মনোজ বসুর গল্প সমগ্র

মনোজ বসুর

গল্প সমগ্র

উত্তর পর্ব

ডঃ ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : কুড়ি টাকা

মনোজ বসুর (১৯০১) গল্পের পাত্রে জীবন-রসের সঞ্চয় সন্ধান করতে যার হওয়া গিয়েছিল কতকাল আগে,—সেই ১৯৩০ সালে 'নতুন মানুষ' যখন 'বিচিত্রা'র পাতায় হঠাৎ প্রকাশিত হয় ;—কিংবা সে হয়ত তারও আগেকার কথা। শিল্পীর গল্পের পসরা এ পর্যন্ত ছুটি সংকলনের ডালায় সাজিয়ে তোলা শেষ হয়েছে। এবারে এসে পৌছা গেছে ষাট-এর দশকের গভীরে—যার প্রথম ফসল ধরা আছে 'কল্পলতা'য়। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এই গল্প-সংকলনটিতে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয় বছরের রচনাই প্রধানত সংগৃহীত। অতদূরে এসে মনে হয়,—আর বুঝিবা 'রস' নয়—ত্বরিত-সচল জীবনের জলছবি একের পর এক ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে প্রবহমান গল্পের ধারা-স্রোতে। ক্ষণকালের চমক, ক্ষণিক আবেশ এবং মুগ্ধতা প্রায় উড়ে চলে এসে অবশেষে মিলিয়ে যায়—দ্রুতগতি রেলগাড়ির দু'পাশের পটচ্ছায়ার মত।

নতুন এ ভাবনা আসলে নতুন কালের হাতের দান; আর শিল্পী মনোজ বসু কেবল নিবিষ্ট জীবন-পিপাসু নন, জীবন-পথের অনলস এবং, অংশত, অনাবিষ্ট পথিকও। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, এই সময়েই—অর্থাৎ ষাটের দশকের শুরুতেই—আর এক প্রিয় প্রবীণ গল্পশিল্পী 'এই দশকের গল্প' সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫০-এর দশকে স্ফূর্ত প্রতিশ্রুতিপর তরুণ লেখকদের রচনাসম্ভারে সাজিয়ে।[১] কেবল কবিতায় নয়, ছোটগল্পের জগতেও শিল্পের চরিত্র-বদলের মাপুনি হয়েছে তখন থেকেই দশকের নিরিখ। ভেতরকার যুক্তিটি হল, চলচ্ছবির মত ত্বরিতগতি ;—কিংবা বুঝিবা মহাকাশযানের মত—মহাকাশ-যানের গঠনশৈলীর মতই যার বিস্তার ও বিকাশ অশেষ জটিলতাক্রান্ত—অধুনাতন জীবনের চরিত্র বদল হয়ে যাচ্ছে প্রায় নিমেষে নিমেষে,—প্রতি দশকের হিসেবে এই জীবনের সুনির্দিষ্ট যুগান্তর। আর সাহিত্য যেখানে জীবন-সম্ভব, কিংবা যদি হয় জীবনের দর্পণ, তার রূপগুণান্তরেরও স্বভাবতই হবে অভিন্ন নিরিখ। অন্তত পঞ্চাশের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক জীবনের উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা চরিত্র আমাদের আয়েসী জীবন-মূলেও বাসা বাঁধতে শুরু করেছে; ষাটের দশকের শুরু থেকে তার সচেতন স্বীকৃতি স্পষ্টোচ্চারিত। মনোজ বসুর গাল্পিক মনের গভীরে তার ছায়া-সম্পাত অস্ফুট উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল,—অনেকটা বুঝিবা অগোচরেই।

১। দ্র. বিমল কর (সঃ)—'এই দশকের গল্প।'

এই যুগ-জীবন-চরিত্রকে শিল্পী কিভাবে কতটা রূপগুণান্বিত করে তুলেছেন, সে এক, পৃথক্ প্রসঙ্গ। তারও আগে মনে আসে সেই অভিভূতিকর চারিত্র লক্ষণের কথা, মনে পড়ে অধুনাতন এক মার্কিন গল্প-শিল্পী এবং গল্প-সমালোচকের অনুভবের কথাও,—"ব্যক্তিগত এবং সার্বিক নীতিচেতনার বিপ্লব, স্বপ্নাতীত সামাজিক ও অর্থনীতিক জটিলতা, উদ্বেগ, উত্তেজনা ও স্নায়বিক অবদমনের বিস্ফোরণ, অভিভূতিকর ও উত্তরোত্তর ভীতিজনক বৈজ্ঞানিক চমক,—এইসবের ফলে 'জগতের সবকিছুই যথাযথ রয়েছে,'—ব্রাউনিঙের এই স্বস্তিকর ধারণাটিকে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মুখোমুখি করে তুলেছে। নূতন যেখানে আগামীকালই সেকেলে হয়ে পড়তে চায়, পরিবর্তনকেই যেখানে চিরস্থায়ী বলে মনে হয়, পরিণামী বিনষ্টিই যেখানে প্রায় একমাত্র সত্য, পুরানো মূল্যচেতনা পুরানো প্রাচুর্য পুরানো ভাবাদর্শ যেখানে আসছে সপ্তাহের সাংবাদিক শিরোনামার নিরিখে পুনর্মূল্যায়িত হয়ে চলে,- ছোটগল্প সেই যুগের প্রতিফলক সাহিত্যিক দর্পণ হয়ে উঠেছে।"[২]

এ অনুভব সাম্প্রতিক মার্কিন গল্প সম্পর্কে যত, বাংলা গল্পের বেলা তত তীব্র পরিমাণে সত্য নাও হতে পারে,—নিছক উদরান্নের সংস্থানে নিঃশেষিত-প্রায়, বৈচিত্র্য এবং বিস্তার-সীমিত পশ্চিমবঙ্গের স্বভাবত নির্জীব জীবনের পক্ষে মার্কিন জীবনযাত্রার আত্যন্তিক উত্তালতা, ব্যাপ্তি কিংবা প্রখরতা কল্পনাতীত। তাহলেও প্রত্যয় এবং প্রবণতাগত স্বধর্ম্যের কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।- নীরন্ধ্র অন্ধকারে ছাওয়া এইকালের আকাশে ছোট ছোট গল্পের জোনাকিরূপ যত্র তত্র ফুটে যদি না উঠেও, ছোটগল্পের নিটোল অবয়বধৃত বিশেষ রসসৌন্দর্য বুঝিবা আর সম্ভাবনীয় নয়।

কথা সাহিত্যের জগতে উপন্যাসের উদ্ভব কল্পনা করা হয় রেনেসাঁসের প্রাথমিক উৎক্ষেপ প্রভাবে ভারসমতাচ্যুত জীবনের আত্মিক স্বাবরোধের মূলে। আর সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্পের শিল্পরূপ উপন্যাসেরও উত্তরভূমিতে। এইসব কথা ভেবে এক সময়ে মনে হয়েছিল, রেনেসাঁস-পরিণামী স্থিত-প্রত্যয় আত্মস্থতার গভীরতল হতেই বুঝি বা ছোটগল্প কলার উদ্ভব।[৩] বাংলা ছোটগল্পের রবীন্দ্র-সম্ভব জন্ম, রবীন্দ্র-উত্তর পরিণতি এবং সাম্প্রতিক দুর্লভতার আদ্যোপান্ত ইতিহাস লক্ষ করে এ অনুভব আরো দৃঢ় হয়েছে।—একালে যথার্থ ছোটগল্প অলভ্য,—কারণ এ জীবনের মূল হতে যে-কোনো প্রকারের

২। William Peden—'The American Short Story'—বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের।

৩। দ্র. ভূদেব চৌধুরী— 'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার'।

প্রত্যয়ের ভিত এবং আত্মস্থতার অনুকূল সমাহিতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। জীবন যেখানে নোঙর-ছেঁড়া অনিশ্চয়তার স্রোতে চরকির মত ঘুরছে, ত্রিশঙ্কুর মত যে উন্মার্গজীবিতা পরিণাম-প্রত্যাশাহীন অবক্ষয়ের বিবর-মুখাগত, সুষ্ঠু সৃজন-কলার সমুচিত প্রচ্ছদ সেখানে উন্মূলিত— ছোট গল্প-শৈলীর সাবলীল প্রকাশও সহজে বাধাহত।

তাহলেও আগাগোড়া জীবন যেখানে অবিরল ক্ষোভ-আক্ষেপে আলোড়িত স্বভাব-শিল্পীর প্রহত চেতনা সেখানে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বুঝি আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অভিঘাতের আকার-প্রকার, অভিজ্ঞতার রকমফের এবং শিল্পি-চিত্তের প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ ও প্রকরণ অনুযায়ী সেই মুক্তি-প্রয়াস স্বতন্ত্র-বিচিত্র অভিব্যক্তির পথ খুঁজে নেয়, দেশভেদে এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-ভেদেও বহমান একই উৎক্ষেপ-তাড়না বিভিন্ন চারিত্রে প্রকাশ লাভ করে। সাম্প্রতিক মার্কিন গল্পের সঙ্গে বাংলা গল্পের, কিংবা মনোজ বসুর গল্পের সঙ্গে অপরাপর বাঙালি গাল্পিকের রচনাগত স্বাতন্ত্র্যের রহস্য আসলে এইখানে।

আলোচ্য কালসীমায় মনোজ বসুর শিল্পিমনের অভিজ্ঞতা ও অনুভবগত বিবর্তনের রূপরেখাটি তরুণ আলোচক একজন সুঠাম সংহতিতে প্রকাশ করেছেন,—"১৯৬০ এর পরে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনগুলো লক্ষীভূত হয়। এই সময় থেকে নাগরিকতার উন্মেষ হল মনোজ বসুর সাহিত্যে। লেখকের গ্রামভাবনায় ছিল যশোহর জেলা। ঐ অঞ্চল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের বিপন্ন সম্প্রীতি নিয়ে লেখক দীর্ঘকাল ধরে আদর্শমূলক অনেক গল্প রচনা করেছেন। স্বপ্নসাধের বিনষ্টিতে লেখক আশাহত, গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণায় মন তাঁর বেদনা-বিধুর। এ অবস্থায় নগরকে পটভূমি নির্বাচন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। শহরের প্রতিকূল পরিবেশে সৃষ্টি-প্রেরণা স্ফূর্তি পায় না; জীর্ণ-ব্যবস্থার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন সমাজ-নির্মাণও অসাধ্য ···বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে লেখক পল্লীর উৎখাত মানুষ ও শহরের পরিবেশকে আশ্রয় করে শিল্প সৃষ্টি শুরু করলেন।"[৪]

'কল্পলতা'র গল্পগুচ্ছ এইসব নিয়েই গড়া,—কিছু অতীত স্মৃতির রোমন্থন, কিছু বর্তমান আক্ষেপের উত্তেজনা, আরো কিছু বা বহমান জীবন-অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের 'চূর্ণক'। কিন্তু সব কিছুতেই মেজাজটা কেমন হাল্কা, কোথাও মজার আমেজ,—ইংরেজিতে যাকে 'ফান' বলা যেতে পারে,—কোথাও গুরু

৪। দীপক চন্দ্র -'মনোজ বসু : 'জীবন ও সাহিত্য'

কথাও লঘু সুরে বলে ফেলে ভারমুক্ত হয়ে যাবার আগ্রহ; ভাষাভঙ্গী কোথাও কটাক্ষ-বঙ্কিম, কখনো বা তির্যক—প্রতীকিতার ধারঘেঁষা।

'চিড়িয়াখানা' গল্পের কথাই বলি। চিড়িয়াখানায় 'বেবুন' দেখতে গিয়েছিল গল্পের নায়ক; 'কুকুরে-বাঁদরে মিশান' কুৎসিত প্রাণী। দর্শকেরা দেখে কেউ কেউ বিচলিত হয়েছিল—'পশুর লজ্জা থাকতে নেই, কিন্তু যারা দেখে তাদের তো লজ্জা। সাহস করে কেউ কাপড় জড়িয়ে দিতে পারে না!' —সেই বিবস্ত্রতার প্রসঙ্গে বেবুন-রসিক মা-মেয়ের বস্ত্রহ্রস্বতার যে কটাক্ষটুকু আছে, তার মূলে শোভন-রুচি প্রবীণ শিল্পি-মনের ধিক্কার যেন স্বতোসংবৃত।

এই অর্থেই বলেছিলাম, চলমান জীবন-পথের অনলস পথিক মনোজ বসু অংশত অনাবিষ্ট-ও। জীবনের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তাঁর শিল্প-দৃষ্টি সহজে স্পর্শ-কাতর,—অনেকটাই টেনে-বাঁধা একতারা যন্ত্রের মত; মনোজ বসুর মেঠো সরল অন্তরঙ্গ মানসিকতার গভীরে একতারারই মধুর নিবিড় সুর স্বতো-গুঞ্জরিত! কিন্তু ঐ একতারা-শিল্পীর চেতনা গ্রামীণ বাউল-বৈষ্ণব-ফকির-দরবেশদের মতই অথৈ মরমিয়া অনুভবে সহজে মগ্ন;—অনির্বচনীয় এক নির্লিপ্ততায় না হোক্, তাঁদেরই মত অনতিসম্পৃক্ত ভাবুকতার বীচিবিভঙ্গে নিয়ত বিভোল। আধুনিক সাজ-সজ্জায় বাসনিক লজ্জাবিসর্জনের প্রসঙ্গেই আসা যাক্,—বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী এমন ক্ষেত্রে প্রখর শাসনে উদ্যত হতে পারত। শরৎচন্দ্র হয়ত সরল বিবৃতিমূলক মর্মস্পর্শী ভাষায় অনুভবকে বিচলিত করতে চাইতেন, সমকালীন তারাশঙ্কর 'প্রগাঢ় ও প্রযত্নোচ্চারিত' অবহিত ভাষণে বক্তব্যকে পূর্ণ স্ফুট করে তবেই থামতে পারতেন। জীবনের প্রতি অনুরাগ এঁদের যত, ব্যক্তিগত আসক্তি-বন্ধন কিংবা সম্পৃক্ততাও—ইংরেজি করে বললে 'ইনভল্‌ভ্‌মেণ্ট'-ও তার চেয়ে কিছু কম নয়। অন্যপক্ষে মনোজ বসুর শিল্পি-চেতনা দেখেছি বয়ঃসন্ধি-পীড়িত কৈশোর ভাবালুতায় মেদুর। স্বভাব-কিশোরের মতই আত্মপ্রক্ষেপণ কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবলতা তাঁর শিল্প-চারিত্রে অনুপস্থিত। বেদনায় সংকুচিত, আনন্দে কলকণ্ঠ, স্বভাব-উৎকণ্ঠার ব্যাকুলতাভরে তাঁর গভীর অনুভূতিও অনতিগাঢ় বাক্‌শৈলীর নির্মোকবদ্ধ। কিন্তু কঠিন কথা বলা গেল না বলেই সত্য কথা গোপন করাও তো সম্ভব নয়! তখনই সহজ-শিল্পীর কণ্ঠের স্বত-উৎসারিত বাণী আপন আন্তর আবেগেই বঙ্কিম কটাক্ষটুকুকে আয়ত্ত করে নেয়। ঐ 'চিড়িয়াখানা' গল্পের নাম;—নৃসিংহ অবতার বা কিন্নর মূর্তির বিমিশ্র চরিত্রতার সূত্রে বেবুনের কুৎসিত সঙ্কর রূপ; তার সঙ্গে বিবস্ত্র জন্তু আর তার মুখোমুখি স্বল্পবস্ত্রা জননী-কন্যা—নারীত্বের ছলাকলায় পরস্পরের প্রতিযোগিনী যারা—সবকিছু

মিলে অনায়াস-প্রবাহিত অকুণ্ঠিত বিবৃতির সূত্রে যা আত্মপ্রকাশ করে, সে কি তিরস্কার, আত্মগ্লানি, না নিছক জীবন-দেখার মূক ব্যথিত অনুভব?

যেমন করে ভাবা গিয়েছিল, তেমন করে বুঝি প্রকাশ করে ওঠা গেল না। লঘু হাল্কা মেজাজের গল্পটির মূলে স্বেচ্ছাগতি যে মজা-লুব্ধতা রয়েছে, তার রেশটুকু রক্ষা করা যায় নি; হয়ত তো তা সম্ভবও নয়। শরতের আকাশে ভেসে-বেড়ানো 'শাদা-মেঘের ভেলা'ও আসলে লঘু বাষ্প-কণিকারই মালা,—বর্ষার ঘননিবিড় অশ্রুবিন্দুর বিস্ফারিত স্মিত লঘু রূপান্তর। তবু যত উজ্জ্বল, যত নির্ভারই হোক,—অশ্রুর গোপন উৎসটিকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই তো! আমাদের বিবরণে অশ্রুর সেই ঘন জমাট চরিত্রটিই প্রবল হল,—মেঘের কোলে রোদের হাসির পুরো খেলাটি দেখতে হলে মূল 'চিড়িয়াখানা' গল্পটিই পড়ে দেখতে হয়—প্রবীণ জীবন-প্রেমিকের বেদনার সঙ্গে স্বভাব-কিশোর শিল্পি-চেতনার গঙ্গা-যমুনা সংগম যেন বহুধা ভারাক্রান্ত সাম্প্রতিক জীবন-বোধের মূল হতে আশ্চর্য যাদু বলে 'মাধ্যাকর্ষণ'-এর অনিবার্য টানটি নির্মোচিত হয়ে গেল; বাংলা গল্পে এইটুকু মনোজ বসুর গাল্পিক প্রতিভার অপরতন্ত্র দান। হোক্ হাল্কা, তবু উন্মার্গগত নয় কিছুতেই।

বেদনার আঘাত যেখানে বিদারক, অশ্রুর বিন্দুটি ঘনতর বদ্ধ,—সেখানে সংকেতের ব্যবহার বরং আরো নিটোল। তাহলেও, চূড়ান্ত আত্মিক অভিঘাতেও গল্পের শরীরে আত্মপ্রতিফলন মনোজ বসুর স্বভাব-সিদ্ধ নয়। 'কান্না গাড়ি'র কথা মনে আসে।—বস্তুত গোটা 'কল্পলতা' সংকলনে ঐ একটিই 'সিরিয়াস' মেজাজে লেখা গল্প। সবারই কথা, মনোজ বসুর প্রথম প্রেম—তাঁর আজন্ম স্বপ্নের পরমতীর্থ গ্রাম-বাংলা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল রাজনৈতিক পাশা খেলুড়েদের হাতে, সাম্প্রদায়িকতার নেশাগ্রস্ত দুঃশাসনেরা তখন মানবতার বস্ত্র হরণে উন্মত্ত। মানুষের ধনপ্রাণ শরীর সম্মান শ্মশান-শকুনদলের নখচঞ্চুতলে রক্তাক্ত পদধূলিলীন। জীবন-প্রেমিক, প্রেম-সৌন্দর্য-মধুরিমার আজন্ম ধ্যানী রোমান্টিক শিল্পীর যন্ত্রণার অবধি নেই,—সব চেয়ে বড় যন্ত্রণা তো বিশ্বাসের অপমৃত্যুর! সেই রক্তাক্ত অনুভবকে রক্তরাগ-সজীব প্রাণ-প্রবল করে তুলেছেন শিল্পী এই গল্পে। গাড়ি বয়ে কান্নার ঝাঁক আসছিল পেট্রাপোলের সীমান্ত-প্লাটফর্মে পাকিস্তানের ওপার হতে;-মনোজ বসুর ব্যক্তি এবং শিল্পি-জীবনের স্বপ্ন-তীর্থ সে পারে। স্থতি-গঞ্জের ধর্ষিতা নারীর বীভৎস-মৃতি কাহিনী। সুতিগঞ্জ আসলে সতীগঞ্জের অপভ্রংশ; —ঐ বটগাছ তলায় 'সতী' হয়েছিলেন কোন্ চক্রবর্তী-ঘরের তরুণী বধূ; সে সব শতাব্দীর পরপারের কাহিনী। ইতিহাস আজ ফিরে

কথা কইছে,—ঐ গাছতলায় নরপশুদের হাতে সর্বস্ব লুণ্ঠিত হল আর এক সতীর। কিছু 'ফ্ল্যাশব্যাক্', কিছু স্মৃতিচারণ, আরো কিছু শ্রুতিধারণের কলা-কৌশলের সাঙ্কেতিকতা বশে এ গল্প উদ্বেজিত চিত্তের প্রতি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অমোঘ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সব শেষে, গভীর রাতে সতেরো বছর আগে ফাঁসি-যাওয়া জগতের পুনরাবির্ভাব, তার অনুতাপ-দাহ আর কিছু নয়—শিল্পি-চেতনার সান্ত্বনাহীন আক্ষেপবিদ্ধতার বিমূর্ত প্রগাঢ় প্রতীক, আত্মপ্রক্ষেপণ-বিমুখ আত্মিক যন্ত্রণার অনতি উচ্চারিত এই সংবৃত প্রকাশ মনোজ বসুর অনতি-সম্পৃক্ত নিবিড় জীবন-প্রীতির অ-দ্বিতীয় শিল্পস্বাক্ষর।

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিল,—'চিড়িয়াখানা' আর 'কান্নার গাড়ি'-দুটি গল্পই নর-জান্তবতারু বৃত্তান্ত,—দুয়েই শিল্পি চেতনার আক্ষেপ প্রতীক-প্রক্ষিপ্ত,—কিন্তু প্রথমটির বিকাশ হাল্কা চালে, পরেরটি অপেক্ষাকৃত মন্থর-প্রগাঢ়, তবু কোনো গল্পই অতি-ভারাক্রান্ত নয়।

অবশ্য তার মুখ্য কারণ শিল্পীর অভিনব 'করণ-কৌশল'। ছোটগাল্পিকের অমোঘ শক্তির উৎস-নির্দেশ প্রসঙ্গে এডগার অ্যালেন পো বলেছিলেন, 'প্রথম থেকেই পাঠকের আত্মাকে তিনি আপন অধিকার বশে নিয়ে আসেন।'[৫] মনোজ বসুর গল্প-বলার ভঙ্গী গাল-গাল্পিকের, ছোটগাল্পিকের নয়।—আগেই বলেছি কলমের মুখেও গল্প বলেন তিনি,—লিখিয়ের প্রকরণ লেখায় উপেক্ষিত। কথক-সুলভ সেই আয়াসহীন ভঙ্গিতে ভারিক্কি ভাবনার প্রকাশ লগ্নেও কোনো ভার গল্পের গায়ে এঁটে বসতে পাবে না। ফলে এমনকি 'কান্নার গাড়ি' গল্পেও বেদনার অনুভব যতই প্রগাঢ় হোক, গল্পের গতি কোথাও মন্থর নয়। এই অনায়াস সহজ ভঙ্গি বশেই পাঠকের মনকে কেবল নিজের হাতের মুঠোয় নয়, একেবারে গল্পের অঙ্গীভূত করে ফেলেন মনোজ বসু, যার ফলে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাটি হারিয়ে গল্পের সংগতি-স্বাভাবিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার মৌলিক অধিকারটুকুও বিসর্জন দিয়ে বসতে হয়।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'নার্সিংহোম' গল্পের কথাই ধরা যাক্। মজার গল্প একটি, কিছু মজা আর কিছু রোমান্স। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পের কার্য-কারণ-সংগতি সম্পর্কেই সন্দেহ থেকে যায়। শরৎচন্দ্র নাকি বলতেন, 'গল্প হল মিছে কথা বলার আর্ট।'—অর্থাৎ এমন করে মিছে কথা সাজানো রইল, যাতে সত্যি বলে মনে করতেই হয়। কিন্তু আশাক বায়ের প্রথম 'নার্সিংহোম'-বাস যদি সত্য-মিথ্যায় সংশয়াচ্ছন্ন আবছায়া-ঘেরা ছাঁচে ঢালাই হয়েই থাকে, তার

৫। Edganr Allen Poe: 'Nathaniel Hawthorne'.—Works of Edganr Allen Poe, Vol. III

দ্বিতীয়বার 'নার্সিংহোম' প্রবেশের প্রয়াস অসংলগ্ন অবিশ্বাস্যতায় ছড়ানো। তাহলেও ঐখানেই যেন গল্পের মজা, হঠাৎ যে-করে অশোক রায়কে আবিষ্কার করতে হল ডাক্তার সেন আর সিস্টার নীতার 'বিয়ে হয়ে' যাবার খবর,— আর মেট্রনের ঐ শেষ কটাক্ষটুকু! ঐখানেই নির্ভার লঘু হাসির মজা ঝিলিক দিয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়;—ঠোঁটের কোনে সদ্য জেগে-ওঠা স্মিত হাসির রেখাটির সমপরিমাণ তার পরমায়ু।

'নার্সিংহোম' অন্যথায় ত্রিভুজ প্রেমের একটি রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাসে শেষ হতে পারত; কিংবা 'ভেজাল' গল্পের নিয়তি হতে পারত কারুণ্য-মেদুর। কিন্তু প্রথম থেকেই অবাস্তব-লঘু বাচনভঙ্গী আর স্বেচ্ছা-নির্মিত বেসামাল হাল্কা চাল ক্ষণজীবী হলেও মজার আমেজটুকুকে নিটোল আকারে গড়ে তোলে তিলে তিলে। এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল 'মায়াকান্না' (১৯৬১)। সেখানে বলেছি, তখন থেকেই ক্ষণজীবিতার 'এপিসোডিক' উপাদান গল্প-কলার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু 'মায়া কান্না'র 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'হাসি-হাসি মুখ' কিংবা 'ললাট পাঠ'-এর পাশে 'নার্সিংহোম' 'ভেজাল' অথবা 'ডাকাতি'-ই নয় কেবল, এমন কি 'বলিদান' কিংবা 'তিমিঙ্গিল'-এর মত গল্পেও দেখব, শিল্পীর জীবন-দৃষ্টি নিছক 'এপিসোডিক' নয়—আরো তরল,—আরো 'ফানি'।

'বলিদান' কিংবা 'তিমিঙ্গিল' গল্পের গভীরে বিচ্ছেদ ও বেদনাবোধের এক সন্তর্পণ সংগুপ্ত উৎস রয়েছে, সমস্ত গল্পকে যা মানবিক করুণাবোধে বিগলিত করে তুলতে পারত। বিশেষত 'তিমিঙ্গিল'-এর প্রসঙ্গসূত্রে 'নরবাঁধ' কিংবা 'দেবীকিশোরী'-গল্পগুচ্ছের ব্যথা-সুনিবিড় মানবিক আবেদনের সম্ভাবনার কথা মনে আসেই; কিন্তু হাল্কা মেজাজের কৌতুক-কটাক্ষ-বঙ্কিম বিন্যাস-কৌশলে শিল্পী সে সম্ভাবনাকে হেলায় হারাতে দিয়েছেন।

এ-কোনো লাভক্ষতির হিসেব নিকেশ নয়, কিংবা দোষগুণের কড়চাও না! মানবিক আবেদন-স্নিগ্ধ করুণাঘন একটি গল্প-সম্ভাবনার তুলনায় একটি মুখে-হাসি চোখে-জল ভরা চকিত-চপল জীবন-চিত্রের মূল্যগত তারতম্য বিচার নিরর্থক। কিন্তু শিল্পের গভীরে শিল্পীর মেজাজটিকে আবিষ্কার করতে পারার অতিরিক্ত লাভের লোভ সর্বদাই পাঠকের মনে জড়িয়ে থাকে,—আর মনোজ বসুর মত পরিবেশ-চকিত মানসিকতার পক্ষে শিল্পীর মেজাজ অর্থেই তো দেশ-কাল-জীবনেরও রহস্য কুঞ্চিকা! তাছাড়া গল্পের সূত্র ধরে গাল্পিকের মন, আর পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর জীবনকে খুঁজে দেখার আকাঙ্ক্ষা-সূত্রেই তো একদা শুরু হয়েছিল আমাদের এই মনোজ বসুর গল্পলোক পরিক্রমা।

সেই প্রসঙ্গেই মনে আসে, এ জীবন-দৃষ্টি নিঃসন্দেহে 'এপিসোডিক'। আগের আলোচনায় দেখেছি, আমাদের এই স্বভাব-উত্তেজিত যুগে নিবিড় অনুভবে জীবনের গভীর তলগত হতে পারার ধৈর্য, অবকাশ, কিংবা স্থিত-চিন্তন কিছুই বড় একটা অবশিষ্ট নেই। 'মাথুর' গল্পের নিবিষ্ট জীবনানুভব একালে 'বাপের বাড়ির মেয়ে'র লঘিমাকে অতিক্রম করে বেশিদূর এগোতে পারে না, কিংবা 'নরবাঁধ'-এর অনিবার্য সংস্করণ বুঝি 'তিলন্দীর চর'-এ। শিল্পের সৃজন-রহস্যশালায় কালের হাতের প্রভাব ঐ পর্যন্তই। কিন্তু 'কল্পলতা'র গল্পে তারও অতিরিক্ত তরলতা যেটুকু জুটেছে, যেটুকু নিছক কৌতুক-মজাদার ('ফানি'),-- মাঝে মাঝে মনে হয়, সে বুঝিবা জীবনের প্রতি বিরক্তি-বিমুখ শিল্পি-চেতনার আত্মসংগোপনের প্রচ্ছন্ন কৌশল।

কেবল দেশ-বিভাগ-জনিত ক্রূরতা নয়, 'চিড়িয়াখানা' 'বধূ ভগবান, যম' 'চাবি', 'ঘরণী' 'কল্পতরু' প্রভৃতি গল্পে জীবনের পাতালভূমি থেকে উঠে-আসা তিক্ত অভিজ্ঞতা যেন ঝাঁক বেঁধে দেখা দিয়েছে; কোনো ইতিমূলক প্রত্যাশা, —কোনো ভরসাবাহী মূল্যচেতনা সে চোরা বালিতে দাঁড়াবার ভর খুঁজে পায় না। 'চিড়িয়াখানা' গল্পের বেআব্রুআনা হাল আমলের লক্ষণাক্রান্ত যদি হয়, তার মূলনিহিত মানস-প্রবণতা, 'চাবি' গল্পের সর্পিল লুব্ধতা, 'ঘরণীর' অসুস্থ চিত্ত-বিক্ষেপ কিংবা 'কল্পতরু' গল্পে ধর্ম নিয়ে চোরাকারবার,— এ-সব কিছুই মানব-প্রকৃতির চিরকেলে অনিবার্য উপাদান।—স্নেহ-প্রেম ত্যাগ-তিতিক্ষা-আত্মদানের মহিমা জীবনে যত সত্য, লালসা, লোভ-স্বার্থপরতা, ক্রূর-কুটিলতা তার.চেয়েও প্রখর-প্রকট। তাহলেও যা আছে, কেবল তাই নিয়ে মানুষ বাঁচে না, তার চেয়েও অনেক বেশি করে যা হতে ইচ্ছে করে তারই গভীরে মানুষের আত্মিক বসতি; আর মানুষের বাস্তবিক অস্তিত্বও তার এই আত্মিক অধিবাসনের বাসনা-লাঞ্ছিত। 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর অভিজ্ঞতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলব্ধিতে যত জলজ্যান্ত হোক, তবু রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ট্রাজেডি বেশি লোভনীয় হতে বাধা নেই। অবিশ্বাসের চোরাগলিতে মানবিক প্রত্যাশা দমফুটো হয়ে মরতে রাজি নয় কিছুতেই; এমনকি রাবণের চিতার মত শাশ্বত শ্মশানীভূত জীবন-অভিজ্ঞতার মাঝখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নব নবতর প্রত্যয়ের আবাঁধা ঘাট খুঁজে ফিরেছেন শেষ অবধি।

মনোজ বসুর বেলা আসল কথা, অবিচল বিশ্বাসের সুঠাম বন্দরে প্রথমাবধি তিনি আপন শিল্প-কল্পনার তরী বেঁধেছিলেন.—প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার পাছে দরদী নিবিড় স্বপ্নকল্পনা জড়িয়ে। অথচ এমনি দুর্যোগ এল যুগের মাথায়

ভর করে, মুক্ত-কৈশোর শিল্পি-চেতনার দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসে! 'চাবি' গল্পের অভিজ্ঞতার মধ্যে যেন আত্মগোপন করে আছে 'পটল ডাক্তার মধ্যবিত্ত পাঁচালি', এবং 'কল্পতরু'র গল্পাবেদন নিশ্চয়ই সর্বাংশে পরশুরামের 'বিরিঞ্চি-বাবা'র মত অমিশ্র কৌতুকসর্বস্ব নয়। জীবনের পশ্চিম সীমায় পৌঁছে এই অনুভব-অভিজ্ঞতার অনিবার্যতা-বোধ মনোজ বসুর অনতিপ্রখর অথচ অতিস্পর্শকাতর চিত্তবৃত্তির গভীরে যে উত্তাপ সঞ্চার করেছিল, তাকেই হাস্য-চালের লঘু পদক্ষেপে পাশ কাটিয়ে গেলেন শিল্পী তাঁর নিজস্ব কলাকৌশলে। 'কল্পতরু'—গল্পমালার প্রায় সর্বত্রই ঐ একই বৈশিষ্ট্য,—অব্যবহিত কৌতুক-লঘুতার পর্ণপুটে জীবনের দুর্মোচনীয় বিনষ্টি-বোধ-জনিত আক্ষেপ অনায়াসে প্রচ্ছাদিত। আপাত হাসির উজ্জ্বল আলোকে আসলে ঝুটা মুক্তার মত চক্‌চক্ করে আত্মপ্রক্ষেপণকুণ্ঠ শিল্পি-মনের 'একবিন্দু নয়নের জল'!

'কল্পলতা'র পরবর্তী সংকলন 'ওনারা' ১৩৭৬ বাংলা সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কৌতুকী মেজাজটা এখানে আরো স্বচ্ছ,—আরো অমিশ্র নির্ভেজাল; তবু সংশয়ও জাগে,—পুরোপুরি তাই কী? প্রথম গল্পটাই 'ভেজালের উৎপত্তি'; লেখক নিজে বলেছেন তাঁর অন্যতম প্রিয় গল্প।[৬] ভেজাল সম্পর্কে কোনো তত্ত্বানুসন্ধান নয়, কিংবা নিছক সরস ভেজালি গল্পও নয় 'কল্পলতা'র 'ভেজাল'-এর মত। প্রাথমিক চরিত্রে এটি ভূতের গল্প; গোটা 'ওনারা' সংকলনটাই তাই নিয়ে। ভূতের গল্প আর অতিপ্রাকৃত-রসের গল্পে তফাৎ অনেক। প্রথম জীবনে অতিপ্রাকৃত গল্প লিখে মনোজ বসু বিস্ময় উদ্রেক করেছিলেন সেই 'বনমর্মর'-'নরবাঁধ'-এর যুগ থেকে; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন, 'অতিপ্রাকৃত' রসের গল্প সৃষ্টিতেই মনোজ বসুর প্রতিভার প্রধান প্রবণতা। এসব কথাই আগে দেখে এসেছি।

তাহলেও সৃষ্টির জগতে মনোজ বসু আসলে বৈচিত্র্য আর বহুলতার প্রত্যাশী। আগেও বলেছি, পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি দাবি করেন, সকল বিষয় নিয়ে, এবং সকল প্রকরণেই তিনি গল্প লিখেছেন,—বড়-ছোট-মাঝারি সকল আকারের। মনোজ বসুর গল্পের মত তাঁর এ-অনুভবও তথ্যমূল-রহিত নয়। আর আমাদের আলোচ্য কালসীমায় পৌঁছে বিদেশী সমালোচকের সেই মুখরোচক কথাংশটি বার বার মনে পড়ে মনোজ বসুর গল্পগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে—'ছোট গল্প সবই হতে পারে, একটি ঘোড়ার মৃত্যু থেকে একটি তরুণীর প্রথম প্রণয় পর্যন্ত।...লেখক যা চান—সব।'[৭]

৬। দ্রঃ 'মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭৮)'। দ্রঃ H. E. Bates—'The modern short story'.

আর আপাত-লঘুতা, বলেছি, চলমান কালের স্বাভাবিক মেজাজ। 'ওনারা' গল্প-সংকলন এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এমন নয় যে, সবগুলো গল্পই গ্রন্থ-প্রকাশের সমসাময়িক। মনোজ বসুর বৈচিত্র্যলোভী শিল্পি-মন ভূতের কৌতুক-রহস্য নিয়েও মাঝে মধ্যে কৌতূহলী হয়েছে,—তারই সূত্রে নানা সময়ে লেখা 'ভূত-দানা-দেবতা'র প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা গল্পগুলি গেঁথে এই নূতন সংকলন ;—লঘু রস আর হাল্কা রসিকতায় জড়ানো গল্প।

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিল, ভূতের গল্প আর অতিপ্রাকৃত রসের গল্প অভিন্নস্বাদী নয়, যদিও অশরীরী সত্তা দুয়েরই মৌল উপাদান। জীবনের গভীরে চেনা-অচেনা, প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের মাঝখানে যে আবছায়া জগৎ রয়েছে, চেতন মনের প্রখর আলোকে যাকে ধরা যায় না, অথবা চেতনাবচেতনের গভীরে যার অনুভব অমোঘ, সেই অন্তহীন রহস্যের অতল অভিভবমূলে অতিপ্রাকৃত গল্পের অনির্বচনীয় আস্বাদন। 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী-কিশোরী' গল্পগুচ্ছের প্রসঙ্গে সেই অপরূপ স্বাদুতার সন্ধান করা গেছে মনোজ বসুর গল্পেও। কিন্তু ভূতের গল্পের গঠন ও আবেদন দুই-ই পৃথক। বস্তুতঃ অনতিগোচর অস্তিত্বের রহস্য-বিস্ময় যদি অতিপ্রাকৃত রসের মুখ্য উপাদান হয়, ভূতের গল্প তাহলে সেই ফিকে-করে-ফেলা রহস্য নিয়ে অবিশ্বাসী মনের খেয়ালি কৌতুক। অবশ্যই এ হল বড়দের ভূতের গল্পের কথা। শিশুর চেতনায় ভূতের গল্প আর রূপকথার গল্পের স্বাদে ভিন্নতা খুব নেই,—সব কিছুই ভয়-বিস্ময়-কৌতূহল-উৎকণ্ঠা-মুগ্ধতার অপরূপ স্বপ্ন-পাথার!

'ওনারা' নামটাতেই বড়দের ভূতের গল্প-সুলভ কৌতুক-কটাক্ষ উঁকি দিচ্ছে যেন,—ঐ নামের একটি গল্পও আছে সংকলনে। তাতে মজার গল্পের চরিত্রটি স্পষ্টাক্ষর রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন মনোজ বসু।—'ওনারা' কেন নাম হল, "নাম না নিয়ে 'ইনি' 'উনি' বলে অত খাতির কিসের?"- তার যুক্তিজাল বিস্তার উপলক্ষে সেই যে বলা হল মেজ বৌ-এর গল্প ;—কব্‌রেজ এসে ঔষধ দিলেন ; খাবার ব্যবস্থা, "ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিঁটে।"— "তুলসি চরণ হলেন ভাসুর এবং মধুসূদন স্বামী। নাম করবার জো নেই। ঠারে-ঠোরে বলতে হল।" কারণ স্বামী-ভাসুর গুরুজন, কিনা 'প্রতাপশালী', —আর 'ক্ষমতাবানের নাম' ধরে না কেউ-ই ভয়ে। অতএব 'ওনারা'-ও 'ওনারা'-ই।

গোটা প্রসঙ্গটাই মজা, কৌতুক, আর হাল্কাচালের লঘু আমেজে ভরা। তবু তলিয়ে দেখলে মনে হয়, 'ওনারা' কিংবা 'ভেজালের উৎপত্তির' মত গল্পে আরো বুঝি কিছু লুকিয়ে থেকে মজা দেখে,—তরল হাসির তলদেশ-লীন

শিল্পি-চেতনার সে এক ভাষা-বর্ণহীন অন্তর্মগ্ন আক্ষেপ,—সব তছনছ করে দেওয়া একালের অভিজ্ঞতা-অভিঘাতে যা বিপ্রস্ত বিলোল। সাহিত্যে আহত চিত্তের হাসি ব্যঙ্গবিদ্রূপ-স্যাটায়ারের আকারেই তীব্র প্রতিফলিত হয়। বারে বারে বলেছি, মনোজ বসুর কৈশোর-রস-মদির শিল্পি-চেতনা তীব্রতা-রহিত; আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতই বা করবেন কাকে, বহমান জীবনের সঙ্গে শিল্পীর অনুভব যে নিয়ত একাত্ম! কুলকুচির জল আকাশে ছুঁড়তে গেলে সে যে নিজেরই নাকে-মুখে এসে ছিটিয়ে পড়ে! অতএব এ-সব কিছু নয়—এ হল নিছক 'কটাক্ষ'—নির্ভেজাল কৌতুক আর মজা,—তবু তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে লুণ্ঠিত-স্বপ্ন স্বভাব-শিল্পীর গোচরে-অগোচরে 'মনকে চোখ ঠারা'র লুকোচুরি।

'ওনারা' গল্পের প্রসঙ্গেই আসা যাক্ আবার,—আগের কথা যেখানে শেষ হল,—সেই ক্ষমতাবানের নাম ধরে না কেউ; সেই সূত্রেই লেখক বলছেন,—"পুঁটিরাম দাস স্বদেশী সভার চেয়ার-বেঞ্চি বয়ে এবং কারবাইড্ জেলে দিয়ে বরাবর দেশের কাজ করে এসেছে। স্বাধীনতার পরে তালেগোলে সে-ও এক মন্ত্রী। আপনাদের মুখে তখন আর পুঁটিরাম নেই—এইচ-এম অর্থাৎ অনারেবল মিনিস্টার। বাতে অথর্ব হয়ে সেই পুঁটিরামের মন্ত্রিত্ব গেল তো রাজ্যপাল হবার তদ্বিরে লাগল। আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে 'হিজ এক্সেলেন্সি' দিতে শড়োগড়ো করতে লেগেছেন। তদ্বিরে কিন্তু কাজ দেয় নি, বাতের ব্যথা নিয়ে ঘরে ফিরতে হল তাকে। এবং ঘুরে-ফিরে, সেই পুঁটিরাম'ও নয়—'পুঁটে দাস' এবারে।"

—এমনি করেই লেখেন মনোজ বসু—গালগল্প বলার জোরালো বৈঠকি প্রকরণ তাঁর গল্পের! ভরাস্রোতের নদীর মত তরতরিয়ে ছুটে চলে, যত খড়-কুটো-পলি সবও ছোটে তার দুরন্ত টানে, কোথাও ভারবোঝা, কোথাও মন্থরতা নেই। এবারে তো আরো জোর টান লেগেছে হাসি-কৌতুক কল্লোড়ের! কিন্তু এরই মাঝে আবহমান মূল্যবোধ-পাল্টে-যাওয়া আমাদের হালের সমাজ-জীবনটি কী আনুপূর্বিক আকারে রেখায়িত হয়ে উঠেছে! গল্প নয় এটি,—মূল গল্পের কোনো অনিবার্য প্রসঙ্গও নয়;—জাত কথকের মত কথার পিঠে কথা সাজানোর খেলায় এও একদফা নূতন কথার পোঁচ! কিন্তু জীবন-দেখা চোখ কত নিবিড় হলে এমন অনায়াস-লঘু ভঙ্গিমায় অমন গভীর আক্ষেপকে মুক্তি দেওয়া যায়—লুকোচুরির অপরূপ কটাক্ষ-কৌশলে! আমাদের তো আবার জগতকে মনে পড়তে চায়—'কান্নার গাড়ি' গল্পের জগত, 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' করতে গিয়ে সে কি ভুল করেছিল?

কে দেবে সে উত্তর!—শিল্পী মনোজ বসু তখন হাসছেন, চোরা চাউনি ঘেরা হাস্য, বুঝিবা এক-টু বাঁকা হাসি, মনের চোখের জল ঢাকা পড়বে নয় ত কিসে?

'ভেজালের উৎপত্তি' গল্পে কটাক্ষ বিদ্রূপের সীমান্ত ঘেঁষে গেছে, তবু শিল্পীর অভ্যস্ত কলাকুশলতার বশে আঘাতের ব্যথা কখনোই প্রায় অনুভবনীয় সুরে উঠে আসতে পারে না। গল্পের শেষ ছত্র কয়টি সবার আগে মনে পড়ে। চারদিকে সবারই মনে ভেজালের ফলাও ভাবনা—কারণ 'ভেজালে তড়িঘড়ি ফলপ্রাপ্তি।'

অতএব যমরাজ ভাবছিলেন। তাঁরও মাথায় সহসা আলাদা এক প্লান চাড়া দিয়ে উঠল। বলেন, 'নরলোকে খাদ্যে ভেজাল দিক—আমরাও এদিকে আত্মার ভেজাল চালিয়ে যেতে পারি। মানুষ-আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু-গাধা নেড়িকুত্তা-পাতিশিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে যাও। সাপ-ছুঁচো কেন্নো-বিছেতেই বা দোষ কি। বায়ুভূত নিরাকার জিনিস—ভাল রকম মিশাল করে দিও। বুড়া ব্রহ্মার পিতামহও ধরতে পারবে না।

"সেই জিনিস চলছে। নরসমাজে ইদানীং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, তার গূঢ় রহস্য এইখানে।"

রবীন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর মনে পড়ে, বিশ্বযুদ্ধলাঞ্ছিত পৃথিবীর চারদিকে তখন 'মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কার': মনোজ বসুরও সেই অভিন্ন অভিজ্ঞতা যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে। কিন্তু আত্মিক অপমানজনিত এই আক্ষেপও কত স্তিমিত হয়ে গেল 'নরসমাজ' শব্দটির তির্যক দ্ব্যর্থ-বাহী প্রতীকী প্রয়োগ। ঐটুকু বাঁকা কটাক্ষের আড়ালে অনিবার্য দীর্ঘশ্বাসটিকে সংহত করে নিলেন শিল্পী,—আগাগোড়া গল্প-জোড়া লঘু হাসির ছদ্মবেশটি অকুঞ্চিত থেকে গেল। আসলে মানুষের দেহাধারে জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গের অবাধ-বিচরণই শিল্পীর সৌন্দর্যপিপাসু মনকে উত্তেজিত করেছিল। তাও কি যে-সে জন্তু-জানোয়ার!—কীট-পতঙ্গ, 'গরু-গাধা, নেড়িকুত্তা-পাতিশেয়াল' 'সাপ-ছুঁচো-কেন্নো'র আত্মা চলে যাচ্ছে মানুষের ছদ্মবেশে। তা না হলে আর আজ, 'দুধে নর্দমার জল, চায়ে চামড়ার কুচি, চালে কাঁকর, ওষুধে ময়দা, ময়দায় তেঁতুল-বীচি—এ সমস্ত বহু-পরীক্ষিত পুরানো রেওয়াজ—কোলের বাচ্চাটা অবধি জানে!'

আর্থনীতিক বলবেন, এ-সব কিছুর মূলে রয়েছে উৎপাদনের ঘাটতি—'আকাল'!—কিন্তু মানবিক মূল্য-চেতনায় স্থিত-চিত্ত শিল্পীর তাতে সান্ত্বনা কোথায়? মনুষ্যত্বের 'আকাল' পড়ে গেল যে!—তবু এ-কোনো তিরস্কার

কিংবা শাসনের তর্জনী উত্তোলন নয়,—আজীবন সুন্দর-সেবী চেতনার অনতি-উচ্চারিত সুগভীর আত্মধিক্কার; হাসির মিষ্টি আবরণের তলায় জমাট তেতো অভিজ্ঞতার বড়িটি যেন।

কেবল অনুভূতির নিভৃত নিবিড়তা নয়, এই ছন্নছাড়া জীবন-যাত্রার অবক্ষয়িত চরিত্র কত তিলে তিলে—কত নিবিষ্টভাবে লক্ষিত হয়েছে, গোটা গল্পজোড়া টুক্‌রো-কথার আপাত অসংলগ্নতায় তার পরিচয় দীপ্যমান? 'ওনারা' সংকলনেও মনোজ বসুর সাম্প্রতিকতা-লাঞ্ছিত অনুভব লঘুহাসির ঝুটা মুক্তার আড়ালে ব্যথিত আত্মার অশ্রুবিন্দুটিকেই ঝিক্‌মিকিয়ে তুলেছে, সেই পুরোনো কথা নূতন করে আবার দেখা দিল। বস্তুত সাম্প্রতিক অস্থিরতা-মথিত জীবনের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া মনোজ বসুর একালের গল্পে এক সাধারণ লক্ষণ, স্বভাব-বিশ্বাসী শিল্পিমনের সহ-জ প্রতিবেদন। 'অথ-লক্ষ্মীনারায়ণ-কথা' ভূতের গল্প নয়, দেবতার; হাসির উপকরণও অমন অঢেল নয়—কিন্তু গল্পবাণী এবং গল্পাবেদন অভিন্ন।

কিন্তু 'ওনারা' সংকলনের সব গল্পই সাম্প্রতিক রচনা নয়,—একথা আগেই বলেছি; এবং সকল গল্পই সমান মজাদার নয়। এইসব লঘুচালের গল্পেও দেখা গেছে, মনোজ বসুর প্রতিভার মৌল প্রবণতা হল সুগভীর জীবন-প্রেম, স্বপ্নাবিষ্ট প্রকৃতি-মুগ্ধতা আর অম্লান-অকুণ্ঠিত মানবিক সহানুভূতি। প্রকৃতি-স্বপ্নের হাত ধরে এসেছে রোমান্টিক রহস্যমগ্নতা,—মানব-প্রীতির সূত্রে, সন্তর্পণ সমবেদনা! হাসির গল্পে, ভূতের গল্পে সিরিয়াস গল্পের মতই শিল্পীর এই আত্মিক স্বভাব সদা-অনুস্যূত; পার্থক্য কেবল গুণ আর পরিমাণগত মিশোলে। তারই গুণে লঘুরসের ভূতের গল্পই কত বিচিত্রস্বাদী হয়ে উঠেছে! ওই 'ওনারা' গল্পেই দেখি,—অত হাল্কা চালে শুরু তো হয়েছিল গল্প—এবং এগিয়েও ছিল অনেকদূর! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই 'মেজোবউ'-এর ভূমিকা যখন এল,—এক জীবনের ভুল শুধরাতে যিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেও থামেন নি, তাঁর মাতৃহৃদয়ের অক্লান্ত কল্যাণ-বাসনা ভূতের গল্পেও আশ্চর্য করুণাঘন এক মানবিক আবেদন গড়ে তোলে। 'ফেরা' গল্পটি তো পুরোই মানবিক জীবনাবেদন-ঘনিষ্ঠ; কিংবা 'ছায়াময়ী' যে পরিমাণে ভূতের গল্প তার চেয়েও বেশি একটি মিষ্টিপ্রেমের গল্প নয় কী? নয়নতারার গর্ভের ভূত-হয়ে-যাওয়া অতীত ইতিহাসের মেয়েটির জীবন বাসনা সে মাধুর্যকে আরো নিবিড়তাই দিয়েছে। মনোজ বসুর গল্পে সর্বত্রই জীবন, জীবন-প্রেমের স্বপ্নাবেশ—কখনো অকুণ্ঠিত-অনবসয়, কখনো সাম্প্রতিকতার পেষণে প্রচ্ছন্ন আক্ষিপ্ত।

এই অনুভব নিয়ে তাঁর গল্পলোকের আরো হালের কালে এসে পৌঁছা যায়! 'ওনারা'-এর পরে মনোজ বসুর গল্প নিয়ে আরো দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল,—'মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প' (বৈশাখ ১৩৭৮), আর 'সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল' (আশ্বিন ১৩৭৮)। প্রথমোক্ত সংকলনটির স্মৃতি অসম্পূর্ণ প্রত্যাশার নিরন্তর বেদনা জড়িয়ে রেখেছে শিল্পীর মনে, মনোজ বসু'র গল্প-পাঠকের পক্ষেও সে আক্ষেপ সীমাহীন। শিল্পি-অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনুজের অনুরাগ নিয়ে সংকলন-সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গল্পগুলির নির্বাচনও তাঁরই হাতে সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আকস্মিক অকাল-বিয়োগে পরিকল্পিত মুখবন্ধ অলেখাই থেকে গেল। সে সংকলনে অন্যত্র অপ্রকাশিত গল্প স্থান পেয়েছিল দু'টি—'উত্তরের পথ, দক্ষিণের পথ' এবং 'একদা ছিলেন', আর শেষোক্ত সংকলনের একটিমাত্র নূতন গল্প 'এপার ওপার'। তার পরে আর গ্রন্থিত হয়নি, কিন্তু গল্প লেখা চলেছে অবিরাম ধারায়।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্পের শ্রেষ্ঠতার উৎস মদ-বিহ্বল জীবন ও জীবনাবেশ তারই অভিমুখে মন ফিরিয়েছেন শিল্পী আবার 'আংটি চাটুয্যের ভাই' গল্পে।

বস্তুত শিল্পীর গাল্পিক প্রবণতার সর্বায়ত স্বাক্ষরটি যেন গল্পের দেহে-মনে আঁকা,—তাঁর ভাবুকতা ও রূপকলার সকল মুখ্য লক্ষণ!

খুব দূরলিপ্ত হলেও আংটি চাটুয্যের ভাই বসন্তর সঙ্গে রবীন্দ্র-গল্প 'অতিথি'-র তারাপদর আদলে মিল রয়েছে—উদাসীন ভবঘুরে বন্ধনভীরু সেই অপরূপ কিশোর, আর স্বভাব-মুক্ত যাযাবর-চরিত্র আপনভোলা এই তরুণের সাদৃশ্য আন্তরিক। চরম বাঁধনে আটকে পড়ার ষড়যন্ত্র ভেদ করে বিবাহ-পূর্ব নাটকীয় লগ্নে তারাপদ উধাও হয়ে গিয়েছিল—আর স্বেচ্ছাবিবাহিত চিরপথিক তরুণ-প্রাণের শেকল পরাতে দাদাবৌদি যখন বউ ঘরে নিয়ে এলেন, পলাতক হয়ে যায় বসন্ত! গল্প-বিষয় ও নায়ক চরিত্রের এই নিকটবর্তিতা সত্ত্বেও গল্প দুটির রসাবেদনের পার্থক্য আমূল।

'অতিথি' আসলে গল্পের আকারে এক মন্ময় স্পর্শালু গান! চিরকালের বনবিহঙ্গ ক্ষণকালের খাঁচা ভেঙে অনন্তে ভেসেছিল—সেই আনন্ত্যের সুর গল্পের নাড়িতে। মনোজ বসুর গল্পের গভীরেও ঝঙ্কার আছে—কিন্তু সে গীত নয় গাথা;—'অতিথি' আসলে লিরিক রসের গল্প, আর 'আংটি চাটুয্যের ভাই' অন্তঃস্বভাবে 'ব্যালাড'। ব্যালাড আসলে সেই আদিম জীবনেরই হ্রস্বকায় নির্ভার গল্প, সরল স্বভাব-কবিতাচ্ছন্দে সাধারণ অভিজ্ঞতা-বাসনা যেখানে কথনধর্মী বাক্‌শৈলী-বশে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা বলেন,

ব্যালাডই নাম-না-জানা শিল্পীর হাতের রচনা—অর্থাৎ শিল্পী সেখানে আত্মসংবরণ করেছেন সার্বিক সমাজের আকাঙ্ক্ষার গভীরে। মনোজ বসুও তাই করেছেন,—আগে বলেছি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার জলজঙ্গলাশ্রয়ী আদিম জীবনের রোমান্টিক গাথাকার তিনি।

কিন্তু তাঁর স্বভাব-শৈলী আত্মসংবরণ বা আত্মসংহরণের নয়—আত্মবিস্তার ও আত্মলীনতা সাধনের। অতি পরিচিত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপন কৈশোর-স্বপ্নের আবেগ আর অনুরাগ নিয়ে প্রবেশ করেছেন শিল্পী,—তিলে তিলে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ব্যাকুল ভালোবাসাকে প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার নাড়িতে নাড়িতে,—শেষ পর্যন্ত জীবনের বাস্তবিক চরিত্র আর শিল্পীর স্বপ্নাভিলাষে কোনো পার্থক্য থাকে নি। তাই বাদাবন-সুন্দরবন নিয়ে লেখা গল্পে মনোজ বসুর স্বতন্ত্র সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ সে জীবনের বনিয়াদ তো বাস্তবের সর্বাবয়বে বিলীন হয়ে পড়া তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নেরই ফসল!

'আংটি চাটুয্যের ভাই' গল্পের রোমান্টিক গাথারসের উৎস ঐখানেই। আদিম প্রগল্ভতার বশে প্রাচুর্য আতিশয্যের রঙে ঝলমল করে উঠেছে! রূপকথার রাজকন্যার হাসিতে মুক্তো ঝরে, কান্নায় গলে মাণিক! আর রূপকথা আমাদের একালে শিশুগল্প বলে বিবেচিত হলেও তার প্রথম জন্ম ইতিহাসের শৈশবকালের মানুষদের 'বড়ো' এবং 'ভালো'র স্বপ্নকেই ঘিরে। 'আংটি চাটুয্যের ভাই'-এও দেখি জুতোর তলা থেকে টাকা বেরোয়—দগ-দগে ঘায়ের ওপরে ব্যাণ্ডেজ-এর মত করে বাঁধা কাপড় সরিয়ে নিলে দেখা যায় টাকার ভাণ্ডার—ঘা কোথায়? আংটি চাটুয্যের বউ-এবও যে দরাজ প্রাণ! না হয়ে যায়?—আংটি চাটুয্যের দশ আঙুলে হীরার আংটি দশটি ঝলমল করে। সব আজগুবি খেয়াল—কিন্তু তবু আজগুবি কখনো মনে হয় না!—আসলে ঐসব কামনা-বাসনা, ছন্নছাড়া জীবনেব তলায় তলায় বয়ে চলে অকারণ ভালোবাসার অশেষ অভীপ্সা,-ওরই মর্মমূল হতে মানুষের ইতিহাসের উৎসার! ইতিহাস এগোয়, কিন্তু মর্মের আকাঙ্ক্ষা মলিন হয় না কখনো। আধুনিক জীবনের মর্মলীন আদিম জীবন-ক্ষুধার্ততার সেই অমৃত-স্রোতে জারিত করেই এইসব গল্পের রস-উৎসার। 'আংটি চাটুয্যের ভাই' একটি সার্থক আধুনিক গাথা, গদ্যের নাড়িতে কথকতাধর্মী আদিম কবিতার ঝংকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'আমি জীবনপুরের পথিক রে ভাই' গান সেই গাথারসের ধ্রুবপদ।

বস্তুত বাদাবন-সুন্দরবনের এই পরিমণ্ডল মনোজ বসুর শিল্পিচেতনায় অক্ষয়

অমর হয়ে আছে ;—দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার সীমান্ত পেরিয়েও সেই সহ-জ জীবনের গাথাস্বপ্ন অম্লান দীপ্তিতে ঝলকিত হয়েছে তাঁর কল্পনায়। কেবল 'আংটি চাটুয্যের ভাই' নয়, 'সীমান্ত', 'কানু গাঙ্গুলির কবর' 'আধুনিকা' এবং আরো একটু পরে লেখা 'স্বয়ংবরা' গল্পেও তার স্বাক্ষর অমলিন। গল্প-বিষয় অপেক্ষাকৃত হাল আমলের কাছে ঘেঁষে এসেছে—'দেশবিভাগ' এবং স্বদেশের জন্য পরাধীন ভারতে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের উপাদান নিয়ে গড়া সরস-বিরসান্ত নির্বিশেষে সব গল্পেই সেই আদিমতাধর্মী কল্পনার সহজ স্বতস্ফূর্তি ;—সেই অমিত প্রাচুর্যের মায়াঘেরা স্বপ্ন, যার সর্বাঙ্গে আতিশয্যের শিশু-ভোলানো চকচকে রঙ্!—সকল পরিণত মনের গভীরে যে অমর শিশু ঘুমন্ত, ঘুম-ভাঙানি গানে এইসব গল্পের গাথারূপ। 'খদ্যোত' কিংবা 'দিল্লি অনেক দূর' গল্পমালার সমবিষয়ক গল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই এইসব গল্পের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হতে পারবে। 'স্বয়ংবরা' গল্পটি সবচেয়ে মজার গল্প এদের মধ্যে, কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি 'সীমান্ত'। কেবল 'থীম'-এর অপরূপ স্বপ্ন-সম্ভব মদিরতার জন্যেই নয়,—শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তা-অতিনাটকীয়তায় মেশা কলা-কৌশলে উদ্ভাসিত অপরূপ সৌরভে 'সীমান্ত' মনোজ বসুর এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

'ইতিহাস' এ-পর্যন্ত পড়া মনোজ বসুর প্রায় একমাত্র গল্প যার মধ্যে জীবনের তপস্যা এপিক প্রগাঢ়তাও সঞ্চয় করতে চেয়েছিল। গল্পের পটভূমি আধুনিক কলকাতা; কিন্তু বিষয় উনিশ শতকের সূচনা লগ্নের ইতিহাস—শিল্পীর গাথাধর্মী রোমান্টিক প্রবণতা যার মধ্যে নড়ে ফিরে বেড়াবার অবকাশটুকু সংগ্রহ করে নিয়েছে। আদিমতার গভীরে যেখানে দার্ঢ্য গাঢ়তা, সেখানেই তার মহাকাব্যিক সম্ভাবনা। এ গল্পে মনোজ বসুর কল্পনার হাতে জীবন রচনায় অভ্যস্ত স্নিগ্ধ শ্যামল জলোমাটি অনেকটা কঠিন আকার ধরতে চেয়েছে ;—যতটা সংহত হয়েছে ততটাই সে ভরাট।—এদিক থেকে তার বৈচিত্র্য আর স্বতন্ত্রতা সবিশেষ লক্ষযোগ্য।

কিন্তু 'একটুকু বাসা'র মত গল্প 'মায়া কান্না' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তও হতে পারত; এই শেষোক্ত সংকলন ১৩৬৮ সালে গ্রন্থিত হয়েছিল—খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে তখন ষাট-এর দশকের শুরু। তারই এপার-ওপারের সীমান্ত ঘেঁষে শিল্পিমনে এই গল্পগুচ্ছের জন্মকাল। গল্প-বিষয় আবার তার এপিসোডিক চরিত্র খুঁজে পেয়েছে।—শিল্পীর মেজাজ এবারে হাল্কা নয়, যেমন ছিল 'খদ্যোত'-গল্পমালায়। কিন্তু 'কিংশুক'-এর প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছি, মনোজ বসুর জীবন-উন্মুখ কল্পনা ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবার মত গাঢ় গভীরতা কোথাও খুঁজে পায় না এই চলমান স্রোতের ধারায়। পুরাতন আদর্শ, মূল্যবোধ,

পুরাতন অর্থনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্যের বাঁধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে উদ্বাস্তু স্রোতের মত ভেসে চলেছিল। পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গাগত নব-পশ্চিমবঙ্গীয় যে জীবন, তারই সঙ্গে আপন কল্পনা-শক্তিকে ভাসিয়ে দেন শিল্পী সকল ঐকান্তিকতার সঙ্গে। গল্প-বাণী আরো প্রগাঢ় যে হতে পারল না, তার কারণ শিল্পীর অভিজ্ঞতার চারপাশে ছুটে-চলা জীবনে তার উপযোগী গাঢ়তা ছিল না। সেই বুদ্বুদের মত ভাসমান জীবন হতে এক একটি তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা-অনুভূত মুঠো করে ধরে কল্পনা-রসে রাঙিয়ে দেবার নূতন এ প্রয়াস।

'মায়াকান্না' সংকলনের প্রথম গল্প 'উপহার'-এর 'থীম' এবং শৈলীতে তার স্বচ্ছ প্রকাশ। ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-বাগানে সভা করতে গিয়ে মনোজ বসুর আকুল স্বভাব মন বৈচিত্র্যে চমকিত হয়েছিল নিশ্চয়। সেই ভাল-লাগা চমকের সূত্রে একটি ক্ষণস্থায়ী 'সিচুয়েশন' গেঁথে এক মুহূর্তের গল্পটি গড়ে উঠল। 'সীমান্ত' গল্পের শুরুতে শিল্পী ভূমিকা করেছিলেন—"শুনতে গল্পের মতো, কিন্তু খাঁটি বৃত্তান্ত।"—তাহলেও সে 'বৃত্তান্ত'-তে শিল্পি-কল্পনার স্বভাব-সিদ্ধ মিশোল লুকোনো নেই। কিন্তু 'উপহার'-এর 'খাঁটি-বৃত্তান্ত'-গুণ বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না, বরং ঐ গল্পের স্কীম-এই এ-কালের জীবনের চরিত্রও যেন ভাসে।

অন্যপক্ষে মনোজ বসুর কল্পনা গুণের মৌল উপাদান কেবল 'ফ্যান্সি' নয়,—প্রায়ই 'ফ্যান্সি' এবং 'ফ্যান্টাসি'র যৌথ মিশ্রণে গড়া। বরং 'ফ্যান্সি'র চেয়ে 'ফ্যান্ট্যাসি'র দিকে বয়ঃসন্ধি ধর্মী গ্রামীণ ঘরোয়া গল্পকলার প্রবণতা বেশি,—তাতে শিশু ভোলানো রঙের চমক যে থাকে সেকথা দেখেছি আগে। 'সুখীদম্পতি', তার চেয়েও বেশি করে 'ট্যাক্সিওয়ালা' গল্পে সেই অতিকল্পনার বিভা আস্টেপৃষ্ঠে ছড়ানো। তাহলেও অবাস্তব বলে এ-সব গল্পকেও ছুঁড়ে ফেলবার উপায় নেই। গল্পের পিঠে গল্প, কথার পেছনে কথা সাজানোর কারুকলাকৌশল এমন অনায়াসে ছড়ানো যে, প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠিত অজস্র কৌতূহলের গালঘুঁজিতে মনকে যখন ঘোড়ার মত ছুটিয়ে বেড়ায় শিল্পীর অতি-কল্পনা, তখনো প্রশ্ন করবার অবকাশ থাকে না- এ কি হল? এ-সব কি ঠিক? তাছাড়া, একথাও আগে বলেছি, আমাদের প্রত্যেক পরিণত মনে সুখসুপ্ত আদিম শিশুচেতনার কানে এ-সব কল্পনা যেন ঘুম ভাঙানি গান গেয়ে ফেরে। তারই ফলে গল্প-পড়ুয়ারও অবচেতন মন বুঝি 'ট্যাক্সিওয়ালা'র মত গল্প পড়তে পড়তে মনে মনে বলে স্বপন যদি মধুর এমন হোক্ সে মিছে কল্পনা! আর কথার পিঠে কথা সাজিয়ে আপাত-জটিল গল্পের পাত্রে স্বপ্নের পর স্বপ্নের উর্ণাজাল রচনার চমকপ্রদ মধু-মেদুর কৌশল এক অতি সহজ প্রকাশ পেয়েছে

'হাসি হাসি মুখ' গল্পে। এ-সব গল্পে 'ফ্যান্সি' আর 'ফ্যান্টাসি'—কবিকল্পনা আর অতি-কল্পনাকে পৃথক্ করে নেবার উপায় নেই। আর আগে যে-কথা বলছিলাম, 'একটুকু বাসা আর 'ললাটপাঠ' একই অতিকল্পনার হাতে গড়ার মজার গল্প, অভিন্ন গোত্র এরা।

কিন্তু অন্তরের সহজ আবেগকে ডুবিয়ে দিতে পারার বাস্তবিক আশ্রয় পেলে মনোজ বসু চিরকালই যে তাঁর জীবন-কল্পনাবিলাসী মন নিয়ে গভীরতায় ডুবতে রাজি, 'চলো গোয়া' গল্প তার অম্লান সাক্ষী। সেই পরাধীনতা-মুক্তির জন্য জীবন-পণ সংগ্রাম, মানবতার বেদীতে সর্বোৎসর্গের সেই প্রাণ-যজ্ঞ, বাদাবন-সুন্দরবন-প্রকৃতির মতই মনোজ বসুর অনুভবকে এ-সবেরই স্বপ্ন আবাল্য মথিত করেছে দেখেছি। তাই প্রথম সুযোগ পেয়েই জেগে উঠল আবার, সেই অবিস্মরণীয় গাথাশিল্প। যেন বাদাবনে খুঁজে পাওয়া 'কানু গাঙ্গুলির কবর'-এর সগোত্র। বাধা কিছু নেই তো। দুই জীবনই তো সাগর-মেখলা. বঙ্গোপসাগর একপ্রান্তে—আরেক প্রান্তে আরব সাগর! আর অমর জীবনের জয়গাথা রচনায় শিল্পীর ফেনিল কল্পনা চিরদুর্মর, অতএব সব বাধা দূরত্ব ঘুচে গিয়ে জীবনের সেই আদিম শাশ্বত বিস্ময়বোধের জয়গাথা নির্বাধ হয়ে ওঠে। 'বাদাবন' এবং 'মায়াকন্যা' গল্প দুটিতে যথাক্রমে কবিকল্পনার ভিয়েনে যে পাকা রস জমে উঠেছে, তারই বিমিশ্রতায় গড়া 'চলো গোয়া' গল্পের শরীর-মন।

মনোজ বসুর 'গল্প পঞ্চাশৎ' বইয়ে সংযোজিত হয়েছিল পনেরোটি নতুন গল্প, 'মায়া কন্যার' পরের বছরে সংকলিত। গল্প-চরিত্রে তাই বিভিন্নতা নেই খুব, কিন্তু গঠনে পরিণতির ছাপ কোথাও কোথাও অভিনবতর। মনোজ বসুর কলাশৈলীর মুখ্য উপাদান বারে বারে দেখেছি,—কবিকল্পনা অতিকল্পনায় মেশানো দ্রুতগতি উপাখ্যান, গল্পের সঙ্গে গল্পবলিয়ের মগ্নতা-জনিত এক দুরন্ত প্রাণের টান, গাথা-প্রকৃতির অনুমত কথন-ধর্মী বাক্‌কলার জীবন্ত প্রত্যক্ষ স্বপ্রাবেশ—যার কোথাও অতি আবেগের উচ্ছ্বাস, কোথাও নাটকীয়তার চমকপ্রদ সহজ উৎসার। সেই সঙ্গে, যেমন 'খদ্যোত' বা দিল্লী অনেক দূর'—গল্পমালায় দেখেছি,—সাংকেতিকতার তির্যক কটাক্ষ সঞ্চিত হয়েছে কোথাও কোথাও। আর তার মুখ্য রস-উপাদান রোমান্সের সহজ আবেশ-ঘনিষ্ঠ জীবন-রস, যার আস্বাদনে ভালো যত লাগে, মজা লাগে তার চেয়ে বেশি। মজা অর্থে এবারে আর কেবল ইংরেজির 'ফান' নয়—এক মন-খুশি-করা আরামের অনুভবের কথা বলছি।

'গল্পপঞ্চাশৎ-এর নানা গল্পে ভাব-রূপের এই বিভিন্ন উপাদান বিচিত্র

পরিমাণ ছড়িয়ে আছে। 'পুণ্যের সংসার' গল্পটির অন্তর্নিহিত কটাক্ষ সজীব-সংহত ; গল্পবাণী শিল্পীকে শরৎচন্দ্রের কাছাকাছিই কেবল টেনে আনে নি,—রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পের গাঢ়তা একালের পটভূমিতে মনোজ বসুর বয়ঃসন্ধি-ভাবিত ভাষায় যেন আর একবার আভাসিত হল। গল্প-নামের সাংকেতিকতা গল্পদেহে সঞ্চারিত হয়ে নতুন লাবণ্য বিন্যাস করেছে। অত সচকিত ভাবে না হোক, 'সঞ্চয়িতা' গল্পেও সংকেত-প্রবণতা একেবারেই দুর্লক্ষ্য নয়, শিক্ষিতা আধুনিক তরুণীদের কাছে 'সঞ্চয়িতা'-ও পরিচিত না—না তার নাম না কোনো কবিতার পরিচয়!—তবু আমরা রবীন্দ্র-গর্বী ; কটাক্ষের এ কৌতুক-শাসন সমগ্র জাতির প্রতি দরদী শিল্পীর তর্জনী-নির্দেশ।

'সুভদ্রা', 'সাঁতার', 'সতী' গল্প তিনটিতেই সেই প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা-সুপ্ত গ্রামীণ প্রতিবেশ—শিল্পীর সবচেয়ে চেনা সবচেয়ে প্রিয় জীবনের গন্ধে সুরভিত। তারই মধ্যে 'সাঁতার' গল্পটি অনেকটাই নিটোল একটি ছোটগল্প ; মনোজ বসুর রচনায় যার সংখ্যা প্রচুর নয়, এই সংকলনের 'ফাঁসি' তার আর এক অপরূপ সার্থক নিদর্শন। 'ফাঁসি' গল্পে কল্পনা, অতি-কল্পনা, জীবন-প্রেম আর যুগপৎ বিস্ময়তি নাটকীয়তা-ঘনিষ্ঠ প্রায় অলক্ষ্য দ্রুতগতি বিন্যাসের যাদুকলা একটি পরিপূর্ণ ছোট গল্পই রচনা করেছে।

'সুভদ্রা' গল্পে চিরপুরাতন গাথার রস নতুন করে দেখা দিয়েছে। 'বাদাবনের গান'-এর সঙ্গে তুলনা করলে একই জীবন নিয়ে শিল্পীর বিচিত্র রস-সৃষ্টি প্রয়াসের কারু-কৌতুকও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আর 'সতী' গল্পে পুরোনো জীবনের প্রচ্ছদে নতুন বিশ্বাস, নতুন ভরসার গান লিখেছেন শিল্পী। গান নয় ঠিক—আসলে গাথা। বিধবা সতীর নবজীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভ বিদ্যাসাগরের যুগে ছিল জীবন সংগ্রাম—আর একালের পরমবাঞ্ছিত স্বপ্ন,—তবু স্বপ্নই বেশি পরিমাণে। মনোজ বসুর সিদ্ধ রূপায়ণে সেই দুর্লভ স্বপ্নকে মুঠো ভরে পাওয়ার অনতি-তীব্র স্বাদুতার মধ্যে ক্ষণবিচরণ করা গেল। 'নতুন বউ অলকা'-ও মিষ্টি রসের ইচ্ছা পূরণের গল্প—কিন্তু পুরাতন জীবনে নূতন আকাঙ্ক্ষার বিজয়-বৈজয়ন্তী।

'ধুলোবান সর্বেবান' গল্পে যেন শিল্পিমনের এই নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষার কনকাঞ্জলি। হাইলাকান্দির উদ্বাস্তু জীবনে পুরাতন প্রাচুর্য-ঐতিহ্যের মিথ্যা হাহাকারকে ধুলোমুঠির মত করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে জীবন গড়বার স্বপ্ন, জীবন গড়ার তপস্যাকে শিল্পী অপরূপ সাংকেতিকতায় রূপ দিয়েছেন। ওপার থেকে চলে আসা মায়ের ভূত মেয়েকে ছেড়ে যাবে, আর ওপারে নিঃশেষিত 'ভূত'-জীবনের সংস্কার থেকে মুক্ত হবে পরেশ-টুনি—'ভূত-

খোলায়' ভেঙে ছাই হয়ে যাবে—নব-জীবনে পুনর্বাসিত হবে সবাই। গল্পের গায়ে গায়ে কবিতা-লতার মত এঁকে বেঁকে জড়িয়ে উঠেছে এই গাথা-স্বপ্ন,—মনোজ বসুর গল্প-কৃতির যা স্বভাব-সম্পদ।

আসলে এমনি করেই তিনি চলেছেন।—জন্মলগ্নে কুড়িয়ে-পাওয়া কৈশোরের সোনার স্বপ্নঘেরা জলজঙ্গলাকীর্ণ প্রকৃতির প্রতি নাড়ির টান—আর সেই সূত্রেই গড়ে-ওঠা অনাবিল আদিম অকুণ্ঠিত জীবন-প্রেম,—এক সুস্থির মূল্যবোধের দৃঢ় বেদীতে মনের গভীরে যার মণি-সিংহাসন! এই সব কিছুর পাথেয় নিয়ে পায়ে পায়ে আজও অক্লান্ত হেঁটে চলেছেন জীবন-উৎসুক মরমী শিল্পী—ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া ক্রান্তিকালীন গ্রহণ-লাগা জীবনের পিছু পিছু। তাঁর আত্মার কৌতূহল গ্রহণ-দেখার নয়—মুক্তিস্নানের।

ভূদেব চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

কঠিন রোগের কবল থেকে অতিসম্প্রতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসু সুস্থ হয়ে ফিরলেন। এই আনন্দের মধ্যে 'গল্পসমগ্র—উত্তর পর্ব' প্রকাশিত হচ্ছে। গল্প-রচনার মধ্যেই মনোজ বসুর সৃজন-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গসাহিত্যে এত বিচিত্রধর্মী গল্প মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র লিখেছেন। গল্পসমগ্রের পর্বে পর্বে সেই সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে। আদি ও মধ্য পর্ব ইতিপূর্বে বেরিয়ে গেছে—উত্তর পর্ব বেরিয়ে গেল। বাকি শুধু আর একটি—প্রান্তিক পর্ব। সে বইও প্রেসে যাচ্ছে।

দুর্মূল্যের কারণে লেখাগুলি রসিক পাঠকের কাছে পৌছানোর বাধা না ঘটে, লেখকের ঐকান্তিক ইচ্ছা। সেই কারণে 'গল্পসমগ্রের' বাবদ রয়ালটি তিনি নিচ্ছেন না। বেঙ্গল পাবলিশার্সের স্রষ্টা মনোজ বসুর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি বশত প্রকাশকেরাও যথাসাধ্য অনুদান করছেন।

ডক্টর ভূদেব চৌধুরী, বাংলা গল্পের রসবিচারে যিনি একক ও অনন্য, তিনিই গ্রন্থগুলি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই কারণে গল্পসমগ্রের আরও সমৃদ্ধি-লাভ ঘটেছে। তাঁর ভূমিকাগুলি অতুলন। লেখকের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা বশত তিনিও নামে মাত্র সম্মান-দক্ষিণা গ্রহণ করছেন। এই সমস্ত কারণে ডবল ডিমাই ১/১৬ সাইজের ৬০০ পৃষ্ঠারও বেশি বৃহদায়তন গ্রন্থ মাত্র ২০'০০ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আদি পর্বের (৪০০ পৃষ্ঠা) মূল্য ১২'০০ মাত্র। মধ্য পর্বের (৬০০ পৃষ্ঠারও বেশি) মূল্য ২০'০০। আরও আছে। গ্রাহক হতে হবে না। আমাদের কাউন্টার থেকে সরাসরি যারা গল্পসমগ্র নেবেন, তাঁদের অতিরিক্ত ২০% ডিসকাউণ্ট দেওয়া হবে। আদি, মধ্য ও উত্তর পর্ব গ্রাহকেরা যথাক্রমে ৯'৬০, ১৬'০০ এবং ১৬'০০ মূল্যে পাবেন।

সূচীপত্র

উপহার

ডুয়ার্স-অঞ্চলে গিয়েছিলাম। ভুটানের সীমান্তে। সেখানেও সাহিত্য-সভা। এক চা-বাগানে থাকতে দিয়েছে। আগে সাহেব-সুবোরা শিকারে আসত, তাদের জন্য অতিথিশালা বানিয়ে রেখেছে। ভিতরে ঢুকে তাজ্জব হবেন। দামি আসবাবপত্র, এই উঁচু গদির বিছানা, বিদ্যুতের আলো-পাখা —জঙ্গলপুরীর মধ্যে একটুকু ইন্দ্রলোক যেন।

আর এক তাজ্জব, ইন্দিরার মতো মেয়ে এই জায়গায়। বাগানের ম্যানেজারের মেয়ে। জলপাইগুড়ি থেকে ইস্কুলে পড়ত, সোমত্ত বয়স হওয়ায় পড়া ছাড়িয়ে ম্যানেজারমশায় বাগানে নিয়ে এসেছেন। ফাল্গুনমাসের দিকে কলকাতা নিয়ে যাবেন বিয়ে দেবার জন্য। দেখতে বেশ সুশ্রী, অতএব ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে না, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যেটুকু সময় বাসায় থাকি, ইন্দিরা ছায়ার মতো ঘোরে। এত কাছাকাছি একজন লেখককে পেয়ে বর্তে গিয়েছে মেয়েটা। মুখেও তাই বলে : আপনার বই পড়ি, চোখে দেখব কোন দিন ভাবতে পারিনি।

তুমি লেখ-টেখ নাকি ?

না, না—কী যে বলেন ! কত বিদ্যে আমার, তাই লিখতে যাব !

ঐ জোরালো না না—শুনে সন্দেহ আরও বাড়ে। প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ড্রেসিং-রুমের একটা তাকে পদ্যের খাতা। প্রথম পদ্যটা ফুলের উপর—

কী হে, খাতায় কী লিখেছ এসব ?

দুটো-একটা লাইন পড়তে ইন্দিরা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে : এন কী করে এখানে ? পড়বেন না আপনি। কক্ষনো না—

খাতা কেড়ে নিতে যায় আমার হাত থেকে। এই সময় ম্যানেজার এসে বললেন, চান করে নিন এবারে। বাথরুমে জল দিচ্ছে।

ইন্দিরারই সমবয়সি একটি মেয়ে টিউবওয়েল থেকে জল তুলে তুলে বাথরুমের টব ভর্তি করছে। ম্যানেজার পরিচয় দিলেন : আমাদের মালির মেয়ে—কালীতারা। অতিথিশালার ঘর-দুয়োর ওদের জিম্মায় থাকে। আপনি আসছেন—রান্নার লোক খুঁজছিলাম এই ক'দিনের জন্য। তা কালীতারা আড় হয়ে পড়ল : লেখক-মানুষ বাজে লোকের রান্না খাবেন কি !

আমি রাঁধব। রাঁধাবাড়া শুধু নয়—আপনার সমস্ত কাজ ও-ই করছে, আর কাউকে ছুঁতে দেয় না।

বলেন কি, এত ক্ষমতা ঐটুকু মেয়ের! রাঁধছেও খাসা।

ভাল মেয়ে, পড়াশুনোতেও খুব ভাল। আমরা এক বাংলা-ইস্কুল বসিয়েছি বাগানে। ফার্স্ট হয়।

কাল এসে পৌঁছেছি—তাই তো বটে! মেয়েটা চরকির মতো ঘুরছে সেই থেকে, পান থেকে চুন খসতে দেয় না। খেয়ে উঠতে না উঠতে দেখি, আঁচানোর জল গরম করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঁচিয়ে বসতে না বসতে ডিবে ভরতি পান। এর উপরে পড়াশুনো করে শুনে ভাল লাগল।

ঘুম-টুম দিয়ে সভায় গেছি। মস্ত সভা। এসব জিনিস এদিকে বড় একটা হয় না, অনেক দূর থেকে লোক এসেছে। লোক দেখে আমাদেরও মুখ খুলে যায়, দু-ঘণ্টা একনাগাড়ে বক্তৃতা চালিয়েছি। অত লোক স্থির হয়ে শুনল। বাগানের কুলি-কামিন বেশির ভাগ—সাহিত্যের কী বুঝল তারা, কে জানে! কিন্তু হাততালির ঠেলায় অস্থির।

ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে বাগানে ফিরলাম। সাড়ে-আটটার প্লেন ধরব, এয়ারপোর্ট পাঁচ মাইল, মোটে সময় নেই। নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতে হবে এক্ষুনি।

তুমি সভায় গেলে না কালীতারা?

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দিরা বলে, ও যাবে—তবেই হয়েছে! বসে বসে উনকুটি ভাগে ডাল-চচ্চড়ি রাঁধছিল।

পান দিতে এসে কালীতারা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে দু-পায়ের উপর প্রণাম করল।

তাই তো, কিছু দেওয়া তো উচিত। মনিব্যাগ খুলে দুটো টাকা দিলাম: মিষ্টি খেও কালীতারা—

মোটরে হর্ন দিচ্ছে। ইন্দিরাকে বলি, স্যুটকেশটা বের করে দাও গাড়িতে। জামা পরে যাচ্ছি আমি।

তাকিয়ে দেখি, কালীতারার হাসিমুখ এদিকে কালো হয়ে গেছে। দু-চোখে জল টলটল করছে।

কি হল?

আমরা ঝি-চাকর, টাকাই তো দেবেন আমাদের!

খাটের উপর সেই পত্তর খাতা, একটু আগে শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম। কালীতারা ছোঁ মেরেই খাতা তুলে নিল।

আমার খাতা এখানে আনল কে ?

খাতা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে। একবার মুখ ফেরাল, অশ্রুর ধারা বইছে। টাকা দুটো রেখে গেছে খাটের উপর।

হতভম্ব হয়ে আছি, এমন সময় ইন্দিরা ফিরে এল। আর ভুল করব না। সভায় পদ্মের তোড়া দিয়েছে, তোড়াটা তার হাতে তুলে দিলাম।

বারম্বার হর্ন দিচ্ছে। আর দাঁড়ানো চলে না।

কিন্তু গাড়িতে উঠে চশমা খুলে রাখতে গিয়ে দেখি, খাপ ফেলে এসেছি।

রোখো, রোখো—

আবার ঘরে গেলাম। বারান্দায় ম্যানেজারের গলা।

নর্দমায় ফেলে দিলি কেন ? অত বড় মানুষটা উপহার দিলেন—

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইন্দিরা বলছে, কালীকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিলেন। আমার বেলা জঞ্জাল গুচ্ছেরখানেক। খাটাখাটনি আমিও তো করেছি—

সুখী দম্পতি

পথ দীঘ। গাড়িটা গোলমাল করছে কিছুক্ষণ থেকে। বারম্বার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। শেষটা আর কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। নেমে পড়ল ড্রাইভার। এটা টিপছে, ওটা খুলছে, ফুঁ দিচ্ছে একটা সরু নলে মুখ রেখে।

প্রফুল্ল খিঁচিয়ে ওঠে : কী হল বিহারী ? কতক্ষণ লাগবে, ঠিক করে বল।

ড্রাইভার বলে, কারবুরেটারে তেল যাচ্ছে না। ময়লা ঢুকেছে। এক্ষুনি হয়ে যাবে সার—দু-এক মিনিটের মধ্যে।

যেমন কাজকর্ম তোমার! গাড়ি ছুটিয়েই দায়-খালাস। ইঞ্জিনের দিকে দেখবে না তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি কর। আসছি আমি।

প্রফুল্লও নামল। রক্ষা এই যে শহর জায়গা, এবং দুপুরবেলা। রাত দুপুরে বনজঙ্গল কিম্বা মাঠঘাটের ভিতর গাড়ি বিগড়ালে ভোগান্তির পার ছিল না।

বোধকরি স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই কৈফিয়তের ভাবে প্রফুল্ল বলে, বন্ধু আছে আমার এখানে। সুবিধে পেলাম তো তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। এক্ষুনি আসছি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

বলে হনহন করে সে চলল। মোড়ের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বীণাও তারপরে বেরিয়ে আসে গাড়ির ভিতর থেকে। বিহারী বলে, কড়া রোদ মা, মাথা ধরে যাবে।

রীণা বলে, গাড়ি তেতেপুড়ে আছে। ভিতরে মোটে বসা যাচ্ছে না। সেই-ধর রোদ খেতে খেতে আসা হল তো এতখানি পথ—

তবে মা গাছতলায় ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান। কতক্ষণ লাগবে কিছু বলা যায় না।

এই যে একেবারে মিনিট হিসাব করে বলে দিলে—দু-এক মিনিটে হয়ে যাবে।

বিহারী বলে, বাবুর কাছে কী আর বলব। কেন বলি তা-ও তো জানেন মা। সত্যিকথা আপনাকে বলা যায়, বাবুর কাছে বলব কোন সাহসে?

বলতে বলতে সে রাস্তার ধূলোয় শুয়ে পড়ে মোটরের নিচে চলে গেল। ঠুকঠাক করছে। একতলা বাড়ি একটা রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে। বাড়ির লাগোয়া বকুলগাছ। বকুলতলায় গিয়ে রীণা গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে দাঁড়াল।

বিহারী বেরিয়ে আসে খানিক পরে। বিরস মুখ। বলে, হয় না। বাবুকে তো যা-হোক একটা বলে দিলাম। রোগ কোনখানে ধরা যাচ্ছে না। আপনি কতক্ষণ ও-রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা? রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ুন। খুঁজেপেতে আমি একটা মিস্ত্রি নিয়ে আসি। দূরের পথ—গোলমালটা কোনখানে, ভাল করে না দেখিয়ে যাওয়া যায় না। বাবু এর মধ্যে এসে পড়লে বলবেন সেই কথা।

রীণা হাসল: আসবে তার এখন কি! বন্ধুর বাড়ি গেছে, তারা কি এত সহজে ছাড়বে? পাঁচ মিনিট বলে গেল, পাঁচ ঘণ্টা না লাগলে বাঁচি এখন।

মিস্ত্রির খোঁজে ছুটল বিহারী। রীণা রোয়াকে বসল। বসেই ঠাহর হল, এই একতলা বাড়ির দুটো চোখ জানলা দিয়ে তার পানে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে পুরোপুরি চিনে ফেলে দড়াম করে দরজা খুলে রোয়াকে এসে রীণাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। রীণারই সমবয়সি বউমানুষ। মাধবী।

রীণা আমার ঘরের দুয়োরে! অবাক কাণ্ড, রীণা আমার রোয়াকের উপর! আমি তা বুঝব কেমন করে? চোখে দেখছি—দেখেও তো বিশ্বাস হয় না। চোখ কচলে দেখি আবার।

রীণা বলে, ধানবাদ থেকে ফিরছি। ও বলল, ট্রেনে কেন আর—এমন গাড়ি রয়েছে। গাড়িতে নিরিবিলি আরাম করে যাওয়া যাবে। তা গাড়ি খারাপ হয়ে গেল এই অবধি এসে।

রীণা বড়ঘরের বউ, মাধবী তা জানে। সুখে স্বচ্ছন্দে আছে তা-ও শুনেছে। এত বছরেও সে সুখে তিলেক ভাঁটা আসে নি—এখনো ছুটিতে নিরিবিলি খোঁজে। সংসারে অভাব-অনটন না থাকলে হয় বোধকরি এই রকম।

মাধবী কলকণ্ঠে বলে, বুঝেছি যে একটা কিছু হয়েছে। নইলে এতবড় অঘটন—রীণা মিত্তির আমাদের পচা নর্দমার পাশে! ভিতরে আয়। গাড়ি যতক্ষণ ঠিক না হচ্ছে, সেটুকু সময় বসবি তো আমার কাছে। একা দেখছি, কর্তাটিকে কোথায় সরিয়ে দিলি এর মধ্যে?

বন্ধু পেয়ে গেছে, বলিস কেন! দুনিয়াময় ওর বন্ধু। বন্ধু এসে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

জড়িয়ে ধরে মাধবী তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। এতখানি বয়স হয়েছে, গায়ে কী জোর! ছোট্ট বয়সে রীণা কোনদিন তার সঙ্গে পারেনি, আজকেও পারল না। ঘরে নিয়ে বিছানার উপর বসাল। পুরানো শাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে জানলার পর্দা— গরিবের বাড়ি, একটিবার নজর বুলিয়েই বোঝা যায়। কোনদিন মাধবী ফর্সা নয়—এখন আরও যেন পুড়ে গিয়ে কয়লার মতন হয়েছে। ধানবাদের কয়লাকুঠিতে কদম বলে আদিবাসী ছুঁড়িটা আছে, অবিকল সেই গায়ের রং। কষ্টে-দুঃখে এমন হয়েছে। এমন মেয়েটা, আহা, ভাল ঘরে পড়েনি

মাধবী বলে, উঃ কতকাল পরে দেখা! বিয়ে করে তোকে কলকাতায় নিয়ে গেল, কত যে কেঁদেছিলাম সেদিন! এখন কেউ কারো খোঁজ রাখি নে। ভাগ্যিস আজ মোটর বিগড়াল বাড়ির সামনে—

আঙুলের কর গণছে: এই কার্তিকে আট—পুরো আট বছর হয়ে গেছে। তারপরে এই দু-মাস। মনে হয় একেবারে সেদিনের কথা। মাস-বছর পাখনা মেলে উড়ে পালাচ্ছে।

মাধবীর বাম চোখের বাঁ-দিকটায় রীণার দৃষ্টি পড়ল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

মাধবী বলে, কি রে?

কাল দাগ ওটা কিসের?

মারের দাগ। বলিস কেন, রেগে গিয়ে চাবির খোলো ছুঁড়ে মারল সেদিন। আর একটু হলে চোখটা যেত। কপাল গুণে রক্ষে হয়েছে।

রীণা তৃপ্তি ভরে শুনছে। মনে মনে আরাম পায়। দুর্গতির কথা সবিস্তারে শোনবার জন্য দরদের সুরে বলে, কী সর্বনাশ!

মাধবীর একবিন্দু যদি সঙ্কোচ-দ্বিধার ভাব থাকে! গরিব বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষা পায় নি কিছু, ঘরকন্নাই কেবল শিখেছিল। নির্লজ্জ ভাবে কেমন বলে যাচ্ছে: ঝি-চাকর নেই, একলা হাতে সব করতে হয়। সব কাজ সময় মতন পেরে উঠিনে। বলে, পুলিপিঠে করবি বলেছিলি—নিয়ে আয়। পিঠের খুব ভক্ত কিনা! বলে, নিয়ে আয় এক্ষুনি। চুলের মুঠি ধরে এমন

টান দিয়েছে, মাটিতে পড়ে গেলাম। তাতেও রাগ যায় না, ঝনাৎ করে চাবি ছুঁড়ে মারল।

রীণা শিউরে উঠে বলে, এই অত্যাচার করে যাচ্ছে পুরুষে। সভ্য জগতে বাস করি, কোন রকম এর প্রতিকার নেই?

মাধবী হতাশ স্বরে বলে, প্রতিকার চিতেয় যবে উঠব, সেইদিন। তার আগে নয়। এক-পা ধুলো নিয়ে বাইরে থেকে এসে হুকুম ঝাড়বে, পা ধুইয়ে দে। ধপাস করে বিছানায় শুয়ে বলবে, গায়ে লেপ জড়িয়ে দে ভাল করে। সীতারামের সুখ আর কাকে বলে! এর মধ্যে দৈবাৎ পান থেকে চুন খসেছে তো রক্ষে নেই।

রীণা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। আট বছরের ছাড়াছাড়ি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল অভিন্নহৃদয় হয়ে গেছে সে মাধবীর সঙ্গে। সেই ছোটবেলার মতো। কণ্ঠে অগ্নিজ্বালা নিয়ে বলে, ঠিক, ঠিক! আমারও তাই। পুরুষ ওরা সবাই একরকম। চুপচাপ সহ্য করি বলে আরও পেয়ে বসে। আমি তো ঠিক করেছি, লজ্জা করে আর বোঝা বয়ে মরব না।

ঘাড় নেড়ে মাধবী জোরে জোরে সায় দেয়: যা বলেছিস। বাইরে একেবারে কেঁচো, যত বীরত্ব বাড়ির মধ্যে এসে। আমরা সয়ে যাই কিনা! ঐ যে এলেন এবার বীরপুরুষটি। এরই মধ্যে হয়ে গেল পড়াশুনো? ছুটি নিয়ে জল খেতে এসেছ—তা জলের কলসি কি কোলের মধ্যে আমার?

দেবশিশুর মতো মাধবীর সাত বছরের ছেলে 'জল খাব' বলে ঝুপ করে মায়ের কোলের উপর বসে পড়ল।

মাধবী বলে, ড্যাব-ড্যাব করে দেখছ কি খোকন? মাসিমা হয়। প্রণাম কর। কেমন ভিজে-বেড়ালটি দেখছিস তো রীণা, বাইরের লোকের সামনে এমনি। ঘরের মধ্যে বীরত্বের নমুনা এই রয়েছে আমার চোখের উপর।

রীণার মুখের উপর উপর কে যেন ছাই মেড়ে দিল। চোখের দৃষ্টি ধ্বক করে জ্বলে উঠে শীতল হয়ে গেল একেবারে। টেনে টেনে সে বলে, আমার ঘরে ছেলেপুলে নেই। ছেলেপুলের বেহদ্দ ঐ একটা মানুষ। বলি, কাজ নেই বিধাতা আমার ছেলেপুলের। একজনকে সামলাতেই হিমসিম হয়ে যাচ্ছি। ঐ যা বললাম ভাই, পুরুষ হলেই সব একরকম। বয়সের বাছবিচার নেই। জানিস তো, কলকাতা রামময় রোডের উপর শ্বশুরবাড়ির ভরভরন্ত সংসার। ঠাকুর-চাকর-ঝি নিয়ে জন তিরিশ অন্তত। তার মধ্যে থেকে টেনে-হিঁচড়ে আমায় নিয়ে কলিয়ারির কুঠিতে উঠল। যে খেয়াল একবার মাথায় উঠবে! বলে, দুজনে বেশ একা একা···হি-হি হি-হি—লজ্জাও করে বলতে!

হেসে আর কূল পায় না বীণা। হাসির তোড়ে কথা শেষ করতে পারে না। বলে, ফিরতে কি চায়! জেলের গাড়িতে যেমন কয়েদি পুরে নেয়, তেমনি জবরদস্তি করে ফের এই কলকাতা নিয়ে চলেছি।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে বীণা তড়াক করে উঠে পড়ল: ড্রাইভার এসে গেল। যাচ্ছি ভাই। বিস্তর পথ এখনো, রাত্তির হয়ে যাবে।

তোর কর্তাকে দেখাবিনে একটু?

ঐ যে বললাম—বন্ধুর বাড়ি। গিয়ে না পড়লে উঠবে? সন্ধ্যে হয়ে গেলেও হুঁশ হবে না। কী মুশকিল যে ওদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো!

কথা বাড়তে না দিয়ে বীণা ঘর থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে একেবারে গাড়ির খোপে ঢুকে পড়ল। ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে: শিগগির চল, শিগগির—আঃ, কী দু-জন তোমরা বকবক করছ? চালাও।

বিহারী বলে, মিস্ত্রি নিয়ে এলাম। ভাল করে দেখে দিক, কেন ও-রকমটা হচ্ছে—

বীণা বলে, গাড়ি চালাতে বলছি কথা শোন না কেন? তুমি আর মিস্ত্রি ঠেলেঠুলে স্টার্ট করিয়ে নাও।

মেজাজ দেখে বিহারী ভয়ে ভয়ে বলে, দু-কদম গিয়ে আবার স্টার্ট বন্ধ হবে। সেইজন্য বলছিলাম।

অধীর কণ্ঠে বীণা বলে, মিস্ত্রি দেখানো হবে এই জায়গা থেকে সরে গিয়ে। এ বাড়ির সামনে নয়। তোমার বাবু এসে না পড়ে এখানে! তার বন্ধুর বাড়িতেই চল যাই। টেনে-টুনে সেখান থেকে গাড়িতে তুলতে সময় লাগবে। ততক্ষণে তোমরা ইঞ্জিন দেখো।

বিহারী বলে, বন্ধুর বাড়ি তো জানা নেই মা।

মিস্ত্রি-লোকটার দিকে তাকাল একবার বীণা। কারবুরেটার খুলে ফেলে নিবিষ্ট হয়ে সে পরীক্ষা করছে। নিম্নকণ্ঠে বীণা বলে, আমি জানি বন্ধুর বাড়ি। বাজারের মধ্যে যে শুঁড়িখানা দেখে এলে, সেইখানে। আটটা বছর ঘর করে জানতে কিছু বাকি নেই বিহারী। বাজারের আশেপাশে কোনখানে গাড়ি রেখে তোমরা মিস্ত্রি দেখিও। ঢের ঢের সময় পাবে।

চোখে জল ভরে এল। বলে, কদম মাগিটা মনুষ্যত্ব কিছু থাকতে দিয়েছে ওর মধ্যে! পুরানো লোক বলে তোমাকেও তো একটু সমীহ করেনি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কলিয়ারিতে গিয়ে পড়েছিলাম তাই। কোন রকমে এখন কলকাতায় নিয়ে তুলতে পারলে বাঁচি। ভদ্রলোকের পাড়া থেকে বেরিয়ে পড় বিহারী। ভয়ে আমার গা কাঁপছে।

ট্যাক্সিওয়ালা

ভদ্রলোকের ছেলে ট্যাক্সি চালিয়ে খাই। মিথ্যে বলব না। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল তখন, খালি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ওঁরা ট্যাক্সি ট্যাক্সি—করে ডাকলেন। গাড়ি থামিয়েও ছিলাম, কিন্তু নিইনি ওঁদের। দোষ আমার বটে। হয়তো ফাইন করবেন হুজুর। হয়তো বা লাইসেন্স বাতিল করবেন। তবু আমি মিথ্যা বলব না। দশটা মিনিট সময় দিন, আগাগোড়া বলি।

মাস ছয়েক আগে সেদিনটাও খুব বর্ষা। শিয়ালদা স্টেশনে প্যাসেঞ্জার এনে নামিয়েছি। দূর থেকে একজন ডাকছেন, রোখো রোখো— বালিগঞ্জে যেতে হবে। আর কাছের এক বুড়োমানুষ বললেন, বাবা আমরা ধর্মতলায় যাব—সুবোধ মল্লিক স্কোয়াবের কাছে। রোগা মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

এবং সেই মেয়েব দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকিসনে ভলি। মাথা ঘুরে পড়বি। বোস ওইখানে।

ধুলোর মধ্যে ওখানে কেন? গাড়িতেই উঠে বসুন একেবারে।

বালিগঞ্জের প্যাসেঞ্জার তখন এসে এই মারে তো এই মারে: এঁদের তুললে গাড়িতে—আমি আগে ডাকিনি?

আজ্ঞে না। এরা যাবেন ধর্মতলায়, আপনি সেই বালিগঞ্জে। বেশি ভাড়া ছেড়ে তা হলে অল্প ভাড়া কেন ধরব বলুন।

গাড়ির ভিতর থেকে বুড়োমানুষটি গদগদ হয়ে উঠলেন: ভদ্রলোকের ছেলে বলেই এমন দয়াধর্ম। চিরজীবী হও, নামটি কি তোমার বাবা?

রাখালচন্দ্র দে—

সামনে চেয়ে গাড়ি চালাচ্ছি, কান দুটো পিছনে খাড়া রয়েছে। দত্তপুকুরের কাছাকাছি এক গাঁ থেকে আসছে। তিন জন- বাপ, মেয়ে আর গাঁয়ের এক ছোকরা ডাক্তার। মেয়ের পেটজ্বালা করে, জ্বর হয়, শুকিয়ে সলতের মতো হয়ে যাচ্ছে সে দিনকে-দিন! ছোকরাই এতদিন চিকিৎসা করেছে, হালে পানি না পেয়ে কলকাতার বড়-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সামান্য পথ, মিনিট দশেকে পৌঁছে দিলাম। বুড়ো বললেন, তোমার ডাক্তার কত সময় নেবেন বল তো অতুল।

অতুল বলে, বড়-ডাক্তার বেশি সময় দিয়ে দেখেন না। তা হলে পোষাবে কেন?

বুড়ো বললেন, সাতটার আগে ফেরা যায় যদি, দেখ। নয় তো একেবারে সেই ন'টা সাতাশ। বাড়ি পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে।

সে আশা ছেড়ে দিন কাকা। চেম্বারে যা ভিড়—সাতটা পর্যন্তই হয়তো বসে থাকতে হবে আমাদের।

নেমে পড়ল অতুল। বলে, ভিতরে গিয়ে দেখে আসি। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আপনারা ততক্ষণ গাড়ি-বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ান।

আমি বললাম, গাড়ি-বারাণ্ডায় দাঁড়াবেন কি রকম! ওখানে জলের ছাট যাচ্ছে।

ডলি বলে, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াব আমি। ছাট লাগবে না।

তরুণী মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বুড়োকেই খানিকটা শাসনের সুরে বলি, ওদিকে বলছেন নাড়িতে জ্বর রয়েছে। যেমন আছেন, থাকুন তেমনি বসে। ভাড়া চোদ্দ আনা উঠেছে। ফ্লাগ নামিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণই থাকুন আর ভাড়া উঠবে না।

ডলি তবু আমারই দিকে দৃষ্টি মেলে বলে, প্যাসেঞ্জার ধরুন গে রাখাল-দা। আর কেন লোকসান সইবেন আমাদের জন্যে?

দাদা হয়ে গেছি, তবু কিন্তু লজ্জা লাগে। কথাবার্তা বুড়োর দিকে চেয়েই চলছে: একলা একটা মানুষ—অত প্যাসেঞ্জার খোঁজাখুঁজির গরজ কী আমার! গাছের তলায় দিব্যি আছি। আমি নড়ছি নে। আপনারা নেমে গেলেও না।

অতুল ডাক্তার ফিরে এল এমনি সময়: কপাল ভাল কাকা। বৃষ্টিবাদলায় একদম রোগিপত্তর আসেনি। চেম্বার খালি। ভাল হল, সাতটার গাড়িতেই ফেরা যাবে।

ভাড়া দিতে যাচ্ছেন, বললাম, এখন কেন? সাতটার গাড়িতে যাবেন তো? আমি রইলাম, আমিই নিয়ে যাব। ভাড়া একসঙ্গে দেবেন।

বুড়ো বললেন, না বাবা। মেয়ে রাগ করছে। আর বসিয়ে রেখে তোমার ক্ষতি করব না।

এতক্ষণ থেকে একটুর জন্য প্যাসেঞ্জার ফেলে যাব—সে হচ্ছে না। বৃষ্টির মধ্যে আপনারাও ট্যাক্সি পাবেন না। সাতটার গাড়ি ফেল হবে। রোগা মানুষ নিয়ে রাত দুপুর অবধি ভোগান্তি।

ডাক্তার দেখিয়ে ওঁরা গাড়িতে এসে উঠলেন। মুখ গম্ভীর, কথাবার্তা নেই। রোগটা কি, জানবার জন্ম আকুলিবিকুলি করছি। কিন্তু ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সে সব কেন বলতে যাবেন? এই বুঝলাম, আসছে বুধবার আবার এসে নানা রকমের এক্স-রে ছবি নিতে হবে।

ছুটো টাকা দিলেন, চার আনা আমি ফেরত দিচ্ছি। বুড়ো বললেন, দিতে হবে না বাবা।

যাতায়াতে সাতসিকে উঠেছে। পাওনার বেশি তো ভিক্ষে। সে আমি নিই না।

বুড়ো বললেন, হিসাব ধরলে পাওনা তো অনেক বেশিই হয়; সে যাক গে। ভিক্ষে আমিই নিলাম। ছ-টাকার ওষুধ লাগল পয়লা দিন, আর অতুলের খাতিরে ডাক্তারের অর্ধেক ফী আট টাকা। আরও কত লাগবে অমন! টাকা গিয়ে ডলি আমার এখন ভাল হয়ে উঠলে হয়।

পরের বুধবারেও আসচেন ঐ গাডিতে। দূরের ভাড়া এসেছিল, আমি নিই নি' ঠিক সময়ে স্টেশনের স্ট্যাণ্ডে চলে এসেছি। পাছে প্যাসেঞ্জারে ডাকে—ডাকলেই তো নিয়ে যেতে হবে—বনেট উঁচু করে তুলে এটা-ওটা খুটখাট করছি। অর্থাৎ যন্ত্রপাতির কোন দোষ হয়েছে, গাড়ি চলবার অবস্থায় নেই। নজর কিন্তু আমার যন্ত্রপাতির দিকে নয়, প্ল্যাটফরমের যত প্যাসেঞ্জার বেরিয়ে আসছে তাদের দিকে। ডলিদের দেখছি না, আর আমি অধীর হয়ে পড়ছি। আসে নি তারা? অসুখ বেড়েছে খুব - শহরে এনে ডাক্তার দেখাবার অবস্থা নেই? অথবা আমার অলক্ষ্যে অন্য কোন ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে?

না, মিথ্যে ভয়। দেখা দিল তারা অবশেষে। বুড়ো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

এই যে, আমি রয়েছি—আমি নিয়ে যাব। রোগা মানুষ স্ট্যাণ্ড অবধি হাঁটিয়ে আনতে হবে না। গাড়ি নিয়ে আসছি।

ডলি বলে, গাড়ি যে আজ বড্ড ঝকঝকে দেখাচ্ছে রাখাল-দা।

কাদা মেখে যাচ্ছেতাই হয়েছিল, কাল সার্ভিস করিয়েছি। সিটের কভারও ধোবার বাড়ি দিয়েছিলাম।

ধর্মতলার চেম্বারের সামনে পৌঁছে বুড়ো বললেন, চলে যাও তুমি। আজ অনেক দেরি হবে।

হোক না দেরি। তেল পুড়িয়ে কোথায় এখন প্যাসেঞ্জারের তল্লাসে

ঘুরব! কত ট্যাক্সি ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আমার তো স্টেশন অবধি ভাড়া ধরা রইল।

তিনজনে চেম্বারে ঢুকলেন। বুড়ো ফিরে এলেন অনতিপরেই: কী ভিড়, বাপরে বাপ! পয়সা রোজগার করছে বটে। বসবার জায়গা নেই। তুমি থেকে গেলে তো গাড়ির ভিতরেই একটু বসি বাবা।

বসুন না—

দরজা খুলে দিলাম। বুড়ো বলেছেন, মন ভাল নয় বাবা। মেয়ের সামনে বলা যায় না—ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছে।

ডাক্তার নই, রোগপীড়ের কিছু জানি নে—তবু কেন জানি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলাম: হতেই পারে না—ভয় দেখাবার জন্য ওরা ক'টা রোগের নাম শিখে রেখেছে।

ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা তোমার মুখে। ওর মা তো শোনা অবধি অবিরাম চোখের জল মোছেন, আর মাথা কোটেন গোবিন্দবাড়ি গিয়ে। মেয়ের কিছু হলে পাগল হয়ে যাব আমরা।

কাজ সেরে ডলি আর অতুল ডাক্তার ফিরে এল। পরশুদিন সঠিক ব্যাপার জানা যাবে। রোগি আনতে হবে আবার সেই সামনের বুধবারে।

কী হল আমার—সেই বুধবারেও স্টেশনে এসেছি। উদ্বেগে আজ গাড়ির ভিতরে নেই। গাড়ির চাবি এঁটে প্লাটফরমে ঢুকে পড়েছি। ইঞ্জিন এসে দাঁড়াল, সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি। এক্স-রে করে কী জানা গেল—কী কথা শুনতে হয় না-জানি আজ বুড়োকর্তার মুখে! ডলি নয়—আমারই মরণ-বাঁচন যেন সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছে।

খবর ভাল, দেখেই বুঝলাম। দেমাকে অতুল ডাক্তার ফেটে পড়ছে: বলেছিলাম না কাকা? গাঁয়ের ছেলে বলে ভরসা করতে পারেন না। লক্ষণ শুনে নিয়ে যা আমি বলেছিলাম, বড়-ডাক্তার আধ ডজন এক্স রে প্লেট নিয়ে একগাদা টাকা গচ্চা লাগিয়ে ঠিক তাই বলল। এই যে, তুমি এসে গেছ দেখছি। আজকে শেষ। আর আসছিনে আমরা। আজকে শুধু একটা প্রেস্কৃপসন নিয়ে চলে যাব।

ধর্মতলা অবধি পথটুকু কী হুল্লোড়ে কেটে গেল! রোগ এমন-কিছু নয়, দীর্ঘ দিনের বদহজম থেকে দাঁড়িয়েছে। একটু কিন্তু দুঃখও লাগছে মনে। একেবারে এত সামান্য রোগ! আর আসবেন না ওঁরা, ট্যাক্সি ভাড়া করবেন না।

তারপর পুজোর সময়টা এই সেদিন দেখা। তিনজন নয়, দু-জন ওরা এসেছে—ডলি আর অতুল ডাক্তার। একগাদা জিনিস কিনেছে—পাঁচ-সাতটা প্যাকেট। বিষম বৃষ্টি। খালি গাড়ি নিয়ে আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে ডলি ডাকছে, ট্যাক্সি—

তাকিয়ে দেখেই চিনতে পেরেছি। নেমে পড়ে হাসিমুখে যাচ্ছি ওদের কাছে। ফুটপাথটুকু পার হতেই ভিজে-জবজবে হয়ে গেলাম। ডলির সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর, মুখভরা ঝলমলে হাসি। ছ-মাস আগেকার সেই অসুখের অবস্থা ভাবতে পারা যায় না। ডাক্তার আর রোগি নয় এখন, স্বামী আর স্ত্রী।

অতুল বলে উঠল, আরে, চেনা লোক! দু-তিন বার গেছি এর ট্যাক্সিতে।

ডলি সেই কথার জের ধরে বলে, ভাল হয়েছে। প্যাকেটগুলো নিয়ে তোল দিকি ড্রাইভার।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি, মুটে ডাকুন। মাল বওয়া আমার কাজ নয়।

বৃষ্টিতে মুটে কোথায় এখন? তিনটে চারটে প্যাকেট তুমি নিয়ে নাও। বাকিগুলো আমরা হাতে হাতে নেব।

কথা সত্যি। মুটে ছিল না। আর অত জিনিস ট্যাক্সিতে বয়ে নিয়ে তোলা একবারে হত না। বৃষ্টিতে নেয়ে যেতেন ওঁরা। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা আমি তার কি জানি?

বিপন্ন ডলি বলে, মিটারে যা পাওনা হয়, তার উপর আট আনা বেশি ধরে দেব ড্রাইভার। নিয়ে নাও।

পাওনার বেশি তো ভিক্ষে। ভিক্ষে আমি নিইনে।

গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়েছি। অতুল চেঁচাচ্ছে, রোখো—জিনিসপত্তোর আমরাই বয়ে নিচ্ছি।

গাড়ি খারাপ আছে আমার—

গালিগালাজ করে স্বামী-স্ত্রী মিলে। গাড়ির নম্বর নিল। তারপরে এই দরখাস্ত ঝেড়েছে হুজুরের কাছে।

হাসি-হাসি মুখ

ক'টা বছর আগেও কসাড় বন। এখানে ওখানে পাথরের চাঁই। বিস্তীর্ণ খাদের মধ্যে ঝিরঝিরে জলধারা—বর্ষায় তিনিই আবার দুরন্ত নদী। সেই

নদীতে মহা আয়োজনে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। দৈত্যাকার যন্ত্রপাতি ও হাজার হাজার লোকজন এসে পড়ল। দেখতে দেখতে শহর।

দুটো হোটেল। একটার নাম উপবন, আর একটা পান্থবাস। বিকালবেলা মোটরের প্রচণ্ড গর্জন তুলে সুশান্ত উপবনে এসে নামল। বলে, চা দাও এক কাপ, সঙ্গে যা-হোক কিছু। যা তোমাদের তৈরি আছে, তাই দাও। নতুন কিছু বানিয়ে দিতে হবে না। বিষম তাড়া। চা খেয়েই ছুটব, থাকছি না।

চা-দিয়ে-বেড়াচ্ছে সেই লোক বেজার মুখে বলে, জায়গাও নেই থাকবার। টেনেটুনে পনেরটা সিট, সেখানে কুড়ি হয়ে গেছে। ঘরে জায়গা হয় না তো বারান্দায় তক্তপোশ নিয়ে পড়েছে।

বটে, এমন জমেছে হোটেলের ব্যবসা!

রোস্ট খেতে আসে সব উপবনে। দিদিমণির হাতের রান্না।

একটা মেয়েকেও বুঝি দেখা যাচ্ছে রান্নাঘরে—উনুনের ধারে বসে ছ্যাকছোঁক করছে। চায়ে বেশি মিষ্টি বলে এক্ষুনি সুশান্ত অনুযোগ করতে যাচ্ছিল, সেই চা লহমার মধ্যে উৎকট-তিতো। অদৃষ্টে ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়ে যায়, তার অদৃষ্টেই মিছা খাটনি। উঠতি শহরের দোকানে দোকানে তারস্বরে বক্তৃতা করে দু'হাতে বিজ্ঞাপন বিলিয়ে গলদ্ঘর্ম হল তিন-চার ঘণ্টা, সাবান বিক্রি হয়েছে সাকুল্যে পাঁচ-সাতখানার বেশি নয়। কয়েকটা চালু নাম দোকানদার বেটারা মুখস্থ করে রেখেছে, তার বাইরে যেন কেউটেসাপ। হাতে ছুঁতেও চায় না, ছুঁলে বুঝি ছোবল দেবে! শুকনো গলা চায়ে ভিজিয়ে এক্ষুনি সুশান্ত এই পোড়া জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়বে। মাইল তিনেক দূরে ছোটখাট এক গঞ্জ—সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে ঢুঁ দিয়ে দেখবে। খোরাকি খরচাটা তোলবার জন্যেও অন্তত ডজন দুই গছানোর দরকার। না হলে উপোস আজ রাত্রিবেলা।

দাম মিটিয়ে উঠতে যাচ্ছে, হেনকালে উপবনের মালিক এসে পড়লেন। হাটবার আজ এখানে, হাট করতে বেরিয়েছিলেন। চাকরের মাথার ঝুড়িতে একপাল ঠ্যাঙ-বাঁধা মুরগি কক-কক করে উঠল।

মুখ তুলে চেয়ে সুশান্ত অবাক।

মাস্টারমশায় যে! হোটেল খুলে বসেছেন এখানে?

অনেক বছর পরে দেখা, চিনতে তবু মুহূর্তের দেরি হয় না। রামজয় বিশ্বাস—মাস্টার কোনদিন ছিলেন না, অন্তত সুশান্ত যতদিন জানে তার মধ্যে নয়। দলের ছেলেরা তবু বরাবর মাস্টারমশায় বলত। সুশান্ত তাদের মধ্যে একজন।

রামজয় হো-হো করে হেসে সুশান্তর জবাব দিলেন : বুড়ো হয়েও হাত নিসপিস করে। বোমা-রিভলভারে শত্রু বধ করব, প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। অহিংস মত এসে আমরা সব বাতিল। জঙ্গুলে শহরে চুপচাপ এখন মুরগি বধ করে অভ্যেসটা বজায় রেখে যাই।

চেয়ার টেনে সুশান্তর ধারে জমিয়ে বসলেন। বলেন, রাত্রে মুরগির রোস্ট খাওয়াব। কত জায়গায় খেয়ে থাকিস, উপবনেও খেয়ে যা। জিভে স্বাদ লেগে থাকবে, ইহজন্মে মুছবে না।

চা পরিবেশনকারী সেই লোকটা—নাটক-নবেলে যেমন হামেশাই দেখা যায়—ভৃত্য হলেও অতিশয় প্রতাপশালী ভৃত্য। মালিক রামজয়ের উপর খিঁচিয়ে উঠল : নেমন্তন্ন হচ্ছে—শুতে দেবেন কোথা শুনি? বারান্দাও ভরে গেছে, উঠোন ছাড়া জায়গা নেই। রাত্রে বৃষ্টি হলে ছাতা খুলে বসতে হবে। পয়সার খদ্দের সবাই—ঘুম ভেঙে তখন কেউ দরজা খুলতে উঠবে না।

সুশান্তকে বলে, না বাছা, কর্তার কথা কানে নিও না। মুরগি খাওয়ানোর লোভে উনি বলছেন। রাত্রে থাকবে তো গুটগুট করে পান্থবাসে চলে যাও। একটুখানি পথ—এই রাস্তার মাথায়। ফাঁকা হোটেল, শান্তিতে থাকবে। উপরের তিনটে ঘরই দিয়ে দেবে। একটায় সন্ধ্যারাত্রে শুয়ো, একটায় এক-ঘুমের পর, বাকি যেটা রইল সকালের ঘুম পড়ে পড়ে ঘুমিও সেখানে। কেউ ঝঞ্ঝাট করতে আসবে না।

রামজয় বলেন, কিন্তু রোস্ট? তা-ও যদিই বা দেয়, আমার হিমির রান্না মুরগি-রোস্ট পাবে কোথায় ওরা?

কথাবার্তায় দেরি হয়ে গেল। এখন আর নতুন গঞ্জে গিয়ে সুবিধা হবে না। লোভও হচ্ছে, হিমি অর্থাৎ হিমানীর রান্না রোস্ট না-জানি কী অপূর্ব চিজ! দু-চারটে দোকান এখানেই বাকি আছে, সেইগুলো সেরে পান্থবাসে শোবার ব্যবস্থা করে ফিরবে। শোওয়া পান্থবাসে, খাওয়া এখানে হিমির হাতের রোস্ট। ভোর থাকতে উঠে রওনা।

পান্থবাসে এসে হিমির বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। রামজয় চিরকাল দেশের কাজে ছিলেন, নিজের সংসারধর্ম নেই, হিমি তাঁর ভাগনী। পাকিস্তানে ছিল, সেখানে সুপাত্র মেলে না, বোন-ভগ্নিপতি কন্যাদায়-মোচনের জন্য হিন্দুস্থানে এসেছেন। এসে উঠেছেন রামজয়ের উপবনে, তা-ও প্রায় আট-দশ মাস হল। মেয়ে গছানো হয়ে গেলে ফিরে যাবেন।

জ্বলছেন ঈর্ষায় পান্থবাসের মালিকটি। সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। বলেন, আমাদের কি দেখছেন! ঐ উপবনের ঘরে ঘরে চামচিকের বাসা—সত্যিই

চামচিকে উড়ত। হিমির রোস্টে কপাল ফিরেছে। রোস্ট না ঘোড়ার ডিম! খদ্দের ঝুঁকেছে রাঁধুনি দেখে। পচা কাঁঠাল থাকলে মাছি জমে, যুবতী রমণীতে তেমনি মানুষ। বলতে হয় না, বিজ্ঞাপন দিতে হয় না, আপনা-আপনি কেমন টের পেয়ে যায়। ট্রেনের টিকিট কেটে পর্যন্ত আসে। এতকালের দেশসেবক হয়ে এমনধারা কাজে উনি আস্কারা দিচ্ছেন, আশ্চর্য!

অতএব শুধুমাত্র রোস্ট নয়, হিমানী নামে প্রাণীটিকেও দেখবার অতিশয় লোভ। যাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের উপবন জেঁকে উঠেছে, যার জন্য টিকিট করে ট্রেন যোগে মানুষ আসে।

চোখোচোখি হল। এবং চোখের দেখাতেই শেষ নয়, মজে গেছে বোধহয় সেই হিমি। প্রথম দর্শনেই প্রেম। পুরো ঘণ্টাও লাগেনি।

তারিয়ে তারিয়ে রোস্ট শেষ করতে রাত গভীর হল। সুশান্ত বলে, প্রকাণ্ড দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়েছি মাস্টারমশায়, আজকের বিকালটা বরবাদ। রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ব। এই রাত্রে পান্থবাস অবধি হাঙ্গামা করতে যাব না, যেখানে হোক গড়িয়ে পড়ি।

রামজয় নিষ্পায়। ছাতের চিলেকোঠা কুটুম্বদের ছেড়ে দিয়েছেন, ঠাসাঠাসি করে কায়ক্লেশে আছেন তাঁরা। বুড়োমানুষ নিজে বাইরে শুতে সাহস করেন না, হাঁপানি-কাশি চেপে ধরবে।

সুশান্ত কোন কথা কানে নেয় না। গুরুতর রকমের ঘুম ধরেছে আর কি—কুয়াতলার চাতালের উপর মাদুর টেনে নিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল।

বলে, বৃষ্টিবাদলা হবে না, পরিষ্কার আকাশ। রাত থাকতে কেউ ডেকে তুলে দেবেন। মাস্টারমশায়ের অত ভোরে ওঠা ঠিক হবে না। তুমি ডেকে দিও হিমানী, বুঝলে? নয় তো বড্ড ক্ষতি আমার।

পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনো সুশান্ত পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকতে আসেনি হিমানী। বয়ে গেছে! এত লোক থাকতে সে কেন অচেনা বেটাছেলেকে ডাকতে যাবে? মামামশায়ের পুরানো সাগরেদ—ডেকে তোলার মানে দাঁড়াবে সে-ই যেন মানুষটাকে তাড়িয়ে তুলতে চায়। ঘুমেরও বলিহারি যাই! লোকের পর লোক এসে দাঁতন করে মুখ ধুয়ে যাচ্ছে কুয়াতলায়। বালতি বালতি জল তুলছে, আতাগাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে রোদের ঝিলিক পড়ছে এসে মুখের উপর। এতেও ঘুম ভাঙে না, সে-মানুষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে পথে বেরোয় কোন বিবেচনায়?

হঠাৎ একসময় সুশান্ত ধড়মড়িয়ে উঠে চারিদিক তাকিয়ে হায়-হায় করে

উঠল : ছি-ছি-ছি, খাওয়াদাওয়া করে আর মরণ-ঘুম ঘুমিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। এত জনকে বলে রেখেছি, কেউ ডেকে দিল না। তুমি কেন ডাকলে না হিমানী?

ডাক শুনে হিমানী চোখ তুলে তাকাল। চোখোচোখি আবার, দু-চোখে হাসি ছাপিয়ে পড়ছে। হাসি যেন কথা বলে: বুঝি লো বুঝি, ইচ্ছে-ঘুম তোমার। লোক দেখিয়ে দুষতে হয়, তাই তুমি বলছ এসব।

রামজয় এই সময় এসে সুসংবাদ দিলেন: মাঝের ঘরের একজন বিকালে চলে যাচ্ছেন, একটা সিট খালি হবে। ভালই হল, আজ রাত্রে তোকে আর দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

রাত্রিটাও থেকে যাবে, এতদূর ধরে নিয়েছেন। এই যত হা-হুতাশ কেউ ওঁরা আমলে আনেন না। একজন তো হাসছে টিপিটিপি, অন্যে সিটের ব্যবস্থা করে এলেন। পাকাপাকি বসবাসের জন্যেই যেন উপবনে আসা—মান বাড়ানোর জন্যে মুখে যাই-যাই করছে, মনের কথা উল্টো।

আমি রওনা হচ্ছি মাস্টারমশায়—

এখন এই একপ্রহর বেলায়? রামজয় খিঁচিয়ে উঠলেন: রোদ চড়ে গিয়ে একটু পরেই তো আগুন ঢালবে। দোকানে দোকানে তোর কাজ—দোকানিরা ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমুবে তখন। কাজের চাড় হলে সকাল উঠে বেরুতিস।

হিমানীকে দেখা গেল—রান্নাঘরের বারান্দায় দ্রুতহাতে চা ঢালছে, দুধ-চিনি মেশাচ্ছে। দেখিয়ে দেখিয়ে নিঃশব্দে যেন বলে, যাচ্ছ সত্যি তো এক্ষুনি? কত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিই দেখ।

চাহ তুলে সুশান্ত তারই যেন মনে মনে জবাব দিচ্ছে: ব্যস্ত হয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলো না হিমানী। ধীরেসুস্থে করো। মাস্টারমশায় ঠিক বলেছেন, এখন বেরিয়ে কাজ হবে না। দুপুরের পর যাব।

রামজয়ের দিকে চেয়ে বলে, শ্যামল দত্ত বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। চাকরি না নিয়ে আমারই কথার উপর কারবার ফেঁদেছে। আমার উপরে তাই বিশেষ রকমের দায়িত্ব। বিকালে চলে যাব, তখন মানা করলে হবে না কিন্তু মাস্টারমশায়।

রামজয় বলেন, কেন মানা করব? খালি সিটের জন্য বলছি বুঝি—সিটের কি আর ভাড়া দিতে যাচ্ছিস তুই?

এক বয়সে লুকিয়েচুরিয়ে জন-সমাজের বাইরে বাইরে দিন কাটত, কথাবার্তার ধরনটা সেই জন্যে খাপছাড়া। বলছেন, সে-দিন নেই আর

উপবনের। হিমি-মা'র হাতে অমৃতের ঝারি। সিট আমার খালি পড়ে থাকে না। একটা সিট খালি শুনলে পাঁচ-সাত খদ্দেরে ঝাঁপিয়ে এসে, আমায় দিন আমায় দিন—করবে।

হিমানী চা দিতে এসেছে। সেই চোখ-ভরা হাসি। বাচাল চোখ দুটো যেন তড়পাচ্ছে: গেলে না চলে? তাহলে ক্ষমতা বুঝতাম!

আচ্ছা, দেখা যাবে ওবেলা। রোদের জোর একটু কমতে দাও। বড্ড ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সুশান্ত সারাক্ষণ ছটফট করছে।

মোটরগাড়ি উঠানের উপর—কাল থেকে রয়েছে। বিকালবেলা তৈরি হয়ে খুব রোখে রোখে সে বেরুল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে হবে এবার।

সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। শ্যামল দত্ত এ গাড়ি বাতিল করে দিয়েছিল, সুশান্ত সেরেসুরে পথে বের করেছে। বুড়োমানুষের মতো নড়ানো বড় মুশকিল, তবে একবার নড়াতে পারলে তারপর বেশি গোলমাল করে না। পুরো একদিন বিশ্রাম পেয়ে আজ বোধহয় গাড়ির আলস্য লেগে গেছে। এত হ্যাণ্ডেল মেরেও সাড়া জাগানো যায় না। হ্যাণ্ডেল মারতে মারতে হাসফাঁস করছে সুশান্ত বেচারি, ভিড় জমিয়ে হোটেলের মানুষ লোমহর্ষক কাণ্ড দেখছে।

অনতিদূরে হিমানী—করুণা নেই, হাসছে সে-ও যথারীতি। মুচকি হেসে বলল, রেখে দিন, এখন হবে না। আবার এক সময় দেখবেন।

এবং মুখ ফুটে যা বলল না, তা-ও সুশান্ত বুঝতে পারে: নাটবোল্ট কোথায় কি ঢিলে করে রেখেছেন, হবে কেমন করে? সকলের দেখা তো হয়ে গেল—আর কেন, হাত-পা ধুয়ে উঠে আসুন এবার।

সেই অনুক্ত কথাগুলোই সুশান্তকে বেশি করে ক্ষেপিয়ে তুলল। রামজয় এসে তার উপর ইন্ধন দিলেন: হ্যাঁ, গাড়ি সরিয়ে উই কুয়াতলার ওদিকে নিয়ে রাখ। বড় আসর চাই। শুনেছিস তা হলে, আদিবাসী ছোঁড়াছুঁড়িদের একটা দল সন্ধ্যাবেলা নাচতে আসবে। মাঝে মাঝে নেচে যায়, চা আর মুড়ির মোয়া খেতে দিই। বড় ভাল নাচে রে, দেখে মজা পাবি।

বুড়োমানুষের মনে ঘোরপ্যাচ নেই, সরল ভাবে বলছেন। কিন্তু হিমির হাসির সঙ্গে জুড়ে গিয়ে উৎকট লাগে। অন্য রকম মানে দাঁড়ায়। আসর বড় করার জন্যেই যেন মোটরগাড়ি নিয়ে এতক্ষণের এত কসরত। নাচের ঘটা দেখা ছাড়া যেন অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না।

আরও চরম করলেন রামজয়: যাকগে বাপু বড্ড ঘেমে গিয়েছিস। যেটুকু ফাঁকা আছে ওর মধ্যেই কুলিয়ে যাবে একরকম। হাত-পা ধুয়ে খালি সিটে তুই খানিকটা গড়িয়ে নিগে যা।

স্বাড়িও তেমনি লেগেছে। সাড়া-শব্দ দেবে না, গুম হয়ে রয়েছে। সুশান্ত এবারে বনেট তুলে খুটখাট করছে, এটা খুলছে ওটা আঁটছে। মুখ তুলে হিমানীকেও এক-আধবার দেখতে পায়। সেই হাসি, কাজের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু একটু হেসে সরে পড়ে। অর্থাৎ বেলা ডুবে গেছে—যাওয়ার কথা এখন আর উঠছে না। যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে পড়ো দিকি এবার, কাল সকালে আবার দেখো।

নাচ হল সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ধরে। এমন-কিছু নয়। কিম্বা মনে উদ্বেগ বলেই সুশান্তর ভাল লাগল না। শ্যামল দত্ত এত খরচা করে গাড়ি দিয়ে বাইরে পাঠাল, কাজের নমুনা এই। অথচ সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুভ্রা-সাবান দাঁড় করানোর উপরে। উৎসাহ পেলে শ্যামল আরও টাকা ঢালবে, কারবার বড় করবে। সুশান্ত এখনই সর্বেসর্বা, তেমনি হলে তো হাতে মাথা কেটে চারিদিক চক্কোর দিয়ে বেড়াবে।

আশ্চর্য, গাড়ি এতক্ষণে গর্জন করে উঠল। বুড়ো গাড়ি বোঝে সব—এখন এই রাত্তিরবেলা ছুটোছুটির গরজ হবে না, সেই জন্যই হয়তো। কুয়া থেকে সুশান্ত বালতিতে জল তুলছে—ইঞ্জিনে ভরে রাখবে, ভোরবেলা উঠেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে রওনা হতে পারে।

রামজয় পাশে এসে আচমকা প্রশ্ন করেন: কে কে আছে তোর সংসারে?

সুশান্ত বলে, একা আমি।

হিমিকে বিয়ে করে ফেল্ তবে। দু-জন হবি।

হাতের বালতি ঝপ করে মাটিতে পড়ে জল গড়িয়ে গেল।

রামজয় নিজের কথা বলে চলেছেন: ওরা এসেছে আট মাসের উপর হয়ে গেল, এখনো কিছু করতে পারলাম না। বিয়েথাওয়ার কাজ পারিনে আমি, পারলে কি নিজেই একটা করতাম না? বোন-ভগ্নিপতি হয়তো ভাবছে, হোটেলের উপকার হচ্ছে—মতলব করেই এগুচ্ছিনে আমি। হঠাৎ মনে হল, তোকে যদি বলি তুই কক্ষনো 'না' বলবিনে। কি রে, রাখবিনে আমার কথা?

বিয়ে করে খাওয়াব কি মাস্টারমশায়?

ভাত—

আসবে কোত্থেকে সে ভাত?

হিমি রেঁধে দেবে। এতজনকে রোস্ট রেঁধে রেঁধে খাওয়ায়, ভাত রাঁধতেও পারবে।

হেসে উঠে সুশান্ত বলে, চাল কোথা পাব।

দোকানে। কিনে-কেটে দিবি, রাঁধা-ভাত আমোদ করে খাবি দু-জনে।

বলবার কিছু নেই। সর্ব সমস্যা মাস্টারমশায় জল করে দিলেন। সে আমলেও এমনি দিতেন—

কত ইংরেজ ভারতে আছে—চল্লিশ হাজার?

তাই হবে।

ওদের একটার জন্তে ধরা যাক আমাদের পাঁচটা খরচা। আমাদের দিকে তাহলে দু-লাখ। রইল কত দেশবাসী—বিয়োগ করে বের কর্।

আদমসুমারি সঠিক জানা না থাকায় সুশান্ত জবাব দিত: তা অনেকই তো রইল।

তারাই স্বাধীন হয়ে দেশ শাসন করবে। সুখসমৃদ্ধি হবে। বুঝলি রে এবার?

অকাট্য হিসাব, না বোঝার কিছু নেই। ঠিক আজকেরই মতন।

রামজয় বলে যাচ্ছেন, সময়টাও ভাল পাওয়া গেছে—বোশেখ মাস, বিয়ের মাস। আজকে আর হবার উপায় নেই—হিমি উপোস করেনি, পুরুত-পরামাণকের ব্যবস্থা নেই। কাল। দিনক্ষণ পাই ভাল, নয়তো গোধূলিলগ্ন যাচ্ছে কোথায়?

এহেন ব্যবস্থা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সুশান্ত কিন্তু-কিন্তু করছে: কালকের দিন তবে বরবাদ। পরশুও কি যেতে দেবেন আপনারা? তার পরের দিনও বোধহয় না—ফুলশয্যার কত সব বখেড়া থাকে, শোনা আছে। হিমানীর বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সবই তো এখন এক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে —উপবন হোটেল।

কাতর হয়ে বলে, বড্ড ক্ষতিলোকসান মাস্টারমশায়। শ্যামল এত খরচা করে পাঠাল, কাজ দেখাতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবারটা ছেড়ে দিন, শিগ্‌গিরই আসব আবার। উপবন রইল, আপনার হিমিও কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না।

রামজয় চটে গিয়ে বলেন, হিসেবের বাইরে তো কিছু নেই—কত ক্ষতিলোকসান হিসেব করে বল্। আমি পূরণ করব। সাবান পেটিসুদ্ধ আমায় দিয়ে দে। কত দাম—ষাট-সত্তর, না হয় একশ'ই হল। একটা গরু কি মহিষের দাম। সাবান আমার হোটেলে খরচা হবে। মিটল তো এবার, জামাই হয়ে সিটে শুয়ে পা দোলাগে এবার—

ফুলশয্যা হয়েও ছুটি হল না। কন্যাদায় মুক্ত হয়ে হিমানীর বাপ-মা নিশ্চিন্তে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছেন। চিলেকোঠা এখন সুশান্ত ও হিমানীর

—দু-জনে দিব্যি একলা আছে। অসুবিধা অন্য কিছু নয়, শুধু এক শুভ্রা-সাবান। খচখচ করে সর্বক্ষণ মনে বিঁধে আনন্দ মাটি করে দেয়। হয়তো শ্যামল প্রশ্ন করবে: কাজ ফেলে কি জন্যে এক জায়গায় পড়ে ছিলে?

ভেবেচিন্তে তারও একরকম উপায় করা গেল। টেলিগ্রাম কলকাতায় শ্যামল দত্তের কাছে: তোমার আবিষ্কৃত শুভ্রা-সাবানের আশ্চর্য সমাদর। পেটি সুদ্ধ শেষ। আবার পাঠাও, ফিরতি পথে বিক্রি হতে হতে যাবে। মালের অপেক্ষায় এখানকার উপবন হোটেলে পড়ে আছি।

কি করি বলুন মাস্টারমশায়। মালিকের জবাব না পেয়ে ফিরি কেমন করে? জবাব এলেও তো হবে না, মাল এসে পৌঁছবে, তারপরে।

রামজয় বলেন, ছটফট করিস কেন? ভালই তো আছিস।

আছে ভাল সন্দেহ কি! উপবনের সুবিখ্যাত মুরগি-রোস্ট রোজ রাত্রে। সত্যি চমৎকার। আরও উপাদেয় লাগে একেবারে মুফতে বলে।

শ্যামলের জবাব এলো। বিষম খুশি সে। প্রথম যাত্রায় এতদূর সাফল্য, কে ভাবতে পেরেছে! সাবান বুক করা হয়েছে, দু-চার দিনে পৌঁছে যাবে। ততদিন থাক কষ্ট করে হোটেলে। খদ্দেরের যখন এমন আগ্রহ, তাদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না।

এসে পড়ল অবশেষে মাল। গাড়ির পিছন দিকে বোঝাই দিয়ে রওনাও হতে হল একদিন। এ-ও ভাল, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একা এসেছিল কলকাতা থেকে, ফিরছে দু-জন। গাড়ির মধ্যে বন্ধনহীন দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, এ জিনিস স্বপ্নে ভাবা যায় না। শুভ্রা সাবানের দৌলতেই হল, শুভ্রার উপর তারা কৃতজ্ঞ। স্টিয়ারিং হাতে ধরে সামনের দিকে একাগ্র হয়ে সুশান্ত গাড়ি চালায়। গায়ের উপর এলিয়ে আছে হিমানী, দু-চোখে হাসি। গাড়ির পিছনে গাদা গাদা সাবান। এবং অর্ডার-বই, ক্যাশমেমো, রকমারি সচিত্র বিজ্ঞাপন। বাজার-চলিত সাধারণ সাবান নয়—সুপ্রসিদ্ধ কেমিস্ট ডক্টর শ্যামল দত্তের অভিনব আবিষ্কার। বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো, যার ফলে সিকি পরিমাণ সাবান এবং অর্ধেক পরিমাণ শ্রম ব্যয়ে কাপড়চোপড় ডবল ফর্সা হবে। এই ফর্মুলা দেশি বিদেশি যে কোন শিল্পপতিকে দিলে বিনিময়ে কোটি টাকা—কিন্তু ধনীকে আরও ধনী করা ডক্টর দত্তের উদ্দেশ্য নয়···ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেদার বিজ্ঞাপন ছড়াচ্ছে, মুখেও বোঝাচ্ছে। মস্ত [illegible] কাজের নামে যত দূর যেখানে খুশি যাও চলে। সন্ধ্যা হলে তখন খোঁজ নাও কাছাকাছি আশ্রয় কোথায় মেলে। আজ এই জায়গায় থেকে গেলাম, কাল

রাত্রে অন্ত কোন রেস্ট-হাউস বা হোটেলে। —অথবা ঠাঁই না পেয়ে ঐ গাড়ির খোপেই কিনা, আগেভাগে কিছু বলবার জো নেই। বড় মজার মধুচন্দ্র-যাপন—ক'টা বর-বউয়ের জুটে থাকে এমন? ঘুমোয় না, কামরার ভিতরে হোক আর গাড়ির খোপেই হোক—ঘুম আসবার আগেই ওদের রাত পোহায়ে যায়।

রাতগুলো কাটে চমৎকার। দিনমানটা নিয়ে—সুশান্তর কিছু নয়, হিমানীরই যত মুশকিল। দেশের একটা প্রধান সড়ক ধরে চলেছে—বিশ-ত্রিশ মিনিট অন্তর গঞ্জ-জায়গা। গাড়ি পথের একদিকে রেখে নমুনা ও কাগজপত্র নিয়ে সুশান্ত নেমে পড়ে। শুভ্রা-সাবান ও আবিষ্কারক ডক্টর দত্তের গুণপনা যথোচিত জাহির করে ব্যাগ খুলে সন্তর্পণে এইবার সাবানের প্যাকেট বের করল। দোকানি সঙ্গে সঙ্গে অন্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সামনের খদ্দের সামলায়। অগত্যা সুশান্ত গোড়া থেকে শুরু করে আবার। এ-দোকান থেকে সে-দোকানে—এই চলে সারাক্ষণ। গাড়ির মধ্যে হিমানী পাহারায় আছে—একা। হিমানীর সময় আর কাটতে চায় না। বড় কষ্টের এই দিনমান।

একদিন বড একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু-পাশ দিয়ে দোকানের অনন্ত লাইন। সর্বনাশ করেছে—এত দোকান সন্ধ্যা অবধি ঘুরেও সারা হবে না, রাত হয়ে যাবে। তাতেও কুলাবে না, কালকের দিন লেগে যাবে বোধহয়। রোদটা বিষম উগ্র আজ। উল্টা দিকের এক দোকানে সুশান্ত অনেকক্ষণ ঢুকেছে, বেরুবার নাম নেই।

অধৈর্য হয়ে একসময় হিমানীও গাড়ি থেকে বেরুল।

হাতছানি দিয়ে সুশান্তকে কাছে ডাকে: অতক্ষণ ধরে কি করো?

গল্প করছিলাম, তা বুঝি জানো না! ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প।

হিমানী বলে, এক জায়গায় অত সময় নিলে হবে কেন? তাড়াতাড়ি করো। বসা যাচ্ছে না গাড়ির ভিতর। যেন তপ্তখোলা।

কাজের জুত হচ্ছে না, মেজাজ খারাপ সুশান্তর। খিঁচিয়ে উঠল: তা বলে আর অমন হাসি থাকত না মুখে।

হাসছি আমি? তুমি আমার হাসি দেখতে পেলে?

এক টুকরো আয়নার কাচ সামনেটায়—হিমানী মুখ দেখতে যায়। কিন্তু সে কাচে ছায়া পড়ে না। বলে, তপ্তখোলায় ধান ফুটে খই হয়ে যায়—ভাবছি আমিই বা কখন ফুটে গিয়ে চিড়িং করে হুডের ফাঁকে বাইরে গিয়ে পড়ি! উল্টে তুমি আমার হাসি দেখছ—হাসির কি হল শুনি!

আমি নাজেহাল হচ্ছি। লোকের কষ্ট দেখার মতো সুখ কিসে আছে? এত করে জপালাম, তা সাবান যেন অস্পৃশ্য জিনিস—ছুঁ নেই চান করতে হবে। কাজ নেই, ঢের হয়েছে। এখান থেকে সোজা কলকাতা, শ্যামলকে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দেবো—আমার দ্বারা ক্যানভাসিং হবে না, আমায় ছেড়ে দাও। বন্ধুমানুষের খামোখা কতকগুলো টাকা নষ্ট করলাম।

মুখের কথা এই। তা বলে লহমার জন্তে কাজ বন্ধ করে থাকে না। আবার পাশের দোকানে ছোটে। ছুটে গেল বোধকরি হিমানীর সঙ্গে যে সময় নষ্ট হল সেইটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য। ঠিক আগেকার মতোই—বেরুবার নাম নেই।

হিমানী গাড়ির বাইরে এবার। বাজে-পোড়া নারিকেলগাছ একটা রয়েছে, কাছেপিঠে অন্য কোন গাছ নেই যে ছায়ায় গিয়ে একটু দাঁড়ায়। এদিকেও দোকানপাট—পায়ে পায়ে তারই একটার ছাঁচতলায় গেল।

গদির উপর হাতবাক্সের সামনে মালিক লক্ষ্য করছিল। মেয়েটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে এদিকে এলো, সঙ্কোচে উঠতে পারছে না দোকানে। সমস্ত তার নজরে পড়েছে। বৃদ্ধ কর্মচারী একজন ঝিমোচ্ছিল বসে বসে। তাকে পাঠিয়ে দেয়: দেখে আসুন তো সরকারমশায়, উনি কি চান।

সরকারমশায় হিমানীর কাছে এসে বলে, কী দরকার বাবু জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।

ডেকে পাঠাচ্ছে অপর পক্ষ, হিমানী নিজে থেকে কিছু বলতে যায়নি। একটা জায়গায় বসে রোদে ভাজা-ভাজা না হয়ে ক্যানভাসিং-এর কাজ দিক না কিছু এগিয়ে। রাস্তার ওপারে লাইন ধরে সুশান্তর কাজ— হিমানী এধারে যে ক'টা দোকানে পারে সেরে রাখুক। খারাপটা কী হবে। মরার বাড়া গাল নেই— সুশান্ত কিছু করতে পারছে না, হিমানীরও না হয় তাই।

বুড়া লোকটি বলছে, বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

গাড়িতে গিয়ে কাগজপত্র এবং সাবানের কয়েকটা প্যাকেট হাতে নিযে হিমানী সাহস করে দোকানে ঢুকল।

কি চাই বলুন।

কী বলবে হিমানী, মুখ যেন সূঁচ-সুতোয় সেলাই করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের কাগজ কয়েকটা এগিয়ে দিল।

হাতে নিয়েছে মালিকমশায়, পড়ে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হিমানীর হাসি-ভরা মুখের দিকে। ঘেমে উঠে হিমানী মুখ নামিয়ে নিল।

মালিক চমক খেয়ে বলে, ও হ্যাঁ, কি জিনিস দেখি—সাবান ? শুভ্রা-সাবানের নাম শোনা আছে। খুব ভাল জিনিস। কোথায় পাওয়া যায়, ভাবছিলাম। তা ঈশ্বরই যেন মিলিয়ে দিলেন। দিয়ে যান ডজন চারেক।

সরকারমশায়কে বলে, চার ডজন নিয়ে নিন।

বিজ্ঞাপনে এতক্ষণে নজর দিল। পাইকারি মূল্য ছাপা আছে, হাতবাক্স থেকে টাকা বের করছে। কৃতজ্ঞতা ভরে হিমানী মুখ তুলেছে। চোখোচোখি হল।

মালিক বলে, আরও কিছু নিতে বলছেন ? তা বেশ, খুচরো কেন পুরো গ্রোসই দিয়ে যান। খুব চলবে এ জিনিস। আপনি মাঝে মাঝে আসবেন। আসছে হপ্তায় আসুন না একবার। এসে খোঁজ নেবেন। সমস্ত কেটে যাবে তার মধ্যে।

আশাতীত ব্যাপার। আনন্দে থই পায় না হিমানী। সুশান্ত সেই দোকানেই এখনো—না, সেটা সেরে অন্যত্র ঢুকেছে ? বড্ড বেশি বকে, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দেয়। আর চটে ওঠে কথায় কথায়। দোকানের মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়ে। হিমানী তো কথাই বলল না। কায়দাটা ধরিয়ে দিতে হবে সুশান্তকে।

উৎসাহ ভরে পরের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পদ্ধতি একই। কথা নয়—কথা বলতে জিভ তো জড়িয়ে আসে—বিনা বাক্যে বিজ্ঞাপনের কাগজ হাতে এগিয়ে দেয়। হাতে নিয়ে মানুষটা মুখের পানে তাকায়: শুভ্রা-সাবান—আহা-মরি নাম ! নামটা শুনেই মনে হয় কাপড়-জামা ধবধব করছে। নামেই কাটবে, দিয়ে যান। আসছে হপ্তায় আসবেন, বেশি করে নেবো।

গোটা পাঁচ-ছয় দোকানে ঘুরল। কাছাকাছি আর নেই, আর সব দূরে। গাড়ির পাহারা ছেড়ে দূরে যাওয়া চলে না। শুভ্রার নাম ও গুণপনা সব ক'টা দোকানই জানে, দেখা গেল। কোথায় পাওয়া যায়, সঠিক ঠিকানার অভাবে এতদিন উদ্যোগ হয়নি। বসেছে আবার গাড়িতে। কাজের সাফল্যে, এবারে গরম নয়, বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগে।

সুশান্ত এলো এই সময়। বিজ্ঞাপন ফুরিয়েছে ; কিছু বিজ্ঞাপন নেবে। রোদ খেয়ে ক্ষেপে আছে। হিমানীর উপর বোমার মতন ফেটে পড়ে : হাসছে যে তুমি বড়ো ?

টিপিটিপি হাসছিল হিমানী, খিল-খিল করে জলোচ্ছ্বাসের মতো ফেটে পড়ে। ঝগড়া করে : কেন হাসব না ? তোমার যে কত ক্ষমতা, জানো না বলেই মন গুমরে থাকো। যত খাটনি খেটেছ, কিছুই বিফল হয় নি।

ঠাট্টা ?

প্রমাণ স্বরূপ হিমানী ক্যাশমেমো বের করে ধরল। নতুন একটা বই নিয়ে এই ক'জায়গায় বিক্রি করে এসেছে। রাগ জল হয়ে গিয়ে সুশান্ত অপলক তাকিয়ে পড়ে: ঠিক তুমি মন্তোর জানো হিমানী।

হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে তার। নেহাত বাজার জায়গা, এর বেশি চালানো যায় না। বলে, গোটা ত্রিশেক জায়গায় ঘুরেছি; তোমার সিকির সিকিও তো হয়নি আমার। কাজে প্রথম নেমেই দিগ্বিজয় করে এলে।

এদিক-ওদিক চেয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে হিমানী বলে, সত্যি বলছি, একটা মুখের কথাও বলতে হয়নি। তোমরা বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছ, বিজ্ঞাপনে জানা ছিল সকলের। একেবারে মুকিয়ে ছিল, শুভ্রা নামটা দেখেই লুফে নিল। দিগ্বিজয় বলো যা-কিছু বলো সমস্ত তোমার।

এর পরে আজ আর কাজকর্ম নয়, কাজ বিস্তর হয়েছে। গাড়ি চলল। ছুটি এইবারে। মফস্বল জায়গা হলেও সিনেমা আছে ঠিক। খুঁজেপেতে গিয়ে বসে পড়বে।

রাত্রে রেস্টহাউসের কামরায় যুগলে শলাপরামর্শ: ঠিক, ঠিক! এমনি কায়দা এবার থেকে। মাস ক'টা কাটিয়ে দিয়ে সোজা কলকাতা। আবার যখন বেরুব, এই লঝ্ঝড় গাড়িতে নয়। শ্যামলের নিজের গাড়িটা নিয়ে আসব। কাজ ভাল দেখলে হাসতে হাসতে দিয়ে দেবে সে।

ঘাড় দুলিয়ে হিমানী বলে, বয়ে গেছে। চাকরি তোমার, আমি কি জন্যে খাটতে যাব? একবেলা একটু শখ হয়েছিল—তাই বলে কি নিত্যিদিন?

বলছে এই মুখে। চোখের হাসি জয়ের আনন্দে আরও যেন ঝিলিক দিচ্ছে। সুশান্ত যত বলে—তুমি ছাড়া হবে না হিমানী, সকৌতুকে হিমানী তত ঘাড় নাড়ে: পারব না, কক্ষনো না। আমি তো ক্যানভাসার নই তোমার শ্যামল দত্তর। আমি কেন করতে যাব?

এক সময় গম্ভীর হয়ে বলে, দেখ, ভয় করে বড্ড আমার। পুরুষের সামনে ঠকঠক করে গা কাঁপে। গেঁয়ো মেয়ে যে আমি—মা-ঠাকুরমা আমায় ঘরকুনো বানিয়েছেন। এসব কাজে লাগাবে তো শহুরে মেয়ে বিয়ে করলে না কেন?

এই কলহ, এই আবার সোহাগের গদগদ ভাব। নতুন বিয়ের বর-বউয়ের যা দস্তুর। শেষরাত্রের দিকে অবশেষে নিমরাজি হল হিমানী: এমন জেদি

মানুষ দেখিনি কখনো। যা ধরবে, তাই করিয়ে তুমি ছাড়বে। কী যে করি আমি তোমার জ্বালায়!

চলছে সেইভাবে। তবু এক একদিন হিমানী বিগড়ে যায়। বিষম খেয়ালি। এক পা নড়বে না, কিছুতে না। গাড়ির ভিতর জেদ করে বসে থাকে, আর হাসে মিটিমিটি: আমি কি জানি এসব, করেছি কখনো? বিয়ে হতে না হতে কাজে জুড়ে দিয়েছ। আজকে আমার ছুটি।

তাকে গাড়িতে রেখে অগত্যা সুশান্ত ঢুকে গেল কোন এক দোকানে।

কি নিয়ে এলেন আবার? এখানে ক্ষারে কাপড় কাচে মশায়, সাবান লাগে না। পুরো কাপড় ক'টা মানুষেরই বা—পরে সব ন্যাকড়া। তাতে সাবান কোথা লাগাবে?

যেখানে যাচ্ছে—উল্টেপাল্টে এমনি ধরনের কথা। সাবান নিতান্তই অপ্রয়োজনের বস্তু।

হিমানীকে অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে ওরই মধ্যে এক জায়গায় পাঠাল। পছন্দ হয়ে যাক না। নিজে অলক্ষ্য পিছনে আছে।

হিমানীর যা কায়দা—একটি কথা নেই। বিজ্ঞাপনের কাগজ দিল এগিয়ে। মুখের দিকে তাকিয়ে দোকানির কণ্ঠস্বর এবার ভিন্ন রকম। কর্মচারীকে বলে, শুভ্রা-সাবান নিয়ে এসেছেন হে! রেখে দাও খান কয়েক। চেষ্টা কোরো তোমরা, কিছু কি আর কাটবে না?

কম নিক বেশি নিক, একেবারে ফেরায় না কেউ। দোকানিগুলো পুরুষমানুষ, নিশ্চয়ই সেই কারণে; পুরুষ পুরুষকে সুনজরে দেখে না—একজন পুরুষে করে খাবে, সহ্য করতে পারে না অন্য পুরুষ। সুশান্তকে তাই অবহেলা। হত এই দোকানিরা মেয়েলোক, হিমানী তবে বুঝত ঠেলা। সুশান্তকে খাতির করত, তার কথা রাখত। নিয়মই এই।

পথে পথে আর ভাল লাগে না। যা হবার হল, ফেরা এবারে। কলকাতায় ফিরে যাওয়া যাক।

হিমানী বলে, সেই গঞ্জে একটিবার যেতে ইচ্ছা করে, আমার হাতে-খড়ি যেখানটা। ঐদিক দিয়ে ঘুরে যাই চলো। হপ্তাখানেক পরে যেতে বলে দিয়েছিল—যে ক'টা মাল পড়ে আছে, ওখানেই নিয়ে নেবে।

বাজে-পোড়া নারিকেলগাছ, টিনের বেড়া, পাকা মেজের সেই দোকান। দুপুরের বিশ্রামের পর সবে দোকান খুলছে—প্রকাণ্ড চাবির থলে হাতে সেদিনের সেই বুড়ো কর্মচারী। দেখেই হিমানীকে চিনেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, আপনি-ই তো সেদিন সাবান দিয়ে গেলেন। উঃ, সাবান বটে!

ভাবলাম, এত ভাল ভাল কথা লিখেছে, দেখিই না এক কুচি ফতুয়ায় লাগিয়ে। এই যেটা গায়ে পরে আছি। পুরো একখানা সাবান ক্ষইয়ে ফেললাম। যতই কাচি, ফর্সা না হয়ে উল্টে আরও ঘোর হয়ে যায়।

মুখ কালো সুশান্তর, সপাং করে কে যেন চাবুক মেরে বসল। প্রবোধ দেয় হিমানীকে: এ লোকের কথায় কী আসে যায়! গুণ না থাকলে এত সোরগোল পড়ে যেত না। কথা বাড়িও না, চলে এসো তুমি।

সোরগোল সহসা পিছন দিকেই। মালিক এসে পড়েছে, পিছন থেকে মালিক বলে ওঠে, এই যে, এসে গেছেন আপনি। আজকেই ভাবছিলাম আপনার কথা। সাবান কোথা?

সুশান্ত বুড়ো কর্মচারীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলে, দরকার?

সুশান্তর কথা কানেই গেল না তার। হিমানীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, হাত খালি আজকে—বিজ্ঞাপনের কাগজও দেখছিনে। গাড়িতে রেখে এলেন বুঝি? ভিতরে চলুন। মানুষটিকে বলে দিন, তিন চার ডজন সাবান আনতে।

কর্মচারীটি বিরক্তি ভরে বলে, আগের সাবান তো গাদা হয়ে পড়ে আছে। আবার কেন? তাই বরঞ্চ কতক ফিরিয়ে দিলে হয়।

অপ্রতিভ হয়ে মালিক বলে, কে বলেছে? আপনি কিছু জানেন না সরকারমশায়। চলে যান, নিজের কাজে বসুনগে।

বিক্রি ছাড়া কাজ কি আমার? সেইজন্যে জানতে পারি। বলেকয়ে একজনকে একখানা গছিয়ে দিলাম, ফেরত এনে যাচ্ছে-তাই করে বলল। আপনার সামনেই তো হল, আপনি এখন চেপে যাচ্ছেন।

মালিক তর্জন করে ওঠে: আপনাকে কে মাতব্বরি করতে বলছে শুনি? কথাবার্তার মধ্যে কখনো ফোড়ন কাটবেন না, শেষ বারের মতো মানা করে দিচ্ছি। সাবধান!

মুখ কালো পরে সরকারমশায় নিজ স্থানে গিয়ে বসল। ফিক করে হেসে মালিক বলে, এই হপ্তায় আপনি আবার নিয়ে আসবেন, কথা ছিল। দিন। যদি সব না-ও গিয়ে থাকে, ভাবনার কি আছে? নানা ঝঞ্ঝাটে আমি নিজে ক'দিন দেখতে পারিনি। 'মাল কিছুই পড়ে থাকবে না।

একটু থেমে আবার বলে, থাকে পড়ে সে আমার থাকবে। আপনার কোন দায়? হপ্তায় হপ্তায় আপনি নিয়ে আসবেন।

সুশান্ত হাত চেপে ধরেছে হিমানীর। গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দিচ্ছে।

হিমানী বলে, সাবান চাইল যে?

সুশান্ত বলে, বেচব না এদের কাছে।

হাত টেনে হিমানীকে পাশের সিটে তুলল।

হিমানী আবার বলে, আরও ক'টা দোকান এদিকে আছে। তাদের হয়তো সত্যিই ফুরিয়েছে।

তোমার খদ্দের একজনের কাছেও বিক্রি করব না।

গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ক্ষণ পরে তিক্ত কণ্ঠে সুশান্ত বলে, হাসছিলে কেন দোকানদার ছোঁড়ার দিকে অমন করে ?

অবাক হয়ে হিমানী বলে, কি বলছ, হাসি দেখলে কখন তুমি ?

আলবৎ হেসেছ। মন-মজানো হাসি। গেঁয়ো মেয়ে বলে আবার ন্যাকা সাজতে যাও। শহরে মেয়ের বাপ-ঠাকুর্দাও অমন করে না। হাসি দিয়ে বড়শি-গাঁথার মতো আমায় গেঁথে ফেললে। নইলে বিয়ের অবস্থা আমার! একেবারে দিশে করতে দিলে না।

গাড়ি গর্জন করে ছুটেছে।

হিমানী বলে, না বুঝে একবার একদিন বিক্রি করে এসেছিলাম। অন্যায় হয়েছিল আমার। বলে বলে তুমিই তো তারপর পাঠাতে।

বলেছিলাম সাবান বেচতে, হাসি বেচতে বলিনি।

হিমানী কেঁদে পড়ল।

আরও জলে উঠে সুশান্ত বলে, দিব্যি তো জল আনতে পারো চোখে! হাসি কান্না দু-রকম দুই চোখে—যে জিনিষও নয়। এক সঙ্গে মেশানো। হাসির আরও বাহার খোলে এতে—যে দেখে, তার মুণ্ডু ঘুরে যায়।

হিমানী আরও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পোড়া হাসি চোখের জলেও ধুয়ে যায় না, কান্নার মধ্যেও হাসি লেগে থাকে—এ রোগ নিরাময় হবে কেমন করে!

শ্যামল দত্ত আনন্দে থই পায় না। প্রথম যাত্রায় এতদূর সাফল্য ধারণার অতীত। শত্রুরা কত কি বলত, তাদের মুখ চুন। হয়েছে কি এখনো! এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে, আরও কয়েকটা জিনিস মেশানোর ইচ্ছা আছে, তখন এক আজব কাণ্ড হবে, বালতির জলে শুভ্রার একটুখানি গুলে যাতে ঢালবে, তাই ফরসা। মানুষ কুকুর কাপড়-চোপড় টেবিল-চেয়ার যার উপরেই হোক। দেশে আর অন্য সাবান পাত্তা পাবে না।

ইতিমধ্যে খবর কানে গেল, বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে সুশান্ত।

শ্যামল লাফিয়ে ওঠে সত্যি ? এতবড় জিনিসটা চেপে রেখেছ, আচ্ছা

মানুষ তো তুমি! বউ কবে দেখাচ্ছ? কবে তোমাদের সময় হবে জেনে এসে বলো, এইখানে ছোটখাট একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

সুশান্ত বাড়ি এসে বলে, কবে যাওয়া যায় বলো। সামনের রবিবার—কেমন?

হিমানী জ্বলে ওঠে: কোনদিনও নয়। খবরদার, বাইরে যাওয়ার নাম করবে না আমার কাছে।

মুখে যা বলল, তাই। নিচের তলায় আধ-অন্ধকার একটা ঘর—অহোরাত্রি হিমানী তার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

সুশান্ত বলে, হল কি তোমার? নবাব-বাদশার হারেমকে যে হার মানিয়ে দিলে। এক পা কোথাও বেরুবে না?

বেরুলেই তো হেসে হেসে মানুষের মুণ্ডু ঘোরাব। মাথা ঘুরে পটপট করে সব পড়বে, দেশে মড়ক লেগে যাবে।

সুশান্তও চটেছে। বলে, সেটা বুঝি মিথ্যে? মিটমিট করে হাসো, যাচ্ছেতাই হাসি তোমার। না হাসলে কেউ বানিয়ে বলতে যায় না।

না হাসবার জন্য হিমানীর কত চেষ্টা—দু-জন মানুষের সামান্য ঘরকন্নার পর সমস্তটা দিন এই নিয়ে আছে। আয়না নিয়ে জানলার কাছে বসে নানান কায়দায় মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাসি বন্ধের অভ্যাস করে।

শীতলা-মূর্তি মাথায় করে বাড়ির দরজায় এসেছে: মায়ের নামে পয়সা-কড়ি কি দেবে দাও—

মা কি করবেন?

দয়া হলে তোমার ঘরে কোনদিন মা অনুগ্রহ দেবেন না।

হিমানী বলে, পয়সা কেন, আস্ত একটা আনি ধরে দিচ্ছি। মা যেন অনুগ্রহই দেন। পূজোর সময় আমার নামে চেয়ে নিও, মুখ যেন ঝাঁঝরা হয়ে যায় আমার।

ছোটবেলা সবাই বলত, বড্ড হাসকুটে মেয়ে গো! আদর করত। ঠাকুরমা বললেন, আমি দেখার জন্য থাকব না, কিন্তু চিরকাল যেন হেসে হেসে এমনি কাটাতে পারিস। আশীর্বাদ ভেবে অভিশাপ দিলেন তিনি, সত্যি সত্যি তাই ফলে গেছে। সারা মুখে হাসির মাখামাখি। সন্ধ্যাবেলা ঠনঠনে-কালীবাড়ির আরতির ঘণ্টাধ্বনি আসে। ঘরের মেঝেয় মাথা কোটে তখন হিমানী: মাগো, কাঁদতে পারি যাতে তাই করে দাও। নিখুঁত পরিপাটি কান্না—যার মধ্যে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই।

শ্যামল তাগাদা দেয় : কই হে, কবে আসছ তোমরা? আমার বাড়ি এত ভিড়ের মধ্যে আসতে না চান, হোটেলই চা-টা হতে পারে। তোমার বউ আজও দেখলাম না, বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় এসে সুশান্ত স্ত্রীকে বলে, হোটেলেই চলো তবে। শুধু শ্যামল তুমি আর আমি। ছোটবেলার সহপাঠি, মানুষটি বড় ভাল সেই জন্য এমনি করে। আসলে তো মনিব, অন্নবস্ত্র তারই দৌলতে --

হিমানী ঝেড়ে ফেলে : মনিব তোমার। আমার কেউ নয়, আমি কেন যেতে যাব?

সুশান্ত অনেক করে বোঝাচ্ছে : শুভ্রা একদম চলছে না। সারাদিনের মধ্যে আমার বিশ্রাম নেই—এত বড় শহরের অলিগলি চষে ফেলছি। আগে তবু দশ-বিশ গ্রোস কাটত, এখন বোধহয় দশখানাও নয়। শ্যামল যদি কারবার তুলে দেয়, চোখে অন্ধকার দেখতে হবে।

হিমানী রায় দিল : ও যাবেই। পণ্ডশ্রম তোমার, ঠেকাতে পারবে না। কেমিস্ট না কচু—যা করেছে সাবানের জাতই নয়। নিজে আমি কেচে দেখেছি, কাপড় আরও কাল হয়ে যায়। বিজ্ঞাপনে আকাশ ফাটিয়ে ক'দিন চলবে?

এর পর হঠাৎ এক সকালবেলা শ্যামল নিজেই তাদের বাসায় এলো। অন্ধকার মুখ। বলল, সাবান নিয়ে আজকে আর বাজারে বেরিয়ে কাজ নেই। সোজা তুমি অফিসে চলে যেও। জরুরি কথা আছে।

হিমানী একহাত ঘোমটা টেনে জবুথবু হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামল একটু হাসল। বলে, বড্ড লাজুক তো ইনি। আজকাল এমন দেখা যায় না। যাক, বিব্রত করব না।

কানের গয়না নিয়ে এসেছে—গয়নার কৌটো হিমানীর হাতে দিল না, চেয়ারের পাশে রাখল। সুশান্ত মনে মনে গরগর করছে, ব্যাপারটা কোন রকমে চাপা দিতে চায় : অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো—

কিন্তু বলছে কাকে! শ্যামল ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে, একটা মিষ্টি মুখে দেবার সবুর সয় না। বলে, কর্তব্য অনেকগুলো মুলতুবি রয়েছে, সেইগুলো সারতে বেরিয়েছি। চাকরি নিয়েছি এলাহাবাদে, সেইখানে চলে যাচ্ছি।

শ্যামল বেরিয়ে যেতে সুশান্ত বোমার মতো ফেটে পড়ে : এটা কি হল শুনি? কাপড়চোপড়ে মুখ ঢেকে কলাবউ হয়ে রইলে—রাস্তায় রাস্তায় ক্যানভাসিং করেছ, সে খবর শ্যামল বুঝি জানে না?

হিমানী বলে, কী করব মুখ না ঢেকে? মুখে যে হাসি! কত চেষ্টা করি, হাসি কিছুতে ছাড়ছে না।

কে এমন বাড়ি বয়ে পয়সা দিতে আসে? এসে অপমানিত হয়ে গেল।

কথা কেড়ে নিয়ে সজোরে ঘাড় নেড়ে উগ্র কণ্ঠে হিমানী বলে, উপকার করে বলেই কি তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে বলো? সে আমি পারব না। কক্ষনো না।

শ্যামলের যা বলবার বাসায় এসেই একরকম বলে গিয়েছিল। অফিসে গিয়ে সুশান্ত সবিস্তারে সব শুনল। শুভ্রা চলবে না, বিস্তর লোকসান হয়েছে। কারবার তুলে দিয়ে চাকরি নিয়ে শ্যামল এলাহাবাদে চলল। একমাসের মাইনে দিয়ে লোকজন সমস্ত বিদায়।

মাথায় হাত দিয়ে বসে সুশান্ত। যত রাগ আর দুঃখ হিমানীর উপর ঝাড়ছে: একা একা ছিলাম দিব্যি। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—জঙ্গুলে রাজ্যে গিয়ে কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে গেলাম। নইলে বিয়ে করার অবস্থা কি আমার! যা বাজার পড়েছে, লক্ষপতি মানুষও বিশবার আগুপিছু করে। মাস্টারমশায়ও লেগে গেলেন, দিশা করতে দিলেন না।

মাথায় হাত দিয়ে পড়েছিল, হাতে স্বর্গ এসে পৌঁছল ডাকের চিঠি ভর করে। রামজয় বিশ্বাস চিঠি লিখেছেন।

তাঁদের শহর আরও জাঁকিয়ে উঠেছে। ভাল ভাল সব হোটেল। উপবন বলতে গেলে কাঁটাবন এখন, খদ্দের বড় একটা আসে না। দিন কতক সেই সুদিন এসেছিল—হিমি যখন ছিল। হিমির রোস্টের নাম হয়ে গিয়েছিল। এখনো লোকে সে জিনিষ ভুলতে পারে নি।

সুশান্তকে লিখেছেন: প্রাণান্তক খাটনি খেটে পরের কারবার বড় করছ তুমি। চলে এসো হিমানীকে নিয়ে। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে? উপবন তোমাদের নামে লেখাপড়া করে দেবো—জিনিসটা চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সহ্য করতে পারিনে। হিমির নামে হোটেল আবার জেঁকে উঠবে। মালিক হয়ে তোমরাই চালাও, বুড়োমানুষ যে ক'টা দিন আছি, চাট্টি খেতে দিও। এই বন্দোবস্ত।

চিঠি বার পাঁচ-সাত সুশান্তর পড়া হয়ে গেছে। হিমানীকেও পড়তে দেয়। বলে, নিজেদের কাজকারবার, নিজেরা কর্তা। চলো হিমানী।

হিমানীও বলে, চলো ভাই—

দুটি প্রাণীর দরিদ্র সংসার—সেদিন দিয়ে বড় সুবিধা। বাঁধাছাঁদার হাঙ্গামা নেই, মালের দরুন মাশুলও বেশি দিতে হবে না রেল-কোম্পানিকে। চিরজীবনের মতন চলে যাচ্ছে, আর কলকাতা ফিরবে না।

যাত্রায় বাধা পড়ে গেল, আকস্মিক দুর্ঘটনা। গিয়েই তো রোস্ট রান্নায় লেগে যেতে হবে—কিছু সড়োগড়ো করে নিচ্ছে হিমানী। মুরগি জুটছে না বলে ফুলকপির রোস্ট। ঘিয়ের বদলে সর্ষের তেল। কলকল করে তেল ফুটছে, তার মধ্যে আস্ত কপি ফেলে দিয়েছে। গরম তেল ছিটকে উঠে সারা মুখে পড়ল। গাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ে, ছোট্ট বয়স থেকে রান্নাবান্না করছে, এত অসাবধান কেন? মুখই বা কড়াইয়ের অত কাছে নিয়েছিল কী দেখবার জন্য?

দুর্গ্রহ কাকে বলে! রাঁধা-কইমাছ গ্রাসের সামনে জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো। প্রাণরক্ষা হল, সুস্থ হতে তবু মাসখানেক। হাসপাতাল থেকে হিমানী যেদিন বেরিয়ে এলো, সুশান্ত মুখের দিকে তাকাতে পারে না। গা শিরশির করে।

হাসতে যায় আজ হিমানী মনের সাধে, সুশান্তকে দেখিয়ে দেখিয়ে। ভয়সঙ্কোচ নেই।

হি-হি হো-হো—প্রাণপণ হাসি! আওয়াজটা বটে হাসির, কিন্তু মুখের উপর হাসির চেহারা কই? পরম উল্লাসে স্বামীর গায়ে ঝাঁকি দেয়: ওগো দেখছ, হাসি মুছে গেছে! নজর ফেলে দেখ, একেবারে কিছু নেই।

স্টেশন থেকে ঘোড়ার-গাড়ি করে উপবনে পৌছল। রামজয় দোতলায় ছিলেন, উঠি-পড়ি নেমে এলেন: কই রে হিমি, কোথায় তুই?

সুশান্তর দিকে চেয়ে হাহাকার করে উঠলেন: এ কোন মুখপুড়ি সঙ্গে করে আনলি, আমার সে হিমি কই?

হিমানী বলে, মুখ পুড়েছে মামামশায়, হাত পোড়েনি। রোস্ট সেই আগেকার মতোই করব। আগের চেয়েও ভাল করব দেখো। খাবে তো রোস্ট, আমার মুখ কেউ খুবলে খুবলে খেতে যাবে না।

তবু রামজয় প্রবোধ মানেন না। খিঁচিয়ে উঠলেন: তোর চেয়ে বামুন-ঠাকুর ঢের ঢের ভাল করবে। চলে যা তোরা। মুখ দেখে কেউ রান্না খাবে না, খদ্দের যে ক'টি আছে তারাও সরে পড়বে।

খাই-খাই

মায়ের ঘরে নীলমণি—মায়ের তক্তাপোশের পাশে। হাতের পাঁচটা আঙুল—কনিষ্ঠা অনামিকা মধ্যমা তর্জনী আর বৃদ্ধ—একটার পর একটা উঁচু করে মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া বলছে। ছড়াটা আজ নতুন শিখেছে:

এইটে বলে, খাবো খাবো—

কনিষ্ঠা থেকে শুরু। কনিষ্ঠা সকলের ছোট কিনা—খিদে পেয়েছে তার, খেতে চাইছে।

এবং পর পর চলল আঙুলদের সকলের কথা:

এইটে বলে, খাবো খাবো—
এইটে বলে, কোথায় পাবো?
এইটে বলে, কর্জ করো—
এইটে বলে, শোধের বেলা?
এইটে বলে, এই কলা, এই কলা!

বেঁটে বৃদ্ধাঙ্গুলি ভারি শয়তান—কর্জ শোধ করবে না, উল্টে কলা দেখাবে।

মুখ-চোখ ঘুরিয়ে মাকে নীলমণি নতুন ছড়া শোনাচ্ছে। কিন্তু হাসে না মেনকা। কড়ে-আঙুল বলে কেন, তার দেহের প্রতিটি রোমকূপ যেন 'খেতে দাও' 'খেতে দাও' করছে।

অথচ এই মেনকা একদিন ভাতের তলে মাছ ঢাকা দিয়ে শাশুড়িকে ফাঁকি দিয়েছে: খেয়েছি মা। তারপর সবসুদ্ধ নিয়ে আঁস্তাকুড়ে ঢেলেছে। আর এই নীলমণির কথা ফোটেনি - বাচ্চা ছেলে, তখন থেকেই না খাওয়ার চালাকিটা শিখে ফেলেছে। ঝিনুক ভরে মুখে দুধ ঢেলে দিয়েছ, না গিলে টাকরার ভিতর রেখে দিয়েছে—আবার ঝিনুক ভরছ, ফুচ করে দুধ ফোয়ারার ধারে বের করে দিল। ঝিকমিকে দাঁত ক'টিতে হাসির কী ছটা তখন!

আজকে রোগের মধ্যে মেনকার স্বপ্ন বলে মনে হয়। এসব সত্যি সত্যি ঘটেনি বুঝি কোনদিন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, খাওয়া হয়ে গেল তোদের?

ঠাঁই হচ্ছে।

আমারও ঠাঁই করতে বল। আমি খাব তোদের সঙ্গে।

হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেল: বলছি তা কানে যায় না বুঝি? ডেকে আন্ তোর বাবাকে।

বলরাম এলে তার উপর মেনকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: স্বার্থপর তোমরা। আমায় উপোসি রেখে আকণ্ঠ এইবারে গিলতে বসবে।

উপোসি কেন থাকতে যাবে তুমি?

আমিও তাই বলি। আর নয়, কোন কথা আজ শুনব না। থালার চারপাশে বাটিতে ভাত-তরকারি খাব তোমাদের কাছে বসে।

মেনকা কাঁদতে লাগল। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলরাম বলে, ডাক্তারে যেমন বলে তাই তো খাবে! অবুঝ হচ্ছ কেন?

ডাক্তারে বলে, জ্যান্ত-মাছ কচি-পাঁঠার ঝোল মাখন আপেল-বেদানা দাদখানি-চালের ভাত। দাও এনে তাই।

এখন আর বলে না। হজমের ক্ষমতা নেই। দুধ খাচ্ছ—দুধের চেয়ে ভাল জিনিস কি আছে বলো।

হজমের যখন ক্ষমতা ছিল তখনো কি খাইয়েছ আপেল-বেদানা-মাখন? বাড়ির গরু পোয়াটাক দুধ দেয়, ছেলেটাকে বঞ্চিত করে দেদার দুধ খেয়ে যাচ্ছি।

বলরাম কি বলবে, চুপ করে থাকে। কথা যা বলছে, একেবারে মিছা নয়।

মেনকা বলে, আমি বাঁচব না—ডাক্তার জানে, তুমিও জান। এখনো তবু খেতে দেবে না। না খেতে দিয়ে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে চাও। তুমি খুনে।

বলরামের মুখেও শক্ত কথা এসে গিয়েছিল, সামলে নিল। বলে, জুটিয়ে নিয়েছ রাজব্যাধি, কিন্তু আমি যে রাজা নই। যা-কিছু ছিল, একে একে সমস্ত গেছে। তিরিশ বিঘের এমন চকটাও বিক্রি করে দিলাম। এর পরে তুমি যদি যাও, আমরাও তো পিছু পিছু আসছি। থাকব কি খেয়ে? ছেলে যাবে, আমিও যাব—দুনিয়ার উপর কেউ আমরা বেঁচে থাকছিনে। হিংসার কিছু নেই মেনকা।

মেনকা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল: ব্যাধির খোঁটা দিলে। কিন্তু কাদের জন্য এই ব্যাধি, জিজ্ঞাসা করি। বিয়ে হয়ে বাপের বাড়ি থেকে এলাম—শাশুড়ি বললেন, পাথুরে বউ এনেছে, মাটিতে শুবি তোরা, বউয়ের ভারে তক্তাপোশ ভেঙে পড়বে। সেই মানুষ শুকিয়ে আজ কঞ্চিখানা। নিজে না খেয়ে সারা জন্ম তোমাদের খাইয়ে এলাম। বিদায় হয়ে যাচ্ছি, একটা বেলাও তবু সাধ মিটিয়ে খেতে দেবে না। উঠতে পারিনে দেখতে পারিনে সেই জন্যে বড্ড মজা! নিজেদের অষ্টব্যঞ্জন সাজিয়ে রেখে ডাক্তারের দোহাই পাড়তে এসেছ। আজ আমি কিছুতে শুনছিনে, তোমাদের ঐ বাড়া-ভাত কেড়েকুড়ে খেয়ে নেবো—

শয্যা থেকে উঠতে গিয়ে মেজের উপর পড়ে গেল। গলগল করে রক্ত—এত রক্ত শুকানো দেহটুকুর মধ্যে! রক্ত দেখে ডর লাগে, বলরাম থরথরিয়ে কাঁপছে। মানুষজন ডাকবে, তা-ও অনেকক্ষণের মধ্যে পেরে ওঠে না।

মেনকা মারা গেল। মেজেয় চাপ-চাপ রক্ত, তারই উপর বাসি-মড়া পড়ে আছে একটা বেলা এবং পুরো এক রাত্রি। ডাক্তার সতর্ক করে দেন: এ ব্যাধি বিশ্রী রকমের ছোঁয়াচে। শ্মশানে যাবার আগে নিজেদের দিকটা

সকলে ভেবে দেখো। মড়া ভাল করে জীবাণুমুক্ত হয় যেন। পুড়ে কয়লা হয়ে গেলে তবে নিশ্চিন্ত।

শ্মশানে যাবে বলে যারা কোমর বাঁধছিল, এমন কথার পরে তারা পিছিয়ে পড়ে।

বলরাম বলে, কুছ পরোয়া নেই। জীবাণু মারতে কি কি লাগবে, প্রেসক্রিপশন করে দিন ডাক্তারবাবু। এত টাকা আপনাদের খাওয়ালাম, শেষটুকুতে বঞ্চিত করব না।

আচার্যিঠাকুর পাঁজি দেখে ইতিমধ্যে নতুন এক বাগড়া তুললেন : মড়া তিনপা্ দোষ পেয়েছে। তা ছাড়া এই রকম দীর্ঘকালের যাপ্য ব্যাধিতে মরা মহাপাতকের ফল। শান্তিস্বস্ত্যয়নে সেই পাতকের খণ্ডন করে তবে মড়া বাড়ির বার হবে। নয়তো গ্রামসুদ্ধ লোক সঙ্গে টানবে কিন্তু। যারা ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে, তাদের ঘাড় ভাঙবে সকলের আগে।

উঠতে গিয়ে যে মানুষটা আছাড় খেয়ে মারা গেল, মরার সঙ্গে সঙ্গেই তার এমন দৈত্যসম প্রতাপ, বলরাম বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। তবু বলে; ফর্দ করে দিন ঠাকুরমশায়। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। এতই হল তো স্বস্ত্যয়নও বাকি থাকবে না।

নেশাখোর রঘুপ্রসাদ উদয় হল এর মধ্যে। বলরামকে এক পাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলে, শুনেছি সব দাদা। ঘরের ভিতরে মড়া রয়েছে বলে শেয়াল-শকুনে নাগাল পায়নি, এরাই সব ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। ওদের তালে যেও না—অষুধে আর স্বস্ত্যয়নে যা পড়বে, তার সিকি আন্দাজ ছাড়ো। কলের মতো কাজ হয়ে যাবে।

বলরাম বলে, বুঝিয়ে বলো।

বলি, ডাক্তার আর আচার্যিঠাকুর ছাড় করে দিলেই মড়া অমনি পায়ে হেঁটে চিতায় উঠবে না। তার পরেও খরচা আছে। সেই খরচটা আগে করতে বলি। কিছু দরাজ হাতে।

চোখ টিপে বলে, শিবের জটা নয়—জটার উপরে মা-সুরধুনী বর্তমান, সেই পর্যন্ত উঠতে হবে। জটা বুঝলে না, কী মুশকিল! ইকড়ি-মিকড়ি চামচিকড়ি, কলকেয় সেজে চড়-চড়-চড়াৎ—যার অন্য নাম গাঁজা। গাঁজায় হবে না। সুরধুনী, যিনি শিবের জটা ছেড়ে বোতলে ঢুকেছেন, তারই দুটো এনে দাও দাদা। কোমরে গামছা বেঁধে চারজনে চলে আসি। বল হরি, হরিবোল! খাটিয়া দাও কি বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে বল—চক্ষের পলকে নির্গোলে চালান হয়ে যাবে।

এমন সুবিধা পেয়ে কে ছাড়ে! বলরাম বলে, কথা পাকা। একটুখানি কেবল সবুর করতে হবে।

অধীর রঘুপ্রাসাদ বলে, কাল দুপুর থেকে দরাদরি চলছে। মড়ায় মাছি পড়ছে, গন্ধ হয়ে গেছে। আরও সবুর করলে হাত-পাগুলো খসে খসে আসবে যে!

বলরাম বলে, দেরি বেশি হবে না। গাইগরুটা দিয়ে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা ক'টা নিয়ে আসা।

রঘুপ্রসাদ অবাক হয়ে বলে, গাইগরু বেচে দিচ্ছ দাদা?

আর কিছুই নেই—কী বেচব বলো? ডাক্তার-বদ্যিতে সাফ করে নিয়েছে, যম এসে শেষটা প্রাণটুকু নিয়ে নিল। গাইগরু রয়ে গেছে রোগির জন্য দুধ দিত বলে। মেনকা আর তো দুধ খেতে আসবে না, গরু তবে কোন কাজে লাগবে?

রঘুপ্রসাদ বলে, তিনি না থাকুন, ছেলে তো রয়েছে। নীলমণি দুধ খাবে। গরু বেচতে হবে না দাদা, দু-আনার জটাজালের ব্যবস্থাই হোক। সে পয়সা না জোটে, আমরা চার সাঙাত চাঁদা করে তুলে নেবো।

ততক্ষণে বলরাম গাইয়ের দড়ি হাতে নিয়েছে। বলে, শুধু একপোয়া দুধে ছেলে বেঁচে থাকবে না। গরু বেচতেই হবে আজ হোক কিম্বা কাল হোক। তবে কেন আজকে নয়? এত জাঁকজমকের চিকিচ্ছের শেষ একেবারে নিরম্বু হলে মানাবে কেন?

শ্মশানে কাজ চুকেবুকে গেল। গিয়েছিল মোট সাত—মেনকাকেও হিসাবে ধরতে হবে। ফেরার কথা ছ-জনের। রঘুপ্রসাদরা চার, এবং বাপ-বেটা দুই। গণে দেখ, ঠিকঠাক ফিরছি তো বটে?

আকাশ মেঘে থমথম করছে। অন্ধকার। দেখ দিকি, কাউকে বউঠান দোসর করে রেখে দিল কিনা? আছিস নীলমণি—মা তোকে তো বড্ড চোখে হারাত। সাড়া দে, কথা বলতে বলতে হাঁটু—বোবা হয়ে গেছিস যে একেবারে! নাম ধরে কাঁহাতক ঠাহর করা যায়, গণে ফেল সকলকে—'কয় শুভঙ্কর মজুত গোণো'।

চিতার আগুনের পাশে কাজের উত্তেজনায় এতক্ষণ রঘুপ্রসাদ চাঙ্গা ছিল, ফিরতি পথে এইবার সুরধুনীর গুণ দেখা দিয়েছে। গণনায় পাঁচ হল।

কে গেল? দেখ দিকি হিসাব করে—

অন্য একজন গণে। অবস্থার ইতরবিশেষ হয় না—পাচই বটে। নীলমণির

হাত ধরে বলরাম অন্যমনস্ক ভাবে আগে আগে চলেছে, পিছন তাকিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল : নিজেকে বাদ দিয়ে গুণছ যে তোমরা।

আরও পরে বলরামেরও এক সময় সন্দেহ আসে : পাঁচ না হোক, ছয়ও নয়—গোড়াকার সেই সাত পুরোপুরি। বাড়ির কাছে আমবাগানের মধ্যে পুকুরঘাটে এসে বসেছে তখন। জিরিয়ে নিচ্ছে। মাথার উপরে বড় বড় ডালপালা, আরও উপরে মেঘান্ধকার আকাশ। পাশাপাশি বসেছে, কিন্তু পাশের মানুষটাও ঠাহরে আসে না।

শ্মশান থেকে বাড়ি ঢুকবার মুখে রীতকর্ম আছে। স্নান করে সেই কাজগুলো সেরে যেতে হয়। জিরিয়ে গায়ের ঘাম মেরে ঝুপঝুপ করে এই-বারে সব জলে পড়বে। ছ-জন তো হওয়া উচিত, কিন্তু পিছন দিকে ফোঁস করে আবার'কে নিশ্বাস ফেলল?

চমকে ওঠে বলরাম, দু-চোখের সকল দৃষ্টি পুঞ্জিত করে দেখে। আশশ্যাওড়ার ঝোপজঙ্গলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেছে, খাঃ—খাঃ—খাঃ—খাঃ এমনি ধরনের একটু আওয়াজও কানে পাওয়া যায়। বুঝি মেনকা চিতার আগুনেও পুড়ল না—কাঁধে চড়ে গিয়েছিল, অলক্ষ্যে পিছু পিছু এসে মৃত্যু-সময়ের মতো খাওয়ার কথাই বলছে।

আতঙ্কে বলরাম চেঁচিয়ে ওঠে : কে তুমি? কে, কে?

বলরাম হেসেছিল ওদের গণনার সময়, এবারে রঘুপ্রসাদের পালা। হাত বাড়িয়ে ঘুসি দিল বস্তুটার গায়ে। নেড়িকুকুর ঠাঁই নিয়ে আছে, কেঁউ-কেঁউ করে পালাল। হেসে সকলে লুটোপুটি খায়। দেখাদেখি বলরামও হাসে। কিন্তু হাসি কি জন্যে? মরে ভূতপেত্নী হয়ে নানান মূর্তি ধরে—কুকুরই বা কেন হতে পারবে না?

স্নান করে উঠে ভিজা কাপড়ে শ্মশান-যাত্রীকে লোহা ছুঁতে হয়। বিদেহীর লোহাকে বড় ভয়। উচ্ছেপাতা বা অমনি কোন তিতো জিনিষ চিবিয়ে মুখ বিস্বাদ করতে হয়। এত প্রক্রিয়ার পর মরা-মানুষ তবে সঙ্গ ছাড়ে।

কিন্তু মেনকার বেলা কোন-কিছুই খাটল না। বাড়ির বউ বাড়িতেই ফিরেছে—এসে দিনরাত খাই-খাই করে বেড়ায়। চোখে না দেখেও বলরাম অনুভবে বোঝে।

একেবারে দেখে নি, তাই বা বলা যায় কেমন করে? ভূতচতুর্দশীর নিশিরাত্রে ভাঁড়ারঘরের দরজার সামনে ছায়ার মতন দেখেছিল। তালাবন্ধ ছিল তাই রক্ষে, নইলে পরের দিনের পূজাসামগ্রী—মুড়কী-তালশাঁস-নারিকেলনাড়ু সমস্ত বোধহয় শেষ করে যেত। দুপুরে খেতে বসলে রান্নাঘরের

বেড়ার উপর চোখ দুটো রেখে একদৃষ্টে খাওয়া দেখে— অমন লোভী দৃষ্টি পড়ার পর ভাত হজম হয় কখনো? জ্বালাতন করে মারল। আর একদিন— ঝড়বাদলে দুর্যোগময় সে দিনটা—দরজার উপরে কী ধাক্কাধাক্কি! ব্যাপার হল কিনা—নীলমণির জন্মদিন বলে পায়েস রান্না হয়েছে।

বাড়ি-ঘর বাগান-পুকুর যেদিকে তাকানো যায়—মেনকার দেখাদেখি খাই-খাই করছে সবাই মিলে। গরু বিক্রির টাকা ফুরিয়ে এল, সামান্য অবশেষ। বলরাম একদিন সমারোহে রান্নাবান্নার আয়োজন করল। মাছই দু-তিন রকমের, পায়েস, মাছের মুড়ো দিয়ে কচুশাকের ঘণ্ট (মেনকার প্রিয় তরকারি– মাছের মুড়ো এলেই বাগানের কচুশাক তুলে ঘণ্ট রাঁধত)। বড় থালায় পরিপাটি করে ভাত বেড়ে চারিপাশে বাটি সাজিয়ে সন্ধ্যার পর ছড়কোর পাশে পথের উপর রেখে এল। গেলাসে জল, বাটায় আস্ত পান কাটা-সুপারি চুন-খয়ের।

কলকাতায় চলে যাবে পরমাত্মীয় দিব্যনাথ রায়ের ওখানে। তার আগে খাক এসে মেনকা—সাধ মিটিয়ে খেয়ে যাক।

রাত দুপুরে নেশাখোর রঘুপ্রসাদ এই পথে যাবার সময় হাঁকডাক করে বলরামকে জাগিয়ে তুলল।

থালা বাটি-গেলাস ছড়কোর ধারে ফেলে রেখেছ দাদা, দেখতে পেলে চোরে নিয়ে যাবে।

বলরাম উঠে এসে পরমানন্দে বাসন তুলে নেয়। বাটায় পান ও গেলাসে জল পড়ে আছে, তা ছাড়া বাকি সমস্ত চেটেমুছে শেষ করে গেছে।

রঘুপ্রসাদ বলে, শিবাপুজো নাকি তোমার বাড়ি? আমায় দেখে শিয়াল পালিয়ে গেল। কিন্তু কাঁসার থালা-বাটি কে কবে শিবা-ভোজনে দিয়ে থাকে!

শিবাপুজোর অনুষ্ঠানে সন্ধ্যার আগে বনের ধারে গিয়ে শিয়ালকে সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। এখানে কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে এসে পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে গেল। মানুষই ক্ষিধের জ্বালায় কুকুর-শিয়াল হয়ে যায়— পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কাগজে একটা ছবি দেখেছিল বলরাম, মানুষে আর কুকুরে ডাস্টবিন থেকে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। জ্যান্ত মানুষই পারে তো ভূতপেত্নী শিয়ালের মূর্তি ধরে খাবে, এটা অসম্ভব কিসে?

বেরিয়ে পড়ল বাপ আর ছেলে। কলকাতা শহরে এক পরমাত্মীয় আছেন—দিব্যনাথ রায়। মস্ত বড়লোক। পুঁটলি করে কিছু চাল-ডাল বেঁধে নিয়েছে সেকালে, রেলগাড়ি হবার আগে, জগন্নাথক্ষেত্রের তীর্থযাত্রীরা

যেমন নিয়ে যেত। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা গ্রাম অবধি চেনা মানুষ—যাকে পায়, খবরটা শুনিয়ে দেয়ঃ কলকাতা চললাম। মন খারাপ, বুঝতেই পারছ। ছেলেটা কান্নাকাটি করে। যাই, বেড়িয়ে আসিগে।

দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে সকলে আনন্দ জানায়ঃ বেশ বুদ্ধি করেছ। কলকাতা ভাল জায়গা। দুটো দিনেই মন ঠিক হয়ে যাবে।

বলে আর নিশ্বাস চেপে নেয়। বলরাম মানুষটাকে ভগবান কত দিয়েছেন না জানি। বউয়ের রাজসূয় চিকিৎসা চালাল দুটো বছর ধরে। সে লেঠা চুকল তো বাপেছেলেয় শহরে যাচ্ছে। কত সব দেখবার জিনিস—হাওড়ার-পোল থিয়েটার চিড়িয়াখানা মরা-সোসাইটি। বড় বড় দালানকোঠায় সুখের পায়রা হয়ে বকম-বকম করতে চলল।

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি—

খেয়ানৌকা ওপারে। একেবার পারে গিয়ে পড়েছে, মানুষ না পেলে ফিরবে না। বলরাম কাতর হয়ে ডাকাডাকি করছেঃ চলে এসো মাঝি ভাই। ক্ষিধেয় ছেলেটা নেতিয়ে পড়ছে। স্টেশনে গিয়ে উঠতে পারলে এখন বাঁচি।

অবশেষে দয়া হল মাঝির। নৌকা এপারে এনে বলে, যাবে কোথা?

বললাম তো, স্টেশনে।

তারপরে? হিল্লিদিল্লি, না ঝিঙেডাঙার গঞ্জ অবধি? সাঁজের বেলা খেয়াঘাটে এসে আবার এমনি দিগদারি করবে তো?

বলরাম সগর্বে বলে, সাঁজের বেলা নয়, কাল নয়, পরশুও নয়। কবে ফেরা হবে, এখন বলা যায় না। কোনদিনই নয় হয়তো। যাব কলকাতা।

খেয়ামাঝির চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে।

বলরাম বলছে, সোনাইছড়ির দিবোদাসকে জানতে মাঝি? সম্পর্কে ভগ্নিপতি হয়। জানতে বইকি—গঞ্জের মাল গস্ত করে তোমার নৌকোয় কতদিন পার হয়েছে। ব্যাপারবাণিজ্যে ফেঁপে উঠে কলকাতা শহরে সে একজন লাটবেলাট। বিপদের কথা শুনে অবধি বোন ক্রমাগত লিখছেঃ ছেলেটাকে নিয়ে চলে এসো। ভাবছি, মায়ের অভাবে দেখাশুনোর কেউ নেই। তেমন যদি চাপাচাপি করে পিসির কাছেই রেখে আসব।

ঘাড় নেড়ে মাঝিও সায় দেয়ঃ রেখেই এসো বলরাম। কলকাতা যে সে জায়গা! কল ঘোরালে জল, কল টিপলে আলো। এক বছর দু-বছর বাদে নিজের ছেলে বলে তুমিই চিনতে পারবে না।

বলরাম হেসে বলে, যা বললে মাঝি—আমার ভগ্নিপতির ব্যাপারে তবছ কিন্তু ভাই। ঝিঙেডাঙার গুদাম থেকে কেরোসিনের টিন ঘাড়ে করে খেয়াপার হত—এখন শুনি, পরনের কাপড়খানা হাতে করে তুলতে গেলে দুটো চাকর দু-দিক দিয়ে ছোঁ মেরে কাপড় নিয়ে চানের জায়গায় পৌঁছে দেয়। নাম অবধি বদলেছে—দিবোদাস গুঁই গিয়ে দিব্যনাথ রায়।

পার করে দিয়ে খেয়ামাঝি ভাড়ার জন্ম হাত পাতল: দুটো পয়সা দু-জনের পারানি।

একফোঁটা ছেলে, ওর আবার পারানি! ওর পয়সাটা মাপ করে দাও।

পেট যে মাপ করে না। পাকা-হত্তুকি পেতাম একটা—,তাহলে দু-জনের দুটোই মাপ করে দিতাম। দয়াময় বলে নাম হয়ে যেত।

(পাকা-হরিতকী খেলে নাকি ক্ষুধা-তৃষ্ণা চিরকালের মতো ঘুচে যায়। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় সে বস্তু—কাঁচা অবস্থায় হরিতকী ঝরে পড়ে। মানুষ কত কি করছে—এমন-কিছু পারে না ডালে ডালে যাতে হরিতকী-ফল পেকে থাকে? পেটের দায়ে নিশ্চিন্ত—দুনিয়া তাহলে কত সুখের হত!)

শহর কলকাতা। মুগ্ধ নীলমণি বলে, ও বাবা, কত মানুষ এখানে! রথের মেলা লেগেছে বুঝি?

বলরাম সহাস্যে বলে, এ শহরে নিত্যি রথের মেলা। বারো মাস, চৌপহর দিন। চলে আয়—

কয়েক পা গিয়ে নীলমণি আবার থমকে দাঁড়ায়: বাবা কত সব গাড়ি! এক, দুই, তিন—

গর্ব ভরে বলরাম বলে, এই ক'টা দেখেই তাক লেগে গেল! চল্ এগিয়ে, কত শত দেখবি।

গণে গণে বত্রিশ অবধি উঠেছে। কিছু বিরক্ত হয়ে বলরাম বলে, পা চালিয়ে চল্ রে বাবা। কত গণবি, তোর ধারাপাতে কুলোবে না। আকাশের তারা পাতালের বালির মতো—গণে পারা যায় না।

এতক্ষণে নীলমণিও বুঝেছে সেটা। গণা অসম্ভব। প্রশ্ন করে, গাড়ি চড়ে এত মানুষ যায় কোথা বাবা?

বহুদর্শী বলরাম বলে, কাজকর্মে যায়, বিনি কাজেও ঘুরতে যায়। টাকার মানুষ হাঁটতে পারে না তো—

খোঁড়া?

পায়ে হাঁটা ছোট কাজ। আমরা হাঁটি আবার বড়লোকেও যদি

হাঁটবে, তফাতটা রইল কোথা? টাকা হলে আমরাও কি হাঁটতে যাব, রাস্তার এপার-ওপার হতে গাড়ি। আজকে হাঁট্—পা চালিয়ে হাঁট্ রে বাবা। উল্টোডিঙি কি এখানে?

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। রাত্রিবেলা চারিদিক আলো-আলো হয়ে শহরের নতুন বাহার। মানুষগুলোর চেহারাও বুঝি পালটে যায়। দিনমানে ছিল কাজকর্মের মানুষ, এখন উল্লাসের। সেজেগুজে হাসি ছড়াতে ছড়াতে চলেছে দেখ।

সেই মায়া-জগতের ঝলমলে রাস্তা ধরে দূর-পাড়াগাঁয়ের মানুষ বলরাম নীলমণিও যাচ্ছে। একটা বড় সুবিধা, ছিন্নবেশে এবং নগ্নপায়ে পথ হাঁটতে মানা নেই। এমন কি কলের জলও যত খুশি খাওয়া যায়, সেজন্য পয়সা দিতে হয় না। এত বড় শহর জায়গায় এই তো অনেক।

হাঁটছে দু-জনে। নীলমণি ঘ্যান ঘ্যান করছে: ও বাবা, খেতে দাও কিছু। ক্ষিধেয় পা ভেঙে আসছে, হাঁটতে পারিনে।

এই তো জল খেলি একবার। আরও খানিকটা না হয় খেয়ে নে। বড়লোকের বাড়ি—গেলেই তো খেতে নিয়ে বসাবে। এটা-ওটা খেয়ে পেট ভরতি করলে লোকসান।

কিন্তু পথ চিনে উল্টোডিঙিতে যাওয়া রাত্রের মধ্যে ঘটে উঠল না। একবাড়ির রোয়াকে পড়ে ছিল। সকালবেলা গিয়ে পৌঁছেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের লোক—সদর-অন্দরের তফাত বোঝে না, 'দিদি', 'দিদি' করে একেবারে ভিতর-উঠানে।

আমার দিদি হয় গো—বড়-মাসিমার মেয়ে। বাইরের লোক নই আমরা। ও দিদি, অমন করে কি দেখছ? আমি বলরাম, এই আমার ছেলে।

এত পরিচয়েও দিদি ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে থাকেন। আশ্চর্য বটে! টাকা হলে লোকে শুধু খোঁড়াই হয় না, কানাও হয়। টাকার দোষ বিস্তর।

আমি বলাই গো, যেটা বললে চিনবে। তোমার বিয়ের ভোজের মাছ ধুতে গিয়ে পুকুরঘাটে আছাড় খেয়েছিলাম—কপালের উপর এই যে দাগ এখনো আছে। দেখ।

দিদি এতক্ষণে চিনলেন মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কি মনে করে?

প্রশ্নের ধরনে বলরাম ঘাবড়ে গেল। আপনজনের কাছে বউয়ের মৃত্যুর কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলবে। এবং দিদিই তখন প্রস্তাব করবেন—বাঁধন কেটেছে তো থেকে যাও এখানে দিনকতক। যাবার সময় ছেলেটাকে বরঞ্চ

রেখে যেও। শহরে আমোদ-স্ফূর্তিতে থাকবে, মরা-মায়ের কথা মনে পড়বে না তার। এদের এলাহি ব্যাপারের মধ্যে একটি দুটি মানুষের কম-বেশিতে যায় আসে না কিছু, খোঁজই হবে না। দিদির এ হেন কথার কি জবাব হবে, তা-ও বলরাম ভেবে এসেছে—

কিন্তু গোড়াতেই সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

ছেলের হাত ধরে কলকাতা অবধি ধাওয়া করেছ, ব্যাপার কি বলাই?

বলরাম আমতা-আমতা করে বলে, সর্বনাশের কথা চিঠিতে সবই লিখেছি দিদি। ঘরে মন টিঁকল না—ভাবলাম, আত্মীয়জনদের দেখেশুনে আসি।

এখান থেকে আর কোথায় যাচ্ছ?

প্রশ্ন করে জবাব আসার আগেই দিদি অলক্ষ্য কার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে উঠলেন: ছেলেমানুষটা এসেছে—শুধু-মুখে চলে যাবে, জলটল দে কিছু খেতে।

সঙ্গে সঙ্গে পুনরপি প্রশ্ন: যাচ্ছ কোথা এখন?

খুঁজে খুঁজে এই কষ্ট করে এলো, ধুলোপায়েই যে বিদায় করতে চায়। মরীয়া হয়ে বলরাম বলে, এ বেলাটা থেকে যাব দিদি।

এখানে? সে তো ভাল কথা, চমৎকার কথা—

দিদিও হকচকিয়ে গেছেন। শহরের মানুষ হলে এত সোজাসুজি বলত না, লাগসই উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

বললেন, কত কাল পরে দেখা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের অবস্থা—

বলরাম চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাল বই খারাপ তো কিছু নজরে আসে না। উপরে নিচে ব্যস্তসমস্ত ঝি-চাকরের দল এঘর থেকে ওঘর থেকে প্রাতরাশের উচ্ছিষ্ট বাসন কলতলায় এনে গাদা করছে। সরকার বাজারের ঝুড়ি একটা লোকের মাথায় দিয়ে দালানে এনে নামাল। ঝি একজন ছুটে এসে বঁটি পেতে মাছ কুটছে। উপর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের হুকুম: খান চারেক মাছ ভেজে শিগগির দিয়ে যাও ঠাকুর। উত্তম সাজগোজের ক'টা বাচ্চা ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়ি করছে বারান্দার উপর—

এই প্রহর দেড়েক বেলায় ধনীর বাড়ির অন্দরমহল যেমনধারা গমগম করবার কথা, ঠিক তেমনি।

মুখে তবু যথাসম্ভব উদ্বেগের ভাব এনে বলরাম প্রশ্ন করে, হয়েছে কি দিদি?

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখগে। তোমার ভগ্নিপতির মাড়ি ফুলে ঢোল। কাল থেকে মুখে কুটোগাছাটি কাটছেন না।

কিন্তু সেই মানুষটির দরদে বাড়ির অন্য সকলেও যে অনাহারে পড়ে

আছে, সে ব্যাপার নয়। উল্টোটাই বরঞ্চ। তবু শশব্যস্তে যেতে হয় ঘরের মধ্যে মাড়ি ফুলিয়ে ভগ্নিপতি যেখানে বসে আছেন। বলরাম আর নীলমণি ঢপঢপ করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করল।

মাড়ি ফুলুক যাই হোক, কথার বিন্দুমাত্র অকুলান নেই। কেরোসিন-টিন ঘাড়ে বয়ে আনতেন, সেই থেকে কী করে এত বড় ডিপো গড়লেন তারই আনুপূর্বিক কথা। সেকালের দরিদ্রদশা যারা দেখেছে, তাদেরই একজনকে পেয়ে দিব্যনাথ শতমুখ হয়ে গেছেন। আঙুল ফুলে কী করে কলাগাছ হল, সেই বিস্তৃত কাহিনী।

কলকাতায় এসেও দিবোদাসের কেরোসিন বেচা-কেনা। ডিপো থেকে ছুটো টিন কিনে ছু-হাতে ঝুলিয়ে ঘোড়ার-গাড়িতে তুলছেন। গায়ে মাত্র গেঞ্জি, চেহারাটা বড ভাল—বোঝার ভারে পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। কোম্পানির সাহেব সেদিন ডিপোয় এসেছে কি কারণে, দিবোদাসকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিল। ক'দিন যাতায়াত সেই অফিসে। এক মেম-সাহেব ছিল সেখানে, তার সঙ্গেও জানাশোনা হয়ে গেল। সাহেব বলে দিল খালের ধারে একটা ঘরভাড়া কর তুমি, তারপর যা করতে হয় বলব। মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় এক খোপ টিনের ঘর নিলেন এই উল্টোডিঙিতে। মাস গেলে সেই পাঁচ টাকার কি উপায় হবে, ভেবে পান না। সেই কথা মেম-সাহেবকে কায়ক্লেশে বোঝালেন বাঙাল টানের কথার মধ্যে গোটা পাঁচ-সাত ইংরেজি কথা ঢুকিয়ে। মেম-সাহেব খুকখুক করে হেসে পাঁচটা টাকা টেবিলের উপর রেখে বলল, ভাড়া চুকিয়ে দাওগে যাইন, সাহেবকে আমিও বলব। কার বলার গুণে জানি না, ডকের গুদাম থেকে সাহেব পুরো এক নৌকা মাল পাঠিয়ে দিলেন উল্টোডিঙির ঘরে। এবং খদ্দেরও সেই মালের পিছু পিছু। এমনি চলল। এই সময় লড়াইটা বাধল ভাগ্যক্রমে। বাজারে কেরোসিন অমিল। দিবোদাস সেই মওকায় দিব্যনাথ হয়ে গেলেন, গুঁই পদবি গিয়ে রায়।

বলতে বলতে হঠাৎ দিব্যনাথ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন: হলে হবে কি, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পুরানো জানা-শোনার মানুষ বলে তোমাকেই শুধু বলতে পারছি। টাকা চোখে দেখতে পাইনে। এত লোকজন ঠাটবাট কুলিয়ে উঠতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে কাঁধে মাল বয়ে ব্যবসা করতাম, সেই বোধহয় ভাল ছিল। এত অভাব-অভিযোগ ছিল না। দাঁতের যন্ত্রণায় কাল যেতে পারিনি, সকাল থেকে এক-শ গণ্ডা টেলিফোন। মরতে মরতেও আজ বেরুতে হবে, না হলে উপায় নেই।

বানিয়ে বানিয়ে দুঃখের কাঁদুনি গাইছেন, মনে হয় না। এত বড় ডিপোর মালিক, এত ধনদৌলত বাড়ি-গাড়ি—অভাবের তবু অবধি নেই। মানুষের টাকা যত বাড়ে, পেটও বড় হয় বুঝি সঙ্গে সঙ্গে। তিরিশ বিঘের চকটা যে নেই—বৃত্তান্ত শুনে এদের অনটনের সংসারে কিছু দিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে বলরামের।

দিব্যনাথ আবার বলেন, ভাল লাগে না সত্যি বলছি বলাই। কাশীধামে বিশ্বনাথ-গলির কাছে ঠিক গঙ্গার উপর একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। দরাদরি হচ্ছে—বাড়িটা পেয়ে যাই তো বাবা বিশ্বনাথের পদতলে গিয়ে পড়ব। চিরকাল খাটব নাকি? পেরেও উঠছিনে আর।

ঠিক বলরামেরই দোসর। খাই-খাইয়ের তাড়নায় বলরাম এসেছে কলকাতা, আর উনি পালাতে চান কাশী। মানুষের উপায় নেই একমাত্র পাকা-হরিতকী ছাড়া। দীর্ঘ কথাবার্তার ফলে বলরামের মোটের উপর একটা লাভ—অনেকখানি দেরি করিয়ে দিলেন। অবস্থা যত নিদারুণই হোক, অন্তত দুপুরবেলাটা না খাইয়ে দিদি ছাড় পাচ্ছেন না।

খাওয়ার পর বিশ্রামের নামে বলরাম চোখ বুজে পড়ল। সন্ধ্যাটা পার করে দেবে ভেবেছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু বলরামেরই সম্পর্কে দিদি হন তো—তিনি আরও সেয়ানা। এসে পড়ে গা ঝাঁকাচ্ছেন। এমন ঝাঁকুনি—মরে গেলেও লাফিয়ে না উঠে উপায় নেই। বলছেন, কত আর ঘুমোবে বলাই? বেলা পড়ে গেল। সেই যে কোথায় যাবার কথা, কখন যাবে?

বলরাম ধীরে-সুস্থে উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে।

দিদি বিষম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন: ডিপোর লোকেরা এইবারে এসে পড়বে। তারা থাকে এই ঘরে, এসব তাদের বিছানা। উঠে পড়—বিছানা ঠিকঠাক করে রাখুক। মগচটা মানুষ সব, বিছানা জুড়ে শুয়ে আছ দেখলে আগুন হবে।

বেরিয়ে না পড়ে অতএব উপায় নেই। শহরের মানুষ আর কোথায় কে জানা আছে, ভ্রূকুঞ্চিত করে বলরাম ভাবতে লাগল।

আরও চার-পাঁচটা দিন বোধহয় গেছে। রাস্তায় রাস্তায় এখন। নীলমণি হু-পা করে যাচ্ছে, আর থমকে দাঁড়ায়। বলরাম খিঁচিয়ে ওঠে: কি হল রে?

শহরের শোভা দেখছে না আজ। গাড়ি গণছে না। কেঁদে বলে, খিদে পেয়েছে, খাবো—

খিদের নাম শুনে বলরামেরও পেট চোঁ-চোঁ করে উঠল। বিকৃত মুখে

বলে, সকালে ক্ষিধে দুপুরে ক্ষিধে সন্ধ্যেয় ক্ষিধে রাত্রে ক্ষিধে—পাকা-হত্তুকি ছাড়া রাক্ষুসে ক্ষিধে ঠেকানো যাবে না। নেই কিছু, কোথায় পাবো ?

খাবারের দোকানের কাচের দিকে আঙুল দেখিয়ে শিশু বলে, ঐ যে কত সব রয়েছে।

আমার বাপের দোকান কিনা, চাইলেই অমনি দিয়ে দেবে! চল্, চল্—

পারছি নে আর বাবা। খেতে দাও।

বলরামের হঠাৎ যেন অসুরের শক্তি আসে দেহে। হাঁটতে পারিনে বলে নীলমণি যত কাঁদে, ততই সে পায়ের জোর বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত শিশুর কবল থেকে ছুটে পালাবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যেমন পালিয়েছে। মরা-বউটার হাত থেকে যেমন পালিয়েছে। নীলমণি যত পিছিয়ে পড়ে, স্ফূর্তি ততই বাড়ে। আরও জোর দেয়।

দূরে পড়ে গিয়ে ছেলে এখন মর্মান্তিক চেঁচাচ্ছে : খেতে দাও ও বাবা, খাবো, খাবো—

শিশু তাড়া করেছে, প্রেতিনী মা যেমনটা করে তুলেছিল। পায়ের জোর না থাক, গলার জোরটা বড় ভয়ানক। ছুটছে বলরাম এই কলকাতার রাস্তার উপরে যতখানি সম্ভব। প্রাণের দায়ে ছুটছে যেন। বাদাবনে বাঘের তাড়ায় কাঠুরে যেমন ছুটে পালায়। বেঁচেও যেত ঠিক। খানিকটা দূরে ডাইনের গলিটা নিরিখ করে নিয়েছে, সাঁ করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ত। শিশুর বাপের ক্ষমতা ছিল না, অলিগলির মধ্যে খোঁজ করে ধরবার। কিন্তু দুর্দৈব—

সিনেমা ভেঙে মেয়েদের একটা দল মাঝখানে পড়ে গেল। কলহাস্যময়ী। বাতাস হাসির উচ্ছ্বাসে আর অঙ্গের সুবাসে ভরেছে। উঁচু পাহাড় কিম্বা দুস্তর নদী হঠাৎ যেন বলরামের পথ আটকে দিল। পেরে উঠল না—নীলমণি আবার এসে পড়েছে।

খাবো খাবো—ও বাবা, খেতে দাও। বাবা গো—

শরীরটা বলরামের হঠাৎ বিষম ভারী লাগছে। দশমনি বিশমনি পাথর যেন একখানা, নড়ানো যায় না। অসহায়ের মতো পিছন দিকে তাকায়। খাবো খাবো—করে দুর্বার নিয়তির মতো একফোঁটা ছেলে তেড়ে আসছে। দূরত্ব ক্রমেই কমছে। কাছে, একেবারে কাছে এসে পড়ল—'বাবা' বলে দু হাতে জাপটে ধরবে এইবার।

মাথার মধ্যে বনবন করে কেমন যেন পাক দিয়ে ওঠে। ছুটে এসে কঠিন মুঠিতে ধরল নীলমণিকে। ঠ্যাং দুটো ধরে উঁচু করেছে। ছেলে আর্তনাদ

করে ওঠে। কতটুকু বা সময়! উঁচু করে তুলে আছাড় মারল সিমেন্ট-বাঁধানো ফুটপাথের উপর।

তারপর যেমন হয়। জনতা ক্ষেপে গিয়ে কিল-চড়-লাথি মারছে বলরামকে। এরা যে বাপ-ছেলে, কে জানতে যাচ্ছে? মারতে মারতে ভূমিশায়ী করে ফেলেছে, তারও উপর চলছে। পুলিস না এসে পড়া পর্যন্ত চলবে এই রকম। মেরে মেরে হাতের সুখ করছে।

হঠাৎ মানুষজন ছুটে পালায়: মরে গেল নাকি রে? বেআন্দাজি মার মেরেছে—কী দরকার ছিল? এত করে মানা করছি—

পুলিস এসে পড়ল ধীরেসুস্থে। অ্যাম্বুলেন্স এল। পিতাপুত্র দুজনে অচেতন। হাসপাতালে এক গাড়িতে চলল।

ঠোঁট নড়ছে বলরামের। কান এগিয়ে সহৃদয় একজনে প্রশ্ন করেন, ও বুড়ো, কী বলছ তুমি?

খাবো—

হিন্দু-মুসলমান

সেকালের অদূরদর্শী মুরুব্বিরা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন চালে আর ডালে মিশিয়ে। মুসলমানে আর হিন্দুতে। এর কানাচে ওর ঘর। ওর উঠান দিয়ে এর বাড়ি যাবার পথ। কে হিন্দু, কে মুসলমান—এখন বাছাবাছি ও ভাগাভাগির দিন এসে গেল। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলেত থেকে বাঁটোয়ারা করতে এসে ভেবে পাচ্ছেন না, লাইনটা কোনখান দিয়ে টানবেন। টালবাহানা হচ্ছে, সঠিক সীমানা আজও এসে পৌছল না।

জেলা খুলনা, থানা মূলঘর, গ্রাম খালবুনা। পূর্ণচন্দ্র সমাদ্দার ও খোরশেদ খাঁ পড়শি মানুষ। নিতান্তই এবাড়ি-ওবাড়ি, মাঝখানে শুধু একটা বাঁশবন। খোরশেদের বাড়ির পোষা মুরগি চলে আসে পূর্ণর ঢেঁকিশালে, ছিটকে-পড়া ধান-চাল খুঁটে খুঁটে খায়। পূর্ণর মা রে-রে করে ওঠেন: জাত-ধর্ম কিছু রইল না, বাস উঠিয়ে তবে ছাড়বে ওরা। খোরশেদের বউ বেকুব হয়ে এসে মুরগি তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে তোলে। আবার কালীপুজোয় সন্ধ্যা থেকে পূর্ণর কালীঘরে একসঙ্গে চারটে ঢাক ড্যাডাং-ড্যাডাং করে। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খোরশেদ আর পাঁচজন মাতব্বর ডেকে বলে, টাকা হয়েছে কিনা, ঢাকে কাঠি দিয়ে মেজকর্তা সেইটে জানান দিচ্ছে। আর চলে না, বাস্তুভিটে ছাড়তে

হল এবার। তোমরা কেউ যদি পাঁচ-দশ কাঠা ভুঁই দাও, ঘরের চাল খুলে নিয়ে সেইখানে চেপে পড়ি।

এমনই চলছে আজ আট-দশ বছর। বাস তোলে না কেউ। রাগের মাথায় বলে, পরক্ষণে ভুলে যায়। কিন্তু এবারে তা নয়। বাস সত্যি সত্যি তুলতে হবে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের কথাবার্তা উঠতেই যা কাণ্ড, হয়ে গেলে তো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কেটে কুচি কুচি করবে। তবে কোন পক্ষ কাদের কাটবে সেই হল কথা। অন্যান্য জায়গা সম্পর্কে লোকে যা-হোক একটা আন্দাজ করে নিয়েছে—কিন্তু এই খুলনা জেলাটার ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। একদিন শোনা গেল, হিন্দুস্থানে দিয়ে দিয়েছে—যেহেতু গুণতিতে হিন্দু বেশি এ-জেলায়। মুসলমানের মধ্যে সাজ-সাজ পড়ে যায়: কোন্ দিকে নৌকা ভাসাবে—ফরিদপুর না বাখরগঞ্জ? পরের দিন আবার উল্টো খবর: খুলনা দিয়েছে পাকিস্তানে। কলকাতা যাবার পর নদী-সমুদ্র-সুন্দরবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এলাকাটাও যদি চলে যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের রইল তবে কি? সেই বিবেচনায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হিন্দুর মুখ শুকনো। শলা-পরামর্শ: কোথাকার টিকিট কাটবে—বনগাঁ-দত্তপুকুর, না আরও এগিয়ে একেবারে খাস কলকাতা?

পাকা খবর আসে আসে—আসে না। বাইরে কিন্তু যেমন তেমনি। পূর্ণ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হল খোরশেদ খাঁর—

সেলাম আলেকুম মেজকর্তা।

সুখে থাক।

দেখা হলেই সেলাম এবং সুখে থাকার আশীর্বাদ চিরদিনের। দুই মুখের হাসি পর্যন্ত ঠিক যেমনধারা হয়ে আসছে।

পূর্ণ জিজ্ঞাসা করেন, ছেলের সাদি কবে দিচ্ছ খোরশেদ?

এ মাসে হল না, সেই অঘ্রানে। হলে কি আর জানবে না? তদ্দিন অবিশ্যি থাক যদি তোমরা।

থাকব না তো কোথায় যাব? সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে বুড়োবয়সে কোন চুলোয় যাব মরতে?

কী সর্বনাশ, টের পেয়ে গেল নাকি? সশঙ্কিত পূর্ণ সমাদ্দার ভাবছেন, চর এসে নিশ্চয় কিছু শুনে গেছে। আরও সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। আরও গভীর রাত্রে। বাড়ির ছেলেপুলেকেও বিশ্বাস নেই—তারা ঘুমিয়ে গেলে তার পরে।

রাত-দুপুরে বিরাশি বছরের বুড়া দ্বারিক হালদার আসেন লাঠি ঠুকঠুক

করতে করতে। নৃপতি সেন আসেন। হাজরা মজুমদার ও অধীর সাহা আসে।

নৃপতি বলেন, জায়গাজমি দেখে এলাম ইছামতীর ওপারে। বেতের জঙ্গল, বুনোশূয়োরের আস্তানা—সেইসব জায়গার এখন কাঠা হিসাবে দর হাঁকছে। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস—বেটাদের চক্ষুপর্দা নেই।

দ্বারিক ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন: দেখ, অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি চাই নি কখনো। বাপঠাকুর্দা মুক্তগম্বির শ্মশানে গেছেন—বুড়ো হাড় ক'খানা ভেবেছিলাম তাঁদের জায়গায় নিয়ে গিয়ে পোড়াবে। কিন্তু ভবিতব্য আলাদা। কোথায় কোন আদাড়ে-ভাগাড়ে মরে থাকব, শিয়াল শকুনে টেনে টেনে খাবে।

পূর্ণ ভিতর দিকে বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত ছিলেন। তামাক সেজে নিয়ে এসে এঁদের হুঁকোয় বসিয়ে দিলেন। তারপর দ্বারিক ও নৃপতিকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

দ্বারিকের চোখ ছলছল করে: চললে তা হলে?

হ্যা খুড়োমশায়। পাকিস্তান হয়ে গেলে তখন আর যাওয়ার পথ থাকবে না। আনসার-বাহিনী এখনই তড়পে বেড়াচ্ছে। বিরাটিতে মাসতুত ভাই আছে। সে খবর পাঠিয়েছে, গিয়ে পড়লে যা-হোক একটা ব্যবস্থা হতে পারবে, চিঠি ছুঁড়ে জায়গা-জমি হয় না।

নৃপতি বলেন, যাও চলে সহায় পেয়েছ যখন। কখন যাচ্ছ?

দিনমানে সকলের চোখের সামনে পারব না। আজ সারারাত গোছগাছ করে রাখি, রওনা কাল রাত্রে। হয়তো এটা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে। তখন ফিরে আসব। ঘরদোর তো বেচে দিয়ে যাচ্ছিনে, কী বলেন?

হাজরা মজুমদার নিজের চিন্তায় মগ্ন আছে একপাশে। পূর্ণ তার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরলেন: কাঁঠালগাছ নিয়ে দু-বছর মামলা করেছি তোমার সঙ্গে। দোষ-অপরাধ মনে রেখ না হাজরা ভাই। বাগান-ভরা আম-কাঁঠাল, পুকুর-ভরা মাছ—নিয়েথুয়ে খেও সমস্ত। আজেবাজে মানুষের বদলে তোমরা স্বজাত যদি খাও, অনেক শান্তি।

সেই সময়টা ওদিকেও বাঁশবন ছাড়িয়ে খোরশেদ খাঁর দলিচঘরে মাতব্বরদের বৈঠক বসেছে। সর্বনেশে কাণ্ড! সামাদ গাজি স্বকর্ণে শুনে এসে তবে বলছে। বিলপারের নমোরা তৈরি—লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে, নতুন হাঁড়িতে ঘষে ঘষে শড়কি চকচকে করছে। খুলনা হিন্দুস্থানে—এই

খবরটুকুর জন্য শুধু অপেক্ষা। হুড়মুড় করে এসে পড়ে মেরেধরে ঘর জ্বালিয়ে সমভূমি করে যাবে।

কথার মাঝখানে খোরশেদ খাঁ পূর্ণর বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে সতর্ক করে দেয়ঃ এইও, শব্দ কোরো না। দুষমন ওখানে। শলা-পরামর্শ করছি—টের পেলে এক্ষুনি বিলপারে খবর দিয়ে দেবে। ফরমান আসা অবধি সবুর করবে না।

সামাদ বলে, ফরমানে যা-ই আসুক, আমি এখন বরিশালে নানার বাড়ি গিয়ে থাকিগে। হিন্দুস্থান হয়ে গেলে কোন বেটাকে তখন আর গাঙ পার হতে দেবে না।

খোরশেদ বলে, কিন্তু তোর ক্ষেত নিড়ানোর কী? এমন খাসা ধান হয়েছে—নিড়ানো না হলে ঘাসবনে বরবাদ করে দেবে।

সামাদ বলে, খোদাতালার উপর ফেলে যাচ্ছি। জানে বাঁচলে তবে তো ধান!

সকালবেলা সমাদ্দার-বাড়ির বাচ্চা ছেলে নন্তু বাঁশতলায় এসে খোরশেদের ছোট মেয়েটাকে চাপা গলায় ডাকছে, এই হাসনা, শোন—

হাসনা এল। নন্তুর হাতে গুলতি আর রামসীতার মস্তবড় মাটির পুতুল।

কাছে আয়, একটা কথা বলি। অন্য কাউকে বলবিনে। খবরদার!

গোপন কথা শোনবার জন্য হাসনা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালঃ কাউকে বলব না।

আজ রাত্রে গাঁ ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি।

হাসনা অবাক হয়ে বলে, কেন রে?

থাকলে মোসলমানে মেরে ফেলবে। বাবা দ্বারিক-দাদু সব বলাবলি করছিল। আমি শুনে নিয়েছি।

হাসনা অপ্রত্যয়ের ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, দূর! মারবে তো হিঁদুতে। আব্বা বলছিল মা'র কাছে। আমি তখন শুনেছি।

নন্তু বলে, মিথ্যে কথা। তোর শোনা ভুল—

দু-রকমও হতে পারে।—একটু ভেবে নিয়ে হাসনা জোর দিয়ে বলে, ঠিক তাই। বাঘে মারে, আবার কুমিরেও তো মারে। মোসলমান মারে বলে হিঁদু বুঝি মারতে পারে না? আচ্ছা, হিঁদু কেমন রে নন্তু—তুই দেখেছিস?

নন্তু বলে, কী বোকা রে! দেখলেই তো মেরে ফেলবে।

মোসলমান? মানে, বেটাছেলে—নানান জায়গায় যাস কিনা তুই!

সে-ও তো একই কথা হল। কিছু দেখি নি। বাবা রে, না দেখতে হয় যেন কখনো!

তারপরে যে জন্যে নন্তু এই সাত-সকালে চলে এসেছে। বলে, এই পুতুল আর গুলতি তোকে দিলাম হাসনা। বাবা নিতে দিচ্ছে না, জিনিসপত্তোর অনেক হয়ে গেল কিনা।

পুলকিত হাসনা দু-হাতে নিয়ে নিল। বলে, দাঁড়া একটু নন্তু, রেখে আসি। সাঁ করে দৌড় দিল। ফিরে এসেছে জলছবি নিয়ে। বলে, দোরে বেচতে এসেছিল, দু-আনার কিনলাম। তা নাকি হিঁদুর ঠাকুর সব। আব্বা খাতার পাতায় মারতে দেবে না। তোকে দিলাম নন্তু। সেরে সামলে রাখিস, বাড়ির কাউকে দেখাসনে। দেখতে পেলে বকবে।

উপকার বিফলে যায় না

চাকরির খোঁজ এল। নাম-করা ফার্মের রিসেপসনিস্ট। বিদেশি কোম্পানি, মাইনে খারাপ দেবে না। খাটনিও কিছু নয়—সাজগোজ করে বসে থাকা, আর মিষ্টিকথা বলা আগন্তুকের সঙ্গে। কাজ কিছু কর আর না কর, মুখের হাসিটা চাই।

খোঁজ এনে দিল উর্মির বান্ধবী অলকা। টাইপিস্ট সে ঐ অফিসের।

উর্মি বলে, ওই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ আমার কাছে। হাসতে ভুলে গেছি। কটু বিষে মন জ্বলে, মিষ্টিকথা ঠোঁটে আনব কি করে? আর সাজগোজের কথা বলছিস, রূপ থাকলে তবে তো সাজ! একটু-আধটু যা আমার ছিল, পুড়েজ্বলে গেছে। সাজ তোকেই মানায়।

দাগা পেয়েছে জীবনে, আপনজন পেলে এমনিধারা বকবক করে। দরখাস্ত একেবারে টাইপ করে নিয়ে এনেছে অলকা। তাড়া দিয়ে উঠল: সই করতে বলছি, তাই কর। রূপের জন্যে আজকাল বিধাতার মুখ চাইতে হয় না। নানান রকম জিনিস বেরিয়েছে বাজারে—নিজেরাই রূপ বানিয়ে নিতে পারি। ডাকুক ইণ্টারভিউয়ে। আমি সেদিন এসে সাজগোজ করে দেব।

ইণ্টারভিউয়ের দিন—উঃ, এত সুন্দর সুন্দর মেয়ে বেকার! হলঘর ভরে গেছে। সেক্রেটারি শহরে নেই, শোনা গেল এ্যাসিস্ট্যাণ্টের উপর ভার,

জন পাঁচেক তিনি বাছাই করে রাখবেন। সাহেব দিল্লি থেকে ফিরে তাদের ভিতর থেকে নিয়ে নেবেন। কিন্তু কোন বিচারে কাকে যে বাদ দেবে, উর্মি ভেবে পায় না। যার দিকে তাকায়, নজর ফেরে না। কী উজ্জ্বল! কথাবার্তায় ও চালচলনে বিদ্যুতের চমক। আগে বুঝতে পারে নি, কখনো তাহলে এমন প্রতিযোগিতায় আসত না।

একে একে ডাক পড়ছে, ইন্টারভিউ হয়ে ভিন্ন দরজায় বেরিয়ে যাচ্ছে তারা। আরম্ভ হয়েছে ঠিক এগারটায়। দেড়টায় একঝোঁক বন্ধ হয়ে আড়াইটা থেকে আবার চলছে। এখন চারটে বাজে, উর্মিকে তবু ডাকে না। এরই মধ্যে আলমারির কাচে একবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! অলকা যথাসাধ্য সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ ঘণ্টায় রূপের গুঁড়ো ঝরে গিয়ে আদি চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। এ চাকরিতে চেহারাই হল আসল—সরে পড়বে নাকি টিপিটিপি? কিন্তু পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়া অথবা রেলের পাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়া ছাড়া আর যে কোনো নিশ্চিন্ত জায়গা মনে পড়ে না।

অবশেষে ডাক এল। নাগেশ নয়? নাগেশ এই ফার্মে এসে জুটেছে, সে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। হায় বিধাতা! ক্ষীণতম আশাটুকুও ফুস করে এক লহমায় নিভে গেল। কামরার মধ্যে সে আর নাগেশ। কড়া কিছু বচন শোনাবে বিদায় করবার আগে? টাকা ফেরত চাইবে দশ বছরের সুদ সমেত?

একটি পলক। পলকের মধ্যে দশটা বছর পিছিয়ে চলে যায়। নাগেশ পাগল তখন উর্মিকে নিয়ে। শত কাজ ফেলে গেটে দাঁড়িয়ে থাকে অফিসের ছুটির সময়টা। দু-জনে বেরিয়ে পড়ে। অনেক দূর চলে যায়—এক একদিন সেই ঘুঘুডাঙার বাগানে। কোন বড়লোক বাগান-বাড়ি বানিয়েছিল। এখন সাপ-শিয়ালের আস্তানা। কিন্তু পুকুরঘাটের ভাঙা চাতালের উপর পা ছড়িয়ে বসে দু-জনে চিনাবাদাম খাবার পক্ষে জায়গাটা উপাদেয়। নাগেশ এম. এ. পাশ করে এক কলেজে ঢুকেছে। প্রিন্সিপ্যাল আপন মামা। তাঁরই জোগাড়ে ঢুকতে পেরেছে। অধ্যাপনার কাজ—টাকাকড়ি না হোক, অতিশয় সাধুবৃত্তি। খাতিরসম্মান খুব।

নাগেশ গড়গড় করে ভবিষ্যতের সুখ-শান্তির কথা বলে, বাদাম খেতে খেতে উর্মি হুঁ-হাঁ দিয়ে যায়। একদিন দেখা গেল উর্মির মুখ ভার। হাসে না, কথা বলে না। জোর করে মুখের আঁচল সরাতে গেল তো চোখে জল।

কি—কি হয়েছে?

বলবে না কিছু। নাগেশও নাছোড়বান্দা। যা কোনোদিন করে না—আবেগের মাথায় হাত ধরে বসল সে উর্মির।

অগত্যা বলতে হয়। মেজবউদিরা বড়লোক। সত্যিকার বউদি নয়, প্রতিবেশী। তাঁর জড়োয়া-নেকলেশ পরে বিয়েবাড়ি গিয়েছিল। নেকলেশ চুরি গেছে। স্বার্থপর জঘন্য মেয়েমানুষ মেজবউদি। স্বামীটাও গোঁয়ার-গোবিন্দ। গয়না ফেরত না পেলে রক্ষে রাখবে না।

আত্মহত্যা করতে না হয়। তাছাড়া আর উপায় দেখি নে।

আজকের দিনটা উর্মি যা-হোক বলে ঠেকিয়ে এসেছে: নেকলেশ বাক্সের ভিতর, বাক্সের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। নেকলেশ হারানোর কথা বলতে সাহস হয় নি, বলেছে চাবি হারিয়েছে। মেজবউদি সন্দেহ করেছে তবু। আজকের ভিতর চাবি পাওয়া না গেলে তালা ভেঙে বের করে দিতে হবে। সকালবেলা গয়না তার চাই-ই।

উর্মি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

নাগেশ ত্রস্ত হয়ে বলে, চোরে নিয়েছে, কোথায় এখন চোর খুঁজে বেড়াব? সোজাসুজি বরঞ্চ দামের কথা জিজ্ঞাসা করো।

উর্মি বলে, পাঁচ-শ টাকায় সেদিন মাত্র কিনেছে। আমি সঙ্গে ছিলাম। টাকাটা পেলে হয়তো ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু মাসের শেষ এখন, পাঁচ-শ কি—পাঁচটা টাকাও তো জোটানো দায়।

নাগেশ একটুখানি ভেবে বলে, কালকের দিনটাও সময় নিয়ে নাও—সন্ধ্যা অবধি। আমি আসব এমনি সময়ে।

উর্মির জল-ভরা চোখে চিকচিকে হাসি। কত ভাল উর্মি! অনেক রাতে নাগেশ বাসায় ফিরল। তখন সে নিশ্চিত বুঝেছে, উর্মি আত্মহত্যা করলে তাকেও পিছন পিছন যমালয় অবধি ধাওয়া করতে হবে।

পরের দিন এক-শ টাকার পাঁচখানা নোট এনে উর্মির হাতে দিল। উর্মি বলে, যাই, মুখের উপর ছুঁড়ে দিইগে মেজবউদির। সবুর সইছে না। কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে! সংসারে টাকাটাই চিনেছে কেবল, টাকা ছাড়া ওরা অন্য কিছু জানে না।

নাগেশ অন্যমনস্ক। এক কথার জবাবে অন্য কথা বলে বসে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়: আজকে যাচ্ছি। হাঙ্গামাটা মিটল কিনা, তার জন্যে মন ব্যস্ত থাকবে।

উর্মি হেসে গলে পড়ছে। বলে, কাল নয় পরশুও নয়—ছুটো দিন আমি অফিস কামাই করব। শুক্রবারে দেখা কোরো তুমি নাগেশ। নিশ্চয় এসো। তোমার এত বড় ঋণ কেমন করে শোধ হবে, তাই ভাবছি।

ম্লান হেসে নাগেশ বলে, ভাল করে ভেবে এস এই দুটো দিনে। সাধুফকির আমি নই—ঋণ-শোধ চাই নে, প্রাণ ধরে এমন কথা বলতে পারব না!

শুক্রবারে গিয়েছিল নাগেশ। সেদিনও উর্মি অফিস করে নি। তখন চলে গেল বাগানবাড়ি—তাদের সেই ভাঙা চাতালে। সেখানে যদি আসে। মশাও যেন মতলব করে দলবদ্ধ হয়ে লেগেছে। গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজলে হুঁশ হল, যুবতী মেয়ে আর আসতে পারে না।

তারপরে বিষম বিপাক। য়্যুনিভার্সিটি পরীক্ষার ফরম পূরণ করিয়ে ফী নেবার ভার নাগেশের উপর। তার মধ্যে ঐ পাঁচ-শ টাকা জমা দেয় নি। বন্ধুবান্ধবের কাছে হাওলাত-বরাত করে শেষ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেবে ভেবেছিল। উর্মি আত্মহত্যার কথা বলে—ভাবনার কিছু ছিলও না তার উপরে। কিন্তু হাওলাত কেউ দিল না। কমিটির কানে উঠল। অধ্যাপক মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক অপরাধ। প্রিন্সিপ্যাল মাতুল মশায় টাকাটা নিজে থেকে দিয়ে কোনরকমে আদালতের অপমান থেকে বাঁচালেন। চাকরি গেল।

এর মধ্যেও নাগেশ অনেকবার উর্মির অফিসের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষটা একদিন ভিতরে ঢুকে গেল। চাকরিটা পাকা নয়; তার উপরে বিনা খবরে মাস দেড়েক একটানা কামাই—ধরে নেওয়া যেতে পারে, নেই তার চাকরি। বাড়ির ঠিকানাও জানা গেল না। দারুণ অভাবের মধ্যে ছিল—নাগেশ কতবার ভেবেছে, সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করল বা! কতদিন নিশ্বাস ফেলেছে!

আসলে কিন্তু নাগেশের সামনাসামনি পড়বার ভয়। পাছে দেখা হয়ে যায়, সেই ভয়ে উর্মি অফিস কামাই করত। নাগেশের পাঁচ-শ টাকা নিয়ে সেদিন সোজা সে গেল হিরণ্ময়ের কাছে। বিলাত যাবে হিরণ্ময় বিজনেস-ম্যানেজমেণ্টের ডিপ্লোমা নিতে। চিঠিপত্র লিখে ভর্তি হয়েছে। পাশপোর্ট তৈরি। গিয়ে পড়লে ইণ্ডিয়াহাউসে ধরে পেড়ে কাজ একটা জুটিয়ে নেবেই, সে আত্মবিশ্বাস আছে। মুশকিল, জাহাজ-ভাড়ার জোগাড় হচ্ছে না।

তাই একদিন নিশ্বাস ফেলে বলল, কেরানিগিরিতেই আমার জীবন কাটবে। বুড়ো বয়সে দেড়-শ টাকা। ঘরসংসার-স্ত্রী-পুত্র অদৃষ্টে নেই। একলা উপোস করতে পারি, কিন্তু উপোসের ভাগ নেবার জন্য অন্যকে আনব কোন বিবেচনায়?

তারপর উর্মি টাকা এনে দিল। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, দিচ্ছ আমায়?

উর্মি বলে, তুমি চাইলে প্রাণ অবধি দিতে পারি। এ তো কয়েকটা টাকা।

হিরণ্ময় গদগদ হয়ে বলে, টাকা নয়—দু-জনে আমরা যে স্বর্গ-রচনা করব, সেখানে উঠবার সিঁড়ি।

আবার বলে, আশার অতীত এনে দিলে তুমি। তবু তো হয় না। আমি অপদার্থ—দু-শ মাত্র জোটাতে পেরেছি। বেশি আর হবে কোথা থেকে? মাস গেলে যে ক'টি টাকা দেয়, তোমার কাছেও তা বলতে পারি নে। বিদেশ-বিভুঁয়ে একেবারে শূন্যহাতে গিয়ে ওঠা যায় না। একটি হাজার চাই অন্তত। তোমার টাকা এখন রেখে দাও উর্মি। এই সেসানে আর হল না। ছ-মাস পরে পরের সেসানের জন্য চেষ্টা করব।

আবার ছ-মাস? রক্ষে কর—

উর্মি টিপিটিপি হাসছিল এতক্ষণ। আঁচলের তলা থেকে গয়নার কৌটা বের করল। বলে, এটা বেচলে শ-চারেক হয়ে যাবে।

নেকলেশ। হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, এমন জিনিসটা পরতে কোনদিন তো দেখলাম না।

আনকোরা নতুন দেখছ না? একজনে উপহার দিল আমায়।

সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে ওঠে: না গো, মুখ ভারী করতে হবে না। কে আমায় দিতে যাবে! যা-কিছু দেবার তুমিই দিও বিলেত থেকে ফিরে এসে। নেকলেশ মেজবউদির। পছন্দ করে নতুন কিনেছে। মামাতো বোনের বিয়েয় আমি পরে গেলাম। নিপাট ভালমানুষ মেজবউদি, মেজদাও তেমনি। মানে নিরেট বোকা। হারিয়ে গেছে বলতে অমনি তাই বিশ্বাস করে নিল।

হিরণ্ময় ইতস্তত করে। বলে, চুরি করা হল যে!

উর্মি সায় দেয়: তা সত্যি। চোর আমি—তোমারই জন্যে। মেজবউদির কাছে পাপী হয়ে রইলাম। ফিরে এসে তুমি পাপ মোচন করে দিও।

ঘাড় নেড়ে হিরণ্ময় বলে, নিশ্চয় করব। তখন এ দুঃসময় থাকবে না। কোন একটা অজুহাত করে মেজবউদিকে নেকলেশ গড়িয়ে দেব। ডবল দামের নেকলেশ।

দু-জনে সামনাসামনি বসে কত গল্প! দেড় বছর কি বড় জোর দুটো বছর—দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বম্বে পৌঁছেই চিঠি দেব। এডেন থেকে আর একটা, আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে আবার। জেনোয়ায় পৌঁছে মস্তবড় খামের চিঠি। সারা পথ চিঠি ছাড়তে ছাড়তে যাব উর্মি।

কিন্তু একটা চিঠিও আসে নি দশ বছরের মধ্যে। একটা খবরও নয়—

নাগেশের সামনে দাঁড়িয়ে পলকের মধ্যে পুরানো কথা মনের উপর তরঙ্গ

খেলে যায়। নাগেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। ভাল করে চিনে নিচ্ছে। এতকাল পরে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে—হুঙ্কার দিয়ে উঠবে? কিংবা ঘৃণায় কথা না বলে হাত তুলে বেরিয়ে যাবার দরজা দেখাবে?

অতি সহজভাবে নাগেশ বলল, বসুন। (শোন, উর্মিকে আপনি বলে আজ নাগেশ!) উর্মির দরখাস্তটা দেখে আর খসখস করে কি লিখে যায় ফাইলের পৃষ্ঠায়। মুখ তুলে তারপর বলে, বাঁ-দিককার ঘরে গিয়ে বসুন। খবরটা জেনে যান একেবারে। মিনিট পনেরোর ভিতর নাম পাঠাব।

অতএব সেই ঘরে গেল উর্মি। আরও সব আছে, নাগেশের নিন্দেমন্দ করছে তারা: বিশ্বসংসারের যাবতীয় প্রশ্ন – জবাব নিজেই বড় জানে কিনা! সুযোগ পেয়েছে তো বিদ্যে ফলাতে ছাড়বে কেন? কিন্তু উর্মিকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে নি নাগেশ। 'আগে দর্শনধারী, তারপরে গুণ বিচারি' —নজরে দেখেই হয়তো প্রশ্ন করা বাহুল্য মনে করেছে।

কেরানিবাবু এসে নাম পড়ছেন। কী আশ্চর্য, কানে শুনেও বিশ্বাস হয় না—প্রথম নাম উর্মি।

অফিস-বাড়িটার সামনে রাস্তার উপর দোকানের জানলায় উর্মি ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিস-পত্র দেখছে। নাগেশ বেরিয়ে আসতে দ্রুতপদে কাছে গেল।

আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। লিস্টে আমার নাম দিয়েছেন।

নাগেশ বলে, সকলের উপরে।

কী যে উপকার করলেন আমার!

ট্রাম ধরতে যাচ্ছিল নাগেশ। থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে সহজভাবে বলে, কিছু না, কিছু না। উপকার কী আবার—এ নামটা না দিয়ে ওই নাম বসানো।

মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে বলে, সেবারের উপকারের ধাক্কায় শিশু শ্রীঘরে নিয়ে তুলছিল। মামা বাঁচিয়ে দিলেন। সে যাকগে, শেষরক্ষা হলে হয়। কড়া সাহেব আমাদের সেক্রেটারি। ভাল উচ্চারণে ইংরেজিতে তড়িঘড়ি জবাব দেবেন। তবু কী হয় বলতে পারি নে। আচ্ছা—

তড়াক করে লাফিয়ে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ল।

দিন দশেক পরে সেই মোক্ষম পরীক্ষা। সেক্রেটারি সাহেবের খাসকামরায়। দরজা-জানলা-আঁটা এয়ারকণ্ডিসণ্ড ঘর। কিন্তু ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যেই কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। দুটো ইংরেজি কথা পাশাপাশি জুড়তে জিভ জড়িয়ে যায়, কী ইংরেজি জবাব দেবে সাহেব-মানুষের কাছে!

সাহেব আঙুল তুলে চেয়ার দেখিয়ে দেয়। চেয়ার কী—যেন জলহস্তী হাঁ করে আছে। গদির মধ্যে চক্ষের পলকে তাকে গিলে খেয়ে ফেলল।

সাহেব-মানুষ ঊর্মিকে অবাক করে দিয়ে বাংলা কথা বলে ওঠে: চাকরি আপনারই হবে। ওই চারজনকে ডেকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে বাতিল করে দেব। মিনিট দুয়েক বসে যান। ভয়ানক রকমের পরীক্ষা দিচ্ছেন, বাইরের ওরা ভাবুক।

হাসল একটু ঠোঁটের হাসি। আর চিনতে বাকি থাকবে কেন? হিরণ্ময় পুরাদস্তুর সাহেব এখন, এবং এত বড় ফার্মের সেক্রেটারি। হঠাৎ ঊর্মির পুরানো নীতিবাক্য মনে আসে: উপকার কদাপি বিফলে যায় না। হিরণ্ময়ের বিলাত যাওয়ায় সাহায্য করেছিল—ফল এই দশ বছর পরে।

চাকরির প্রথম দিন নাগেশ এক সময়ে ঊর্মির টেবিলে হাজির।

অভিনন্দন জানাতে এলাম!

আপনিই তো এর মূলে।

হেন ক্ষেত্রে না-না—বলে বিনয় দেখানো রীতি। নাগেশের তা নয়। ঘাড় নেড়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, তা ঠিক। গোড়াতেই যদি ঝেড়ে ফেলতাম—সে ক্ষমতা ছিল আমার—তা হলে সাহেব অবধি পৌঁছতে হত না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় আসছে না—

ঊর্মি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নাগেশ বলে, মাইনে দেড়-শ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কলমের খোঁচায় সাহেব আড়াই-শ করে দিলেন। উনি যা করবেন, ডিরেক্টররা চোখ বুঁজে মেনে নেবে। কিন্তু এমন কখনও হয় না। কোম্পানির টাকা ওঁরই যেন বুকের পাঁজরা। এইবারে কেবল এই আপনার বেলা দেখছি—

ঊর্মি কৌতুক-দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, কী মনে হয় আপনার?

আগের জানাশোনা নাকি?

আমার কাছে উপকার পেয়েছিলেন এক সময়ে।

দেখলেন? নাগেশ বিগলিত হয়ে উঠল: মানুষ এমনি-এমনি বড় হয় না। ওঁর জন্যে কবে কী করেছিলেন, মনের মধ্যে গেঁথে রেখে এতদিনে তার শোধ দিলেন।

একটু থেমে ঢোঁক গিলে নিয়ে বলে, উপকার আমিও তো করি। উপকারের দায়ে সেবারে ধরুন জেলে যেতে বসেছিলাম।

বুকের মধ্যে দুলে ওঠে ঊর্মির। বছর দশেক আগে দু-জনাই কমবয়সি—

সেই আমলের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায়। বলে, কী করতে পারি বলুন। প্রাণ দিয়েও আপনার ঋণের যদি শোধ হয়—

নাগেশ ইতস্তত করে: প্রাণ কেন দিতে হবে? মানে—

ঊর্মি অধীর কণ্ঠে বলে, বলুন না—

দেখুন, ফার্স্টক্লাস এম এ. আমি। পাঁচ বছর পড়ে আছি, মাইনে কুল্যে এক-শ আশি। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, কুলিয়ে ওঠা যায় না। সাহেবকে যদি বলেন একটু আমার কথা। মানে, এক্ষুনি নয়, ধীরেসুস্থে সময় বুঝে—

একটুখানি স্তব্ধ থেকে ঊর্মি হাসল: সে কী কথা! নিশ্চয় বলব। উপকার বিফল হয় না। আমার বেলা হয় নি, আপনারই বা হবে কেন?

হিরণ্ময়কে বলবে কি না বলবে, সে হল পরের ভাবনা। রিসেপসনিস্ট মেয়ে-হাসতে হবে। সেজেগুজে হেসে হেসে মিষ্টিকথা বলা তার চাকরি। এই পয়লা দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল।

পার্থপ্রতিম

সতীদাহ আমলের গল্প। সতীকে বোঝানো হচ্ছে: আগুনে বিষম কষ্ট, সে কষ্টের আন্দাজ নেই তোমার। সতী নিরুত্তরে ঘৃত-প্রদীপটা টেনে নিয়ে তার উপরে হাত রাখলেন। চামড়া পোড়ার উৎকট গন্ধ। সতী কিন্তু তাকিয়েও দেখেন না। হাসিমুখে অন্য হাতে কোলের শিশুটার গায়ে-মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

গল্প পড়ে পার্থ লাফিয়ে ওঠে। এই পথ। একালে সতীদাহ উঠে গেছে, কিন্তু মোটামুটি রেওয়াজটা রয়েছে। সর্বদেহে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানো। মেয়েরাই করেন। শক্ত করে ন্যাকড়া জড়াতে পারলে ফল অব্যর্থ। নিভানোর জন্য যত দাপাদাপি কর, আগুন ততই লকলক করে উঠবে। আত্মীয়স্বজনের দিক দিয়েও সন্তোষের কারণ আছে। মৃত্যুর পরে যা-কিছু করণীয়, মানুষটা নিজেই সব সমাধা করে যাচ্ছে। পোড়া দেহটুকু কেবল শ্মশানের নদীগর্ভে দিয়ে আসা। বখেড়া প্রায় কিছুই নেই।

ভেবে-চিন্তে সে দু-পয়সার এক মোমবাতি কিনে আনে। প্রক্রিয়া আগে একটু পরখ করবে। চোখ বুঁজে দাঁতে-দাঁত চেপে কড়ে-আঙুলটা জলন্ত বাত্তিতে ধরেছে। উ-হু-হু—কী জলুনি রে বাবা! ফোসকা উঠে গেল

দেখতে দেখতে। শুধুমাত্র কড়েআঙুলে এই কষ্ট—আস্ত দেহখানা কী করে আগুনে দেয়! মেয়েরাই পারেন—কে বলে নারী অবলা!

আবার কয়েকটা দিন চুপচাপ। যথারীতি পার্থ দরখাস্ত ছেড়ে যাচ্ছে। দিবারাত্রি ফাইফরমাস খেটে মাসিমার কিছু মন ভিজিয়েছে। আপন মাসি নয়, একটা-কিছু বলে ডাকতে হয় তাই মাসি। মাসিমার বোন থাকেন ডুয়ার্স অঞ্চলে, ভগ্নিপতি আসাম-লিঙ্কের কোন স্টেসনে স্টেশনমাস্টার। মাসিমা তাঁদেরও লিখেছেন—পার্থকে কোন চা-বাগানের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারেন যদি। এর উপরে আরও সদয় হয়ে বিকেলবেলা ছ-টা করে পয়সা বরাদ্দ করেছেন চা খেয়ে আসবার জন্য। দোকানে বসে পার্থ চা খায়, এবং দোকানের খবরের কাগজে কর্মখালি দেখে দেখে ঠিকানা টোকে। সম্বল ক্রমশ প্রতিদিনের ঐ ছ'পয়সায় এসে ঠেকল। চা খাওয়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঠিকানা টুকতে যায় এখন দোকানে। বড়ঘরের ছেলে—সর্বস্ব গেছে, কিন্তু চেহারাটা রয়েছে। খদ্দের না হয়েও খুব খাতির। চায়ের পয়সায় ডাক-টিকিট কিনে দরখাস্ত ছাড়ছে। ফলের ইতরবিশেষ নেই। গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের কথা আছে—সেই মহাসাধনায় পার্থপ্রতিম বছর দেড়েক ধরে লেগে রয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্মশানঘাটে গিয়ে পড়ল। মরণের পর নদীর কিনারে সম্ভবত এই বটের ছায়ায় এনে নামাবে। জীবনকালে এখনও গুঁড়ির উপরে চুপচাপ বসে থাকতে মন্দ লাগে না। নদীর শোভা দেখতে দেখতে আবার এক মতলব মাথায় আসে। আগুনে যন্ত্রণা, কিন্তু নদীর ঠাণ্ডা জল অত্যন্ত আরামের।

সে রাত্রে থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, হাড-কাঁপানো ঠাণ্ডা। কম্বলের নিচে থেকে উঠে পার্থ বেরিয়ে পড়ল। টনসিলের দোষ—ছাতা একটা না নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। গায়ের র‍্যাপারটা গলায় জড়িয়ে নেয়, গলদেশ গরম থাকলে টনসিলে কায়দা করতে পারবে না। পুলের উপর উঠে—কোন রকম ইতস্তত নয়—হাত-পা ছেড়ে ঝুপ করে জলে পড়ল।

কনকনে নদীজলে অসাড় হয়ে গিয়ে, ভেবেছিল, সোজা একেবারে পাতালপুরী। পাতালবাসিনী রাজকন্যার অতিথি—বেকার হওয়া সত্ত্বেও নিখরচায় ঘি-মাখন খাবে, দুধে আঁচাবে। ঠিক উল্টো। বাঁচবার উত্তেজনায় পলকের মধ্যে সর্বদেহে যেন আগুন ধরে গেল। কিশোর-বয়সে পূর্ববাংলায় তাদের সাগরগড়ের দীঘিতে কোণাকুণি কত পাড়ি দিয়েছে। সেই

অসুরের শক্তি ফিরে আসে হঠাৎ। সাঁতার কেটে সে ডাঙায় উঠে পড়ল।

ডাঙায় উঠে শীতে কাঁপে, আর হায়-হায় করে মনে মনে। সাঁতার জানাটাই কাল হল। এক হতে পারত, গলায় কলসি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কপালখানা যে রকম— কলসিতে হয়তো জলই ঢুকল না। কিম্বা ঝাঁপ দেবার মুখে ভেঙে গেল কলসি। তা ছাড়া এই আধা-শহর জায়গায় দুর্যোগ যত বড়ই হোক, লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ হয় না। একটা মানুষ আয়োজন করে গলায় কলসি বাঁধছে, মজা দেখতে ভিড় জমে যেত।

মোটের উপর হল না কিছুই—ভিজে ঢোল হয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে পার্থ বাসায় ফিরল। আর যে ভয় ছিল— টনসিল বিগড়ে এখন থেকেই গলা খুশখুশ করছে। শেষরাত থেকে কাশি। মেসোমশায় উকিল মানুষ—ভোর থাকতে উঠে বইপত্র ঘেঁটে আরজির মুশাবিদা করেন। পাশেই কাছারিঘর, সেখান থেকে তিনি ক্ষেপে ওঠেন: আচ্ছা কেশোরোগির পাল্লায় পড়া গেল! কাজকর্ম করতে দেবে না। বলি, বিদায় হচ্ছ কবে? চাকরি হল না-হল জানি নে, এই মাসের মধ্যে বাসা ছেড়ে চলে যাবে। আমার পাকা হুকুম। বাড়ির মধ্যে প্যানপ্যান করে হুকুমের রদ হবে না। এইটে জেনে রেখে দাও।

নতুন মাসের মাঝামাঝি এখন। হপ্তা দুয়েকের মতো সময় আছে। খবরের কাগজে পার্থ ইদানীং কেবল কর্মখালি দেখে না, দুর্ঘটনার কলমেও চোখ বুলায়। হালফিলের রকমারি আত্মহত্যার খবর। একটা জিনিস প্রায়ই চোখে পড়ে—ইঞ্জিনে কাটা পড়া। বিজ্ঞানের যুগে, মনে হচ্ছে, ইঞ্জিনের কদরটাই সকলের বেশি। বাসা থেকে পঞ্চাশ কদম গিয়েই রেললাইন। ছোট লাইন, ইঞ্জিনও ছোট—কিন্তু একটা মানুষ কাটা পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। পদ্ধতিটা চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই।

ওষুধপত্র খেয়ে কাশিটা কিছু আরাম হয়েছে। বৃষ্টি নেই সেদিন, কিন্তু আকাশ মেঘে থমথম করছে। বিষম অন্ধকার। জলকাদা মেখে পা টিপে টিপে বিস্তর কষ্টে পার্থ রাস্তাব উঁচুতে উঠল। স্লিপারের উপর সটান শুয়ে পড়ল একদিককার পাটিতে মাথা রেখে। লাইনের ভিতর জল জমে আছে, পাটির নিচে জল বেরিয়ে যাবার নালাটুকু জঙ্গলে বুজে গেছে। কাজকর্ম কেউ কিছু করে নাকি আজকাল—সবাই ফাঁকিবাজ। এ যেন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে নারায়ণের শয়নের মতো হল। কিন্তু নারায়ণ দেবতা বলেই পারেন,

পার্থ একবার শুয়ে তখনই উঠে পড়ল। লোহার পাটির উপর উবু হয়ে বসেছে। এসে পড়ুক ট্রেন, টুক করে সঙ্গে সঙ্গে সে শুয়ে পড়বে।

লাইনের এখানটা বাঁকচুর নেই, টানা সরলরেখা। ইঞ্জিনের আলো দেখা দিল দূরে। ছোট্ট আলো—নক্ষত্রের মতো। কাঁপছে, বড় হয়ে উঠছে। কাছে—আরও কাছে এসেছে, তীব্র আলোয় যেন দিনমান। প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় এক সরীসৃপ হুঙ্কার দিয়ে ধেয়ে আসছে। লাফ দিয়ে চক্ষের পলকে পার্থ লাইনের বাইরে এসে পড়ে। গড়াতে গড়াতে চলে যায় বর্ষার জলে ভরভরন্ত নয়ানজুলির ধারে গুড়িকচু-বন অবধি। গাড়ি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল—তখন নিঃসংশয় হল, বেঁচে আছে সে।

হার এবারও। শেষ মুহূর্তে কী রকমটা হয়ে যায়, এতকালের কষ্টেসৃষ্টে লালন-করা দেহপ্রাণের উপর মমতা উথলে ওঠে। হাত দুটো নুলো এবং পা দুখানা পঙ্গু হলেই রেলে কাটা চলে। শক্ত-সমর্থ মানুষ ইঞ্জিনের মুখে কেমন করে পড়ে থাকে, কে জানে। পার্থ অন্তত পারবে না।

মাস ওদিকে দ্রুত শেষ হয়ে আসে। কিন্তু ততদিনও সবুর সইল না। মেসোমশায় ডেকে পাঠালেন: শ্যালী-ভায়রাভাই সব এসে পড়ছেন। জায়গার অনটন বুঝতেই পারছ, তাড়াতাড়ি অন্য জায়গা খুঁজে নাও। দু-এক দিনের মধ্যে।

ডুয়ার্সের স্টেশনমাস্টার পার্থকে কোথায় ডেকে পাঠাবেন—তা নয়, নিজেরা এসে উৎখাত করছেন তাকে। পুরানো ভৃত্য নীলমণির সঙ্গে সে একঘরে শোয়! রাত্রিবেলা ভাত হোক না হোক, আফিমের গুলি গোটা পাঁচেক চাই-ই নীলমণির। আফিমের পরে দুধ। না দিলে চুরি অথবা জবরদস্তি করে খাবে। তার পরে চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকে। শতমুখে সে আফিমের মাহাত্ম্য শোনায়। এমন নেশা ইন্দ্রলোকেও বুঝি নেই। উপকারও বিস্তর। সাপে কামড়ালে সাপই মরবে, নীলমণির কিছু হবে না। সইয়ে সইয়ে অশেষ যত্নে এই পাঁচ গুলি অবধি রপ্ত করেছে। অন্য যে কেউ এই পরিমাণ মুখে পুরলে—ঐ যে চোখ বন্ধ করে বসে আছে, সে চোখ ইহজন্মে খুলবে না।

অতএব পার্থেরও পাঁচটা গুলি দরকার। তাড়াতাড়ি—মেসোমশায় যেমন ঐ হুকুম দিলেন, দু-চার দিনের মধ্যে। পাঁচ নয়, তার ডবল—দশটা। ডবল ডোজ চাপালে আরও নিশ্চিন্ত। জলের নিচে দম আটকে ছটফটানি কিম্বা ইঞ্জিনের চাকায় হাড়ে-মাসে মশলা পেশা নয়, চোখ বুঁজে বুঁদ হয়ে

নন্দনকাননে মনে মনে চরে বেড়ানো। কিন্তু মুশকিল হল, আফিমটা কেউ বিনামূল্যে দান করবে না—নগদ খরচার ব্যাপার। তারও জোগাড় হয়ে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। কাছারি-ঘরের মেজেয় একখানা দশটাকার নোট। ঈশ্বর সদয় এবারে—বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা তিনিই জুটিয়ে এনে দিলেন।

আবগারির দোকানে ছুটল। পয়সা দিয়ে মাল কিনতে এত বখেড়া কে জানত! লোহার রডের অন্তরাল থেকে লোকটা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স? বিনি লাইসেন্সে চ্যাংড়ামি করতে এসেছ—এইটুকু ছোকরা মৌতাতের অভাবে মরে যাচ্ছ একেবারে? পালা, পালা—দোকানের মধ্যে ঝামেলা করিসনে।

তাড়া খেয়ে মুখ চুন করে পার্থ বেরিয়ে আসে। আর একজন তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে। সমবেদনার স্বরে সে বলে, পাজি নেশা। ঠিক সময়ে না হলে জান যাবার দাখিল। ব্লাকে অবিশ্যি জোগাড় করা যায়। দুটো-চারটে পয়সা বেশি নেবে, কিন্তু পয়সা তো জীবনের চেয়ে বড় নয়।

ব্লাক কোন বস্তু, পার্থ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না। লোকটা আরও অবাক: আকাশ থেকে পড়লে না বিলেত থেকে এলে? সাদা-বাজারে কাজ-কর্ম কতটুকু, ব্লাকেই তো চলছে আজকাল সব।

নিয়ে গেল সেই ব্লাকের জায়গায়। গরু-মহিষের খাটাল। মালিক নিজে আফিমখোর, পরহিতার্থেও কিছু কিছু রাখে। চেনা খদ্দের সব—তারা আফিম কেনে, আর অনুপান হিসেবে দুধ কিনে নেয়। আধ-ভরি মাল চাই—উঁহু, তার কমে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। দশ টাকাই লেগে গেল। দমকা খরচ—যাকগে, এই সন্ধ্যেরাতটুকু কেটে গেলে কোনদিন কখনো আর আধলা-পয়সার খরচা নেই।

শোবার মুখে দৃকপাত না করে সমস্তটুকু খেয়ে নিল। সামান্য তিতো, স্বাদ নিতান্ত খারাপ নয়। আলসে চোখ জড়িয়ে আসে। দুনিয়া খারাপ নয়, কিন্তু ফুলের মধ্যে পোকার মতন মানুষগুলোই বেয়াড়া। মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল এইবার। মৃত্যুর মুখে চোখ বুঁজে পার্থ এখনি কত কি ভাবছে···

মরে গেছে, এই অবধি জানা। সকালবেলা ধড়মড়িয়ে উঠল। রক্তচক্ষু মেসোমশায় দুর্দান্ত কিল ঝাড়ছেন: চোর শয়তান, মনের ভুলে নোটখানা ফেলে গিয়েছি, অমনি সেটা গাপ করেছ?

পার্থ হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মরেই তো গিয়েছিল, মেসোমশায়ের কঠিন হাতের কিল মৃতসঞ্জীবনী হয়ে প্রাণ ফিরিয়ে আনল।

সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, আমি কেন নিতে যাব? আমি চক্ষেও দেখি নি।

মেসোমশায় আবার ধেয়ে আসেন তার দিকে: চুরি, তার উপরে মিথ্যে-কথা! তুমি নাও নি—দশটাকার নোটের তবে পাখনা বেরিয়েছিল, পাখনা বের করে ফুরফুর করে উড়ে গেল? জেলে পাঠিয়ে তোমায় শিক্ষা দেব, সামান্য বলে ছেড়ে দেব না।

নীলমণিকে হুকুম করলেন: ঘরে নিয়ে পোর নীলমণি। শিকল দে বাইরে থেকে। না যেতে চায়, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবি। পুলিশ নিয়ে আসছি আমি।

ঐ যে জেলের কথা হল, তারপরে পার্থর অন্য-কিছু কানে ঢোকে না। তাড়িয়ে দেবেন মেসোমশায়, কিন্তু দয়াবান বটে– সঙ্গে সঙ্গে অমনি ব্যবস্থাও করে দিচ্ছেন। দালানে বসবাস, নিখরচায় খাওয়াদাওয়া—সদাশয় সরকার বাহাদুরের এমন পাকা বন্দোবস্ত থাকতে কেন আহাম্মুকের মতন মরতে যাচ্ছিল! কতদিন থাকতে দেবে তাই এখন ভাবনা। ছোট মামলা—কিন্তু দুঁদে ফৌজদারি উকিল মেসোমশায় চেষ্টা করে মেয়াদ কিছু বাড়াতে পারবেন না?

নীলমণি টেনে-হিঁচড়ে ঘরে পুরবে কি, পার্থ নিজেই ঢুকে পড়ে থানাওয়ালাদের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু কোথায় ছিলেন মাসি, হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন: দশটা টাকা তো? আমি নিয়েছি—কী করবে কর। যাও কেন ফেলে? যেমন ফেলে যাও তেমনি।

সামুদ্রিক সর্বপ্রাণীর ত্রাস হল তিমি। শোনা যায়, আর এক প্রাণী আছে—তিমিঙ্গিল, তিমি থরহরি কম্পমান তার ভয়ে, বাগে পেলে কোঁৎ করে আস্ত তিমি গিলে ফেলবে। মাসিমা হলেন তাই। দুর্ধর্ষ উকিল মেসোমশাই হুঁ-হুঁ করে অস্পষ্টভাবে কী সব বলে সুড়সুড় করে সরে পড়লেন।

এ সুযোগও ভেস্তে গেল অতএব। হায় মাসি, তোমার জন্য এত খেটে মরি—তুমিই শেষটা এই করলে! ইতিমধ্যে মাসিমা একবাটি গুড়-মুড়ি এনে হাতে ঠেসে দিচ্ছেন: খাও—

সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, এবারে তোমার উপায় হয়ে যাবে। ছুটি নিয়ে জামাইবাবুরা এসে যাচ্ছেন। নমিতা সেয়ানা

হয়ে পড়েছে, এইখানে থেকে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন। অত-দূর থেকে হয় না। ওঁদের সামনাসামনি কথাবার্তা হবে। জামাইবাবু নিজেই এক চা-বাগান কিনেছেন। গোটা দুই ভাল স্টেশন পেয়েছিলেন, সেই সময়টা রোজগার করে নিয়েছেন। এখন বেনামিতে কিনে রাখলেন, রিটায়ার করবার পর চেপে বসবেন। ততদিন খাঁটিলোক চাই একজনা—

পোড়া-শোলমাছ শনির প্রকোপে খলবল করে জলে পালিয়ে যায়। পার্থরও হয়েছে তাই, কোন-কিছুতে নির্ভর করতে পারে না এখন। জুয়াচোর খাটালওয়ালার উপর রাগে গরগর করছে। গালে চড় মেরে দশ দশটা টাকা নিয়ে নিল—অন্তত গোটাকয়েক শক্ত কথা না শুনিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

বিকালের দিকে এক সময় পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

গাই দোওয়া হচ্ছে সামনের দিকে, রকমারি পাত্র হাতে নানান লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তাদের পাশ কাটিয়ে পার্থ সোজা খোপের মধ্যে মালিকের কাছে গিয়ে পড়ল।

কী আফিম দিয়েছিলে? সমস্তটা খেয়ে ফেললাম, দিব্যি তবু বেঁচে রয়েছি।

মালিক একগাল হেসে বলে, বাঁচবেন না কেন! বেঁচেবর্তে থেকে নেশাভাং আমোদ-ফূর্তি করুন, দুনিয়া ভোগ করে যান। কাঁচা বয়সে মরাছাড়ার কথা ভাল শোনায় না।

পার্থ বলে, ভেজাল আফিম গছিয়ে দশ টাকা মেরে দিয়েছে তুমি।

মালিকের সাফ জবাব: নিজের ক্ষেত থেকে এনে দিই নি—ষোল-আনা খাঁটি, হলপ করে বলি কি করে? মালখানা থেকে অল্পসল্প করে সরায়, খদ্দের সঙ্গে সঙ্গে কাকচিলের মতো এসে পড়ে। তা বাবু, চোখ গরম কিসের অত! সাচ্চা হলে আপনি চোখ উলটে পড়তেন, আমার হাতে তখন দড়ি পড়ত।

উত্তপ্ত কণ্ঠে আবার বলে, ঝামেলা করবেন না। আমি সাফ বেকবুল যাব—দুধ ছাড়া অন্য কিছু বেচিনে। ব্যস, হয়ে গেল।

গাই দোওয়া সারা হয়ে দুধ মাপামাপি হচ্ছে ওদিকে। বচসা দস্তুরমতো। কেউ বলে, মাপে কম! কেউ বলে, স্রেফ ফেনা দিয়ে সেরে দিলে। কেউ বলে, বাঁটের মুখে নিষ্কুটি সাদা জল বেরোয় কি করে, কী খাওয়াও বল দিকি? গোয়ালারও কাটা-কাটা জবাব: না পোষায়, নিও না। পায়ে ধরে কে সাধছে?

পিছনে খানিকটা দূরে দুটো পিতলের বালতি। আধাআধি জলে

ভরতি। সুযোগক্রমে এই জল সম্ভবত দুধ হয়ে উঠবে। বালতি তো বালতিই নই। পার্থ দু-হাতে তুলে নিল দুটো। বালতি হাতে হন-হন করে চলেছে।

কী আশ্চর্য, দেখে না কেউ তাকিয়ে! কলহ নিয়ে মত্ত। পার্থ তখন হুড়হুড় করে বালতির জল ঢেলে ফেলল। এবারে নজর না পড়ে উপায় নেই।

বালতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আরে, সত্যি সত্যি ভেগে পড়ে যে! ধর্, ধর্—

পার্থ দৌড়চ্ছে। লোক-দেখানো একটু না দৌড়লে চোর বলে মানবে কেন? গোয়ালা এসে কঁ্যাক করে টুঁটি চেপে ধরল। হয়েছে—এবারে হয়েছে। এ জায়গায় মাসিমা নেই, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হাসিল হবে।

কোথায় নিয়ে চললে আমায়?

যমের বাড়ি।

পার্থর হাসি পেয়ে যায়: বড় দুর্গম ঠাঁই। অনেক চেষ্টা করছি, মোকামে পৌঁছতে পারি নি। তার চেয়ে কনস্টেবল ডেকে জিম্মা করে দাও।

নয় তো আর সুখ হবে কিসে! হাতে আধুলি গুঁজে দিয়ে সরে পড়বে। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলি তো আগে, পরের বিবেচনা মালিকের। মালিক যা করেন।

টেনে নিয়ে ফেলল সেই খোপের সামনে, মালিক যেখানে বিরাজ করছে। দুধের খদ্দের লোকগুলোও রে-রে করে ছুটেছে: মারামারি কিসের? কী হয়েছে?

চোরে বালতি নিয়ে পালাচ্ছিল।

পার্থকে ভাল করে দেখছে সকলে। কষ্টে অযত্নে গৌরবরণ মুখ তামাটে হয়ে গেছে। তবু যে ভালঘরের ছেলে, সেটা লুকানো যায় না। পয়সার ব্যাপারে মনে মনে তারা গজরাচ্ছিল, এবারে কায়দা পেয়ে গেল।

ভদ্দরলোকের ছেলে দিন দুপুরে বালতি চুরি করতে এসেছে—চালাকির জায়গা পেলে না!

এত লোকের গর্জনে মালিক প্রমাদ গণে: জিজ্ঞাসা করেই দেখুন না। সামান্য ব্যাপারে উনি কি মিথ্যেকথা বলতে যাবেন?

পার্থ বলে, চুরি করেছি সত্যি কথা। দিক জেলে পুরে।

জনতার একজন কথা কেড়ে নিয়ে বলে, জেল সোজা নয় অত। মাকড় মারলে ধোকড় হয়। বালতি না হয় হাতে করে তুলেছিলেন—আর ওরা এই যে ওজনে কম দেয়, পানাপুকুরের জল মেশায়, হরেক রকম চোরা ব্যবসা করে। কোনটা অজানা আমাদের? ওদের তবে তো নিত্যি দু-বেলা জেল হওয়া উচিত।

ভীত খাটালওয়ালা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চায়: আরে দূর, কী হয়েছে! চলে যান আপনি বাবু। বর্তন থাকে তো আসুন, একসের দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দাম লাগবে না। বর্তন নেই তো ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিন। জ্বাল-দেওয়া দুধের চেয়ে কাঁচার আরও সোয়াদ ভাল। দেখুন না খেয়ে।

চার-চার বারের চেষ্টাতেও যমালয়ের দরজা খোলে না। তখন মাঝামাঝি একটা রফা করে নিচ্ছিল, জেলে গিয়ে থাকবে—তা-ও ভেস্তে গেল। মনের দুঃখে এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে বেশ খানিকটা রাত্রি করে পার্থ বাসায় ফিরল। মাসিমা একেবারে মুকিয়ে ছিলেন। ইদানীং বিষম ভাল হয়ে গেছেন তিনি। কণ্ঠে মধু ঝরছে।

গিয়েছিলে কোথা বাবা? ওঁর অমনি আলগা মুখ—ওসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে! আমি ঘর-বার করছি—ছেলেমানুষ রাগের বশে একমুখো বেরিয়ে পড়লই বা!

বলেন, জামাইবাবুরা এসে গিয়েছেন। নাকি চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠি এসে পৌঁছয় নি। তোমার সম্বন্ধে কথাবার্তাও অনেক হল। জামাইবাবুর চা-বাগান তোমাকেই দেখেশুনে গড়েপিটে তুলতে হবে। বাগানের অর্ধেক তোমার নামে লেখাপড়া করে দেবেন।

পার্থ অবাক। মাসিমা একেবারে অর্ধেক রাজত্বের বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। গল্পে আছে, রাজহস্তী পথের মানুষ শুঁড়ে তুলে এনে সিংহাসনে বসাল—সেই ব্যাপার।

আরও আছে। অর্ধেক রাজত্বের উপরে রাজকন্যা।

মাসিমা বলছেন, নমিতার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাই করে নেবেন তোমায়। শুধু ছেলে দেখেই দেবেন। বাড়ি-ঘরদোর বাপ-মা আত্মীয়জন থাকলে সে জামাই শ্বশুরের ন্যাওটা হয়ে কাজকর্ম করবে না। দিদিকে বললাম, আমাদের পার্থর মতন চালাকচতুর সৎ ছেলে কলিকালে হয় না। রাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন ওঁরা শুয়ে পড়েছেন। সকালবেলা নমিতাকে দেখো, ওঁদের মুখেই শুনো সমস্ত।

কখন সকাল হবে, নিদ্রার অবসান হয়ে ভুয়ার্সের মানুষ ক'টি বাইরে আসবেন—পার্থর মোটে সবুর সইছে না। অবশেষে উঠলেন তাঁরা, আলাপ-পরিচয় ও কথাবার্তা হল। ঠিক কনে-দেখার মতো না হলেও নমিতাকে একনজর দেখে ফেলল আড়চোখে।

তারপরে পার্থ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সম্ভ্রান্ত স্টেশনারি দোকান—'রকমারি ভাণ্ডার'। এক দঙ্গল মেয়ে এসে কেনাকাটা করছে। চুরি করবে পার্থ এখানে। অশিক্ষিত খাটালের লোক থানাপুলিশে ভয় পায়, শাস্তি নগদ-নগদ সেরে বিদায় করে। এরা কখনো আইনের বাইরে যাবে না। নেবেও একটা কোন ভাল জিনিস, যার জন্য সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। কিন্তু তেমন জিনিস কোথায় হাতের কাছে? কাউণ্টারে সব সস্তার মাল। পেরেক পুঁতে কয়েকটা টর্চলাইট ঝুলিয়ে রেখেছে, এই যা-হোক কিছু দামি ওর ভিতরে। একটা টর্চ খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। দেখে পকেটে পোরে। খুব ধীরে-সুস্থে পুরছে। তাতে কাজও হয়েছে। একটা মেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখে ফেলল। পাড়ার ডাক্তারবাবুর মেয়ে। নাম, যতদূর জানে, রেখা। পকেটের ভিতর দিয়ে টর্চের মাথার দিককার চেপটা অংশ বেরিয়ে আছে। কিন্তু আসল মানুষ সেলসম্যানটা যে তাকিয়েও দেখে না। ছোকরা মানুষ তো—মেয়ে-খদ্দের নিয়ে খুব ব্যস্ত।

আশায় আশায় তবু পার্থ দোকান ছেড়ে বাইরে যায় না। কেনাকাটা সেরে মেয়েগুলো বিদায় হল অবশেষে। কী আশ্চর্য, পার্থ যেন মাছি-পিঁপড়ে—চোখ তুলে তাকাবে না তার দিকে! কাউণ্টারের যেসব জিনিস খালি হয়ে গেল, ভিতর থেকে এনে এনে সাজাচ্ছে। টর্চের দিকটায় তাকিয়ে একজনকে ধমকে ওঠে: কী রকম কাজকর্ম তোমার শুনি? টর্চ রেখেছ তো ব্যাটারি রাখ নি। টর্চ কিনে তার সঙ্গে ব্যাটারি চাইবে না? কোথায় আছে তখন খুঁজে বেড়িও।

লোকটা টর্চের কাছে ব্যাটারি রেখে গেল। পার্থ মুঠো ভরে ব্যাটারি তুলে নেয়। এবারে তো একটিমাত্র মানুষ—ভাগ্যবশে যদি নয়নপাত হয়। কিছু না, কিছু না। তখন পার্থ উত্তপ্ত হয়ে ছোকরার সামনাসামনি দাঁড়ায়: হাতের কাজ সেরে নিন, একটা কথা বলব আপনার সঙ্গে।

ছোকরা সসম্ভ্রমে আহ্বান করে: ভিতরে বসবার জায়গা আছে। আসুন না, চলে আসুন।

দিব্যি চেয়ার-টেবিল পাতা, সেইখানে এনে বসাল। বলে, কী আনব বলুন—গরম চা, না ঠাণ্ডা সরবত?

গুরুঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে যেন। পার্থ তিক্ত-কণ্ঠে বলে, কী রকম ব্যবসা করেন! গোটা দোকান যদি লোপাট যায়, চোখ তুলে দেখবেন না?

অপরাধীর ভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ছোকরা বলে, সত্যি কিছু হয়েছে নাকি?

রাগে রাগে পার্থ পকেটের টর্চ বের করে মুখের উপর ধরল: এই টর্চ নিয়েছি। • তারপরেই ব্যাটারি এনে রাখলেন, টর্চ নিলেন তো ব্যাটারিও নিয়ে নিন—সেইটে যেন বলে দিচ্ছেন। ব্যাটারিও নিলাম চার-পাঁচটা—

ছোকরা নিরীহভাবে বলে, দরকার হয়েছে নিশ্চয়। পথে তো এখানে আলো দেয় না—ঘুরঘুট্টি আঁধারে ঘুরতে হয়, সেই জন্যে নিয়েছেন।

পার্থ বলে, তবে আর কি! টর্চের দরকার, নিয়ে নিয়েছি। যাদের রুমালের দরকার, পাউডারের দরকার, ফিতের দরকার—নিয়ে যাক ব্যাগ ভরতি করে। সাইনবোর্ডটা মুছে তাহলে লিখে দিন, 'সদাব্রত ভাণ্ডার'।

জিভ কেটে ছোকরা বলে, কীটানুকীট আমরা। সদাব্রত করবার দেমাক কিসে হবে? খদ্দের আপনি—দামই দেবেন। সুবিধা মতো দিয়ে যাবেন।

দাম দেবার জন্য নিই নি। চুরি করেছি। চোখের উপরের চুরি ধরতে পারেন না। ব্যবসা চালান কি করে?

ছোকরা হেসেই খুন। পার্থ বলে, হাসছেন যে বড়?

আপনার কথা শুনে। চুরি করে কেউ কখনো তা বলতে যায়? চোর হলে ঠিক ধরতে পারি। কত ভাগ্যে আমাদের দোকানে পায়ের ধুলো পড়েছে। আবার বলছেন, চুরি করেছি।

চেনেন নাকি আমায়? কিন্তু কই আমি তো ঠিক—

আমরা কি চেনবার যুগ্যি? উঠতি গঞ্জে দোকান সাজিয়ে আজকেই না হয় দুটো পয়সার মুখ দেখছি। আমাদের মতন দশখানা গাঁয়ের মানুষ কত নিয়েছে খেয়েছে আপনাদের সাগরগড়ের বাড়িতে।

ব্যস, তাবৎ আশা-ভরসার ইতি। এখন ছোরাছুরি মেরে সমস্ত দোকান লুঠ করে নিয়ে গেলেও এই ব্যক্তিরা কাড়বে না। টর্চ ছুঁড়ে দিয়ে পার্থ বেরিয়ে পড়ল।

এইবারে সর্বশেষ চেষ্টা। পার্থ সোজাসুজি থানায় গিয়ে উঠল। আজে-বাজে মানুষ নয়, খোদ ও. সি অর্থাৎ বড়বাবুকে ধরবে।

রাইটার-কনস্টেবল খইনি টিপছিল: কী দরকার বড়বাবুর কাছে?

পার্থ বলে, সেখানেই বলা যাবে।

ফালতু লোকের সঙ্গে বড়বাবু দেখা করেন না। দরকার লিখে স্লিপ পাঠাতে হবে।

চুরির ব্যাপার—

সে তো ঐখানে লেখা হচ্ছে। বেঞ্চির উপর ওদের পাশে গিয়ে বসে পড়ুন।

একগাদা মানুষ। এক একজন করে বলছে, ছোটবাবু লেখে নিচ্ছেন। বড়বাবু অতএব আছেন নিশ্চয় কামরার ভিতরে। কাজকর্মে এমন নিষ্ঠা নয় তো সম্ভবে না।

পার্থ যখন অনুগ্রহ চায় না, বরঞ্চ উল্টো—সে কেন স্লিপ পাঠিয়ে খাতির দেখাতে যাবে! দরজা ঠেলে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল। বড়বাবু ঘাড় হেঁট করে কি লিখছিলেন, ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকালেন। আরও উত্তেজনার কারণ, পার্থ ধপাস করে বসে পড়েছে সামনের চেয়ার টেনে নিয়ে।

কী চাই?

চুরি—

ওসবের জন্য ছোটবাবু আছেন তো বাইরে। কেউ বলে নি?

ডায়েরি করতে আসি নি। চুরি করেছি আমি নিজে। চাক্ষুষ-সাক্ষিও আছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে রেখা।

বড়বাবুর নয়ন বিস্ফারিত হয়ে রইল: চুরি করে এসে ধরা দিচ্ছ? নিজের আসতে হল—যাদের মাল চুরি করলে তারা কি করছে?

পার্থ হেসে বলে, কেউ এগোতে চায় না। একটা মানুষ জেলে ঢুকে যেটুকু কষ্ট পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট তাকে জেলে ঢোকানোর হাঙ্গামায়।

তোমারই বা মাথাব্যথা কেন তবে?

প্রবীণ বহুদর্শী ব্যক্তি, পার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কী ভাবলেন। মাথা নেড়ে বলেন, বুঝলাম। খাটতে চাও না, জেলে গিয়ে মজা করে নিখরচায় সরকারি খানা সাঁটবে।

পার্থ সকৌতুকে চেয়ে আছে।

স্বর ক্রমেই উগ্র হচ্ছে বড়বাবুর: অপদার্থ! যা-কিছু করবার, লোকে বয়স থাকতে করে নেয়। শরীরে সামর্থ্য থাকবে না, নড়তে-চড়তে কষ্ট হবে, লম্বা মেয়াদে জেলে পড়ে থাকবার সময় তখন। জেল আছেও সেই জন্যে। কাজকর্ম না করে শুধু যদি জেলের ভরসায় থাক, গভর্নমেণ্ট ফতুর হয়ে যাবে যে!

কী ধরনের কাজকর্ম, বুঝতে পাথর দেবি হয় না। হঠাৎ বড়বাবু স্বর বদলে বলেন, কি চুরি করলে?

টর্চ একটা।

জিনিসটা কি রকম—দেশি না বিলাতি? হাত বাড়িয়ে বলেন, দেখি—

জিনিস ফেরত দিয়ে এসেছি।

ফেরত দিয়ে ইয়ার্কি করতে এসেছ থানায়?

বড়বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: বেরোও, বেরিয়ে পড় এক্ষুনি।

সহজে না গেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করব। জেল মামার-বাড়ি কিনা— গিয়ে অমনি পড়লেই হল!

অনেক বেলায় বিরস মুখে পার্থ বাসায় ফিরল। অনুমান হয়, তার অদর্শনে বাড়িতে রীতিমত তোলপাড় পড়েছিল।

মাসিমা বলেন, ঠাকুরমশায় এসে দিন দেখে দিলেন। ভাদ্দরমাসে এর পরে অকাল পড়ে যাবে। বিয়ে আজকেই।

বজ্রাহত পার্থ বলে, সে কী! শুভস্য শীঘ্রম্—সে অবিশ্যি ভালই। কিন্তু আমি যে খেয়েটেয়ে এলাম।

মাসিমা হেসে উড়িয়ে দেন: কনেরই কাঠ-কাঠ উপোস। বর একটু চা-টা খেলে দোষের হয় না।

চা কী বলছেন, ভরপেট ঠেসে খাইয়েছে। দেশের একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—

হোক গে। পাত্রী অরক্ষণীয়া—ভাত খেলেই বা কী! ঘরে গিয়ে এইবার বিশ্রাম করগে বাবা। একটু পরে গায়ে-হলুদ।

নিরুপায় পার্থ ঘরে ঢুকল। নড়বড়ে তক্তাপোষ সরে গিয়ে খাট পড়েছে। খাটের উপর গদি, তোষক, বালিশ, পাশবালিশ, ধবধবে চাদর। সমস্ত পার্থর জন্যে। জামাই-আদর বলে থাকে, এই বুঝি তার শুরু।

গদির উপর বসে পড়তে মাসিমা খুট করে দরজায় শিকল তুলে দিলেন।

পার্থ কাতর হয়ে বলে, শিকল দেবার কী হল মাসিমা? যদি ধরুন, কোন কারণে বাইরে যেতে হয় একবার।

জানলায় এসে মধুর হেসে বিগলিত কণ্ঠে মাসিমা বললেন, যাবে। তার জন্যে কী হয়েছে! দিদির দুই ছেলে—তোমার দুই শালা—রইল বাইরে। নীলমণি আছে। বললেই দুয়োর খুলে দেবে। বিয়ের বর কিনা আজ— ওরা সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, যা-কিছু দরকার, ওরাই করে দেবে সমস্ত।

শিকলে তালা এঁটে বিয়ে-বাড়ির দশ রকম ব্যবস্থায় মাসিমা দ্রুত চলে গেলেন।

বোঝা গেল ব্যাপার। জেলে যেতে চাচ্ছিল, পাকে-প্রকারে তাই ঘটল। সারাদিন এমনি তালা বন্ধ থাকবে। বিয়ের মন্ত্র পড়া এবং কনের সাত-পাক ঘোরা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ছাড় নেই। সম্ভবত তার পরেও না। কিছু ছাড় হতে পারে একেবারে ভুয়ার্সের জঙ্গলে নিয়ে।

বন্ধ ঘরের মধ্যে সারাদিন পার্থ একা একা ভাবছে। মন্দ কি! সে তো

মরীয়া। মরণের চেষ্টা করেছে কতবার। হল না তো জেল। জেলও হল না, তখন এই বিয়ে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো মোটের উপর।

শুভদৃষ্টির সময় চারি পাশ থেকে বলছে, বর-কনে ভাল করে তাকাও এইবার। জোরালো আলো ধরেছে চাদরে-ঢাকা দু-জনের পাশে। পার্থ তৎক্ষণাৎ চোখ বোজে। আড়চোখে সেই একবার কনে দেখে নিয়েছিল, সে আতঙ্ক কাটে নি এখনো। বাসরে ঘুমের ভান করে পাশ ফিরল। দু-তিনটে মেয়ে বাসর জাগতে এসেছিল, ব্যাপার বুঝে নিয়ে তারাও রংতামাসা করে না। ফুলশয্যার রাত্রে প্রদীপ নেভানো বড় অলক্ষণ। কিন্তু পার্থর নাকি উৎকট চোখের অসুখ, আলোয় চোখ করকর করে।

অন্ধকার ঘরে নতুন বউয়ের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে দু-চারটে কথা। নমিতা বলে, আমিও আয়নায় মুখ দেখিনে। ভয় করে।

পার্থ বলে, অমন হল কি করে?

বাঘে ধরেছিল। ছোট্ট আমি তখন। লোকজন গিয়ে পড়তে বাঘ ছেড়ে দিয়ে পালাল।

নতুন বউয়ের কথাবার্তা কিন্তু ভারি মিষ্টি। অন্ধকারে শুনতে ভাল লাগে। নতুন বউয়ের গায়ে হাত দিয়ে সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়, এই যা। ফাঁক পেলেই পালিয়ে দূর-দূরান্তর চলে যাবে, পার্থ মনে ঠিক করেছিল। কিন্তু একটা রাত্রেই সঙ্কল্প মিইয়ে এল। দিনমানটা পালিয়ে থাকবে, রাত্রিবেলা অন্ধকারে কিসের ভয়!

এই রকম সত্যি সত্যি চলেছিল কিছুকাল। অনেকটা দায়ে পড়েও বটে। শ্বশুরের বেনামি চা-বাগান নিয়ে পার্থ উঠেপড়ে লাগল। ভোররাত্রের ট্রেনে বেরিয়ে পড়ত। কুলিকামিন নিয়ে কাজকর্ম—সমস্তটা দিন কোথা দিয়ে কাটত, ঠাহর হত না। ফিরত এক প্রহর রাত্রে। সেই সময় এমন হয়েছে, কাজের চাপে একটা রাত্রি হয়তো ফিরতে পারল না বাসায়। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করেছে বীভৎস-মূর্তি নমিতার জন্য।

* * *

সভা উপলক্ষে আমি ডুয়ার্স গিয়েছিলাম। কুসুমবাড়ি বাগানে থাকতে দিয়েছে। কুসুমবাড়ির নামডাক খুব। গেস্টহাউস ভূমি থেকে আধতলা-সমান উঁচু—সাপ উঠতে পারে না ঘরে, যত বর্ষাই হোক মেজে কখনো স্যাঁতসেঁতে হয় না। দামি আসবাবপত্র। কলকাতার শৌখিন-পাড়া থেকে সবচেয়ে চমৎকার কয়েকটা কুঠুরি যেন জঙ্গলের মধ্যে এনে বসিয়েছে।

পার্থপ্রতিম ঘোষের সঙ্গে ঐখানে পরিচয়। বাগানের অর্ধেক হিস্যার মালিক ও ম্যানেজার। আমাদের মতো শহুরে মানুষ পেয়ে বর্তে গেছেন। মিনিট দুয়েকের ভিতর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, এবং ঘণ্টা খানেকের ভিতর সমস্ত বলেকয়ে খালাস।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল হঠাৎ। অকাল-বর্ষা। ঘরের মধ্যে পার্থপ্রতিম ও আমি। মুহুর্মুহু চা আসছে। তেমন চা আপনারা মুখে দিতে পান না— অতিথির জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া। চা আসে, সঙ্গে বিবিধ আয়োজন। প্রতিবারেই নতুন নতুন পদ। গল্প থামিয়ে পার্থপ্রতিম অমনি স্ত্রীর কথায় আসেন: আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন। খেয়ে দেখুন, আমার স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করেন সমস্ত। বলবেন না আর—আমার স্ত্রী নাবালক বানিয়ে ফেলেছেন—আমাকে শুধু নয়, বাগানসুদ্ধ সকলকে·

এই এক দুর্বলতা দেখছি, স্ত্রীর নামে গদগদ। প্রতি কথায় 'আমার স্ত্রী' 'আমার স্ত্রী'—এক রকম মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। বারম্বার না বললে সেই মহিলা যেন অন্য কারো স্ত্রী হয়ে যাবেন। তখন মনে হল, বিয়ের যাবতীয় গল্প বানিয়ে বললেন হয়তো। আমরা যেমন বানিয়ে বানিয়ে কাগজে লিখি।

অবশেষে দেখলামও মহিলাকে। বাঘ পালিয়ে গিয়েছিল বোধকরি চোয়ালের এক খাবলা মাংস মুখে করে নিয়ে। ফুটো দিয়ে দু-পাটি দাঁতের অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়। একটা চোখ অস্বাভাবিক রকম বড়, আর একটার ঢেলা গলে গিয়ে সাদা মার্বেলের মতো হয়ে আছে।

পার্থপ্রতিম তখন বলছেন, এবারে বড়দিনের সময় আমার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা যাব। বড়দিনের সে জলুষ নেই আগেকার মতো। তা হোক, আমার স্ত্রী কলকাতা দেখেন নি। কয়েকটা দিন আমোদস্ফূর্তি করে আসা যাবে।

ললাট-পাঠ

রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত কপাল, দুই বাহু ও বক্ষঃস্থল। গায়ে নামাবলী। ঠিক যেমনটি হতে হয়। আপিস-পাড়ায় ল্যাম্পপোস্ট ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণব। দাঁড়ায় এসে বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি, দুটো-একটা করে আপিসের ছুটি হওয়া যখন শুরু হয়েছে।

খোলা ফটকের পথে বন্যাস্রোতের মতো মানুষ বেরোয়—মুখে ক্লান্তির কালসিটে, হাতে শূন্য টিফিনের কৌটা। অফিসাররা তো মোটর হাঁকিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। চলেছে থপথপ করে কেরানি-মানুষদের সান্ধ্যভ্রমণ। মেয়ে কেরানিও বিস্তর। বেলা দশটায় দেখবেন জুঁইফুলের মতন এক-একটি। ফুটফুটে ফর্সা, গণ্ডে গোলাপী আভা। চেয়ে থাকতে হয়, চেয়ে চেয়ে কতজনের গাড়ির তলে যাওয়ার উপক্রম। এখন ফিরছে সেইসব মেয়ে—কটকটে কালো রং, চোখ বসে গেছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। প্রসাধনের জলুস পাঁচটা অবধি রাখা দুষ্কর—বিশেষ করে সস্তা দামের এই যত দেশি প্রসাধন চলছে আজকাল।

ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণব ল্যাম্পপোস্ট ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে। চোখের উপর এইরকম সাদামাঠা দৃষ্টি না হয়ে যদি বর্শাফলক থাকত একজোড়া—খোঁচা দিয়ে দিয়ে পথচারীদের সচেতন করা যেত। দলে দলে চলেছে আপিস-ফেরতা নিস্পৃহ উদাসীন মানুষ—কতক্ষণে বাড়ি গিয়ে হাত-পা ধুয়ে বিছানায় গড়াবে, এই মাত্র লক্ষ্য। চন্দনের ডোরা-কাটা জ্যোতিষার্ণব হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল—চোখ তুলে সেদিকে কেউ একবার তাকিয়ে দেখে না।

অবশেষে সুন্দর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক ছোকরা কাছে চলে এল। পুলকিত ভৃগুচরণ—দৃষ্টির বঁড়শি একটা শিকার অন্তত গেঁথে তুলেছে।

ছোকরা বলে, কী দেখছেন ঠাকুরমশায় ?

দরখাস্ত করে দাও। দেরি কোরো না।

কিসের দরখাস্ত, কার কাছে করব ?

ভৃগুচরণ হেসে ফেলে : জানেন না যেন মোটে !

ছোকরা বলে, সত্যিই জানিনে। আপনি বলে দিন।

আজকে না জান তো কাল জানবে। কাল না হলে পরশু। অফিসের চাকরি না চাও, বাইরে দরখাস্ত কর। বৃহস্পতি তুঙ্গী। এই সুযোগ। ছাই-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হবে।

ছোকরা অবাক হয়ে গেছে। বলে, কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আপনাকে, জ্যোতিষীমশায়, বাজিয়ে দেখছিলাম একটু। আপিসে সত্যিই ভাল চাকরি খালি হয়েছে। এত ভাল যে, দরখাস্ত করতে ভরসা পাচ্ছিনে। বুড়ো অফিস-সেক্রেটারি মারা গেছেন। বিচার করে দেখলে, যিনি গেলেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা আমার। কিন্তু যোগ্যতার বিচারে ক'টা চাকরি হয়—এটা-ওটা অনেক-কিছু লাগে।

ভৃগুচরণ বলে, দরখাস্ত করে দাও, আমি বলছি। চাকরি তো চাকরি—আজ যদি শুনতে পাও ভারতভূমির জন্যে রাজা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তুমি দরখাস্ত করলে তা-ও ঠিক লেগে যাবে। বড় সুদিন তোমার।

ছোকরা প্রশ্ন করে, আপিসের খবর জানলেন আপনি কেমন করে?

শুধু আপিস কেন, তোমার মনের খবর নয়? দরখাস্ত ছাড়তে দ্বিধা করছ, তা-ও তো জানি।

কী করে জানেন এত সব?

ললাটের উপর সমস্ত লেখা আছে। রাজৈশ্বর্যলাভ—লেখাটা জলজল করছে ওই। লেখা পড়ে বলে দিই। পড়তে জানলে তোমরাও বলবে—বাহাদুরি কিছু নেই।

আবার ক'দিন যায়। তিনটি মেয়ে যাচ্ছে। একটি তার মধ্যে গটগট করে ভৃগুচরণের দিকে চলল।

পেছন থেকে ডাকছে: কোথায় যাস রে শুক্লা?

ওই মানুষটার কাছে। চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন।

কাছে গিয়ে মারমুখি হয়ে পড়ে: ছুটির সময়টা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

আপনার জন্য।

থতমত খেয়ে শুক্লা মুহূর্তকাল জবাব দিতে পারে না।

তারপর বলে, দাঁড়ানো বের করে দেব পুলিস ডেকে। জানেন, পুলিসের একটা আলাদা বিভাগ রয়েছে আপনাদের জন্যে। নামাবলীর তারা খাতির রাখে না।

ভৃগুচরণ শান্তভাবে বলে, বিভাগটা আমাদের জন্য নয়—যারা অসৎ অনাচারী তাদের জন্য। আমি ছাত্র, পাঠক। আপনার চেহারা দেখিনে, দেখতে আসি আপনার ললাট। দেখবার মতো বস্তু বটে। হাজারে একটা এমন দেখা যায়।

মুখ ফিরিয়ে শুক্লা সঙ্গিনীদের বলে দেয়, তোরা এগুতে লাগ। আমার একটু দেরি হবে।

ভৃগুচরণকে জিজ্ঞাসা করে, কী আছে আমার ললাটে?

রাজলক্ষণ। আপনি রাজরানি—

ঠিক বলেছেন। শুক্লা খিলখিল করে হাসে: রাজরানি তাতে সন্দেহ কী? দশটা থেকে টাইপ করে করে দশ আঙুলে ব্যথা হয়ে গেছে। কুলায় না বলে সন্ধ্যার পরে এক্ষুনি আবার রাজরানি টুইশানিতে বেরুবেন। তিন ছাত্রী একসঙ্গে, পনের তঙ্কা রাজরানির মাসিক নজরানা।

বলতে বলতে থেমে গিয়ে বড় বড় চোখ মেলে শুক্লা জ্যোতিষার্ণবের দিকে তাকাল: আপনিই বোধহয় সেই। আচ্ছা, আমাদের ডেসপ্যাচ-সেকশনের সমীরণবাবুর ললাটও কি আপনি দেখেছিলেন?

কে সমীরণ, চিনি না তো!

সেই ভদ্রলোককেও ধরেছিলেন এমনি। দরখাস্ত ছাড়লে নাকি ভারত-ভূমির রাজা করে দেবে, এই সব। সেই গল্প সমীরণবাবু আপিসময় চাউর করে দিলেন। উঃ, কী ভাল লোক আপনি—যার দিকে চোখ পড়ে তাকেই রাজ্যপাট দিয়ে দেন। আপনি বিধাতাপুরুষ হলে সুখের অন্ত থাকত না, মহারাজা-মহারানি হয়ে যেত সবাই।

ভৃগুচরণ হাসছে মৃদু মৃদু। বলে, আমি কিছুই করিনে। শুধু পড়ে দিই। বই পড়ে আপনি যেমন বলেন, ললাট পড়ে আমিও তেমনি বলি। আমার পাঠের অন্যথা হবে না। আজকে আপনি যা-ই হন, ভবিষ্যতে নিশ্চয় রাজরানি।

অধীর কণ্ঠে শুক্লা বলে, কবে? চুল পেকে দাঁত নড়বড়ে হয়ে যখন গয়া-কাশী করে বেড়াব, সেই বয়সে?

হেসে ভৃগু বলে, তার আগে—অনেক আগে। গয়া-কাশীর দিনের তো অনেক বাকি এখনো।

ঠিক এমনি সময়ে সমীরণের আবির্ভাব। এদিক-ওদিক খুঁজছিল। তারপর দেখতে পেয়ে দ্রুতপায়ে চলে এল।

জ্যোতিষার্ণব মশায়, সেই ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে দিলেন কেন? খুঁজে খুঁজে পাইনে।

ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে গাড়ি-বারান্দায় এসেছি। আচ্ছাদনের নিচে। ক্রমোন্নতি, দেখছেন না? আরও হবে—আপিসে যা আমার গুণপনা ছড়াচ্ছেন!

শুক্লাকে দেখে সমীরণ হাসিমুখে তার দিকে চাইল। বলে, আপনার কথায় দরখাস্ত তো দিলাম। আশাপ্রদ মনে হচ্ছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামরায় ডেকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বাড়িতে যেতে বলেছেন রবিবারে।

ভৃগুচরণ গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়ে: জানি রে ভাই, সমস্ত জানি। ললাটে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে তবেই তো বললাম তোমায়।

আচ্ছা, আসি তবে এখন। মনে ভাবলাম, খবরটা আপনাকে দিয়ে যাই। তা দেখুন, কথা ফলে যায় তো আপনার উন্নতিও এই গাড়ি-বারান্দা

অবধি নয়—অট্টালিকার চূড়োয়। তখন আর একলা শুক্লা দেবী নয়, অফিস সুদ্ধ ভেঙে এসে পড়বে আপনার কাছে।

শুক্লার দিকে একটা চোরা চাউনি হেনে সমীরণ বিদায় হল।

আবার সেই আগেকার প্রসঙ্গ। শুক্লা বলে, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লে শুনব না। ভাল সময় কদ্দিন পরে- ঠিক করে বলে দিন। আর আমি পারছিনে।

জল এসেছে বুঝি মেয়েটার চোখের কোণে। ভৃগুচরণের করুণা হল। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না। বসিগে কোথাও চলুন। ভাল করে দেখে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে হবে। পার্কে চলুন।

পার্কে গিয়ে গ্যাসের আলোর নিচে শুক্লার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জ্যোতিষার্ণব। মুখ আপনা-আপনি কেমন নত হয়ে আসে। তারপরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—শুক্লাদের ঘর-সংসারের কথাও এসে পড়ে তার মধ্যে। মৃদু হেসে ভৃগুচরণ শেষটা রায় দিয়ে দেয়: নিজে না-ও যদি কিছু হন, রাজার বউ তো রাজরানি। অন্য কেউ ধরুন রাজা হয়ে গেল- তাকে বিয়ে করে ফেলবেন।

বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ জেনে শুক্লা আনন্দে ডগমগ। খুব বেশি তো একটা বছর—এ দিন থাকবে না তারপরে। ললাটলিপি অদৃশ্য অক্ষরে বলে দিচ্ছে।

অনেক ইতস্তত করে এক সময়ে শুক্লা বলল, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম। আরও কতজনকে দেখতে পারতেন। মাইনে পেয়েছি আজ। আপনার পারিশ্রমিক কত, যদি জানতে পারি-

এক পয়সাও নয়।

বিনা ফী-তে দেখে বেড়ান নাকি? কম হোক বেশি হোক, আমি শুধু পয়সা নিয়ে খাটি। আপনার দশা দেখছি আমার চেয়েও খারাপ!

সকলের কথা হচ্ছে না তো। বউনির সময়ের মক্কেল আপনারা, আপনাদের কোন ফী নেই।

বেশ, ফী না নেবেন তো চলুন কোনখানে। গায়ে নামাবলী জড়িয়ে চপ-কাটলেট চলবে না বোধহয়। মিষ্টিমিঠাই খাওয়া যাবে।

শুধু চপ-কাটলেট কেন, চিকেন হ্যামও চলে। নামাবলী কিংবা ভৃগুসংহিতা কোথাও বারণ কিছু লেখে নি।

সারাদিনের খাটনিতে শুক্লার ক্ষিধে পেয়েছে খুব। মন-ভরা স্ফূর্তি, ব্যাগে পুরো মাসের মাইনে। খুব খেল সে। ভৃগুচরণও নিতান্ত কম যায় না। কিন্তু ব্যাগ খুলবার আগেই হোটেলের বিল ভৃগুচরণ মিটিয়ে দিল।

শুক্লা ঠেকাতে গিয়ে পারল না। ঘাড় দুলিয়ে বলে, কী অন্যায়! আমি আপনাকে নিয়ে এলাম, দাম আমিই দেব। কিছুতেই হবে না।

ভৃগু বলে, দেবেন তার জন্যে কী! রাজরানি যখন হবেন, সুদ-সমেত চেয়ে নিয়ে আসব।

তারপরে আরও এসেছে শুক্লা। গাড়ি-বারান্দায় বার দুই, এক তলার ভাড়াটে কুঠুরিতে বার কয়েক। এবং সর্বশেষ বড় রাস্তার উপর মস্তবড় সাইনবোর্ড ওয়ালা ভাগ্যগণনা-মন্দিরে। কর্মখালির খবর আছে, দরখাস্ত করবে কিনা? মা পীড়াপীড়ি করছেন বিয়ের মত দেবার জন্য, কী করবে? এমনি সব। ফী লাগে না শুক্লার, হিসাব থাকছে—রাজরানি হবার পর একসঙ্গে শোধ হবে।

মাঝে মাঝে শুক্লা অস্থির হয়ে বলে, এক বছর বলেছিলেন, বছর তো কাবার হয়ে যায়।

বছরের ভিতরেই হয়ে যাবে। ললাট পড়ে বলেছি, মিথ্যা হবে কেমন করে?

ভৃগুচরণ সুখবরটা দিল: সমীরণ এসেছিল কাল। অফিস-সেক্রেটারি তাকেই করল। আসছে মাস থেকে বসবে। আপনারা শোনেন নি কিছু?

হাসতে হসতে তারপর বলে, যা দেখছি, সোজাসুজি রানি আপনি হতে পারলেন না। রাজা বিয়ে করেই রানি হতে হবে।

মাস দেড়েক পরে আবার একদিন শুক্লা এসে পড়ল। উত্তেজনায় কাঁপছে।

কী হয়েছে শুক্লা দেবী?

নেমন্তন্ন-চিঠি দেয় নি আপনাকে? সমীরণের যে বিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেয়ের সঙ্গে। সেক্রেটারি হয়েছে নিজের কোন গুণে নয়, খাঁদা বোঁচা মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে। পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ, এখন বুঝতে পারছি। ভালই হয়েছে, আপদ সরে গেছে। আপিসের কেউ কিছু জানত না, কোনদিন কাউকে বুঝতে দেয় নি—

বলছে, ভাল হয়েছে—দুই গালে অশ্রুর ধারা গড়াচ্ছে তখন।

ভৃগুচরণ চিন্তান্বিত। একের পর এক টেলিফোন আসছে—সহকারীকে ফোন ধরে যা-হোক কিছু জবাব দিতে বলল ভাগ্য-জিজ্ঞাসু অগণ্য লোক বাইরের ঘরে: অনেকে ব্যস্ত হচ্ছে। সহকারী গিয়ে বলল, পুজো শেষ হতে এখনো আধ ঘণ্টার উপর। জরুরি কাজ থাকলে চলে যেতে পারেন।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে চুপ। একজনও উঠল না।

শুক্লা গালি পাড়ছে: ধাপ্পাবাজ আপনিও কম নন। যা বলেন, কিছুই মেলে না। রাজরানি না হাতি! আপনি বুজরুক, আপিসে সবাইকে বলব। যেখানে যাব, বলে বেড়াব।

ভৃগুচরণ শান্তভাবে বলে, ক'দিন আর বাকি বছর পুরবার?

গেল-বছর ছাব্বিশে মাঘ বলেছিলেন। তারিখ লিখে রেখেছি। আর আজকে তো হল পনেরই।

ভৃগু হিসাব করে বলে, এগার দিন এখনো বাকি আছে। অনেক সময়।

শুক্লা বলে, এগার মাসে কিছু হল না, এগার দিনে হবে?

হতেই হবে। ললাটের পাঠ কখনো ভুল হয় না আমার। এবারও হবে না।

এক হপ্তা পরে আবার এসেছে। সামলে নিয়েছে শুক্লা পুরোপুরি। হাসিখুশি ভাব। বলে, কী গো গণৎকার মশায়, রাজমুকুট গড়িয়ে ফেলেছেন নাকি আমার জন্য? আর তো চারদিন।

এবারে ভৃগুচরণ ঘাবড়ে যাচ্ছে। এমন নাছোড়বান্দা মেয়ে তো দেখা যায় না। তাগিদ দিয়ে দিয়ে ভাগ্য আদায় করবে।

সোজাসুজি রাজরানি হলাম না। ঘুর-পথে হবার কথা বলেছিলেন, তা-ই বা কোথায়?

ভৃগুচরণ জ্যোতিষার্ণব নিরুত্তর। পশার-প্রতিপত্তি যায় এবারে বুঝি! বাইরের ঘরে একগাদা মক্কেল—চেঁচামেচি করে এখনই এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে। কিন্তু শুক্লা তা করল না। হাসিমুখে ভৃগুর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। বলল, আচ্ছা, আমি একটা উপায় বলছি। অন্য রাজা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, আপনিই বরাসনে বসে পড়ুন।

ভৃগুচরণ আঁতকে ওঠে: অ্যাঁ, সে কি! আমি কেমন করে—

ললাট-লিপি নইলে মিথ্যা হয়ে যায় যে!

কিন্তু রাজা তো আমি নই—

রাজা কী বলছেন—মহারাজা। বাইরের ঘরে বিল্বগড়ের রাজা বসে আছেন। রাজত্ব গিয়ে যিনি মোটর-গ্যারেজ করেছেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, পুজো শেষ হল মহারাজের?

একটু ভেবে নিয়ে ভৃগু বলে, এই চারদিনের মধ্যেই কিন্তু। নয়তো লিপির পড়া মিথ্যে হয়ে যাবে। দিনক্ষণ দেখে এসেছেন আপনি?

শুক্লা সংশোধন করে দেয়: আপনি নয়, তুমি—

চল গোয়া—

[গোয়া-সত্যাগ্রহের সময়কার গল্প]

সারা পথ কষ্ট। রাতে ঘুমুতে দিল না। স্টেশনে স্টেশনে ডেকে তুলে মালা দিচ্ছে, চন্দন লেপছে কপালে। পুণায় নামলাম, তখন আর মানুষ বলে মালুম হবে না। নাক-চোখ-মুখ নেই, গা-গতর কিছু নেই—ভারী ভারী ফুলের বাণ্ডিলের তলায় দুটো করে পা বেরিয়ে আছে।

শিবাজি-মন্দিরে লোক ভেঙে পড়ছে। বেদির উপর তুলে দিয়ে বলে, বলুন কিছু এবারে—

গোয়ায় গিয়ে পৌছুলে নিদারুণ ঠেঙাবে, গুলিও করতে পারে, এই মাত্র শুনেছিলাম। পথের এত সব হাঙ্গামের কথা বলে নি কেউ। বললে বোধ-হয় পিছিয়ে যেতাম। দোহাই পাড়ি: দেখুন, মারাঠির যা বিদ্যে—কথাবার্তা বুঝতে পারি খানিক খানিক। রাষ্ট্রভাষা যেটুকু জানা, সে হয়তো গোয়ালা-কয়লাওয়ালার সঙ্গে চালানো যায়, বক্তৃতায় চলবে না।

তবু মাপ হল না: তা কি হয়েছে! বাংলাতেই ছাড়ুন। জ্বালাময়ী হলে হল, মানুষজন বুঝে নেবে।

পুণা থেকে বেলগাঁও। খাতির যতই করুক, টিকিট কাটতে হল নিজ নিজ পয়সায়। গোড়া থেকে সেই কথা। পয়সা নেই উদ্যোক্তাদের।

বার ঘণ্টার পথ। রাত্রি একটায় স্টেশনে নেমে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি, বৃষ্টি! সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দিল আজকে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, অলক্ষ্য অন্ধকার থেকে সাড়া এল: চলে আসুন—

নিঃশব্দে চলেছি তাদের পিছু পিছু। চারিদিক নিষুপ্ত, একটানা জলস্রোত। এক ভাঙা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। অনেক লোক আগে থেকে এসে আছে। বলে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিন। সময় নেই।

আধ-মগ চা আর গোণাগুণতি একখানা করে রুটি। গরম চা হড়হড় করে গলায় ঢেলে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। ট্রাক দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর। সত্তরটি প্রাণী মোটমাট। কিন্তু পায়ে হেঁটে যখন যাওয়া যাবে না, এবং ট্রাকও একটা বই দুটো নেই—সত্তর না হয়ে সাত-শ হলেও ওর মধ্যে উঠে পড়তে হবে। কোন কায়দায় উঠবেন, সে আপনার ভাবনা।

আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে। এই চলে গেলাম—অনেকক্ষণ পরে দেখছি, সেই পথটাই হাত কয়েক নিচে। টানেলের ভিতর ঢুকে পড়লাম বারকয়েক। বৃষ্টিটা মাঝে বন্ধ হয়েছিল, আবার নামল। বৃষ্টি, অন্ধকার আর মানুষের গাদাগাদি—পথের মজাটা উপভোগ হচ্ছে না। বহাল তবিয়তে আর একবার আসব এদিকে। যদি অবশ্য সশরীরে ফিরে আসতে পারি পালাজার মশায়ের অতিথিশালা থেকে।

চল্লিশ মাইল এসে আনমোর কাস্টমস। টাকাপয়সা কাপড়-চোপড় জমা দিয়ে দিন, নাম-ঠিকানা লিখুন। ফিরতি মুখে যাবতীয় মালপত্র বুঝে নিয়ে যাবেন। না ফেরেন তো দেশের ঠিকানায় ফেরত চলে যাবে। আপনার ভালমন্দ যা-ই হোক, মালের এক তিল মার যাবে না।

মালকোঁচা এঁটে নিলাম। গায়ে কামিজ, গামছা বাঁধা কোমরে বেড় দিয়ে। পুরোপুরি রণসজ্জা। আরও পাঁচ মাইল ভারতের এলাকা। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। সদর পথে কড়া পাহারা। গাইড হয়ে এসেছে তাই ক'জন - সুলুকসন্ধান বুঝে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সাপের মতন প্রায় বুকে হেঁটে চলেছি। সীমান্তে এসে দাঁড়ালাম, তখন ফরশা হয়ে গেছে। জায়গাটাও একেবারে ফাঁকা মাঠ। মাঠের ওপারে জঙ্গল। পশ্চিমঘাট-পর্বতমালা দিগন্ত ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। গাইডেরা ত্রস্ত হয়ে বলে, গুলি করবে—শুয়ে পড়, শুয়ে পড়। সত্তর জন আমরা চক্ষের পলকে মাঠের জল-কাদার সঙ্গে লেপটে গেলাম। গাইডেরাও শুয়েছে—একজন শুধু হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুয়ে শুয়ে মৃদুকণ্ঠে বচসা চলেছে: পতাকা কে নেবে কাঁধে? গুলি করবে নির্ঘাৎ সেই মানুষকে তাক করে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সব অঞ্চলই আজকে পাশাপাশি— প্রথম বুলেট বুকে নেবে কোন অঞ্চলের কোন ভাগ্যবান! মারাঠিরা কর্মকর্তা—আমাদের উপর কেমন-ধারা টান সেই স্বদেশি যুগ থেকে। বললেন, সর্বকাজে বাঙালি চিরকাল আগুয়ান—তোমরাই নেবে পতাকা। কে নেবে, মানুষ ঠিক কর।

লড়াইয়ের ফেরতা মোহন সিং ও সোনো। পঞ্চ—অঙ্গ চিরলে এখনো গেড়-দু গণ্ডা গুলি বেরুবে—পতাকার দাবিতে ঝগড়া বাধিয়েছে তারা। আর নয়—চুপ, চুপ!

ঝিঁঝি ডাকতে লাগল বনান্তরাল থেকে। ঝিঁঝি নয়—যে লোকটা আগে চলে গেছে, তার সঙ্কেত। সময় হয়েছে, যাত্রা এবারে। সাঁ করে

এক ছুটে মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়।···ব্যস, ঢুকে গেছি গোয়ার এলাকায়। পাহারাদারমশায়েরা রাজপথে ওদিকে মোক্ষম পাহারা দিচ্ছেন।• ঘুরুন তাঁরা পাহারা দিয়ে দিয়ে। বনজঙ্গল পার হয়ে আবার জনপদে বেরুব, পুরো মিছিল তখন সাজানো হবে। পথ কতখানি রে বাপু— চলেছি, চলেছি, চলার আর শেষ নেই। দেবরাজও কি দিন বুঝে নামলেন? বৃষ্টি ছাড়ছে না, ভিজে জবজবে হয়ে গেছি। জঙ্গল ঘন হয়ে পথ এঁটে যায় একসময়। গাইডদের কুড়াল আছে, গাছপালা কেটে পথ করে দিচ্ছে। ঐ কাটবার সময়টা অবকাশ আমাদের—এক-আধ মিনিট যা দাঁড়াতে পাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ছি।

সাড়ে-ছ'ফুট জোয়ানপুরুষ লড়াইয়ের সৈনিক মোহন সিং তিড়িং করে হাত তিনেক পিছনে লাফিয়ে পড়ল। জঙ্গলে নানান জন্তু-জানোয়ার—বাঘ দেখল নাকি? কুড়াল উঁচিয়ে গাইডরা ছুটে এসেছে: কই, কোথায়?

আঙুল তুলে মোহন সিং গাছের ডাল দেখাল। বাঘ তো গাছে চড়ে বেড়ায় না, হতভম্ব হয়ে গাইডরা ইতি-উতি চায়।

কোন দিকে?

দেখ না তাকিয়ে।

কাঁপছে দস্তুরমতো। জলে ভিজে শীত লেগেছে বলেই কি? বলে, ঐ— ঐ –। ডালে নয়, পাতার উপর।

পাতায় পাতায় ছিনেজোঁক। এদিক-ওদিক সর্বত্র।

জোঁক দেখে অমন চেঁচালে?

মোহন সিং খিঁচিয়ে উঠে: বাঘ হলে ডরাব কেন? এত মানুষ একসঙ্গে, বাঘে আমাদের কি করবে?

তা বটে! পর্তুগিজ-বুলেটের আশায় রেলভাড়া করে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আসছি। বাঘকে আমরা থোড়াই কেয়ার করি। জোঁক সর্বনেশে বস্তু। চোরাগোপ্তা আক্রমণ—টেরও পাবেন না, কোন সময় এসে ধরেছে। রক্ত খেয়ে সাবাড় করল - সুড়সুড়ি দিচ্ছে তখন কে যেন, আরাম লাগছে। এ শত্রুর কাছে সামাল হবেন কি করে? চলাচল বন্ধ করে সর্বাঙ্গ নিরিখ করছি, জোঁক লেগে আছে কিনা। পিঠের জামা তুলে এ-ওকে বলছি, দেখ তো, দেখ তো—

বুড়োমানুষ সীতারামিয়া— একটা দাঁত নেই, একগাছি চুলও কাঁচা নেই। কথা বলতে গেলে কামারের হাপরের মতন ফক-ফক করে হাওয়া বেরিয়ে আসে। জোঁকের গোলমালের মধ্যে ফাঁক বুঝে তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

একঢোক জল খাওয়াও ভাই।

এখন জল চাচ্ছেন, তারপরে মিঠাইমেওয়া, রাত্তির হলে বোধহয় আকাশের চাঁদ। পিছনে ঝরণা রেখে এলাম, জলের কথা সেই সময়ে বলতে কি হল?

ঝরণা লাগছে কিসে? খানা-ডোবায় কত জল! বুড়োমানুষটা পিপাসার জল চাচ্ছে, অমন করতে নেই।

বুড়োমানুষ আছেন তো ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়। এসব কাজে আসা কেন?

আজকেই বুড়োমানুষ, ভায়া। সত্যাগ্রহ এইটুকু বয়স থেকে করছি। গান্ধিজীর সেই চম্পারণ থেকে। কোনো জায়গায় বাদ নেই। এখন তো ও-পাঠ উঠেই যাচ্ছে। হয়তো-বা এই শেষ। অমন করে বলে না—ছিঃ!

একজনের ঘটি চেয়ে নিয়ে আমি জল এনে দিলাম। জল খেয়ে সীতারামিয়ার মেজাজ চড়ল।

চিরকাল বুড়ো ছিলাম না, বুঝলে? সত্যাগ্রহ ক'টা দেখেছ? এ আবার সত্যাগ্রহ নাকি! পুঁচকে একফোঁটা পর্তুগাল, ম্যাপে যার নিশানাই মেলে না। খোদ বৃটিশের সঙ্গে আমরা সত্যাগ্রহ করতাম। রাবণ রাজা সূর্যকে তাঁবেদার করে খাটাত, আর ঐ বৃটিশ রাজা। সে রাজ্যে সূর্যের অস্ত যাবার এক্তিয়ার ছিল না।

কিন্তু সীতারামিয়ার চেয়েও বেশি মুশকিল চৌধুরিকে নিয়ে। দলপতি তিনি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে হাঁটু ফুলে ঢোল হয়েছে, কিন্তু এলাকার ভিতর এসে পড়ে এক লহমা থেমে থাকবার জো নেই। কেমন করে কখন খবর বেরিয়ে যাবে—পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। অথবা চুপিসারে নিয়ে জেলে পুরবে। মানুষজন জানবে না, দাগ কাটবে না কারো মনে!

দাঁড়ানো চলবে না অতএব। চল, এগিয়ে চল। মরে গেলে শবদেহ নিয়ে তখনও এগুবে। মোহন সিং তড়াক করে চৌধুরিকে কাঁধে তুলে ফেলল।

কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এই যাচ্ছেতাই পথে নিজেরাই পার না, এর উপর আমায় বইবে? খানিকটা কাতর হয়ে পড়েছি বলে নেতার কথা মানবে না তোমরা?

মোহন সিং বদ্ধকালা আপাতত। ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে। মাইলটাক গিয়ে চৌধুরি আর্তনাদ করে ওঠেন: নামাও, নামাও—

কী হল হঠাৎ—মর্মান্তিক যন্ত্রণা উঠেছে হয়তো দেহে। ভড়কে গিয়ে

মোহন সিং যেমন নামিয়েছে, চৌধুরি এক গাছের গুঁড়ি এঁটে ধরে দাঁড়ালেন। গাছ সুদ্ধ না উপড়ে তাঁকে নড়াতে পারবে না।

রাগ করে বল্লেন, কী খেলা হচ্ছে বল তো আমায় নিয়ে? কাঁধ সুড়সুড় করে তো বুড়োমানুষ সীতারামিয়া মশায়কে কাঁধে তোল।

সীতারামিয়া ঠিক পিছনে। তাঁকে নিয়ে আবার কথা ওঠায় ক্ষেপে উঠলেন: বুড়ো-বুড়ো কোরো না বলছি। এ বুড়ো তোমাদের সকলকে শেষ করে তবে মরবে।

সীতারামিয়া সকলের আগে চলে এলেন। এর পরে আর হাঁটা নয়, দৌড়চ্ছেন সকলের আগে আগে।

পাহাড় আর জঙ্গলের অন্ত নেই। ঘনতর হচ্ছে ক্রমশ। পথ ভুল হয় নি তো? আমার অবস্থা অতিশয় সঙ্গিন। সকাল থেকে মাথা ছিঁড়ে পড়ছে—আর পারি না, টলে পড়ে না যাই। সীতারামিয়া ও চৌধুরির গতিক দেখে ভয়ে ভয়ে কাউকে বলি নি। মোহন সিং কিন্তু সন্দেহ করেছে—কটোমটো তাকাচ্ছে। ফাঁকা কাঁধে অসুবিধা হচ্ছে বোধহয় তার। শনির দৃষ্টির আড়ালে সরে যাই তাড়াতাড়ি। একেবারে সকলের পিছনে।

এক গাইডের মুখ-ভরা বিপুল গোঁফ-দাড়ি। দাড়ির জঙ্গল দেখে কে যেন দণ্ডকারণ্য বলেছিল—লোকটাও সেই থেকে দণ্ডক-ভাই। তার সঙ্গে গল্প জমিয়েছি, মাথাধরার কথা তার কাছেও ভাঙি নি। যেন গল্পের দরুনই পিছিয়ে পড়ছি আমরা।

গ্রাম কতদূর দণ্ডক-ভাই?

আধ মাইল।

অধীর কণ্ঠে বলি, ঐ এক কথাই তো কখন থেকে বলছ।

দণ্ডক-ভাই গম্ভীর হয়ে বলে, দু-কথার মানুষ আমি নই।

আরও ঘণ্টা দুয়েক কায়ক্লেশে চলবার পরেও সেই আধ মাইল। পিছিয়ে পড়েছি—পাহাড়ের বাঁকে আগের মানুষদের অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। ধুঁকতে ধুঁকতে এক পাথরের উপর বসে পড়লাম।

জিরিয়ে নিই একটু। আর পারছিনে।

কপালে হাত ছুঁইয়ে দণ্ডক-ভাই শিউরে উঠে: জ্বর ধাঁ-ধাঁ করছে। এতক্ষণ পেরেছ কী করে, সেই তো অবাক লাগে।

ব্যাকুল হয়ে বলি, কী হবে তা হলে?

দণ্ডক অভয় দেয়: জিরিয়ে নাও না। কুছ পরোয়া নেই। ওরা পাকদণ্ডী ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। চড়াই ধরে সোজাসুজি আমি নিয়ে তুলব।

তবে তাই। আমার সঙ্গে থাক তুমি। ওদের দলে ভিড়ো না।

দণ্ডক ঘাড় নাড়ল: বেশ তো! কিন্তু ওদের জানিয়ে আসা দরকার। তোমায় না দেখতে পেয়ে ফিরে আসে যদি! পৌঁছুতে তা হলে দেরি পড়ে যাবে। এক ছুটে আমি বলে আসছি।

হনহন করে চলল। পিছন থেকে বলে দিই, দেরি কোরো না ভাই। যাবে আর ফিরে আসবে।

মুখ ফিরিয়ে সে বলল, আধ ঘণ্টা। উঁহু, অতও নয়। বসে থাক তুমি, জিরিয়ে নাও।

আধ মাইলের পিছন ছুটছি সকাল থেকে, আবার এই আধ ঘণ্টার ফেরে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন আর বসে থাকতে পারি না। ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি: দণ্ডক, দণ্ডক-ভাই! কাকস্য পরিবেদনা! পাহাড়ের গায়ে গায়ে ডাক ঘুরে বেড়ায়। সর-সর করে মস্ত এক সাপ সরে গেল পথের পাশ দিয়ে। কপালক্রমে এটি ভদ্র-স্বভাবের, নির্গোলে তাই সরে গেল। ফোঁস করে ফণা তুলতেও পারত। তখন খেয়াল হল, চেঁচামেচি ঠিক হচ্ছে না আর এখন। ঘোরাঘুরিও উচিত নয়। বনের বাসিন্দা ওঁরা, সারাদিন ঝিমিয়ে থাকেন, ফুর্তি-ফার্তির সময় এবারে। ঝুমুপ-আঁধারি রাত, তার উপর ঘনপত্র গাছের ছায়া—অন্ধকার নিবিড় হল দেখতে দেখতে। গাছে উঠে পড়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। জ্বরে হাঁসফাঁস করছি, পুরোপুরি চেতনা আছে তা-ও মনে হয় না। তবু কিন্তু বুদ্ধি এসে গেল—কোমরের গামছাখানা পরে ধুতি দিয়ে সর্বদেহ আষ্টেপিষ্টে বাঁধলাম ডালের সঙ্গে। আরও জ্বর বেড়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেও ভুঁয়ে না পড়ে যাই।

সে রাত্রে পশ্চিমঘাটের পর্বত-সানুতে উৎসব পড়ে গেল। দিনের ঘুম ভেঙে অরণ্য জেগে উঠছে। হাওয়া দিয়েছে, পাতায় লতায় ফিসফিসানি আওয়াজ। কল-কল করে জল নামছে কোথায়। জন্তু জানোয়ার ছুটোছুটি করছে ছায়ান্ধকারে বনের অন্ধিসান্ধিতে—ভারি মজার লুকোচুরি খেলা। শহুরে মানুষ আপনাদের এ-বস্তু আন্দাজে আসবে না। রাত্রিচর পাখি আকাশের গায়ে কাল কাল রেখা টেনে ছুটোছুটি করছে, বুনো ফলের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অদূরের কোন গাছে। সারা বনের সমস্ত ডালপালা ভরে জোনাকিরা আলো সাজিয়েছে। কত জানোয়ারের কত রকম ডাক—কচি গলার কান্নার মতন, খলখল করে হেসে ওঠার মতন। বাঘের হামলা এক

একবার তাড়া দিয়ে যেন সব থামিয়ে দিচ্ছে। জ্বরটা আরও বেড়েছে, আধেক ঘুম আধেক জাগরণে চারিদিক বিচিত্র লাগে। ভয়ও হচ্ছে। বনভূমের নতুন মানুষ আমি—বাসিন্দাদের কারো নজরে না পড়ি, অতিথিকে উৎসবে টেনে নামিয়ে না নেয়।

ভোরের আলোয় আবার সব নিঃশব্দ। রঙ্গালয়ে পট পড়ে গেছে। কে বলবে অত কাণ্ড চলছিল রাত্রে! গাছ থেকে নেমে এসেছি। চারিদিক এখন মরা। জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াই—কোথায় জনপদ, কোথায় মানুষ! বন্ধু হও শত্রু হও—মানুষ কেউ যদি থাক, কথা বলে ওঠ। দণ্ডক সেই ছুতো করে ভেগে পড়ল। দোষ দিই নে—একটা দিনের চেনা রোগি নিয়ে পড়ে থাকতে যাবে কেন? অরণ্যে চিৎকার করে বেড়াই: কে আছ গো, কে আছ?

জ্বর থাকার দরুন খিদেটা নেই। তেষ্টা আছে, ঝরণাও তেমনি পায়ে পায়ে। ঝরণায় নেমে আঁজলা ভরে জল খাই। বিকালের দিকে এমন সুবিধাটাও গেল। কড়া উপোসের ঠেলায় জ্বর কায়দা হয়ে আসছে, এবং তারই উপসর্গ—চনমন করছে পেট। কি খাই, কি খাই? লতায় লতায় লাল টকটকে ফল ফলে আছে একরকম। একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছি—বাপরে বাপ, কী উৎকট তিতো! থুঃ থুঃ—। আবার ভাবছি, কুইনাইন জ্বরের ওষুধ—মুখে দিয়েছি তো গিলেই ফেলি, জ্বর যেটুকু আছে ছেড়ে যাবে। ফল খোঁজাখুঁজিই চলল তারপরে। আমের কাছাকাছি এক ফল—আঁটি খুব মোটা, কিন্তু মিষ্টি। কোঁচড় ভরে সেই ফল পেড়ে নিচ্ছি—

মহিষ যেন একটা। গ্রাম তবে নিকটেই। দড়ি ছিঁড়ে মহিষ এসে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। উঠি-কি-পড়ি ছুটেছি সেদিকে। একটা নয়, পিছনে আরও আছে। বিস্তর মহিষ, সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সবগুলো। সে নজর ভাল ঠেকে না—হিংস্র, ভয়ঙ্কর। কী সর্বনাশ, বুনো মহিষের দল। একটা বড় গাছের গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে দেখছিলাম, ফনফন করে উঠে পড়লাম। এই কাজটা খুব ভাল পারি। যতক্ষণ নিচে ছিলাম, মহিষগুলো তাকিয়ে ছিল স্থির চোখে। উঠছি দেখে তীরের বেগে ছুটে এল। লতাপাতা ছিঁড়েখুঁড়ে আসছে, মাটি উঠছে খুরের ঘায়ে। এসে করল কি—গাছে ঘা মারছে শিং দিয়ে। এদিক দিয়ে মারছে, ওদিক দিয়ে মারছে। এই প্রকাণ্ড গাছ কাঁপছে থর-থর করে। আর আমি জোঁকের মতন লেপটে আছি ডালপাতার ভিতরে। আছি কি নেই, বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ হাঁকডাক ও লড়ালড়ি করে মহিষেরও বোধকরি সেই সন্দেহ হয়—গাছে নেই, ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে।

অন্ধকার হল, ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলে গেল দুশমনগুলো। নির্জন বনে আরও একটি রাত্রি আমার। কোঁচড়ের সেই ফল খাচ্ছি, আর আঁটি ফেলছি ছুঁড়ে ছুঁড়ে...

গাছের চূড়া থেকেই দেখে নিয়েছি সরু এক জলধারা। নদী পেয়ে গেছি, এ নদী ছাড়ব না কিছুতে। উত্তাল স্রোতে জল চলেছে, কিনারে কিনারে চলেছি আমি। নদী নিশ্চয় জনপদে নেমে গেছে—যেখানে গ্রাম আছে, মানুষ আছে। পায়ে-চলার পথ একটু যেন? বর্ষায় শ্যামল ঘাসের উপরে পায়ের দাগ—কোন মানুষ হেঁটে চলে গিয়েছে। ঈশ্বর, চিহ্নটুকু না হারায় যেন কোন রকমে! খানিকটা গিয়ে পদচিহ্ন নদীর জলে নেমে গেল। অতএব পার হয়ে গেছে সেই মানুষ। পাহাড়ে-নদী, জল অল্প। পাথরের চাঁই মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে। সেই পাথরে পা রেখে রেখে—বুঝে দেখুন আমার অবস্থা, পেটে ভাত নেই, জ্বরে পিষছে দু-দিন ধরে—পাথরে পা রেখে রেখে নদী পার হচ্ছি। একবার সামলানো গেল না, জলে পড়ে গেলাম। উপুড় হয়ে পড়েছি। আর যাবে কোথায়—করাল স্রোত নুড়ির মতন গড়িয়ে নিয়ে চলল। মিনিট দুয়েকে মাইল খানেক গেছি অন্তত। প্রাণের ভয়ে আঁকুপাকু করছি, হাত বাড়াচ্ছি এটা-ওটা ধরবার জন্য। ধরে ফেললাম গোড়া আলগা এক গাছের শিকড়। শিকড় ধরে ঝুল খেয়ে ডাঙায় উঠলাম। বিষম কষ্ট হয়েছে, কষ্টের চোটে গড়িয়ে পড়ি সেইখানে।

তারপরে সামলে নিয়ে চোখ মেলে দেখি, নারকেলের ছোবড়া। নারকেল হলে ভাবতাম জলে ভেসে এসেছে। ছোবড়া মানুষের হাতে ছাড়ানো, মানুষ আছে তবে কাছাকাছি। আমার অবস্থা ঐ ছোবড়া হাতে নিয়ে এক পাক নেচে নেবার মতন। সোনার তাল পেলে মানুষে অমন করে না।

আর কয়েক পা গিয়ে—সৌভাগ্যের অন্ত নেই—পোড়া কয়লা। রান্নাবান্না করে গেছে, ছেঁড়া কলাপাতা পড়ে আছে। কাঁঠালগাছ দেখা গেল, বিস্তর কাঁঠাল ফলেছে। তারপর ক্ষেতখামার—পুরুষ-মেয়ে চাষবাস করছে। আহা রে, মানুষ দেখে চোখ জুড়াল! বেড়া-ঘেরা বাগবাগিচা—নারকেল-বাগান, কাঁঠালগাছ, কলাবাগান। তার পিছনে খোড়োঘর—পূর্ববাংলায় কলাবাগানের মধ্যে ঠিক যেমনধারা ঘর দেখতে পান।

এক বাড়ি ঢুকে পড়লাম। ভর-দুপুর, তা বুঝবার জো নেই—আকাশ থমথম করছে মেঘে। মেয়ে-পুরুষ কাউকে দেখছিনে—ঐ যা দেখে এলাম। ক্ষেতে গিয়েছে বোধহয়। শুধু বাচ্চার দঙ্গল। ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে। কাকে কি বলি, কে আমার কথা বুঝবে? তা খাবার না জুটল,

কোলে তুলে ধরি তো একটা-দুটোকে। হল না—হুড়দাড় করে সব পালাল।

বৃষ্টি এল। ফুল-লতাপাতায় এক বাড়ির ফটক সাজিয়েছে। আটচালা মতন টিনের ঘর—মানুষজন গুলতানি করছে—বৃষ্টি বাঁচাতে তাদের দাওয়ায় উঠে পড়লাম। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে। সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছি, ক'জনে এগিয়ে এল।

কে তুমি?

চুপ করে আছি। মোম দিয়ে গোঁফ-মাজা—উনিই বাড়ির কর্তা বলে ঠেকছে—গর্জন করে উঠলেন: সত্যাগ্রহী নাকি তুমি? ঠিক করে বল।

চাট্টি খেতে দেবেন আমায়?

বেরোও, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলাম, বসে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। সত্যাগ্রহের মহড়া দিয়ে নিই অভদ্র লোকটার কাছে।

যাবে না?

বৃষ্টি ধরুক—

ধরুক না ধরুক, যেতেই হবে তোমায়। এক্ষুনি।

মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে ছাঁচতলায়, জল গড়িয়ে নয়ানজুলিতে জমছে, ঝিলিক দিচ্ছে আকাশে—মুগ্ধ হয়ে আমি এই সব স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করছি।

শুনতে পাচ্ছ না?

কোন অজুহাত মানল না। ঘাড় ধাক্কা দিল লোকটা। ক্লান্ত রোগা শরীর—উঠানে গড়িয়ে পড়লাম বৃষ্টি-জলের মধ্যে। এর পরেও রেহাই নেই—দাওয়ায় এসে হুঙ্কার দিচ্ছে: ছুতো ধরে পড়ে থাকলে হবে না। ওঠ্—উঠে পড় বলছি।

মরি, সে-ও ভাল—এই ছ্যাঁচড়া জায়গায় তিলার্ধ আর নয়। টলতে টলতে বেরুলাম। শরীরের সঙ্গে মনও দুর্বল হয়ে গেছে। চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো। হায় রে, এই মানুষ এরা সব! বদনাম শুনি পর্তুগিজ পুলিশ ও সৈন্যের সম্পর্কে। সে প্রভুদের সঙ্গে কখন মোলাকাত হবে জানিনে। কিন্তু এদের কাণ্ড দেখে রি-রি করে জ্বলছে সর্বাঙ্গ। বেরিয়ে পড়েছি, তবু ছাড়ে না। ঐখান থেকে চেঁচাচ্ছে, গুণে গুণে পা ফেলছিস—চলে যেতে মন সরে না বুঝি?

কড়া স্বরে জবাব দিই: সরতে চাইছে না পা। দু-দিন খাইনি, অসুখ

হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের জানানো মিছে। বরঞ্চ জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থাকব, তোমাদের মতন মানুষের কাছে নয়।

আবার চোপরা করে—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

দুই বীরপুরুষ সেই বৃষ্টি-জলের মধ্যে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল। হাতে লাঠি। লাঠি উঁচিয়ে বলে, এত জায়গা থাকতে এখানে মরতে এসেছে! গ্রাম-ছাড়া করে দিয়ে আসব তোকে।

রাগে রাগে পা ফেলছিলাম—অতঃপর প্রাণের আতঙ্কে দস্তুরমতো ছুটতে আরম্ভ করেছি। ঐ লাঠির এক ঘা যদি বসিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে খতম। হাঁক দিয়ে ওঠে: কানা গরুর ভিন্ন গোঠ। ওদিকে কোথায় রে, ডাইনে—

অতএব ডাইনে ঘুরি। সুঁড়িপথ। পিছন পিছন ওরা তাড়া করে আসছে। আড়ালে এসেই দু-জনে কিন্তু হাতের লাঠি ফেলে দিল। দু-দিক দিয়ে এসে কাঁধের নিচেটায় ধরেছে। খানাখন্দ জলে ভরতি, ব্যাং ডাকছে—এই রেঃ, দেয় বুঝি দুই মরদে মিলে জলসই করে!

কিন্তু না, লাঠি ফেলে দিয়ে তারা আর এক মানুষ। আমার কাঁধের নিচে হাত বেড় দিয়ে দেহভার তারাই বয়ে চলেছে। বলে, ও-বাড়ির মেয়ের বিয়ে। অনেক লোক জমেছে, তার মধ্যে কে ভাল-মানুষ, কে পুলিশের চর, ঠিকঠিকানা নেই। সত্যাগ্রহীর কথা শুনলে পুলিশ বাড়ি ঢুকে তছনছ করবে। বড্ড অত্যাচার হল তোমার উপরে! কপালের ওখানটা ছড়ে গিয়েছে বুঝি—আহা-হা!

অবাক হয়ে গেছি। মারমুখী মানুষের মুখে পলকের মধ্যে এমন সহানুভূতি বেরোয়! যাচ্ছি আর মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছি একটু করে। বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে, এই বড় রক্ষা। বললাম, তোমাদের গ্রামটা বড্ড বড় তো—কতক্ষণে যে শেষ হবে!

বড় তো বটেই, দেড়-শ ঘর বসতি। তা তোমার কি ভাবনা? না পেরে ওঠ, এর পরে পাঁজাকোলা করে নেব!

পথের পাশে গাছতলায় যণ্ডাগুণ্ডা একজন যেন ওত পেতে ছিল।

সত্যাগ্রহীকে গ্রামের বের করে দিচ্ছ তোমরা?

সেই লোক দুটো থতমত খেয়ে যায়: অবস্থা জান তো তুমি! তার উপরে ওটা হল বিয়ে বাড়ি—

যণ্ডা লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে, যাওয়া হবে না মশায়। সবাই গরু-ভেড়া নয় ওদের মতো। সত্যাগ্রহী ঠাঁই পায় নি শুনলে দশখানা গ্রাম থুতু দেবে আমাদের।

রোষদৃষ্টি হেনে তাদের বলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পালাও—বিদেয় হও শিগগির। যা করতে হয়, আমি করব। পুলিশ এলে বলে দিও, ভীমরাও আটকেছে।

আমার হাত মোক্ষম এঁটে ধরে ভীমরাও কটমট চোখে তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা এক ব্যাপার! আমি যেন একটা বল বা ঐ গোছের কিছু—আমায় নিয়ে লোফালুফি চলছে। তারা অনেক দূর চলে গেল—ভীমরাও তখন বলে, রাতটুকু তো জিরিয়ে নাও, কাল তারপরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। কোন জায়গায় থাকবে, দেখতে দেব না ওদের। কাউকে বিশ্বাস নেই। তবে রাজ-অট্টালিকা হবে না, সেটা মশায় আগেভাগে বলে দিলাম। সত্যাগ্রহ করতে এসেছ জায়গার খুঁতখুঁতানি কেন থাকবে?

যেন আমি ইতিমধ্যে দরবার করে রেখেছি রাজ-অট্টালিকার জন্য। কিন্তু ঐ মেজাজের উপর কথা বলতে যাবে কে! লোক দুটো চলে গেছে, ভীমরাও তখনো চুপচাপ। হঠাৎ তাড়া দিয়ে ওঠে: এমনি তো হেঁটে চলবার মুরোদ নেই, অত দাঁড়াবার তেজ আসে কোথা থেকে? গাছের শিকড় রয়েছে, ওর উপর বসে পড়লে গতর কি ক্ষয়ে যাবে?

ভয়ে ভয়ে সেই পথের ধারে বসে পড়তে হল। ভীমরাও সহসা কোমল হয়ে বলে, ঘোর না হলে যাওয়া যাচ্ছে না ভাই। কে কোথায় দেখে ফেলবে। বোসো আর একটু। পথ বেশি নয়। দু-চার পা এখান থেকে। হাঁটতে পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে বলি, খুব—খুব—

পারবে বই কি! এত বড় কাজে এসেছ, কোনটা না পার তোমরা?

নিয়ে তুলল এক গোয়ালঘরে। বাড়ি নয়, খামার—ফসল তোলে এ জায়গায়। মালিক বোধহয় জানেও না কিছু—গোয়ালে গরু তুলে জাবনা দিয়ে রাতের কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছে। ভীমরাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে সন্তর্পণে ঝাঁপের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পিছনে আমি। অন্ধকারে চোখ জ্বলে যেন তার—আমি কিছু দেখছি না, ওরই মধ্যে একটা কোণে নিয়ে গিয়ে বলে, ভাল কপাল তোমার। এতখানি শুকনো ফাঁকা জায়গা। বস, আরাম করে বসে পড়—

বসিয়ে দিয়েই বেরুচ্ছে। আস্তে আস্তে বলি, একটু যদি জল পাওয়া যায়—

ভীমরাও থমকে দাঁড়াল: রাত্তিরটা জল খেয়ে কাটাবে ?, চটে আছ গাঁয়ের উপরে—জল খেয়ে পড়ে থাকবে, অন্নগ্রহণ হবে না। এত বড় দুর্বাসা মুনি, তবে এসব কাজে কেন এসেছ শুনি ?

এবং মিনিট দশেকের ভিতর থালায় করে ভাত ডাল আর কি-একটু তরকারি নিয়ে এল। আলো নেই—এসব হাত ঠেকিয়ে বুঝে নিচ্ছি। বলে, অন্ধকারে খেতে হবে। কেরোসিনের যা দর, এমনিই তো কত মানুষ আলো জালে না। কোন লাটসাহেব হে তুমি, একটা রাত আঁধারে কাটাতে পার না ?

ভাগ্যিস অন্ধকার! আমার অবস্থা তাই দেখতে পেল না। দেখলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলত। অথবা কান্না আসত। ভাত এমন বস্তু, আগে কখনো ভাবতে পারি নি। কিন্তু হলে কি হবে—দু-গ্রাস পেটে না পড়তে নাড়িভুঁড়ি অবধি পাক দিয়ে উঠল। যেটুকু ভিতরে গেছে, দশ গুণ অন্তত হড়হড করে উগরে দিলাম। বিশ্বভুবন বনবন করে পাক খেতে লাগল। তারপরে আর কিছু জানি নে…

চেতনা ফিরলে দেখি, একা ভীমরাও নয়—আর-একটা মেয়ে এসে জুটেছে। অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাইনে, ঝিনমিন গয়না বাজিয়ে সেঁক দিচ্ছে আমার হাতে পায়ে। গোয়ালের সাঁজালের আগুন ভীমরাও হাতপাখার বাতাস দিয়ে দিয়ে গনগনে করে তুলেছে। এত সেঁকছে, শীত যায় না তবু। সর্বদেহে কাঁপুনি। লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই, ভয়ও হচ্ছে। উঠে বসতে যাই।

সেরে গেছি আমি। আর দরকার নেই। তোমরা চলে যাও।

ভীমরাও বলে, যাব তোমার হুকুমে নাকি ? উঠো না বলছি, ভাল হবে না। উঃ, কম জ্বালান জ্বালিয়েছ! এই ননীর দেহ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোও কোন আক্কেলে ?

স্বর নামিয়ে মেয়েটাকে বলে, দুধটা এইবারে খাইয়ে দাও। দেখ তো, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয় এতক্ষণে।

জবাব না দিয়ে মেয়েটা দুধের বাটি আগুনের উপর ধরল। চুড়িপরা নিটোল হাতের একটুকু। আসল রং ঠিক জানি নে, আগুনের আঁচে খানিকটা গৌর দেখাচ্ছে।

ভীমরাও বলে, দুধ খেয়ে নাও—চাঙ্গা হবে। বমি করে জায়গাটা নোংরা করে ফেলেছ, দু-খানা বেঞ্চি জুড়ে খাট বানিয়ে দিচ্ছি। মজা কত—আমি বেটা কাঁধে বয়ে বেঞ্চি এনে দিই, উনি তার উপর শুয়ে শুয়ে পা দোলান!

বেঞ্চি আনতে ভীমরাও কোন দিকে চলে গেল। মেয়েটি এবার কথা

বলে ওঠে। সহজ হিন্দি—আর কী মিষ্টি গলা! বলে, সত্যাগ্রহী, দুধটুকু খাও। আমায় আশীর্বাদ কর। আজকের দিনে তুমি রাগ করে থাকলে সুখশান্তি হবে না আমার জীবনে।

চমক লাগে, এমন কথা বলে কেন? বলছে, বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, সেই থেকে তোমার খোঁজ করছি। চুরি করে এসেছি মাপ চাইবার জন্য। বাড়ির কেউ জানে না। আমার এমন দিনে, সত্যাগ্রহী, তুমি রাগ করে থেকো না।

বিয়ের কনে এই? কোন গতিকে একটু আলো এসে পড়ত এই গোয়াল-ঘরে—করুণাময়ীকে দেখে নিতাম! কেমন চেহারা জানিনে। কপালে জলজ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা? বিয়ের কনে কেমন সাজ করে এদের দেশে? গয়না তো বাজছে, কোন কোন গয়না পরে এসেছ ওগো কন্যে?

একটু পরে বেঞ্চি ঘাড়ে ভীমরাও এসে পড়ল। বলে, দুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে? বাঃ বাঃ! এবারে বাড়ি যাও তুমি, বেশিক্ষণ এখন বাইরে থাকে না। দুধ নিয়ে এসে খুব ভাল কাজ করেছ, বুদ্ধির কাজ করেছ।

খাইয়ে-দাইয়ে ওরা চলে গেছে। একলা আমি—আর গরুগুলো। মশা হয়েছে—গরু পা দাপাচ্ছে। আমিও এপাশ-ওপাশ করছি মশার কামড়ে। স্বপ্নের মতো লাগে—নরম হাতে কতক্ষণ ধরে মেয়েটা সেঁক দিল, আর শিশুর মতন মাথাটা তুলে ধরে দুধ খাইয়ে গেল।

অনেক রাত্রি। ভারী বুটের আওয়াজে চোখ মেললাম, ঘুমের ভাব কেটে গেল। বুটজুতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোয়ালঘরের কানাচে। পুলিশ টের পেয়ে গেছে। দরমার বেড়ার এক জায়গায় ফাঁক—টর্চ ফেলছে সেখান থেকে। টর্চের আলো মুখের উপর পড়েছে। আমার ঘুম ভাঙে না কিছুতে, মরে ঘুমুচ্ছি। দুমদাম লাথি পড়ছে। দরজার ঝাঁপ ছিঁড়ে পড়ে গেল। খুঁটি বেয়ে টকাটক উঠে পড়ে চালের বাতা খুঁজছে—কি খুঁজছে বলুন তো? বোমা-পিস্তলবাব সেরেস্তবে রেখেছি কিনা। আর জন চারেক ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমায় বন্দুক তাক করে। গণ্ডগোল করেছি কি দেহের চার জায়গায় একসঙ্গে ছিদ্র করে দেবে। পা তুলে মারল এক বুটের লাথি। গড়িয়ে পড়লাম উল্টো দিকে! সেদিক দিয়ে মারল আর একজন। কী ভয়ানক ঘুম বুঝুন, ঘুম আমার কিছুতে ভাঙে না শেষটা চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে চোখের পাতা জোর করে খুলে দিল। না জেগে আর উপায় কী?

কে তুমি?

আমি সত্যাগ্রহী—

এদিক দিয়ে ঠাই করে এক চড় তো ওদিকে মুখ ঘুরে যায়। ওদিককার চড়ে মুখ আবার সিধে হয়। শেষটা আর নিয়ম নেই—এলোপাথাড়ি মারছে কিল-চড়-ঘুসি।

কত জন এসেছ তোমরা, তারা সব কোথায়?

আবার চোখ বুঁজেছি আমি। ঘুম ধরেছে, শুনতে পাই নে। হাতে কুলোয় না তখন—লাঠি বের করল। বাঁশের ও রবারের ছোট ছোট লাঠি। শেষটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলল অন্য এক জায়গায়।

রাতে ভাল ঠাহর হয় নি—সকালবেলা দেখতে পাচ্ছি, সেই গোয়ালের মতন খোড়োঘর নয়, পাকা দালান। দালান পাকাই বটে—তবে এ দালান যখন বানিয়েছিল, অনুমান করি, পর্তুগিজরা তখনো এসে জোটে নি। আজকে উজ্জ্বল রোদ, কিন্তু কালকের বৃষ্টির জল টপটপ করে চুইয়ে পড়ছে ছাত থেকে। বৈশাখ মাসে পুণ্যার্থীরা তুলসীগাছে ঝারি বসান, আমার সর্বাঙ্গে তেমনিধারা জলের ঝারি ঝরছে।

ন'টা নাগাত দরজার তালা খুলে ডাকল: বাইরে এস সত্যাগ্রহী।

ফাঁড়িতে নিয়ে এসেছে। সাইনবোর্ডে পাচ্ছি, বিচুলি জায়গাটার নাম। আফিসের বড় বারান্দায় পুলিশরা বসে। সেখানে নিয়ে দাঁড় করাল।

কি ঠিক করলে, বলবে সব কথা? দেখ, চুপ করে থেকে পার পাবে না। মুখ দিয়ে কথা না বেরোয় তো জিভ ছিঁড়ে বের করব। যা জান, বলে যাও।

হুঁ।

বর্ডারে নিশ্চয় অনেক সত্যাগ্রহী দেখে এলে?

হুঁ।

উৎসাহ ভরে একজনে খাতা বের করে নিল।

কত হবে? আন্দাজেই বল না হে! কোন্ পথে আসছে তারা? কুচকাওয়াজ হচ্ছে শুনলাম ওদিকে—সত্যি?

হুঁ।

আরও চলল কিছুক্ষণ। শেষটা খাতা ছুঁড়ে দিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরে—এক কথা কাঁহাতক বলি, বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা। দিন পাঁচ-ছয় কেটে গেল। সেলে আটক থাকি, সকালবেলা বারাণ্ডায় নিয়ে নিয়মিত ডলাই-মলাই করে। দিনে রাতে দু-খানা পাউরুটি ও দুই গ্লাস জল বরাদ্দ। বেরুতে দেবে না। ঘরের মধ্যেই নোংরা হচ্ছে, তা বলে উপায় নেই।

একজন বুড়ো পুলিশের উপর তদারকের ভার। লোকটা খৃস্টান, কথাবার্তায় সেটা টের পেলাম।

গোয়া ইণ্ডিয়ার মধ্যে ঢুকে গেলে তো গির্জা ভাঙবে তোমরা। পৈতে পরিয়ে আমাদের পুজোয় বসিয়ে দেবে।

ইণ্ডিয়ায় লাখো লাখো গির্জা। গিয়ে দেখগে যাও। আর বিশ পুরুষ ধরে যাদের পৈতে, তারাই সব হেলায় এখন পৈতে ফেলে দিচ্ছে—নতুন করে পৈতে পরাবে কেন?

একদিন লোকটা জিজ্ঞাসা করে, ভাইবোন ক'টি তোমরা?

একলা।

বিয়ে করেছ?

না।

মা-বাপ বর্তমান আছেন?

মা ছোট্ট বয়সে মারা যান। বাবা আছেন—বয়স হয়েছে, নড়তে নড়তে পারেন না।

আচ্ছা পাষণ্ড তো বুড়ো! ছেড়ে দিলে কোন্ প্রাণে?

না বলে চলে এসেছি।

আসবে বই কি! এমনি ধনুর্ধর ছেলে তোমরা আজকাল। এত যে সাজা পাচ্ছ—বাপের মনে কষ্ট দিয়েছ, তারই ফল। বেশ হচ্ছে, আমি বড্ড খুশি।

চটেমটে চলে গেল। কিন্তু মজা হল তারপর। আস্ত পাউরুটি এখন কেটে কেটে দেয়। এক গাদা, খেয়ে শেষ করা যায় না।

তাই একদিন বললাম, ক'টা রুটি কাট তুমি?

একটা। তাই হুকুম হয়েছে, বেশি দিয়ে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব। শকুনের চোখ ঘুরছে চারিদিকে।

একটা রুটির এতগুলো টুকরা?

রুটিটা বড় ছিল। একখানা করেই দিতে বলেছে, কী ওজনের হবে বলে দেয় নি তো!

ঠাহর করলাম, রুটির টুকরোয় চিনি ছড়ানো। মাখনের মতো কি একটু লাগানো, এমনও সন্দেহ হয়। আর একদিন জানলার গরাদ দিয়ে কাগজে জড়ানো খানিকটা ভাজি এসে পড়ল।

ছয় দিনের দিন যথারীতি সেই বারাণ্ডায় দাঁড় করিয়েছে। আজকে বেশি জমজমাট। বারাণ্ডা ভরে গেছে। লালচে-মুখ পর্তুগিজ আছে, কটকটে

কালো নিগ্রো আছে—গোয়ার দেশি লোকেরা তো আছেই। একটা নতুন লোক—সাজপোশাকে অফিসার মনে হয়—কোমল স্বরে শুভার্থীর মতন বলে, এত কষ্ট করে লাভটা কি হবে বলতে পার? গোয়া ভারতে গেলে নেহরু আর সাঙোপাঙ্গদের মজা। তোমাদের নামও কেউ জানতে পারবে না।

ঘাড় নেড়ে সায় দিই: আমার নাম আবার জানতে যাবে কে?

বোঝ তবে। খবরাখবর বল দিকি সমস্ত। টাকা পাবে, আমোদ-স্ফূর্তি পাবে। এমন স্ফূর্তি—যা তোমাদের ধারণায় আসে না। যে রকমটা চাও। বন্ধু হলে আমরা তাকে বড্ড খাতির করি।

বটেই তো!

পুলকিত পর্তুগিজ অফিসার আমার দিকে ও সকলের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল: বল সবাই সালাজার জিন্দাবাদ!

সবাই তাই বলল। আমার ক্ষীণ কণ্ঠে কেবল ভিন্ন রকম: ভারত জিন্দাবাদ!

অফিসারের ফরসা মুখ কাল হয়ে গেছে। পাশের একজন বলে, এই শয়তানি চলছে এদ্দিন ধরে। একখানা কাঠই শুধু—মানুষ নয়। শুকনো কাঠখানা আমরা পাহারা দিয়ে মরছি। কিম্বা হয়তো কোন মন্তোর জানে। আমাদের হাত ব্যথা হয়ে যায়, ওর গায়ে লাগে না।

আমি তখন বলি, কেন এঁদের হাতের কষ্ট দেওয়া? পাঞ্জিমে পাঠিয়ে দিন, বিচার হোক।

অফিসার বলে, অদ্দুর যেতে হবে না। বিচার আজ এখানেই। বিচারের জন্যে আমি এসেছি।

বলিদানের আগে যেমন পাঁঠা পাছড়ায়, জন কয়েক তেমনি করে ধরল আমায়। চকচকে ক্ষুর বের করল। গলায় বসিয়ে জবাই করবে? আপনারা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু কেমন রোখ চেপে গেছে—আমি তখন জীবনে বীতস্পৃহ একেবারে। ইচ্ছে করেই তো মরতে এসেছি।

না, গলা কাটল না। খরখর করে ভ্রূর অর্ধেকখানি কামিয়ে ফেলল। মাথার এখানে ওখানে খোঁচা খোঁচা চুল তুলে নিচ্ছে। হাসছে সকলে হো-হো করে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বলে, চুল তুলে নিলাম—তা রাগ কোরো না, কালো রঙে মিলিয়ে দিচ্ছি আবার—

আলকাতরা ঢালল মাথার সেই সব জায়গায়। দেখছে মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—শিল্পবস্তু মানুষে যেমন করে দেখে। বলে, খাসা দেখাচ্ছে—চমৎকার! এবারে কান দুটো। দুটো কান কেটে নিয়ে ছেড়ে দেব তোমায়।

ক্ষুর, ধরে সত্যি সত্যি কানে পোঁচ দিতে যায়। দু-হাতে কান চেপে ধরে মাথা ঘোরাচ্ছি এদিকে-ওদিকে: গলা কেটে ফেল আমার। সেই ভাল। কান ছুঁতে দেব না।

অফিসার লোকটা সদয় হয়ে তখন বলে, যাকগে, যাকগে। দুটো কানের দরকার নেই, একটাতেই হবে। একটা নিয়ে নাও, আর একটা ওর থাক। কাটা-কান ইণ্ডিয়ায় পাঠাব—এর পরে যারা আসছে, বুঝেসমঝে আসে যাতে।

বিষম হুটোপাটি। গায়ে আমার অসুরের বল এসেছে। মানুষগুলোকে ঘা-গুঁতো দিয়ে ছিটকে নেমে পড়লাম। তখন মরিয়া। মারুক কাটুক—তার আগে শুনিয়ে যাই, যে জন্য এত কষ্ট করে এত পথ এসেছি। পতাকা নেই আমার সঙ্গে—মুখে মুখে চেঁচাচ্ছি: ভারত জিন্দাবাদ! ছুটে বেড়াচ্ছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে: ভারতের জয় হোক—তোমাদের আমাদের সকলের ভারত।

ধর্ ধর্—

কতক্ষণ পারব? জাপটে ধরেছে আবার। অফিসার বজ্রকণ্ঠে হুকুম দেয়, পায়ের তলা চিরে দাও। হেঁটে হেঁটে জন্মে আর সত্যাগ্রহে না আসতে পারে!

*　　　*　　　*

সত্যাগ্রহী শিরিষ-কাগজ ঘষছিলেন আলমারিতে। পালিশ হবে। কাগজ রেখে পা তুলে ধরলেন আমার দৃষ্টির সামনে। বললেন, পা দেখাচ্ছি—কিছু মনে করবেন না। নয়তো ভাবতেন, বেটা গালগল্প চালিয়ে গেল। পুঁজ হয়েছিল, সেই অবস্থায় সীমান্তে এনে এক রকম ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দিল এপার-মুখো।

ঘা শুকিয়ে গেছে, তবু গা ঘিনঘিন করে ওঠে। পায়ের তলায় লম্বালম্বি আড়াআড়ি অগুন্তি সরলরেখায় জাল বুনে গিয়েছে।

সত্যাগ্রহী বলেন, হাঁটতে পারি নে। জুতো পায়ে হাঁটতে গেলেও পা টনটন করে। তাই এই বসা কাজ ধরেছি। ফার্নিচার পালিশের কাজ। কাজটা ভাল। খাটনির কিছু নয়, দিন গেলে তিন-টাকা চোদ্দ-সিকে রোজগার।

বাদাবন

প্রমথ হালদার লাট কুড়ুলতলা থেকে ফিরছিলেন।

একটা জঙ্গল জরিপ হচ্ছে। সরকারি বোটখানা নিয়ে চৌধুরি সাহেব অনেক দূরে সুপতি অঞ্চলে বেরিয়ে গেলেন, এঁরা ডিঙায় আসছিলেন তাই। চৌকিদার ও মাঝিমাল্লা জন আষ্টেক সঙ্গে। আর আছে বন্দুক, সড়কি, হেঁসোদাও। ভাঁটার খরস্রোতে দুলে দুলে বাদারাজ্যের রাজচক্রবর্তী সম্রাটের মতো প্রমথ যাচ্ছিলেন।

তিনখানা বোঠে পড়ছিল। হাতের ইঙ্গিতে সহসা প্রমথ তাদের থামতে বললেন। তামাক খাচ্ছিলেন, হুঁকো নামিয়ে মাঝিকে ফিসফিস করে নির্দেশ দিলেন হালটা আলগোছে ছুঁয়ে রাখতে জলের উপর—যাতে কোন রকম সাড়া-শব্দ না হয়। কূল ঘেঁসে ধীরে ধীরে ডিঙা এগুতে লাগল।

পাড়ের মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি আর কোথায়—বলাঝোপ, গোলবনের শিকড়, শূলো। দোয়ানিয়ার মুখে এল। প্রমথ বাঁদিকে আঙুল বাড়ালেন। অর্থাৎ ঢুকতে হবে ঐ দোয়ানিয়ায়।

মাঝি চরণদাস ঘাড় নাড়ে। সে-ও পুরানো লোক। এত উজান কেটে নৌকো তোলা দুষ্কর তো বটেই—তা ছাড়া দোয়ানিয়ার দু-মুখ দিয়ে অতিক্রুত জল নামছে, নৌকোর তলি এখনই বসে যাবে নোনা-কাদায়। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গরম বাদা, জনমানবহীন। প্রমথর হাতে টোটার বন্দুক আছে যদিচ, তবু ও-জায়গায় অতক্ষণ ঐভাবে নিশ্চল হয়ে থাকা ঠিক হবে না।

প্রমথ প্রণিধান করলেন। ভেবেচিন্তে ঐখানে খালের মুখে ডিঙি রাখতে বললেন। চৌকিদার কালীপদকে প্রশ্ন করেন, শুনতে পাস?

কালীপদ কান খাড়া করল। এক ধরনের মৃদু আওয়াজ আসছে এপার ওপার দু-দিক থেকে। বলে, বাঁদর—

ঠিক বলেছিস। থেমে আবার একটু শুনে নিয়ে প্রমথ বললেন, হুঁ, বাঁদরই।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বলে উঠলেন, এই—এইবার?

কু দিচ্ছে। বাঁদর ছাড়া আর কি!

প্রমথ বিরক্ত হয়ে বললেন, কান দিয়ে শুনিস তোরা, না কি? আসল-বাঁদর আর নকল-বাঁদরে তফাত ধরতে পারিস নে?

কালীপদর কাছে সাধারণ বানরের ডাক—কিন্তু প্রমথ নিঃসংশয় ভাবে বুঝেছেন, মানুষই বানরের মতো ডাকছে। গাছাল দিচ্ছে মানুষ। এবং এ মানুষ—সঠিক বলা চলে না যদিচ—অম্বিক বিশ্বাসদেরই কেউ হওয়া সম্ভব। শিকারের পাশ নিয়ে তাঁদের স্টেশন থেকে সম্প্রতি কেউ বাদায় ঢোকে নি। দিন দুপুরে বিনা-পাশে বাদায় ঢোকা—অম্বিক ছাড়া এত সাহস কার?

বললেন, নেমে গিয়ে দেখে আয় তো খানিকটা এগিয়ে।

শূলোবন ও নোনাকাদা ভেঙে জঙ্গলে ঢোকা সহজ নয়। হয়তো সবটাই প্রমথর মনের কল্পনা। কিন্তু হুকুম হয়েছে, উপায় নেই—দু-জন মাল্লা সঙ্গে নিয়ে মুখ বেজার করে কালীপদ নেমে গেল।

ক্ষণ পরে ফিরে এসে পরমোৎসাহে বলে, ঠিক ধরছেন কর্তা। গাছের মাথায় গুটিশুটি হয়ে আছে।

উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে সকলে বাদায় নামলেন। মাদার আর হীরালাল ডিঙি আগলে রইল। বলে গেলেন, ফিরতে যদি দেরি হয়—ইতিমধ্যে রান্নাবান্না সেরে রাখে যেন। একটা গাদা-বন্দুকও রইল তাদের জিম্মায়। ভাঁটার টানে জল যদি অত্যধিক সরে যায়, নৌকো নাবালে সরিয়ে বাঁধতে বললেন

জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বানরের বড় মিতালি। বানরে কেওড়াগাছের ফল-পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে আর কু-কু করে নিমন্ত্রণ জানায়। ডাক শুনে হরিণের দল গাছতলায় আসে। শিকারিরাও অবিকল বানরের মতো করে ডাকে—খাওয়ার লোভে হরিণ এলে গুলি করে গাছের উপর থেকে। গাছাল দেওয়া বলে এই রীতিকে।

বাদায় ঢুকে পড়ে প্রমথ হেন ব্যক্তিও দিশাহারা হচ্ছেন আজকে। চারিদিক থেকে কু-কু আওয়াজ। কোনটা খাঁটি আর কোনটা নকল, ঠিক করবার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়ান। অনেক জল-কাদা ভেঙে ও শূলোর গুঁতো খেয়ে আন্দাজ মতো একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। কা কস্য পরিবেদনা! নির্জন নিঃশব্দ—অথচ এই এতক্ষণ একটানা ডাক শোনা যাচ্ছিল এখান থেকে। হ্যাঁ—এই জায়গাই বটে! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন—হঠাৎ ধ্বনি ওঠে পিছনে, যে দিকটা অতিক্রম করে এলেন তাঁরা। নোনা রাজ্য—পৌষ মাস হলেও শীত প্রখর নয়। ঘোরাঘুরিতে ঘাম ঝরছে। কোট ভিজে জবজবে হয়ে গেছে গায়ের ঘামে এবং অসাবধানে চলাচলের দরুন জল-কাদা ছিটকে উঠে। পা রক্তাক্ত হয়েছে কাঁটার খোঁচায়, কিন্তু অম্বিক বিশ্বাসের

নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রমথ এমন মশগুল যে আঘাত টেরই পান নি। আড়াই প্রহর অতীত হল, সঙ্গের লোকেরা অধীর হয়েছে ফিরবার জন্য। আর প্রমথ ঘুরে ঘুরে যত নাজেহাল হচ্ছেন, জেদ তাঁর তত বেড়ে যাচ্ছে।

মানুষটা তো চোখে দেখেছিস কালীপদ। গেল কোথা?

দলের মধ্যে একজন গুণীন আছে—জলধর। গুণীন বলেই খাতির করে তাকে বনকরের চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাদায় নামবার সময় সে সঙ্গে থাকবেই। ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে জলধর বলে, মানুষ হলে ঠিক পাওয়া যেত। যাবে কোথা? পাখনা নেই যে উড়ে পালাবে।

ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। অনেকের মনেই ঐ রকম সন্দেহ, প্রমথর সামনে মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। বাদাবনে হিংস্র প্রাণী অনেক—সাপ বাঘ দাঁতাল কুমির। আরও আছে—তারাই সব চেয়ে ভয়াবহ। আদিকাল থেকে অসংখ্য লোক অপঘাতে মরেছে—লোকালয়-সীমার বাইরে আরণ্য রাজ্যে স্বচ্ছন্দবিহার করে তারা। নানাবিধ মূর্তি ধরে উদয় হয়—বাঘের মূর্তি, সাপের মূর্তি। অব্যর্থ বাঘবন্ধন মন্ত্রেও সে বাঘের আক্রমণ ঠেকানো যায় না, সে সাপের বিষ নামাতে পারে এমন ওঝা ত্রিভুবনে নেই। মানুষের চেহারা নিয়েও কখন কখন দেখা দিয়েছে, এমনধারা শোনা যায়। আজকের ব্যাপারেই বোঝ না কেন—দেড় প্রহর থেকে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, এখন এই প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যাবেলাতেও এদিক-ওদিক থেকে তেমনি কু-কু ডাক এসে বিভ্রান্ত করছে। মানুষের কাজ বলে আর ভরসা করা যায় কি করে?

জলধর বলে, ফেরা যাক কর্তামশায়।

ভাষাটা প্রার্থনার, কিন্তু আদেশের আমেজ কণ্ঠস্বরে। বাদাবনের অশরীরী অধিবাসীদের সুলুকসন্ধান এতগুলো লোকের মধ্যে একমাত্র তারই কিছু জানা। তার কথা অবহেলা করা চলে না।

যাবার সময় কাদায় পা বসে বসে গিয়েছিল, গোলপাতায় গেরো দিয়েছিল মাঝে মাঝে। সেইসব চিহ্ন ধরে অনেক দুঃখে অনেক বার পথ হারিয়ে অবশেষে তাঁরা দোয়ানিয়ার মুখে ফিরে এলেন। ডিঙির পাত্তা নেই। জোয়ার এসেছে। জঙ্গলের অনেক দূর অবধি জল উঠে ছলছল করছে। শেষ-ভাঁটায় নৌকো যদি দূরে নিয়ে বেঁধে থাকে, এখন তো আবার যথাস্থানে এসে পৌঁছবার কথা। হু-হু করে বাতাস বইছে, ভরসন্ধ্যায় জল বেশ কনকনে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ উদ্বেগে প্রমথ সতৃষ্ণ চোখে দূরের দিকে চেয়ে আছেন, পকেট থেকে বাঁশি বের করে হুইশিল দিচ্ছেন বারংবার। বাঁশির আওয়াজ বনভূমির দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জবাবেও ঠিক

ঐ রকম আওয়াজ আসবার কথা। নৌকোর লোক যেখানে থাকুক, বাঁশিতে শিস দেবে—এই নিয়ম। কিন্তু কোন শব্দসাড়া নেই। হল কি? মুখ শুকনো সকলের।

মাদার ও হীরালালকে পাওয়া গেল অবশেষে। গাছে উঠে বসে ছিল, সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। কালীপদ রাগে চেঁচিয়ে ওঠে: কর্তা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে। হারামজাদা তোরা ঘাপটি মেরে ছিলি কোথায় বল্? নৌকো কোথা?

ভয়ে তারা জবাব দিতে পারে না। তাদেরই অপরাধ। ভাঁটা সরে যাওয়ার পর অল্প জলে পাশখালিতে মাছ ধরার ভারি সুবিধা। ভাত চাপিয়ে দিয়ে দু-জনে ওরা পাশখেপলা নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। এমন হল, মাছের ভারে জাল টেনে তোলা দায়। বাছাই মাছ গোটাকয়েক করে খালুইতে ফেলে বাদ বাকি জলে ছেড়ে দিচ্ছে। কত নেবে—কী হবে অত মাছ দিয়ে? মনের আনন্দে জাল ফেলতে ফেলতে এমনি অনেকটা দূর এগিয়েছে—তারপর খেয়াল হল, ভাত ফুটে গেছে এতক্ষণে—নামাবার প্রয়োজন। ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল। কোথায় কি- গোটা ডিঙিটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। নোঙর ফেলা ছিল, শক্ত কাছি দিয়ে বাঁধা ছিল বাইনগাছে সঙ্গে—এমনি ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুলে নিয়ে গেছে কারা নৌকো।

বন্দুক ছিল যে!

বন্দুক সঙ্গে নিয়ে জাল ফেলবে কি করে—বাঁশি. বন্দুক সমস্ত নৌকোয় ছিল। সব গেছে। এমনটা যে হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবেনি।

প্রমথ চোখ পাকালেন একবার তাদের দিকে। স্টেশনে গিয়ে পৌছতে পারলে ভয়ানক কিছু হবে লোক দুটোর সম্পর্কে, সন্দেহ নেই। এখনই তো কালীপদ ক্ষণে ক্ষণে মারতে যাচ্ছে: কোন আক্কেলে নৌকো ছেড়ে যাস তোরা? খা—খালুই-ভরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে চিবিয়ে খা এখন। আর কি করবি!

জলধর ধীরকণ্ঠে বলল, ওসব থাক। ফিরবার উপায় ভাব আগে।

খিদেয় সকলের নাড়িসুদ্ধ হজম হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু স্টেশনে কেমন করে ফিরবে, সেইটে বড় ভাবনা। নদী-খালে পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। আর এই রাত্রিবেলা।

প্রমথ প্রশ্ন করলেন, দেওড় শুনতে পাস?

কোথায়?

সত্যি সত্যি বন্দুকের দেওড় হলে এতগুলো লোকের মধ্যে প্রমথ ছাড়া কারও কিছু কানে গেল না, এমন হতে পারে না। কিন্তু শুনতে পেয়েছেন প্রমথ। কেবল কানে শোনা নয়, চোখের উপরও যেন দেখতে পাচ্ছেন— অম্বিক বিশ্বাসই চালাকি করে সরকারি ডিঙি নিয়ে বাদাবন কাঁপিয়ে তাঁদেরই বন্দুকে দেওড় করতে করতে জয়যাত্রায় চলেছে। আর প্রমথরা বনপ্রান্তে অপমানে দুর্ভাবনায় পৌষের শীতে হি-হি করে কাঁপছেন, নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া কিছু করবার নেই।

প্রমথ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ যে—ঐ শোন্—

অনতিদূরে হা-হা-হা হাসির শব্দ। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। এই তো— একেবারে কাছে। ক্ষিপ্ত প্রমথ জলকাদা ভেঙে ছুটলেন। আরও অনেকে ছুটল।

কালীপদ দেখিয়ে দিল, মানুষ নয়—ভীমরাজ পাখি। লেজ নাড়ছে ডালে বসে।

নির্জন অরণ্যভূমে এই এক আশ্চর্য পাখি মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের কণ্ঠস্বরে গম্ভীর উচ্চহাসি হাসে; অবোধ্য ভাষায় কাকে যেন কি আদেশ দেয়। দেখা গেল, জলধর বিড়বিড় করে কি বলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। সে এদের শুধুমাত্র পাখি বলে স্বীকার করে না।

শুকনো কাঠ-পাতা জ্বেলে দোয়ানিয়ার ধারে তাঁরা জেগে বসে কাটালেন। স্টেশনে পৌঁছতে পরের দিন বিকাল। নিতান্ত প্রমথ হালদার বলেই পৌঁছতে পারলেন শেষ পর্যন্ত।

এসে দেখলেন, সেই ডিঙি ঘাটে বাঁধা। রাত্রির মধ্যেই রেখে গেছে। স্টেশনের পাহারায় যারা ছিল, কেউ টের পায় নি। প্রমথদের যথেষ্ট নাজেহাল করা হয়েছে, ডিঙির আর প্রয়োজন কি! বন্দুক দেয় নি- নিয়ে নিয়েছে সেটা।

প্রমথ ক্ষেপে উঠলেন, মরে মরে পাহারা দিচ্ছিলি বেটারা? ডিঙি না রেখে তোদের বোঝাই করে নিয়ে পিঠটান দিল না কেন? আপদ চুকত তা হলে।

অস্নাত অভুক্ত প্রমথ পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, অম্বিক বিশ্বাসকে জব্দ তিনি করবেনই। চিরজীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে দেবেন, আর যাতে বাদাবনে শয়তানি করতে না আসে!

নিজেদের ভুলত্রুটি যথাসম্ভব রেখেঢেকে সদরে বন্দুক-চুরির রিপোর্ট পাঠালেন। কড়া পুলিশ-পেট্রোল শুরু হল। খুব উত্তেজনা চলল দিনকতক। খোঁজে খোঁজে বহু জায়গায় হানা দেওয়া হল—অম্বিক বিশ্বাসের আস্তানা মেলে না। আস্তানা নেই। আয়েসে মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা এবং

সুখশান্তির সংসারধর্ম থাকলে এমন উচ্ছৃঙ্খল কেউ হতে পারে! এই দেখ না, ঝড়ের মতো আচমকা জঙ্গলে এসে পড়বে। কোন পথে কি উদ্দেশ্যে আসবে, বুঝবার উপায় নেই আগে থাকতে। কখনো আসে হরিণ মারতে, কখনো কাঠ কিংবা গোলপাতা কাটতে, কখনো মোমমধু ভাঙতে, আবার কখনো বা নিতান্তই অকারণে বোধকরি বনকরের কর্তাদের ক্ষেপিয়ে মজা দেখবার জন্য। আইনকানুনের ধার ধারে না, সরকারের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা দিয়ে পূর্বাহ্নে অনুমতি নেওয়া বোধকরি ওরা কাপুরুষতা বলে মনে করে। ঝুনঝুনি স্টেশনের কাছাকাছি এসে বন্দুকের দেওড় করে। প্রমথ ভাবেন, তাঁদেরই সেই গাদা-বন্দুকটা। মানসেলায় দেশি কামারের তৈরি বিনা-পাশের বন্দুক অজস্র পাওয়া যায়, তেমনি কোন বন্দুক হওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু এদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে প্রমথর মনে ভেসে ওঠে সেদিনকার অপমানকর স্মৃতি।

বছরখানেক কাটল। উত্তেজনা অনেক শান্ত হয়েছে। জলপুলিশের টহল প্রায় বন্ধ। অম্বিকদের বাদা-অভিযানের খবরও ইদানীং শোনা যায় না। চৌধুরি সাহেবের ধারণা, তাঁদের তোড়-জোড় দেখে ভয়ে সে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু প্রমথর রাগ যায় নি। যত শান্তশিষ্ট হয়েই থাক, জব্দ তাকে করবেনই—অপমানের শোধ তুলবেন। বাদা অঞ্চল ছেড়ে ছুড়ে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, সেটা অবশ্য আলাদা কথা।

গুয়াতলির সপ্তাহান্তিক হাট। দুই নদীর মোহানার উপর হাটখোলা। সকাল থেকে খরিদ্দার জমে, বেলা যত বাড়ে হাট তত জমজমাট হয়, নৌকোয় নৌকোয় দুটো নদীর জল প্রায় অদৃশ্য হয়ে ওঠে। তারপর হাটবেসাতি সেরে নোঙর তুলে হাটুরেরা একে দুয়ে নৌকো ছাড়ে, রাত্রি প্রহরখানেক হতে না হতে জনকোলাহল একেবারে স্তব্ধ। গুয়াতলি প্রেত-পুরীর মতো থমথম করে। এমনি অবস্থায় ছ'দিন—ছ'টা দিন ও ছ'টা রাত্রি—তিন-চার শ' টিনের চালা নিঃসীম আকাশের নিচে নদীর মোহানায় জোয়ার-ভাঁটার উচ্ছলতা নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখে শুধু। একটি লোক নামে না ওখানে, একটি মানুষের কণ্ঠ শোনা যায় না।

বাদাবনের সঙ্গে বহির্দেশের যোগসূত্র এই হাট। বাদাবনের লোক পুরো সপ্তাহের চাল-ডাল তেল-নুন আনাজপত্র কিনে নিয়ে যায়। আর নিয়ে যায় ডাকের চিঠি ও খবরের কাগজ। জীয়ন্ত পৃথিবীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও হাসিকান্নার ধ্বনি খানিকটা সঙ্গে করে নিয়ে আবার জঙ্গলে ঢোকে। হাটবারের পর

যেন উৎসব পড়ে যায় স্টেশনের হেঁসেল-ঘরে, বাওয়ালিদের নৌকোয় নৌকোয়—শাকপাতা ও কাঁচা আনাজ রান্না-খাওয়া হয়। দুটো তিনটে দিন পরে আবার যথাপূর্ব অবস্থা—তরিতরকারির মধ্যে মিঠাকুমড়া ও গোল-আলু।

প্রমথ এবার নিজে এসেছেন গুয়াতলি। কষ্টসাধ্য ভ্রমণ—পুরো দেড়টি দিন লাগে যাতায়াতে, বেগোন হলে আরও বেশি। খাওয়া-দাওয়া হয় না পথে, আধখানা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু চৌধুরি সাহেবের আদেশ—গুয়াতলির কুতঘাটায় লঞ্চ থামিয়ে তিনি কিছু জরুরি কাজকর্ম সেরে যেতে চান প্রমথর সঙ্গে। খাস জঙ্গল কুন্দুলতলায় এবার পাশ দেওয়া হবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা। সময়ের নির্দেশ নেই—অতএব সেই ভোরবেলা থেকে ঘাটের অফিসে প্রমথ অপেক্ষমান। হাট ভাঙতে চলল—প্রতি মুহূর্তেই আশা করছেন, বাঁক পার হয়ে চৌধুরির লঞ্চ দেখা দেবে এইবার। চাপরাশিটা বারান্দায় বসে ঢুলছে। বিষম বিরক্তি লাগে প্রমথর। কথা দিয়ে কথার ঠিক রাখেন না—কী রকম সাহেবলোক এঁরা! খাঁটি সাদা সাহেব আর দেশি সাহেবে তফাৎ এইখানে। কিন্তু আর থাকা কোনক্রমে তো চলে না! তা হলে কাল দুপুর অবধি—যতক্ষণ আবার ভাঁটা না লাগে—একটানা বসে থাকতে হবে এমনি। এলেন না চৌধুরি সাহেব—আসবার হলে অনেকক্ষণ এসে যেতেন।

এবারে প্রমথ বোটে করে এসেছেন। মাঝি সেই চরণদাস। সে-ও অস্থির হচ্ছে। হাটুরে নৌকো এবং যত পুবদেশি ব্যাপারি নৌকো ঘাট খালি করে চলে গেল। হাটের চালায় এই এখানে সেই ওখানে দু-একটা টেমি জ্বলছে। শেষরাতের জোয়ার ধরবে ওরা, বিড়বিড় করে টাকাপয়সার হিসাব করছে, কিম্বা তিন টুকরো কাঠ পুঁতে তার উপর নতুন হাঁড়িতে রান্না চাপিয়েছে। বিষম বিরক্ত হচ্ছে চরণ—ছোটখাট বাড়ির মতো বিপুলায়তন এই বোট—গোন মারা গেলে মরা-হাতির মতো চরে চেপে পড়বে, কাছি বেঁধে সকলে মিলে টানাটানি করেও এক হাত নড়ানো যাবে না॥

কত্তা এলেন ?…কে ? কে গা তুমি ?

কুতঘাটার জোরালো পাঞ্চের আলোয় দেখা যায়, কমবয়সি একটি মেয়ে, হাতে নতুন গামছায় বাঁধা বোঁচকা, ধীরেসুস্থে বোটে এসে উঠল।

বিস্মিত চরণদাস প্রশ্ন করে, কে তুমি ? যাবে কোথায় ?

মেয়েটা জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না। কাড়ালে উবু হয়ে বসে রগড়ে রগড়ে পায়ের কাদা ধোয়। পরিপুষ্ট গড়ন। নোনা-রাজ্যে গৌরবর্ণ প্রত্যাশা করা যায় না, কিন্তু কালোর মধ্যে দিব্যি চিকণ আভা।

চরণদাস পুনরপি বলে, ভুল হয়েছে গো ভালমানুষের মেয়ে। গয়নার-নৌকো এ নয়।

চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা। বড় বড় চোখ। দৃষ্টি দিয়ে হেলা ভরে তাকায় যেন বিশ্বভুবনের সব-কিছুর প্রতি। বলল, জানি, গয়নার-নৌকো ছেড়ে গেছে। অনেক কেনাকাটা করতে হল। ছুটোছুটি করে ঘাটে আসব—তা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। দেরি হয়ে গেল।

যাবে কোথা তুমি ?

সে প্রশ্ন কানে না নিয়ে পুঁটলি খুলে ফেলে মেয়েটা আবার ভাল করে বাঁধতে বসে।

জলতরঙ্গ চুড়ি কিনলাম। কেমন হল দেখ দিকি—মানাবে ? এই সেমিজ কিনেছি। চুড়িগুলো সেমিজে জড়িয়ে রাখা যাক। তা হলে ভাঙবে না, কি বল ? চুড়ি দু-জোড়া চার আনা নিল—ঠকিয়েছে ?

চরণ বলে, আমরা চুড়ি কিনি নে। দর জানব ক্যামনে ?

চুড়ি-সেমিজ শুধু নয়, তরল আলতা, চুলের কাঁটা, ছাপা-র মাল— রাশিকৃত শৌখিন জিনিস। গর্বিত কণ্ঠে মেয়েটা বলে, অপরে এমন পছন্দ করে কিনতে পারে! নিজে তাই চলে এলাম। সবাই জানে, মাসির বাড়ি এসেছি। হি-হি-হি—

চরণ বিরক্ত হয়ে বলে, সরকারি না আমাদের এটা। জঙ্গলে যাচ্ছি।

যাও না যে চুলোয় খুশি! বকডোবার চরে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেও।

সুখ কত! তিন বাঁক ঘুরে যাচ্ছি তোমায় বকডোবা নামাতে! এমনি বলে কোন্‌খানে চাপান দিয়ে থাকতে হয়, ঠিক নেই। নেমে যাও বাছা, অন্য নৌকোর চেষ্টা দেখ।

মেয়েটা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : অন্য নৌকো থাকলে তোমাদের খোশামুদি করতে আসি! বয়ে গেছে, আমার পা কাঁদছে।

খোশামুদির বহর দেখে চরণদাসের ইচ্ছে করে লগির বাড়িতে ঘন চুল-ভরা মাথাটা তার দু-ফাঁক করে দেয়। চাউনির রকম দেখে মেয়েটাও হয়তো বুঝেছে। আর কথা কাটাকাটি করল না, মাদুর গুটানো ছিল—সেইটা পেতে পুঁটলি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে আবার বুড়ো দাঁড়িকে হুকুম করছে নবাবনন্দিনী : তোমার ঐ আগুনের মালসা নিয়ে এস তো মুরুব্বির পো।

দাঁড়ি কানে নেয় না, আপন মনে তামাক খাচ্ছে।

এবারে একেবারে মধু-ঢালা কণ্ঠ। বলে, পা মচকে গিয়ে বড্ড টাটাচ্ছে। মালসাটা এদিকে এনে একটুখানি যদি সেঁক দিয়ে দাও।

বজ্জাতি বোঝ। বুড়োর দিকে চেয়ে এখনও বলছে বটে, কিন্তু এবারের লক্ষ্য এক ছোকরা—বনমালী। কলকের জন্য বুড়োর সামনে অনেকক্ষণ থেকে যে সতৃষ্ণ নয়নে বসে আছে। এমন তামাকের পিপাসা—কিন্তু মুহূর্তে তা ভুলে গেল। মালসা সহ মেয়েটি কাছে গিয়ে আগুনে দু-হাতের চেটো গরম করে পায়ের উপর ব্যথার জায়গায় চেপে চেপে ধরছে। কোন দিকে তাকায় না বনমালী—আর সকলে কি ভাবছে, ভ্রূক্ষেপ করে না।

গোড়ার দিকে আঃ-আঃ—করে বেদনা বা আরাম জানাচ্ছিল মেয়েটা। পরে শব্দসাড়া নেই। এতক্ষণে প্রমথ এলেন—দূর থেকে দেখেই বনমালী সরে বসেছে।

প্রমথর মন-মেজাজ ভাল নয়। পথ আটকে পাটাতনে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে আছে—প্রমথ হাঁক দিলেন: কে রে তুই?

বিস্তর চেঁচামেচিতে মেয়েটা একটুখানি পাশ ফিরে শুল।

বোটের লোকজনের উদ্দেশে প্রমথ বললেন, তোরা কি করছিলি রে? অর্ধেকখানি জুড়ে চেপে পড়েছে, এ হিমালয়পর্বত নামিয়ে দেওয়া সোজা হবে এখন?

বুড়ো দাঁড়ি বলে, কথা কানে নেয় না। কী করা যাবে। এসে সটান শুয়ে পড়ল। পা সেঁকিয়ে নিল বোনাকে দিয়ে।

চরণদাস বলল, ছুঁড়ি উঠবে না, ছুতো ধরে পড়ে আছে। আর দেরি করলে কিন্তু সুতারখালির মুখে বেগোন পড়ে যাবে, নৌকো বেঁধে চৌপহর বসে থাকতে হবে।

প্রমথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ঠিক, ঠিক! ছেড়ে দাও। কিন্তু মুশকিল এই উড়োআপদ নিয়ে।

বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, কতকাল ঘুমোয় নি যেন। প্রবল স্রোতে বোট ছুটেছে। এতগুলো পুরুষলোকের মধ্যে একলা সোমত্ত মেয়ে—আর এদের গন্তব্যপথ নির্মানব বনভূমি—তা বলে এতটুকু ভয় বা সঙ্কোচ নেই।

ঘণ্টা দুই পরে চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা উঠে বসে।

কোথায় এলাম গো?

কেউ জবাব দিল না। কূলের দিকে তাকিয়ে সে স্থান নিরূপণের চেষ্টা করে।

উই তো—সুতারখালি ঐ যে!

প্রমথ খালি গায়ে আয়েস করে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন। তাঁর দিকে চেয়ে অনুনয় করে বলল, বাবুমশায়, বকডোবায় নামিয়ে দিতে বল ওদের।

প্রমথ সজোরে ঘাড় নাড়লেন: পাগল নাকি! অতখানি ঘুর—তা ছাড়া জায়গাটা অতি খারাপ।

ভাল জায়গা এ তল্লাটে আছে কোথাও? এই যে যাচ্ছি—এ বুঝি বড্ড ভাল! ও-বছর ভাসন্ত নৌকোয় কাটা-মানুষ পাওয়া গেল, সে তো এইখানেই।

প্রমথর বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। বকডোবার মতো অত ভয়ানক নয় যদিচ, এই সুতারখালির মুখেও নৌকো-মারার ইতিহাস আছে। দপ করে একবার জোরালো আলো জ্বলে উঠল এই সময়টা পাড়ের দিকে কোথায়। অন্ধকার-মগ্ন ক'টা জেলে-ডিঙি সাঁ করে এধার-ওধার পাশ কাটিয়ে গেল। বুড়ো দাঁড়ি কলকে ধরাতে যাচ্ছিল, প্রমথ নিম্নকণ্ঠে নিষেধ করলেন: উঁহু, আলো জ্বালিস নে। কাজ কি! আগুন অনেক দূর দেখা যায়। মালসা ঢাকা দিয়ে দে বরং। সব ক'টা দাঁড় পড়ুক। হাল টেনে যাও চরণদাস, ঝিমোও কেন?

মেয়েটা বলে: নিয়ে চললে কোথা গো?

চরণদাস মেজাজের সঙ্গে জবাব দেয়, ঝুনঝুনি বনকর-আফিস—

একটু তবে পাড়ে ধর। আমি নেমে যাই।

চরণদাস আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে? বকডোবা এখান থেকে কত পথ তা জান?

যেতেই হবে। না গিয়ে ছাড়ান নেই।

বলে সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

চরণদাস বলে, পথঘাটের কোন রকম নিশানা নেই কিন্তু। চার-চারটে খাল পার হতে হবে।

সমস্ত জানি মুরুব্বির পো। আমরা হলাম গে বাদাবনের জন্তু—

চরণদাস আবার সতর্ক করে: এ বাদা বড্ড গরম (অর্থাৎ বাঘের ভয় আছে), জলে কুমির-কামট।

কপালে থাকলে নিয়ে যাবে। এই যে না'র উপরে আছি, তোমরাই বা কী আরামে রেখেছ!

বনমালী বলে, জন্তু-জানোয়ারে খাবে না এখানে।

খাবে না কি বল? খাচ্ছেই তো!

আঙুল দিয়ে দেখাল সে প্রমথর দিকে। বলে, তোমাদের ঠাকুরমশায় লোক কিন্তু সুবিধের নয়। চোখ দিয়ে খুবলাচ্ছে কী রকম, ঐ দেখ।

বেকুব হলেন প্রমথ। আড়চোখে ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছিলেন তিনি নিটোলস্বাস্থ্য স্বল্পবাস মেয়েটার দিকে। কে না তাকায়! চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি তাড়া দিয়ে ওঠেন: চোপরও হারামজাদি!

দাঁড়ি-মাঝিরা উপভোগ করছিল। প্রমথর কিঞ্চিৎ বাহিরফটকা নজর আছে, সবাই জানে। মেয়ে উচিতমতো জবাব দিয়েছে।

চরণদাস জিজ্ঞাসা করে, কি নাম তোমার গা?

ভমর - ভমরমণি—

ভমর নও মা-লক্ষ্মী, ভীমরুল—

ভমর সহসা পুঁটলি তুলে উঠে দাঁড়াল।

পেন্নাম হই ঠাকুরমশায়। নৌকো পাড়ে ধরতে বললাম, তা তো শুনলে না। চললাম।

ভয়াল নদীস্রোতের মধ্যে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দুর্নিরীক্ষ্য তটসীমা। নোনা জলতরঙ্গ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে বোটের গায়ে, অত বড় বোট অসহায়ের মতো আন্দোলিত হচ্ছে—ভমর ঝাঁপ দিল এরই মধ্যে। কুমীর-কামট ওৎ পেতে রয়েছে, লোকে পা ধুতে সাহস করে না এই অঞ্চলের নদী-খালে। এই নদী সাঁতরে কূলে উঠে বকডোবা অবধি নাকি পায়ে হেঁটে চলে যাবে! আত্মহত্যাই বলা উচিত একে।

ঝুনঝুনি ফিরে চৌধুরি সাহেবের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি নিয়ে লোক পৌছবার আগেই এঁরা গুয়াতলি রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই মিছে হয়রানি হল। চৌধুরি লিখেছেন—সোজা স্বপতি চলে যাচ্ছেন তিনি, গুয়াতলি হয়ে যাবার অবসর হল না, প্রমথ ঐ স্বপতি গিয়ে দেখা করেন যেন তাঁর সঙ্গে। অতি সত্বর—কারণ দু-একদিন মাত্র থেকে ডেসপ্যাচ-স্টিমারে কলকাতা চলে যাবেন।

জোয়ার-ভাঁটার হিসাব করে দেখা গেল এই মুহূর্তে পুনশ্চ যাত্রা করলে কায়ক্লেশে চৌধুরি সাহেবের সাক্ষাৎ মিলতে পারে। দুটো ভাতে-ভাত খেয়ে নিলেন সকলে। প্রমথ শুধে বসে থাকবেন, তাঁর কথা হচ্ছে না— পেটে ভর না থাকলে মাঝি-মাল্লারা পেরে উঠবে কেন?

ঝড় উঠল সন্ধ্যার কাছাকাছি। বলেশ্বর-বিষখালির সঙ্গমস্থল—বড় ভয়ানক জায়গা। জল যখন শান্ত থাকে, তখনও পার হতে বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে পাকাপোক্ত মাঝির। আর এখন ঘনকালো মেঘের প্রাচুর্যে একটুখানি চিকণ আভা আকাশের কোনখানে নেই। জলতরঙ্গ

সংখ্যাহীন্ ক্রুদ্ধ সরীসৃপের মতো দূরদিগন্ত থেকে ছুটে আসছে—লক্ষ্য যেন এদেরই এই নৌকোটা। জনালয়ের চিহ্ন নেই কোনদিকে।

চরণদাস শক্ত হাতে হাল ধরে আছে স্থির পাষাণ-মূর্তির মতো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অলক্ষ্য কোন তটভূমির দিকে। খরস্রোতে আর পিঠেন বাতাসে হু-হু করে বোট ছুটেছে। চরণদাস ছুটতে দিয়েছে—এ অবস্থায় বিরুদ্ধতা করতে গেলেই বোট উল্টে যাবে। যায় যেখানে, যাক। মচ-মচ করে হালে বিষম আওয়াজ হচ্ছে এক-একবার। জলতাড়নায় ভেঙে বুঝি দু-খণ্ড হয়ে যায়। মজা বাধে তা হলে। দিকচিহ্নহীন জলরাশির উপর দু-একবার পাক খেয়ে এত বড় বোট মোচার খোলার মতো মগ্ন হয়ে যাবে। বিপদের মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তা চরণদাসের। হাত একটু কাঁপে না, মুখের উপর ভয়ের রেখামাত্র নেই।

প্রমথ বলে উঠলেন, ডাঙা কোন দিকে ?

দেখা যায় নাকি কোন-কিছু ?

তবে ? ক্রি কি হবে ?

চরণদাস রূঢ়কণ্ঠে বলে, নড়াচড়া করবেন না। শুয়ে থাকেন ছইয়ের মধ্যে ঢুকে।

হি-হি করে হেসে বলে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েন। ডুবে গেলে শীত করবে না।

পুরানো লোক চরণদাস। প্রমথ যখন কাজে ঢুকলেন, তার আগে থাকতে আছে। তাই সে ততটা গ্রাহ্য করে না প্রমথকে। আর এখন এই ভয়াল নদীর বুকে সে সর্বেসর্বা—বিক্ষুদ্ধ ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের সেনাপতি। প্রমথর ডাঙারাজ্য এটা নয়।

রাত দুপুর অবধি চলল এই রকম। অবশেষে কূল মিলল। ঘ্যস্-স্ —করে মাটিতে ঠেকল বোটের মাথা, গতি থেমে গেল। শুয়েছিলেন প্রমথ, শুয়ে শুয়ে দুশ্চিন্তার ঝড় বইছিল মনের ভিতর। হঠাৎ চরণদাসের খরকণ্ঠ : উঠে পড়েন, উঠে পড়েন—আর ভয় নেই।

কোথায় ?

মালুম হচ্ছে না। আলো দেখা গেল—সেই নিরিখে এসেছি। এসে পৌছতে পেরেছি, বাপের ভাগ্যি।

ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে এখন। ডাঙায় নামলেন প্রমথ, নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

নেমে দেখ্ না তোরা, কোন্খানে এলাম হদিস পাওয়া যায় কি না।

চরণদাস হাত কয়েক দূরে খাড়ির মুখে বোট নিয়ে যেতে ব্যস্ত। পছন্দসই জায়গাটা—চাপান দিয়ে থাকা যাবে ভাঁটার প্রতীক্ষায়। ঝড়ে জলে অত্যধিক দেরি হয়ে গেছে, কত দূর এসে পড়েছে আন্দাজ হচ্ছে না। সে যাই হোক, উজান ঠেলে চলা কোনক্রমে আর সম্ভব নয়—বোট এগোয় না, পরিশ্রমই সার।

মিটমিটে এক আলো দেখতে পেয়েছিল, সেই আলো ক্রমশ কাছে চলে এল। তিনজন লোক—কলরব করে উঠল তারা।

ঐ যে, ঐ এসেছেন।

বললাম যে, ঠিক এসে যাবেন। বিষ্টিবাদলায় দেরি হয়ে গেছে। কিছু বোলো না এখন—এসে গেছেন, সেই ঢের।

প্রমথর কাছে এসে তারা থমকে দাঁড়াল। চৌখুপির মধ্যে কেরোসিনের টেমি একজনের হাতে। লণ্ঠন তুলে প্রমথর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকায়।

কারা তোমরা?

দুশমন-আকৃতির লোক তিনটার গলার আওয়াজে বুকের ভিতরটা অবধি গুরগুর করে ওঠে। নদীকূলবর্তী এই লোকগুলোর রীতি-প্রকৃতি প্রমথর অজানা নয়। গলা শুকিয়ে কাঠ, সহসা জবাব দিতে পারেন না।

চরণদাস এসে দাঁড়াতে কিছু সাহস পেলেন। চরণদাস বলে, নৌকো বানচাল হয়ে এসে পড়েছি বাবাসকল। ভাঁটি ধরলে ছেড়ে দেব।

হাতে-লণ্ঠন লোকটা প্রমথর উদ্দেশ্য প্রশ্ন করল, কি লোক আপনি মশায়?

ব্রাহ্মণ—এই পৈতে দেখ বাবা—খাঁটি নৈকষ্য কুলীন।

তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে পৈতে টেনে দেখালেন প্রমাণ স্বরূপ। লজ্জায় সঙ্কোচে আর যা ব্যক্ত করতে পারছেন না, সেটা হল—অব্যাহতি দাও বাপধনেরা, ব্রহ্মহত্যা ও ব্রহ্মস্ব হরণ করে মহাপাতকের ভাগী হোয়ো না।

পৈতে দেখিয়ে মন্ত্রের কাজ হল। তিনজন গড় হয়ে প্রণাম করল প্রমথকে, পায়ের ধুলো গালে মাথায় দিল। গো-ব্রাহ্মণে এদের ভক্তি সুবিদিত।

আসতে আজ্ঞা হয়—চলে আসেন।

লণ্ঠনধারী লোকটা সসম্ভ্রমে আলো দেখিয়ে বাঁধের উপর উঠে দাঁড়াল।

গাঙের উপরে পড়ে কষ্ট পাবেন কেন? পাড়ার মধ্যে আসুন।

প্রমথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে: না বাবা, বেশ তো

আছি, দিব্যি আছি। আর কতক্ষণ! জোয়ারের টান একটু থমথমা হলেই নৌকো ছেড়ে দিচ্ছি।

জায়গাটা ভাল নয়, নানা রকম ভয়ভীত আছে।

প্রমথ বললেন, তোমরা বাপধনেরা রয়েছ আশেপাশে, কে কি করতে পারে?

সকলের পিছনের লোকটা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। সে হুমকি দিয়ে উঠল: গিয়ে তো দশ জায়গায় বলে বেড়াবে, বকডোবার মানুষ বিষম ছ্যাঁচড়া—সারা রাত্তির ঘাটে পড়ে রইলাম, কেউ একবার ঝিঙেনোডা করল না।

হাতে তার পাঁচ-হাত্তি পাকা বাঁশের লাঠি। মাটিতে লাঠি ঠুকে বলে, ভ্যাজর-ভ্যাজর করতে পারি নে, কাজ আছে। চলে আসেন।

লাঠির মাথার আংটা ঝুন-ঝুন করে উঠল আঘাতে। প্রমথ ও চরণদাস মুখোমুখি তাকান। কাল আসেন নি, ঝড়ে আজকে এনে ফেলল ঠিক সেই বকডোবায়।

অতএব অতিথি-বৎসল বকডোবার আমন্ত্রণে প্রমথ পাড়ার ভিতরে চললেন। লণ্ঠনওয়ালা লোকটা আগে আগে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেব পিছনে সেই লাঠিধারী। একা নন প্রমথ, চরণদাসকেও সঙ্গে নিয়েছেন।

তারা ফুটেছে দু-চারটে, আঁধারলিপ্ত চতুর্দিক অল্পস্বল্প এইবার নজরে আসে। বড-নদী এ-ধারে, পিছনে বিল। বিলে ধানের সমারোহ। উন্মত্ত তরঙ্গ-তাড়নায় পাড়ের মাটি ঝুপ ঝুপ করে নদীগর্ভে পডছে অবিরত। এই বকডোবা। জগৎ-সংসার থেকে আলাদা—তারাব আবছা আলোয় রহস্যময় নিরালা গ্রাম। হাঁটাপথে যাতায়াতের উপায় নেই। এ-বাডি ও বাড়ি যেতে হলেও ডিঙি—নিতান্ত পক্ষে মাটির গামলায় ভেসে যেতে হবে।

মনটা খারাপ ছিল প্রমথর—বাঁধের উপর জল জমে ছিল, নজরে পডে নি। জুতোসুদ্ধ তার মধ্যে পড়লেন। জল কাদা ছিটকে মাখামাখি হয়ে গেল জামা-কাপডে। লণ্ঠনধারী খানিকটা এগিয়ে ছিল, আহা হা করে কাছে এল। এত দুর্গতিও ছিল অদৃষ্টে! প্রমথর চোখের জল আসবার মতো।

নৌকোয় ফিরে যাই বাপধন—

এসে গেছি ঠাকুরমশায়। ঐ যে। কাপড় বদলে আরাম করবেন এবারে, পান-তামাক খাবেন।

নদীতট থেকে মনে হচ্ছিল, খান কয়েক খোড়োঘর নদী ও বিলের মধ্যে অনন্ত আকাশের নিচে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার মধ্যে পা

দিয়ে অবাক হলেন। খোড়োঘর বটে—কিন্তু বাদার সুন্দরীকাঠের খুঁটি, গরাণের ছিটে দিয়ে চাল তৈরি। অধিকাংশই মাটির দেয়াল-দেওয়া। দৃঢ় পরিপাটি ঘর। আর ঘরের সংখ্যাও একটা-দুটো নয়—ফাঁকা জমি বিশেষ নেই বকডোবা টিলার উপর, সর্বত্র ঘর তুলেছে। মানুষই বা কত! যে তিনজন গাঙের ধারে গিয়েছিল, সকলেই প্রায় ঐ ধাঁচের—শক্তসমর্থ জোয়ান মেয়ে-পুরুষ। বয়সে বুড়ো হলেও এরা জোয়ান থাকে। বয়সে যারা শিশু, তারাও সামান্য এক বৈঠা ভরসা করে বিশাল গাঙ পাড়ি দিয়ে মাদুর তৈরির জন্য ওপারে মাদি কাটতে যায়। অতবড় বিলের সম্পূর্ণ কারকিত এই টিলার লোকগুলোই শুধু করে।

বুক কাঁপে প্রমথর—এত সমাদর কেন তাঁকে? কী মতলবে নিয়ে এল পাড়ার ভিতরে? প্রতি কাজেই এদের বাদায় ঢুকবার গরজ পড়ে, আর বাদার ঘাঁটি আগলে বসে আছেন প্রমথরা। সে হিসাবে অহি-নকুল সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে। লোকগুলো কেমন ভাবে তাকাচ্ছে—এখানে এই পাড়ার ভিতরে যদি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে, ত্রিভুবনে কেউ কোনদিন খোঁজ পাবে না।

না, খুবই আদর-যত্ন করল। দই-মিষ্টি, কাঁঠাল, আনারস আর শসা—ভূরিভোজন হয়েছে। কোরা ধুতি-চাদর দিয়েছে বের করে, কাদা-মাখা কাপড়জামা ওদেরই একটি মেয়ে কেচে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে দুই খুঁটির সঙ্গে। প্রমথর বিষম খিদে পেয়েছিল—দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আতিথ্যে আপ্যায়িত হয়ে এখন শুয়ে পড়েছেন চাদর মুড়ি দিয়ে। চরণদাসও একটু দূরে আলাদা মাদুরে শুয়েছে।

ঘুমের আবিল এসেছিল। এসে ডাকছে: উঠুন—উঠতে আজ্ঞা হয় ঠাকুরমশায়। কত ভাগ্যে এসে পড়েছেন আজকের দিনে। উঠে আসেন—মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করবেন।

চোখ রগড়ে প্রমথ চেয়ে দেখলেন, লণ্ঠন নিয়ে যে-লোকটা পথ দেখিয়ে এসেছিল—সে-ই। পরক্ষণে একটা দল এসে পড়ল। হুড়মুড় করে কতক ঘরের মধ্যে ঢুকল, কতক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ কণ্ঠে তারা তাগিদ দেয়: কই গো—হল কি?

চরণদাস বলে, যাচ্ছি আমরা—

কিসে যাচ্ছ? গজে না ডুলিতে? রাত কাবার হয়ে যায়—এখনো যাচ্ছি!

প্রমথ উঠলেন তাড়াতাড়ি। বললেন, পায়ে শামুকের কুচি ফুটে গেছে। টাটাচ্ছে।

বলেন তো আড়কোলা করে নিয়ে যাওয়া যায়।

শুধুমাত্র মুখের কথা নয়, বক্তা সত্যি সত্যি কোমর বাঁধছে। প্রমথ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: হেঁটেই যাচ্ছি বাপধন। দেখেশুনে একটু আস্তে আস্তে যেতে হবে।

আরও তারা ফুটেছে। অল্প অল্প মেঘ আছে, কিন্তু আর বৃষ্টি হবে না বোধহয়। উঠান ঝাঁট দিয়ে ফেলে তার উপর প্রচুর তুষ ছড়িয়ে জায়গাটা শুকনো করেছে। সপ পেতে সেখানে বিয়ের আসর। উঠান, ঘরের দাওয়া, আনাচ-কানাচ ভরে গেছে নিমন্ত্রিতবর্গে। বর এসে পিঁড়িতে বসেছে।

একজন তাড়াতাড়ি বরাসনের সামনে জলচৌকি এনে দিল প্রমথর বসবার জন্য: বসেন—কত ভাগ্যি আমাদের!

বরকর্তা বরযাত্রীদলের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে প্রমথর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বসল।

বিস্মিত প্রমথ প্রশ্ন করেন, কি?

পদরজ দেন একটু। বর হল আমার ভাই। ঠাকুর স্বর্গে গেছেন। মনে বড় ভাবনা হযেছিল, ব্রাহ্মণ অভাবে বিয়ে হবে কেমনে? তা মা-কালী আপনাকে নিয়ে এলেন।

সেই লণ্ঠনবাহী লোকটা হল কনের বাপ—এখন বোঝা গেছে। সে বলে, জাত-যাওয়া কাণ্ড ঠাকুরমশায়। পুরুত আনতে রওনা হয়ে গেছে পরশুদিন—সে লোক এখনো ফিরল না। ঝড়ে বিপদআপদ ঘটল কিম্বা আর কী হল—কে জানে।

বরকর্তা বলে, নেমে এইবার আসনে বসেন ঠাকুরমশায়।

প্রমথ ঘাড় নাড়লেন: আমি পারব না তো বাবা। বাদাবনে পড়ে থাকি। পুরুতের কাজ করি নি কখনো। মন্তরতন্তর কিছু জানা নেই।

বরের ভাই সহসা হুঙ্কার দিয়ে উঠল: যে পুরুতঠাকুর আনবার জন্য গিয়েছে, তিনিই বা কী এমন দিগ্‌গজ ভটচাজ্জি! দুটো ফুল ফেলে দিলেই হল, মন্তর বেশি লাগে না আমাদের বিয়েয়।

কন্যাকর্তারও মেজাজ চড়েছে: পৈতেওয়ালা জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণ হাজির থাকতে বিয়ে হবে না, এ কি একটা কথার কথা হল!

বর ও কন্যাপক্ষীয় নানাজনের নানারকম মন্তব্য কানে আসে।

ভাবছে, কোন্ জাত কি বৃত্তান্ত—মন্তর পড়ে শেষটা পতিত হবে নাকি?

না পড়াতে চায়, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিক। তারপরে ক্ষমতা থাকে তো মন্তর আদায় করে ছাড়ব।

মন্তর মুখস্থ নেই, চকচকে পৈতের বাহার তো খুব!

পৈতে নয়—জালের সুতো গলায় পরে বেড়াও তুমি নাকি হে?

অসহায় প্রমথ নিঃশব্দে গালি হজম করছেন, এক একবার ঘাড় উঁচু করে দেখছেন চতুর্দিক তাকিয়ে। ঘরের গোলকধাঁধা। উঠে যদি দৌড় দেন তিনি এখান থেকে, এবং এরা কোন রকম বাধা না দেয়, তবু এই ধাঁধা অতিক্রম করে কিছুতেই নদীকূলে পৌঁছতে পারবেন না। যত লোক এসেছে বিয়ে উপলক্ষে, সবাই যেন এক এক পালোয়ান—মেয়ে এবং শিশুগুলো পর্যন্ত। যে কেউ একখানা হাত চেপে ধরলে নড়বার শক্তি থাকবে না।

অতএব জলচৌকি থেকে নেমে মরিয়া হয়ে বসলেন প্রমথ পুরুতের আসনে। যা-ইচ্ছে পড়িয়ে যাবেন দু-দশটা অং-বং জুড়ে দিয়ে। উপায় কি তা ছাড়া?

কনের নাম বল—

দু-আঙুলে ঘোমটা একটুখানি ফাঁক করে মুখ টিপে হাসল বিয়ের কনে।

ভমর—ভমরমণি না তুমি?

রাগ ও আতঙ্ক গিয়ে এবার প্রমথর কৌতুক লাগছে। কাপড়চোপড়ে মোড়া ভমর কতক্ষণ ধরে ঐ রকম আড়ষ্ট কনে-বউ সেজে বসে আছে! বেশ হয়েছে, আচ্ছা জব্দ ডানপিটে মেয়েটা! প্রমথ মন্ত্র অতি ধীরে ধীরে পড়াবেন—বিয়ে যাতে অনেকক্ষণ ধরে চরে চলে, ভমরমণির ঘাড ব্যথা হয়ে যায় নিচু হয়ে বসে থাকতে থাকতে।

আর বর হলগে—ওহে ছোকরা, নাম বল তোমার—

বর সবিনয়ে নাম বলে: শ্রীঅম্বিকাচরণ বিশ্বাস।

একজন পাশ থেকে বলে দিল, ওরে অম্বিক, গড় কর্। আরে, আরে—হ্যাড়া হাতে হয় নাকি? ও যদুপতি, ভাইয়ের হাতে একটা টাকা দিয়ে দাও।

পায়ের গোড়া থেকে প্রণামী টাকাটা তুলে নেবেন কি—প্রমথ অবাক হয়ে অম্বিক বিশ্বাসকে দেখছেন। রোগাপটকা তামাটে রঙের নিতান্ত এক ছোকরা—অম্বিক বলে বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন।

ইয়ারগোছের একজন—অম্বিকেরই অন্তরঙ্গ হবে—পান-খাওয়া দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলে, অম্বিককে ধরবার জন্য তল্লাট তো চষে ফেলছেন। হেঁ-হেঁ—খবর রাখি আমরা হালদারমশায়।

প্রমথ শুষ্ক মুখে প্রতিবাদ করেন: না রে বাবা। আমার বয়ে গেছে! আমি কেন ধরতে যাব? আমি কি জলপুলিশ?

আপোষে ধরা দিল এবারে। ভমরমণি ধরে ফেলল। নিজের চোখে দেখে যাচ্ছেন। বলবেন একথা পুলিশের কাছে।

বলে রসিকতার আনন্দে সে হেসে উঠল। প্রমথর কেমন মনে হল, বাদাবনের মধ্যে সেই সন্ধ্যায় ভীমরাজ পাখির মতো হাসিটা।

রাত কেটেছে। প্রভাতের শান্ত নির্মল আলো। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। ঝড়ের সেই উদ্দাম নদী এখন কাঁচা রোদে ঝিলমিল করছে। একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে নদী পার হয়ে ধানবনের উপর দিয়ে অদূরে আরণ্য ভূমির দিকে। তাদের উড়ন্ত ছায়া নিস্তরঙ্গ নদীজলের উপর দিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চরণদাস ও প্রমথ বোটে এসে উঠলেন। মুখ-বাঁধা একটা হাঁড়িতে চরণদাস নাড়ু নিয়ে এসেছে দাঁড়িদের জন্য। প্রমথর হাতে চুরি-যাওয়া বন্দুকটা। দক্ষিণান্তের সময় যদুপতি দশ টাকা দিয়েছে। অম্বিক বিশ্বাস সেই সময়টা বন্দুক এনে পদপ্রান্তে রেখে দিল।

বোট ছাড়ল। চরণদাস বড় খুশি। অভাবিত ভাল খাওয়াদাওয়া হয়েছে রাত্রে, প্রচুর আদর-আপ্যায়ন। ভরপেট নাড়ু খেয়ে দাঁড়িদেরও স্ফূর্তি খুব। হাতে হাতে হুঁকো চলছে, চরণদাস অবধি পৌঁছল। বগল এবং একটা পায়ের সহযোগে হাল ধরে আয়েস করে সে তামাক খাচ্ছে। কয়েক টান টেনে প্রমথর কথা মনে পড়ল: ইচ্ছে করবেন নাকি কর্তা?

প্রমথ জবাব দিলেন না। ভাঁটা সরে জল দূরবর্তী হয়েছে, অনেকটা কাদা ভেঙে বোটে উঠতে হল। গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে তিনি কাদা-মাখা পা ধুচ্ছেন। ধুচ্ছেন তো ধুচ্ছেনই—আর তাকিয়ে রয়েছেন বকডোবার অপস্রিয়মাণ বসতিগুলোর দিকে। চরণদাসের কথাব জবাব দিলেন না। কানেই যায় নি হয়তো তার কথা।

সহসা তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। যা ঐ বলেছিল—ধরা পড়েছে বটে অম্বিক, ভ্রমরমণির নাগপাশে বাঁধা পড়েছে। ভাল হয়েছে, বড় শক্ত ঘানি। পলাপলি খাটবে না ও-মেয়ের কাছে। কাজকর্ম ফেলে প্রমথদের আর উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে হবে না অম্বিকের পিছু-পিছু। অম্বিকের বিয়েয় পৌরোহিত্য প্রমথর পক্ষে অপমানের বটে, কিন্তু অম্বিকও জব্দ হয়েছে মোটের উপর। তাঁরা এর সিকির সিকিও জব্দ করতে পারতেন না। বড় জোর মাস ছয়েকের জেল হত—আর ভমরের এই কয়েদখানায় থাকতে হবে সমস্ত জীবনকাল। বুঝতে পেরে, অম্বিক তাই চোরাই-বন্দুক ফিরিয়ে দিল।

প্রসন্নকণ্ঠে হাঁক দিলেন, ওরে বাবা চরণদাস, কলকেটা দিস একবার। আছে-টাছে কিছু?

মায়াকন্যা

হরিপ্রসন্ন আমার বাল্যবন্ধু। দায়ে পড়ে তার চাকরি নিয়েছি। তবে সে লোক ভাল। আমি কর্মচারী, সে মনিব—বাইরের লোক আপনারা কোনক্রমে বুঝতে পারবেন না। যেন বন্ধুই আমি, খাতিরে তার কাজকর্ম করে দিই। মাসান্তে হঠাৎ একদিন খানকয়েক নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চট করে সরে পড়ে। এই হল মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে হরিপ্রসন্নর অনেকগুলো চক। নতুন আইন পাশ হল,—এবারে জমিদারি গুটিয়ে নেবার পালা। কতক জমি বিক্রি করে, কতক বা বেনামি করে, আর কতকটা জায়গায় বাগান পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে তড়িঘড়ি যতদূর বের করে নেওয়া যায়। এরই তোড়জোড়ে আজকাল বাদাবনে তার ঘন-ঘন যাতায়াত।

একবার আমায় বলল, যাবি?

অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, যেতেই হবে। রুবিকে নিয়ে মুশকিল—কার কাছে রেখে যাই? দুর্ভাগা মেয়ে, ছ-মাস বয়সে মা হারিয়েছে, আমিই মা-বাপ দুই হয়ে দেখাশুনো করি। খুড়িমা সম্পর্কের একজনকে অনেক বলেকয়ে এবং নগদ কুড়ি টাকা হাতে দিয়ে দশ দিনের কড়ারে মেয়েটাকে গছিয়ে রওনা হলাম।

বৈশাখ মাস। যা গরম পড়েছে—গাঙে খালে কয়েকটা দিন তোফা হাওয়া খেয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। এটা উপরি লাভ। সুন্দরবন শুনে ভাববেন না বনজঙ্গলই শুধু। জঙ্গল তো বটেই—হঠাৎ তার মধ্যে দেখবেন, পঙ্কের কাজ করা প্রায়-অভগ্ন পাকা-কুঠুরি—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোন অনুচর বানিয়েছিল। হয়তো রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার ইদানীং মহানন্দে বিনা-ভাড়ায় তথায় সগোষ্ঠী বসতি করছে। কখনো বা নজরে পড়বে অনেকটা ফাঁকা জায়গা—হাসিল হয়ে সেখানটা আবাদ হচ্ছে। কিংবা নদী-খালের ধারে দেখতে পাবেন ছোটখাটো দিব্যি একটা গ্রাম। কাছাকাছি বনকর-অফিস, তাকে ঘিরে মানুষ ঘরবাড়ি তুলেছে। অথবা গ্রামের মতন দেখেই সরকারি অফিস বসিয়েছে সেই জায়গায়। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না—স্বচক্ষে দেখে আসুন, কতটুকুই বা পথ আপনাদের জায়গা থেকে!

প্রথম আমরা শিবনগর কাছারিবাড়ি উঠলাম। নায়েবের সঙ্গে স্নেহা-কড়চা

রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বিষম আয়োজনে হিসাবপত্তর চলছে। কিন্তু জানি তো হরিপ্রসন্নকে। ছটফটে স্বভাবের মানুষ—দিন চারেক পরে বিরাট কড়চা-খাতা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করে বলল, এদিকে ভালই হচ্ছে নায়েবমশায়, হাঁসখালি-চকের কী গতিক একবার দেখে আসা দরকার। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বলুন—এই ভাঁটায় বেরিয়ে পড়ব।

এই হাঁসখালি যাওয়ার পথেই কাণ্ডটা ঘটল। কুক্ষণের যাত্রা—বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যে প্রাণে বেঁচে এসেছি। কিংবা বলব, পরম লগ্নে বেরিয়েছিলাম—ভাবতে আজও রোমাঞ্চ লাগে। বলছি—অত তাড়াবেন না। বলবার জন্যেই তো আসর সাজিয়ে বসলাম।

দুপুরবেলা আমাদের পানসি এক পাশখালি দিয়ে যাচ্ছে। গোটা দুই বাঁক পার হতে পারলে বড়-গাঙ। হরিপ্রসন্ন থামতে ইশারা করল মাঝিকে। হামেশাই জঙ্গলে আসে, ঝানু শিকারি—আমরা চতুর্দিকে নিঝুম নিঃসাড় দেখছি, তার মধ্যেই সে জন্তু-জানোয়ারের চলাচল টের পেয়েছে।

পানসি এক হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে নিয়ে রাখল। পনের বিশ মিনিট যায়, বন্দুকে টোটা ভরে হরিপ্রসন্ন জঙ্গলের দিকে তাক করে আছে। তার পরে দুড়ুম-দুড়ুম। হরিণ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ও লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে। এ রকম যাওয়া ঠিক নয়—কিন্তু ফুর্তির চোটে বাদার নীতিনিয়ম ভুলে গেছে।

টানাটানি করে শিকার তো নৌকোয় তুলল- বাঁকের মুখে এমন সময় মোটরলঞ্চ। শিকারের লাইসেন্স নেওয়া নেই, তার উপরে মাদি-হরিণ পড়েছে—হেন অবস্থায় বনকরের লঞ্চের সামনে পড়া আর বাঘের মুখে পড়া একই কথা। হরিপ্রসন্ন তা বলে ঘাবড়ায় না। যেন ওদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল: বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন মশায়রা। নয়তো নৌকো নিয়ে বেগোন ঠেলতে হত আপনাদের অফিস অবধি। ফিস্টি হবে—দাড়িওয়ালা সেই লোকটা আছে তো, সেই যে আহা-মরি মাংস রাঁধে? হরিণটা লঞ্চে তুলে দাও হে—

হরিণ তোলবার আগে নিজেই উঠে পড়েছে। আমাদের হাঁক দিয়ে বলে, বড়-গাঙে বেরিয়ে বিষখালির মোহানায় চাপান দিয়ে থাকগে। নিশ্বেস ফেল না, তোমাদেরও ফিস্টি—রাঁধা-মাংস নিয়ে আসব। শুধু উনুনে চাট্টি ভাত চাপিয়ে রেখ, ব্যস!

সে হল দুপুরবেলার কথা। এক পহর রাত হয়ে গেল, পেটের ভিতর বাপান্ত করছে—না হরিপ্রসন্ন, না তার আহা-মরি মাংস। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, পাশখালিতে জল ছিল না—কাদায় নেমে তিন-চার মাইল

নৌকো ঠেলেছি। মাঝিমাল্লারা সন্ধ্যে থেকে নাক ডাকাচ্ছে। একা বসে বসে আমিও কখন শুয়ে পড়েছি—একদম কিছু জানি নে।

পানসি হেলছে দুলছে—ঘুমের মধ্যে এক সময় টের পেলাম। অর্থাৎ জোয়ার এসে গেছে। বাচ্চাকে দোলনায় চাপিয়ে মা যেমন দোলা দেন, ঠিক তেমনি। মন্দ লাগে না। খানিক এমনি গেল। ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছি—

হঠাৎ মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে: সর্বনাশ হয়েছে—নৌকো বানচাল!

লাফিয়ে উঠে বসে আতঙ্কে থরথর কাঁপি। জোয়ারের টানে কাছি ছিঁড়ে নৌকো তীরের মতন ছুটছে। নোনা জলের তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত মেলে হাসছে খলখল শব্দে। যা অবস্থা, সবসুদ্ধ এতক্ষণ জলতলে যাই নে—সেই তো আশ্চর্য!

মাঝি হাল চেপে ধরে সামলাতে গেল তো মড়াৎ করে হাল দুই খণ্ড। চরমক্ষণের অল্পই আর বাকি। হাত পা কোলে করে সময়টুকু কাটিয়ে দাও—কোন-কিছুই করবার নেই। জলের কল্লোলধ্বনি আমার রুবির কান্নার মতন লাগছে। করাল অন্ধকারের পার থেকে রুবির কান্নাভরা ডাক শুনি যেন: বাবা গো, ও বাবা—

ঘন অন্ধকারে কোন জায়গায় কী অবস্থার মধ্যে ছুটছি, বোঝবার জো নেই। পাগলা হাতির মতো মাথা নাড়তে নাড়তে নৌকো হঠাৎ গতি বন্ধ করে দাঁড়াল। পাড়ে লেগেছে, লতাপাতায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে কাছি-বাঁধার মতো হয়েছে। এমন তো হয় না—বেঁচে গেলাম তবে নাকি? টেমি জ্বেলে চোখুপি-লণ্ঠনের মধ্যে পুরে উঁচু করে ধরলাম। দুটো উদ্দেশ্য—কোথায় কি ভাবে আটকে আছি, তার কিছু হদিশ পাওয়া। আর জায়গাটা যদি গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল হয়, আলো ধরে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

মস্ত এক বাঁকের মাঝামাঝি কি গতিকে কিনারায় এসে পড়েছি। যে জোরে আসছিল, পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পানসির তো কুচি-কুচি হয়ে যাবার কথা। কন্ত বুনো লতা জালের মতো আটকে ধরল। বিধাতাপুরুষ আমাদের বেমক্কা পরমায়ু দিয়েছেন, এই থেকে বোঝা যাচ্ছে।

গাঙের পাশাপাশি দীর্ঘ বিসর্পিল এক বস্তু—বাঁধ বলে তো মনে হচ্ছে। আরে—মানুষ কথা বলছে। মানবেলায় এসে পড়েছি তবে তো!

স্ফূর্তিতে নেমে পড়লাম। বিস্তর গোলঝাড়—সেগুলো পার হয়েই বাঁধ। বড় বড় কেওড়াগাছ জায়গাটায় আঁধার জমিয়ে তুলেছে। বাঁধের ওধারটা

একেবারে ফাঁকা। মেঠো-জমি ভেঙে হনহন করে কারা আসছে, গুনতিতে পনের-বিশ জন। বিলের মুক্ত বাতাসে ওদেরই কথাবার্তা কানে গিয়েছিল।

এসেই ধমক দিয়ে ওঠে আমার উপর: আচ্ছা মানুষ! আঘাটায় নেমে পড়ে লণ্ঠন দেখাচ্ছ। সন্ধ্যে থেকে আমরা হা-পিত্যেশ পথ তাকিয়ে আছি। এস, চলে এস—

কোথায়?

পালোয়ান গোছের এক ব্যক্তি হুঙ্কার দিয়ে উঠল: কোথায় যেন জানেন না! আকাশ থেকে পড়লেন।

আকাশ থেকে পড়ি নি, জোয়ারের টানে এসে পড়েছি। সত্যিই আমি কিছু জানি নে।

থাক, থাক। জাত-যাওয়া কাণ্ড—রাতদুপুরে উনি এখন রঙ্গরস শুরু করলেন।

হাত ধরল। উঃ, উঃ—হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে যায়। লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলে, ননীর পুতুল! গুটিগুটি অমন পা ফেললে হবে না, জোর কদমে চল। লগ্নের আর দেরি নেই।

পাকা-গোঁফ এক প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে হাতের লাঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। ভাল মানুষ তিনি, কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমার লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও দাদাভাই। অজানা পথ—লাঠি ধরে সাবধান হয়ে আমাদের সঙ্গে এস।

চোখ রগড়ে পরখ করি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো? সকাতরে বললাম, লগ্ন—কিসের লগ্ন? বুঝতে পারছি নে, কেন যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে।

হেসে উঠলেন সেই প্রবীণ মানুষটি: ও রামনারাণ, শোন শোন—নাতজামাই কেন আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝতে পারছে না। দুনিয়ার এত মুলুক থাকতে শোলাদানায় কেন এসে পড়ে, তা-ও বোধহয় জানে না।

হো-হো হা-হা বহু কণ্ঠে উচ্ছল হাসির ধ্বনি। একজন বলল, মশালগুলো ধরিয়ে ফেল হে! ভূতপ্রেতের মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ, বর ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

আমার সেই লণ্ঠন খুলে একে একে টেমিতে মশাল ধরিয়ে নিল। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে, মশালের আলো কাঁপছে কালো কালো মূর্তিগুলোর উপর। প্রবীণ লোকটি বললেন, আগে-পিছে মশাল ধর। মেঠো-পথ—হোঁচট না খায়। নাতজামাই হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি তুলতে হচ্ছে। তোমারই দোষ

দাদাভাই। ষোলবেহারার পালকি ঘাটে বসে আছে এখনো। খবরাখবর করে তাদের নিয়ে আসবার সময় নেই। উঃ, যা কষ্টটা দিয়েছ! বসে বসে বিরক্ত হয়ে শেষটা ওরা বলল, গাঙের কিনারা ধরে এগিয়ে দেখা যাক। তাইতে তোমায় পেয়ে গেলাম।

মাঠে নেমে পড়েছি এখন। একবার একটু বলি, নৌকোর ওদের কিছু বলা হল না—

যা বলবার আমরা বলব। যেতে বলা হচ্ছে, তাই চল না তাড়াতাড়ি।

অধিক তর্ক করবার তাগত নেই। একটিবার হাত ধরেছিল, তার জ্বলুনি থামে নি এখনো। রহস্যময় লোকগুলো আমায় ঘিরে নিয়ে চলল। কোথাও খানাখন্দ, কোথাও আ'ল-পথ, কোথাও বা ধান কেটে-নেওয়া জমির উপর দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দম-দেওয়া এক কলের-পুতুল হয়ে চলেছি।

অবশেষে পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। তেমাথা পথের উপর তেঁতুলগাছ। অদূরে বাড়ির উঠানে সামিয়ানা খাটানো বিস্তর লোকের আনাগোনা। অকুস্থলে পৌছে গেছি।

বর নিয়ে এসেছি!

অমনি ঢোল-কাঁসি-শানাই বেজে উঠল কোনদিক থেকে। উলু দিচ্ছে মেয়েরা, শাঁক বাজছে। মাঠের দিককার আকাশে শোঁ-শোঁ করে হাউই উঠে তারা কাটছে।

কন্যাপক্ষ অবস্থাপন্ন। বিয়ের আসর খাসা সাজিয়েছে। কাঁচের হাঁড়ি ঝোলানো সারি সারি, বাতি জেলে দিয়েছে। রুপো-বাঁধানো হুঁকোগুলো লোকের হাতে হাতে ঘুরছে—হুঁকোদানের উপর বড় একটা বসতে পায় না। গোলাপজল ছিটোচ্ছে ঘন ঘন।

পুরুত তৈরি হয়ে আছেন। উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আর-এক দফা বকতে লাগলেন: ছি-ছি, বড্ড ছেলেমানুষ! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমাদের! জাত মারবার জো করেছিলে। আর দেরি কোরো না, বরাসনে বসে পড়।

আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রুবির মুখ ভেসে উঠল মনের উপর। মৃত্যুপথযাত্রিণী রুবির মা'র সেই বাচ্চা মেয়েকে আমার কোলে তুলে দেওয়া!

মারুন, কাটুন, যা ইচ্ছে করুন—কিছুতে আমি আসনে বসছি নে। গায়ের জোরে বিয়ে দেবেন নাকি?

এক-উঠোন লোকের মধ্যে কেউ চটে না। হাসে, যেন ভারি এক মজার

ব্যাপার।—শোন, শোন—গাঁয়ের জোয়ের বিয়ে নাকি! বর বলছে এই কথা।

আর একজন বলে উঠল, উপোস করে আছে। তার উপর এ-ঘাট ও-ঘাট করে মাথা বিগড়ে গেছে। আসনে বসিয়ে হাওয়া কর, ঠিক হয়ে যাবে।

সেই নিশিরাত্রে বনের প্রান্তে বাতির অনুজ্জল আলোয় বিচিত্র জনসমাবেশের মধ্যে আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছি। অতীত ধুয়ে মুছে প্রায় নিশ্চিহ্ন। শহরের পিচ-ঢালা রাস্তা, পাঁচতলা-সাততলা বাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার, ট্রামগাড়ি-মোটরগাড়ি- সমস্ত বুঝি মনের আজগুবি কল্পনা! স্ব.. দেখছিলাম নাকি এতক্ষণ— স্বপ্নের ঘোরে এক লহমায় যেন জীবনের তিরিশটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন বিষম হাসি পাচ্ছে কলকাতা শহর ইত্যাদি হাস্যকর অবাস্তব কতকগুলো জায়গার কথা মনে ভেবে।

শুভদৃষ্টি। চৌকির উপর দাঁড়িয়েছি টোপরে চাদর ঢাকা দিয়ে। পিঁড়ির উপর কনে বসিয়ে সাত-পাক ঘোরাচ্ছে। চোখ নিচু হয়ে আছে আমার। চোখ মেলে বউ দেখব, এর চেয়ে বেহায়াপনা আর কী হতে পারে! বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। দেখন-সর' জ্বালিয়ে দিয়েছে। সরার মধ্যে নানা রকম বাজির মশলা—জ্বালিয়ে দিলে চারদিকে যেন দিনমান হয়ে যায়। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালে এইগুলো। সরা জ্বালিয়ে পাশ থেকে বলছে, চোখ মেল—চোখ মেল গো! চার চোখের মিলন হবে, তবেই তো আমোদ-আহ্লাদে কাটবে সারাজীবন।

মুদিত পদ্মকলির মতন দু'টি ডাগর চোখ আমার দৃষ্টির সামনে। থরথর কাঁপছে চোখের পাতা—ভোররাত্রে পদ্মকলি এমনি করেই বুঝি পাঁপড়ি মেলে। সবার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, দুই চোখে দীঘির মতো কালো গভীরতা। জল উছলে পড়ল সেই দীঘি ছাপিয়ে চোখের প্রান্ত বেয়ে। কী তোমার মনোব্যথা ওগো কন্যা? ইচ্ছে করে, আদর করে চোখ মুছিয়ে দিই। কিন্তু চারিদিকে এত মানুষ—লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারি নে, তা হাত দিয়ে চোখ মোছাব!

বাসরঘরে এক শয্যায় আমরা দু'জনে। কত রাত্রি হয়েছে, বলতে পারব না। মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলছে। মেয়ে-বউগুলো ঠাট্টাতামাশায় অনেক জ্বালাতন করেছে, জানলার বাইরে এখনো পাতান দিয়ে আছে কি না জানি নে। থাকে, থাকুক। ঠোঁটই নড়ছে আমাদের, ঠোঁটে ঠোঁটে সামান্য ব্যবধান—কথাবার্তা কারো আর শুনতে হবে না।

মন্ত্র পড়ার সময় নামটা পেয়েছি—পদ্ম। সেই নিঃশব্দ কণ্ঠে বললাম, পদ্ম, তুমি কেঁদেছিলে তখন—

না তো।

তা হলে বলছ, কানা তোমার বর ?

পদ্ম চুপ করে থাকে।

আমায় পছন্দ হয় নি বোধহয় ?

পদ্ম বলল, অমন বললে আমার কত কষ্ট হয় জান! সকলে বলছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি রাগ করতে লাগলে, বিয়েয় কিছুতে বসবে না। আগে একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল তোমার—একটা মেয়ে আছে। শুনে আমার ভয় করতে লাগল। আচ্ছা, ওসব কি সত্যি ?

গোটা কলকাতা শহর যায় যাক স্বপ্ন হয়ে—কিন্তু আমার রুবি! বিষম সন্দেহের দোলায় দুলছি। গুটিসুটি হয়ে রুবি আমার কোলের মধ্যে ঘুমোয় আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ফিরতে একটু দেরি হলে। ও বাবা, তোমার বিছানা করে রেখেছি এই দেখ। ঐটুকু মেয়ের কাজ দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবেন।···আর, এই এখানে বিয়ে হয়ে গেল খানিক আগে—পাশে নববধূ—উপোস করে ছিলাম এই বিয়ের জন্য—পথ ভুল করে দেরি হয়ে গেছে বিয়েবাড়ি পৌঁছতে, সেজন্য এরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল এতজনের কাছে শুনে শুনে মনে হচ্ছে, এটাই সত্য। যে-জীবন এতখানি বয়স ধরে কাটিয়ে এসেছি, সমস্ত কেমন ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে, রুবিও শেষটা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে না যায়।

এই দেখ, আবার তুমি মুখ অন্ধকার করলে। হাস—হাসতে হয় গো আজকের দিনে। তোমার মুখে সব সময় যাতে হাসি থাকে, জীবন দিয়ে আমি তাই করব।

আমিও সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিচ্ছি। দ্বিধা-সন্দেহ-ভয় অনেক ছিল, সমস্ত মুছে গেছে এইটুকু সময় পদ্মর সঙ্গে কাটিয়ে। বললাম, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার—কাল বোধহয় বাসিবিয়ে-টিয়ে—কাল আর যাওয়া হচ্ছে না, যাব আমরা পরশু সকালবেলা। গিয়েই তুমি রুবিকে কোলে তুলে নিও সকলের আগে। রুবির মা হোয়ো। আমার মেয়ে যদি হাসে—দেখো, কত হাসি হাসব তখন আমি।

পদ্ম বলল, এরা যদি যেতে না দেয় ?

সে কি!

ধর, যদি ঘরজামায়ের মতো এখানে থাকতে হয় চিরকাল। কোন-কিছুর

অভাব-অনটন রইল না। তুমি মনিব হলে, কর্তা হলে— আমি তো দাসীবাঁদী আছিই, সকলে তোমার হুকুমবরদার হয়ে কাজকর্ম করবে।

না না, রুবি তবে ভেসে যাবে নাকি?

শুয়ে ছিল পদ্ম, উঠে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে রুবির কথা খানিকক্ষণ। তারপর গুম হয়ে থেকে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

সামনে রোয়াক। রোয়াক পার হয়ে কোন দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় এক ফালি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, দিনমানের মতো পরিষ্কার।

পদ্ম ফিরে এল একআঁচল স্বর্ণচাপা নিয়ে। সুগন্ধে ঘর ভরে গেছে। বলে, নিচু ডালে অনেক ফুটে ছিল। তোমার জন্যে তুলে নিয়ে এলাম। নাও।

দু-হাত পেতে নিলাম। অঞ্জলি ভরে গেল। ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল পদ্ম। আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বললাম, তুমি ভাল পদ্ম—তোমার জন্য সমস্ত ছাড়তে পারি। কেবল সেই আমার মা-হারা মেয়ে—কেউ নেই তাকে দেখাশুনো করবার। পাঁচ দুয়োরে ঠেলা খেয়ে মরবে। আসবার সময় দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, হাত ছাড়িয়ে দিয়ে চলে এলাম।

আবার বলি, রাগ করলে পদ্ম?

জবাব দিতে গিয়ে পদ্মর কথা ফোটে না। জ্যোৎস্নার আলোয় মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরি। বললাম, কী ভাবছ তুমি বল—

চল, কথা বলতে বলতে যাই।

কোথায়?

এস না। এদের কথায় এদ্দুর আসতে পারলে, আমার কথায় যাবে না কেন?

বিয়েবাড়ি এখন শান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, একটি মানুষ জেগে নেই। তেমাথার তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে দুই চোর আমরা টিপিটিপি চলেছি। আরও খানিক এগিয়ে পদ্মর এবার গলা ফুটল। আহা, গানের সুরও এমন মিঠা হয় না। বলে, রুবির কথা ভাবছি। মা না থাকার কষ্ট বুঝি। আমারও মা নেই— ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে মারা গেলেন। তখন আমি একেবারে ছোট, ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ে। বাবা আর গাঁয়ের মানুষরা ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এই দক্ষিণ দেশে ধান-চালের আবাদে এসে নতুন করে ঘরবাড়ি তুললেন।

আমি বললাম, ছিয়াত্তুরে নয়—পঞ্চাশের মন্বন্তর। তোমার ভুল হচ্ছে।

এই তো সেদিনের কথা—ভুল হবার কী আছে! পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার নবাবি গেল, তার কিছু পরেই তো!

পদ্ম পাগল নাকি তবে? এতক্ষণের এত কথাবার্তায় টের পাই নি। চলার ধরনেও মনে হচ্ছে পাগল বটে! হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমায়।

আমি বলি, আস্তে, আস্তে—

পদ্ম আকাশের দিকে তাকায়। শুকতারা উঠে গেছে। আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, গতিবেগ আরও বাড়ায়। বলে, সকাল হয়ে গেলে আর তুমি যেতে পারবে না। কোনদিন যাওয়া হবে না। এস, এস—বাঁধে উঠে পড়বে ভোর হওয়ার আগে।

পায়ে কত কাঁটা ফুটল, নখ ছিঁড়ে গেল উঁচু-নিচু মাটিতে আঘাত লেগে, শামুকে পা কাটল জলের মধ্য দিয়ে যেতে। সে যে কত পথ চললাম, তার হিসেব নেই। অবশেষে বাঁধ দেখতে পাচ্ছি- বাঁধের উপরের সেই গাছগুলো।

বাঁধের নিচে এসে পদ্ম হাত ছেড়ে দিল। বলে, দাঁড়াও একটু।

দুই পায়ে মাথা গুঁজে সে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ ধরে করছে, ওঠে না।

সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলি, আবার দেখা হবে পদ্ম। আমি আসব।

গাছে চড়ার মতন দু-হাতে ধরে ধরে উঁচু বাঁধে উঠছি। নোনা নদী ঝিকমিক করছে গোলঝাড়ের ওদিকে। গা শিরশির করে ওঠে - বড্ড শীত।

পদ্ম, জ্বর আসার মতন মনে হচ্ছে। কাঁপুনি লেগেছে।

কোথায় পদ্ম! তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বাঁধের আড়ালে পালিয়ে কৌতুক করছে বুঝি!

পদ্ম, পদ্মরাণী—

মুক্ত আকাশ-তলে গাঙের কিনারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কত ডাকলাম। পদ্ম যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

সকাল হল। দিনের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে অবাক। মাঠ কোথা, বিশাল জলাভূমি। কিন্তু আমি যে এই কেওড়াগাছ-তলা থেকে ডাইনে নেমেই বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। ভুল হবে কেমন করে? ঠোক্কর খেয়ে ডান-পায়ের নখ উল্টে গেছে। আর জামার পকেট ভর্তি পদ্মর দেওয়া স্বর্ণচাপা। জলের মধ্যে, আর যাই হোক, স্বর্ণচাপা ফোটবার কথা নয়।

কপাল ভাল—বিকালবেলাই নৌকো পেয়ে গেলাম। গোলপাতা কাটতে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। নৌকো না পেলে রাত্রিবেলা জলজঙ্গলের মধ্যে

বাঘের পেটে না-ও যদি যাই—অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কার্তিকমাসের নতুন হিমে কেওড়াতলায় নিশ্চয় মরে পড়ে থাকতাম। আরও এক তাজ্জব—কাল সবে এসেছি, একদিনের মধ্যে বোশেখ থেকে কার্তিকমাসে পৌঁছই কি করে?

ঢুকড়ি মাঝি মাতলায় থাকে। এ ক'দিন অনেকের সঙ্গে এই গল্প করেছি। নৌকো থেকে ডাঙায় পা দিয়েই ঢুকড়ির কাছে গেলাম। বাদাবনের সকল হালচাল সন্ধান তার নখদর্পণে। এখন শক্তিসামর্থ্য নেই, আর বাদায় যেতে পারে না, দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে তামাক টানে। লোকজন কাউকে পেলে বাদাবনের গল্প শোনায়।

ঢুকড়ি বলে, জায়গাটা চিনলাম—শোলাদানার বাঁওড়। শোলাদানা বলে জমজমাট এক গাঁ ছিল—ভূমিকম্পে বসে গিয়ে বাঁওড় হল সেখানে। পুরো গ্রামই আছে জলের তলে, দায়ে-দরকারে কখনোসখনো ভেসে ওঠে। শোলা-দানায় গিয়ে তুমি যে আবার ফিরে এলে—এমন কখনো হয় না। জোর কপাল বটে তোমার!

তিমিঙ্গিল

বিধুর মা'র কথা মনে পড়ে। আশি-পঁচাশি বছরের বুড়ি- বিশ-পঁচিশ পা হেঁটে ধপাস করে পথের মাঝখানে বসে পড়েন। লাঠি খসে পড়ে হাত থেকে। দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে সামলে নেন কিছুক্ষণ। লাঠি ভর দিয়ে আবার ওঠেন, ঠুকঠুক করে আবার হাঁটেন।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ হীরালাল পণ্ডিত—তিনি অবধি ওই মানুষের ভয়ে কম্পমান। হীরালাল মানুষটা ভালো, কিন্তু মারখুটে স্বভাবের। মেরে একটু হাতের সুখ করব না—তবে আর সারা দিনমান পাঠশালা জমিয়ে বসে থাকা কেন? মনোভাব পণ্ডিতমশায়ের এই প্রকার। সবচেয়ে লঘু শাস্তি মধুমোড়া—দুটো আঙুল সাঁড়াশির মতো গায়ের উপরে চেপে ধরে মোড়া দেওয়া। দিচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে উৎকট আনন্দে প্রশ্নের পর প্রশ্ন: মিষ্টি লাগছে? কেমন মিষ্টি—মধুর মতো? খাবি আর?—লজ্জা কেন রে, খা, আরও খা—

আরও নানাবিধ প্রক্রিয়া। সব এখন মনে নেই। তবে জোড়া-কঞ্চি কোনদিন ভুলব না। কবিরাজি-ওষুধ আর অনুপান এক সঙ্গে চলে, এ জিনিষও তাই। বাঘাবিছুটি যুগল-কঞ্চির গায়ে গায়ে জড়ানো। কঞ্চির ঘা আর বিছুটির জ্বালা একসঙ্গে।

চুপসারে আমরা খুব শাপশাপান্ত করতাম : আচ্ছা, মেরে নিন এবারে। ভগবান দেখছেন, সমস্ত তোলা রইল। পরের জন্মে আমরা হবো পণ্ডিত, উনি পড়ুয়া। তখন মধুমোড়া-টোড়া নয়, স্রেফ জোড়া-কঞ্চি। পড়া না পারলে মার, পারলেও মার। ছাড়াছাড়ি নেই।

সকালবেলা পাঠশালার শুরুতেই ভূপতি 'আর করব না' 'আর করব না'— বলে চিৎকার করছে। নতুন কিছু নয়, নিত্যিদিনের ব্যাপার। ভূপতির বাপ ছেলের হাত ধরে পরম যত্নে পাঠশালায় এনে বসিয়ে দফায় দফায় নালিশ বলতে থাকেন। হীরালাল পণ্ডিত গভীর মনোযোগে শোনেন। তারপরে কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত—অপরাধ অনুযায়ী শাস্তিটা কোন্ প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত। ভেবে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভূপতি আগে থেকেই চেঁচাচ্ছে। মার পিঠে পড়েনি—সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : আর এমন করব না পণ্ডিতমশায়। কোনদিনও না। এই কান মলছি, নাক মলছি—

কথার ঠিক রাখে ভূপতি। পরের দিনের ফিরিস্তিতে এই অপরাধগুলো নেই। মাথা থেকে নতুন নতুন বের করেছে। পিতৃদেব দফায় দফায় বলে গেলেন। পণ্ডিতের অতঃপর জলচৌকি থেকে গাত্রোত্থান ও ভূপতির চিৎকার। কাল, পরশু, পরশুর আগের দিন এবং বরাবর যেমন হয়ে এসেছে।

একদিন এমনি চলছে। সজনেতলায় বসে বিধুর মা সজনেফুল কুড়োচ্ছেন, নজরে আসেনি কারো। চিৎকার শুনে লাঠি হাতে তুলে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বয়সে কুঁজো হয়ে গেছেন, কিন্তু হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো খাড়া। দ্রুত চলে আসেন পাঠশালার উঠানে।

ও খুনে পণ্ডিত, সকালে সবাই ভগবানের নাম করে—আর তুমি ছেলে ঠেঙাচ্ছ?

কণ্ঠস্বর খাদে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে চড়ে ওঠে। বিধুর মা'র কলহের এই রীতি। সবাই জানে। ভূপতির পিতৃদেব প্রমাদ গণে দাওয়া থেকে এক লাফে উঠানে পড়ে পা চালিয়ে দিলেন। উত্তেজনায় কাঁপছিলেন হীরালাল-পণ্ডিত। পলকে হিম হয়ে চৌকির উপর বসে পড়লেন। করুণ কণ্ঠে বলেন, ঠেঙানি কোথা দেখলে ঠানদি? ছোঁড়াটা বড় ত্যাঁদোড়, গায়ে হাত না পড়তেই ষাঁড়ের ডাক ডেকে পাড়া জানান দেয়। তোমায় দেখে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে।

কাঁদছে একটু, তা-ও বুঝি সহ্য হয় না পণ্ডিত? দেরি কিসের— গলা টিপে ওটুকুও শেষ করে দাও।

আরম্ভের মিনমিনে কণ্ঠে এখন রীতিমতো ঝাঁজঘণ্টার আওয়াজ।

জরাজীর্ণ দেহে এতখানি গলার জোর কী করে সম্ভব, সেই এক তাজ্জব। মজার গন্ধ পেয়ে পাড়ার মানুষ উঠানে ভিড় করছে। লাঠিতে দেহভার রেখে বিধুর মা পৈঠা বেয়ে তড়িতর করে দাওয়ার উপর উঠলেন। জয় নারদ, জয় নারদ— লেগে যাক বুড়ি আর হীরালালপণ্ডিতে। পাঠশালা-ঘরে আমরা পড়ুয়ার দল এবং উঠানে গাঁয়ের নরনারী নিষ্পলক হয়ে আছি। বেধে যাক ধুন্দুমার।

দাওয়ায় উঠে বিধুর মা ভূপতির পিঠে দিলেন এক লাঠির বাড়ি। তারপর বাড়ির পর বাড়ি পড়তে লাগল। আড়ম্বর ভীষণ, কিন্তু বুড়িমানুষের হাতের কী আর জোর—পিঠের ধুলো ঝাড়া হয়ে যাচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়। ভূপতিও কায়দা পেয়ে গেছে। কান্না ছেড়ে এবার গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলেছে মুখে। এবং ছটফটানি মাটিতে পড়ে। তারই মধ্যে বিধুর মা অবিরত হুঙ্কার ছাড়ছেন: মর, মর্, এক্ষুনি মরে যা তুই, হীরালালপণ্ডিতের ফাঁসি হোক।

উঠানের কেউ কেউ রসিকতা করে: পণ্ডিতমশায়ের কেন, ফাঁসি তোমার হবে ঠানদি। পিটিয়ে পিটিয়ে তুমিই মেরে ফেলছে। আমরা সব সাক্ষি দেব।

ভয়াবহ চেহারা বিধুর মা'র। চক্ষু দুটো বিঘূর্ণিত হচ্ছে, খাটো খাটো চুলগুলো যেন সিংহের কেশর। মরবে কি—তার আগে উনিই তো মাথা ঘুরে মরবেন।

জন কয়েক ছুটে এসে বুড়িকে ধরে ফেলল: যা হবার হয়েছে, ক্ষেমা দাও ঠানদি। পণ্ডিতমশায় আর মারবেন না, তুমি চলে এস।

হীরালালের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সায় দিলেন। সবাই বলছে, নেমে এস ঠানদি।

এত কাণ্ডের পরও বিধুর মা'র আক্রোশ যায়নি। বলেন, পাঠশালাঘর পুড়িয়ে দে আগে, পণ্ডিত তাড়া, তবে নামব। গোড়া থেকে বলছিনে আমি—

দম নিয়ে আবার বলেন, গোড়া থেকে মাথা ভাঙছি। পাঠশালার তালে যাসনে তোরা। সর্বনেশে জিনিস—ছেলেপুলে বন্দিদের হাড়িকাঠ। খাটল তো?

কাল পণ্ডিতমশায় তিমিমাছের বিষয় পড়াচ্ছিলেন। মাছের রাজা তিমি—যাবতীয় মাছ তার উদরে যায়। আরও এক জীব আছে নাকি, তিমিঙ্গিল—আস্ত তিমি যে গিলে খেতে পারে। বইয়ের কথা নয়—তিমিঙ্গিল চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। এই বিধুর মা।

হীরালাল অতঃপর সতর্ক হয়ে গেলেন। হাত উঁচিয়েছেন থাপ্পড় কষে দেবেন বলে—হঠাৎ বিধুর মা'কে দেখে তোলা হাত নামিয়ে নেন। আমরাও মজা পেয়ে গেছি—পণ্ডিতের হাত গায়ে ঠেকানো অবধি আবশ্যক হয় না, তারস্বরে কান্না জুড়ে দিই। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বিধুর মা অমনি প্রকট হন।

ক্রমশ আরও বেপরোয়া আমরা। তিরিশজনের পনেরো গণ্ডা চোখ আমাদের—চোখগুলো অবিরত বাইরের দিকে ঘুরছে। কাছে বা দূরে বিধুর মা'র একটু ছায়া দেখতে পেলেই হল। হাউ-হাউ করে কান্না জুড়ে দিই। গোড়ায় ছিল একলা ভূপতি—সাহস বেড়ে গিয়ে কায়দাটা এখন সকলে ধরে নিয়েছি।

নিরাপদে পণ্ডিত হয়তো কল্কেয় টিকে ধরাচ্ছেন, কিম্বা শ্রুত লেখাচ্ছেন। অথবা বেড়া ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছেন। সহসা কান্নার রোল ওঠে। পণ্ডিত চমক খেয়ে ওঠেন: কী হল রে? হল কী? কেঁদে উঠলি কেন রে?

বিছেয় কামড়েছে পণ্ডিতমশায়।

বেশি কথাবার্তার ফুরসত হয় না। বিধুর মা ধেয়ে এসে পড়েন: ও খুনে পণ্ডিত, আবার লাগিয়েছ?

কিচ্ছু নয় ঠানদি। নাকি বিছেয় কামড়েছে। বিছে এরাই এক একটা। আগে ছিল না, তোমার আস্কারা পেয়ে হয়েছে।

সত্যি তাই। গতিক এমনি, আমরাই যেন পণ্ডিত হয়ে গেছি,—পরজন্ম অবধি সবুর করতে হল না—হীরালালই যেন পড়ুয়া। সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকেন। সাহস বাড়তে বাড়তে তারপর আর বিধুর মাকেও লাগে না। হীরালাল হাত তুললেই আর্তনাদ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে তিনি এদিক-ওদিক তাকান। বিধুর মা নেই কোন দিকে, তবু পণ্ডিত নিঃসংশয় হতে পারেন না। তারপর ফাঁকিটা যখন ধরে ফেললেন, মেজাজ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে মেজাজ গরম করে প্রহারের উপযোগী করা সময়-সাপেক্ষ। ফলে পাঠশালার পড়াশুনা ষোলআনা অহিংস হয়ে উঠল।

পড়ুয়ার গায়ে হাত চলবে না, এমন নিরামিষ পণ্ডিতির মানে হয় না। ইস্তফা দিলেন হীরালাল। গাঁয়ের মুরুব্বিদের বললেন, বিধুর মা মরুক, তারপর ডেকো তোমরা। সোনামুখ করে আসব। বুড়ি যতদিন বেঁচে আছে, না খেয়ে মরলেও এ কর্মে থাকছিনে।

ক্ষ্যাপাটে বিধুর মা বুড়ি। কত হাসাহাসি করেছি। বয়স হয়ে বিধুর গল্পটা শুনলাম। ঐ একমাত্র ছেলে নিয়ে কম বয়সে বিধুর মা বিধবা হয়েছিলেন।

এক বিকালে পাঠশালা থেকে ফিরে বিধু শুয়ে পড়ল। জ্বর এল রাত্রে। কাল-জ্বর—জ্বর সেরে বিধু আর উঠতে পারল না। মারধোর খেয়ে এসেছিল পাঠশালা থেকে, বিধুর মা'র সেই ধারণা। সন্দেহ মাত্র, প্রমাণ কিছু নেই। ছেলের মৃত্যুর পর থেকে বিধুর মা পাঠশালার নামে মারমুখি। যত বয়স হয়েছে, বিরাগ তত বেশি বেড়েছে।

বিধুর মা'র কথা ভাবি কখনোসখনো। ছেলেবয়সে কত হেসেছি, এখন চোখ যেন ভিজে আসে।

বরবহন

আমার এই বেবি-অস্টিন দেখছেন। লোকে রটায়, মাতৃগর্ভ থেকে অস্টিনে চড়েই নাকি ভূতলে নেমেছি। এবং অস্টিন নিয়েই পরলোকে পাড়ি দেব। শেষেরটা সম্ভব বটে। যা দুর্ঘটনার বহর—কোনদিন শুনতে পাবেন, মোটরসহ বাস্তার উপর চুরমার হয়ে পড়ে আছি। কিন্তু আগেরটুকু ডাহা মিথ্যে, কদাচ বিশ্বাস করবেন না। ব্লু বুক খুলে দেখাতে পারি, উনিশ-শ আটত্রিশের মডেল—আমার জন্মের অনেক পরে এ গাড়ি বানিয়েছে।

হালে তো কলবেনে গাড়ি বানাচ্ছে, এসব জিনিস এখনকার দিনে হয় না। চেহারায় যা ই হোক, আমার অস্টিন বিস্তর অসাধ্যসাধন করেছে। এখনো করে। দুলালের বিয়ের গল্প বলি। বন্ধুলোক দুলাল, আমায় দাদা-দাদা করে। বিষয়সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু আপন বলতে তেমন কেউ নেই। কন্যাপক্ষের নাকি এমনি বরই পছন্দ। আর দুলালও এই কনে চায়। সম্বন্ধের শুরুতে নাম ভাঁড়িয়ে নিজ চোখে কনে দেখে এসেছে। দেখে মজে গেছে, আহা-ওহো করে।

বিয়ে আজকে। ব্যবস্থায় খুঁত ছিল না। সদরে গিয়ে বাস ঠিক করে এসেছে—বরের বাড়ি থেকে বর ও বরযাত্রী তুলে নিয়ে ষোল মাইল দূরবর্তী বিয়েবাড়ি পৌঁছে দেবে। বাস যথাকালে রওনাও হয়েছিল সদর থেকে, গুটগুট করে আসছিল। গ্রহের ফের—পথের ধারের নয়ানজুলিতে গড়িয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। স্নান করে মুখে পাউডার-ক্রীম ঘষে এবং কপালে চন্দনের ফুটকি দিয়ে দুলাল প্রায় তৈরি—শাপড়চোপড় বদলে নিলেই পুরোপুরি হয়ে যায়। হেনকালে দুর্ঘটনার খবর এসে পৌঁছল। সেই বাস পথের উপর খাড়া করে তোলা দু-একদিনের কর্ম নয়, আজকের রাতের মধ্যে তো নয়ই। কী করবে করো এবার ভেবেচিন্তে।

আবার কি—অগতির গতি আমি আছি, আমার কাছে এসে পড়ল : অস্টিন বের করো দাদা। লগ্ন ছুটো পর্যন্ত—যেমন করে হোক পৌছে দিতে হবে। নয় তো সর্বনাশ।

গাড়ি আমি এমনই বের করছিলাম। মা'র অসুখ, কেশবপুর গঞ্জ থেকে ডাক্তারবাবু আসবেন। গাড়ি করে এনে আবার গাড়িতে তাঁকে পৌছে দিতে হবে। এই বন্দোবস্ত।

দুলালের হাতঘড়িতে সময় দেখে মনে মনে হিসাব করে নিলাম। বলি, এক কাজ কর দুলাল। বরযাত্রী থাকুক গে, তুমি আর পুরুতঠাকুর পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ো। কেশবপুর অবধি এগিয়ে থাকগে—ডাক্তারবাবুকে বাসায় দিয়ে ঐখান থেকে তোমাদের তুলে নেব। আবার এই বাড়ি অবধি ফিরতে হলে দেরি হয়ে যেতে পারে।

দুলাল বলে, পায়ে হাঁটি কেমন করে?

সে কি, খোঁড়া হয়ে গেছ নাকি? নেমন্তন্ন খেতে সেই সাতবেড়ে পর্যন্ত দিব্যি তো হেঁটে গেলে, কেশবপুর তার অর্ধেক পথও নয়।

বেজার মুখে দুলাল বলে, বরাবর কেশবপুর তো হেঁটেই গিয়েছি। যাবও চিরকাল। একটা দিন আজ বর হয়েছি, একদিন বই দু'দিন নয়—তা ও পায়ে হাঁটতে বল? তার উপরে রাস্তায় জলকাদা। কাপড় জামা নষ্ট হয়ে যাবে।

কাপড়-জামা-জুতো স্যুটকেসে ভরে মাথায় তুলে নাও। কেশবপুর পৌছে হাত পা-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে বর হোয়ো। কথা তো ছিল বাসে চড়ে লাটসাহেবের মতন হর্ন দিতে দিতে কনের বাড়ি হাজির হবে। কপালে তর সইল না।

ডাক্তারবাবুকে আনা এবং পৌছে দেওয়ায় বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। দুলাল দেখি বরপাত্তোর হয়ে কেশবপুর কালীবাড়ির উঠোনে পাকচক্কোর দিচ্ছে, একবার হাতের ঘড়ি আর একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। মেঘে থমথম করছে আকাশ।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে দুলাল বলে, দুটোর পরে আর লগ্ন নেই।

ভাবনা করো না, তার আগে পৌছে দেব। উঠে পড়ো দিকি।

দুলাল বলে, শ্বশুর বেঁচে নেই, জেঠশ্বশুর কর্তা। সে বুড়ো বিষম গোঁড়া, লগ্নের এক মিনিট হেরফের হলে দেবে না।

কানের কাছে মুখ এনে বলে, আর এক ভয় আছে। অতসী দেখতে বড্ড ভাল কিনা—পুঁটে বলে গাঁয়ের একটা ছোঁড়া ঘুরঘুর করে বেড়ায়।

জেঠশ্বশুরের খুব অনুগত। আমায় হাজির না পেলে পুঁটেকেই হয়তো বরাসনে বসিয়ে দেবে।

বর ও পুরুত ছাড়া আরও একজন গাড়িতে উঠলেন। দুলালের মামা সম্পর্কীয় কাকে জুটিয়েছে—তিনি বরকর্তা। উদ্বেগের বশে দুলাল পিছনে না বসে সামনের সিটে আমার পাশে বসল। গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

অর্ধেক পথ গিয়ে ঝড় উঠল। আরও জোর, আরও জোর—ঝড়ের আগে আগে বর নিয়ে হাজির দেব। দেখতে দেখতে ঝড় তুমুল হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে ছড়ছড় করে বৃষ্টি। সেই যেমন বাইবেলের বর্ণনায় আছে—আকাশের দরজা খুলে দিয়েছে। বৃষ্টি নয়, জলস্রোত এসে পড়ছে উপর থেকে।

তা-ও হত। ভদ্রলোকদের কন্যাদায় (এবং পাত্রের তরফে আমাদের দায়টাও বেশি বই কম নয়)—আমার বহুদর্শী অস্টিন বুঝি টের পেয়ে গেছে। এত ছুটতে পারে, ধারণায় ছিল না আমার। বড় মাঠ পার হয়ে গাঁয়ের ভিতর এসে পড়লাম। ঝড়ের প্রকোপ ফাঁকা মাঠে তেমন ঠাহর হয়নি। গাঁয়ে সর্বনাশ হয়ে আছে—গাছ পড়ে পড়ে পথ আটক। তখন নতুন কাজ হল—টেনেটুনে ডাল সরিয়ে গাড়ির পথ করে নেওয়া। ছোট গাড়ির এই দিক দিয়ে সুবিধা। কোনক্রমে একটু ফাঁক করে নিলে সুড়ুত করে বেরিয়ে পড়তে পারে।

এক জায়গায় এসে অচল হলাম। প্রকাণ্ড গাছ—নড়ানো সরানোর উপায় নেই। না কেটে দিলে পথ হয় না। মোটরগাড়িতে কে কবে কুড়াল রাখে? অদূরে গৃহস্থবাড়ি। তাদের জাগিয়ে তুলে কুড়াল চেয়ে আনলাম। হামেশাই মোটর হাঁকিয়ে বেড়াই বলে তল্লাটের সবাই আমায় চেনে। কুড়াল গাড়িতে রেখে দিই, আরও কত গাছ কাটতে হবে কে জানে

দুলাল বলে, তা ভাল করেছ দাদা। এই কনে যদি ফসকে যায়, কুড়াল তক্ষুনি আমি নিজের গলায় মারব।

বর বলে দুলাল হাত-পা কোলে করে নেই। পোশাক লাট হয়ে যাবে সে ভাবনা ভাবছে না আর এখন। আমার সঙ্গে সমানে ডাল টানাটানি করছে। আর হাতঘড়ি দেখছে ঘন ঘন।

এর পরে খানিকটা পরিষ্কার রাস্তা পেয়ে গাড়ি তীরবেগে ছুটিয়ে দিই। সময়ের ক্ষতি যতটা পুষিয়ে নিতে পারি। পুরুতঠাকুর হাঁ হাঁ করে ওঠেন: করো কি, ক্ষেপে গেলে নাকি হে? কনের বাড়ি বলে যে যমের বাড়ি নিয়ে তোলবার গতিক।

মেজাজ হারিয়ে দুলাল তেড়ে উঠল: বাঁচতে বাঁচতে তো থুনথুনে বুড়ো হয়ে গেছেন। বাঁচার সাধ এখনো মেটে না!

মেঘ কেটে জ্যোৎস্না উঠল। মাইল-স্টোন নজরে আসে—আর মোটে চার মাইল। এসে গেছি তো দুলাল—আবার কি! দুটোর আগেই পৌঁছে দিচ্ছি, কী খাওয়াবে আমায় বল।

বলার পর বোধহয় পাঁচটা মিনিটও যায়নি, ফটাস করে একটা চাকার টিউব ফাটল। স্টেপনি অর্থাৎ অতিরিক্ত যে চাকা থাকার কথা, ফুটোফাটা হয়ে বহুকাল পূর্বে তা লয় পেয়ে গেছে। কূলে এসে ভরাডুবি!

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলি, কুছ পরোয়া নেই। গাড়ি থাকুক পড়ে এখানে, আমার এ অস্টিন ভূতেও ছোঁবে না। আমার সঙ্গে চল দুলাল, জোর পায়ে হাঁটো। বুড়োমানুষ ওঁরা ধীরে-সুস্থে পিছনে আসুন। বর নিয়ে তো হাজির করে দিই। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্য আটকাবে না। পুরুত-বরকর্তা তাঁরাই যোগান দিতে পারবেন।

হাঁটা নয় সে, দৌড়ানো। দুলাল হাঁপাতে লেগেছে। পুলটা পার হয়ে মাতব্বর সর্দারের বাড়ি। সাইকেল-রিক্সা চালায় সে। হাঁকডাক করছি: উঠে পড় মাতব্বর। ডবল ভাড়া—

শুয়ে শুয়ে মাতব্বর কাতরাচ্ছে: ওঠার জো নেই, গায়ে জ্বর। কে বলছ তুমি, এগিয়ে এস।

খোলা বৈঠকঘরে আছে। চেনা মানুষ, চেনা বাড়ি উঠে পড়তে বাধা নেই। সত্যি-সত্যি গা আগুন মাতব্বরের। এ মানুষ কেমন করে রিক্সা চালাবে?

নিরুপায় হয়ে বলতে হয়: ভাড়া হিসাব করে আগাম নিয়ে নাও মাতব্বর। রিক্সা আমি চালিয়ে নিয়ে যাই।

মাতব্বর বলে, পারবে তুমি?

সাইকেল তো হরদম চালাই, না পারবার কী আছে? চার মাইল পথ কাদায় ছুটলে বরের আর বিয়ের মন্তোর পড়ার তাগত থাকবে না।

নগদ টাকা মুঠোয় নিয়ে মাতব্বর আর আপত্তি করে না। সাইকেল-রিক্সায় দুলালকে তুলে বনবন করে ছুটাচ্ছি। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখে দুলাল, ঘাড় লম্বা করে দেয় সামনের দিকে। যে কয় ইঞ্চি এমনিভাবে এগিয়ে থাকা যায়।

হঠাৎ সে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল: ছুটে আর কী করবে? হল না, লগ্ন কাবার। কোঁচা ঝেড়ে পুঁটে এতক্ষণ পিঁড়ি চেপে বসেছে।

বিয়েবাড়ির আলো দেখা দিল। ঠুনঠুন ঠুনঠুন—ইচ্ছে করেই আওয়াজ তুলেছি। পুঁটে যদি বসেই থাকে, বরের সাড়া পেয়ে নিশ্চয় কেউ মুখ চাপা

দিয়ে মন্তোর পড়া বন্ধ করে দেবে। কপাল ভাল, ততদূর ঘটেনি। পাঁচ-সাতজনে ছুটে এল রাস্তায়। বর এসেছে, বর এসেছে—সাড়া পড়ে গেল।

কেন দেরি হল, কী বৃত্তান্ত—জিজ্ঞাসার সময় নেই। মেয়ের আত্যয়িক হয়ে গেছে, রাতের মধ্যে পাত্রস্থ করতেই হবে। জেঠামশায় রায় দিলেন: আসল বরই যখন পেয়ে গেলাম, আবার কি! যা রে পুঁটে. তোকে আর লাগবে না। ভোজে বস গে যা এবারে তুই।

তাগড়া-জোয়ান পুঁটে বিরস মুখে উঠে পড়ল।

জেঠামশায় দুলালকে বলছেন, তোমার দেরি দেখে পুঁটেকে ভোজে বসতে দিইনি। বেচারা ঠায় বসে আছে কখন থেকে।

লহমার দেরি নয়, বরের পিঁড়িতে নিয়ে দুলালকে বসিয়ে দিল। তারই মধ্যে একবার ফিসফিস করে দুলাল আমার কানে বলে, তুমি যা করলে দাদা, এ জনমে ভুলতে পারব না।

তারপর বছর তিনেক হতে চলল। শ্বশুরবাড়িতে দুলাল পাকাপাকি বাসিন্দা। পৈতৃক ভিটায় কালে-ভদ্রে আসে—এই তিনটে বছরে বোধকরি তিনবারও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। দুই মেয়ে রেখে শ্বশুর মারা গেছেন—অতসী আর বেতসী। জামাই ছেলের মতন থেকে বিষয়সম্পত্তি ভোগ-দখল করবে, শাশুড়ি ও জেঠশ্বশুর এমনিটাই চেয়েছেন। দুলাল সে আশা মিটিয়েছে। ছোট মেয়ে বেতসীর বেলাতেও এমনি এক পাত্র পেলে মনোবাঞ্ছা ষোলআনা পূরণ হয়।

আছে দুলাল পরম সুখে, সন্দেহ কি। হঠাৎ সংঘাতিক খবর শুনলাম, দুলালের সাধের বউ মারা গেছে নাকি। সাপে কেটেছে জলজ্যান্ত বউটাকে। জীবন এই বটে—পদ্মপত্রে জলবিন্দু। নিজে রিক্সা চালিয়ে বর পৌঁছে দিলাম, বিয়ে হয়ে গেল। মনে হয় কালকের কথা।

কেউ কেউ বলছেন, সুদিনে মিলিয়ে দিয়েছিলে—একটিবার এখন গিয়ে দুলালকে সান্ত্বনা দিয়ে আসা উচিত।

কিন্তু ইনিয়েবিনিয়ে সান্ত্বনার কথা আমার আসে না। বিয়ের পরদিন নতুনবউয়ের সামনে দুলাল শতমুখে আমার গুণের ফিরিস্তি দিচ্ছিল, অতসী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল আমায়। চোখে-মুখে হাসি ছলছল করছে। সেই মুখ আবার একদিন বিষের যন্ত্রণায় কালিবর্ণ হয়ে গেল, দুলাল দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে। এই নিয়ে মুখের দুটো ফাঁকা সান্ত্বনা দিতে লজ্জা করে আমার।

আমি যাইনি। মাস কয়েক পরে দুলালের কাছ থেকে চিঠি এল। মুখে হা-হুতাশ করতে তারও বোধহয় বাধে, নিজে না এসে ডাকের চিঠিতে কাতরতা জানিয়েছে: দাদা, আমার বিপদের খবর কি শোননি? তোমা হেন বন্ধুও যদি ত্যাগ করে, তবে আমি কার মুখে চাইব? দু-এক দিনের মধ্যে এস একবার। আমার যা অবস্থা, আত্মহত্যা করাও বিচিত্র নয়। ইত্যাদি।

যেতে হল। আনুপূর্বিক সমস্ত শুনে এলাম। আমার সেই সময়টা কলকাতা যাবার বড় গরজ। যাত্রা স্থগিত রাখতে হল দুলালের খাতিরে। আঠারোই শ্রাবণ ওদের ওখানে আবার যেতে হবে। বিয়ে ঐদিন বেতসীর সঙ্গে। জামাই হিসাবে দুলালকে ওদের ভারি পছন্দ। তাকে ছাড়বেন না—অতসী গেল তো তার ছোটবোনের সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছেন। বেতসীকে আগে দেখেছি, এবারে বেশ নজর করে দেখে এলাম। নিখুঁত সুন্দরী। অতসীরও রূপ ছিল, তবু বেতসীর কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না। দুলাল দেখছি সুন্দরী বউয়ের কপাল করে এসেছে।

সন্ধ্যার পর বিয়েবাড়ি পৌঁছলাম। সেবারে রিক্সা চালিয়ে এসেছিলাম, এবারে অস্টিন হাঁকিয়ে। দুলালের এতবড় সুহৃদ—অন্য বরযাত্রী না যাক, একজন আমি তো থাকবই।

স্নান সেরে দুলাল বরের সাজ সাজতে বসে গেছে। আমায় দেখে উল্লাসে উঠে পড়ল। তারপর এটা-ওটা বলতে বলতে ঘরের বাইরে এসে—গাড়ির দরজা খুলে রেখে গিয়েছি—চক্ষের পলকে সে গাড়িতে উঠে বসল। ছুটিয়ে দিলাম আমার অস্টিন। গরজ বোঝে গাড়ি, আমার মনের ইচ্ছা টের পায়। বাতাসের বেগে ছুটেছে। এরই মধ্যে একবার দেখে নিলাম, তোলপাড় লেগেছে ওদের মধ্যে। এখন আর কী করবে আমাদের—দেখতে দেখতে পগার-পার।

মাঝপথ মণিরামপুরে এসে হাঁফ ছাড়ি। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হতে দিয়েছি। আর ভয় নেই। পাড়াগাঁ জায়গায় মোটরগাড়ি ইচ্ছামাত্র মেলে না। ট্যাক্সি আনতে হলে যেতে হয় সেই সদর অবধি। মোটমাট দু'খানা ট্যাক্সি—টাকা দিয়েও জোটানো যায় না। জামাই সরেছে টের পাবার পরে সাইকেল-রিক্সা যোগাড় করা—তাতেও সময় লাগবে। লাভটাই বা কি মোটরের পিছনে রিক্সা দৌড় করিয়ে? রাতটুকু পোহায়ে দিতে পারলে নিঃশঙ্ক চিরজীবনের মত। পুঁটের আজও বিয়ে হয়নি।

কিন্তু পালালে কেন বল দিকি? অতসীর জন্যে পাগল হয়েছিলে, বেতসী তো আরও চমৎকার।

দুলাল বলে, অতসীর শুধু চেহারাই দেখেছিলাম দাদা। বেতসীর চেহারা দেখছি, রীতব্যাভার দেখছি, গলার ঝাঁজ শুনছি অহরহ।

মুখচোখে তার আতঙ্কের চিহ্ন ফুটল, ধরল এসে বুঝি—এইরকম ভাব। ওরে বাবা, ওরে বাবা—বলে সে থেমে পড়ল।

কিন্তু অঢেল বিষয়সম্পত্তি ওদের। নগদ টাকাকড়িও আছে শুনতে পাই। লেগে পড়ে থাকলে কোনদিন কিছু করতে হত না। চিরজীবন বসে খেতে পারতে।

খেতাম ক'দিন দাদা! বিষটিষ খেয়ে কোনদিন জীবন শেষ করে দিতাম। আটক করেছিল আমায়। গ্রাম জুড়ে ওদের দাপট—সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখত। রাত্রে সদর-দরজায় তালা এঁটে দিত। কাজের বাড়ি লোকজনের মধ্যে আজকে কিছু ঢিলেঢালা—সেজন্য বেরুতে পারলাম।

বাড়ি পৌঁছে দুলাল আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি যা করলে দাদা, এ জনমে ভুলব না।

আর একদিন বিয়েবাড়ি পৌঁছে দিলে অবিকল এই কথাগুলোই বলেছিল।

গল্পের শেষ নয়, আর একটু আছে।

তিন বছরের অব্যবহারে দুলালের পৈতৃক বাড়ি জঙ্গলে ঢেকে আছে। সারাদিন আমার বাড়ি থেকে সে ধকল সামলাল। সন্ধ্যাবেলা ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে শ্বশুরবাড়ির দঙ্গল এসে পড়লেন। কনে বেতসী আছে, জেঠামশায় আছেন। সুপুষ্ট-গোঁফ লম্বাচওড়া-চেহারা আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হল, সদর থানার ছোট-দারোগা, এদের-আত্মীয়ের মধ্যে পড়েন। তিনিও এসেছেন। দুলাল স্তম্ভিত হয়ে বলে, বিয়ে হয়ে যায়নি? পুঁটে তো ছিল।

জেঠামশায় বললেন, বেতসী কবে কি বলেছিল—পুঁটেটা বিগড়ে রয়েছে। তা ছাড়া তোমা হেন সুপাত্র থাকতে পুঁটেকে কেন বলতে যাব? কোথায় সমুদ্র, আর কোথায় গোষ্পদ!

দুলাল বলে, কাল কনের আভ্যুদিক হয়ে গেছে—রাখলেন কি করে জেঠামশায়?

দিনকাল বদলেছে বাবাজী, এখন আর অত সমস্ত মানতে গেলে হয় না। কাল যা হবার হল, আজ রাত্রে ভণ্ডুল হতে দিচ্ছিনে। শরীরগতিক কেমন আছ—কনে তাই একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। অপারগ বিধায় এখানেই শুভকর্ম হতে পারবে। দারোগাসাহেব এসেছেন—জামার নিচে পৈতে আছে, ইনি আবার দশকর্মান্বিত পুরুতও বটেন।

আত্মীয় দারোগা গর্জন করে ওঠেন: ভদ্রলোকদের অপদস্থ করে ফৌজদারির কারণ ঘটিয়েছ তুমি। বাঁচতে চাও তো ট্যাক্সিতে ভালয় ভালয় উঠে পড়।

ধরেপেড়ে দুলালকে ট্যাক্সিতে তুলল। হতভম্বের মতো চেয়ে রইলাম। আমার প্রাচীন অস্টিন যথাসাধ্য করেছিল, তবু তাকে বাঁচাতে পারলাম না।

চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানায় বেবুন এসেছে কয়েকটা—আফ্রিকার জঙ্গল থেকে সদ্য আমদানি। খাঁচার সামনে বড় ভিড়। চেহারার আলোচনা হচ্ছে। নৃসিংহ-মূর্তি পুরাণে পড়া যায়—খানিকটা মানুষ, খানিকটা সিংহ। কিন্নরের বর্ণনা পাই—খানিকটা মানুষ, খানিকটা ঘোড়া। এই জীবও তেমনি—কুকুরে বাঁদরে মিশাল। কী কুৎসিত!

কলা ছুঁড়ে দিচ্ছে খাঁচায়, চিনেবাদাম দিচ্ছে। নিখরচায় পাতা ছিঁড়ে দিলাম আমি—তাতে যেন বেশি পুলকিত। চবর-চবর করে চিবোচ্ছে জর্দা-পান চিবোনোর মতো। হেনকালে দুটি প্রাণী দেখা দিল—জৌলুসে নজর টেনে ধরে।

মা আর মেয়ে—আমারই পড়শি এরা। চন্দ্রা আর সুশীলা। মা কে আর মেয়েই বা কোনটি, বলুন দিকি যদি ক্ষমতা থাকে। বাজি ধরতে পারি এই নিয়ে। না, সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে ফেললাম—চালাক মানুষ আপনি, হয়তো-বা জিতে যাবেন। যে মেয়েটা বেশি কচি ও চঞ্চলা এবং অতিশয় চমকদার, তাকেই মা বলে দেখিয়ে দেবেন। সত্যিই তাই। সুশীলা দেবীর বয়স বিয়াল্লিশ, অবলীলাক্রমে সেটাকে চব্বিশে এনে দাঁড় করিয়েছেন। বয়স চুরি করতে মেয়েদের ভারি হাত-সাফাই—বিধাতাপুরুষকে ডাহা বেকুব বানিয়ে দেন। মেয়ে চন্দ্রা কিন্তু এ কাজে যায় নি—বয়স এমনিতেই চব্বিশ-পঁচিশ, কমাতে গেলে খুকি হয়ে যাবে। খুকি এবং বুড়ি দুটোই অপছন্দ—মাঝের বয়সটায় চিরস্থির হয়ে থাকতে চান ওঁরা। মা-মেয়ে অতএব সমবয়সি সখী হয়ে চিড়িয়াখানায় বেবুনের খাঁচার সামনে এসেছেন।

খাওয়া ভুলে বেবুনগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে কিচির-মিচির জুড়ে দিল। ভিড়ের আলোচনা যথাপূর্ব চলছে: কী কুৎসিত! আর চলনেরই বা কী ভঙ্গিমা—ভিঙিয়ে ভিঙিয়ে বেড়ায়। পশুর লজ্জা থাকতে নেই, কিন্তু যারা দেখে তাদের তো লজ্জা। সাহস করে কেউ কাপড় জড়িয়ে দিতে পারে না।

কথা শুনুন, বেবুনকে ওরা কাপড় পরাবে! চতুর্দিকে যা অনটন, তোমাদেরই কাপড়ের মাপ হয়তো আইন করে সংক্ষেপ করে দেবে। মানুষগুলোকে ঠাহর করে দেখি—এ হেন আগডুম-বাগডুম যারা বলে। বলছে বেবুনের খাঁচার দিকে নয়—নব আগন্তুক মা-মেয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি। দূরদর্শিনী বটে, সরকার কবে কাপড়চোপড়ের রেশন করেন, বুঝেসমঝে এরা আগে থেকেই অভ্যাসটা রপ্ত করে নিয়েছে।

আরও অবাক হয়ে যাই। বেবুনরা দেখি পিছন ফিরে চোখের উপর হাত তুলেছে। তবে বোধহয় ভিড়ের মানুষ নয়—বেবুনদের কথাবার্তা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম।

বখরা

জংশন-স্টেশনে গাড়ি থামতে না থামতে রে-রে করে মানুষ ছুটে আসে। ফুলদোলের মেলা বসেছে, মেলার লোক ফিরবার শেষ-ট্রেন। পলকের মধ্যে কামরা ভরতি। কোষ্ট বলে ছেড়ে দেবে! দরজার পথে উপায় নেই তো জানলা দিয়ে দুমদাম মাল ফেলছে ভিতরে। মালের পিছন পিছন মানুষ। এয়ারবন্ধুরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে পিঠে ঠেকনো দিয়ে মালের মতো মানুষগুলোকে জানলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ঢুকে তো পড়—জানলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসার ভয় নেই। তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাক ভিতরে।

ঠাসাঠাসি মানুষ, তার উপরে গরমটাও বিষম আজকে। রক্ষা এই যে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছে, তার রকমারি খবর লোকের মুখে মুখে। নোয়াখালিতে এই করেছে, বিহার তার পাল্টা শোধ দিল এই রকমে। দেহকষ্ট ভুলে কামরার সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। যে লোকের যত গরম খবর, তাকে ঘিরে তত জমাটি। বুঝদার কথা শান্ত হয়ে বলতে গেলে তাড়া খেয়ে তাকে চুপ করতে হয়

এমন গরমের মধ্যে গায়ে মাথায় মোটা চাদর জড়িয়ে বেঞ্চির উপর জবুথবু হয়ে আছে—মানুষটার নাম লালমোহন। পাশের ভূষণচন্দ্র এই নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। ম্যালেরিয়া-রোগি লালমোহন—জর আসবে এক্ষুনি, শীত-শীত করছে। কামরার ভিতরে যে-ই কেউ ঢোকে, লালমোহন সচকিত হয়ে দেখে নেয়। এ নিয়েও ভূষণচন্দ্রের প্রশ্ন: কেউ আসবে বুঝি?

লালমোহন সায় দিয়ে বলে, মেলা দেখে আমার এক শালা-কুটুম্বের ফিরবার কথা। এসে পড়লে রক্ষা পাই। চার মাইল পথ ভেঙে বাড়ি যেতে

হবে। একা না বোকা—জ্বরের তাড়শে হয়তো বা মাথা ঘুরে মাঠের উপরে পড়লাম।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে সেই সময়, শালা-কুটুম নন তিনি—এক সাধু এসে উঠলেন বাঁ-হাতে কিডব্যাগ ঝুলিয়ে। গেরুয়া বসন, গেরুয়া আলখাল্লা, মোটা গোঁফ ও লম্বা দাড়ি। সেই দাড়ির অর্ধেকটা ঢেকে বেলফুল ও রজনীগন্ধার একগাদা মালা—গন্ধ ভুরভুর করে ওঠে। সাধুমানুষ দেখে ধাক্কাধাক্কিটা হল না, কষ্টেসৃষ্টে বরঞ্চ একটুখানি দাঁড়াবার মতন ঠাঁই করে দিল তাঁর।

বাঙ্কের শিকল ধরে কাত হয়ে সাধুমহারাজ চতুর্দিকে দৃষ্টিবিস্তার করলেন। দাঙ্গার তর্কাতর্কিতে কামরার ভিতরেই এক দাঙ্গার ব্যাপার—ঘাড় তুলে সাধু-দর্শনের ফুরসত কার! দেখছে কেবল লালমোহন—পলক পড়ে না এমনি ভাবে দেখছে। জ্বরের যন্ত্রণা ভুলে ভক্তিভরে সে আহ্বান করে: আসতে আজ্ঞা হয় স্বামিজী। এই যে—এদিকে।

প্রশান্ত হাস্য বিকিরণ করে স্বামিজী বলেন, জায়গা আছে?

লালমোহন বলে, আপনার জন্যে জায়গার অভাব! যেখানে দয়া করবেন, সেইখানে জায়গা। আপনার জায়গা তো মাথার উপর সকলের।

পাশের ভূষণচন্দ্র খিঁচিয়ে ওঠে: সকলকে নিয়ে টানাটানি কেন মশায়? ভক্ত মানুষ আপনি ডেকে আনছেন, বসতে দেবেন আপনার মাথার উপরে। অন্যের মাথা সস্তা নয়, কেউ মাথা পেতে দিচ্ছে না।

উপর মুখো দেখে নিয়ে আবার বলে, তারও মুশকিল আছে। লম্বা মানুষ স্বামিজী। মাথার উপরে জায়গা দিয়ে বসাবেন, ওঁর যে মাথা ঠুকে যাবে বাঙ্কে।

এক-কামরা গাদাগাদি মানুষের ভিতর দিয়ে অবলীলা ক্রমে পথ করে স্বামিজী লালমোহনের কোণের দিকটায় আসছেন। কাছে এসে বললেন, কই, কোথায় জায়গা?

লালমোহন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল: আসুন না। এইখানে আমার জায়গায় বসে পড়ুন।

ভূষণচন্দ্র অবাক হয়ে বলে, জ্বর-গায়ে আপনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

স্বামিজী বলেন, জ্বর হয়েছে তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, বসতে পারছিনে। আপনাকে বসিয়ে দিয়ে তারপর আমি শুয়ে পড়ব।

ভূষণচন্দ্র বলে, বেশ মশায়! লোকে বসার জায়গা পাচ্ছে না, শোবেন আপনি!

লালমোহন নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা নেই কিন্তু শোয়ার জায়গা অঢেল।

স্বামিজী বললেন, তবে এতক্ষণ শোওনি কেন বাবা?

শুলে জায়গা রাখা যেত না, আজেবাজে লোক বসে পড়ত। কষ্ট করে আগলে ছিলাম ভাল দেখে কাউকে বসাব বলে। তা জোর কপাল আমার—দুনিয়ার সকলের সেরা মানুষটিকে পেয়ে গেলাম।

পুলকিত কণ্ঠে স্বামিজী বলেন, আমায় চেন বুঝি তুমি? ফুলদোলের মেলায় আমার ভাগবত-পাঠ শুনে এসেছ?

লালমোহন বলে, এই দেখুন, আপনাকে চিনতে মেলায় যেতে হবে! তাবৎ দুনিয়ার মধ্যে না চেনে আপনাকে কে?

ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন স্বামিজী। কৌতূহলী ভূষণচন্দ্র লালমোহনের গায়ে ঠেলা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, কে ইনি, কী নাম?

স্বামী—

স্বামী তো ওঁরা সবাই। তার পরে?

নাছোড়বান্দা মানুষটিকে জবাব কিছু দিতেই হবে। যা মুখে আসে, লালমোহন বলে দেয়: স্বামী অঘোরানন্দ—

চুপিচুপি হলেও কথা স্বামিজীর কানে গিয়েছে। একগাল হেসে বললেন, গোলমাল করে ফেললে যে বাবা। অঘোরানন্দ নই, পরমানন্দ।

লালমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে। আগাপাস্তলা ঠিক আছে, মাঝে একটুকু গোলমাল হয়েছে।

হাতের ব্যাগটা কোথায় রাখা যায়—বাঙ্কের উপর তো একটি সূচ ঢোকানো চলে না। স্বামিজী এদিক-ওদিক দেখে ব্যাগ বেঞ্চির নিচে ঠেলে দিয়ে নড়েচড়ে অতঃপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন বেঞ্চির উপরে।

আমার তো দিব্যি হল। তুমি কোথায় শোবে, শুয়ে পড় এইবার।

যে আজ্ঞে—। বলে লালমোহন দুবেঞ্চির ফাঁকে মেজের উপর গড়িয়ে পড়ে। হুঁ-হুঁ, হুঁ-হুঁ জ্বরের কাঁপুনি বেড়েছে, কাহিল হয়ে পড়েছে বেশ। মোটা চাদরটা সে গায়ের উপর টেনে দেয়।

এ কি মশায়? ভূষণচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে: পায়ের কাছে কী রকম শোওয়া!

লালমোহন বলে, সাধুমহাত্মার পদতলে পড়েছি, ভাগ্যটুকু আপনি আর খুঁড়বেন না। উহু-হু—কী শীত রে বাবা, হাড়ের ভিতর অবধি কনকন করছে।

আপাদমস্তক সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

চুপচাপ কাটল খানিকক্ষণ। গাড়িসুদ্ধ ঢুলছে। স্বামিজীও চোখ বুঁজেছেন। লালমোহন সহসা লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কামরার আধঘুমন্ত মানুষগুলোকে সচকিত করে গর্জন করে ওঠে: সাধু না কচু তুমি। জালিয়াত। জালনোটের গোছা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ।

চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে সর্বসমক্ষে মুঠো খুলে ধরে। পাঁচ টাকার নোট কতকগুলো। বলে, দেখুন আপনারা, ঠাহর করে দেখুন। সদ্য ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। আসল কি জাল, কাগজে হাত ঠেকিয়েই আমরা ধরতে পারি। চোখ মেলে পরখ করতে হয় না।

স্বামিজী হকচকিয়ে গেছেন: আমার জিনিস কে বলল?

পরের জিনিস তুমি ব্যাগে পুরে নিয়ে বেড়াচ্ছ? লালমোহন খলখল করে হেসে উঠল: দেখ, আমার কাছে ধাপ্পা দিও না। কে আমি জান—ডিটেকটিভ ললিতকুমার। ছ-মাস তোমার পিছন পিছন ঘুরছি, কায়দায় ফেলতে পারিনে—

অন্তত বিশখানা রোমহর্ষক নবেল আছে ললিতকুমারকে নিয়ে। বইয়ের মানুষ সত্যি সত্যি চোখের উপরে—চক্ষু সকলের ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম।

ভূষণচন্দ্র বলে, কী আশ্চর্য! অরূপগড়ের নেকলেস-চুরির কেসটা আপনিই তবে—

লালমোহন—উহুঁ ললিতকুমার, বুকে থাবা মেরে বলে, আমিই তার আস্কারা করলাম। কিন্তু আজকের কেস তার চেয়েও তাজ্জব।

স্বামিজীর দিকে কটমট চেয়ে বলে, বড্ড ভুগিয়েছ আমায়। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—এখন?

বিপন্ন স্বামিজী অতঃপর অন্য পথ ধরলেন: মেনে নিলাম জালনোট আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি জাল করেছি, সেটা কি করে বলেন? দশজনা রয়েছেন, বিচার করে দেখুন আপনারা। আসরে রেকাবি পেতে দিয়েছে, বড় বড় ভক্তেরা তার উপর প্রণামী ফেলে যাচ্ছেন। আমি তো ভাগবত-রসে মজে আছি, প্রণামী-নোট জাল কি সাচ্চা দেখে নেব কেমন করে?

বটে রে! রাগে গরগর করতে করতে ললিতকুমার বেঞ্চির তলা থেকে কিডব্যাগ উঁচু করে ধরল। ব্যাগের চামড়া এমুড়ো-ওমুড়ো কাটা। সেই কাটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ডিটেকটিভ তাড়া তাড়া পাঁচ টাকার নোট বের করছে। হরির লুটের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে। বলে, প্রণামী দিয়ে

গেছে—তাড়া ধরে ধরে নোটের প্রণামী? এক টাকা দু-টাকার নেই, সমস্ত পাঁচ টাকার?

উঃ, কত কাণ্ড করতে হয় দেখ, একটা অপরাধী ধররার জন্য! জালিয়াতের পায়ের তলায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ নিঃসাড়ে কাজ করে গেছেন, বাইরে থেকে তিলেক টের পাওয়া গেল না।

বিস্ময়ের ঝোঁক কাটিয়ে মার-মার করে উঠল মানুষ: মুঠো মুঠো করে ঠাকুর তোমার ঐ দাড়ি ওপড়াব।

রেলের কামরার ভিতরে হাতে অন্য কাজ না থাকায় করতও সত্যি সত্যি তাই। ললিতকুমার এই সময় হাত ধরে হেঁচকা টান দিল: নেমে এস।

কোথায়?

থানায়। সেখান থেকে কৈবল্যধামে।

পরমানন্দ স্বামী ডিটেকটিভের আগে আগে প্লাটফরমে নেমে পড়েন। নেমে যেন বেঁচে যান। ললিতকুমারও নেমেছে। কামরার দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, আপনারাও কেউ কেউ আসুন। সাক্ষি দেবেন।

নামছে না কেউ, সকলে চোখ তাকাতাকি করে। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। পুলিসের ছোঁয়াছুঁয়িতে ঘায়ের সংখ্যা বোধহয় গোণাগুণতিতে আসে না, সেইজন্য ওটা প্রবচনের মধ্যে নেই।

ললিতকুমার হাঁক দিয়ে ওঠে: কি হল, নামছেন না যে কেউ? গাড়ি ছেড়ে দেবে এইবার।

ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে কামরার মধ্যে। এ বলে তুমি নাম, ও বলে আপনি নামুন। গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে এই বড় ভরসা, ততক্ষণ এইরকম চালিয়ে গেলে হল।

বিরক্ত হয়ে ললিতকুমার বলে, না আসেন তো বয়ে গেল। সাক্ষি-টাক্ষি নিজেই গড়ে-পিটে নেব। সে ক্ষমতা রাখি।

আবার স্বামিজীর হাত এঁটে ধরেছে। স্বামিজী বলেন, সত্যি সত্যি থানায় নেবেন? কিন্তু বন্দোবস্ত এখানেই তো হতে পারে। থানায় হাঙ্গামা বিস্তর। বড়-দারোগা মেজ-দারোগা জমাদার কনেস্টবলে জন পনের অন্তত। তার উপর দেয়ালের টিকটিকিটা পর্যন্ত সেখানে হাঁ করে আছে। এতগুলো হাঁ বুজিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের ভাগে কি থাকবে দেখুন ভেবে।

থমকে দাঁড়াল ললিতকুমার, কথাটা প্রণিধান করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামিজীর মুখে তাকিয়ে বলে, যা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি জবাব দেবে?

মিথ্যেকথায় কাজকারবার হয় না। মিথ্যে কেন বলতে যাব?

বহুদর্শী ললিতকুমারের জানা আছে সেটা। চোর-ডাকাত জালিয়াত-জুয়াচোর নিজেদের ভিতরে বড় সাচ্চা।

ভুয়া নোট ভাঙাতে মেলায় ঢুকেছিলে। ক-খানা ভাঙিয়েছ বল।

মোটে তিনখানা। বেজার মুখে স্বামিজী বলতে লাগলেন, মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। আমি হাতে করে দিচ্ছি, সে জিনিসে তিনবার টোকা দিয়ে বার পাঁচেক আঙুল ঘষে ফেরত দেয়: বদলে দিন ঠাকুরমশাই।

বিশ্বাস করল ললিতকুমার। হিসাব করছে: তিনখানা—তিন পাঁচে পনের। বখরা আধাআধি। আমার ভাগে সাড়ে সাত টাকা—

হাত বাড়িয়ে বলে, দিয়ে দাও।

স্বামিজী আলখাল্লার পকেট থেকে গণে সাতখানা এক টাকার নোট দিলেন। বলেন, খুচরা নেই আমার কাছে। পঞ্চাশ নয়াপয়সা দিয়ে আপনি আরও এক টাকা নিয়ে নিন।

ললিতকুমার বলে, খুচরো আমারও নেই।

তবে?

চায়ের দোকান সামনে। স্বামিজী সোৎসাহে বলেন, গলা শুকিয়ে গেছে। খুচরো যখন কেউ দিতে পারছি নে, এজমালি টাকাটায় চা খাইগে চলুন।

ললিতকুমারও বলে, চল তাই। চা আর কাটলেট। ক্ষিধে পেয়ে গেছে।

ছোট একটা টেবিল নিয়ে দুজনে সামনাসামনি বসল। এক কাপ করে চা দিয়ে গেছে। কাটলেট ভাজা হচ্ছে, হয়ে গেলে সেই সঙ্গে আবার চা আসবে।

চা খেতে খেতে স্বামিজী একবার ললিতকুমারের একবার নিজের কিডব্যাগের দিকে তাকান। সহসা বলে উঠলেন, পরিপাটি হাত আপনার মশায়। চামড়ার ব্যাগে নয়—যেন মাখনের দলায় ছুরি চালিয়ে গেছেন। তাই বলছিলাম—ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি?

ললিতকুমার মুখ তুলে সহাস্যে বলে, বলই না—

ডিটেকটিভের কাজে কত আর পয়সা মশায়? এই বিদ্যে নিয়ে লাইনে থাকলে দু-হাতে পয়সা কুড়িয়ে কূল পেতেন না।

ললিতকুমার বলে, তবে শোন। লাইনেরই মানুষ আমি। ললিতকুমার নই, লালমোহনও নই, লালমামুদ।

বিস্ময়ে স্বামিজীর দুই চক্ষু কপালে উঠে গেছে। লালমামুদ বলে, তোমার পরিচয়টা শুনি এবার স্বামিজী। কে তুমি?

স্বামিজী নাম বললেন: পরমানন্দ-টন্দ নয়, পরশুরাম চক্কোত্তি। পরশু-ঠাকুর বলে।

লুফে নিয়ে লালমামুদ বলে, গাড়ির মধ্যে সেই যা বলেছিলাম—ঠিক ঠিক তবে মিলে গেল। ও নাম দুনিয়াসুদ্ধ জানে। অত বড় ওস্তাদের পায়ের নিচে—শুয়েওছিলাম আমি ঠিক জায়গায়।

বিনয়ের পাল্লাপাল্লি চলে অতঃপর দু'জনে।

পরশুঠাকুর বলে, তোমার লাইনে তুমিও শাহানশা হে। লালমামুদ—মানুষটা এদ্দিন দেখা ছিল না, কাজকর্ম সমস্ত জানি। পকেট কাটতে গিয়ে চামড়ার এক পর্দা তুলে নিলেও মক্কেলের হুঁশ হবে না, এমনি নিখুঁত হাত তোমার।

লালমামুদ বলে, যতই হোক লোকে তবু বলে গাঁটকাটা। তুমি হলে কত বড়। গরমেণ্টো টাকশাল বানিয়েছে, তেমনি এক আলাদা টাকশাল তোমার। টক্কর দিয়ে সমান তালে তুমি টাকশাল চালাচ্ছ।

কাটলেট এসে পড়ল। মুখ বন্ধ হয়ে এবার অন্যদের কলরব কানে আসে: বিহার-শরিফে কী কাণ্ড করল, ঢাকায় তার কী রকম শোধ নিচ্ছে।

লালমামুদ বলে, আহাম্মকগুলো দাঙ্গা করে মরে কেন?

ঘৃণা ভরে পরশুঠাকুর বলে, বখরা মেরে দেয় বলে- আবার কি!

লালমামুদ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়: হক কথা। ন্যায্য গণ্ডা হিসেব করে নিয়ে কাটলেট খেয়ে গলাগলি হয়ে আমরা এই ডেরায় ফিরছি। রাত পোহালে যে যার কাজে নামব। আমাদের মতো ক'জন?

পারলৌকিক

প্রাণকৃষ্ণ ভড় দেহত্যাগ করলেন। মাস আষ্টেক আগে গিন্নি মুক্তালতা গেছেন, এবারে তিনি। যমালয়ে নিয়ে যাবে, ভড়মশায়ের ঘোরতর আপত্তি। কলহ করছেন যমদূতের সঙ্গে (নরলোকের আমরা শুনতে পাচ্ছিনে): ইয়ার্কি নাকি? নেবে তো ধনসম্পত্তি যত-কিছু সমস্ত সঙ্গে নিয়ে নেবে। আমারই স্বোপার্জিত, পৈতৃক একটি আধলাও নয়। সর্বস্ব ফেলে প্রাণটুকু বাছাই করে গাঁটরি বাঁধবে, সেটি হচ্ছে না।

যমদূত হুকুম তামিল করতে এসেছে। হুকুম শুধুমাত্র প্রাণ নিয়ে যাবার। তার কোন দায় পড়েছে, সে কেন ঝামেলার মধ্যে যেতে যাবে? আপোষে যাবেন না তো হিড়হিড় করে হাওয়ার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছেন প্রাণকৃষ্ণ। আকাশে-বাতাসে আলোড়ন।

মেঘের অন্তরাল থেকে সহসা মুক্তালতার কণ্ঠ: কি হল গো, গুচ্ছের টাকাকড়ি তোমার কোন কাজে লাগবে? কাগুজে নোট এ মুলুকে চলে না। খেয়াল করে খানিকটা দোক্তাপাতা যদি আনতে! হপ্তা-ভোর জোটেনি, মুখ আমার পচে গেল।

হপ্তার কথা শুনে প্রাণকৃষ্ণ চমকে যান। তারপর মনে পড়ল, পরলোকের দিবারাত্রি বেধড়ক লম্বা—নরলোকের পুরো একটা মাসে এখানে একদিন। হিসাব অতএব ঠিকই আছে।

গিন্নিকে অভাবিতভাবে পেয়ে গিয়ে অর্ধশোক খানিকটা সামলে নিয়েছেন। যমদূত পৌঁছে দিয়ে নিজকর্মে চলে গেল। আপাতত এইখানে স্থিতি—উদ্বাস্তুর ট্রানজিট-ক্যাম্প বলা যেতে পারে। নরলোকের শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডকরণ চুকেবুকে যাক, যমরাজ তারপরে ফুরসত মতন মৃতদের ফাইল নিয়ে জায়গা নির্বাচনে বসবেন - স্বর্গে যাবে, না নরকে যাবে। এখন শেষ-কলিতে শতকরা নিরানব্বুইটা কেসের নরকে নিয়তি—নরক গুলজার, ঠাঁইয়ের বড় অকুলান সেখানে। হালকা রকমের পাপী কিছু কিছু তাই স্বর্গেও চালান দিতে হচ্ছে—ভিড়ের সময় থার্ড ক্লাস টিকিটের প্যাসেঞ্জার যেমন ফার্স্ট ক্লাসে বসতে পায়। ব্যাপার অসঙ্গত—তবে যমরাজের একটা সান্ত্বনা আছে, পাপীরা গিয়ে পড়ে ইতিমধ্যে স্বর্গধামেই নরক জমিয়ে তুলেছে'।

সে যাক গে। কর্তা-গিন্নি আট মাস বাদে পরলোকে একত্র হলেন। আছেন মোটের উপর ভালই—খানদান, ঘোরাঘুরি করেন। পুরনো পৃথিবীর জন্য মন কেমন করে, মেঘ সরিয়ে মাঝে মাঝে উপর থেকে চেয়ে দেখেন।

একদিন অমনি দেখতে দেখতে ভূতলে নিজের বাড়ির উপর নজর গিয়ে পড়ল। উঃ-উঃ—করে প্রাণকৃষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন।

মুক্তালতা ছুটে এলেন: সেই ফিকব্যথাটা নাকি? কিন্তু মরার পরে রোগ-পীড়ে সবই যে আরোগ্য হয়ে যায়। মরার তো এই সুখ।

উঃ গিন্নি, আমরা মরেছি—আর ছেলে দুটো এরই মধ্যে কী মচ্ছব লাগিয়েছে দেখ। চেয়ে দেখ হঠাৎ-নবাবদের কাণ্ড-কারখানা!

ঢেউ দিয়ে পাশের খানিকটা মেঘ সরিয়ে প্রাণকৃষ্ণ মুক্তালতার নজরের পথ করে দিলেন। বললেন, ফূর্তিটা দেখ একবার। শ্রাদ্ধ করেছে, ন্যাড়া মাথায় এখনো চুল গজালো না—দু'ভায়ের দু-দুটো মোটর। খাটুনির রোজগার নয়—বাপের পয়সা মুফতে পাওয়া। সেইজন্যে মায়ামমতা নেই, দুই দুনো চারখানা হাতে ওড়াতে লেগেছে।

মুক্তালতা নিষ্পলক দেখছেন। কিছুক্ষণ দেখার পরে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে উঠল।

তিনি চিরকাল একলা হাতে রান্নাবান্না ও যাবতীয় ঘরকন্না করে এসেছেন, আর এ কী দেখছেন—বড়বউমা আর ছোটবউমা ক'টা দিনের মধ্যে পুরোপুরি নবাব-নন্দিনী। খাটের উপর গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই, তাস খেলছে তো খেলছেই। ঝি-চাকর কতগুলো বহাল হয়েছে, গণে শেষ হল না। মুক্তালতার মুখ চুলকাচ্ছে, গোটা কয়েক মোক্ষম গালি ছাড়বেন বউ দু'টোর পিতৃকুল মাতৃকুল উল্লেখ করে। কিন্তু লাভ নেই। এতদূরের গালি ইহলোক অবধি পৌছবে না, আকাশে ভেসে যাবে। গালির বাজেখরচ মাত্র।

প্রাণকৃষ্ণ ওদিকে অবিরত বিলাপ করে যাচ্ছেন: জীবনে কোনদিন ভাল খাইনি, ভাল পরিনি। ন্যায়অন্যায় ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়ে টাকা জমিয়ে গেছি, বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়েছি। নিতাই সামন্তর কথা মনে আছে গিন্নি? আমার উপরে সর্বস্ব ফেলে হতভাগা চোখ বুঁজেছিল। সম্পত্তি নিলামে তুলে নিতাই-এর ছেলেপুলেগুলোকে পথে বসিয়েছি। হায় রে হায়, আমার এত কষ্টের টাকার এই পরিণাম! একটিবার যদি নামতে দিত, জুতো খুলে শুয়োরের-বাচ্চাদের আষ্টেপিষ্টে পেটাতাম। মনের জ্বালা তবে কিছু কমত।

সঙ্গে সঙ্গে মনে এল, ভূতলে নেমেও তো সুরাহা হবে না। চিন্ময় অবস্থা এখন—হাত নেই, পেটাবেন কেমন করে? পা নেই, অতএব জুতোও নেই। মরে গেলে এই বড় অসুবিধা।

এমনি সময় অদূরে খলখল হাসির শব্দ। হাসির ধরনটা চেনা। প্রাণকৃষ্ণ কেঁপে উঠলেন।

কে ওখানে?

অধম নিতাই সামন্ত। এক্ষুনি যার নাম হচ্ছিল।

সামন্তর গচ্ছিত সম্পত্তি বাকি খাজনার দায়ে নিলাম করিয়ে প্রাণকৃষ্ণ বেনামিতে কিনে নিয়েছেন। পরলোকে খানিকটা অন্তর্যামীর অবস্থা এসে যায়, কোন-কিছু অগোচর থাকে না। লোকটা পালোয়ান-বিশেষ—এমনি ভাল, রেগে গেলে রক্ষে নেই। মরেছে পাক্কা তিনটি বছর—বিচারের অপেক্ষায় এখনো পড়ে আছে? উঃ, যমরাজ যে মর্ত্যলোকের আদালতকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন!

ভীত প্রাণকৃষ্ণ পালানোর পথ দেখছিলেন। ধেয়ে আসছে নিতাই সামন্ত, এসে সুনিশ্চিত গলা টিপে ধরবে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, গলাই নেই—টিপবে কোথা? মরে গিয়ে ভারি সুবিধা হয়েছে। নির্ভয় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

নিতাই উপস্থিত হয়ে বলে, এত সম্পত্তি রেখে এসেছিলাম, আপনি সমস্ত গ্রাস করলেন।

প্রাণকৃষ্ণ আকাশ থেকে পড়েন (পড়লেন না সত্যি সত্যি): না বাবা, ভুল খবর পেয়েছ। আমি কিছু করিনি। খাজনা বাকি ফেলে এসেছিলে, কালেক্টরি থেকে ক্রোক করে নিয়েছে।

নিতাই যেন নিরাশ হয়ে পড়ল: আপনি নন ভড়মশায়? আপনার সাড়া পেয়ে আমি যে ছুটতে ছুটতে আসছি। প্রাণভরে দু-পায়ে গড় করব।

বিষয়ে বঞ্চিত করেছেন, তার জন্য মামলা-মোকর্দমা মারামারি খুনোখুনি না করে গড় হয়ে প্রণাম করতে আসে—ইহলোকের উল্টো নিয়ম দেখি এখানে। খাসা নিয়ম।

নিতাই বলে, সম্পত্তি রেখে এসে ভুল করেছিলাম, সে ভুলের সংশোধন হয়ে গেছে। তাকিয়ে এখান থেকে ছেলেপুলের ভিখারিবৃত্তি দেখি। অনেকখানি তৃপ্তি। আমরা বেঁচে নেই—বেটারা দিব্যি তো বেঁচেবর্তে রইল। তার উপরে স্ফূর্তি করে বাঁচছে—মনোকষ্ট এতে ডবল হয় কিনা বলুন। তা আপনি আবার বলছেন, আপনার কোন হাত ছিল না, কালেক্টর বাহাদুরই করেছেন। তাঁর পায়েই গড় করব তবে। দেওয়ানজী চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, সে ভদ্রলোক আসছে কদ্দিনে?

প্রাণকৃষ্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠে বলেন, না বাবা, আমি। আমিই তো সব। তোমার ছেলেপুলেদের পথের ফকির করেছি আমি। আবার দেখ, নিজের বেলা আমি ভুল করে এলাম, এসে জ্বলে-পুড়ে মরছি।

জল ও স্থল

মানুষ স্থলচর জীব। একটি মানুষ তার মধ্যে নিশ্চয় বাদ—রথীকান্ত। তাকে জলচর বলা চলে। চৌধুরিদীঘি একবার পাড়ি দিতেই তা-বড় তা-বড় বীরপুরুষ হিমসিম খেয়ে যায়, রথীকান্ত সেই দীঘি বারবার এপার-ওপার করে। দীঘিতে প্রাকটিস করে দম বাড়াচ্ছে, কোন একদিন ইংলিশ-চ্যানেলের প্রতিযোগিতায় নামবার শখ। গেঁয়ো মানুষের এ হেন উচ্চাশায় হাসত আগে সকলে, অধ্যাবসায় দেখে এখন খানিকটা যেন প্রত্যয় পাচ্ছে। এ মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ভাগ্যটিও বড় অনুকূল—যত বাধা একের পর এক সরে গেছে। অতি-শৈশবে গর্ভধারিণী জননী গত হলেন, সেই তখন থেকেই।

মা গিয়েছেন, বাবা রবিকান্ত বর্তমান ছিলেন এই সেদিন অবধি। বিবেচক ব্যক্তি তিনি। চার-চারটে মেয়ের সবগুলোকেই পাত্রস্থ করে গেছেন, বোনদের জন্য রথীকান্তকে দায় ঠেকতে না হয়। ফ্লাওয়ারমিল ছিল শহরে—মিল

চালানো রথীকান্তকে দিয়ে হবে না। বুঝেসমঝে ভাল দামে মিল বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন। দশের কুমন্ত্রণায় গণ্ডগোল একটা পাকাতে যাচ্ছিলেন বটে—রথীর জন্য পাত্রী দেখাশুনা চলছিল, কিন্তু পাকাপাকি হবার আগে রবিকান্ত হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। নির্ঝঞ্ঝাট রথী দুনিয়ার উপর। মনের সুখে জলে জলে সাঁতার কাটে, এবং কিছুক্ষণের জন্য ডাঙায় উঠে খায়দায় ঘুমায়।

ভাতব্যঞ্জন রান্নাবান্না হয়ে পরিপাটিরূপে সাজানো থাকে। আসনে বসে গালে ফেললেই হল। ধবধবে নরম শয্যা পাতা আছে। আলস্যে গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা। এ দুটো কাজ মা আমোদিনী আর মেয়ে কেতকী মিলিত ভাবে করে। আর গণেশ বলে এক ছোকরার উপর বাইরের কাজকর্মের ভার—ক্ষেতের ধান হিসাবপত্র করে গোলায় তোলা, হাটবাজার করা ইত্যাদি। ঘড়ির কাঁটার মতন ঠিক ঠিক নিয়মে সংসার চালিয়ে যায় এরা তিনজন। রথীকান্ত তাকিয়ে দেখে না—দেখবার শক্তি নেই, ফুরসতও নেই। আমোদিনীর স্বামী ছিলেন ফ্লাওয়ার-মিলের ম্যানেজার, আর গণেশ সেই মিলের বিশ্বস্ত কর্মচারী একটি। মিল বেহাত হল। ভিন্ন মনিবের এক্তিয়ারে গিয়ে আমোদিনীর স্বামী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। নিঃসহায় মা-মেয়েকে রবিকান্ত সমাদরে বাড়ি এনে আশ্রয় দিলেন। চাকরি ছেড়ে গণেশও তাঁদের সঙ্গে চলে এল। এর মধ্যেও রবিকান্তর দূরদৃষ্টির পরিচয়। রথীকান্তর দুঃখের পার ছিল না এমনি ভাবে তিনজনে যদি তাকে আগলে না থাকত।

দিব্যি কাটছে। রথীকান্তর মাথায় নূতন মতলব এল। দীঘির সাঁতার যথেষ্ট হয়েছে, এবারে নদীতে। বাড়ি প্রায় নদীর উপরে। অন্য সময়ে যেমন-তেমন, বর্ষায় জল বেড়ে গিয়ে নদী এখন বিশাল ও উদ্দাম। একটু বাতাস উঠলেই ঢেউয়ের উথল-পাথাল। নদীতেই এবার থেকে সাঁতারের প্র্যাকটিস।

বলে, নদী দেখে ঘাবড়ালে চ্যানেলে গিয়ে কী করব? চ্যানেল দীঘি নয়—ঢেউ ভাঙে সেখানে, স্রোত বয়।

চ্যানেল-প্রতিযোগিতার বিবরণ কাগজে খুব বেরোয় আজকাল, কারো কারো পড়া আছে। তারা বলে, কত রকম ব্যবস্থা চ্যানেলে। লঞ্চ-স্টিমার চক্কোর দিয়ে ঘোরে, মাথার উপরে হেলিকপ্টার। প্রাণহানির শঙ্কা নেই।

নেই এখানেও। অকুতোভয় রথীকান্ত বলছে, আমারও আগে পিছে ডিঙি থাকবে। চ্যানেলের কথা কাগজেই পড়েছ, আমার আয়োজনটা চোখে দেখ। দেখে তারপরে যা বলবার বলবে।

স্থির হয়ে গেল, বর্ষার দুর্দান্ত নদীতে রথীকান্ত সাঁতার দেবে। এপারে

শীতলা-মন্দির, ওপারে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের ঘাট থেকে গা ভাসিয়ে অশ্বত্থতলায় গিয়ে উঠবে। স্রোত এমন ভয়ানক যে ইন্দ্রের ঐরাবতও বোধহয় ভেসে চলে যাবে তার মুখে পড়লে। রথীকান্ত ঘোষণা করেছে, স্রোত অগ্রাহ্য করে সোজাসুজি গিয়ে উঠবে সে। বাঁকচুর হলেই হার—ডাঙায় উঠে তা হলে নাক-কান মলবে নিজের।

লোকে লোকারণ্য। তিনটে ডিঙি রক্ষী হয়ে সঙ্গে চলল। মাঝিমাল্লা পাঁচজন প্রতি ডিঙিতে, পাঁচখানা করে বোঠে পড়ছে। ডিঙি তবু রুখতে পারে না, ভাঁটির সঙ্গে তরতর করে ভেসে চলে যায়। আর রথীকান্ত, দেখ, দুখানা মাত্র হাতের সম্বলে ঠিক সেই অশ্বত্থতলায় উঠে পড়ল। সার্থক সাঁতার শিখেছে বটে! মাটিতে পা পড়তে না পড়তে মানুষজন ছুটে এসে কাঁধে তুলে নিল তাকে। কাঁধে তুলে নৃত্য করে। আকাশ ফাটায় উল্লাসের চিৎকারে।

এই চলল এখন প্রতিদিন—সাঁতরে নদীর এপার-ওপার করা। স্রোতে ভাসিয়ে নেবে লোকে ভয় দেখিয়েছিল, অথচ প্রায় সরলরেখা ধরেই চলাচল—পনের-বিশ হাতের এদিক-ওদিক হয় না। তবু কিন্তু অঘটন ঘটল। এক-চক্ষু হরিণের মতো এ-দিকটা কারো ভাবনায় আসেনি। কুমীর নেই এ নদীতে, তল্লাটের মানুষ কস্মিন কালে কুমীরের কথা শোনেনি। বর্ষার নদীতে কুমীর দেখা দিল। স্ফূর্তিতে রথীকান্ত যথারীতি জল কেটে চলেছে—ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনে রক্ষী নৌকো। জলের নিচে দিয়ে এসে আচমকা কুমীরে ধরল তাকে। রীতিমত জোয়ানপুরুষ রথী, কুমীরে সহজে কায়দা করতে পারে না। আর ওদিকে মাঝিমাল্লারা ঘিরে ফেলে হৈ-হৈ করে বোঠের বাড়ি মারছে। কুমীর শিকার ছেড়ে পালাল।

রক্তে জল রাঙা। ডিঙিতে নিয়ে তুলল রথীকে, তখন আর সম্বিত নেই। বাড়িতে নিয়ে এল। সম্পন্ন অবস্থার মানুষ, তার উপর এত বড় গুণী—অঞ্চলের যে ক'জন ডাক্তার, সবাই চলে এসেছে। চেতনা ফিরল অনেক রাত্রে। ইতিমধ্যে সাব্যস্ত হয়ে গেছে সদর হাসপাতালে নিয়ে ডানহাত অপারেশন করতে হবে। সদরে পাঠানোর তোড়জোড় হচ্ছে।

শয্যার পাশটিতে কেতকী। চোখ ছলছল করছে তার। জায়গা ছেড়ে নড়ে না। রথীকান্তও তাকিয়ে দেখল। এক বাড়িতে এতকাল রয়েছে—আজ যেন প্রথম চেয়ে দেখছে কেতকীকে।

কেতকী জিজ্ঞাসা করে, কষ্ট হচ্ছে রথী-দা?

জিজ্ঞাসা বাহুল্য। কষ্টের কথা মুখ দেখেই বোঝা যায়। রথীকান্ত তবু

উড়িয়ে দেয়। ক্লিষ্ট মুখে শীর্ণ হাসি ফুটিয়ে বলে, কিছু না কিছু না, কষ্ট আবার কিসের?

হাতের ঐখানটা ধরেছেন—

এ নিয়েও হাসি-তামাসা। রথী বলে, খুলে না পড়ে যায় সেই জন্য এঁটে ধরে আছি।

হাসপাতাল থেকে ফেরত এল মাসখানেক পরে। প্রাণের হানি হয়নি, সেই ডানহাত কাটা পড়েছে কনুই থেকে। আমোদিনী হাহাকার করে ওঠেন: আমার সোনার কার্তিকের এমন দশা চোখে দেখি কেমন করে?

রথীকান্তই প্রবোধ দিচ্ছে: কী এমন ক্ষতি মাসিমা, এক হাতেই দিব্যি চলে যায়। বিধাতা-পুরুষ বাড়তি হাত দিয়ে রেখেছেন, একটা যদি কোন গতিকে অকেজো হয়ে যায় অন্যটায় কাজকর্ম চলবে। মোটরগাড়িতে যেমন একটা অতিরিক্ত চাকা বয়ে বেড়ায়। ছাঁটকাট হয়ে ভালই তো হল মাসিমা, বাড়তি বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না।

কেতকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। রথীকান্ত হাসছে—তার যে চোখের জল রাখা দা::! কী চেহারা, কী কথাবার্তা, কী দুরন্ত চালচলন। সেই মানুষের একটা হাত চিরকালের মতো পঙ্গু, কামিজের হাতা ঝুলঝুল করছে।

হাসপাতাল থেকে ফিরেও কিছুকাল রথীকে বিছানায় থাকতে হল। কেতকী ধরে ধরে খাওয়ায়। ক্রমশ অল্পসল্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছায়ার মতো কেতকী সর্বক্ষণ সঙ্গে আছে। একেবারে সুস্থ হল, তার পরেও রথীকান্ত প্রায় সারাক্ষণ বাড়ি থাকে। কেতকী কাজেকর্মে আছে—মুখ তুলে হয়তো-বা দেখল, রথী কখন নিঃশব্দে এসে দেখছে, চোখে তার পলক নেই। লজ্জায় রাঙা হয়ে কেতকী পালিয়ে যায়।

আমোদিনীর মুখ হাসিতে ডগমগ। কেতকী বলে, এত হাসি কেন মা?

বেওয়া বিধবার মেয়ে, সহায়সম্বল নেই—তোর অদৃষ্টে যে এতখানি হবে, কে ভাবতে পেরেছে?

শঙ্কিত হয়ে কেতকী বলে, কী হল আবার?

রথী বাবাজির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আজকে। বলে, সাঁতারে ইতি পড়ল মাসিমা। এক-হাতে কি করে হবে? তা ভালই হল। ডাংপিটেমি অনেক করা গেছে, ঘরে থেকে ঘরবসত করি এবার।

ধরা-ছোঁওয়া না দিয়ে কেতকী নিরীহ ভাবে বলে, তুমি হাসছ মা। আমি দেখছি, অন্ন উঠল আমাদের এ বাড়ি থেকে।

আমোদিনী কানেও নিলেন না, একভাবে বলে চলেছেন, সুমতি হয়েছে—বিয়েথাওয়া করবে সে এবার।

তাই তো বলছি মা। বউ এসে তার নিজের সংসার বুঝে নেবে। তোমার কর্তৃত্ব খাটবে না। তারপরেও যদি থাকতে চাও, ইজ্জত খুইয়ে ঝি-রাঁধুনি হয়ে থাকতে হবে।

দেখা যাক, কে আসে বউ হয়ে। এসে ঝি-রাঁধুনি করে, না মাথায় তুলে রাখে।

আর অধিক না বলে আমোদিনী মৃদু হেসে তখনকার মতো চলে গেলেন। বলার বাকিও বড় কিছু রইল না। এত বড় সুখবরে কেতকীর মুখ পাংশু। মা সুখস্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু কেতকী ভাবছে, বাস উঠল এবার এ-বাড়ি থেকে। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

পর পর্বে কেতকী আর রথীকান্তে কথা। রথীকান্ত বলে, হাত যাওয়া মানে আমায় বিধাতা জল থেকে স্থলে ছুঁড়ে দিলেন। স্থলে থাকা এখন। স্থলেই যখন, ঘরবাড়ির মধ্যে পুরোপুরি গৃহস্থ হয়ে থাকি। কি বল?

শালিস মানল যখন, উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কী আর বলা যায়? কেতকী বলে, বেশ তো, ভালই তো—

রথীকান্ত বলে, পঙ্গুমানুষ আমি তো একরকম। একটা হাতেই সব-কিছু—তা-ও ডানহাত নয়, বাঁ-হাত। দেখাশুনোর মানুষ চাই একটি—সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই তুমি যেমন করছ আমার জন্যে।

কেতকী চুপ করে আছে।

বাইরের লোকের উপর আস্থা করা যায় না। আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। এই ঘরে তুমি যে এত করছ, কোনদিন হঠাৎ অন্য লোকের ঘরণী হয়ে বিদায় নিয়ে যাবে। সেইজন্যে ভাবছি, বিয়ে করে ফেলি শান্তশিষ্ট দরদ-ভরা একটা মেয়েকে।

হাসতে হাসতে রথীকান্ত কেতকীকেই প্রশ্ন করে, জানাশোনা আছে কোন মেয়ে, হাত-কাটা বর দেখে যে মুখ বাঁকাবে না?

কেতকী ভ্রূভঙ্গি করে বলে, খুব—খুব। কত গণ্ডা চাই বলুন। টাকাকড়ি আছে আপনার, নামডাক আছে। মেয়েরা এত বোকা নয় যে এর পরেও ক'টা হাত আছে আপনার, ক'টা পা আছে, খুঁটিয়ে দেখতে যাবে।

ঘুরিয়ে কথা কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে, কেতকীর বুঝতে বাকি থাকে না। ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়ে সামনে থেকে সরে পড়ল।

মা-মেয়ের এর পরে মুখোমুখি কলহ। কড়া কড়া শুনিয়ে কেতকী মা'কে

রাগিয়ে দেয়ঃ পাঁচ-দশটা নয়, একটা তো জামাই হবে তোমার। ঠাকুর-দেবতা একটা খুঁতো পাঁঠা নেন না, তুমি মা খুঁতো জামাই করবে?

আমোদিনী বলেন, হাত কাটা গেছে তোরই কপাল গুণে। সর্বঅঙ্গ ষোলআনা বজায় থাকলে তোকে সে বিয়ে করতে যাবে কেন? দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তি করছিস—চিরকাল তাই করে যেতে হত।

রথীকান্ত যাচ্ছিল বুঝি এই দিক দিয়ে। হঠাৎ দেখা যায়, থেমে দাঁড়িয়ে সে কলহের রস উপভোগ করছে। হাসছে টিপিটিপি। কেতকী না দেখার ভান করে বেপরোয়া কুচ্ছোকথা শোনায়। বিগড়ে যায় যদি এইসব শুনে।

ঠিক উল্টো। রথীকান্ত স্পষ্টাস্পষ্টি আমোদিনীর কাছে প্রস্তাব করে বসল। কেতকী বিহনে জীবন তার শুকনো মরুভূমি।

বৃত্তান্ত শুনে কেতকী বলে, ভেবেছিলাম ভাদ্দরমাসটা কাটিয়ে দিয়ে পুজোর সময় যেখানে হোক চলে যাব। হবার জো নেই, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে। গাঁটরি বাঁধ মা। আর তুমি যদি না যাবে তো আমি একাই বেরিয়ে পড়ব যেদিকে দুই চোখ যায়।

ক'দিন পরে রথীকান্তর বাড়ির নিচে নৌকোডুবি। বড়দলের গঞ্জ থেকে হাট করে ফিরছিল। বিকালবেলা। মানুষে ঠাসাঠাসি—হাটুরে-নৌকোর যা দস্তুর। পাল ফুলিয়ে তরতর করে আসছিল—আচমকা উল্টোপাল্টা বাতাস উঠে পালের জীর্ণ কাপড় ছিন্নভিন্ন করে দিল। কাত হয়ে পড়ল নৌকো। ডাঙা বেশি দূরে নয়। গেল গেল—রব তুলে ডাঙার মানুষ শীতলামন্দিরের ঘাটে ছুটল।

কেতকীও ছুটেছে। গণেশও যে ঐ নৌকোয়! হাট করতে গিয়েছিল, ভাল সাঁতার জানে না। ঐ যে—গণেশই প্রাণপণ শক্তিতে পা দাপাচ্ছে জলে ভেসে থাকবার জন্য। কিন্তু পারবে না এই টান কাটিয়ে আসতে।

কেতকী আর্তনাদ করছেঃ বাঁচাও তোমরা ওকে, বাঁচাও! সাঁতার নিজেও জানে না, জোয়ারের প্রমত্ত স্রোতে তবুও সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়।

পিছন থেকে কে ধরে ফেলল—কেতকী ফিরে দেখে রথীকান্ত। সে-ও এসে পড়েছে।

পাগলের মতো কেতকী তার পায়ের উপর পড়েঃ বাঁচাও ওকে রথী-দা, তোমার পায়ে পড়ি। প্রাণদান দাও। যা বলবে কিছুতে আমি আপত্তি করব না। তোমার দাসী-বাঁদী হয়ে থাকব।

কে-একজন কোনদিক দিয়ে মন্তব্য করেঃ দুটো হাত বজায় থাকলে সেটা কি বলতে হত রে?

বাঁচবার জন্ত রথীকান্ত ইতস্তত করে। কেতকী মাথা কুটছে: বাঁচাও একটি বাঁ-হাত সম্বলেই রথী ঝাঁপিয়ে পড়ল। গণেশ তলিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। রথীকান্তরও নিশানা নেই।

ঘাট থেকে ডিঙি খুলে দিল। খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্ষণ পরে রথীকান্তকে দেখা যায়। বাঁ-হাতখানায় গণেশকে বেড় দিয়ে ধরে দু-পায়ের আলোড়নে কোন রকমে মাথা ভাসান দিয়েছে। ডিঙি ছুটে গিয়ে পড়ল। কী উল্লাস, কী উল্লাস!

আমোদিনী আনন্দ আর ধরে রাখতে পারেন না। কেতকীকে টানতে টানতে রথীকান্তর কাছে এনে হাজির করলেন: প্রণাম কর্—

একবারের বেশি দু'বার বলতে হয় না। বাধ্য মেয়ে রথীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমোদিনী বলেন, এখন অকাল চলছে বাবা। পোড়া অকাল সেই কার্তিক অবধি। অঘ্রাণের আগে শুভকাজ হবে না। তা দিনক্ষণ এখনই ঠিক করে ফেলি না আমরা।

মুহূর্তের সবুর সইছে না—পাঁজির খোঁজে গেলেন। রথীকান্ত কেতকীকে দেখছে। সেই ঘরে ভিন্ন শয্যায় গণেশ – চলে ফিরে বেড়ানোর অবস্থা এখনো আসে নি। কেতকী ভুলেও তাকায় না গণেশের দিকে। অর্থাৎ কেতকী পুরোপুরি এখন রথীকান্তর—গণেশকে বাঁচিয়ে রথী মূল্য শোধ করেছে।

আমোদিনী ইতিমধ্যে পাঁজি এনে সামনে দিলেন। রথী তাকিয়েও দেখে না। বলে, ভেবে দেখেছি মাসিমা, বিয়েথাওয়া আমার পোষাবে না। বাঁ-হাত দিয়েই সাঁতার দিতে পারি, আজকে তার পরখ হয়ে গেল। তবে আর ঝামেলায় যাওয়া কেন? জলেরই মানুষ আমি, ডাঙার চেয়ে জল ভাল আমার কাছে। দিব্যি ভেসে ভেসে বেড়াব।

কী আনন্দ!

ঘড়িতে পৌনে-পাঁচ। ভাদুড়ি সাহেবের তলব এসে পড়ল। এই ভয়টাই করছিল তমাল। বড় একটা টেণ্ডার তৈরি হচ্ছে—রকমারি কাজের ভিন্ন ভিন্ন রেট, সমস্ত জুড়ে গেঁথে হিসাব বের করা। যোগ-বিয়োগ-গুণ করে হিমসিম হচ্ছে সেই দুপুরবেলা থেকে। পনেরটা মিনিট কাটাতে পারলেই আজকের মতন ইতি। কিন্তু হল না, সাহেবের নিজ হাতের স্লিপ।

গুটি গুটি কামরার সামনে এসে বেয়ারাকে চোখের ইশারায় প্রশ্ন করে : আছে কেউ ভিতরে ?

সাহেব ডিকটেশন দিচ্ছেন।

হেন অবস্থায় না ঢুকে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু ভাদুড়ির ক্ষেত্রে তা চলবে না। টং-টং করে যেই মাত্র পাঁচটা বাজবে, কাগজপত্র চাপা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠবেন। পাঁচটার উপরে সিকি মিনিটও নয়—আবার কাল। কাজকর্ম যত কিছু এই সময়টুকুর মধ্যে সেরে নিতে হবে।

চোখ তুলে ভাদুড়ি তমালকে দেখে নিলেন। স্টেনোকে বললেন : কী লিখলে পড় এইবার—

এবং আধ মিনিট না যেতেই টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত : কানে কালা তুমি, আর নয়তো শর্টহ্যাণ্ড জান না। ফাঁকি দিয়ে ঢুকেছ।

তমাল তৃপ্তিভরে রত্নার দিকে তাকায়। ভগবান আছেন—পুরো দিনও গেল না, প্রতিফল হাতে হাতে। আজকেই দশটা বেলায় এই মেয়ে গোখরো সাপের মতন ছোবল দিতে গিয়েছিল, ভাদুড়ির সামনে এখন কেঁচো। চোখ চকচক করছে—জল এসে গেছে বুঝি-বা। চাকরি থাকলেই অপমান—সে কিছু নতুন নয়। কিন্তু অপমান একেবারে তমালেরই চোখের উপর !

বেলা দশটা তখন। তমাল সকাল সকাল আজ মেস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। অফিসের কাছে গলির মোড়ে অপেক্ষা করছিল। যথাসময়ে রত্নাকে দেখা গেল।

একটা কথা শুনবেন—

রত্না বলে, অফিসে চলুন। সেইখানে শুনব।

অফিসের ব্যাপার নয়। বড়রাস্তার ভিড়ের মধ্যেও হবে না। একটুখানি আসুন এদিকে। আধঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে আছি।

রত্না পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। কয়েকটা লাল গোলাপ গুচ্ছ করে বাঁধা, এবং ভ্যানিটিব্যাগ। জিনিস দুটো তমাল তুলে ধরল।

রত্না জ্বলে ওঠে। ফুল ছুঁড়ে মারল তমালের গায়ে। ভ্যানিটিব্যাগও ছুঁড়ে দিচ্ছিল, তমালের দিকে নজর পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মড়ার মতো রক্তলেশহীন মুখ।

বলে, দাদারা আপনাকে দেখতে পারে না, মা-ও দুর-দুর করেন। কেন আমার পিছু লেগে আছেন বলুন তো। শায়েস্তা আপনাকে একদিনেই করা যায়। পুলিসকে বললে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই, ভাদুড়ি সাহেবকে বলব। চাকরি তারপর ক'দিন থাকে দেখা যাবে।

আহত কণ্ঠে তমাল বলে, আজকে একটা বিশেষ দিন—জন্মদিন আপনার।

কে বলেছে আপনাকে ?

আপনিই। নইলে কেমন করে জানব বলুন। মিসেস মজুমদারের সঙ্গে একদিন হাসাহাসি করছিলেন : মাইকেলের আর আপনার এক তারিখে জন্ম। তিনি মহাকাব্য লিখলেন, আপনি পাতার পর পাতা নোট লেখেন নিত্যিদিন। কী, মনে পড়ছে না ? আমি সেই সময় শুনে রেখেছিলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবছে রত্না। অবাক হয়ে গেছে।

তমাল বলে, কাগজে দেখলাম মাইকেলের জন্মদিন আজ। তা হলে আপনারও। নিউমার্কেট হয়ে আসছি। জিনিস সামান্য, মানুষটা আমি আরো সামান্য। তাই আপনি ছুঁড়ে দিতে পারলেন।

ভ্যানিটিব্যাগ আঁচলের নিচে নিয়ে রত্না দ্রুতপায়ে অফিসে ঢুকে গেল। রাগে গর-গর করছে তমাল সেই থেকে। স্টেনোরা যেখানে বসে, তার ছায়া মাড়ায়নি। সেই রত্নার সঙ্গে তবু দেখা হয়ে গেল। ভাদুড়ির সামনে, এমনি অবস্থায়।

ভাদুড়ি বলেন, ফের আমি ডিকটেশন দিচ্ছি। এত অন্যমনস্ক হলে চাকরি থাকবে না। কনফারমেশন হয়নি এখনো, মনে রেখ। টাইপ করে আমার টেবিলে রেখে যাবে। যতক্ষণ লাগুক, জানিনে। কাজ শেষ করে তবে যাবে।

রত্নাকে ছেড়ে ভাদুড়ি তমালের দিকে ফিরলেন। ক্লাবে যাবার বাগড়া পড়ে যাচ্ছে, ক্ষেপে রয়েছেন। তমালের বুক ঢিবঢিব করে ফাইল এগিয়ে দিতে।

ঠিক তাই। প্রথম পাতাটায় একটু চোখ বুলিয়ে ভাদুড়ি গর্জন করে ওঠেন : এত কাটাকুটি—হাতে ছুঁতেই তো ঘেন্না করে। একটা সিনপসিস করতে হয়, তা-ও বুদ্ধিতে আসেনি। ছি-ছি ! ঝণ্টু বেয়ারা কনটিনজেন্সির হিসাব দিয়ে গেল, দেখ ঐ চেয়ে। জায়গা বদলাবদলি কর—চেয়ার ছেড়ে ঝণ্টুর টুলে বোসো এবার থেকে।

ফাইল তুলে নিয়ে তমাল তাড়াতাড়ি মুখের উপর ধরে। মুখ না দেখতে পায় রত্না।

ভাদুড়ি বলেন, কপি করে ফেল সবটা। কাটাকুটি থাকবে না, নোংরা হবে না। টাইপ করতে গিয়ে নয়তো একশ গণ্ডা ভুল করবে। একটা সিনপসিস করে দিও। কাল এসে টেবিলে যেন পাই।

আড়চোখে তমাল রত্নার দিকে তাকায়। মুখ নিচু করে সে ভাদুড়ির ডিকটেশন টুকে যাচ্ছে। মুখ তুলল না একবার।

এত বড় অফিসের মধ্যে একা তমাল কাজে আছে। অন্য সমস্ত চেয়ার খালি—লাইনবন্দি রাক্ষসেরা নিঃসাড়ে যেন হাঁ হয়ে আছে। আর আছে আরশুলা, ঘরের অন্ধিসন্ধি থেকে কিলবিল করে বেরুচ্ছে। রত্নাও আছে নাকি? কোন দুঃখে থাকবে, টাইপ করা কতক্ষণেরই বা কাজ! কাজ চুকিয়ে অনেকক্ষণ সে বেরিয়ে পড়েছে। এত ভুলচুক ও বসের গালি খাওয়া—সকলের মূলে রত্না। রত্না সেই যে মন খিঁচড়ে দিল, সারাদিন আজ কাজে মন বসেনি।

একসময় অবশেষে ভাদুড়ির টেবিলে ফাইন রেখে দিয়ে তমাল বেরুল। মোড়ে দাঁড়িয়ে রত্না—সকালে তমালও ঠিক এইখানটায় ছিল।

এই যে, আমি—আমি—

অফিস-পাড়া নির্জন এখন। রত্না ছুটে চলে এল। বলে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি আসেনই না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে। ভয়-ভয় করছিল—চলে গেলেন বুঝি-বা। তা দেখি, আলো জ্বলছে অফিসের ভিতরে।

এত কথার জবাবে তমাল নিরাসক্তভাবে বলে, দরকার আছে কিছু?

রত্না বলে, আমার জন্মদিন, নিজেই তো ভুলে বসেছিলাম। আপনি মনে করে রেখেছেন। উপহার নিয়ে এলেন—জীবনে আজ প্রথম আমি উপহার পেলাম।

সে তো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কোথায়! সারাক্ষণ বুকে বুকে রেখেছি—ভ্যানিটিব্যাগ তুলে ধরে দেখায়। বলে, ফুল নিই কেমন করে? ফুল হাতে অফিসে ঢুকলে রক্ষে ছিল! টাইপ করে করে আঙুল ব্যথা—সে মানুষ শখ করে ফুল কিনেছে, কেউ তা বিশ্বাস করত না। নানান কথা উঠত। কী মানুষ আপনি, আমার দিকটা একবার ভাবলেন না। রাগ করে রইলেন।

গায়ে-গায়ে হয়ে আবদারের ভঙ্গিতে রত্না বলে, আচ্ছা আচ্ছা, রাগ করতে হবে না। শোধ হয়ে যাচ্ছে—অনেকক্ষণ ধরে ঘুরব আপনার সঙ্গে।

তমাল খোঁচা দিয়ে বলে, দাদারা আছে, মা আছেন—তাঁরা যদি কিছু বলেন?

একরত্তি খুকিটি নই, সকলকে চেনা হয়ে গেছে। নির্ভয় বেপরোয়া এখন

রত্না: মা-ভাই কারো তো মনে পড়ল না জন্মদিনের কথা। বিয়েথাওয়া হলে আমার মাসমাইনের টাকাগুলো বেহাত হবে, ভাবনা সেইখানে। যাকগে, এ সব কথা তুলে মন খারাপ করব না আজকের দিনে। চা খাইনি—আপনি পাছে চলে যান, জায়গা থেকে নড়তে পারিনি। কোনখানে ঢুকে পড়ি চলুন।

ক্যান্টিনে নয়—চেনামানুষ বেরিয়ে পড়তে পারে। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার দিকে গিয়ে ছোটখাট এক রেস্তোঁরায় ঢুকল। হাত নেড়ে তমাল ছোকরাকে ডাকে: শোন—

রত্না বলে, বাঃ রে, আমিই তো নিয়ে এলাম। আপনার কী, আপনি কেন আগ বাড়িয়ে হুকুম দেবেন?

প্রভুত্বের কণ্ঠে তমাল বলে, চুপ! জন্মদিনে ঝগড়া করতে নেই, যে যা বলে মেনে নিতে হয়।

ছোকরাকে বলে দিচ্ছে, দু-কাপ চা আর—

ব্যস ব্যস, আর কিছু নয়। ঘাড় দুলিয়ে রত্না না-না করে ওঠে: দোহাই আপনার। বিকেলে শুধু চা আমি খেয়ে থাকি।

তমাল বলে, আমিও। কিন্তু বড় বেশি আনন্দ হলে চায়ের সঙ্গে ভাল জিনিস কিছু খাই। চাকরি যেদিন পাকা হল, সেদিনও খেয়েছিলাম।

ছোকরাকে হুকুম দিল: দু-কাপ চা নিয়ে এস, আর দুটো চিকেন কাটলেট।

অনেক বেড়াব আজ আপনার সঙ্গে। অনেক রাত অবধি।

তমাল বলে, আজ্ঞে-আপনি চালাবে তো কানে এই আঙুল এঁটে দিলাম।

তোমার সঙ্গে—হেসে রত্না সংশোধন করে নিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে জবাবটা কি হবে, বাতলে দিন।

তমাল তাড়া দিয়ে ওঠে: আবার?

একদিনে হয় বুঝি!

দিন নয়, মাস নয়—পুরো বছর এক অফিসে এক সঙ্গে—

অভিমানে থমথম করে তমালের গলা। বাঁধানো ঘাটে বসেছিল, তড়াক করে উঠে জলের দিকে ছুটে যায়।

ওকি ওকি, কোথা চললে তুমি? রত্নাও পিছন নিয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে তমাল হেসে ফেলল: ডুবতে নয় রত্না, ভেসে বেড়াতে।

বিস্তর ডিঙিনৌকো। এক মাঝির সঙ্গে তমাল দরদস্তুর করল, জলে জলে খানিকটা ঘুরিয়ে আনবে। রত্নাকে ডাকে: চলে এস—

আকাশে চাঁদ, জলের উপর জ্যোৎস্না। মুগ্ধকণ্ঠে রত্না বলে, শহরে চাঁদ ওঠে, আজ আমি প্রথম জানতে পেলাম।

কাঠের পার্টিশনের আড়ালে সারাদিন টাইপ করা যার কাজ, সেই নারী জ্যোৎস্নার আলোয় আচমকা হুরী-পরী হয়ে গেছে। গা শিরশির করে তমালের। সামাল করে দেয়: কাদা ওদিকটা, দেখো। জুতোসুদ্ধ কাদায় না পড়ে যাও।

হাত বাড়িয়ে দেয়। হাত ধরে রত্নাকে নৌকোয় তুলে নিল। তার পরেও হাত ধরে আছে। মাঝ-গঙ্গা দিয়ে যাচ্ছে, ফিনিক ফুটছে জ্যোৎস্নায়— যেন দিনমান। হঠাৎ বুঝি রত্নার ভয় ধরে গেল। কিংবা কৌতুক। বলে, যা দুলছে নৌকো, যদি ডুবে যায়? আমি একদম সাঁতার জানিনে।

ওরে পাগল, সাঁকো নাড়াবি নে—পাগলের অমনি মনে পড়ে যায়। বসে ছিল তমাল, উঠে দাঁড়াল। ছোট্ট ডিঙির দু'দিকে দুই পা রেখে ছেলেমানুষের মতন জোরে জোরে দোলা দিচ্ছে।

মাঝি খিঁচিয়ে ওঠে: বসুন না ঠাণ্ডা হয়ে। জল উঠে যাবে।

মাঝিকে নয়—রত্নাকে শুনিয়ে তমাল নিম্নকণ্ঠে বলে, জল উঠে নৌকো ডুবে যাক তাই আমি চাইছি।

রত্না বলে, জীবনে বিতৃষ্ণা—আমি আছি বলে বুঝি?

জীবন রঙিন—তুমি আছ বলেই। সাঁতার জান না বলে দু-হাত বাড়িয়ে রত্না তুমি জড়িয়ে ধরবে। জল তোলপাড় করে আমি ডাঙায় নিয়ে তুলব।

রত্নাকেও ছেলেমানুষিতে পেয়েছে আজ, আরও সে শুনতে চায়। বলে, না যদি পৌঁছতে পার ডাঙায়?

ডুবে মরব একসঙ্গে। কোনদিন হয়তো জেলের জালে জড়িয়ে উঠব। তখন মানুষ নই—কঙ্কাল দু'খানা। কঙ্কালে কঙ্কালে জড়িয়ে আছি। মানুষ ভিড় করে দেখছে। আজকের এই রাত্রির পর মৃত্যুও আমাদের আলিঙ্গন ছিঁড়তে পারবে না।

মরা-ছাড়ার কথা রত্নার পছন্দ নয়, তাড়াতাড়ি ভিন্ন প্রসঙ্গে আসে: এমন গঙ্গা, এত সব নৌকো—কেন যে মানুষ ডাঙার রাস্তায় ধুলো খেয়ে বেড়ায়!

তমাল জুড়ে দেয়: খাঁচার মতন টেবিল-চেয়ারে ঘিরে বসে অফিস করে সারাটা দিন—

রত্না বলে, নোট নেয়, খটাখট টাইপ করে—

তমাল বলে, এস্টিনেট বানায়, খিঁচুনি খায় ভাদুড়ি সাহেবের।

নৌকোর নিচে স্রোতের জল ছলাৎ-ছলাৎ করে, নৌকোর উপরে কেরানি ও স্টেনো মানুষ দুটির অর্থহীন প্রলাপ। হঠাৎ যেন রত্না ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: অফিসসুদ্ধ লোক শাপশাপান্ত করে, আর-জন্মে ভাদুড়ির নাকালটা দেখো।

এই জন্মেই—পাঁচ-সাত বছরের ভিতর। আমৃত্যু সময় দিতে তমাল রাজি নয়। বলে, শ্বশুর হল ম্যানেজিং এজেন্ট, জারিজুরি সেইজন্যে। শ্বশুরটা মরুক—এতাবৎ যত চুরি করেছে উগরে দিয়ে হা-অন্ন জো-অন্ন করে বেড়াবে।

রত্না বলে, রসুইবামুন হবে আমাদের বাসায়। এই ভাদুড়ি, ডালে নুন দাওনি আজ—চার আনা ফাইন।

তমাল আরও কড়া। বলে, রসুইবামুন নয়, আমাদের বাসার ঝাড়ুদার। এই ভাদুড়ি, ধুলো কেন মেঝেয়? আট আনা ফাইন। ঝুল কেন দেয়ালে? এক টাকা ফাইন!

ফাইন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ভাদুড়ি ঝাড়ুদারের বড় দুরবস্থা। এমনি সময় নৌকো এসে ডাঙায় লাগল।

এরই মধ্যে?

মাঝি বলে, এক টাকায় আর কতক্ষণ? টাকা ছাড়ুন, আবার নিয়ে যাচ্ছি।

রত্না বলে, কী দরকার! জলে হল, ময়দানে এবার। খরচা নেই—যতক্ষণ খুশি মনের সাধে ঘুরব।

ডাঙায় উঠেও ভাদুড়িকে ছাড়েনি। আক্রোশ মিটিয়ে হেনস্থা করতে করতে যাচ্ছে।

রাস্তাটা পার হয়েই ফাঁকা ময়দান। হুস করে মোটর এসে ধাক্কা দিল রত্নাকে। পড়ে গেল রত্না, পিচের রাস্তা রক্তে ভেসে যায়। ভলকে ভলকে রক্ত। রক্ত দেখতে পারে না তমাল, সে-ও বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে।

ময়দান নির্জন, তাই এতক্ষণ মনে হচ্ছিল। কোথা থেকে কত মানুষ এসে পড়ল। জনতা হৈ-হৈ করছে। ধাক্কা মেরে মোটর নক্ষত্রগতিতে পালিয়েছে, তার মধ্যেও নম্বরটা দেখে নিয়েছে তমাল। বলতে গিয়েও চেপে গেল। নম্বর বললে তাকেও নাম দিতে হবে, পুলিসের জেরায় পড়বে।

কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল ঝোঁকের মাথায়! তমাল যত ভাবে, আঁতকে ওঠে ততই। পুলিসে অসাধ্য-সাধন করে! জানাজানি হয়ে যেত দু'জনের এই একা-একা বেড়ানো। রেস্তোঁরার ছোকরা, নৌকোর মাঝি সবাইকে সাক্ষির কাঠগড়ায় তুলে পেটের কথা টেনে টেনে বের করত।

ভাদুড়ি সাহেব আবার বিষম নীতিবাগীশ—টের পেলে নির্ঘাত চাকরি খাবেন কোন একটা অজুহাত তুলে। চাকরি তার যাবে, এবং রত্নারও। আহা, সেরে উঠুক রত্না—ভবিষ্যৎ ভেবে সে নিশ্চয় কোনদিন কিছু বলতে যাবে না। তমালও মানা করে দেবে।

পাহারাওলা একটি এসে গেছে, আরও কত আসবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছে। তমাল যেন জনতারই একজন, দৈবাৎ এসে পড়েছে—এমনিভাবে আছে সে মিশে। ক্রমশ পিছনে সরে একসময় বেরিয়ে পড়ল। দ্রুত হাঁটছে। সন্দেহ করে লোকে তাড়া করবে—নয়তো দৌড়ত। মেসে ঢুকে নিজের তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে।

খাওয়ার ডাক এলে অন্য মেম্বারদের সঙ্গে খেতে বসতে হয়। অন্যদিন যা করে, তা থেকে তিল পরিমাণ এদিক-ওদিক হলে চলবে না। চাপ চাপ রক্ত চোখে ভাসে—খাওয়া আসে না, গিলে যেতে হয় তবু। ধ্বক করে মনে পড়ল ভ্যানিটিব্যাগের কথা, ভালবেসে নাকি বুকে বুকে রেখেছে! ন্যাকা মেয়েমানুষ —বয়সের গাছপাথর নেই, খুকি-খুকি ভাব! অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে গিয়ে অথবা হাসপাতালে পৌঁছে সে জিনিস বেরিয়ে পড়বে। ভ্যানিটিব্যাগের ভিতর মৃত্যুবাণ—তমালের পুরো নাম রয়েছে। এবং ন্যাকামি তাকেও পেয়ে বসেছিল—নামের সঙ্গে বেশ খানিকটা কবিত্ব করে রেখেছে।

ঘুমোয়নি তমাল সারারাত। ঘরের আর দুটো সিটে আরও দু'জন—না ঘুমিয়েও তাই মড়ার মতন পড়ে আছে। অস্বাভাবিক ভাব কিছু দেখানো চলবে না। জামা-কাপড় আলনায় ছেড়ে রেখেছে—রক্তের ছিটেফোঁটা লেগেছে হয়তো কাপড়ে, রত্নার রক্ত। আলো জ্বেলে সন্দেহ ঘোচাবে, সে উপায় নেই। ঘুম ভেঙে ওরা দেখে ফেলতে পারে। সাক্ষি দেবে, রাত্রে উঠে তমালবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জামা-কাপড় দেখছিলেন। যেন গাড়ির ধাক্কায় নয়, তমালই ছুরিছোরা মেরে রত্নাকে খুন করেছে।

ভোরবেলা খটখট করে সদর-দরজায় কড়া নড়ে উঠল। পুলিস? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে তমাল কলঘরে ঢুকে পড়ে। তারপরে হুঁশ হল, মেসের ঠাকুর বাসায় গিয়ে শোয়, ভোরে এসে কড়া নেড়ে চাকরকে ডেকে তোলে। কড়া নাড়ে রোজই, আওয়াজ শুনে আজকে তমাল ভয় পেয়ে গেল।

খবরের কাগজ এলে দুর্ঘটনার জায়গাটা সর্বাগ্রে দেখে। তিনটে রয়েছে, কিন্তু ময়দানের ঘটনা নেই। যেমন হয়েছে রিপোর্টারগুলো—সন্ধ্যা অবধি যেটুকু হল তারই দায়সারা খবর দিয়ে বাবুরা ঘরে চলে গেলেন। রাত্রে দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হলেও কাগজে তার এক লাইন পাবে না।

যথারীতি অফিসে গেল। ভাদুড়ি সাহেব ডেকে পাঠালেন। বিষম খাপ্পা: কোম্পানির অন্ন খাচ্ছে—কাজ বলে এতটুকু দরদ নেই। রত্না দাসের কাল ফিরতে বোধহয় একটু দেরি হয়েছিল, আজকে একেবারেই ডুব। তুমি মিস দাসের পথ নাওনি, সেজন্য ধন্যবাদ। টাইপ কে করে এখন? একটা চিঠি টাইপ করতেই মিসেস মজুমদারের এক-শ গণ্ডা ভুল—এত সব টাকা-আনার ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না।

ভাদুড়ি আজও একটা কাজ দিলেন— তেমনি একগাদা যোগ-বিয়োগ-গুণ। পরমানন্দে তমাল হাত পেতে নিল। খবর কেউ এরা জানে না।

অনতিপরে রত্নার ছোটভাই সুদেব এসে পড়ল। হাসপাতাল থেকে সোজা আসছে। এই ছেলেটার সঙ্গে তমাল ভাব জমিয়ে রেখেছে, এরই সঙ্গে দু-চারবার রত্নাদের বাড়ি গেছে। তমালের কাছে এসে সুদেব বলে, শুনেছেন তমাল-দা, দিদির কাল সাংঘাতিক অ্যাকসিডেণ্ট—

তমাল আকাশ থেকে পড়ে: বল কি হে? কী সর্বনাশ!

অফিসময় চাউর হয়ে গেল। অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মিসেস মজুমদার এলেন। সুদেব বলে, সারারাত কেউ আমরা ঘুমোইনি। ভোরে থানায় জানানো হল। তাদের কাছে খবর পেয়ে এমার্জেন্সি-ওয়ার্ডে গেলাম। সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ, সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে দিদি।

মিসেস মজুমদার আর রত্নার পাশাপাশি টেবিল। চোখে তাঁর জল এসে গেল: সারাদিনের এই খাটুনি। তার উপরে, কাল রাত্রি অবধি খেটেছে। বাসায় ঘিঞ্জি ঘর, ময়দানে একটু ফাঁকায় বেড়াচ্ছিল বোধহয়।

তমাল নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। ভ্যানিটিব্যাগ নিশ্চয় গায়েব, নইলে তার সঙ্গে যোগাযোগ বেরিয়ে পড়ত। রত্নার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ ছিটকে পড়েছিল এক দিকে—আজেবাজে কত লোকের ভিড়, কুড়িয়ে নিয়েছে কেউ। ব্যাগের মধ্যে রত্না টাকাপয়সাও রেখেছিল—টাকা সহ নতুন ব্যাগ যে পেয়েছে, সে কি আর ফেরত দিতে আসবে?

মিসেস মজুমদার বলেন, অফিসের পর দেখতে যাব। আপনিও তো যাবেন তমালবাবু, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

সুদেবের সামনে 'না' বলে কি করে, তমাল ঘাড় নেড়ে দিল।

সুদেব বলে, যাবেন—আমরা সব থাকব।

মিসেস মজুমদার পুলিসের বেহদ্দ। ঠিক পাঁচটায় গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বললেন, ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়েছি তমালবাবু। এতক্ষণে এসে গেছে। দেরি করবেন না, চলুন—

হাসপাতালে নেমে পা আর চলতে চায় না। আসামিকে যখন ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যায়, তখন বুঝি তার এই অবস্থা।

মিসেস মজুমদারের নজর এড়ায় না। মেয়েমানুষ যখন—তমালের হাবভাব আগেও কিছু লক্ষ্য করেছেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, অত ভয় পাবেন না তমালবাবু। হাউস সার্জেন আমার চেনা, খানিক আগে তাঁকে ফোন করেছিলাম। কাটিয়ে উঠবে বললেন তিনি, আজকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে। গিয়ে হয়তো দেখতে পাব, টরটর করে কথা বলছে।

তমাল দাঁড়িয়ে পড়ে।

হল কী আপনার?

উল্টো দিকে ফিরে তমাল পায়ে পায়ে চলেছে।

গেটের কাছে লেবু-আপেলের দোকান। মিসেস মজুমদার সকৌতুকে বলেন, আপনি পাগল! ফল নিয়ে যাবার দিন আজ নয়। জ্ঞান ফিরলেই অমনি বুঝি খেতে দেবে!

সুদেব কোন দিক দিয়ে এসে তমালের হাত জড়িয়ে ধরল। হায় রে হায়, হাণ্ডকাপ-পরা আসামি সে এখন! দরজার কাছে রত্নার মা ও দাদা। পা টিপে টিপে যাচ্ছে তমাল—জুতোর শব্দে চিনতে পেরে রত্না বুঝি চেঁচিয়ে উঠবে, সব কথা বলে দেবে সকলের সামনে।

মিসেস মজুমদার জিজ্ঞাসা করেন: জ্ঞান ফিরেছে?

মায়ের দু'চোখ জলে ভরে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। বড়ভাই নিশ্বাস ফেলে বলে, অক্সিজেন দিচ্ছে, জ্ঞান বুঝি আর ফিরবে না।

নিঃশব্দ একেবারে। দেয়ালঘড়িটাও চলছে না, মনে হয়। ডাক্তার এক সময় ঘর থেকে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে চলে গেলেন, কারো দিকে চেয়ে দেখলেন না।

রত্নার পাশে গিয়ে তমাল দাঁড়াল। কতক্ষণ পরে চোখ মুছতে মুছতে মিসেস মজুমদার বলেন, আর কি হবে! চলুন তমালবাবু।

তমাল বলে, আপনি যেতে লাগুন—

পোস্টমর্টেম হবে, দেহ পেতে কাল। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে তমাল মেসে ফিরল। এসে তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ মনে পড়ল, অফিস থেকে বেরিয়ে চা খাওয়া হয়নি তো আজ। চাকরকে ডেকে পয়সা দিয়ে বলে, চা নিয়ে আয় এক কাপ—

চাঙ্গা হয়ে উঠে বসল তক্তাপোশের উপর। আবার বলে, ডবল-কাপ আনবি। আর চিকেন-কাটলেট।

রূপসীর পিছনে

লাল টুকটুকে পাতলা ছুটি ঠোঁট, চুলে এলোখোঁপা, ধবধব করছে গায়ের রং। নিটোল যৌবন, অপরূপ রূপসী—কুসুম রঙের শাড়ি পরে রূপ আরও খুলেছে। লহমার মধ্যে কণিষ্ক এত সমস্ত দেখে নিল।

থাকে কোথায় হেন আশ্চর্য মেয়ে! আর কোনদিন দেখা যায় নি। আকাশের পরী ডানা ভেঙে বুঝি মাটিতে পড়েছে। অথবা সেকালের দেবী ভেনাস মূর্তি ধরে এসেছেন। পথের উপর গাছতলায় আধ-অন্ধকার আড়াল মতো জায়গা—রহস্যজনক ভাবে সেখানে পদচারণা করছে।

রহস্যময়ী হঠাৎ চলতে শুরু করে। কণিষ্ক তাক করে আছে, নজর গেছে ঠিক—এ মেয়েদের এমনি রীতি। কণিষ্কও অতএব চলল। এরকম স্বভাবের কোনদিন সে কিন্তু ছিল না। চিরকাল ভদ্র, শিক্ষিত, রুচিবান। আজকে তার কী হল—রূপসীর পিছু নিয়ে চলেছে। চলছে কি নিজের ইচ্ছেয়—হিড়হিড় করে টানছে তাকে রূপের রশি বেঁধে। সে রশি চোখে দেখা যাচ্ছে না, এই যা।

হাঁটছে না ললনা—বলা যায় দৌড়ানো। অথবা উড়েই যাচ্ছে বোধহয়। পরী যদি হয়, ডানা-ভাঙা মোটেই নয়—ষোলআনা আস্ত পরী। ডানা চাপা রয়েছে শাড়ির আঁচলের নিচে। বাতাসে আঁচল ওড়ে। মোমের মতন নিটোল পা ছুটি বুঝি মাটি ছোঁয় না। উড়ে চলেছে ফাঁপা আঁচলে ভর করে।

বেঁটে সাইজের মানুষ কণিষ্ক—একটু পরেই হাঁপিয়ে উঠল। কুসুম-বসনার দিকে তাক রেখে ছুটতে হচ্ছে, দৃষ্টি থেকে হারিয়ে না যায়। ডালায় কুচি-কুচি তামাক—ফুটপাথে বসে একদল বিড়ি বাঁধছে—পড়বি তো পড়, একেবারে তাদের ঘাড়ের উপর। পায়ের ঘায়ে তামাকের ডালা ফুটপাথের নিচে ছিটকে পড়ে। মানুষগুলো রে-রে করে উঠে পড়ল। আরও সব ছুটে আসছে এদিক-সেদিক থেকে।

ঘিরে ফেলেছে। ব্যূহের মধ্যে আটক হয়েও কণিষ্ক ডিঙি মেরে কুসুম-বসনার দিকে নজর রেখেছে।

দেখতে পাও না মশায়, হাঁটবার সময় চক্ষু ছুটো কোথায় রেখে চল?

যে জায়গায় রাখা আছে, সেটা খুলে বলতে গেলে বিপদ।

গর্জন ওদিকে: মুখে রা কাড়ো না—কানেও কালা নাকি তুমি?

বোঝা যাচ্ছে, আর দেরি করলে মুখের গালিগালাজ নয় তারু পরের ধাপে

উঠে যাবে। তাড়াতাড়ি দু-টাকার নোট একটা ছুঁড়ে দেয় কণিষ্ক: দেখতে পাইনি ভাইসব, দেখলে কেন অমন হবে? মাল কুড়িয়ে ঝেড়েঝুড়ে নাও—খাটনির বাবদে পানটান খেও, এই দিচ্ছি।

দু-টাকায় ব্যূহভেদ হয়ে গেল। ছুটেছে আবার। কিন্তু যত উৎপাত কি আজকের দিনেই! বাচ্চারা পথের উপর গুলি খেলছে, সন্ধ্যার পরেও ঘরে ফেরার নাম নেই। হেন ক্ষেত্রে যা হবার তাই ঘটল, পায়ের ধাক্কায় গোটা দুই-তিন ছিটকে পড়ল এদিক সেদিক। কী আর্তনাদ রে বাবা—খুনই হয়ে গেছে মনে হবে সেই চেঁচামেচি শুনে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে দেখতে হল। খুন না হোক, জখম হয়েছে ভাল রকম। গোটা দুই তিন তখনো ভুঁয়ে গড়াচ্ছে। ভাগ্যক্রমে মহৌষধ জুটে গেল একেবারে হাতের কাছে, স্টেশনারি দোকানে। আধুলি দিয়ে মুঠোখানেক লজেন্স কিনে কণিষ্ক হরির-লুঠের মতো ছড়িয়ে দিল। কান্নাকাটি কোথায় গেল, কাড়াকাড়ি করে সব লজেন্স কুড়োচ্ছে। কুসুম-বসনা ইতিমধ্যে আড়াল হয়ে গেছে। বাচ্চাদের সামলে কণিষ্ক ছুটল আবার। ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নেবার জন্য ডবল জোরে ছুটেছে।

ভরসা ছিল না, শেষটা বড়রাস্তায় এসে খোঁজ মিলল। শ্রীমতী ট্যাক্সির অপেক্ষায়। পাওয়া গেল স্থির হয়ে এইমাত্র দাঁড়িয়ে পড়েছে বলেই। গৌরবরণ নিটোল বাঁ-হাতখানা শাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে, মণিবন্ধ ঘিরে গয়নার ঝলসানি। চম্পককলি আঙুল নেড়ে ইশারায় ডাকছে। এসেও পড়ল চুল-দাড়িওয়ালা ভাগ্যবান শিখ ড্রাইভার।

পিঠ পিঠ কণিষ্কও ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা। কপালজোর রীতিমত—ইচ্ছা মাত্রেই ট্যাক্সি, কলকাতা শহরে এমন ঘটে না।

তাড়া দেয় কণিষ্ক: জোরে চল। হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার—আগের ট্যাক্সি সরে না পড়ে। মিটারে যত উঠবে, বখশিসও তাই।

চলেছে, চলেছে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নাম-করা এক ক্লাব-বাড়ির ফটকে এসে কুসুম-বসনা নেমে পড়ল। ভাড়া মেটাচ্ছে, সেই মুহূর্তে কণিষ্কও এল। তখন এক আশ্চর্য কাণ্ড—সেই মেয়ে তাকিয়ে পড়ল কণিষ্কের দিকে। কাছাকাছি এখন, ভুল হবার কিছু নেই। হাসি-ভরা দুই চোখ—এবং চাতুরীময় ইঙ্গিতও যেন দৃষ্টির মধ্যে। সার্থক বটে এতক্ষণের শহরময় ছোটাছুটি, আর দু-হাতে অর্থব্যয়।

উৎসব আজ এখানে। আলো ঝলমল করছে, গাড়ির পর গাড়ি এসে জমছে। নামছে সব মেয়ে—নানা রকমের নানা ঢঙের নানাবিধ সাজসজ্জার।

সেই কুসুম-বসনাও টুক করে ঢুকে গেল। হাত আগলে কণিষ্ককে আটকে দিল ফটকের দারোয়ান। মহিলা-সংঘের বার্ষিক উৎসব, পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। একক পুরুষের তো নয়ই। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি যথারীতি মিনিস্টারই বটে, কিন্তু বেছে বেছে একজোড়া মেয়ে-মিনিস্টার নিয়ে আসা হয়েছে।

ঢুকতে না পেয়ে কণিষ্ক গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। মনে মনে গজরাচ্ছে, এখনকার দিনেও এই গোঁড়ামি! রূপ আছে কারো কারো, মানি। ঢং আছে, প্রসাধন আর সাজসজ্জা আছে। সবই তো মানুষকে দেখাবার জন্য। পুরুষমানুষকে—যেখান থেকে তারিফ মেলে। এক মেয়ে আর এক মেয়ের ভালো দেখতে পারে না। যত ভালোই হও, নাক সিঁটকোবে। সেই পুরুষ কিনা একেবারে জাত ধরে বাতিল। অথচ পুরুষের সর্ব ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন ওঁরা। ট্রামে বাসেই দেখ না—রিজার্ভ-করা আলাদা আসন, তা ছাড়াও খুশি মতন গতর দুলিয়ে ধপাস করে পুরুষের মাঝে বসে পড়বেন। গাছের ষোলআনা খেয়ে এসে তলার ইতরজনার সঙ্গেও কুড়োবেন, এই তো স্বভাব ওঁদের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কণিষ্ক এই সব। দুত্তোর বলে এক-পা দু-পা চলে যায় বিরক্ত হয়ে। ফেরে আবার। রশি বেঁধে আটক করছে যেন ঐ ফটকের সঙ্গে, এগোলেই টান পড়ে, ফিরে আসতে হয়।

না, কষ্ট বেশি দিল না। উৎসব ভাঙে নি, তবু মেয়েটা বেরিয়ে এল। সেই কুসুম-বসনা। এসে ইতি-উতি তাকায়। দেখেছে কণিষ্ককে।

আছেন দেখছি এখনো—

এগিয়ে আসে মেয়ে। এতদূর ভাবতে পারে নি—কণিষ্কর বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। কেন আসে, কী করবে? পায়ের জুতো খুলে পটাপট বসিয়ে দেবে না তো? অনেক ক্ষেত্রে দিয়েছে এমন, শোনা যায়।

দৌড় দেবে কিনা ভাবছিল। সতর্কভাবে মুখে তাকায়। হাসি-হাসি মুখ। সেই রকম অন্তত আন্দাজ হয়।

মুখেও বলল তেমনি ভাবের কথা: চা খাওয়া যাক আসুন। ছুটো-ছুটিতে গলা শুকিয়েছে।

কণিষ্ককে ঠেস দিয়ে বলা। গলা যদি শুকিয়ে থাকে—সেটা ছুটোছুটির কারণে নয়, অচেনা রূপবতীর মুখোমুখি দাঁড়ানোয়। এসব ব্যাপারে কণিষ্ক একেবারে আনাড়ি। বয়সটা খারাপ, সে জন্য রূপের পিছনে ছুটেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে এখন।

রূপসী খপ করে হাত এঁটে ধরল : আসুন না—

অদূরের রেস্তোরাঁ দেখিয়ে বলে, নিরিবিলি একটা কামরা নিয়ে বসিগে।

এক দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেল ? মারাত্মক প্রেম—হাত ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে ঢুকল রেস্তোরাঁয়।

বলে, কি খাওয়া যায় বলুন ?

হেন অবস্থায় কণিষ্ক কী করতে পারে ! তাড়া দেবার ভঙ্গিতে বলে, আপনাকে তা ভাবতে হবে না। বসুন গিয়ে আপনি।

বোর্ডের উপর বড় বড় অক্ষরে খাদ্যের ফিরিস্তি। কণিষ্ক একনাগাড় অর্ডার দিয়ে চলল। এত বলে যাচ্ছে, ললনা তবু একবার ঘাড় নেড়ে না বলে না। এতাবৎ জানা ছিল, মেয়েলোকে খুঁটে খুঁটে অতি মন্থরে খায়। রূপসী গোগ্রাসে চালিয়েছে। ভীমাকার একটা কবিরাজি-কাটলেট কাবার করে জিভে টক্কর দিয়ে বলে, বেড়ে বানায়—

অতএব ঘণ্টা টিপে বয়কে ডেকে দ্বিতীয়বার কাটলেটের অর্ডার দিতে হয়। আপ্যায়নের অর্ধেক পথে এসে থামা চলে না।

খাওয়ার পর পরিতুষ্ট হয়ে এবারে অন্য সব কথা। বলে, মেয়েছেলে এ রকম ধড়িবাজ, ভাবতে পারা যায় না।

আত্মসমালোচনা নাকি ? সর্বনাশ ! কিন্তু এত দূর খরচান্তের পর কণিষ্কের পক্ষে সায় দেওয়া ঠিক হবে না। প্রতিবাদ করে ওঠে : সে কী কথা। কক্ষনো নয়—তা কেন হবে ?

আপনি কি বুঝবেন—ভুগতে হয় নি তো আপনাকে। দুপুর থেকে পিছন ধরে আছি। ঢুকল ক্লাব-বাড়িতে—তারপর যেন কর্পূর হয়ে উবে গেল। কিছুতে কবজায় আনতে পারলাম না।

বিমূঢ় হয়ে কণিষ্ক কথা শুনছে—হঠাৎ বুঝি নিজমূর্তি সম্পর্কে ললনার খেয়াল হল।

চিনতে পারেন নি ? ইনস্পেক্টর কৃতান্ত সরকার। আলাপ হল সেবারে—সেই যে, চাঁপাতলা যোগসিদ্ধি-আশ্রমে।

হাসতে হাসতে কৃতান্ত সরকার বলে, একটা সিগারেট চাইলাম, আপনি তেড়ে এসেছিলেন। তারপরে অবশ্য খাওয়ালেন খুব। মনে পড়ছে না ?

মনে পড়ে গেল কণিষ্কর। ঠাহর করে দেখে, নাক-চোখ সেই রকমই বটে।

আপনার গোঁফদাড়ি ছিল—সেবারে দেখেছি।

তখন এক বেটা সন্ন্যাসীকে ধরবার তালে ছিলাম। এবারে লেডি।

লেডি-গাটকাটা মঞ্জুলিকা সেন। তবে আর বলছি কি—এক বোঝা অম্বল মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি সেই দুপুর থেকে—

টুপি খোলার মতন চুল খুলে ফেলে কৃতান্ত দেখাতে যাচ্ছিল, বয় এসে পড়ায় চেপে দিল আবার। প্লেটের উপর বিল নিয়ে এসেছে বয়।

মনিব্যাগ খুলতে খুলতে কণিষ্ক মনে মনে যোগ করছে। বিড়িওয়ালাদের পান-খাওয়ানো, লজেন্সের দাম, ট্যাক্সিভাড়া বকশিস সহ, এবং সর্বশেষে রেস্তোরাঁর বিল—একুনে কত দাঁড়াল?

নার্সিং-হোম

অশোক রায় ভুগছে মাস ছয়েক ধরে। দিনকে দিন রোগা সলতে হয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনা করতে গেলে মাথা ঘোরে। নাড়িতে ঘুসঘুসে জ্বর—বিকাল বেলা আসে, সকালের দিকে ছেড়ে যায়।

এইসব ঘাপ্য ব্যাধিতে ডাক্তার সেনের নাম আছে। তাঁকে দেখাবে? ভাল করে দেখাতে হলে নার্সিং হোমে ঢুকতে হয়, ডাক্তার সেন ঐখানে রোগি দেখেন। মোটা খরচের ব্যাপার, কিন্তু প্রাণের চেয়ে পয়সা বড় নয়।

পয়সা এমনি নেয় না, ব্যবস্থা সত্যি সত্যি ভাল। হতে হতে অশোকের মাস তিনেক হয়ে গেল। একটা নার্স আছে, নীতা চৌধুরী, অশোকের দেখাশুনার ভার তার উপরে। ওষুধ খাওয়ায় মেজার-গ্লাসে মেপে, থার্মোমিটার মুখে দেয়, কপালে অডিকলোনের পটি আঁটে। হাসে শুধু মুখে নয়, দু'চোখ দিয়ে। হাসিও রোগ একটা, রীতিমত সংক্রামক রোগ। নীতা চৌধুরীর মুখ থেকে হাসিগুলো সরসর করে তার আঙুলের ডগায় পৌঁছে অডিকলোনের পটির সঙ্গে অশোকের কপালের উপরে, সেখান থেকে মুখের উপরে, চোখের উপরে, মনের উপরে লেপটে যায়।

নীতা রোজ এসে প্রশ্ন করে, কেমন আছেন?

বেজার মুখে অশোক বলে, রোগ বড় তাড়াতাড়ি সেরে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি কোথায়? তিন মাস তো হয়ে গেল।

তিন বছর কেন হল না?

নীতা হেসে বলে, নার্সিং-হোমেরই তাতে মুনাফা।

অশোক বলে, আমার মুনাফা অনেক অনেক বেশি ওদের চেয়ে। তিন বছর ধরে তুমি অডিকলোন [illegible] কপালে, হাতে হাত রেখে নাড়ি দেখতে, কেমন আছি পাশে বসে জিজ্ঞাসা করতে—

পরের দিন সকাল বেলা অশোকের ছাড়ি হয়ে গেল।

নীতা ডাক্তার সেনকে বলে, রোগি যে চলে যাচ্ছে!

অসুখ সেরে গেছে। চলে যাবে, নয় তো কি চিরকাল থাকবে?

মুখ টিপে হেসে নীতা চৌধুরী বলে, অসুখ সেরেছে, তবে এখনো প্রেমের কথা বলে কেন আমায়?

সেন বলেন, অন্য অসুখে ধরেছে। তার চিকিচ্ছে আমার হাতে নেই।

ঠিক তাই। নাছোড়বান্দা। অশোক বরানগরে নীতার বাড়ির আশে-পাশে ঘোরে। চিঠি দেয়, কথা বলার জন্যে ছোঁকছোঁক করে।

নীতার ভাই রাজেশ্বর গোঁয়ার-গুণ্ডা মানুষ। বলে, ওর অসুখ ডাক্তারে জানে না। আমার কাছে আছে।

এবং ক'দিনের মধ্যেই দেখা যায়, পিছন থেকে লাঠির ঘা মেরে অশোকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

বাড়ি এনে তুলল। জ্ঞানও হল। জ্ঞান হয়ে চিঁ-চিঁ গলায় সর্বপ্রথম কথা: বাড়িতে কেন, নার্সিং-হোমে নিয়ে যাও। ডাক্তার সেন দেখবেন।

ওদিকে পুলিসও এসে গেছে: কে মারল, চিনতে পেরেছেন? কেন মারল, উদ্দেশ্য কী ছিল তাদের?

অশোক ঝেড়ে ফেলে দেয়: কিছু জানি নে। সামান্য একটু আঘাত—এ নিয়ে আপনাদের ছুটোছুটি করতে হবে না।

পুলিস সরিয়ে দিয়ে বাড়ির লোককে তাগাদা দেয়, কই, কী হল নার্সিং-হোমের?

সামান্য আঘাত যখন, কেন আর সেখানে যাওয়া?

ডাক্তার সেনের পুরানো রোগি আমি। অমন যত্ন করে আর কেউ দেখবে না। বলতে বলতে চটে ওঠে: আমি বলছি, তার উপর তোমাদের সাউখুরি কেন শুনি?

নার্সিং-হোমে সিস্টার নীতা ছিলেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না এবার।

মেট্রন বলেন, নীতা চাকরি ছেড়েছে।

কেন? অতি উৎকৃষ্ট নার্স তিনি। ছাড়তে আপনারা দিলেন কেন?

বিয়ে হয়ে গেছে ডাক্তার সেনের সঙ্গে। বেহালায় নতুন বাসা করে চলে গেল।'

অশোক ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না।

মেট্রন আবার বলেন, ডাক্তার সেনও এখানে থাকবেন না। নতুন নার্সিং-হোম করবেন শুনলাম দু-জনে মিলে।

কবে? খুব দেরি হবে নাকি? নিশ্বাস ফেলে বলে, সামান্য আঘাত—তার মধ্যে মধ্যে হয়তো মেরেস্বুরে যাব আমি।

বৃত্তান্ত কিছু কিছু মেট্রন জানেন। হেসে বললেন, এবারে বরানগরে নয়, বেহালার দিকে ঘোরাঘুরি করবেন। মাথায় যদি লাঠি পড়ে, ওদের নার্সিং-হোমের প্রথম রোগি হবেন আপনি।

ভেজাল

আহা, ভেজাল থাকুক চিরকাল সংসারে। যাঁরা ঝুটো-ভেজালের কাজ-কারবার করেন, তাঁদের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম। তাঁরা আছেন বলেই আজ সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম করছি।

ভেজালের মহিমা কীর্তন করছে নলিনেশ। কটকের রাখাল ডাক্তারের ছেলে সে—আমার বিশেষ বন্ধু। রাখাল ডাক্তার গেল-বছর দেহ রেখেছেন, ওকালতিতে নলিনেশেরও সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা। ইদানীং বাপের ফার্মেসি দেখাশুনা করে।

গল্পটা নলিনেশের, আমার নিজের মতন করে লিখছি। লীনা দেবীকে শোনালাম। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, যান, বাজে কথা। ও বুঝি বলেছে? যা মিথ্যুক—নিজে কেন যে লেখে না! তাহলে আপনাদের চেয়ে ঢের ঢের বড় লেখক হত।

ঘটনা অতএব মিথ্যা নয়, নিঃসংশয় হওয়া গেল।

কলকাতার কাছে সোনারপুরের মেয়ে লীনা। বিয়ের পরে কটকে শ্বশুরবাড়ি এল। শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামী নিয়ে সংসার। নলিনেশ কোর্টে বেরুচ্ছে—কড়া মানুষ রাখাল চোখ পাকিয়ে পড়েন, সেইজন্যে বেরুতে হয়। পুরো বছর একটানা শ্বশুরঘর করল লীনা। ইদের সঙ্গে সরস্বতীপুজো জুড়ে চারদিন ছুটি দাঁড়িয়েছে—সেই সময় ছুটি মিলল সোনারপুর যাবার। রাখাল ছেলেকে বললেন, বেয়ান লেখালেখি করছেন, যাও তবে বউমাকে নিয়ে। ঠাকুর-ভাসানের পরের দিন এসে পড়বে। কি বার হল—বুধবার। শেষরাত্রে কম্পাউণ্ডার স্টেশনে যাবে, একটা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে চলে এস। বিষ্যুৎবারে সকালবেলা চক্ষু মুছে দেখতে চাই তোমাদের।

লটবহর দেখে রাখাল ভ্রুকুটি করেন: যাচ্ছ তো চারদিনের জন্য, এত লমত কি দরকার? সোনারপুর শহর জায়গা নয়—অন্ততপক্ষে এইটি পার্সেন্ট

পাড়াগাঁ। বেয়ানের ঘরবাড়িও কাঁচা। আমি বলি, দামি কাপড়-চোপড় গয়নাগাটি নিয়ে কাজ নেই। রেখে যাও।

শাশুড়ি এই সময়ে এসে পড়ে বাঁচিয়ে দিলেন। রাখাল ডাক্তারের মুখের উপর তিনিই যা-কিছু মাঝে মাঝে শোনাতেন। বললেন, তোমার যেমন কথা! বিয়ের পর প্রথম বাপের-বাড়ি যাচ্ছে, আত্মীয়কুটুম্ব পাড়াপড়শি কতজনা আসবে—শহর নয় বলে বেশি বেশি আসবে—তারা এসে হাতের শাঁখা-নোয়া আর পরনের ডুরেকাপড় দেখে যাবে, তাতে মান বাড়বে বুঝি তোমার!

রাখাল আর কিছু বলেন নি, কিন্তু লীনার বড্ড মনে লেগেছে। মা-বোন টিনের ঘরে থাকে, সেই দারিদ্র্যের খোঁটা দিলেন শ্বশুরঠাকুর। বড়লোকের ভাল বাড়ি হলে কথা উঠত না।

গয়না একটা একটা করে খুলে ফেলছে। নলিনেশ দেখতে পেয়ে বলে, রাগ বড্ড বেশি তোমার—

রাগ কিসের, ঠিক কথাই বলেছেন তো বাবা। কাঁচাবাড়িতে চুরিচামারির ভয়—

আর মা যেটা বললেন, তার বুঝি কোন দামই নেই? তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে না মাকে?

কিসে কোন দোষ ঘটে যায়—গরিবের মেয়ের জ্বালার অন্ত নেই। সভয়ে লীনা যেখানকার যে গয়না আবার পরে নিল। কানের ঝুমকোজোড়া পরতে গিয়েও রেখে দেয়: এটা অন্তত রেখে যাই। শুধু এই জিনিসটা।

নলিনেশ রাগ করে বলে, গয়নাটা আমি দিলাম বলেই বুঝি?

বড্ড ভাল জিনিস, অনেক যে দাম।

নলিনেশ কঠিন হয়ে বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, আমার জিনিসের হেনস্থা চলবে না। দুটো কান খালি থাকবে বলেই না দিয়েছি। পরে যেতে হবে।

সুমিতা মুগ্ধকণ্ঠে বলে, কী সুন্দর, কী সুন্দর!

দৃষ্টি তার লীনার মুখ থেকে ফেরে না। লজ্জা পেয়ে যায় লীনা। পুরো এক বছর পরে এসেছে। এবং বিয়ের জল গায়ে প'ড়লে মেয়েদের নাকি রং ফোটে, চেহারা উজ্জ্বল হয়। তাই বলে সহোদরা ছোট বোন অমনি করে চেয়ে থাকবে!

ঝাঁকি দিয়ে লীনা অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল। সুমিতা আরও উচ্ছ্বসিত হয়: বিদ্যুতের ঝিলিক দিলি রে দিদি! কী চমৎকার!

লীনা হাসিমুখে ঝগড়া করে: ইয়ার্কি করবি নে। বড় হয়ে গেছিস বলে মারতে পারব না ভেবেছিস?

বাঃ রে, ভালকে ভাল বলছি, মারবার কি করলাম?

ভাল হই আর মন্দ হই, কিচ্ছু বলতে যাবিনে তুই।

নিষেধ না মেনে সুমিতা জোর করে লীনার মুখ ঘুরিয়ে আনে: দেখতে দে সামনাসামনি। ভাল তোকে বললাম বুঝি! ঝুমকোজোড়া তোর সত্যি ভাল।

ভাল অতএব লীনা নয়, কানের ঝুমকো দুটো।

সত্যি দিদি, চমৎকার মানিয়েছে তোর কানে।

লীনা সায় দিয়ে বলে, অল্প দিন বেরিয়েছে। এসব কাজ কটকের স্যাকরাই পারে শুধু। আনারকলি-ঝুমকো—

সে আবার কী?

সিনেমায় যে আনারকলি সেজেছিল, তার কানে এই ঝুমকো ছিল নাকি। বাজে কথা—লোকের মনে ধরবে বলে এমনি এক একটা নাম দেয়।

খোল্, হাতে দে আমার, ভাল করে দেখি।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সুমিতা। এক একবার আলোর সামনে নিয়ে ধরে। সেকেলে প্যাটার্নের অলঙ্কার—সাধারণ ঝুমকোর চেয়ে অনেক বড়। পাথর-বসানো অপরূপ কাজ। এমনি জিনিস মিউজিয়ামে আছে বোধহয়। আনারকলি পরেছিল কিনা জানিনে, কিন্তু অজন্তার ছবিতে থাকতে পারে।

দেখে দেখে তারপর নিজের কানেই পরে ফেলল সুমিতা। আয়না নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। নিজেই তারিফ করছে নিজের: বাঃ, বাঃ! আমার কানেও দিব্যি মানিয়েছে।

হুড়দাড় করে ছুটে চলে যায়। ক্ষণ পরে সেজেগুজে এসে বলে, বুলবুলির বিয়ে আজকে। মন্টিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তোর যাওয়া হবে না দিদি, জামাইবাবু তাহলে একলা পড়ে যাবেন। ঝুমকো কানে রইল, এসে খুলে দেব।

বুলবুলিদের সঙ্গে আত্মীয়সম্পর্ক আছে, তাছাড়া সুমিতার বড় বন্ধু বুলবুলি। শিয়ালদার কাছে বাসা। ছোট ভাই মন্টিকে নিয়ে সুমিতা বেরিয়ে পড়ল। সুমিতাটা যেন কী—আদেখলেপনা চিরকাল। বলাও যায় না কিছু মায়ের পেটের বোনকে। রাতের মধ্যে ফেরা হল না—বাসর জেগে ফষ্টিনষ্টি চলেছে, আবার কি! সকালবেলা উস্কোখুস্কো অবস্থায় এল। যেন আধখানা হয়ে এসেছে: সর্বনাশ হয়েছে দিদি, ঝুমকো নেই!

লীনা গোড়ায় ভেবেছে ঠাট্টা। খুলে রেখে ভয় দেখাচ্ছে। মজা দেখছে। ইয়ার্কি করবি নে সুমিতা। তোর জামাইবাবু দিয়েছে। রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে তাই খোঁজ হয়েছে: দেখছি না কেন কানে?

কেঁদে ফেলে সুমিতা: নেই সে জিনিস। সত্যিই নেই।

শেষরাত্রি অবধি বাসর জেগে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালবেলা কানে হাত দিয়ে দেখে ঝুমকো নেই। পড়ে যায়নি কোনখানে। সবাই নজর দিচ্ছিল—তাদেরই কেউ কান থেকে খুলে নিয়েছে। রুচিপ্রবৃত্তি কী হয়েছে—ভাল ভাল ঘরের মেয়ে-বউ, তার মধ্যে চোর!

উপায় কি এখন? কোনদিকে লীনা কূল দেখতে পায় না। নলিনেশ সর্বক্ষণ বাইরে—সেই এক বাঁচোয়া। চারদিনের জন্য কলকাতা এসে দেখাশোনা করে বেড়াচ্ছে। তাকে না-হয় সামলানো গেল। কিন্তু কটকে ফিরে গিয়ে কী কাণ্ড হবে, ভাবতে হৃৎকম্প হয়। শ্বশুরালয় নয়, ঘনঘোর জঙ্গল—শ্বশুররূপী বাঘ সেখানে হুঙ্কার দিয়ে ঘোরেন। সেই শ্বশুরের মানা না শুনে নিয়ে এসেছি। কথাটা শুনেই তিনি ধরে নেবেন, আমার গরিব মা দামি জিনিসটা বেচে খেয়ে চোরের দোহাই পেড়েছেন।

সে হবে না। যেমন করে হোক চাই আমার জিনিস। পেতেই হবে।

সুমিতা কেঁদে কেঁদে বলে, হবে আর কেমন করে? কে নিয়েছে, তা-ও জানি। কিন্তু মস্ত ঘরের বউ সে—সন্দেহের উপর কী বলব?

দু'জনে ভেবে ভেবে এক উপায় বের করল। আপাতত সামলানো যাবে। নানান রকম ঝুটো গয়নায় বাজার ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে অমনি একটা জিনিস যদি খুঁজে পাওয়া যায়। কানে পরেছে ঝুমকো না ঝুমকো, কে অত খুঁটিয়ে দেখতে যাচ্ছে? সময় কিছু তো পাওয়া গেল, তার মধ্যে খাঁটি জিনিস গড়িয়ে নেবে।

মতলব মাথায় এসে খানিক সোয়াস্তি। দু-বোনে এ-মার্কেট সে-মার্কেট করে বেড়াচ্ছে। খোঁজ নিচ্ছে অন্য মেয়েদের কাছে। অবশেষে পাওয়া গেল। লীনার কানে পরিয়ে কাছ থেকে দূর থেকে দেখে দেখে সুমিতা প্রসন্ন মুখে বলে, হুবহু সেইরকম দিদি। চিরজীবন কানে থাকলেও ধরতে পারবে না—কষ্টিপাথরে কেউ যদি কষে দেখে তবেই।

শ্বশুরবাড়ি গেল লীনা। ব্যবহারে রং চটে যাবে, নকল গয়না সেই ভয়ে খুলে রেখেছে। টাকাটা সিকেটা যা হাতে আসছে, জমায়। কটকে লীনা জমাচ্ছে, সোনারপুরে সুমিতা। দু-বোনের জুড়েগেঁথে, তা হয়েছে মন্দ নয়।

আর দুটো তিনটে মাস—আসল ঝুমকো গোপনে গড়িয়ে নিয়ে নকল গয়না ছুঁড়ে ফেলে দেবে তখন।

কিন্তু হল না। হঠাৎ একদিন নলিনেশ বলল, কানের গয়না দেখতে পাইনে যে? কোথায়?

তুলে রেখেছি। দামি জিনিস বুঝি সদাসর্বদা পরে!

দাও আমায়—

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! কী জবাব দেবে লীনা দিশা পায় না।

নলিনেশ বলে, রেখেছ কোথায়—বড়ট্রাঙ্কের ভিতর?

বড়ট্রাঙ্কের চাবি কোথায় রাখে, নলিনেশের জানা। ট্রাঙ্ক খুলে গয়না হাতে নিয়েছে—

কেন, কেন? ঝাঁপিয়ে পড়ল লীনা: কী করবে আমার ঝুমকো নিয়ে? যা দিয়ে দিয়েছ, আবার কেন তা ফেরত চাও?

তাকিয়ে পড়ে নলিনেশ স্ত্রীর দিকে। কৌতুক লাগে। ভেবেছে কি লীনা? গয়না চেয়েছি বলে পাগল হয়ে উঠল গয়নার মধ্যেই মেয়েদের প্রাণ, রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ যেমন ভোমরার মধ্যে।

হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বলে, বাবা চাইলেন, আমি কি জানি। টাকার কি দরকার পড়েছে। দায়েবেদায়ে লাগবে বলেই তো গয়না। বিক্রি হবে না তোমার ঝুমকো। বন্ধক দেবেন, পেয়ে যাবে আবার। এই মাসের মধ্যেই।

অন্য গয়না নিয়ে নাও, ঝুমকো দেব না। বড় পছন্দের জিনিস। দেব না, দেব না—

কেড়ে নিতে যায় জোর করে। নলিনেশ মজা পেয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় এঁটে ধরে, দে ছুট। কোর্টের বেলা হয়েছে, কোর্টে যাবার মুখে এই ব্যাপার। ঝুমকো পকেটে ফেলে পান মুখে ফেলে বাপের সামনে দিয়ে বাপকে দেখিয়ে দেখিয়ে নলিনেশ কোর্টে চলে গেল।

আকাশ ভেঙে পড়ে লীনার মাথায়। বন্ধক দিক, বিক্রি করুক, পরখ না করে জিনিস কেউ নেয় না। মহাজন ধিক্কার দিয়ে উঠবে: ঝুটো জিনিস গছাতে এসেছেন মশায়? সোনা নয়, তামার উপরে পালিশ। পাথর নয়, রঙিন কাচ।

আবার ভাবছে, বিক্রি-বন্ধক কিছুই নয়—সন্দেহ এসেছে কেমন করে, স্যাকরার কাছে কষে দেখতে নিয়ে গেল। দৃষ্টিটা সেই রকম ছিল বটে নলিনেশের। হারিয়ে গেছে সোজাসুজি বলে দিলে তবু একটা বিশ্বাস-

অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাকত। চাতুরি করতে গিয়েই অপরাধ কবুল হয়ে গেছে। আসল বস্তু বিক্রি করে ঝুটো গয়নায় মেয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। এর কোন কৈফিয়ৎ নেই। রগচটা রাখাল ডাক্তার সর্বসমক্ষে চোর বলে চেঁচামেচি করবেন তার নিরপরাধ অভাগিনী মাকে জড়িয়ে।

কী করা যায়—কী করবে এখন সে? অভিমান আসে নলিনেশের উপর—দোষ-ঘাট হলে স্বামীরই তো ঢেকে নেবার কথা। পাগল হয়ে কতবার না, না—করেছে। মুখের কথাটি তুমি জিজ্ঞাসা করলে না, কী হয়েছে লীনা, অমন করছ কেন? মুঠোয় নিয়ে ছুটে পালালে হাসতে হাসতে। আমায় অপদস্থ করে বড্ড সুখ তোমার। আচ্ছা, আমিও জানি। অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য হবে না আমার, তার আগে পালাব। তুমি বাড়ি ফিরে আসবার আগেই।

গুম হয়ে আছে। ঠিক দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে রাখল ডাক্তার যথারীতি বৈঠকখানায় নেমে গেলেন। পান-তামাক সেখানে যাবে, পাশা চলবে বিকেলবেলা অবধি। শাশুড়ি নিজের ঘরে খাটের উপর সুখনিদ্রায় পড়লেন। আরও কিছুক্ষণ দেখে লীনা পা টিপেটিপে গিয়ে শ্বশুরের আলমারি খুলল। গয়না চুরি না করেও যখন চোর—সত্যি সত্যি চুরি এইবারে। দোতলার আলমারিতে শ্বশুর কতকগুলো বিশেষ ওষুধ রাখেন, ফার্মেসিতে রাখতে ভরসা পান না। আলমারির কাচে কঙ্কালের ছবি সহ লেখা রয়েছে: সাবধান, বিষ।

একটা শিশি বের করে নিয়ে লীনা নিজের ঘরে গেল। মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে গেছে, আর কাকে ডরায়! চিঠি লিখল খানকয়েক তাড়াতাড়ি। নলিনেশের নামে একখানা: ঝুমকো যাচাই করতে নিয়ে গেলে—এত করে মানা করলাম, কানে নিলে না। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি—চোর নই আমরা কেউ। দামের জোগাড় দু-বোনে আমরা প্রায় করে ফেলেছি—সুমিতার কাছ থেকে আর আমার বাক্স খুঁজে নিয়ে নিও।

পুলিসের নামের চিঠি: আমার আত্মহত্যার জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

শেষ চিঠি মা ও সুমিতার নামে: আমি চলে যাচ্ছি, জন্মদুঃখিনীকে মনে রেখ তোমরা।

শিশির ছিপি খুলে মুখে ঢালল। কটু বিস্বাদ, অথচ কেমন মধুর! ঝিমঝিম করে সর্বদেহ, চেতনা এলিয়ে আসে। মৃত্যু এমনি আরামের, তবে লোকে ভয় পায় কেন?

লীনা কেমন করে তাকাচ্ছিল—তার গয়না সত্যি সত্যি বিক্রি করব, ভেবেছে। বলে দিলেই হত আসল কথাটা। বার-লাইব্রেরির চেয়ারে বসে ঘুমানো—তার চেয়ে বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে কথাবার্তা দু'জনে। বাবা পাশায় মেতে আছেন, টের পাবেন না। চোরের মতন উপরে উঠে পড়ব।

অতএব কোর্ট পালাল নলিনেশ। ঘরে ঢুকে দেখে আলুথালু হয়ে পড়ে আছে লীনা। মজা করলে হয়—আলুল চুল খাটের গায়ে জড়িয়ে জোরে জোরে ডাক দেওয়া: লীনা, লীনা—! উঠতে গিয়ে টান পড়বে চুলে, বেকুব হবে।

এগিয়ে দেখল, টেবিলের উপর লীনার শেষ চিঠি। এবং শিয়রে বিষের শিশি।

লীনা, লীনা, বিষ খেয়েছ তুমি ?

বাইরে গিয়ে নলিনেশ রাখাল ডাক্তারের উদ্দেশে চেঁচামেচি করছে: ও বাবা, শিগশির এস। লীনা বিষ খেয়েছে।

মৃত লীনা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘর পালঙ্ক টেবিল বিছানা সবই দেখতে পাচ্ছে। মনে হল, দেখছে প্রেতাত্মা রূপেই। তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

না, দেখেছে তো নলিনেশ। ফিরে এসে হাহাকার করে উঠল: কেন বিষ খেলে লীনা ?

লীনা কাতর হয়ে বলে, বিশ্বাস কর, চুরি হয়ে গেছে তোমার সেই ঝুমকো—

গেছে তো বেশ হয়েছে, চোর পস্তাবে। ঝুটো জিনিস।

কেঁদে পড়ল নলিনেশ। বলে, বাপের-বাড়ি যাচ্ছ, কানদুটো খালি থাকবে, তাড়াতাড়ি আমি ঝুটো ঝুমকো কিনে দিলাম। তোমার পছন্দ জেনে আজকেই জুয়েলারের কাছে দিয়ে এলাম—মিলিয়ে ঠিক ঠিক অমনি জিনিস গড়ে দেবে। বিষ খাবে তুমি তার জন্যে ?

বল কি, সত্যি বলছ ?

লীনারও কান্না পায় এবার: কেন মরলাম ? চুরি করে জব্দ হয়েছে বড়-ঘরের সেই বউটা। বেকুব হয়েছে। বোকার মতন আমি কেন বিষ খেতে যাই!

কাঁদতে কাঁদতে বলে, পায়ের ধুলো দাও। কতক্ষণই বা আছি—যাবার সময় পা ধরে তোমার ক্ষমা নিয়ে যাই।

রাখাল ডাক্তার ও পাশার আড্ডার লোকেরা সিঁড়ি ভেঙে হুড়মুড় করে এসে পড়লেন। ঘুম ভেঙে পিসিঠাকরুনও এসেছেন। সোরগোল বিষম।

রাখাল ডাক্তার বলেন, সর দিকি তোমরা। ভিড় করো না, রোগি দেখতে দাও।

নাড়ি দেখছেন রাখাল। চোখের পাতা তুলে ধরলেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শিয়রের বিষের শিশিটা তুলে দেখে রেগে উঠলেন: আজকেই কিনেছি। আস্ত শিশির অর্ধেকখানি যে সাবাড় করেছ মা-জননী।

বহুদর্শী ডাক্তার এবারে অতিশয় সতর্কভাবে লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে পরীক্ষা করছেন। বমি করানো হল চেষ্টা করে। গজর-গজর করছেন সর্বক্ষণ: টাকার লোভে পড়ে কম্পাউণ্ডার ছোঁড়া বিক্রি করে দেবে, সেই ভয়ে উপরে এনে রেখেছি। সেখানেও রক্ষে নেই, বাড়ির লোকে মেরে দেয়। আজকাল দেখতে পাচ্ছি সন্দেশ-রসগোল্লা চপ-কাটলেটের চেয়েও বিষের উপর মানুষের বেশি টান।

বিস্তর রকমে দেখেও বিষক্রিয়া ধরা পড়ল না। যেন হতাশ হয়ে পড়লেন: টিঞ্চার ওপিয়াই আফিমের আরক। সেই জিনিসের পাক। আড়াই আউন্স ঢকঢক করে গিলে তুমি মা হজম করে বসে আছ। নীলকণ্ঠের অংশে জন্ম তোমার, নরলোকে এমনধারা হতে পারে না।

শিশি হাতে নিয়ে রাখাল চিন্তিত ভাবে ফার্মেসির দিকে গেলেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে বোমার মতো ফেটে পড়েন: যা ভেবেছি তাই। ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়েছিলাম—আফিমের আরকে ছিটেফোঁটাও আফিম নেই। ওষুধপত্রেও ভেজাল চালায়, বেটাদের শূলে চড়ানো উচিত।

নলিনেশ কিন্তু ভেজালের কারবারি সেই মহাপুরুষগণের উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকায়। যার গুণে আজকের দিনে বিষ খেয়েও মরবার উপায় নেই, গয়না চুরি করে চোরকে কপাল চাপড়ে মরতে হয়।

বলিদান

যশোহর জেলার বাঁশতলি গ্রামে দেড়শত বিঘারও উর্ধে তে-ফসলা জমি, ফলের বাগ, দুইটা পুষ্করিণী এবং পাকা বসতবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্থানের সহিত বিনিময়ের জন্য লিখুন। বক্স নং··· ···

খবরের কাগজে পাতা-জোড়া এমনি সব বিজ্ঞাপন। লেখার উপরেই সকলে চোখ বুলিয়ে যান—লেখার পিছনে যে সাগরপ্রমাণ চোখের জল, সেটা কারো নজরে আসে না।

যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উপরের বিজ্ঞাপনটা নিত্যানন্দ চক্রবর্তী:

মশায়ের। নাম গোপন করে বক্স-নম্বর দিয়েছিলেন। চিঠিও এল-কয়েক-খানা—কোনটাই ঠিক মনে ধরছে না। এমন সময় এক সুহৃদের কাছে খবর পাওয়া গেল, ঐ বাঁশতলিরই জয়নাল শেখ নগদ টাকায় সম্পত্তিটা কিনতে চান। জয়নাল মস্ত লোক এখন—হুণ্ডি করে টাকাটা পার করে দেবারও দায়িত্ব নেবেন। সম্পত্তি বিক্রির যে সমস্ত আইনগত বাধা আছে, জয়নাল তা-ও নস্যাৎ করতে পারবেন।

জয়নালের সঙ্গে নিত্যানন্দ কিছুদিন এক পাঠশালায় পড়েছিলেন। বাঁশতলির সুবিখ্যাত সেজকর্তা তাঁর মাতুল, শৈশব ওখানেই কেটেছে। সেজকর্তা অন্তে মাতুল-সম্পত্তি পেয়েছেন, যা এইবারে ঘুচিয়ে দিতে চান। পাসপোর্ট-ভিসা করে নিত্যানন্দ অতএব মাতুলের ভিটা দর্শনে চললেন।

সন্ধ্যাবেলা নিত্যানন্দ আর জয়নাল দক্ষিণকোঠার ভাঙা পৈঠার উপরে বসেছেন। সেকালের কথা উঠল।

হিন্দু তোমরা কি কম অত্যাচার করেছ আমাদের উপর! সেই কতকাল থেকে। শোন তবে। আমার বাপ জামির শেখ ধান কিনলেন সেজকর্তার এইখানে। তিন তিনটে গোলার চাল পর্যন্ত বোঝাই, বাকি একটা থেকে খরচ হচ্ছে। সেজকর্তা চার নম্বর গোলার চাবি ছুঁড়ে দিলেন মাহিন্দারের দিকে। ধান পেড়ে সে গাদা করল, কুলোয় উড়িয়ে চিটে আলাদা করল। পালিতে করে মাপ হল সকলের মুকাবেলা।

সেজকর্তা বললেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাপামাপি করলে জামির, পরে যেন কথা না ওঠে। উঠলেও আমি কানে নেব না।

তখন কে বুঝেছে সেজকর্তা মানুষটার মনে মনে এতখানি প্যাচ!

মাথায় বয়ে বয়ে কালু মিঞা তো আমাদের বাড়ি নিয়ে তুলছে। অত বড় ঐ মাঠখানা, তারপর বাঁশবন—পথ নিতান্ত হেলাফেলার নয়। এতখানি পথ যাচ্ছে আর আসছে। প্রহর বেলায় বওয়া শুরু হয়েছে, বিকাল হয়ে আসে—ধানের পাহাড় যেমন-কে-তেমনি। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কালু মিঞা ধপ করে বসে পড়ল: আমি পারব না শেখ-ভাই, নিজে গিয়ে দেখ। না গেলে ও ধান সারা বছর বয়েও শেষ হবে না। আমি মারা পড়ব।

বাপজী এসে বললেন, বহুৎ বওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত। আর ধান নেব না সেজকর্তা। যা বাকি আছে, তোমার গোলায় তুলে ফেল।

সেজকর্তা চটে আগুন: মরে যাই আর কি! তোমায় বিক্রি-করা

ধান আমি কেন গোলায় তুলব? ধানের কি অভাব আমার? এত বড় অপমানের কথা বারদিগর কানে শুনতে না হয়। তা হলে রক্ষে রাখব না।

বাপজী তখন সোজাসুজি বলেন, ধান তো এক টাকার। সারা বেলাস্ত বয়ে বয়ে কালু খুন হবার দাখিল। ধানে ঠিক কারচুপি আছে, তোমার ধান আমি কিনব না।

সেজকর্তা রাজি হয়ে গেলেন: হোক তাই। যত ধান তোমার বাড়ি গেছে সমস্ত বয়ে ফেরত দিয়ে যাক।

সে আরো বেশি হাঙ্গামা। অত ধান ফেরত আনতে রাতদুপুর হবে। ক্লান্ত কালু মিঞা পেরে উঠবে না, আলাদা কিষান লাগাতে হবে। দু-দুটো মজুরির অকারণ গচ্চা।

বাপজীর মনে এইসব। তারও উপরে সেজকর্তা জুড়ে দিচ্ছেন: ধানের সঙ্গে চিটে মিশিয়ে আগে যেমন ছিল ঠিক সেই রকম করে দেবে। তোমার বাড়ি যা গেছে আর উঠানের উপরে এই যা আছে—সমস্ত গোলায় তুলে শেষ করে তারপর ছুটি।

ফ্যাসাদ বটে! বাপজী বললেন, রাত কাবার হয়ে যাবে যে সেজকর্তা।

কিন্তু নিষ্ঠুর সেজকর্তা খিঁচিয়ে ওঠেন: আমি তার কী জানি! ধান কেনবার সময় মনে ছিল না?

বাপজীও রেগে যান এবার। মনের সন্দেহটা স্পষ্টাস্পষ্টি খুলে বলেন: কালু মিঞা এক এক ক্ষেপ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই ফাঁকে গাদার মধ্যে তোমরা ধান মিশিয়ে দিচ্ছ।

খবরদার আমির! মিথ্যে বদনাম দেবে না। মানহানির মামলা ঠুকে দেব, বলে দিচ্ছি।

ঘোরতর ঝগড়া। কালু টলছে ওদিকে। আইনে না পেরে বাপজী শেষটা সেজকর্তার হাত জড়িয়ে ধরলেন: মানুষ না পাষাণ তুমি! চেয়ে দেখ, কালু মিঞার অবস্থা। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়বে, তাইতে কি সুখ হবে তোমার?

তখন রফা হল, সন্ধ্যা পর্যন্ত ধান বইবে। যদ্দুর হয় হল, তারপরে ছুটি। বাকি ধান সেজকর্তাই মাহিন্দার লাগিয়ে গোলায় তুলে নেবেন।

যাক বাবা, প্রাণবাঁচানোর উপায়টা হল। কালু মিঞাও ঘড়েল তেমনি। সময়ের চুক্তিতে এসে গেল তো এর পরে সে শামুকের গতিতে হাঁটছে। বোঝাও নিচ্ছে নিতান্ত লোক-দেখানোর মতো। খাটনি যত কম হয়। সন্ধ্যার পর ছাড়া পেয়ে বাপজীকে বলে, কী প্যাঁচে ফেলেছিল বোঝ

শেখ-ভাই। এর পরে খান কিনলে গাদার পাশে মানুষ মোতায়েন করে রাখবে। বেমক্কা মেশাতে না পারে।

তবে শোন। মুসলমানেরও কি কম অত্যাচার হিন্দুর উপর!—চুরুট আছে, দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়েছে, নিত্যানন্দ উঠে গিয়ে দেশলাই খুঁজে-পেতে চুরুট ধরালেন। আবার এসে পৈঠায় পা ঝুলিয়ে বসে বলেন, মুসলমানের অত্যাচার শোন। আমার মামাকে নিয়েই ব্যাপার— তোমাদের ঐ সেজকর্তা। ডোমরার সোনাই সর্দার নাকালের এক শেষ করল, দু-দিন আটক করে রেখেছিল। শোন তবে।

ফৌজদারি মামলার সমন পেয়ে মামাকে সদরে যেতে হয়েছিল, রাত্রিবেলা ফিরছেন। পঞ্চাশের উপর বয়স তখন, পয়সাকড়ির যে অভাব তা-ও নয়। আমরা সবাই বলি, গরুর-গাড়ি করে যাও মামা। মামা কানেও নিলেন না: আটক্রোশ তো পথ। আমি খোঁড়া না পর্দানসিন মেয়েমানুষ যে ভগবতীর পিঠে চেপে পাপের ভাগী হতে যাব?

জয়নাল শেখ অবাক হয়ে বলে, সদর হল আটক্রোশ?

তখন তাই ছিল রে ভাই। রাস্তা পাকা হয়ে তারপর মাইলস্টোন বসাল। এক ক্রোশে গুনতে পাই দুই মাইল। ঐ পাকারাস্তায় তখন বাইশখানা পাথর বসিয়েও কূল পায় না। পথ যাই হোক, শেষরাত্রে মামামশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দশটার সময় ঠিক গিয়ে আদালতে এত্তেলা দিয়েছেন। কাজ শেষ করে চারটের পর বাড়িমুখো রওনা।

আগের রাত্রে মহাল থেকে প্রকাণ্ড এক কাতলামাছ দিয়ে গেছে। রাত্রে রাঁধাবাড়া ঘটে ওঠেনি, ভাজা-মাছ দু-চারখানা খাওয়া হয়েছে। মাছ সাঁতলে রেখে দিয়েছে। মামামশায় বলে গেছেন, মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রেঁধে রাখতে। বাড়ি ফিরে খাবেন।

অসম্ভব কিছু নয়, রাত্রি গোটা দশেকের মধ্যে নির্ঘাৎ পৌঁছে যেতেন। কিন্তু দেবরাজ বাগড়া দিলেন। তুমুল ঝড়বৃষ্টি। বাতাসে ছাতা উলটে গিয়ে একেবারে ধারামান হয়ে গেল। পথের ধারের সুপারিগাছ দশ-বারোটা ভেঙে পড়ল মামার চোখের উপর। তা বলে গ্রাহ্য নেই—ঠিক গিয়ে ভাতের থালার সামনে বসে মুড়িঘণ্টের মাছের মাথাটা ঢেলে নেবেন।

হতে পারত তাই। কিন্তু পথের উপর ডোমরার খাল—তখন পাকাপুল হয়নি, বাঁশের সাঁকোয় পারাপার। সাঁকোয় উঠতে গিয়ে মামা তো মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। পাড়ের গাছ পড়ে সাঁকোর বাঁশ ভেঙে জলে ভেসে গেছে। বৃষ্টি পেয়ে খালের জলও বেড়েছে খুব—কলকল করে ছুটেছে।

কোন আশা নেই আর। কাতলামাছের মুড়ো ছ'দিনের পরেও বাসি করে রাখবে না, বাড়ির লোকে সাবাড় করবে। ফাঁকার মধ্যে বৃষ্টি খাওয়ার অতএব মানে হয় না। ঘাটের কাছে সোনাই সর্দারের বাড়ি—তার উঠোনে মামা গিয়ে দাঁড়ালেন।

সোনাই দাওয়ায় শোয়। ঘুমের ভাব এসেছিল, মানুষের সাড়া পেয়ে তড়াক করে মাদুরের উপর উঠে বসল: কে, কে, কে তুমি?

ভেবেছে বর্ষারাত্রে চোর এসেছে উঠোনের উপর।

ছাঁচতলায় কে দাঁড়িয়ে, জবাব দাও। আরে সর্বনাশ, সেজকর্তা কোথা থেকে ভয়ার ভিতর? উঠে এস।

ব্যাগের ভিতরে সাদাধুতি, গামছা ও ফতুয়া, সেগুলো শুকনো আছে। ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলে মামামশায় জলচৌকির উপর জেঁকে বসেছেন। সোনাই সর্দারের হাঁকডাকে বাড়ির লোক উঠে পড়েছে। হাতের চেটোয় কলকে বসিয়ে টানছেন মামামশায়, দেহ চাঙ্গা হয়েছে। মাছের মুড়োর শোকও ভুলেছেন অনেকটা।

মামা এই সব ইনিয়েবিনিয়ে বলতেন, তাঁরই মুখে শোনা গল্প আমার।

সোনাই সর্দার হঠাৎ বলে, খাওয়া তো হয়নি সেজকর্তা।

হঁ, তা হয়েছে একরকম—

বুড়ো হয়েছ, মিছেকথা বোলো না ঠাকুর। বিকেলবেলা বেরিয়েছ, তার মধ্যে ভাত কখন খেলে শুনি? নিজে রেঁধে খাও, আমি কি বলছি আমাদের হেঁসেলের রান্না খেতে? গোয়ালে রাঁধাবাড়া করো, গোয়ালে তো শুনেছি দোষ হয় না।

মামামশায় আমতা-আমতা করেন: হাঙ্গামে কাজ নেই সোনাই। একটা রাত ভাত না খেলে কি হয়! রাত পোহালেই চলে যাব। সাঁকো ভেসে গেছে, সেই শ্রীগঞ্জ অবধি ঘুরে যেতে হবে।

বাড়ির উপর এসে চৌপহর রাত উপোস করে থাকবে- গৃহস্থের একটা ভালমন্দ নেই? মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুল কি করে ঠাকুর?

সোনাই সর্দারের তিন ছেলে—পাথুরে জোয়ান। কায়দায় পেয়েছে, আর কি ছাড়ে! তিন জোয়ান তিন দিক থেকে গর্জন করে ওঠে: রাঁধতে হবে ঠাকুর, খেতে হবে। উপোসি থাকবে তো গাছতলায় পড়ে রইলে না কেন?

রান্নাবান্না মামার আসে না, জন্মে কখনো হাঁড়ি ছোঁন নি। ভয়ে ভয়ে উঠতে হল তবু। সেই রাত্রে পুকুর-ঘাটে গিয়ে নতুন ভাঁড়ে জল তুলে

আনতে হল। ভাতে-ভাত চাপাতে হল নতুন মেটেহাঁড়িতে। উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে চোখে জল বেরিয়ে আসে। কিন্তু পাহারায় আছে ছোঁড়া তিনটে, খানিকটা ভাতের মতো না হওয়া পর্যন্ত কলাপাতায় ঢালতে দেবে না। হল তাই এক সময়, খেতে হল সেই বস্তু। সোনাই সর্দারের ছেলেরা সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা করছে, খাওয়া সমাধা হলে তবে তারা শুতে গেল।

সকালবেলা রোদ উঠেছে। মামামশায় রওনা হয়ে পড়বেন, জুতো খুঁজে পান না। ফতুয়া এবং যে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়েছিলেন, তা-ও নেই।

সোনাই সর্দার হেসে বলে, আছে আছে। দুপুরে চাট্টি মাছ-ভাত সেবা হয়ে যাক, তারপরে আপনাআপনি সব এসে পড়বে।

মামা শঙ্কিত হয়ে বলেন, দুপুরেও?

বাড়ি গিয়ে সর্দারবাড়ির নিন্দেমন্দ করবে যে। বেঘোরে গিয়ে পড়েছিলাম—তা দেখ, ভাতে-ভাত খাইয়ে বিদায় করল। কাল রাত্রে মাছের মুড়ো তোমার ফসকে গেছে—সেই মুড়ো না খাইয়ে ছাড়াছাড়ি নেই।

হায়-হায় করছেন মাতুলমশায় মনে মনে। কথায় কথায় সোনাই সর্দারের কাছে মনোদুঃখ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, তারই ভোগান্তি এখন। তিন ছেলে তিনগাছা পাশখেওলা জাল নিয়ে পুকুরে পড়েছে। বেয়ে বেয়ে নাজেহাল। অনেক কষ্টে অবশেষে একটা মাছ উঠল। যথাসাধ্য রান্নাবান্না করে মামা মাছ-ভাতও খেলেন দুপুরবেলা। তবু কিন্তু জুতো-কাপড়-ফতুয়া বেরিয়ে আসে না।

কি সোনাই, কথার ঠিক রইল কোথায়?

সোনাই সর্দার ভ্রূভঙ্গি করে বলে, মিরগেল-মাছের একফোঁটা একটু মাথা—এ আবার মুড়ো খাওয়া নাকি? হাটবার আজকে—বাঁওড়ের বড় বড় রুই-কাতলা ধরে জেলেরা হাটে নিয়ে আসে। পছন্দসই কাতলা হাটে পাওয়া যাবে।

পাওয়া গেল ভাগ্যক্রমে। নইলে কত দিন কত মাস কত বছর আটক থাকতে হত, ঠিক কি! একটা পুরো দিনমান আর আগে পিছে দুটো রাত্রি কাটিয়ে মামামশায় বাড়ি ফিরলেন। খবরবাদ না পেয়ে মামী এদিকে চোখ মুছতে লেগেছেন। কেমন করে জানবেন সোনাই সর্দারের এই অত্যাচার!

বৃদ্ধ জয়নাল শেখ হাসির মতো ভাব করে বলেন, এমনি অত্যাচার লেগেই ছিল। কোনদিক্‌কার মুরুব্বিরা উদয় হয়ে তাই হিল্লিদিল্লি করতে লাগলেন। মজাটা এই, বাংলা কথা তাদের কেউ বলে না—আমাদের বাংলার কেউ নয় তারা। আমাদের দুখু মিঞা তাদের খুব তাঁবেদারি করেছিল। সেই

দুখু এখন আমির আলি হয়ে উজির-নাজিরদের একজন। ভাগাভাগি না হলে বিড়ি বেঁধে খেতে হত।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নিশ্বাস ফেললেন: আমাদের ফকিরচাঁদ হোড়েরও তাই। এখন সে পি হোর হয়ে মস্তবড় সরকারি ডিপার্টমেন্টের মাথা। ডিপার্টমেন্টের একটা বেহারা হবার বিদ্যেও তো ফকিরের পেটে নেই।

আনমনে নিত্যানন্দ চুরুট টানতে লাগলেন। জয়নালও নিস্তব্ধ।

হঠাৎ নিত্যানন্দ বলেন, কালীপুজোয় এই উঠোনে একবার মহিষবলি হয়েছিল, মনে আছে তোমার?

শুনেছিলাম বটে, দেখতে আসিনি। জয়নাল শেখ ঘাড় নাড়লেন: পুজোআচ্চার ব্যাপার—সে পুজো আবার রাতদুপুরে। ছেলেমানুষ আমি তো তখন।

নিত্যানন্দ বলেন, আমি দেখেছিলাম— আমার মনে আছে। পাঁচ-সাতটা মরদে মিলে মহিষের গলায় ঘি ডলছে, চামড়া নরম করে নিচ্ছে। ধেনোমদ গিলে চোখ লাল করে কামার মেলতুক হাতে দাঁড়াল। কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, কানে রক্তজবা। মেলতুকের দু-পিঠেও সিঁদুর দিয়ে দুটো চোখ এঁকেছে। নিশিরাত্রি, অমাবস্যার অন্ধকার। ঢাকঢোল বেজে উঠল তুমুল আওয়াজ করে, তার মধ্যে মহিষের ডাক কে শুনতে পায়? হাঁড়িকাঠে ফেলে মরদেরা মুণ্ড চেপে ধরল। আজও আমার মনে পড়ে জয়নাল, জল গড়িয়ে আসছিল মহিষের চোখে। ড্যাডাং করে দিল কোপ, ধড় মুণ্ড দুইখণ্ড হয়ে ছিটকে পড়ল। কী রক্ত, কী রক্ত!

চুপ করে নিত্যানন্দ চুরুট টানতে লাগলেন। ঘোর হয়ে গেছে তখন। ধড় আর মুণ্ড উভয় খণ্ডের রক্তধারা যেন চোখের উপরে দেখতে পাচ্ছেন।

কান্নার গাড়ি

সুতিগঞ্জে এসে বাস বিগড়াল। বাঘের ভয় যেখানটা, সেইখানেই সন্ধ্যা। উঁহু, বাঘকে অহেতুক বাড়াচ্ছি। এতখানি তাগত বাঘে সম্ভবে না—বাঘের ভিরমি লেগে যেত। পারে কেবল মানুষেই।

আম-জাম নারকেল-সুপারির মাঝে এক-একটা বাড়ি। গাছপালা ছাড়িয়ে মন্দিরের চূড়াও একটা দেখা যায়। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে—ধোঁয়ার কুণ্ডলী অমন শ-খানেক জায়গা থেকে। আগুনের হল্কা এক-একবার দপ করে আকাশমুখো ওঠে। পৃথিবী পুড়িয়ে দিয়ে এবারে বুঝি আকাশের পালা।

(নিজে দেখিনি, মারফতি গল্প—পেট্রাপোলের প্লাটফরমে নেমে পড়ে ইদ্রিস মিঞা বলছে। ঐ সুতিগঞ্জের উপর দিয়ে মোটরবাসে হামেশাই আমি বাড়ি যেতাম। পাকিস্তান কেঁকে ওঠার পর যাইনে। কলকাতায় খানিকটা জমিয়ে নিয়েছি, কোন দুঃখে যেতে যাব বলুন। নিরাপদ দালান-কোঠায় বসে আহা-ওহো করি। এবারে কী রকম ঝোঁক চাপল, সীমান্তের পেট্রাপোল স্টেশনে এসে সেকালের পড়শিদের খোঁজ নিচ্ছি। ইদ্রিস মিঞা ঐ ট্রেনে এসে নামল।)

পাকারাস্তার উপরে মোটরবাস তো অচল। ড্রাইভার আর অ্যাসিস্টান্ট নেমে পড়ে ইঞ্জিনের বনেট তুলে খুটখাট করছে। বহু কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকার আসে অবিরাম। দূরে ছিল, ধেয়ে আসছে এইদিকে। বাসের ভিতরে মড়াকান্না: তোমার পায়ে পড়ি ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি ছেড়ে দাও।

ড্রাইভার পুরানো লোক, বিশ বছর এই লাইনে আছে, সকলের সঙ্গে দহরম-মহরম। কিন্তু আগের সঙ্গে কোনটাই বা মিলছে! চালু গাড়ি হয়তো বা মতলব করেই থামিয়েছে। প্যাসেঞ্জারে কান্নাকাটি করছে: যা-কিছু আছে, তুমি নিয়ে নাও ড্রাইভার। শুধু প্রাণদান চাচ্ছি।

ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ড্রাইভার সিটে উঠে পড়ল। অ্যাসিস্টান্ট প্রাণপণে হ্যাণ্ডেল মারছে। গাড়ির সাড়া নেই। হল্লা এতক্ষণে পাকারাস্তায় উঠে পড়েছে। গাড়ির আগে পিছে বন্দুকধারী দুই কনস্টেবল—রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে তারা বন্দুক তুলল।

এইসব হল্লার মানুষ বাংলা দেশে এসেও বাংলা কথা জানে না। ভিজে-মাটি বাংলার মানুষ হলে চোখ তার ভিজবেই, সামলাতে পারবে না। বন্দুক দেখে বীরবৃন্দ কিছু নরম হয়েছে। নাকি বদ মতলব নেই, বাসে উঠবে তারা। বাসে চড়ে শহরে যাবে। কিন্তু বোঝাই বাসের ভিতরে মানুষ কি—একমুঠো সর্ষে ফেলারও তো জায়গা নেই।

তারা বলছে, ছাতের উপরে উঠে যাবে। হিন্দু ড্রাইভার সব পালিয়েছে—দিনে রাত্রে পঁচিশখানা বাসের জায়গায় তিন-চারটেয় এসে ঠেকেছে। যাবেই তারা শহরে, বাসে নেবে না তো পায়ে হেঁটে যাবে অদ্দূর?

লেগে যায় আর কি! তারা এক পক্ষ, অন্য পক্ষে ড্রাইভার ও কনস্টেবল দুটো এবং দুই বন্দুক। এ কিছু নয়, হয়ে থাকে এমনিধারা। বড়-কিছু শুরু হবার মুখে তর্কবিতর্ক ও বকাবকিতে রক্ত গরম করে নেয়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবাই জানে এ নিয়ম। এই কনস্টেবল তখন হয়তো যাত্রীদের দিকেই বন্দুক তাক করবে। বিশ্বাস নেই।

কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে ক্রমশ গর্জনে পৌঁছল। বন্দুক অগ্রাহ্য করে ক্ষিপ্তের মতো ছুটল তারা—সত্যি সত্যি বাসের ছাতে উঠবে। অথবা অন্য-কিছু। যাত্রীদের পরিত্রাহি আর্তনাদ।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল—নিস্তব্ধ সকলে। মন্ত্র পড়ে যেন মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বটগাছের পাকা পাতা বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ছে, সেই শব্দটুকুও শুনতে পাওয়া যায়।

ইদ্রিশ মিঞা সেই বাসে, চমকে উঠে সে রাস্তার এদিক-ওদিক তাকায়। খড়দরের কেউ নিশ্চয় এসে পড়েছে—দারোগা, পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মিলিটারি—? মিলিটারি-পুলিসের জীপগাড়ি কি—একটা সাইকেল-রিক্সাও তো কোনদিকে নেই।

তারপরে নজরে পড়ে, পাকারাস্তার উপরে না হোক—এসেছে সত্যিই। ভাঁট-কালকাসুন্দের জঙ্গল ভেঙে মজানদীর কিনারে বটতলার দিকে পায়ে পায়ে চলে আসছে—এই সুতিগঞ্জ গাঁয়েরই বউ বোধহয়। অটুট স্বাস্থ্য, উদ্ধত যৌবন। খড়কুটো-ধুলোমাটিমাখা ঝাঁকড়া চুল, মুখে বুকে বাহুতে ক্ষতচিহ্ন—রক্ত ফুটে ফুটে উঠেছে। কাপড় ফালা-ফালা—হুটোপাটিতে শতচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলে পড়ে আছে, অঙ্গ ঢাকে না তাতে। এতক্ষণ তবু ঝোপঝাড়ের আবরু ছিল—বটতলায় ফাঁকার মধ্যে শতচক্ষুর সামনে এসে গেছে। লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। লজ্জা করার নেইও অবশিষ্ট কিছু—বজ্জাতে লুটেপুটে নিয়েছে, একবার চেয়ে দেখেই বুঝতে পারি।

বাসের ঝগড়া ছেড়ে হল্লার মানুষগুলো নির্বাক হয়ে দেখছে। এইবারে—এক্ষুনি তো ঝাপটে ধরে জঙ্গলে দেবে ছুট। এমনি ব্যাপার ইদ্রিশ মিঞারও কি চোখে দেখা নয়?

অথচ কী আশ্চর্য—একদৃষ্টে বিহ্বল হয়ে দেখছে তারা। বাক্যই শুধু নয়, সর্বইন্দ্রিয় স্তব্ধ। যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে আর্তনাদ করছিল—শান্তি যে মৃত্যুর চেয়ে কত বীভৎস হয়, পাথর হয় গিয়ে চোখের উপর তাই দেখছে।

(সুতিগঞ্জের বটতলা! গ্রামের আসল নাম সতীগঞ্জ, দলিলপত্রে এবং রিচার্ডসন সাহেবের স্মৃতিকথার মধ্যে এই নাম। লোকের মুখে মুখে এখন সুতিগঞ্জে দাঁড়িয়েছে। আমার কিশোর বয়স তখন—বটতলার ওখানটায় স্বদেশি মিটিং হয়েছিল, গাঁ থেকে আমরা সব গিয়েছিলাম। জগৎ বক্তৃতা করল। তখন মোটরবাস ছিল না, পাকারাস্তায় ঘোড়ার-গাড়ির চলাচল। জগৎ এসে নামল, গাঁয়ের বউমেয়েরা ভিড় করে এসে শঙ্খ বাজালেন, উলু দিলেন। জগৎও কিন্তু আসল নাম নয়, কাল্পনিক নাম দিয়ে আমি গল্প

লিখেছি। সাজানো বাড়ানো অনেক ব্যাপার গল্পের ভিতর থাকে, ঐসব বিখ্যাত নাম সেজন্তে দেওয়া চলে না। ফাঁসির দড়ি শেষ অবধি জগতের পুরস্কার হল। হবেই। গভীর রাত্রে পুলিস পাহারায় আমরা মফঃস্বল শহরের শ্মশানঘাটায় জগৎকে চুপি চুপি দাহ করে এলাম। যাকগে, সে হল ভিন্ন কথা।)

সেই বটগাছ-তলায় ধর্ষিতা গ্রামবধূ। পেট্রাপোল সীমান্ত-স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ইদ্রিশ মিঞা বর্ণনা দিচ্ছে। তাই বা কেন, ধর্ষিতা বলো কোন বিচারে? ইটপাথরে ধর্ষণ আবার কি—লজ্জাই বা কিসের? পাথরের উলঙ্গ মূর্তি কে কবে কাপড়ে ঢাকতে যায়? পালানোর কোন ইচ্ছে নিয়ে নয়—ঘুমের মধ্যে এক একজন অজান্তে যেমন ঘুরে বেড়ায়, তেমনিধারা এসে পড়েছে ঝোপজঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে। চলনে তাই বলছে। ঐসব ঘরবাড়ি জ্বলছে—রমণীকে ঘিরেও কাঠকুঠো জ্বালিয়ে দাও, দেখো সে এক তিল নড়বে না।

(রিচার্ডসনের স্মৃতিকথা পড়ে দেখবেন। ইদ্রিশ মিঞার বর্ণনার সঙ্গে খানিকটা মেলে। রিচার্ডসন ছিল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, লেখকও বটে, বাংলা-দেশের মানুষ ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে উৎসাহী। খবর পেল, কোন এক চক্রবর্তী মরেছে, তার তরুণী বউ সতী হবে। নদীকূলের ঐ বটতলায় শ্মশানঘাটা তখন, ঘোড়া ছুটিয়ে রিচার্ডসন দেখতে এলো। স্বেচ্ছায় কেউ সতী হলে তখনকার আইনে বাধা দেবার জো ছিল না—তবে জোর-জবরদস্তি না হয়, সেটা পুলিসের এক্তিয়ার বটে। ঘোড়া থেকে নেমেই রিচার্ডসন ঢাকঢোল বন্ধ করে দিল—চিতার উপরে জীবন্ত মানুষের আর্তনাদ বাজনার প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে চাপা দিয়ে দেয়, এই ধারণা। দেখা দিল তরুণী বউটা। তারই কোলের বাচ্চাটা নিয়ে বড়সতীন পিছন পিছন আসছে—বাচ্চাটা এগিয়ে ধরে ডাকাডাকি করছে ফেরাবার জন্য। বাচ্চা কাঁদছে আকুল হয়ে, পাষাণী মা তাকিয়ে দেখে না।

রিচার্ডসন লিখছে: যুক্তকর সতীর, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চেতনাহীন বলে মনে হচ্ছে। বিপুল জনসমাবেশ সে বুঝি কিছুই চোখে দেখছে না, একের পর এক পা ফেলে চলেছে লেলিহান চিতাগ্নির দিকে। আমার মনে হল, প্রাচ্য-দেশসুলভ কোনরকম নেশা করানো হয়েছে তাকে, কিম্বা যৌগিক প্রক্রিয়ায় সম্মোহিত করেছে। না হলে সন্তানের কান্নায় চোখ ফেরায় না, এ কেমন মা! পুরুতকে আদেশ করলাম, চিতায় উঠবার আগে ছোটখাট একটু পরীক্ষা হবে। ঘিয়ের প্রদীপ ঐ যুক্তকরের নিচে তুলে ধরো, সেঁক

জাগুক, সম্বিত ফেরে কিনা দেখতে চাই। কী আশ্চর্য, প্রদীপ নিয়ে আসতেই তরুণী নিজে থেকে হাতের আঙুলগুলো প্রদীপের আগুনে মেলে ধরল। চামড়া পোড়ার গন্ধ বেরুল—হাত সরাচ্ছে না, মুখে এতটুকু বিকৃতি নেই। জনতা স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। আমি পারলাম না, ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে এলাম। মানুষ তখন সতীর জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ছে।)

এ রমণীও তাই। এক বিচিত্র লোকে রয়েছে। শতেক চক্ষুর সামনে প্রায় বিবস্ত্র—জানেই না সে-ব্যাপার। বাসের মানুষ আমাদেরও যে কিছু করণীয় আছে, মনে পড়ছে না। অদ্ভুত অনুভূতি—ধূ-ধূ করছে যেন চারিদিক, আমরা নিরালম্ব ভাসছি। যে পৃথিবীতে এতকাল ছিলাম, সেটা ধোঁয়া হয়ে গেছে একেবারে। এক যুবতী রমণীর মৃতদেহ আলসে তার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। কাচের মতন দুই চোখে দৃষ্টি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কী দেখতে পেয়ে মজানদীর ঘাটের পাশে ছুটল। হোগলাঝাড়ের ভিতর মড়া। মরা মেয়েমানুষ। এমন মড়া তো কতই কত দিকে—আজকের দিনে মড়ার মতন সস্তা জিনিস কি? মরা গরু হলে চামড়া খুলে নিয়ে দুটো পয়সা লভ্য হয়, মরা মানুষে মুনাফা নেই। কেউ তাকিয়েও দেখতে যায় না।

কিন্তু সেখানে শুধু মড়া নয়, জোঁকের মতো মড়া লেপটে আছে আর-এক বস্তু। ঠাহর করেনি কেউ, যে ঘাতক মেরেছিল সে-ও দেখেনি—মৃত্যুর সময়ে মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্চাছেলে লুকানো ছিল। হোগলাবনে দুটোই পড়ে—হয়তো বা ঘুমিয়ে ছিল বাচ্চাটা, ক্ষিধে পেয়ে এখন দুধের প্রত্যাশায় মড়ার বুকে মুখ ঢুকিয়ে আঁকুপাকু করছে। ছুটে গিয়ে যুবতী সেই বাচ্চা তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্বিত। এতক্ষণের শুকনো চোখে আকুল ধারায় জল নামে, আর হা-হা হা-হা করে বিকট সুরের কান্না। আকাশের উপরে ঈশ্বর যদি থাকেন, কান্না শুনে থরথর করে নিশ্চয় তিনি কাঁপছিলেন।

বাচ্চাকে আড়কোলা করে বুকের উপর ধরেছে—বস্ত্র বিহনে ছেলে ঢাকা দিয়ে লজ্জা রক্ষা করে। আর বাসের প্যাসেঞ্জারের কাছে সকাতরে ভিক্ষা চায়: কাপড়—

স্তম্ভিত হতচেতন আমরা মুহূর্তে সচকিত হয়ে পোঁচকাবুচকি হাতড়াচ্ছি। শাড়ি হোক ধুতি হোক সাদা থান হোক, নিজের পরের বলে কথা নেই, কাপড় একটা পেয়ে গেলেই হয়। পাগলা প্যাসেঞ্জার একটি আমাদের মধ্যে, সর্বক্ষণ নিজ মনে বিড়বিড় করতে করতে এত পথ এসেছে, হঠাৎ সে উত্তেজিত

হয়ে 'সর্বনাশ হোক' 'সর্বনাশ হোক' বলে লাফ দিয়ে ওঠে—উঠতে গিয়ে বাঙ্কের ছাতে মাথা ঠুকে যায়। আর বাইরের সেই হিংস্র জনতা, দেখি, নিঃশব্দে পাকারাস্তা ছেড়ে পিলপিল করে নেমে যাচ্ছে। জিতে গেলেন মুসলমান-ঘরের এক গিন্নি—তাঁর কাপড়টাই সকলের আগে উলঙ্গ যুবতীর গায়ের উপর পড়েছে।

বলছিল ইদ্রিশ মিঞা পেট্রাপোলে সদ্য-পৌছানো ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে। দাঁত মেলে হাসির মতো ভঙ্গি করে বলে, মুসলমান তখন আমরা সকলেই—পুরুষ মেয়ে যতগুলো বাসে করে যাচ্ছি। আবার ঐ দেখো দাদা, টপাটপ এইবারে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে।

একটুখানি ইতস্তত করে লুব্ধকণ্ঠে বলল, একটা কথা বলি দাদা। ধুতি পরতে লোভ হচ্ছে, তোমার পরনের ধুতিটা দাও আমায়।

পথে-ঘাটে কেন রে? বাড়ি চল, দিনরাত ধুতি পরে থাকবি।

সবুর সইছে না। চলো না গাছতলায়—আমার গামছাখানা পরে ধুতি ছাড়বে। আমি তারপরে লুঙি দিয়ে দেবো।

হাত এড়ানো গেল না, কবেই বা পেরেছি! গাছতলায় চলেছি দু'জনে গাড়ির কাছ ঘেঁসে। সবগুলো কামরার মধ্যে মানুষ হাউ-হাউ করে কাঁদছে। যতক্ষণ সীমান্তের ওপারে, ভীরু সন্দেহসঙ্কুল দৃষ্টি—ভিটেমাটি ছাড়তে যে তিলমাত্র দুঃখ হয়েছে, কিছুতে কাউকে জানতে দেবে না। এরই মধ্যে কে-একজন চেঁচিয়ে উঠল: তেঁতুলগাছ পার হলাম রে—(বর্ডারের নিশানা এক তেঁতুলগাছ) আর কোথায় ছিল কত কান্না, সেই মুহূর্তে সমুদ্র হয়ে ট্রেন তোলপাড় করে তুলল। মেয়ে আছে, পুরুষ আছে, অপোগণ্ড শিশু আছে, অন্তিমযাত্রী বুড়ো আছে—নানান কণ্ঠে হাজারো রকম দুঃখের কান্না। পেট্রাপোলে ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে গেছে—তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে নিঃশঙ্কে সাধ মিটিয়ে কেঁদে নিচ্ছে। কামরা বোঝাই করে কান্না বয়ে আনে, কান্নার গাড়ি সেই জন্যে নাম।

কান্নার গাড়ির পাশ দিয়ে ইদ্রিশ আর আমি হাত-ধরাধরি করে যাচ্ছি—আরও এক তাজ্জব দেখলাম, সধবা বউরা এ ওর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বিজয়া-দশমীর দিন ঠিক এই জিনিস দেখতাম—প্রতিমা বরণ করতে এসে এ ওকে সিঁদুর পরাত চির-এয়োস্ত্রী হবার কামনায়। কান্নার গাড়িতেও তাই—ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর তুলে পথে বেরিয়েছে, এয়োস্ত্রী হয়ে তবে এবার মাটিতে পা দেবে।

গাছতলার নিভৃতে লুঙি বদলে ধুতি পরেছে ইদ্রিশ মিঞা—উঁহু, ইদ্রিশ

আর কেন—ইন্দুভূষণ। আমি সেই যে জগতের গল্প লিখেছি—তারই আপন ভাগনে। ছেলেবয়সে মাতুলের এটা-ওটা ফাইফরমাস খেটেছে, চিরটা কাল সেই দেমাক নিয়ে কাটাল। দেমাকটা গিয়েছে বুঝি এইবার। ধুতি পরতে পরতে ছলছল চোখে বলে উঠল, এমনটা কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল দাদা?

কান্নার গাড়ির প্যাসেঞ্জার ইন্দুভূষণও দল থেকে আলাদা নয়।

বাড়ি নিয়ে এসে ইন্দুভূষণের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিস্তর কথা শুনলাম। লেখা যায় না। রাত্রি অনেক হয়েছে, ঘুম নেই—আমার চিরকালের দেশভুঁয়ের জন্য কান্না পাচ্ছে। একা একা পায়চারি করছি—পরমাশ্চর্য ব্যাপার! দেখি, উঠানের উপর জগৎ। আবছা অন্ধকারে সেটা যে জগতেরই ছায়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফাঁসি গিয়েছিলে যে তুমি?

জগৎ বলে, অনুতাপে জ্বলছি আজ সতের বচ্ছর। দড়ির জোগাড় হয়েছে—পাতকোর জল-তোলা দড়ি। মেটেকলসি একটা খুঁজে বেড়াচ্ছি। দড়ি-কলসি গলায় বেঁধে ঝাঁপ দেবো, জলের নিচে যদি জ্বলুনি ঠাণ্ডা হয়—'

তদ্বির

দুই ঠিকেদার—কার্তিক পুঁই আর রাখহরি সেন। টাকার আণ্ডিল—দু'জনেই। উজিরঘেরি জঙ্গল হাসিল হয়ে বাঁধবন্দি হবে, ঠিকেদারিটা কে পায়?

রাখহরি বাইরে থেকে এসেছে, কার্তিক স্থানীয় লোক। সেই হিসাবে কার্তিকের বিশেষ রকমের দাবি। মানুষটি ধুরন্ধরও বটে। কাজ বাগানোর যাবতীয় বিধিনিয়ম নিষ্ঠাভরে পালন করে ধাপে ধাপে এগুচ্ছে। দুর্গোৎসবে বসে পুরুত সকলের আগে ষষ্ঠিপুজো সারেন—ক্ষুদে ঠাকুর-ঠাকরুন থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ বড়র দিকে এগুতে হয়। এ ব্যাপারেও ঠিক তেমনি—গোড়ায় কাছারির বরকন্দাজকে তুষ্ট করে তারপর নায়েব—এই দ্বিতীয় পর্ব নায়েব অবধি পৌঁচেছে কার্তিক পুঁই।

নায়েব ফটিক বর্ধন। তাকে মোক্ষম করে ধরেছে: আপনিই সব—সেকালে যাকে নবাব বলত, এখন তাই নায়েব হয়েছে। বড়বাবু তো একটা সই মেরে খালাস। তিনি কি আর জঙ্গলে জঙ্গলে কাজ দেখে বেড়াবেন? বোঝেনও কচু। পাঠিয়ে দিন কাজটা বড়বাবুকে বলে। চিরকালের সম্পর্ক আমাদের। রাখহরির মতো ভুঁইফোঁড় নই, আপনার পাওনাগণ্ডার একচুল এদিক-ওদিক হবে না।

কী আশ্চর্য! আপনি বলে দেবেন পুঁইমশায়, আমি সেই অপেক্ষায় থাকব? শুধু বড়বাবু কেন, মেজো ছোট সকলের কাছে তদ্বির হয়েছে। বড়বাবু কাশী গেছেন, ফিরে এলেই হুকুমটা বের হয়ে আসে।

বলতে বলতে ফটিক হাত পাতল: পুজোর মুখে বুঝতেই পারছেন কত খরচ-খরচা। ছেলেপুলের কাপড়জামা কিনতেই তো ফতুর হবার জোগাড়। তহরিটা এই সময় দিয়ে দিন পুঁইমশায়, বন্দোবস্ত খুব তাড়াতাড়ি হবে।

কার্তিক পুঁই বিপদ গণে: পুজো তো আমারও। কাজটার আস্কারা হয়ে যাক ভালোয় ভালোয়। আমিও পুজোর ধকল সামলে নিই এর মধ্যে। তহরি আপনার কোথাও যাবে না।

কালোমুখ করে ফটিক বলে, পুজো রাখহরি সেনকেও বাদ দিয়ে নয়। কাল সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোক পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। ছিলাম না আমি, দেখা হয়নি। আজ আবার আসবেন, বলে গেছেন।

একটা পাঁচটাকার নোট তাড়াতাড়ি হাতে গুঁজে দিয়ে কার্তিক পুঁই নায়েবের হাত জড়িয়ে ধরল: এতেই তুষ্ট হন এখন। পুজোর বিপদ না হলে এত করে বলতাম না। ঠিকেদারি পাকাপাকি হয়ে গেলেও তো সমস্ত আপনার হাতে। বাঁধের মাটির মাপ করবেন আপনি, জঙ্গলের গাছ কতগুলো কাটা হল তার হিসেব আপনার কলমে, বিল পাস করবেন, বিলের টাকাও আপনি নিজ হাতে দেবেন। পদে পদে পয়সা।

মোলায়েম হেসে কার্তিক আবার বলে, দিতে আমি গররাজি নই। ষোলআনা ভোগ করতে গেলে ব্যবসা হয় না, দুটো পয়সা পেলে একটা পয়সা তাই থেকে ছেড়ে দিতে হয়। উতলা হচ্ছেন কেন নায়েবমশায়, নিয়মদস্তুর সমস্ত পাবেন। বেশিই পাবেন।

কিন্তু হাসিতে চিঁড়ে ভেজে না। হাত মুক্ত করে ফটিক ছুঁড়ে দিল পাঁচটাকার নোট। রাগ করে বলে, ফকিরের ভিক্ষে দিলেন নাকি পুঁইমশায়? আমায় অবিশ্বাস করছেন—এই বা কেন তবে? সেনমশায়ের কাজকর্মের ধরন আলাদা। মুঠো-ভরা নোট নিয়ে তিনি ঘোরাঘুরি করছেন।

কার্তিক শিউরে উঠে বলে, জলে বাস করব, আর কুমিরকে অবিশ্বাস? বলছেন কি নয়েবমশায়!

বিস্তর বলে কয়ে হাতে আরও দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে তবে নায়েবের রাগ ভাঙাতে হয়।

রাখহরি সেনের কিন্তু পাত্তা নেই। ফটিক নায়েব মানুষটার চেহারাই

ভাল করে দেখল না এদ্দিনের মধ্যে। লাইনে নতুন এসেছেন, তদ্বির বোঝেন না। অগত্যা ফটিকই একদিন গুটিগুটি তাঁর বাড়ি চলে গেল।

নমস্কার সেনমশায়। টাকাকড়ি আছে আপনার, কাজকর্ম বোঝেন সেটাও জানি। কিন্তু বাড়ি বসে তো ঠিকেদারি আসে না, সেইটে মনে করিয়ে দিতে এলাম।

রাখহরি বলে, বাড়ি বসে আছি কে বলল? ছাপা ফরমে টেণ্ডার দিয়ে এসেছি। খোদ বড়বাবু হাত পেতে নিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আমার কাজকর্মের সম্বন্ধে।

দু-হাত উল্টে ফটিক-নায়েব হতাশ ভাবে বলে, তবেই হয়েছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া—এতে উল্টো ফল। হাত পেতে নিয়েছেন বড়বাবু, নিয়ে তো রেখে দিলেন। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। বেমালুম বিস্মরণ। এক-শ গণ্ডা কাজ বড়বাবুর—হাজার মানুষ এসে নিত্যিদিন অমনি কাগজ হাতে দিয়ে যাচ্ছে।

মুখের দিকে তাকিয়ে ফটিক মনোভাব ঠাহর করবার চেষ্টা করে। মালুম হয় না কিছু, কথা যেন কানেই গেল না।

ফটিক বলে, টেণ্ডার জমা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তদ্বির করবার বিধি। নতুন মানুষ—জানেন না বলে বাতলে দিতে এসেছি।

তদ্বিরতদারক নিষিদ্ধ—ফরমে তবে ছাপা রয়েছে কেন?

ফটিক ক্যা-ক্যা করে হাসে। তদ্বির বলে বিশেষ একটা দরকারি ব্যাপার আছে, পাছে আপনারা ভুলে বসে থাকেন। এইবারে নগদ ছাড়তে হবে সেনমশায়। যাদের কথা বড়বাবু শোনেন, টাকা পেয়ে আপনার টেণ্ডার তারা বাবুর নজরের সামনে তুলে ধরবে। সুপারিশ করবে আপনার জন্য।

আপনি বুঝি সেই মানুষ?

আত্মপ্রসাদে ফটিক বর্ধন দু-পাটি দাঁত মেলে হেসে পড়ল।

রাখহরি সজোরে চড় মারল ফটিকের গালে: ঘুষ নিতে এসেছেন? বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে।

আশ্চর্য ব্যাপার, রাখহরি সেনের ফার্ম কণ্ট্রাক্ট পেয়ে গেল। অপমানিত ফটিক প্রাণপণে বাধা দিয়েছে, কিন্তু নিন্দেমন্দ বড়বাবু কানে নিলেন না। তারপরে রাখহরি নিজে একদিন ফটিক বর্ধনের কাছে এসে উপস্থিত। মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে সামনে রাখল। বলে, যৎসামান্য পারিশ্রমিক। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন নায়েবমশায়।

ফটিক অবাক হয়ে বলে, আমি?

কাজটা যাতে না পাই, তার চেষ্টা করেছেন। সত্যি-মিথ্যে বদনাম দিয়েছেন। আমার তদ্বির এই। যত গালিগালাজ করেন, উপরওয়ালা ততই ভাবে অতিশয় সাচ্চা ফার্ম—আমলার সঙ্গে যোগসাজস নেই, ঠিক মতো কাজকর্ম হবে। আপনার সুপারিশ থাকলে বড়বাবু বিগড়ে যেত। যদি বলেন, চড় মারলাম কেন—চড় না খেয়ে মন খুলে এমন যাচ্ছেতাই করতে পারতেন না।

গুণেগেঁথে ফটিক টাকা তুলে নিল। মোটা অঙ্ক—পঞ্চাশ।

রাধহরি সেন হেসে বলে, শেষ নয় এটা—সবে আরম্ভ। এর পরে কাজকর্ম তো পুরোপুরি আপনার হাতে এসে গেল। চড়চাপড় নয় আর। পদে পদে টাকা।

প্রতিহিংসা

কালাচাঁদ-কাকা আমসত্তের সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন একটা। ঠিকানা মিলিয়ে দেখলাম, এই বাড়ি বটে। কড়া নাড়ছি। চুপচাপ। নেড়েই যাচ্ছি। হঠাৎ একবার সাড়া এলো, কে ?

বীণারই গলা, সন্দেহ নেই। নাম বললাম। পাঁচ বছর হলেও ভুলবার কথা নয়, তবু গ্রামের নাম বলি : অমুক জায়গা থেকে আসছি। তোমার মামা ক'খানা আমসত্ত পাঠিয়েছেন।

বীণা বলল, ওরে গগন, দোর খুলে বৈঠকখানায় বসা। আসছি আমি পঙ্কজ-দা।

কোথায় গগন, কেউ সাড়াশব্দ দেয় না। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি। ভাগ্যিস রেনকোট নিয়ে এসেছিলাম অসিতের বাসা থেকে। হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে আছি। বীণার ব্যাপার না হলে কখন চলে যেতাম। পাঁচ বছর বাদে বিবাহিত বীণা কেমন হয়েছে, দেখবার লোভ। ভাল ছেলের সঙ্গে বীণার বিয়ে হয়েছে। গ্রাজুয়েট, জাপানি এম্ব্যাসিতে কাজ করে, ভাল মাইনে পায়। বাসা করে স্বামী-স্ত্রী পরম সুখে আছে। কালাচাঁদ-কাকাই গল্পে গল্পে এ সমস্ত বললেন। তা সুযোগ যখন হয়েছে, সুখ দেখে যাই ওদের। মেয়েটার কপাল ভাল, আমার ঘাড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে।

স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি সেবারে সেই পাঁচ বছর আগে। পড়াশুনোয় রীতিমত ভাল, তার উপরে তিন তিনটে প্রাইভেট-মাস্টার। স্কলারশিপ যদিই বা ফসকে যায়, একগাদা লেটার পাব নির্ঘাৎ। এই সময়ে কালাচাঁদ-কাকার

মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বোন-ভাগনি এসে পড়ল। রীণা ও তার মা। বয়সে কিশোরী তখন রীণা, রাজকন্যার মতো রূপ। পাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দর মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে—শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতেই মা কালাচাঁদ-কাকা ও রীণার মায়ের কাছে প্রস্তাব পাড়লেন: বিয়েথাওয়া এখনই যে হচ্ছে তা নয়। পঙ্কজ অনেক পড়বে এখনো, বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনবেন ওঁর বড় ইচ্ছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে থাকুক, বিলেত রওনা হবার ঠিক আগেই শুভকর্ম। মেম বিয়ে করে যাতে না ফিরতে পারে।

সকল দিক দিয়ে আমি অতিশয় সুপাত্র, তাঁদেরও আপত্তির কথা নয়। বাবা আরও এক পা এগিয়ে বললেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। মুখের কথা নয়, আমি একখানা গয়না দিয়ে আশীর্বাদ সেরে রাখব। তারিখ ঠিক হল। ঠিক তার তিনদিন আগে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। কলেরা হয়ে বাবা মারা গেলেন। রীণারা চলে গেল। যে রকম নবাবি চালনচলন বাবার, কত লক্ষ টাকা রেখে গেছেন তার জন্যে সকলে কৌতূহলী। রেখে গেছেন একরাশ দেনা। ধার করার কৌশল, বোঝা যাচ্ছে, আশ্চর্য রকম রপ্ত করেছিলেন। ভিতরের অবস্থা উত্তমর্ণেরা বিন্দুমাত্র টের পায়নি, ধার দিয়ে কৃতার্থ হত যেন তারা। উত্তমর্ণ কি, আমার মা অবধি কোনদিন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি।

তাহলেও পাত্র হিসাবে আমি সত্যিই তো ভাল। কালাচাঁদ-কাকা বললেন, কুছ পরোয়া নেই। পঙ্কজের পড়ার খরচা রীণার বাপই দেবেন। ব্যারিস্টার না-ই বা হল, ওকালতি পড়ে উকিল হয়ে সদরে বসতে পারবে। কপালে থাকলে উকিল থেকে হাকিম।

কিন্তু আমার মা বেঁকে বসেছেন: অপয়া মেয়ে, কালাচাঁদ। আশীর্বাদের মুখে এই সর্বনাশ—ও মেয়ে বউ হয়ে ঘরে এলে বাড়িসুদ্ধ নিপাত যাবে।

ওদিকে রীণার মা-ও নাকি যাচ্ছেতাই করে বলছেন: বড্ড রক্ষে হয়েছে। রীণার কপালজোর। কী ধাপ্পাবাজ ছিল ভদ্রলোক! ঠাকুর-প্রতিমার মতো—উপরে রংচং, ভিতরে খড়। বিসর্জনের পর তবেই ধরতে পারা গেল।

কালাচাঁদ-কাকা ফলাও করে এই সব বলে বেড়াচ্ছেন। হয়তো বা নিজেরই রচনা, রীণার মা কিছু জানেন না। মায়ের অপমানের কথায় তিনি প্রতিহিংসা নিচ্ছেন। আমারও পড়াশোনার ঐখানে ইস্তফা। মা আর ছোট ছোট ভাইবোন তিনটে—সমস্ত দায় আমার মাথায়। গ্রামের

ইস্কুলে চাকরি নিলাম। কিন্তু যা বাজার পড়েছে, চালাবার উপায় দেখিনে। চাকরির চেষ্টায় কলকাতা এসেছি। আশাও পেয়েছি। অসিতদের ওখানে উঠেছি। যখন গ্রামে থাকত একসঙ্গে পড়েছি অসিতের সঙ্গে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারই মধ্যে রীণার বাসায় এই আমন্ত্রণ দিতে আসা।

কিন্তু কী হল এদের গগনের—রীণারই বা খবর কি? কারো যে সাড়া পাইনে। বিরক্ত হয়ে বিষম জোরে কড়া নাড়ি আবার। রীণা বলে ওঠে, কী আশ্চর্য, এখনো দোর খোলে নি? দাঁড়ান—একটুখানি দাঁড়ান পঙ্কজ-দা। আমি যাচ্ছি।

যাচ্ছি-যাচ্ছি করে, কী ব্যাপার? রাস্তা থেকে জানলা বেশ খানিকটা উঁচু। দেয়াল বেয়ে উঠে উঁকি দিই। তোলপাড় ভিতরে। ধোয়া সুজনি চাপা দিচ্ছে বিছানার উপর। ন্যাকড়া ভিজিয়ে চেয়ারটা মুছছে। জিনিস-পত্র নড়ানো সরানো চলছে। দু'খানা হাত নিয়ে দশহাতের কাজ করছে রীণা। অপরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী আমার চোখে পড়তে দেবে না। নতুন-কিছু নয়। সাজগোজে ক'জন আমরা সর্বক্ষণ চমকদার হয়ে থাকতে পারি বলুন। অতিথি এলে তাই হুড়োহুড়ি লেগে যায়। আমি মানুষটার জন্যেই এত, অতএব নিজের দিকেও একবার নজর ফেলে দেখি। না, ভালই। চাকরির ব্যাপারে ভাল ভাল লোকের কাছে যেতে হবে, সে জন্য জামায় কাপড়ে ফুটোফাটা নেই। উপরন্তু ধোবার বাড়ির কাচানো। পথের কাদায় জুতোর পক্ষে সুবিধা হয়েছে—আনকোরা নতুন হোক আর পুরানো-জরাজীর্ণ হোক, কাদা মেখে গেলে সব জুতোরই এক চেহারা। পাঁচ বছর আগে বাবার আমলে যে বেশে দেখাশোনা হত, তার চেয়ে খুব বেশি নিবেশ নয়। তার উপর রেনকোট দারিদ্র্য চাপা দিয়ে একটা অভিজাত চেহারা এনে দিয়েছে।

খুট করে দরজা খুলে রীণা বেরুল। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, দেখুন দিকি! আমি জানি, বসিয়েছে এনে আপনাকে। একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছি সেই ফাঁকে গগন লম্বা দিয়েছে। ঠাকুরের দেশ থেকে লোক এসেছে, সে অবশ্য বলেকয়ে ছুটি নিয়ে গেছে। চাকরবাকরের যা অবস্থা হয়েছে কলকাতায়—

লম্বায় চওড়ায় বড় জোর হাত পাঁচেক—নাকি, বৈঠকখানা সেই স্থান। সেখানে নিয়ে বসাল। লাগোয়া শোবার-ঘরটা বরং মানানসই। বলি, ঘুমিয়ে ছিলে বুঝি রীণা? তাই হবে—নইলে এতক্ষণ তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে -

কী করি, আমার কর্তাটি তো অফিসে। একা একা ঘুম পেয়ে যায়। দায়িত্বের চাকরি—ঘড়ি-ধরা কাজ ওদের নয়। সকাল সকাল ফিরতে পারল

তো চৌরঙ্গিপাড়ার কোন একটা সিনেমায় ঢুকে বসলাম। সংসারের কাজকর্ম লোকজনে করে। আমার কি কাজ বলুন ঘুমানো ছাড়া? কিছু মনে করবেন না পঙ্কজ-দা। গগন নেই, আমি তো জানিনে। বড্ড ঘুমকাতুরে আমি—ঘুম ভাঙলেও ঘোর কাটতে চায় না।

সে তো স্বচক্ষে দেখা রীণা। সেই যে সেবার কালাচাঁদ-কাকার বাড়ি দুপুরে খেয়ে ঘুমুলে, কেউ ডেকে দেয় নি—রাত্রে খাওয়ার আগে উঠলে একেবারে। বেকুব হয়ে তুমি তো কেঁদে ফেললে একেবারে।

মুখ টিপে হেসে রীণা বলে, আপনাদের সব কেমন মনে থাকে পঙ্কজ-দা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রীণা স্বল্পপরিসর ঘর দুটি কেমন আহা-মরি করে তুলেছে। নিজেও। পাঁচ বছর আগে রূপসী কিশোরীকে দেখতাম, পরিপূর্ণ যৌবনে রীণা আজ অপরূপ। লম্বা-হাতা ব্লাউজ পরেছে। হঠাৎ এক সময় হাতা খানিকটা সরে গিয়েছে—দেখি, সুগৌর বাহুর উপর কটকটে কালো দাগ। জায়গায় জায়গায় ঘা এখনো দগদগ করছে।

শিউরে উঠে বলি, কি হয়েছে রীণা?

এই? তাড়াতাড়ি হাত ঢেকে ফেলে রীণা হেসেই খুন: বলেন কেন! সিনেমা দেখে ফিরছি দু'জনে। বাস থেকে নেমে এইটুকু হেঁটে আসছি। ঘুম ধরেছে আমার। ঢুলতে ঢুলতে পথের ধারে কাঁটা-তারের বেড়ার উপর! সেই রাত্রে কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ-ব্যাণ্ডেজ—ডাক্তারবাবু শুনে মুখ টিপে হাসলেন, লজ্জায় আমি মুখ তুলতে পারিনে।

আমসত্ত্বর পুঁটুলি দিয়ে বললাম, সিঁদুরে-গাছের আমের আমসত্ত। কলকাতায় আসছি শুনে কালাচাঁদ-কাকা বললেন, এই আমসত্ত রীণা বড় ভালবাসে। নিয়ে যাও ক'খানা।

রীণা খুব তারিফ করে: যেমন গোলাপফুলের মতন রং, তেমনি সুবাস। খেয়ে ভাল বলেছিলাম, মামা সেই কথা মনে করে রেখেছেন। কত যে ভালবাসেন মামা। সব কথা কেমন মনে থাকে আপনাদের।

বলতে বলতে হাসি-ভরা চোখ দুটো বুঝি ছলছলিয়ে আসে। তারপরে আমার কথা উঠল: কলকাতায় কি মনে করে পঙ্কজ-দা?

ক্যালকাটা ট্রেডিং করপোরেশনে চাকরি নিচ্ছি একটা।

গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টারি করেন শুনেছিলাম—

রীণার কণ্ঠে যেন তাচ্ছিল্যের সুর। না-ও হতে পারে। যৎসামান্য মাইনে বলে আমারই মনে হয় ঐ রকম। গর্বিত কণ্ঠে বলি, ইস্কুলের শিক্ষক

আমি। আছি বেশ ভালোই। মানুষ গড়ে তোলার মহাব্রত। এক-শ টাকা করে দেয়। ট্রেডিং করপোরেশনে অবশ্য তিন-শ—

রীণা বলে, ভুল করছেন পঙ্কজ-দা। এক-শ টাকা অনেক ভাল ছিল গাঁ-ঘরের শান্তির জীবন। কলকাতা পাজি জায়গা।

সায় দিয়ে বলি, সে তো বটেই। নিজের বাড়িতে থেকে ক্ষেতের চাল খেয়ে এক-শ টাকা নিতান্ত কম হল না। টাকার জন্যে নয় রীণা। ভাল লাইব্রেরি নেই পাড়াগাঁয়ে, পড়াশুনোর অসুবিধে। না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু না পড়ে যে পারিনে। কিছু না হোক কলকাতায় থেকে দেদার পড়তে পারব। সে-ই আমার বড় লোভ।

কথাবার্তার মাঝখানে রীণা উঠে পড়ল: নাঃ, গগনই ডোবাল। একটা পানের দোকান আছে, সেইখানে আড্ডা জমায়। দেখে আসি আমি।

ব্যস্ত হচ্ছে কেন, বুঝতে পারি। মিষ্টিমিঠাই কিছু আনাবে। গগন গায়েব, ঠাকুরটা ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে। সত্যি, বড় মুশকিলে পড়েছে রীণা।

কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে টিপটিপ করে—

খুলে-রাখা সেই রেনকোট গায়ে চাপিয়ে রীণা ততক্ষণে রাস্তায় নেমেছে: চলে যাবেন না কিন্তু পঙ্কজ-দা। এক্ষুনি আসছি।

একলা ঘরে হাসি পায় এখন আমার। বাবার দিব্যদৃষ্টি ছিল, তাই ব্যারিস্টার না হলাম, উকিল—অন্ততপক্ষে একটা মোক্তার হলেও আমার পয়সা খায় কে? এক-শ টাকার মাস্টারি, ট্রেডিং করপোরেশনে তিন-শ টাকার চাকরি—বাতাসের উপর অবলীলাক্রমে কেমন এক বিশাল ইমারত বানিয়ে দিলাম। বাবার সঙ্গে ইস্কুলের সেক্রেটারির দহরম-মহরম ছিল। তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লাম: বাবা চলে গিয়ে বড্ড বিপাকে পড়েছি, উপায় একটা করতেই হবে।

তাই তো হে, মুশকিলে ফেললে। নতুন নিয়মে গ্রাজুয়েটের নিচে মাস্টার হয় না। যাক গে, প্রাইমারি সেকশনে নিয়ে নিচ্ছি তোমায়। মাইনে পঁচিশ।

স্বর্গ হাতের মুঠোয় পেয়েছি তখন।

সেক্রেটারি বললেন, কিন্তু চাঁদা কেটে নেওয়া হবে কুড়ি টাকা। সই করবে পঁচিশ, পাবে কুড়ি বাদ দিয়ে যে টাকা থাকে। মুখ কাঁচুমাচু করো কেন হে ছোকরা। সকাল আর সন্ধ্যে তোমার রইল, সেই তো আসল। মাস্টার না হলে চিনবে কে তোমায়, টুইশানি কে দিতে যাবে? ইস্কুলের কাজ মানেই হল মাছে-ঠাসা পুকুরের ধারে হুইল-ছিপ হাতে নিয়ে বসা। ক্ষমতা থাকে, টানে টানে মাছ তুলে নাও। তার জন্য টিকিট লাগছে না, উল্টে পাঁচ টাকা করে পাচ্ছ।

অতএব ছিপ ধরেই আছি পাঁচ পাঁচটা বছর। ক্লাসে পড়ানোর সময় মনে আনি, চার ফেলা হচ্ছে মাছ লাগানোর জন্ত—ভাল-পড়িয়ে নাম করতে পারলে টুইশানি গাঁথবার সুবিধা। কিন্তু বাজার খারাপ হয়ে এখন আর এমন অনিশ্চিত আয়ের উপর চলছে না। অসিতের বাপ পঞ্চানন হালদার ট্রেডিং করপোরেশনের বড়বাবু। বৈষয়িক গোলমাল মেটাতে গ্রামে এসেছেন। নিরুপায় হয়ে তাঁর কাছে পড়লাম: অসিতকে চাকরি দিয়েছেন, আমাকেও যে ভাবে হোক নিয়ে নিন।

অসিতের সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব, হালদারমশায় জানেন সেটা। এক-কথায় কেটে দিলেন না। বললেন, তোমার যে বিস্তে তাতে দু-রকমের চাকরি হতে পারে আমাদের অফিসে।

লোলুপ কর্ণদ্বয় উদ্যত করে আছি।

এক জেনারেল ম্যানেজার। যিনি আছেন, একটা পাশও নন। কোন রকমে ইংরেজিতে নাম সই করেন। মাইনে আড়াই হাজার। কিন্তু এই চাকরি হবে না বাপু, অন্ত কোয়ালিফিকেশনও চাই। সিনিয়র পার্টনারের শালা হতে হবে।

চুরুটে একটা বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আর হতে পার ম্যানেজারের আরদালি। মাইনে পঁচিশ টাকা। কিন্তু তার জন্ত তদ্বির লাগবে। তদ্বির মানে বুঝেছ তো? টাকা।

কলকাতায় ফিরে ছেলের বন্ধুর কথা তিনি ভোলেন নি। চিঠি দিলেন, চাকরি একটা ঠিক করেছি। আরদালি ঠিক নয়, তার কিছু উপরে। টাইম-কিপার। মাইনে পঁচাত্তর। তদ্বির লাগবে চার মাসের মাইনে। নগদ নিয়ে শিগগির চলে এসো। দেরি হলে থাকবে না।

তিন শ টাকা—কিন্তু তিনটে টাকারও তো জোগাড় নেই। অসিতকে কাকুতিমিনতি করে লিখলাম: চাকরে মানুষ তুমি, টাকাটা ধার দাও। চাকরি ফসকে গেলে সবসুদ্ধ না খেয়ে মরব। অসিতের জবাব: চলে এসো কলকাতা। পৌঁছানো মাত্র দশটাকার দু খানা নোট হাতে গুঁজে দিল, এবং গ্রামের কৃতী যাঁরা শহরে আছেন তাঁদের ঠিকানা। বলে, এক মাসের সিনেমা দেখা আর কাটলেট-খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এ বাজারে একলা কেউ অত টাকা দেবে না। ঠিকানা দিয়েছি, তিল কুড়িয়ে তাল করোগে। বাবাকে ধরলে তিনিই কোন না বিশ-পঁচিশ দেবেন। আমার এই টাকার কথা বোলো না তাঁকে, খবরদার।

সেই ঘোরাঘুরি এখন ক'দিন ধরে চলবে। রীণারা বড়লোক শুনেছি,

তার কাছেও কৌশলে কথাটা পাড়ব ভেবেছিলাম। অথচ উল্টোটাই হয়ে গেল। যেন কোন খাজে-খাঁ এসেছি আমি—কোন অভাব নেই। একটি মাত্র ক্ষোভ, যথোচিত বই পড়তে পারিনে।

আধ-বুড়ো শীর্ণদেহ একটা লোক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে: বাড়ির সব লোক কোথা?

হিমাংশুবাবু তো অফিসে এখন—

আর বলতে দেয় না। হি-হি করে লোকটা হেসে উঠল: কোন আপিস মশায় হিমাংশু ঘটকের। কে চাকরি দিল? বেড়ে ভাঁওতা দিয়েছে। বউটা বলল বুঝি—তিনিই বা কোথা? বড় ল্যাঠা হল—দেখলেই পালাবে। বলি বাড়িটা তো আমার নয়, মনিব ঠেকাই আমি কেমন করে?

পালায় নি। চাকরটা কোথায় বেরিয়েছে, তাকে খুঁজতে গেল। এক্ষুনি এসে যাবে।

এই দেখুন, চাকরও রেখেছে বুঝি হিমাংশু? ঝি-চাকর-ঠাকুর সব-কিছু এখন একলা ঐ পরিবার। দিনরাত্তির মুখ বুঁজে খাটে, মদ খেয়ে এসে নৃশংস পশু ধরে ধরে সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা ঠেঙায়। ঠেঙিয়ে সর্বদেহ চালা-চালা করেছে। দেখে এক এক সময় রোখ চেপে যায়—জানিয়ে দিই মনিবকে, ভাড়া তিন মাসের জায়গায় চার মাস বাকি ফেলেছে। উচ্ছেদের নোটিস দিই ঠুকে ঘর খালি করে পথে গিয়ে উঠুক। কিন্তু বউটিও যে সেই সঙ্গে যাবে—সেই জন্যে পারিনে।

কাছে বসিয়ে সবিস্তারে শুনি। বাড়িওয়ালার বিল-সরকার ইনি। উচ্ছেদ করতে পারলে মনিব তো বগল বাজাবে—পাঁচ-শ টাকা সেলামি, ভাড়া ডবল। কিন্তু গরিব হয়ে আর এক গরিবের সর্বনাশ করা উচিত নয়। এদ্দিন চেপে রেখেছে, আর বুঝি পারা যায় না। তারও তো চাকরির ভয়। এক মাসের ভাড়াও যদি দিয়ে দিত। দেবার উপায় নেই, সেটা অবশ্য জান।—

বাইশ টাকা ভাড়া। অসিতের সেই নোট দুটো পকেটে আছে। রাহা খরচ যা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তাই থেকেও দু'টাকা হয়ে যাবে। বীণার মা সেই বলে বেড়াতেন: মেয়ের কপালজোর—খুব রক্ষে হয়েছে আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে। প্রতিহিংসার একটা বড় সুযোগ। অভাব আমায় নিত্যিদিনের, এ সুযোগ ছাড়া যায় না—

লিখুন রসিদ সরকারমশায়।

রসিদ দিয়ে লোকটা চলে গেল। মনের উৎকট জ্বালায় আমি তার উল্টো পিঠে আবার লিখি: ভাড়াটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে কোরো না

রীণা। এমনও ঘটতে পারত, তোমার সকল দায়দায়িত্ব আমায় উপর। ভাড়া তাহলে আমিই দিতাম। কপালজোরে অবশ্য রক্ষে হয়ে গেছে।

সুজনির নিচে রসিদটা রেখে কিছু চাপা দিয়ে দিই। শোওয়ার সময় হাতে পড়বে। সুজনি তুলতে গিয়ে ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, নোংরা শতছিন্ন এমনি তোষক-বালিশ তো শ্মশানে মড়ার সঙ্গে বিদায় করে দেয়, মানুষে শুয়ে থাকে ভাবা যায় না। সদ্য পাট-ভাঙা রঙিন সুজনিতে ঢেকে দিয়েছে। এঘর-ওঘর ঘুরে আরও দেখছি। উপুড়-করা বালতিটা তুলতে মদের খালি বোতল কয়েকটা। ঢাকা দাও, রীণাকে দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, যেমন ছিল সমস্ত ঢেকেঢুকে রাখো।

পাতার ঠোঙায় মিষ্টি এনেছে। রীণা বলে, গগনকে কোথাও পেলাম না। চাকর-বাকর এমনি হয়েছে কলকাতায়! নিজে দোকানে চলে গেলাম।

বেশ করেছ রীণা। আপনহাত জগন্নাথ। যা দিনকাল পড়েছে, পরের উপর নির্ভর যত কম করা যায়।

ক্ষিধে পেয়েছিল, পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে উঠে পড়লাম। রীণা বলে, চাকরিটা হলে আবার আসবেন।

নিশ্চয়। বড় আনন্দ পেয়ে গেলাম। দিব্যি আছ দুটিতে। 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে'—

কলকণ্ঠে রীণা বলে, উচ্চবৃক্ষ আর পেলাম কোথা? একতলার ঘর। বাড়ির যা দুর্ভিক্ষ কলকাতায়! উপরের ফ্লাটটা নেবার কত চেষ্টা করছি। ওরা একশ টাকা দেয়, দেড়শ অবধি বলেছি। কিন্তু ভাড়াটে উচ্ছেদ করবে কেমন করে?

ট্রামে উঠে রেনকোট খুলে রাখছি— পকেটে কি যেন ঠেকল। সর্বনাশ করেছে, অসিতকে লেখা সেই চিঠি রেনকোটের পকেটে রেখেছে হতভাগা। পড়ে দেখে নি তো রীণা? চিঠির ভাঁজে রীণার কানের গয়না। কী সর্বনাশ, চিঠির উল্টোপিঠে রীণা যে আমারই মতন করে খানিকটা লিখে রেখেছে:

আপনার এতবড় দায়। কিন্তু টাকা আমাদের বাড়ি থাকে না—ব্যাঙ্কে রেখে দেয়। মানুষটি কখন অফিস থেকে ফেরে, স্থিরতা নেই। ঝুমকো দুটো দিলাম, এ জিনিস কেউ পরে না আজকাল, বিক্রি করে দায় সারবেন। কিছু মনে করবেন না পঙ্কজ-দা। একদিন ঘনিষ্ঠ হতে হতে বেঁচে গিয়েছি— হলে কি দায়ে-বেদায়ে আমার গয়না নিতেন না?

দয়াময়

বারাসতে নামলাম। ট্রেনে এক তুখড় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নাম বললেন বলাই পাল। ডেলি প্যাসেঞ্জার, গল্পে-মানুষ। সেকালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আস্তানা ছিল বারাসতে—সেই সব গল্প হল। আমি যেখানে যাচ্ছি, সে-ও তাঁর জানা। শহর ছেড়ে খানিকটা উত্তরে। বলাইও সেইদিকে যাবেন। ভাল হয়েছে মানুষটিকে পেয়ে।

গল্প করতে করতে গেট পার হয়ে বেরিয়েছি। পিছনে গোলমাল শুনে থমকে দাঁড়াই। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট-পরা লিকলিকে এক ছোঁড়াকে ধরেছে। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বিনা টিকিটে সরে পড়বার তালে ছিল—কাঁাক করে ধরেছে চেপে। মিনমিনে গলায় ছোঁড়া কি বলছে বোঝা যায় না। টিকিটবাবুর হুঙ্কার কানে আসে: ঘুঘু দেখেছিস, ফাঁদ দেখিস নি! পুলিসে দেব তোকে শয়তান-কাঁহাকা—

বলাই পাল এক ছুটে সেখানে গিয়ে ছোঁড়ার গালে দিলেন প্রচণ্ড এক চড়। পিঠের ওপর কিলও ঝাড়লেন গোটা চার পাঁচ। রাগে ফুলছেন: হতভাগা, বলিনি তোকে? অসুবিধায় পড়ে কোন দিন যদি টিকিট কাটতে না পারিস, সোজাসুজি গেটবাবুদের গিয়ে বলবি। দয়াময় লোক এঁরা—পরের দুঃখ বোঝেন। তা নয়, ঠকিয়ে যাবে এঁদের—চুপিচুপি সরে পড়বে! কামারবাড়ি এসেছিস ছুঁচ চুরি করতে—এঁরা বোকা! রেলের চাকরি করলে কি হবে—জানিস, রীতিমত শিক্ষিত মানুষ। গোটা রাজ্য চালাবার বুদ্ধি রাখেন।

বাঁ-হাতের ব্যাগ ছুঁয়ে ফেলে দুই হাতে দুই কিল উঁচিযে বলাই পাল আক্রোশ ভরে আবার তেড়ে যান। ভয়ের কথা হয়ে দাঁড়াল। রোগা ছেলেটা। লোহার হাতের কিলে নিশ্চয় মাথা ঘুরে পড়ত যদি না লাফিয়ে পড়ে হাত চেপে ধরতাম। টিকিটবাবুটি অবধি সন্ত্রস্ত হয়েছেন: আহা, কী করেন! আর মারবেন না, অনেক তো হয়ে গেল—

না মশায়, মেরেই ফেলব একেবারে। দুনিয়ার আপদবালাই। এসেছে বিনা টিকিটে, তার উপর চালাকি খেলতে যায় এই মহাশয়-মানুষটিকে সঙ্গে। এখনই এমনি—বড় হয়ে ডাকাত হবে, খুনে হবে।

বলাই পালকে ঠেকানো বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। হাত দুটো ধরে রেখেছি তো পা ছুঁড়ছেন—লাথি মারবেন পায়ের নাগালের মধ্যে পেলে।

চিড়িয়াখানার খাঁচায় সিংহের মতো গর্জন ছাড়ছেন। কে-একজন ভিড়ের মধ্য থেকে বলল, ছোঁড়াটাও তো কম হাঁদা নয়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখিস, পালা শিগগির। দেখছিস মানুষটা ক্ষেপে গেছেন। ছাড়া পেলে খুন করে ফেলবেন তোকে।

থ হয়ে গেছি আমি তো একেবারে। ছেড়ে যেতে পারছি নে। ওঁর জানাশোনা বাড়ি—রাত্রিবেলা কোথায় এখন হড্ড-হড্ড করে বেড়াব? আসামি সরে পড়বার পর অবশেষে বলাই পাল শান্ত হলেন। নিঃশব্দে খানিকটা পথ এগিয়ে গেছি, এমনি সময় আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

ছোঁড়াটা আপনার চেনা বুঝি?

বলাই হেসে বলেন, ক্ষেপেছেন! আজকে এই প্রথম দেখলাম।

তবে অত রেগে গেলেন কেন?

ঝঞ্ঝাটে পড়েছিল, বাঁচিয়ে দিলাম। অতি ছ্যাচড়া ঐ টিকিটবাবুটি। অন্তত চারগণ্ডা পয়সা আদায় না করে ছাড়ত না।

উষ্ণ কণ্ঠে আমি বললাম, মার যা দিয়েছেন সে কিন্তু মশায় চারআনার উপর দিয়ে যায়।

বাবু!—ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি সেই ছোঁড়া কখন পিছন নিয়েছে। বলাই পালের দিকে সে হাত বাড়াল: ব্যাগটা দিন বাবু, আমি পৌছে দিয়ে আসি।

বলাই বলেন, চড় মারলাম,—লেগেছিল নাকি রে?

ছোঁড়া ফিক করে হেসে বলে, মারলেন কোথা বাবু, শুধুই তম্বি। পিঠের উপর হাত বুলানোর মতন ঠেকল।

বলাই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, শুনলেন? এ ছোঁড়া কে আমার মশায়—কী দায় পড়েছে মেরে ধরে সংশোধন করতে যাব? চোর হোক জোচ্চোর হোক, আমার কি! দয়া হল, একবারের মতন তাই বাঁচিয়ে দিলাম।

ছোঁড়া হাত বাড়িয়ে আছে, ব্যাগ সে নেবেই। দু-চোখে কৃতজ্ঞতার ছাপ।

বৃষ্টি

স্টেশনে নেমেই মুষলধারে বৃষ্টি। বেরুতে পারে না প্রদীপ, অধীর হয়ে ওঠে। জিনিসপত্র কিনতে হবে ঘুরে ঘুরে, অনেকের বাড়ি যেতে হবে। একগাদা কাজ।

খানিকক্ষণ পরে বৃষ্টির জোরটা কমল, একেবারে থামে না। টিপ-টিপ করে চলছে। ছুটতে ছুটতে সে ছাতার দোকানে চলে যায়। বাজে খরচটা এড়ানো যাবে না। কাজকর্ম পণ্ড হবে তা হলে।

সস্তার জিনিস একটা দিন।

দোকানদার টাকা ছয়েকের মতো একটা বের করে দিল : এইটে নিন, হাসতে খেলতে পাঁচ-ছ'টা বছর।

আরও সস্তা নেই?

আছে। কিন্তু জোচ্চোরি কারবার নয় আমাদের, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেব। সে জিনিস দুটো দিনও টিকবে না।

শুধু আজকের দিনটা চলবে কিনা, বলুন। তা হলেই অনেক হল।

বিকালের দিকে বৃষ্টি ধরল। কাজকর্ম তখন সারা হয়ে গেছে। একটা চেনা দোকানে জিনিসপত্র মজুত রেখেছে। বিশ্রাম এতক্ষণে। ট্রামে উঠে পড়ল।

কলকাতার ট্রামের যা নিয়ম—লোকে লোকারণ্য। তার উপরে বিপদ, এক দঙ্গল মেয়ে উঠে পড়ল এই জায়গা থেকে। কষ্টেসৃষ্টে ঠাঁই করে নিয়ে কি-হয় কি-হয় ভেবে মনে মনে অনেকে গুরু-নাম জপছিল—সেই কাণ্ডই ঘটে গেল এবারে। থুনথুনে বুড়োমানুষটাও দশ-বছুরে লেডির জন্য জায়গা ছেড়ে মাথার উপরের রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চললেন। প্রদীপও ঝুলছে। এবং সতৃষ্ণনয়নে দেখছে মেয়েদের দিকে।

নিরিখ করে দেখে দেখে মতি স্থির করে ফেলেছে। ঝকঝকে মেয়েটা, আমাদের শম্পা—প্রভঞ্জন-গতিতে প্রদীপ তার দিকে এগোয়। রীতিমত ধাক্কাধাক্কি। এসে পড়েছে সামনে, একদৃষ্টে শম্পার দিকে তাকিয়ে আছে।

সমাজ সংসার এবং দুনিয়ার উপর বিতৃষ্ণা নিয়ে শম্পা বেরিয়ে পড়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ অনেকখানি এগিয়ে আজকেই ভেস্তে যাবার খবর এল। কথাবার্তা চলছিল পাত্রের বাবা আর শম্পার মামার মধ্যে। শম্পারই সহপাঠিনী রেবা সরকারকে পাত্র পছন্দ করেছে। এমন কি বিয়ের দিনক্ষণ অবধি ঠিকঠাক। মামা এ সবের কিছু জানতেন না। খবর পেয়ে আজ চিঠি লিখেছেন।

প্রদীপ ওদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নেয় শম্পা। বিরক্তি বুঝেও প্রদীপ নিরস্ত হয় না। ডাকছে : শুনুন, একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

শম্পা কানেই শুনছে না যেন। জানলা দিয়ে পথের দিকে দেখে।

একটু জোর দিয়ে প্রদীপ বলে, জরুরি কথা।

অবহেলার ভঙ্গিতে শম্পা বলল, আপনাকে চিনিনে তো।

হাসল প্রদীপ: না-ই বা চিনলেন। অচেনা লোকের সঙ্গে কি কথা বলেন না? ঘোমটা-দেওয়া সেকেলে মেয়েরা বলতেন না অবিশ্যি। আপনারা তো তেমন নন।

তবু শম্পা ক্ষণকাল চুপ করে থাকে। রেবা সরকারের কথা মনে ভাসছে— হতে পারে তারই সম্পর্কের কিছু। এমন কোন গুপ্ততথ্য, বিজয়িনীর দম্ভ যাতে চুরমার হয়ে যাবে।

ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, কি কথা?

প্রদীপ বলে, অনুমতি দেন তো বসে পড়ি পাশের খালি জায়গাটায়। এমনি ঝুলে ঝুলে বলা কি ভাল হবে?

সেটা শম্পাও চায় না। রেবার সম্বন্ধে যদি কিছু হয়, নিচু গলায় হওয়াই ঠিক। তবু সহসা হাঁ-না কিছু বলতে পারে না। শুধু রেবা কেন, পুরুষ জাতটার উপরেও নিদারুণ ঘৃণা। রি-রি করে জ্বলছে মনের মধ্যে।

প্রদীপ সকাতরে বলে, খুব আলগোছে বসছি আমি। আপনার অসুবিধা হবে না।

শম্পা কঠিন ভাবে বলে, যেমন ইচ্ছা বসতে পারেন। শোনাবার দরকার নেই। মানুষ কি পাথর কি গাছ—আমি তাকিয়েও দেখব না।

বসে পড়ল প্রদীপ। সঙ্কুচিত হয়েই বসল। চুপচাপ আছে।

থাকতে না পেরে শম্পা বলে, কি বলতে চান বলুন এবারে।

এগারোটায় এসে নেমেছি, সেই থেকে ঘোরাঘুরি। পা টনটন করছে, না বসলে উপায় ছিল না।

পিছনে ঠেসান দিয়ে প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল। কত ক্লান্ত হয়েছে বোঝা যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখার সুবিধা পেল শম্পা। সুশ্রী তরুণ, চেহারায় অপরূপ উজ্জ্বলতা। এত উদাসীন ভাব না দেখালেও হত। কিন্তু মনটা আজ বড় মুষড়ে আছে, ক্ষিপ্ত হয়ে আছে মনে মনে।

শম্পা বলে, বসা তো হয়েই গেছে। কথাটা বলুন।

চোখ মেলে প্রদীপ ফিক করে একটু হাসল: কথাও আমার এই। আপনার এই পাশে একটুখানি বসবার দরকার।

শম্পা বলে, বসতে চাওয়া তো অন্যায়। লেখা রয়েছে, 'মহিলাদের জন্যে'।

মেয়ে হয়ে, আপনাদের বড্ড সুবিধা। যথা ইচ্ছা বসে পড়বেন, কোনরকম বাধা নেই। তার উপরে আলাদা নিজস্ব সিট তো রিজার্ভ করাই আছে। এখন যেটা দরকার হয়ে পড়েছে—

কৌতুক লাগছে প্রদীপের কথায়। যে ব্যথা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, অনেকখানি স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। শম্পা বলে, হ্যাঁ, দরকারটা কি শুনি?

জায়গা রিজার্ভ থাকবে পুরুষের জন্য—বেঞ্চির গায়ে তাই লেখা থাকবে। হচ্ছে না চক্ষুলজ্জায়, পুরুষেরা কর্তা বলে। জাত ধরে তাই আমাদের নিগ্রহ।

কথা ভাল করে শেষ হতে পারল না। আবার প্রদীপ চোখ বুজল। এবং কিঞ্চিৎ যেন নাসাধ্বনি।

ট্রাম চলেছে। ঘড়াং করে একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে থেমে আছে। যত মেয়ে হুড়মুড় করে নেমে যায়। সিনেমা-হাউস সামনে। অপরাহ্ণের এইগুলো সিনেমার ট্রাম, মোড়ে মোড়ে সাজগোজ করা মেয়েরা ওঠে। আরও কিছু পরে অফিসের ট্রাম—বিজীর্ণ মলিন কেরানিমশায়রা ঘরে ফিরবেন। প্রদীপ ঘুম ভেঙে এক লম্ফে নেমে পড়ে টিকিটের লাইন দিল।

টিকিট কেটে বেরিয়েও এল। এসে দেখে, শম্পা হাসিমুখে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

আপনিও এসেছেন?

শম্পা বলে, সিনেমা দেখতে বেরুইনি। এদিক-সেদিক বেড়াতাম, কিম্বা কোন বান্ধবীর কাছে গিয়ে বসতাম খানিক। আপনার জন্যে নেমে পড়তে হল।

কথাটা বেয়াড়া ভাবে বেরিয়ে গেল। সদ্যপরিচিত মানুষটা কোন অর্থ ধরে বসে—তাড়াতাড়ি শম্পা বিশদ করে বলে, আপনার এই ছাতার জন্য। ট্রামে ছাতা ফেলে এসেছিলেন। এমন ভুলো-মন নিয়ে কাজকর্ম করেন কি করে?

প্রদীপ একটুও অপ্রতিভ নয়। বলে, অন্য কিছু ভুলি না কখনো। শুধুমাত্র ছাতা। বৃষ্টি যদি না থাকল, ছাতা ঠিক ফেলে আসব। বছরে কতগুলো ছাতা যায়, তার লেখাজোখা নেই। নতুন ছাতা, আজকেই কিনেছি। আপনি এই দিয়ে দিচ্ছেন—হল থেকে বেরুনোর সময় খুব সম্ভব আবার ফেলে আসব।

শম্পা হেসে বলে, তবে দেব না। আমার কাছে থাকল এখন। আমিও ঢুকছি, বেরিয়ে এসে দিয়ে দেব। কিন্তু সামনের টিকিট কিনলেন কেন? চোখ কর-কর করবে, ভাল দেখতেও পাবেন না ঐ সিট থেকে।

দেখব না তো। অকারণে বেশি খরচা করলাম না সে জন্যে।

সবিস্ময়ে শম্পা প্রশ্ন করে, তবে ?

ঘুমোব। এয়ারকণ্ডিশন-করা ঘরে এত সস্তার মধ্যে বের করুন দিকি এমন একটা ঘুমোবার জায়গা।

দেখি টিকিটখানা।

ব্যাপার বুঝবার আগেই শম্পা ছোঁ মেরে টিকিট নিয়ে অদৃশ্য। ক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে, বদলে নিয়ে এলাম। আমার আপনার পাশাপাশি সিট। একা-একা ছবি দেখতে পারিনে, একজন কেউ থাকবে আমার সঙ্গে।

প্রদীপ বিরক্তভাবে বলে, আমি তো দেখবই না ছবি। ঘুমোব। বেশি দামের টিকিট কিনে খামোকা কতকগুলো পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন।

শম্পা বলে, আলো নেভানোর পর পাশের মানুষ ছবি দেখছে, না ঘুমোচ্ছে, না অন্য-কিছু করছে, সে তো আমি দেখতে যাব না। পাশে থাকলেই খুশি—আমি ভাবব, ছবিই দেখছেন।

একটুখানি হেসে বলল, সস্তা সিটে ছারপোকার কামড়ে ছটফট করতেন। পয়সা জলাঞ্জলি যায়নি—গদি-আঁটা ভাল চেয়ারে আরামেই ঘুম হবে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা দিল। হল অন্ধকার। তর্কাতর্কির সময় নেই। ঢুকে পড়ল শম্পা আর প্রদীপ।

ছবির শেষে লবীতে বেরিয়ে এসে প্রদীপ বলে, ছাতা দিন।

শম্পা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলে, অনেক উন্নতি। ভুলবেন না তো এবার ?

বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলে, বৃষ্টির সময়টা আমি ভুলিনে। দেখুন না অবস্থা।

বিষম বৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এখনো চলছে। আকাশে মেঘ উঠলেই তো কলকাতার রাস্তায় জল জমে। এখন সমুদ্র। ট্রাম এবং যানবাহন বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র যা চলতে পারে সে হল নৌকা। এবং ছোটখাট স্টিমারও বোধহয়।

ছাতাটা টেনে নিয়ে প্রদীপ এগিয়ে যায়। শম্পা বলে, বাঃ রে, আমি যাব না ?

যাবেন বই কি! আমার তাড়া আছে। ন'টার গাড়িতে ফিরতে হবে আমায়।

শম্পা বলে, কেমন করে যাব ? বৃষ্টি তো ধরবার লক্ষণ নেই।

প্রদীপ নির্বিকার ভাবে বলে, না ধরে তো পরের শো-এ বসে পড়বেন। ধরবেই একসময় না একসময়। কলেজ স্কোয়ারে বন্ধুর দোকানে জিনিসপত্র

রেখে এসেছি, দোকান বন্ধ করে তারা চলে যাবে। চললাম, কিছু মনে করবেন না।

শম্পা এবারে জোর দিয়ে বলে, সে হবে না। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবেন আপনি। নয় তো কলেজ স্কোয়ার অবধি এক ছাতায় যাই দু-জনে। মাঝে কোন রিক্সা-টিক্সা পেয়ে যেতে পারি।

হেসে বলে, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। যা ছুৎমার্গী আপনি!

আছে বৈ কি—আপত্তি সত্যিই আছে। শম্পার আপাদমস্তক প্রদীপ নিরীক্ষণ করে নেয় একবার। বলে, ছোঁয়াছুঁয়ির কথা হচ্ছে না। আয়নায় বপুখানি দেখে থাকেন তো। আপনি ছাতার নিচে এলে ছাতার বাইরে আমায় ভিজতে ভিজতে যেতে হবে। নিউমোনিয়ায় ধরবে। আচ্ছা, নমস্কার!

ফুটপাথে নেমে পড়েছে। কি মনে পড়ে আবার ফিরে আসে।

আপনার নাম-ঠিকানা দিন তো। চিঠি দেব।

কঠোর স্বরে শম্পা বলে, দরকার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও সায় দিয়ে বলে, তা বটে! এখান থেকেই তো কাজ চুকিয়ে যেতে পারি। রয়েছেও একটা পড়ে।

ফোলিওব্যাগ খুলে খামের চিঠি বের করল। বলে, নাম লেখা আছে, তাকে পাওয়া গেল না। কেটে নিজের নাম বসিয়ে নেবেন। গেলে বড্ড খুশি হব। এই কলকাতার উপরেই, বাইরে যেতে হবে না।

শুভবিবাহ-ছাপা নিমন্ত্রণের চিঠি। প্রদীপ চলে গেছে। বাইরে ধারা বর্ষণ। চিঠি খুলে নেড়ে-চেড়ে দেখে। কনে—রেবা সরকার।

পাত্রের নাম—শম্পার মনে পড়ল, মামার চিঠিতে অনেকবার নাম পড়েছে—প্রদীপকুমার দত্ত।

বধূ, ভগবান ও যম

অনেকদিন পরে কাল রাত্রে দেশে ফিরেছি। ভোরবেলা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠি। সামন্ত-বাড়ি কান্নার রোল। সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেলাম। সমীরণ সামন্তের মা বুড়োমানুষ—কাকিমা বলে ডাকি। আমায় দেখে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

হয়েছে কি কাকিমা?

সমীরণ মারা গেছে।

আমি স্তম্ভিত। রাত্রে এসেছি, এত বড় কথাটা কেউ বলল না! সামন্ত-কাকা মারা গেলেন, সমীরণ তখন পাঁচ বছরের। তারপরে তারও টাইফয়েড। একুশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি। যুবা বয়স তখন আমার, রাতের পর রাত জেগেছি এই কাকিমার সঙ্গে। যম পরাস্ত হয়ে পালাল। বছর দুই আগে বিয়ে হয়ে গেছে সমীরণের। আমি সেই সময়টা বিষম জরুরি কাজে আটকা। আসব না, আসার কোন উপায় নেই। কাকিমাও নাছোড়বান্দা। চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছেন—একফোঁটা বয়সে বাঁচিয়ে তুলেছিলে, সংসারধর্মে মতিও তোমার কথায় হল। তুমি সামনে না থাকলে কখন পাকছাট মারে বলা যায় না। সম্বন্ধটা তাহলে ভেঙে দিতে হয়। হোক তাই, তোমার যদি সেই রকম ইচ্ছা।

সমস্ত ফেলে চলে এলাম কাকিমার জেদাজেদিতে। বরকর্তা হয়ে বিয়ে দিয়ে আনলাম। ফুটফুটে কচি বউটা—আহা রে, তারই বা কী দশা এখন!

বড় সংছেলে সমীরণ। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কাকীমা তার গুণের কথা বলছেন। মাকে সে চোখে হারাত। একবার কাকিমাকে বিছেয় না কিসে কামড়েছিল। একফোঁটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বিল ভেঙে ওঝার বাড়ি ছুটল। ইনিয়ে-বিনিয়ে এমনি সব বলে যাচ্ছেন। পুরনো দিনের কত ঘটনা। তুচ্ছ জিনিসটাও বড় হয়ে আজ চোখের উপর ভাসে।

আচ্ছন্ন হয়ে বসে বসে শুনি। এ কী, সমীরণের বউ এক পেয়ালা চা আমার সামনে রেখে প্রণাম করে ধীরপায়ে চলে গেল। এই বয়সের বউরা যেমনধারা সাজগোজ করে অবিকল তাই, বিধবার লক্ষণ দেখা যায় না। কাকিমা-ই সাজ বদলাতে দেন নি, বুঝতে পারি। একমাত্র ছেলের বউ নিরাভরণ হয়ে সামনে ঘুরবে, সে বড় মর্মান্তিক—ছেলে নেই, পলকে পলকে সেই শোক মনে তুলে দেবে।

ক্ষণ পরে, কী আশ্চর্য, খোদ সমীরণই ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়ার গায়ের একটা ভেরেণ্ডার ডাল ভেঙে নিল। চোখ কচলে ভাল করে দেখে নিই—সমীরণই। আমি যেন কে না কে—একটি কথাও না বলে মুখ ফিরিয়ে দাঁতন করছে।

কী সমীরণ, আমায় চিনিস নে বুঝি?

সমীরণ জবাব দেয়: মরে গেছি তো শুনলে। মরা মানুষ হয়ে কোন আক্কেলে জ্যান্তদের কাছে যাব বল!

ঝগড়াঝাটির ব্যাপার অতএব। কাকিমাকে ধমক দিই: ঘাবড়ে

দিয়েছিলে। অমন কথা বলে কখনো—বিশেষ এই নিজের ছেলের সম্বন্ধে! একমাত্র ছেলে তোমার।

কাকিমা ডুকরে কেঁদে ওঠেন: মিছে বলিনি বাবা। নিজের ছেলে আর নেই। মরে গেছে, মরা ছাড়া কী আর বলি! এতদিন সে ছিল বটে আমার—

চা দিয়ে বউ রান্নাঘরে ঢুকেছে। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, সাধ-আহ্লাদের ছেলে ঐ হারামজাদী গুণ করে নিয়েছে। কাল সমস্ত দিন একাদশী করে আছি—তা একবার যদি তাকিয়ে দেখে, মা-বুড়ি থাকল কি মরল।

সমীরণ সকাতরে আমার দিকে চেয়ে বলে, শুনলে তো? জানতাম, সাতকাণ্ড রামায়ণ শুরু হল বলে। সেই লজ্জায় লুকিয়ে বসেছিলাম। গতিক যা দাঁড়িয়েছে, একদিকে ছুটে বেরুব। উঃ, কী সর্বনাশ যে করেছ দাদা—এবারে কিছু বলতে এলে কথা রাখব না।

কাকিমা করকর করে ওঠেন: কাল ছিল না আমার একাদশী? বল্ ভেড়াকান্ত, তোর মুখেই শুনি।

রাত্রে সেজন্য ছানা আর মিষ্টিমিঠাই এনে দিয়েছি—এনেছি কিনা সেটাও বল দাদার কাছে।

সে বুঝি আমার জন্যে? সমীরণের কথার জবাব কাকিমা আমায় উদ্দেশ করে দিচ্ছেন: কোঁচার তলে মালসা ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যের পর বাবু টিপিটিপি ঘরে গিয়ে উঠল। বুড়ো হয়েছি বলে ভেবেছে চোখও গেছে। এক মালসা রসগোল্লা বউকে ধরে ধরে গিলিয়েছে। একেবারে না দিলে মন্দ দেখায়—পাথরের বাটিতে করে এই টুকু টুকু চারটে গুলি ঠকাস করে আমার সামনে ফেলে গেল। মিঠাই বলে তাই আবার খোঁটা দিতে এসেছে তোমার কাছে!

ধৈর্য হারিয়ে সমীরণ গর্জন করে উঠল: এনেছি মোটমাট ছটা, তাই এখন পুরো মালসা হয়ে গেল। তুমি একবার বসন্ত ময়রার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ দাদা। সে তো অচেনা মানুষ নয়, তোমার কাছে মিথ্যাও বলবে না।

আমিও রাগ করে বলি, মিষ্টিমিঠাই বাড়ি এলে বউ খাবে না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাবে এই বুঝি তোমার বিচার কাকিমা! খেয়েছে, বেশ করেছে। ছিঃ!

কাকিমা বলেন, আমি খেতে দিই না? কত পর-অপর বলে আমার বাড়ি চিরকাল আমার কাছ থেকে নিচ্ছে খাচ্ছে—

দেখেছি বলেই তো বলি। কচি মেয়ে বাপ-মা ভাই-বোন ছেড়ে তোমার বাড়ি এসেছে—

কাকিমা আবার জ্বলে উঠলেন: কচি ঐ চোখেই দেখতে। মিটেমিটে শয়তান, বিষপুঁটুলি। বাইরে থেকে একদিন এসে কি বুঝবি? দুটো বছরের মধ্যে ছেলে আমার পর করে দিয়েছে। সাত নয় পাঁচ নয়, পেট-মোছা কোল-মোছা এক ছেলে আমার—

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সত্যি তো চোখে দেখেছি, কত কষ্টে মানুষ করেছেন সমীরণকে। একটা দিনের ছবি ভুলতে পারিনে। ক্রোশ দুই দূরে বড়-ইস্কুল। বৈশাখমাসে মর্নিং-ইস্কুল—খুব ভোরবেলা আকাশে পোহাতি তারা থাকতে ছেলেরা রওনা হয়ে পড়ে। ঝড় হয়ে গেছে, শেষরাত্রে উঠে আম কুড়োতে গেছি। দেখলাম, কাকিমাও ছেলেদের পিছু পিছু যাচ্ছেন। মাঠের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—বড় মাঠ ধীরে ধীরে পার হয়ে তারা বড়রাস্তায় উঠল। একা নয় সমীরণ, চার-পাঁচ জনে বেশ একটা দল হয়ে যাচ্ছে। কাকিমা নিশ্চল মূর্তি হয়ে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছেন না এত দূর থেকে—কিন্তু নিশ্চিত জানি, দুটি চোখের পলকহীন দৃষ্টি সমীরণের উপর সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কখনো যদি ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, খর দুপুরে একবার বাড়ি একবার ঐ মাঠ করে বেড়াতেন, তা-ও দেখেছি।

কাকিমা বলছেন, এই দেখ বাবা, আমার পরনের কাপড়ের দিকে তাকাও একটিবার—

সমীরণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, কী মহাপাপের ফল ভুগছি, দেখ দাদা। যে আসে তাকে ঐ ছেঁড়া কাপড় দেখাবে। ও-জিনিস সেই জন্যেই পরে থাকে। নতুন কাপড় এনে দিলাম, ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলল।

ফেলব না? কী কাপড় এনেছিলি, সেটাও বুকে হাত দিয়ে বল। হাতে নেই, বহরে নেই, জালের মতন একটু জিলজিলে ছেপটি। তেমন কাপড় মানুষ রাস্তার কানা-খোঁড়াকেও ভিক্ষে দেয় না। বউয়ের বেলা তো জোড়ায় জোড়ায় বেনারসি-বোম্বাই। ঘেন্নার জিনিস, মা হয়ে কি জন্যে তবে নিতে যাব?

সমীরণ বলে, যে কাপড় পরে ঐ যে তোমার চা দিয়ে গেল। জোলার বোনা ডুরেশাড়ি—তাই নাকি বেনারসি-বোম্বাই। যা অবস্থা করে তুলেছে, কোনদিন আত্মঘাতী হব। মনের সাধে বউকে তখন বিধবার থানকাপড় পরাবে। সেই ক'টা দিন একটু ক্ষমা দিতে বল দাদা।

একটুখানি দম নিয়ে আবার বলে, এই ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেই সেবারে

'বেরিয়ে পড়ছিলাম। তোমরা সেটা হতে দিলে না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও জুটে গেলে। বিয়ে আমি করতে চাই নি। দেখেশুনে মা-ই মেয়ে পছন্দ করল। কলকাতার কাজকর্ম ফেলে তুমি তার উপর এসে পড়লে।

কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কনে চিনতে ভুল করেছি। ভালঘরের মেয়ে বলে আনলাম, ঘরে তুলে দেখি ডাকিনী। ডাকিনীর হাতে পুত্র সমর্পণ করলাম, এর চেয়ে যমের হাতে দিলে ভাল ছিল। সেই যখন টাইফয়েড হয়ে একুশ দিন একুশ রাত্রি লড়ালড়ি চলল—

আমার উপর হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেন: তুমিই তো ডাক্তার-কবরেজ ওষুধপত্তর টাকাপয়সা নিয়ে এসে পড়লে। আমার এই বুড়োবয়সের খোয়ারটা দেখবে বলে বুঝি? ডাকছি সেই যমকে—একবার ভুল হয়েছে, আর হবে না। যম এসে নিয়ে যাক, মনকে তাতে প্রবোধ দিতে পারব।

আর একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। সমীরণের বিয়ের মাস পাঁচ-ছয় আগেকার কথা। সামন্তবাড়ি এমনি কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। কাকিমা বুক ছেড়ে কাঁদছেন: পেটের ধন এক ছেলে—সে না থাকলে কাকে নিয়ে আমার সংসার করা। কান্নার মধ্যে অনেক সুরে অনেক কথা বলছেন—প্রধান কথাটা এই।

আমার মুশকিল, বড় এক জটিল মামলার দলিলদস্তাবেজ নিয়ে বসেছি, দলিলের স্থূল কথাগুলো সতর্কভাবে টুকে নিতে হচ্ছে। উঠব বললেই ওঠা যায় না। জীর্ণ কাগজ যথোচিত যত্নে তুলেপেড়ে রাখা অনেকক্ষণের ব্যাপার।

গ্রামের একজনকে মুহুরি হিসাবে রেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদেন কেন কাকীমা, কী হল? কী সমস্ত ঐ বলছেন—

সামন্তবাড়ির অদূরে বিশাল দীঘি। ধ্বক করে আমার জলের কথাটাই মনে হয়: দীঘিতে ডুবেটুবে গেল নাকি?

দীঘির দু-শ হাতের মধ্যে সমীরণ যায় না। জলের নামে ভয়। সদরে জজের সেরেস্তায় একটা চাকরি হয়েছিল—নৌকোয় স্টিমারে জলের উপর দিয়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে গেলই না সেখানে?

গাছ থেকে পড়ল না তো? উঠোনের 'পরেই তো গোলাপখাস-গাছ।

মুহুরি বলে, বাপ-পিতামহ দোতলায় ঘর তুলে গেছেন, জ্ঞান হবার পর সে ঘরেই গেল না কখনো। চামচিকে আর ইঁদুরের বাসা হয়ে আছে। উপরে উঠলে মাথা ঘোরে। গাছে চড়বে সেই মানুষ, তবেই হয়েছে! উঠোনের ঐ নিচু গোলাপখাসের আম পাড়তে মা-বুড়ি পাড়ানি ডেকে ডেকে হয়রান।

তবে কান্না কিসের—এই আকাশ-ফাটানো কান্না? পুলিসের হাঙ্গামায় পড়ল না তো? বেচারামের বউটা সেবারে এমনি মাথা-ভাঙাভাঙি করছিল। অনেকদিন আগে আমার ছেলেবয়সে অহিভূষণের পিসিমাকেও ঠিক এমনি ডাক ছেড়ে কাঁদতে দেখেছিলাম।

বহুদর্শী মুহুরি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল: উহুঁ, তা কেন হবে? বেচারাম সিঁধেল চোর, সিঁধের মুখে ধরা পড়ল। হাতকড়ি পরিয়ে টানতে টানতে বাড়িতে বউয়ের কাছে নিয়ে গেল। অহিভূষণ স্বদেশি। পুলিস রিভলভার পেল, আর বন্দে মাতরম্-লেখা নিশান। সমীরণ সৎ ছেলে, ঐসব কোন ঝামেলায় নেই। চুরি করে না, স্বদেশিও করে না। তাকে পুলিসে কেন ধরতে যাবে?

কাকিমার কান্না আরও তীব্র হয়ে কানে বাজে: তুই গেলে কী নিয়ে থাকব রে বাবা—

চলে যাচ্ছে নিশ্চয় কোনখানে। চাকরিবাকরি করতে বিদেশ যাচ্ছে, তা-ও হতে পারে। কি বল মুহুরিমশায়?

মুহুরি বলে, তা হলে কাঁদতে যাবে কেন? বুড়ি তো চাচ্ছে তাই। বলে, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে রোজগারপত্তর কর, বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে আসি—

আর্তনাদ ক্রমেই বাড়ছে। যাওয়া উচিত, তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গোছাই এমনি সময় দেখি, অমূল্য ডাক্তার যাচ্ছেন সেইদিকে।

শুনুন, ও ডাক্তারবাবু, অসুখবিসুখ নাকি সমীরণের?

মুহুরি জুড়ে দিল: জীবনের আশঙ্কা আছে?

অমূল্য ডাক্তার হনহন করে আমার দিকেই চলে আসেন। ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, হবেই যদি অসুখ—টি-বি, ক্যান্সার, থ্রম্বসিস, যার চেয়ে বড় অসুখ নিদানে নেই—তা বলে, জীবনের আশঙ্কা? এই অমূল্য সিংহ হোমিওপ্যাথি-বাক্সসহ গ্রামের উপর বর্তমান থাকতে? শহর থেকে ডাকাডাকি—সিভিল-সার্জন অবধি হাতে ধরে বললেন, বসে যান এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি আমরা। তবু গ্রাম ছেড়ে নড়িনে। কেন? আমার জ্ঞাতগুষ্ঠি গ্রামবাসী—আমি চলে যাবার পর একটি প্রাণী আর বেঁচে থাকবে? যমদূতের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি। মহামারী জলস্তম্ভ খাণ্ডবদাহনে দুনিয়া উৎসন্ন হয়ে যাক, এ গাঁয়ের গাছের পাতাটি খসবার উপায় নেই। আপনি তো গাঁয়ে থাকেন না, যারা সব আছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ডাক্তার চলে গেলেন। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে আমিও উঠলাম।

কাকিমার আর্তনাদে দস্তুরমতো ভিড় জমে গেছে। ঠিক আজকের মতোই গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হয়েছে কি কাকিমা?

ভগবানে পেয়েছে সমীরণকে। সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।—ভিড়ের মধ্যে ভস্ম-মাখা সাধু বিশালানন্দ। সেইদিকে কাকিমা কটমট করে তাকালেন।

ভাল ছেলে তোমার কাকীমা। ভগবান পাদপদ্মে টেনেছেন—তাই নিয়ে কান্নাকাটি করে তুমি লোক জমাচ্ছ? ছিঃ!

কাকিমা লজ্জা মানেন না। সাধুর দিকে চেয়ে বলেন, ছেলে আমার এমন ছিল না কস্মিনকালে। ঐ বাবাজি ফুসমন্তর দিয়ে করেছে।

ভালই তো, চতুর্দিকে যা-সমস্ত হরদম দেখি—সন্তান বাঁদর-বদমায়েশ হয়ে বাপ-মায়ের হাড় ভাজা-ভাজা করে দিচ্ছে। ভগবানে মতি গেছে, এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?

কাকিমা বলেন, ভগবান কি চাকরি দেবেন, খেতে পরতে দেবেন? এক ছেলে আমার, বিয়েথাওয়া দিয়ে খালি সংসার ভরভরন্ত করব—কতদিনের সাধ। ভগবান গোড়াতেই তো বাগড়া দিয়ে বসলেন।

পুনশ্চ বিশালানন্দকে দেখিয়ে বলেন, সে বটে বাবাজিদের পোষায়। রজতকান্তি রায়ের বাড়ি আস্তানা, ভগবান বানের জলের মতো দিচ্ছেন রায় মশায়দের। আমাদের এই এঁদো ঘরবাড়ি—কোন্ দুঃখে ভগবান মরতে আসবেন? ঢুকতেই তো মাথা ঠুকে যাবে।

হাতে জপের থলি। বললেন, নামজপ করছিলাম একটু পুকুর-ঘাটে বসে। নেত্যর মা গিয়ে বলল, দেখ গিয়ে ও ঠাকরুন, ছেলে তোমার সন্ন্যাসীঠাকুর ভাগিয়ে নিয়ে চলল। জপ ছেড়ে ছুটে এসেছি। ইহকাল তো দুঃখকষ্টে দাসীবৃত্তি-চেড়ীবৃত্তি করে গেল—পরকালের একটু সুরাহা করে নেব, সে কি আর হতে দেবে হতচ্ছাড়া বাবাজি? তোমরা সব এসে পড়েছ বাবা—এই জন্যেই চেঁচামেচি করছিলাম। জপটা তাড়াতাড়ি সেরে আসিগে এইবার। বাবাজির সঙ্গে তোমরা বুঝসমঝ করতে লাগ। ফিরে এসে তখনো যদি ছাইমুখোটাকে দেখি, খ্যাংরা-পেটা করে ছাড়ব। ওর ভগবানের নিকুচি করেছে!

কাকিমা অন্তর্হিত হলে বিশালানন্দকে চুপিচুপি বলি, সরে পড়ুন বাবাজি। কাজ নেই সমীরণের পারত্রিক মঙ্গলে। এক্ষুনি যদি বিদেয় হন—এই পাঁচ টাকা। জপ সেরে কাকিমা ফিরলে কি হবে জানিনে। ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ঠেকাতে পারবেন, তা-ও কিন্তু ভরসায় আসে না।

বিশালানন্দ বুদ্ধিমান, প্রস্তাবটা বুঝে দেখলেন তিনি। আশীর্বাদ করে পাঁচ টাকা দক্ষিণা নিয়ে দ্রুত নিক্রান্ত হলেন।

কাকিমা এসে বললেন, বিশ্বাস নেই বাবা। চলে গেছে, কিন্তু রজত-কান্তির বাড়িতে তো রয়ে গেল। আড়ালে আবডালে ফুসফুস-গুজগুজ করবে। কনের জোগাড় দেখ তুমি, সাদামাটা যা-হোক একটা হলেই হল। বিয়ে সামনের বোশেখে। যমের হাত থেকে বাঁচালে তো ভগবানের হাত থেকে বাঁচাও এবারে।

কনে আমায় দেখতে হয়নি, কাকিমাই সব করলেন। আজকে সেই কনের হাত থেকে যমের হাতে পুনশ্চ চালান করার কথা বলছেন। তাতেই নাকি অধিক সান্ত্বনা।

গয়না

চণ্ডেশ্বর মিত্তির ব্যাপার-বাণিজ্যে নতুন পয়সা করেছেন। একমাত্র মেয়ে তুলসীমঞ্জরী। ধুমধাম করে রায়বাড়ির ছেলে নীলকণ্ঠের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

তারপর থেকেই চণ্ডেশ্বর নিজের গাল চড়াচ্ছেন: রায়েদের অট্টালিকাই দেখলাম! ভিতরে চামচিকের বাসা, সে খবর আর নিলাম না। আসবাবপত্তোর যৌতুক দিয়েছি, মেয়ের গা-ভরা গয়না। কিছু কি আর থাকবে? বেচে খাবে দু'দিনে।

এক রাত্রে ঘুম ভেঙে তুলসী দেখে, নীলকণ্ঠ বিছানায় নেই। এমনি রীতি আছে বটে এদের বংশে—নীলকণ্ঠের এক খুড়িমা শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন। নয়নতারার কাছে শোনা। তুলসীর সমবয়সী মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে এই বাড়িতে আছে। নয়ন সাবধান করে দিয়েছে: রায়বাড়ির ছেলে সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না। নজরে নজরে রাখবি ভাই, বেচাল কিছু করে না বসে।

তুলসী মুখ টিপে হাসে। বাঘ হোক যাই হোক, গুবগুঞ্জনটা শুনিস যদি আড়ি পেতে! এর জন্যেও তুলসীর মনে মনে বেদনা—লম্বা চওড়া বিরাট-পুরুষটি ডাকিনীমন্ত্রে বুঝি নিরীহ মেষ হয়ে গেছে। ধিক্কার আসে তার নিজের উপরে।

কিন্তু আজ রাত্রে নীলকণ্ঠ ঘরে নেই। তুলসীর ভয় করে। এই বিপুলায়তন কক্ষ, অত্যুচ্চ ছাত—মনে হয়, এক রাক্ষসের বিশাল ভয়ঙ্কর জঠর। তার মধ্যে তুলসী তিলে তিলে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আওয়াজ পাওয়া যায়—খুটখুট খুটখুট। নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে যেন ঘুমন্ত

অট্টালিকার বুকের ওঠানামা। উৎকর্ণ হয়ে তুলসী শোনে। কক্ষের বাইরে আলসের উপরে আওয়াজ। এক একবার ঘরের চৌকাঠ অবধি চলে আসে—এসেই দূরের দিকে চলে যায়। সর্বনাশ, খোলা দরজা হা-হা করছে। নীলকণ্ঠ দরজা খুলে চলে গেছে।

উঠল তুলসী। দরজা বন্ধ করবে। রাত্রিশেষের চন্দ্রালোক তেরছা হয়ে পড়েছে আলসের উপর। নীলকণ্ঠের মুখে এক একবার পড়ছে আলো। পদচারণা করছে সে। কোন প্রেতলোক থেকে যেন এসেছে—বুক কাঁপে স্বামীর এই মূর্তি দেখে। পাগল হয়ে এগিয়ে যায় তুলসী। গিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরল।

বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে নীলকণ্ঠ বলে, কি ?

তুলসী কেঁদে বলে, শোবে এস। আমার ভয় করছে।

বধূর সঙ্গে সে ঘরে ঢুকল। খাটে বসে বলল, গয়নাগুলো দেবে আমায় ?

কেন, কি বৃত্তান্ত—এত সব জিজ্ঞাসার সাহস নেই। ইচ্ছেও করে না। সম্ভবত বিষয়সম্পত্তি-ঘটিত কিছু, বন্ধক দিয়ে দায়মুক্ত হবে। সেই উদ্বেগে ঘুম নেই নীলকণ্ঠের।

ছাই গয়না! তুমি পাশ থেকে উঠে গিয়ে নিশি-পাওয়ার মতো সারারাত্রি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—রাজরাজেশ্বরী সেজে পড়ে থাকব আমি একলাটি! একটি কথাও না বলে এয়োতির চিহ্ন কঙ্কন দুটি মাত্র রেখে গয়না খুলে দিল।

নীলকণ্ঠ বলে, আরো—আরো যা আছে তোরঙ্গের ভিতর, সমস্ত চাই আমি।

তোরঙ্গ খুলে তা-ও বের করে তুলসী খাটের উপর রাখল। মধুর হেসে বলে, আর নেই।

ভাল করে সকাল না হতেই নীলকণ্ঠ গয়না নিয়ে বেরুল। সারাদিন দেখা নেই—সন্ধ্যার পর ফিরে এল অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়।

তা হোক, গয়না বিদায় করে দিয়ে তুলসী বড় খুশি। মন তৃপ্তিতে ভরা। রাতে যতবার জেগেছে—দেখে, ক্লান্ত নীলকণ্ঠ বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে, দুটি হাতে বেষ্টন করে আছে তাকে। যাকগে গয়না—এই তার নতুন গয়না হল। বরের দু'খানি বাহু পাটিহার হয়ে গলায় দুলছে, ভালবাসার মিষ্টি আবেশ সর্ব-অঙ্গ মনপ্রাণ জুড়ে গয়নার ঝিনিমিনির মতো বাজছে। গয়না যেন অহঙ্কারের বোঝা, অস্বস্তির বোঝা—ঐ এক ব্যবধান ছিল তার আর স্বামীর মধ্যে। বাধা ঘুচে গিয়ে এবারে অফুরন্ত মিলন।

বাড়ির সকলের ক্রমশ নজরে আসতে লাগল। গোপালের মা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে: তোমায় গা খালি কেন বউমা ?

খুলে রেখেছি। ভারি গয়নার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসে।

মেয়েমানুষের গায়ে গয়না ভারি! একি একটা বিশ্বাস হবার কথা? তায় কম বয়সের নতুনবউ বলছে।

নয়নতারার কাছে তুলসী বলে, তুলে রেখেছি ভাই। মা গো মা, যা ডাকাতি চারিদিকে, শুনে গায়ে কাঁটা দেয়।

নয়ন বলে, জোলো-ডাকাত—তারা তো গাঙে থাকে, নৌকোয় নৌকোয় বেড়ায়।

জলের উপর যখন নৌকোয় পাবে না, ডাঙায় উঠে এসে হামলা দেবে।

নয়নতারা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, এ বাড়িতে নয় কখনো। জানিস, তোর শ্বশুরই ছিলেন ডাকাতের সর্দার। তিনি মারা গিয়েই তো অবস্থা পড়ে গেল এদের।

কানাকানি বাড়ির বাইরেও চলেছে। দত্তদের মেয়ে নবদুর্গা এসে বলে—হয়তো বা পরখ করবার অছিলায়ঃ তোমার ঝুমকোজোড়া একবার দাও নতুনবউ। স্যাকরা এসেছে, তাকে দেখাব। ভারি সুন্দর হয়েছে। আমারও ঐ রকম চাই।

অগত্যা তুলসীকে স্বীকার করতে হয়ঃ গহনা ওঁর কাছে—

পুরুষমানুষের কাছে কি জন্যে গহনা? আছে তো, না চলে গেছে আর কোথাও? চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখ নতুনবউ। পুরুষকে বিশ্বাস করতে নেই। বিশেষ করে রায়বাড়ির পুরুষকে।

একদিন তুলসী সাহস করে নীলকণ্ঠকে বলে, গয়না কি বন্ধক দিয়েছ?

না, বেচে খেয়েছি—

চণ্ডেশ্বর মিত্তিরের কথাগুলো অবিকল। বধূর দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, কেন? এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন আজ?

এমনি—

ভয় পেয়ে তুলসীমঞ্জরী সরে গেল সামনে থেকে। নীলকণ্ঠের মনে কাঁটার মতো খচখচ করে। গয়নার কথাটা কেন তুলল বউ—গয়না নিয়ে ব্যঙ্গ করল তার দারিদ্র্যকে?

সজোরে সে তুলসীর হাত চেপে ধরল নিভৃতে পেয়েঃ জবাব দাও—

ঠারেঠোরে লোকে নানা কথা বলছে। তুলসীর সমস্ত কানে আসে। শুনে শুনে সে-ও কঠিন হয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, বিক্রি না করে গয়না যদি বন্ধক দিতে, ফিরে পাবার তবু উপায় থাকত।

কি উপায়? বড়লোক বাপের হাতে-পায়ে ধরে ছাড়িয়ে আনতে?

হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন? সাধআহ্লাদের জিনিস, টের পেলে বাবা নিজে থেকেই ছাড়িয়ে দিতেন।

বলতে বলতে তুলসীমঞ্জরী থমকে যায়। কী রকম তাকাচ্ছে—দৃষ্টির আগুনে পুড়িয়ে মারবে যেন তাকে! আকুল কণ্ঠে তুলসী বলে, গয়না চাইনে আমি, চাইনে। কথার কথা—একটা ঠাট্টা করলাম গো। আমার ঘরের খবর বাবাকে জানাতে যাব কেন? কিসে তিনি টের পাবেন?

নীলকণ্ঠ বলে, বেচে দিয়েছি যখন, ঠিক সেই জিনিস তোমায় দিতে পারব না। কিন্তু গয়নায় তোমায় ঢেকে ফেলব, গয়নার বোঝায় তোমায় গুঁড়িয়ে দেব। এই আমি কথা দিলাম আজকে।

সন্ধ্যা হলেই নীলকণ্ঠ রায়কে আর বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা যায় না। ফেরে শেষরাত্রির দিকে। তুলসী বিজন অলিন্দে চুপচাপ বসে থাকে দূর-বিস্তৃত বিলের দিকে চেয়ে। লোকের সাড়া পেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। নীলকণ্ঠকে দেখলেই সরে যায়। কথাবার্তা একেবারে বন্ধ।

একদিন নীলকণ্ঠ পথ আটকে দাঁড়াল। কেশে গলা সাফ করে অহেতুক কৈফিয়ৎ দেয়: পাশা খেলতে খেলতে রাত হয়ে যায়। সত্যি, বড্ড নেশায় ধরেছে। নেশা কাটিয়ে উঠতে হবে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে তুলসী এঁকে বেঁকে ছুটে পালাল। নেশা তো বটেই! কিন্তু কাটাবে কি—বেড়েই চলেছে দিনকে-দিন। আগে রাতের মধ্যে ফিরত, এখন এক একদিন বেলা উঠে যায়। দশের চোখের উপর দিয়ে, দেখ দেখ, নৈশবিহার অন্তে নীলকণ্ঠ রায় বাড়ি ফিরছে—

তার উপরে গোপালের মা মাঝে মাঝে প্রবোধ দিতে বসে: সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল, আহা! চুল বাঁধো না, খাওয়াদাওয়ার যত্ন নাও না। বংশটাই এমনি এদের। এ বাড়ির বউদের কত চোখের জল পড়েছে, তার কোন লেখাজোখা নেই।

কিন্তু এ হল চণ্ডেশ্বর মিস্তিরের মেয়ে—ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মরে গেলেও চোখের জল ফেলবে না—অন্তত এদের এই অলিন্দে বসে নয়। তুলসীমঞ্জরী বাপের-বাড়ি চলে গেল, এ পাপ-পুরীতে দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঝিনঝিন ঝুমঝুম গা-ভরা গয়না নিয়ে তুলসী বাপের-বাড়ি থেকে ফিরছে। বাড়ি ফিরে তুলসী সকলের আগে পড়বে নীলকণ্ঠের দু'টি পায়ে। দু'পায়ে মাথা গুঁজে সারাক্ষণ পড়ে থাকবে। যতক্ষণ না আদর করে তুলে ধরে বুকের উপর! বুকে নিয়ে সে তুলসীর নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে!

এই তুমি! আমায় কিছু জানতে দাও নি—তাই তো আমার বড়

অভিমান! কত নোংরা কথা ভেবেছি, ছি ছি, তোমার সম্বন্ধে! দূর করে দেব গোপালের মাকে। ইহজীবনে মুখ দেখব না আর নয়নতারার।

তুলসীকে হঠাৎ দেখে চণ্ডেশ্বর খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন, জামাই তোর সমস্ত গয়না আমার কাছে ফেরত দিয়ে গেছে। গয়না সে নেবে না।

তুলসী বলে, আমিই খুলে দিয়েছিলাম। নতুন গয়না দেবেন উনি আমায়, তোমার গয়না নিতে যাব কেন?

আমার হল কিসে? ও সব তো বিয়ের যৌতুক দিয়ে দিয়েছি।

মেয়ের ঠোঁট কাঁপে অভিমানে: কেন বলেছ তবে ঐ সমস্ত? গয়না বেচুক আর জলে ফেলে দিক—দিয়ে দিয়েছ যখন, ফিরে তাকাবে কেন তুমি সেদিকে?

তোদের কাছে বলতে গিয়েছিলাম? মনের ভাবনা তোরা কেন কানে নিতে যাবি? আবোল-তাবোল কতই তো মানুষে ভাবে। বেশ, তোদের বাড়ি গিয়ে আমিই হাতে ধরে মাপ চাইব মানী জামাইয়ের কাছে।

এর উপর আর জবাব চলে না। গয়না নিয়ে তুলসীমঞ্জরী ফিরে চলেছে। একটি একটি ক'রে গয়নাগুলো গায়ে পরেছে। গলায় পরবার হারই হল পাঁচ-ছ'রকম। হোকগে—বেমানান হোক আর যাই হোক, সোনার বোঝা গায়ে চাপিয়ে ফিরে যাচ্ছি। একগাদা গয়না পরে সেই বিয়ের কনের মতো দাঁড়াব শ্বশুরবাড়ির অঙ্গনে। গয়নার রাশি ঝিকমিক করে দশের কাছে আমার বিজয়বার্তা শোনাবে। পুরনো রায়বাড়ির যত অখ্যাতিই থাক, তুমি অম্লান। অনেক উঁচুতে প্রদীপ্ত ঐ তারার মতো আমি যে কিছুতেই তোমার নাগাল পাচ্ছিনে—

তারার আলোয় মন্থর অলস বাতাসে তুলসীমঞ্জরীর পানসি দুলে দুলে চলেছে—পাশের জঙ্গল থেকে কালো কুমীরের মতো ছোট্ট ডিঙি ছুটে এসে পানসির গায়ে লেপটে গেল।···কি হল—অ্যাঁ। কারা তোমরা গো?

পানসিতে উঠে পড়ল লৌহ-মূর্তি আট-দশ জনা। উদ্দাম হাসি। গতিক বুঝে দাঁড়ি-মাঝিরা ঝপাঝপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল। কামরার ভিতরে থরথর কাঁপছে তুলসীমঞ্জরী।

বজ্রগর্জনে একজনে বলে, গয়না খোল।

তুলসী গুটিসুটি হয়ে গবাক্ষলগ্ন হয়ে গেল। এই গয়না এবং তার সকল সত্তা একেবারে এক বস্তু—বিচ্ছিন্ন করবার জো নেই।

দাও—

বাঘে যেমন শিকার ধরে, তেমনি লাফ দিয়েছে বউটাকে ধরবার জন্য—সোনার রাশি টেনে ছিঁড়ে গা থেকে ছিনিয়ে নেবে। তার আগেই তুলসী-

মঞ্জরী গবাক্ষপথে গাঙে ঝাঁপ দিয়েছে। আর দলপতি নীলকণ্ঠ এই সময়টায় ঢুকছিল কামরায়। ছাতে-ঝোলানো বেলোয়ারি-ঝাড়ের ঝলমলে আলোয় সে শুধু দেখতে পেল, রূপ আর সুবর্ণের হরিদ্রাতরঙ্গ তুলে এক চলবিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

ধরো, ধরো—

দুর্বার স্রোতে একবার ঈষৎ ঘূর্ণি উঠল। তারপর আর কিছু নেই। এক ঝাপটা হাওয়া বয়ে গেল। কিচির-মিচির করে চরের উপর গাংশালিক ডাকে। খলখল ক্রুর হাস্যে প্রমত্ত জোয়ারে নদী বয়ে চলেছে।

নীলকণ্ঠ কঠিন আদেশ দেয়: ঝাঁপ দিয়ে, পড়, খুঁজে বের করতেই হবে। জ্যান্ত কিম্বা মরা।

মেয়েটার যাই হোক, অত সোনা কিছুতে জলতলে নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া হবে না। সোনা চাই তার তুলসীকে সাজাবার জন্য। সাজাতে সাজাতে আসল কথা খুলে বলবে। গয়নার আদ্যন্ত ইতিহাস।

ডাকাতি

গ্রীষ্মের ছুটিতে জয়ন্তী মামার-বাড়ি এসেছে। আম ফলেছে খুব—দিদিমা পঙ্কজিনী চিঠিতে লোভ দেখিয়েছিলেন। আম খাবে, আর ছুটির বেড়ানো হবে। মামারা কেউ থাকে না। বড়মামা ভিলাই-এর ইঞ্জিনিয়ার, ছোটমামা পুনায়—মিলিটারিতে ঢুকেছে। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে, জোয়ান-যুবা কেউ ঘরে পড়ে থাকে না। পৈতৃক দালানকোঠা, বাগবাগিচা আগলে পড়ে রয়েছেন সেকালের দুটি মানুষ—দাদু আর দিদিমা। দালানের ইট-কাঠ খসে খসে পড়ছে, উঠান অবধি জঙ্গল এঁটে এসেছে। বড়ছেলে বাসায় নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি—জনরব, জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় কলসি ভর্তি বাড়ির কোন একখানে পোঁতা রয়েছে—সেই বস্তু ছেড়ে কর্তাগিন্নির নড়বার উপায় নেই।

জয়ন্তী এল অনেক দিন পরে। নাতনির গায়ে-মাথায় পঙ্কজিনী আদরে হাত বুলান: একেবারে নতুন মানুষ হয়ে এলি দিদিভাই। রূপ যে অঙ্গে ধরে না।

কাশীনাথকে কলকণ্ঠে জয়ন্তী বলে, দিদিমা কি বলে, শুনতে পাচ্ছ দাদু? তবু কিন্তু দু-বছর ধরে বর খুঁজে খুঁজে বাবা হয়রান। তুমি রাজি হয়ে যাও লক্ষ্মী দাদু, আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে যাক।

পঙ্কজিনী ঝগড়া করেন: চিঠি লিখে লিখে নিয়ে এলাম, পেটে পেটে এত শয়তানি তোমার! আমারই উপর ডাকাতি?

কাশীনাথ বলেন, যৌবন বয়স ছিল—তা-ও তোর দিদিমা একদিনের তরে আমায় পছন্দ করেনি। তোদের আমলে এসে পাত্রের এত দুর্ভিক্ষ হয়েছে দিদি?

পাত্র থাকবে না কেন—শূন্যপাত্র সব, ঘা দিলে ঢনঢন করে বাজে। ভরা-পাত্র তোমার মতন সত্যিই মেলে না দাদু। তা বেশ, দিদিমা রাগ করছে তো ভাগাভাগি করে নিই। মানুষটা তুমি দিদিমার ভাগে যাও। মনের সাধে তোমায় নাওয়ান খাওয়ান, বাতের তেল মালিশ করুন— হিংসে করতে যাব না! আমার ভাগে চাই তোমার গুপ্তধনের কলসিটা। সোনার টাকা রূপোর টাকা দু-হাতে তুলে তুলে খরচ করব।

খিল-খিল করে হেসে উঠে আবার বলে, আমাদের হাল আমলের বিয়েয় শাড়ি-গাড়ি, টাকাকড়ির বন্দোবস্ত থাকলেই হল, বর না হলেও দিব্যি চলে। বরের বখেড়া যে বয়ে বেড়াই, মানুষটা মরজি মতন খরচার যোগান দিয়ে যাবে সেই জন্য।

অজ পাড়াগাঁ। পথ-ঘাট আলোহীন, বিদ্যুতের পাখা নেই, কল ঘোরালে জল পড়ে না—একটা মাস তবু যেন পাখনা মেলে উড়ে চলে গেল। বর্ষাটা বড় তাড়াতাড়ি নেমেছে এবার। ছুটিরও শেষ হয়ে এল। যাই-যাই করছে জয়তী—হেনকালে এক কাণ্ড। সকালবেলা দরজা খুলে দেখা গেল, ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ চৌকাঠের সামনে থান-ইট চাপা দেওয়া। পঙ্কজিনী ঠোক্কর খেতেন আর একটু হলে—পা দিয়ে ইট সরিয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। জয়তীকে বলেন, দেখ দিকি কিসের কাগজ। আমার তো আবার চশমা লাগবে।

দেখতে হবে কী আবার! ঝঙ্কার দিয়ে জয়তী উঠানে নেমে গেল। বলে, দিব্যি ছিলাম দিদিমা, উড়োচিঠি এদ্দিনে এই গাঁয়ের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

পঙ্কজিনী বলেন, কী লিখেছে, মানুষটাই বা কে—দেখতে হবে না?

জয়তী তেমনি অবহেলার ভাবে বলে, উড়োচিঠি দশ-বারোটা পেয়েছি এমন। না পড়েই বলে দিচ্ছি—আমা বিহনে জীবন অন্ধকার এবই বকমফের কিছু। কথা সব মুখস্থ—ঠিক কিনা মিলিয়ে দেখ।

উঠানের পাশে নিমগাছের ডাল ভাঙছে জয়তী। দাঁতন করবে। মামার-বাড়ির এই এক মাসে ষোলআনা গাঁয়েব মেয়ে সে এখন।

বলে, উড়োচিঠিতে নাম দেয় না। গাঁয়ের কোন্ মানুষটা লিখেছে, আমি কিন্তু বলে দিতে পারি। সেই যে একজন অকালের বাতাবিলেবু এনে দিল, আমি তাই দিয়ে ফুটবল খেললাম—

শোভন? পঙ্কজিনী জোরে জোরে ঘাড় নাড়েন: কক্ষনো নয়, হতেই পারে না। তেমন ছেলে শোভন আমাদের নয়।

জয়তী বলে, দেখ দিদিমা, বুড়ো হয়ে গেছ, প্রেমের খুঁটিনাটি তুমি কি বোঝ? যৌবনে জানতে বটে, সে সমস্ত কবে ভুলে মেরে দিয়েছ! একশ' মানুষের ভিতর থেকে বেছে আমি বলে দিতে পারি, কোন কোন চোখে প্রেমের চাউনি। তুমি আমার ভুল ধরতে এস না।

পঙ্কজিনী অগত্যা চশমা খুঁজে আনলেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে জয়তী বলে, বুঝেছি দিদিমা, তোমায় তো কেউ প্রেমপত্র দেয় না, পড়বার জন্য চাতকিনী হয়ে আছ। দাদুকে বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

চিঠি পড়ে পঙ্কজিনী কলরব করে উঠেন: ডাকাতের চিঠি—বাড়িতে ডাকাত পড়বে, একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে এই চিঠি রেখে গেছে। আগামী শনিবার ঘোর অমাবস্যা, ঐ দিন রাত্রি দশটা থেকে চারটার কোন এক সময় আসবে তারা। গৃহস্থ প্রস্তুত থাকবেন। টাকার কলসিটা যদি আপোসে বের করে রাখেন, নির্ঝঞ্ঝাটে দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে।

কাশীনাথ জয়তীকে বলেন, কলকাতায় আজই রওনা হয়ে পড় দিদিভাই। ছুটি আছে আরও আটটা দশটা দিন—কিন্তু উড়োচিঠির পরে একদণ্ডও থাকা চলে না।

জয়তী বলে, চিঠি বুঝি কলকাতায় যায় না! আমার কপাল—যেখানেই থাকব, চিঠি ছাড়বার মানুষগুলো কেমন টের পেয়ে যায়।

অবুঝ কথায় পঙ্কজিনী বিরক্ত হয়ে বলেন, সর্বনেশে চিঠি রে লাঠিসোটা, ছোরা-মশাল নিয়ে এসে পড়বে। তোর কলকাতার উড়োচিঠি নয় যে ছিঁড়ে ফেললেই চুকে গেল।

তা বই কি! চোখ বড় বড় করে জয়তী বলে, তোমারও বয়স ছিল দিদিমা, দেখতেও ভাল ছিলে, উড়োচিঠি পাওনি কখনো? তবে এমন বল কেন? চিঠিতেই চুকেবুকে যায় না, তারপরে আসে কবিতা। সে কবিতা লাঠি-ছোরার চেয়ে বেশি সাংঘাতিক।

ফিক করে হেসে বলে, হ্যাঁ দিদিমা, সত্যি কথা বলো কবিতা লেখেনি কোন প্রেমিক তোমায় নিয়ে?

মেয়েটা আস্ত-পাগল—এতবড় উদ্বেগের মধ্যেও এই সমস্ত কথা। ভয়ডর নেই, জেদ ধরে বলে, এমনি যদিই বা যেতাম এখন আর কিছুতে নয়। কলকাতায় চুরি হয় হরদম—ডাকাতি একেবারে নেই। ডাকাতি না দেখে আমি যাব না।

চিঠির কথা চাউর হয়ে গিয়ে পড়শিরা আসতে লেগেছে। শোভন নামে সেই ছোকরাও এসে গেল একবার। অনেকে প্রবোধ দিচ্ছে: ক্ষেপেছেন কর্তামশায়! সম্মুখযুদ্ধের কাল চলে গেছে। কলিযুগে চোরাগোপ্তা কাজকর্ম, খবর দিয়ে কেউ কিছু করে না। রসিকতা করেছে, আপনার তরাস দেখে হাসছে এখন সেই লোক।

শুনে জয়ন্তী রাগে গরগর করে: আমি বলে কত আশা করে আছি, রসিকতা বলে এখন ওঁরা ভণ্ডুল দিতে লাগলেন। আপনাদের কি—ঘাঁটির উপর বসত, শনিবারে না হল দু'মাস পরেই হবে। আমার যত-কিছু সবই এই ছুটির ভিতরে।

তখন জয়ন্তীর পক্ষ নিয়েও কেউ কেউ বলে, একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয় কর্তামশায়। ভেজাল কিসে নেই- উৎকৃষ্ট বাদশাভোগ চাল, তার মধ্যেও সের করা পনের-বিশটা কাঁকর। কলিযুগ মানি, তা বলে দুটো-পাঁচটা সত্যবাদী কি থাকতে নেই। সেকালে এই জিনিসই হত—আগেভাগে খবর দিয়ে রে-রে করে ডাক ছেড়ে আসত—নাম হল তাই ডাকাত। সেই রকম বনেদি ডাকাতের কোন একটা দল পুরানো রেওয়াজ ধরে কাজ করতে চায়। থানায় গিয়ে আপনি অন্তত খবরটা দিয়ে রাখুন। নইলে তাঁরা দুঃখ করবেন: দেখেছ, দেশভুঁই ছেড়ে পড়ে আছি, আমাদের একটা মুখের কথা বলবার পিত্যেশ নেই। চুরি-ডাকাতি খুন-জখম তাঁদেরই এক্তিয়ারে পড়ে - তাঁদের একবার জানান দিতে হয়।

জাঁদরেল ইনস্পেক্টর মহাদেব সেন থানা আলো করে আছেন। প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। দুটো দাগি চোর বিশাল দেহে তেল মাখাচ্ছিল। কাশীনাথের হাত থেকে উড়োচিঠি নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে মহাদেব রায় দিলেন: ঘুমোন গিয়ে।

ঘুম আসে কি করে এই অবস্থায়?

চটে গিয়ে মহাদেব বলেন, ভাল সর্ষের তেল কিছু কিনে নিয়ে যান, নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়বেন। আমার এলাকার মধ্যে চোর-ডাকাত হোক আর সাধুমোহান্তই হোক, কারো কিছু করবার জো নেই।

কথা না বাড়িয়ে তিনি স্নানে উঠে গেলেন। কী করেন কাশীনাথ, ফিরে যাচ্ছেন বিরসমুখে। পাশের দালানে সাব-ইনস্পেক্টর করালীকান্তের অফিস—হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন: আমাদের এই জায়গায় চরণ পড়ল—কী হয়েছে কাশীবাবু?

ডাকাতের চিঠি করালীকে দিয়ে কাশীনাথ বললেন, বড়বাবু তো ঘুমানোর হুকুম দিয়ে দিলেন, আপনি কোনটা বলেন শুনি।

আদ্যন্ত পড়ে চিঠি ফেরত দিয়ে হাস্যমুখে করালী বলেন, বড়বাবুর ভারী ভারী মক্কেল, ছোটখাটো কাজে ওঁকে নড়ানো যায় না। ডাকাত না আসে ভালই, কিন্তু এসে পড়লে তখনকার ব্যবস্থা কি? খানদানি ডাকাতের রীতিই এই। চুপিসারের কাজ হল চুরি—চোরকে ডাকাতে ঘেন্না করে, তাদের পাশাপাশি পাতা পেড়ে খায় না। জাতে এক হলেও ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া দেয় না চোরের ঘরে। আমার কথা যদি শোনেন, হেলা করবেন না। যেমন কুকুর তেমনি ধারা মুগুরের ব্যবস্থা রাখুন।

কাশীনাথ বলেন, একটা তো রাত্রি—আপনি দয়া করে যান যদি ঐ সময়।

করালী লুফে নিয়ে বলেন, দয়াধর্মের কি হল—আমাদের কর্তব্যই এই। লোকের বিপদে-আপদে দেখব, সরকার সেইজন্য মাইনে দিয়ে থানার উপরে পুষছেন।

একটুখানি ভেবে নিয়ে ফসফস করে কাগজে হিসাব কষলেন। বলেন, আপনাদের গাঁয়ের পথঘাট ভাল নয়, বিস্তর জলকাদা। সাইকেল চলবে না, ঘোড়ারও একটা পা জখম। পালকিতে যাব। আট বেহারা বারো আনা হিসাবে ছয়টাকা আর পালকি ভাড়া চার আনা। দু-জন সিপাহি নিয়ে যাব, তাদের বারবরদারি। সকলের খাওয়াদাওয়া চা-সিগারেটের বন্দোবস্ত রাখবেন। বাকি যা কথাবার্তা, সে সমস্ত সরকারি থানার উপর হওয়া ঠিক নয়। নিয়ম যা আছে, সেইমতো হবে। আপনি আপাতত পালকি-বেহারার খরচাটা দিয়ে চলে যান।

কাশীনাথ দোমনা হয়ে বলেন, টাকা তো নিয়ে আসিনি।

বেশ গিয়ে পাঠাবেন। আজকে না হয়তো কাল। তারিখ ধরে বসে থাকবেন না কিন্তু মশায়। চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে, এর মধ্যে অন্য কেউ এসে যদি রাহাখরচা জমা দিয়ে যায়, আপনাকে মুশকিলে পড়তে হবে।

কাশীনাথ বেরিয়ে পড়ছেন, করালী আবার ডেকে বলেন, চিন্তা নেই। গিয়ে পড়েছি শুনতে পেলে ডাকাত ও-মুখোই হবে না। একটা কথা—মশারির জোগাড় থাকে যেন। আর একটা পাশবালিশ। মাথার বালিশ না হলেও চলে, পাশবালিশ ছাড়া শুতে পারিনে। বদ অভ্যাস।

পঙ্কজিনী উদ্বেগে ঘর-বা'র করছেন। কাশীনাথ গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন: কী হল?

কাশীনাথ বললেন, রাহা খরচটা জমা দিলেই ছোট-দারোগা আসতে রাজি। কর্তব্যই তো ওঁদের এই। খাট-বিছানা মশারি-পাশবালিশের জোগাড় দেখ। শুয়ে থাকবেন, তাতেই ডাকাত আর এ-মুখো হবে না—বলে দিলেন।

জয়ন্তী বলে, খাঁটি কথা দাদু। ডাকাতে চেনে জানে ওঁদের। সিংহির মামা ভোম্বোলদাস, ডাকাতের মামা তেমনি ওঁরা। মামা এসে পড়েই তো গৃহস্থের যা-কিছু সম্বল কতক পেটে খেয়েছে কতক পকেটে নিয়ে পুরেছে—তারপরেও ডাকাত পড়বে কি ক'টা মেটে হাঁড়িকুড়ি আর ফুটো ঘটি-বাটির জন্যে? ডাকাতি করতে হলে তখন আর গৃহস্থের উপরে নয়, দারোগার উপর।

কাশীনাথও মনে মনে তাই ভেবে দেখছেন। আসতে পারে ডাকাত, আবার না ও তো আসতে পারে। আগেভাগে আপোষে তবে মামা-ডাকাতের হাতে গিয়ে পড়া কেন?

কর্তব্য না সারে কবালীর ওদিকে সোয়াস্তি নেই। সিপাহি পাঠিয়ে তাগাদা দেন: শনিবার এসে যায়, খবরাখবর দিলেন না। ব্যাপার কি?

কাশীনাথ মনস্থির করে ফেলেছেন: অত টাকা কোথায় পাই এখন? যা কপালে থাকে হবে।

টাকা নেই তো ডাকাত আসছে কেন?

নামটা আছে যে। টাকার কলসির বদনাম। কলসি চেয়ে ডাকাতে চিঠি দেয়, থানার লোক ভাবছে কলসির কথা। দু'দিনের তরে নাতনিটা বেড়াতে এসেছে— সে-ও কলসি-কলসি করে।

থানার সিপাহি ফিরিয়ে দিয়ে কাশীনাথ ভাবছেন, হাঙ্গামার ব্যাপারে সরকারি মানুষ একটু ছুঁইয়ে রাখা ভাল। গবর্নমেণ্টকে তাচ্ছিল্য করছেন বলে আইনের প্যাঁচে না জড়াতে পারে। ওদের ছেড়ে তখন চৌকিদারের বাড়ি চলে গেলেন।

শোন নটবর, চৌকিদারি-ট্যাক্স বাড়াতে বাড়াতে ছ-আনা থেকে পাঁচ সিকেয় ঠেলে তুলেছ। এই বিপদে সরকারি মানুষ তোমার সাহায্য করা উচিত।

নটবর তটস্থ হয়ে বলে, রাত্রে ঘুম হয় না— আপনার বাড়ি সারারাত আমি জেগে পাহারা দেব। বটার মা'কে একটিবার বলে যান কর্তামশাই।

বটা অর্থাৎ বটকৃষ্ণের মা—নটবরের বউ। তাকে ডেকে কাশীনাথ বললেন, শনিবার আমার বাড়ি ডাকাত পড়বে। চৌকিদার গিয়ে পাহারা দেবে, কথাটা তোমায় জানিয়ে যেতে বলল।

নটবরের বউ একগাল হেসে বলে, যাব আমি। আপনার মতন মানুষ দায়ে পড়েছেন, কেন যাব না? আমার বটকেষ্টও যাবে। ছোট ছেলে কার কাছে রেখে যাই?

কাশীনাথ অবাক হয়ে বলেন, কেন, তুমি যেতে যাবে কেন? তোমার কী কাজ?

বউ বলে, কাজ তো আমারই। নতুন বর্ষায় চৌকিদারের হাঁপানি চাগান দিয়েছে, সারারাত যেন কামারের হাপর টানে। আমিই তো বুকে মালিশ করে কোন গতিকে দমটুকু ধরে রেখেছি।

কথাবার্তা বলে কাশীনাথ চৌকিদারের বাড়ি থেকে ফিরছেন, শোভনের সঙ্গে পথে দেখা। সে বলল, ভালই হবে। বউ সত্যি কথা বলেছে, রাত্রের মধ্যে নটবর ঘুমোয় না। সর্বক্ষণ হাঁপানির টান—ঘুমোবে কেমন করে? পাহারা নিখুঁত হবে। মালিশের পুরানো-ঘিয়ের জোগাড় রাখবেন, বাড়ির উপরে নয়তো অপঘাত ঘটে যেতে পারে। তাদের ঐ বাচ্চা ছেলে বটকেষ্টকে নিয়ে যাচ্ছে—বিষম খেতে পারে কিন্তু। চামড়ার নিচে চাড়মাংস নেই, ফাঁপা বালিশের খোলের মতো। খাইযে খাইয়ে সেই খোল ভরাট করে রাখতে হয়। ক্ষিধে-ক্ষিধে করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে বসবে, তক্ষুনি চিঁড়েভাজা দিতে হবে।

বিপন্ন কাশীনাথ বলেন, বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম। কী করে ডাকাত ঠেকাই, ভেবে কোন হদিস পাচ্ছিনে। দিনও তো এসে গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, নিজেদের কথা বলি কি করে? অভিমান ভরে শোভন বলতে লাগল, এতজনকে এত রকমে খোশামোদ করছেন—আমরা যে রক্ষিবাহিনী সাজিয়ে গ্রাম জুড়ে মার্চ করে বেড়াচ্ছি, আমাদের একটি বার মুখের কথাটা বললেন না। না বললেও যায় আসে না। ঠিক আছে, আমাদের বাহিনী সারারাত সেদিন বাড়ি ঘেরাও করে থাকবে। দুশমন রুখবার জন্য দরকার হলে প্রাণ দেবার জন্য তৈরি আমরা।

কাশীনাথ চমৎকৃত হয়ে বলেন, ভদ্রলোকের ছেলেপুলে তোমরা সব—জলকাদা মেখে রাত্রি জেগে আমার বাড়ি পাহারা দেবে, এমন কথা কী করে বলি! ইচ্ছে হলেও তো বলতে পারিনে বাবা। তোমাদের বাড়ির লোকেই বা কি ভাববেন? কত জন তোমরা আসছ, আমায় তবে একটা আন্দাজ দিয়ে দাও।

শোভন বলে, বাহিনীর মেম্বার হল কুড়ি। তার মধ্যে কাজকর্মে অসুখ-বিসুখে কিছু ঝড়তি-পড়তি—ধরুন পাঁচ। দাঁড়াল তা হলে পনের। কিন্তু

হিসাব নিয়ে কি হবে? যে যার বাড়ি থেকে খেয়ে-দেয়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঠিক দশটায় আপনাদের আমতলায় এসে পড়ব। আপনার বাড়ি একটা মুড়িও দাঁতে কাটব না। সেবার খুঁত হবে তা হলে, স্বার্থগন্ধ লাগবে। মারামারি কাটাকাটি যা-ই ঘটুক, আপনারা পড়ে পড়ে ঘুমোবেন—যা-কিছু করবার বাহিনীই সব করবে।

অতঃপর ক'দিন ধরে শোভনের খুব আনাগোনা। বাড়ির চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখে—কে কোথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে, সেই বন্দোবস্ত। জয়ন্তীকে দেখে শোভন মনে করিয়ে দেয়: শনিবারের আর তিন দিন। বলা যায় না, আমাদের জীবনের মেয়াদও হয়তো তাই।

বলে, আর দু-দিন।

বলে, কাল শনিবার এস্পার ওস্পার যাহোক একটা কাল রাত্রিবেলা—

শনিবারে সারাদিন দুর্যোগ। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টিটা বড় চেপে এল, সঙ্গে বাতাস। একটু থামে, আবার মুষলধারে শুরু হয়ে যায় নীরন্ধ্র আঁধার, ব্যাঙ ডাকছে তুমুল সোরগোল করে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা—তখন থেকেই শোভন যথানির্দিষ্ট আমতলায় দাঁড়িয়ে। অন্য কারো টিকি দেখা যায় না। ভয় পেয়ে গেল? কিম্বা ঘুম ধরেছে ঠাণ্ডা বাদলার রাত্রে? লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কী ভাবছে গ্রামের লোক রক্ষিবাহিনী সম্বন্ধে! বিশেষ করে জয়ন্তী—কলকাতা থেকে দু-দিনের জন্য যে এসেছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পিছন দিকে। খাপসুদ্ধ ছোরা কোমরে বাঁধা, আমের গুঁড়িতে ঠেশান দেওয়া শড়কি। ছোরায় হাত রেখে শোভন চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ডাকাত নয়, বাহিনীর কেউ নয়—সেই মেয়েটা যার কাছে অবস্থা গোপন রাখার বেশি দরকার। জয়ন্তী।

কী আশ্চর্য। অন্ধকারে একা চলে এলেন, ভয় করে না?

জয়ন্তী বলে, ভয় করলে ডাকাত দেখব কি করে? দেখবার জন্যেই তো জেদ করে রয়ে গেছি। দাদুর কথা কানে নিলাম না।

শহুরে অবুঝ মেয়ে—বিদ্যে থাকতে পারে, বুদ্ধির বেলা লবডঙ্কা। বিরক্ত কণ্ঠে শোভন বলে, চুপিসারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ডাকাত ভেবে ছোরাটা আপনার ঘাড়েই যদি বসিয়ে দিতাম!

কাঠের ছোরা তো আপনার—ভয় দেখানো জিনিস।

ঝুঁকে-পড়া একখানা ডাল জয়ন্তীর গায়ে লাগছিল। অপমানিত শোভন এককোপে সেটা দুই খণ্ড করে ছোরার ধারের প্রমাণ দিল।

জয়ন্তী ব্যাকুল হয়ে বলে, ডাল কাটতে গেলেন কেন? দেখুন দিকি! তবু খানিকটা আড়াল হয়ে ছিলেন, ডাকাত এলে হঠাৎ দেখতে পেত না।

শোভন বলে, আড়ালে থাকবার হলে তো আপনাদের ঘরের মধ্যে গিয়েই থাকতাম। তার চেয়ে আরও ভাল, নিজের বাড়ির দোতলায়।

জয়ন্তী নিরীহ ভাবে বলে, এক পক্ষে ভালই। জানলা খুলে দেখা যাবে এবার আপনাকে। কী করেন দেখব। ডাকাত যদি আসে—দরজা খুলে দেব, টুক করে ঢুকে পড়বেন। এই বলা রইল।

বীরত্ব প্রকাশ করে শোভন বলে, দেখবেন বই কি! কিন্তু একটা জায়গায় কতক্ষণই বা দেখতে পাবেন? ঘুরে ঘুরে বাহিনী চালনা করতে হবে না! তারা সব এসে পড়ল বলে।

অনেক রাত্রে জয়ন্তী আবার বেরিয়ে এসেছে: এল বাহিনী?

অকারণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে অপ্রতিভ স্বরে শোভন বলে, আসবার তো কথা। আজ সকালেও মীটিং হয়েছে। এসে যাবে ঠিক, দেখুন না—

আসবে কাল সকালে, ডাকাতে হেস্তনেস্ত করে যাবার পর। আপনার মতন বোকা তারা নয়।

রীতিমত চটে গেছে শোভন। বলে, ঝড়জল কী রকম সেটা তো বুঝে দেখবেন। এমন দুর্যোগে শিয়াল-কুকুর পর্যন্ত বেরোয় না।

আপনিই বা কেন বেরুলেন?

শোভন বলে, আমিও ঠিক সেই প্রশ্ন করব। ঝড়-জল-অন্ধকারের মধ্যে মেয়েলোক হয়ে কোন্ সাহসে আপনি বার বার বেরুচ্ছেন?

এমনি তো কথার সাগর জয়ন্তী, কিন্তু থতমত খেয়ে গেল। বাড়ি পাহারা দিতে এসে তার উপর ধমক দেবার অধিকারও যেন শোভনের বর্তেছে।

ঘরে চলে যান। শান্তিতে আমাদের কাজ করতে দিন। আর আসবেন না।

জয়ন্তী বলে, চা হয়ে গেছে, তাই বলতে এলাম। খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে ভাল লাগবে।

ঘাড় নেড়ে শোভন বলে, গ্রামসেবায় এসেছি—চা কি বলেন, একঢোক জলও খাব না এ-বাড়ি। তেষ্টা পেলে পুকুরঘাট থেকে আঁজলা ভরে খাব।

বা-রে! এই রাত্রে উনুন ধরিয়ে কত কষ্ট করে করলাম—। অভিমানে জয়ন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

শোভন কিছু নরম হয়ে বলে, স্বার্থগন্ধ এসে যাবে তাহলে। পুরোপুরি সাত্ত্বিক সেবা হবে না।

না হল তো বয়ে গেল। বৃষ্টিজলে ভিজে শরীর খারাপ করেছে আপনার, ঘন ঘন কাশছেন। আমার চোখ-কান ফাঁকি দিতে পারবেন না। শখের চা নয়—ওষুধ। সাত্ত্বিক গুণ এতে নষ্ট হয় না।

অতএব পিছু পিছু গিয়ে আদা-চা খেয়ে আসতে হল। অনেকক্ষণ কাটল, অন্য কেউ এল না তা হলে। শোভন একাই ঘুরছে—কোনও বক্রপথে ডাকাত চুপিচুপি না ঢুকে পড়ে। মোড় ঘুরে বেরিয়ে আবার দেখে—জয়ন্তী।

উৎকণ্ঠায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে জয়ন্তী বলে, খুঁজছি কতক্ষণ ধরে, খুঁজে খুঁজে পাইনে। যা ভয় হয়েছিল—

শোভন সকৌতুকে বলে, ডাকাতে হরণ করে নিয়ে গেছে, তাই বুঝি ভাবলেন? আপনাকেই তো একবার ডাকাত ভেবে ছোরা উঁচিয়েছিলাম। কী দুঃসাহসী আপনি, একালের দেবী চৌধুরাণী। কিন্তু চা তো হয়ে গেছে—এবারে কী? পোলাও-লুচি মাংস-রসগোল্লা?

পোলাও না আরো-কিছু! আমি তো খাইনি এখনো—ডাকাত এই আসে এই আসে করে বসতে পারিনি। খাচ্ছি, তারই মধ্যে এসে হয়তো চলে গেল! চায়ের জন্য উনুন ধরানো হল তো ভাবলাম, খাবারটা গরম করে নিই। যা খাবার দিদিমা রেখেছে, আমার মতন পাঁচজনেও খেয়ে পারবে না। রাত অনেক হয়েছে—আমি বলি, ওদিকটা এইবারে সেরে নেওয়া যাক।

শোভন শিউরে উঠল: এখন ভাত খেতে বসব—বলছেন কী! চা খেয়েছি, দু-চার মিনিটের ব্যাপার—সে-ও অন্যায় খুব। মাপ করবেন, ঘাঁটি ছেড়ে আর নড়তে পারব না। যদি এসে পড়ে—

জয়ন্তী রাগ করে বলে, দল জুটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পড়বে—পারবেন লড়তে একলা?

শোভন গর্ব ভরে বলে, কেন পারব না? ঘরবাড়ি আমাদের না তাদের? দলে ভারী হোক ডাকাতরা, শড়কি-বন্দুক নিয়ে আসুক, আমার সঙ্গে পারবে কিসে? প্রাণও যদি যায়, বুঝব দশের কাজে গিয়েছে।

বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছে—খেয়াল হল বুঝি সেটা। ফিক করে হেসে শোভন ব্যাপারটা লঘু করে নেয়: একলাই বা কিসে! আমি ডাকাত পাহারা দিচ্ছি, আপনি আছেন আমার পাহারায়। দু'জন তাহলে।

না, বাজে কথা থাক, ওসব হবে না। আত্মহত্যা করতে দেব না চোখের উপর।

জয়ন্তী এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। শোভনের হাত ধরে টানে: বাহিনীর কেউ এল না তো আপনি বা কেন আসবেন! আপনার কোন্

দায় পড়েছে। কড়া হয়ে দাদুর গোড়াতেই মানা করা উচিত ছিল। কোন একটা বিপদ হলে আপনার বাড়ির লোক কী বলবেন?

উত্তেজনা দেখে শোভন হেসে ফেলে: ভাবনা করবেন না, সেদিক দিয়ে অসুবিধা নেই।

ভ্রূকুটি করে জয়ন্তী বলে, বুঝেছি। গোঁয়ারগোবিন্দ বলে বাড়ির লোকে আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

তা নয়—কেউ তো নেই আমার। থাকলে অবশ্য কী করতেন, জানিনে।

জয়ন্তী অবাক হয়ে বলে, বাবা-মা ভাই-বোন—

বউয়ের কথা বলল না। এ হেন বাউণ্ডুলে লোকের বউ থাকাই উচিত নয়। থাকলে সে-মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ। বলল, সংসারে একেবারে কেউ নেই?

কেউ নেই। মা ছিলেন, বাড়িতে তিনি একা থাকতেন। গৃহদেবতা ধানচাল গরুবাছুর নিয়ে ছিলেন। আমি পড়াশুনো করতাম বাইরে। বসন্ত হয়েছে মায়ের, খবর পেয়ে ছুটে এলাম। এসে আর দেখতে পাইনি।

গলা ভারী হয়ে ওঠে ছন্নছাড়া বেপরোয়া ছেলের। বলে, সেই থেকে গাঁয়ে আছি। কী হবে আর পড়াশুনোয়! গাঁয়ের সকলের সঙ্গে দশ রকম কাজকর্ম নিয়ে থাকি। শান্তিতে আছি। শহরে হাজার-লক্ষের হৈ-হল্লা—গাঁয়ে দশ-বিশজন জোনাকির মতন আমরা টিমটিম করি।

ডাকাত এল না। ক'দিন পরে ভিলাই থেকে কাশীনাথের বড় ছেলে এসে পড়ল। এমন অসহায় অবস্থায় বাপ মাকে গাঁয়ে পড়ে থাকতে দেবে না, নিয়েই যাবে বাসায়।

বলে, ডাকাতি এবারটা না-ই হল, কিন্তু ভরসা কিসের? যখন তখন তো হতে পারে।

কাশীনাথ হেসে বলেন, হয়নি ডাকাতি—তা-ই বা কেমন করে বলি বাবা?

সন্ত্রস্ত হয়ে ছেলে বলে, কিছু হয়েছিল নাকি? কই, গাঁয়ের এতজনকে পথে পেলাম…মা-ও তো তেমন কিছু বললেন না।

ডাকাতি বইকি! সে ডাকাত আগেভাগে এসে আমার বাড়ি ঘাঁটি করে ছিল। গাঁয়ের ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। শোভনকে নিয়ে গেছে কলকাতায়! আবার সে পড়াশুনো করবে।

চাবি

করুণাকিঙ্কর দাস অনেক দিন ধরে ভুগছেন। ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানির মালিক, প্রকাশ্য ও গোপন আরও নানা কাজ-কারবার আছে, নামডাক বিস্তর। রোগেও ধরেছে তেমনি—রাজব্যাধি ক্যানসার, যার উপরে আর হয় না। ক্রমশ শেষ অবস্থা এসে গেল, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে যাবেন। পাঁচ-সাত হপ্তাও হতে পারে—বলা যায় না এই মানুষটির কথা। কেউ কেউ বলে, মাস পাঁচ-সাত টানবেন দেখে নিও। লড়ে বেড়ানো ওঁর সারা জীবনের অভ্যাস। আট বছর বয়সে বাপ মরেছেন—তখন থেকেই লড়ে বেড়াচ্ছেন দুনিয়ার সঙ্গে। এবং বিজয়ীও হয়েছেন—যোলআনার উপর আঠারআনা। এককালের ঘোর শত্রুরা এখন পায়ের তলার ছুঁচো। পদতল ঘিরে বসে কিচকিচ করে। কাজ করতে করতে করুণাকিঙ্কর আধখানা কথা হয়তো ছুঁড়ে দিলেন তাদের দিকে। তাতেই কৃতার্থ তারা, কথাটুকু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টেপাল্টে চেখে চেখে তারিফ করে। দুঃখের দিনে করুণাকিঙ্কর খোলার ঘরে হাতবাক্স নিয়ে হিসাবপত্র লিখতেন, এখন এয়ারকণ্ডিসণ্ড ড্রইংরুম ভরা দামি-দামি আসবাব। ঐ মানুষগুলোকেও আসবাবপত্রের বেশি ভাবেন না তিনি। বড়মানুষের এ-সমস্ত রাখতে হয়।

দিন দিন অশক্ত হয়ে পড়ছেন। শোবার ঘরের বাইরে যাবারও শক্তি নেই। খাটের লাগোয়া টেবিলটায় নিজের কাজকর্ম করতেন—শুধুমাত্র বিক্রি করার কাজ। ইস্টার্ন বিল্ডার্স ছাড়াও নানান ব্যাপারে টাকা ছড়িয়েছেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে যথাসম্ভব কুড়িয়েবাড়িয়ে আনা। শেয়ার ও ভূসম্পত্তি দেদার বিক্রি হচ্ছে, খদ্দেরে যে দর বলে তাতেই ছেড়ে দেন। বেচে দিয়ে নগদ টাকা আর সোনা শোবার ঘরের সিন্দুকে পুরে নিজ হাতে চাবি দিয়ে রাখেন।

নিজের ছেলেপুলে নেই, তা বলে সংসার ছোট নয়। স্ত্রী মন্দাকিনী আছেন, তার উপর আছে দুই ভাইপো আর চার ভাইঝি। এবং ঝি-চাকর একগাদা। তবে শান্তির সংসার বটে। ভাইপো-ভাইঝিরা বাপ-মায়ের অধিক মান্য করে। জেঠামণির অসুখে ভাইপো সতীকান্ত রাত জেগে জেগে লবেজান হচ্ছে। দুটো নার্স রাখা হয়েছে, পালা করে তারা ডিউটি দিচ্ছে। সতীকান্তকে তবু লহমার জন্য রোগির ঘর থেকে নড়ানো যায় না।

নার্স সবিতা বলে, এত কষ্ট করবেন তো খরচা করে আমাদের এনেছেন কেন?

এনেছি জেঠামণির কষ্টের লাঘব হবে বলে। আমার কষ্ট দেখতে হবে না আপনার।

খবর পেয়ে পাটনা থেকে করুণাকিঙ্করের বড় বোন শঙ্করী এসে পড়লেন। বাতে পঙ্গু, তবু গাড়ি থেকে নেমেই একরকম ছুটতে ছুটতে রোগির ঘরে। আর্তনাদ করে উঠলেন: কী হয়ে গেছে আমার সোনারচাঁদ ভাই। এমন অবস্থা—একটা খবরও দিস নি আমায়!

সতীকান্ত বলে, রোগির ঘরে চেঁচামেচি কোরো না পিসিমা। হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হও গে। চিঠির পরে চিঠি লেখা হচ্ছে, আর খবর কেমন করে দেব?

শঙ্করী বলেন, অসুখ না অসুখ—এদ্দিনেও সারে না, কী রকম অসুখ রে বাবা! পাগল হয়ে ছুটে এলাম। মায়ের পেটের ছোট-ভাই আমার—তোরা তার কি বুঝবি! তোরা তো পরে এসে জুড়ে বসেছিস।

করুণাকিঙ্কর মিন মিন করে বললেন, দিদি কি একলা এসেছ?

শঙ্করী বললেন, সময়ের ছুটি কোথা? মনের অবস্থা যা হল, তখন আর এক মিনিটের সবুর সয় না। সময়কে বললাম, তুই বাবা গাড়ির কামরায় তুলে দিয়ে আয়, ঠিক আমি পৌঁছে যাব। ভাইয়ের টানে টানে গিয়ে পড়ব ঠিক, ভাবনা করিস নে। বার বার করে বলে দিয়েছে, মামা কেমন থাকেন—গিয়েই চিঠি দিও। চিঠি নয়, 'তার' করব কাল সকালে। ছুটি না পেলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসুক। চাকরি কিছু মামার চেয়ে বড় নয়।

সতীকান্ত খানিকটা আত্মগতভাবে বলে, সেবারে তা বোঝা গিয়েছিল বটে!

করুণাকিঙ্করও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন: এলে তাকে জুতো-পেটা করব। না দিদি, জুতো তোলবারও আর শক্তি নেই।

মন্দাকিনী কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার না থাক আমার আছে। যদি আসে, শত্রুকে আমি ভিতরে ঢুকতে দেব না। চাকরবাকরদের সঙ্গে বাইরের বারান্দায় থাকতে হবে।

আক্রোশ অসঙ্গত নয়। কলেজ থেকে বেরুলেই করুণাকিঙ্কর ভাগনেকে ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। দুটো বছর আগেও সময়ের কথা ছাড়া কোন কাজ হতে পারত না। ছেলেটা সকল দিকে ভাল—বুদ্ধিমান পরিশ্রমী মিষ্টভাষী। ব্যবসায়ে বড় হতে গেলে যা-কিছু লাগে। কিন্তু এক রোগে সমস্ত মাটি। সেকেলে এক নীতির ভূত ঘাড়ে চেপে ছিল তার: অনেস্টি ইজ দি বেষ্ট পলিসি, সাধুতাই সর্বোত্তম পথ। অপর দশজনে যেমন করে থাকে—

অফিসঘরে লিখে টাঙিয়ে দেয় বচনটা, অবরে-সবরে বুকনি ছাড়ে—সমরের সে ব্যাপার নয়, মনে-প্রাণে খাঁটি বলে মান্য করে। এবং সেই জন্যে পদে পদে লাগত করুণাকিঙ্করের সঙ্গে। চরম হল বুধহাটা পুল তৈরির কাণ্ডটা নিয়ে। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না, নিরেস মাল চালিয়ে যাচ্ছে —খুব একটা হৈ-চৈ উঠল, কাগজে পর্যন্ত লেখালেখি। নতুন-কিছু নয়, ঠিকেদারি কাজের দস্তুরই এই। কিন্তু বীরেন পাল পিছন থেকে তদ্বির করছিল—কণ্ট্রাক্টটা সে বাগাতে পারে নি, মরীয়া হয়ে লেগেছিল তাই। তদন্ত কমিটি বসে গেল শেষ অবধি। কমিটির কাছে সাক্ষি দেবার জন্য সমরের ডাক এল। সে বলে, আত্মীয়তা টাকাপয়সা নিজের ভবিষ্যৎ সকলের বড় হল সত্য। সত্য থেকে তিলেক ভ্রষ্ট হতে পারব না। আগাগোড়া সত্যি কথা বলে মামাকে ফাঁসিয়ে দিল সে। করুণাকিঙ্কর ঝানু লোক—বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে তবে বড় হয়েছেন। সকল ঘাঁটির বন্দোবস্ত রেখে তবে তিনি কাজে এগোন। জেল-টেল কিছু হল না, পুল তৈরির কণ্ট্রাক্টটা বাতিল হল শুধু. .পল বীরেন পাল। করুণাকিঙ্কর সেই একটিবার পরাজয় মানলেন বীরেন পালের কাছে গণ্ডগোল চুকে যাবার আগেই সমর ইস্তফা দিয়ে চলে গেল। গেছে চলে মানে মানে—নইলে করুণাকিঙ্করই গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতেন। মামা-ভাগনেয় সেই থেকে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।

করুণাকিঙ্কর প্রশ্ন করেন: কি করছে দিদি আজকাল? ইস্কুলমাস্টারি? অন্য কিছু তোমার ছেলেকে দিয়ে হবে না। নির্জলা সাধুগিরি ঐ এক মাস্টারি কাজেই শুধু চলে।

অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সবাই বলে, হয়ে এসেছে আর একটা কি দুটো দিন রোগি আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। নার্স সবিতা ফিসফিস করে সতীকান্তকে বলছে, আপনার জেঠামণির আশ্চর্য সহ্যশক্তি। এ রোগের মতন যন্ত্রণা আর কিছুতে নয় ঈশ্বরকে বলি, মরার সময় যে রোগ ইচ্ছে দিও, এই ক্যানসারটা ছাড়া। আর ওঁকে দেখুন—এত বড় রোগের সঙ্গে লড়াই করছেন, কিছুতে তা মালুম পাবেন না। হাসি-হাসি মুখ—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিষ্টি স্বপ্ন দেখছেন যেন। এমনটা আর দেখি নি কখনো।

সতীকান্ত কাতর কণ্ঠে বলে, জেঠামণি চিরটা কাল আমাদের জন্য করে গেলেন। এমন কোন উপায় থাকত, ওঁর কষ্টের খানিকটা যদি নিজের উপর নিতে পারতাম—

সবিতা বলে, বললে তো আপনি রেগে যাবেন—নিজের প্রশংসা সইতে

পারেন না। কিন্তু যে কষ্টটা নিচ্ছেন নিজের উপর, সে-ও কিছু কম যায় না। দিনরাত ঠায় বসে, রোগির দিক থেকে নজর ফেরান না। কত জায়গায় তো যাই, কিন্তু এমন সেবা দেখিনি আর কখনো।

রোগি, মনে করা গিয়েছিল, একেবারে অসাড়। হঠাৎ তিনি কথা বলে ওঠেন। বিশাল ঘর—তার একপ্রান্তে সতীকান্ত আর সবিতায় ফিসফিসানি কথা। অথচ শুনে নিয়েছেন করুণাকিঙ্কর। চোখ বুজে মুখস্থ-কথার মতো বললেন, অবিচার কোরো না নার্স। সেবা শুধু এক সতীকান্তর দেখলে? আরও যে কতজন কতদিকে তাকিয়ে আছে—কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, নজর কেউ তো ফেরায় না। ডাইনের জানলার ওদিকে দেখ বড়বউ—সতীকান্তর জেঠিমা। বাঁয়ের জানলায় ভাইঝিগুলো। শিয়রের দরজা এদ্দিন খালি পড়ে থাকত, দিদি নতুন এসে সেখানে ঠাই করে নিয়েছেন।

তাকিয়ে পড়তে, সত্যিই বাঁয়ের জানলার আড়ালে অনেকগুলো পায়ের পালিয়ে যাওয়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনের জানলার কপাট খুলে দিয়ে মন্দাকিনী বললেন, না দাঁড়িয়ে করি কি—পা দুটো আমার টেনে এনে বেঁধে দেয় যেন এখানে। থাকতে পারি না।

করুণাকিঙ্কর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, নির্ভয়ে আছি সেজন্যে। সকল দিকে কড়া পাহারা, যমদূত ঢুকতে পারছে না।

সবিতা অবাক হয়ে গেল: আমাদের নজরে পড়ে না, আর আপনি শুয়ে শুয়ে—

করুণাকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে কথার পূরণ দিয়ে দেন: চোখ বুজে বুজে সমস্ত আমি দেখি। তোমরা দু-জনে অতদূরে ফিসফিস-গুজগুজ কর, তা-ও সব কানে শুনতে পাই।

কিছু আজেবাজে কথা হয়ে থাকে সত্যি দু জনের মধ্যে। সোমত্ত মেয়ে আর জোয়ানপুরুষ এক ঘরে দিনরাত্রি থাকলে না হয়ে পারে না। করুণাকিঙ্করের কথায় সতীকান্তর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। উচ্ছ্বাস ভরে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নেয়: জেঠামণি অন্তর্যামী। কে কি করছে, কে কি বলছে, সমস্ত উনি টের পান। ওঁর অজান্তে কিছুই হয় না।

ঘরের বাইরে পেয়ে এক সময় সবিতা সতীকান্তকে বলছে, কত রোগি দেখে থাকি, এমনটা কখনো দেখি নি। আজকেও হয়ে যেতে পারে, ডাক্তারবাবু দেখেশুনে বলে গেলেন। সেই মানুষ দেখছেন শুনছেন, টরটর করে কথা বলছেন—ডাক্তারিশাস্ত্রে প্রহেলিকা এটা।

সতীকান্ত তিক্তস্বরে বলে, মরে যাবার পরেও দেখবেন, চোখ-কান ঠিক

আছে, কথা বলে চলেছেন তখনও। পুড়িয়ে ছাই করে গঙ্গায় ধুয়ে দিলে তখন যদি বন্ধ হয়।

বৈঠকখানায় ওদিকে সমারোহ ব্যাপার। উদ্বিগ্ন মানুষজন আসছে খবরাখবর নিতে। পাড়াপ্রতিবেশী কারও আসতে বাকি নেই, ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানির উঁচু-নিচু সকল স্তরের সকল কর্মচারী এসে হায়-হায় করছেন। সকাল থেকে রাত্রি অবধি অবিরাম চলছে এই কাণ্ড। সতীকান্তর যমজ ভাই শশীকান্ত এই দিকটা সামলাচ্ছে। একই কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। এরই মধ্যে পরমশত্রু বীরেন পাল এসে দেখা দিলেন: বড্ড উতলা হয়েছি। চুপচাপ বাড়ি থাকতে পারলাম না। বলি, খবরটা নিজের কানে শুনে আসি। ভিতরে যাব না, আমায় দেখলে উত্তেজিত হবেন। হওয়া স্বাভাবিক—সম্পর্ক তো ভাল নয় আমাদের মধ্যে। কিন্তু ব্যবসা নিয়ে যত লড়ালড়ি হোক, মানুষটিকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি। এসব মানুষ আর জন্মাবেন না।

খবরের-কাগজ থেকেও লোক এসেছে: কর্মবীর পুরুষসিংহ—বাঙালি জাতির গৌরব। মন্ত্রী আর হোমরাচোমরাদের কথা অঢেল ছাপা হয়, এই মানুষটির ছবি আর জীবনী পাঠকের সামনে তুলে ধরব, লোকে প্রেরণা পাবে। কেমন আছেন, বলুন।

আজ সকাল থেকে শশীকান্ত যে জবাবটা ঠিক করে নিয়েছে: ভাল—

কাগজের লোক চটে গেছে। কণ্ঠস্বরে তবু যথাসম্ভব কোমলতা রেখে বলল, হোক তাই। অমন মানুষটা সুস্থ হয়ে উঠলেই ভাল। কিন্তু সেদিন যে বললেন, এখন-তখন—

ডাক্তারের কথাই বলেছিলাম। আমরা কতটুকু কি বুঝি আর কি বলতে যাব।

লোকটা গজর-গজর করে: আজ এক কথা, কাল এক কথা—কিছু বোঝে না, আন্দাজি ঢিল ছোঁড়ে। অমন ডাক্তার ডাকেন কেন বলুন তো।

শশীকান্ত বলে, শহরে সকলের বড় ডাক্তার। একজন নয়, তিন-তিনজন। জলের মতন অর্থব্যয় হচ্ছে।

সবিতা নার্স এই সময় বাসা থেকে ডিউটিতে এল। সে বলে উঠল, ডাক্তারের দোষ নেই, রোগি সব রকমের হিসাব বানচাল করে দিচ্ছেন। শেষটা ডাক্তার বলে গেলেন, রোগির অবস্থা যা-ই হোক বাইরের সকলকে বলবেন, ভাল।

ঝুটো খবর ছড়াচ্ছেন?

সবিতা বলে, নইলে যে মুখ থাকে না। রোগি নিজে ভুগছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সব ভুগিয়ে মারছেন।

করুণাকিঙ্কর সত্যিই অবশেষে মারা গেলেন। মরেছেন সেটা খোঁজ নিয়ে জানতে হয় না, কান্নার চোটে মাইল ভর মানুষের কান ফেটে যাবার দাখিল। মন্দাকিনী লুটোপুটি খাচ্ছেন মৃত স্বামীর উপর। ঠেকানো যায় না, সরিয়ে আনতে গেলে আরও কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরেন: এমন নিষ্ঠুর কেন হচ্ছ তোমরা? থাকতে দাও, বুকের উপর চিরজন্মের মতো একটু মাথা দিয়ে রাখি।

দেখাদেখি করুণাকিঙ্করের চার ভাইঝি চারদিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জেঠামণির উপর। তারাও মাথা কুটবে, কিন্তু জায়গা পাচ্ছে না। বিপুল দেহ নিয়ে মন্দাকিনী মৃতের সর্বাঙ্গ জুড়ে আছেন। যেন তাঁর সম্পত্তিতে অন্যেরা জবরদখল করতে আসছে—কিছুতেই সেটা হতে দেবেন না। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে, চার চারটে ডাগড়া মেয়ের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন—ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে তারা জায়গা করে নিচ্ছে।

এ হেন দৃশ্যে পাষাণ ফেটে জল বেরোয়। কিন্তু সতীকান্তর চোখে জল নয়, আগুন। ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে আপাতত সে-ই অভিভাবক সকলের উপর। ধমক দিয়ে উঠল: আধিক্যেতা হচ্ছে জেঠাইমা। এত সমস্ত বাইরের মানুষ—উঠে যান, সরে যান। মড়া নিয়ে রওনা হয়ে পড়ুক এইবার।

মন্দাকিনী মুখ তুললেন। ফোলা-ফোলা চোখ, ঝাকড়ামাকড়া চুল—মূর্তিমতী শোকের চেহারা। বললেন, বুড়ো মাগি আমার বেলা দোষ হল, আর নিজের যে এক গণ্ডা বোন লেলিয়ে দিয়েছ—সেটা কি?

আরও হল। বাতের ব্যথা বেড়ে শঙ্করী একেবারে শয্যাশায়ী—সেই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ধরে তিনিও এসে দাঁড়ালেন। লড়ালড়ির ভিতরে ঢোকবার সামর্থ্য নেই, হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে আর্তনাদ করছেন: আমার মায়ের পেটের ভাই। সবখানি তোরা জুড়ে আছিস—আমায় একটু বসতে দে কাছে গিয়ে।

নার্স সবিতা তাজ্জব হয়ে দেখছে। যে বয়সে করুণাকিঙ্কর গেলেন, তাকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু আত্মীয়-অনাত্মীয় বিশাল এক জনতা হা-হুতাশ করছে আর চোখ মুছছে—শেষ-দেখা দেখে যাবে একবার। সার্থক জীবন করুণাকিঙ্করের—শুধু টাকাপয়সা করেন নি, ভালবাসায় বেঁধে গেছেন এত মানুষ। সবিতার চোখেও বুঝি জল এসে যায়। কত শোকের সাক্ষি

হতে হয় তাকে, বৃত্তিই তার এই। কিন্তু আজকে যেন সামলাতে পারছে না। চমক লাগল হঠাৎ—সকলের পিছনে শশীকান্ত একান্তে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসিই বটে, কিছুমাত্র সংশয় নেই।

হাসি দেখে সবিতা ভয় পেয়ে গেল। শোক অতিরিক্ত মাত্রায় হলে উল্টো ভাব দেখা যায় অনেক সময়। দ্রুতপায়ে সে শশীর কাছে গেল: কি হয়েছে আপনার?

শশীকান্ত বলে, কোন-একটা ওষুধ দিতে পারেন যাতে কান্না পেয়ে যায়? হাসি কিছুতে চেপে রুখতে পারছি নে।

অসংলগ্ন কথাবার্তা। মাথা খারাপের লক্ষণই বটে!

শশীকান্ত বলছে, হাসি এ জায়গায় বড্ড বেমানান। সবাই নিজের নিজের তালে আছে, আমার দিকে সেজন্য এখনো নজর পড়ে নি। অভিনয় আমার মোটে আসে না, কান্নার জন্য তাই ওষুধ খুঁজছি। নাঃ, রান্নাঘরে গিয়ে লঙ্কা-বাটা একটু দিই চোখে। তাতে যদি জল বেরোয়।

সবিতা স্তম্ভিত হয়ে বলে, কী বলছেন! শোকের অভিনয় করছে এত মানুষ?

সব, সব—একজনও বাদ নেই। জেঠামণি বুঝতেন সেটা। যত মানুষ এই এসে জমেছে—ব্যবসায়ের লোকজন, পাড়া প্রতিবেশী—খড়্গহস্ত সবাই জেঠামণির উপর। নাস্তানাবুদ কাউকে তো কম করেন নি। কারো চাকরি খেয়েছেন, কারো জমিজমা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন। নিতান্ত নিজে কিছু না পারলেন তো দু-পক্ষে মামলা বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখেছেন। লোকের কষ্টে ফূর্তি হত তাঁর। অত যে লোক দিনের পর দিন অসুখের খবরাখবর নিতে আসত—তার মানে, যাবেন তো সত্যি সত্যি, না আবার খাড়া হয়ে উঠবেন? ভাল আছেন যেদিন বলতাম, হাসত তারা হি-হি করে আর মনে মনে কাঁদত।

সবিতা তর্ক করে: সে না হয় বাইরের লোকের ব্যাপার। আপনি বললেন, একজনও বাদ নেই। কিন্তু ঘরের মানুষ নিশ্চয় অভিনয় করেন না। আপনার জেঠাইমা পিসিমা বোনেরা—বিশেষ করে আপনার ভাই সতীকান্তবাবু—

কিছু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, ঐ সেবার তুলনা নেই। সব সময় রোগির পাশে, দু-চোখের পাতা এক করতে দেখলাম না কখনো।

শশীকান্ত হেসে বলে, চোখ কিন্তু ঠিক জেঠামণির উপর নয়। জেঠামণির কোমরের ঘুনসিতে চাবি বাঁধা, সেই দিকে। সিন্দুক বোঝাই টাকাকড়ি

যে-চাবিতে খোলে। আপসে না মরেন তো গলা টিপে মেরে চাবি নিতেও আপত্তি ছিল না। জেঠামণি জানতেন সমস্ত—

সবিতার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে শশীকান্ত একটুখানি উপভোগ করে নিল। বলে, সেটা অবশ্য সম্ভব ছিল না। আরও অনেক দল তাক করে ছিল বাইরে থেকে, চাবি কাড়তে গেলে রে-রে করে এসে পড়ত। জেনে বুঝে জেঠামণিও নির্ভয়ে ছিলেন। বাড়ির মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখ জেঠামণির আর আমার। আমি তাই বড়-একটা কাছাকাছি হতাম না। জানি, ও-হাটে সুঁচ বিক্রি চলবে না। ওরা গিয়েছিল তাই করতে। ডাহা বেকুব। ফণী দত্ত এটর্নির আনাগোনা বেড়ে গেল। জানি, উইল হচ্ছে। মরার আগে কোমরের চাবিও পাচার হয়ে যাবে। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। আজকে সেটা হাতে-নাতে পরখ হয়ে গেল।

সবিতা বলে, কি করে? চাবি আছে কি নেই, এখনো তো কেউ খুঁজে দেখে নি।

কি আশ্চর্য! কোমর কতবার হাতড়ানো হয়ে গেল– পাঁচ দুনো দশখানা হাতে। অতগুলো মানুষের চোখের উপরেই তো ধপ করে মড়ার গায়ে পড়ে জেঠাইমা মাথা কুটতে লাগল, হাত দুটো তখন কাপড়ের নিচে ঘুনসি বেয়ে ঘুরছে। তারপরে পড়ল আমার চার বোন। ঐ একটা জায়গাতেই মাথা কোটবার জন্য সকলের ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিন্তু চাবি পায় নি, পেলে তক্ষুনি চুলোচুলি বেঁধে যেত। বুড়োথুত্থুড়ো পিসিমার সেই সময়টা যা অবস্থা— ক্ষমতা নেই, দাঁড়িয়ে আঁকুপাকু করছেন।

হাসি আর রুখতে পারে না শশীকান্ত, ছুটে বেরুল। গেল বোধকরি রান্নাঘরের দিকে লঙ্কা-বাটা জোগাড় করতে।

সমারোহে শ্মশানে নিয়ে গেল। করুণাকিঙ্কর চিতায় উঠে গেছেন, তখনো মানুষ গিজগিজ করছে। ডবল সাইজের চিতা, আরও দুই চিতার পরিমাণ অতিরিক্ত কাঠ এনে গাদা করেছে।

এই কাজেও সতীকান্তর ষোলআনা তদারকি। চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। চন্দনকাঠের টুকরো নিয়ে সতীকান্ত আগুনে ছুঁড়ছে। বলে, কী রকম চন্দনকাঠ হে, গন্ধ ওঠে কই? আজেবাজে কাঠ দিয়ে চন্দনের দাম নিয়েছে। সব শালা জোচ্চোর।

মস্তবড় একটা বাঁশ নিয়ে মড়া সরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বাঁশের বাড়ি দিয়ে মাথার খুলি চুরমার করে ছিল, ভিতরটা ভাল মতন যাতে পোড়ে। চক্কোর দিয়ে ঘুরে ঘুরে তদারক করছে: কাঠ দাও হে, বেশি করে কাঠ

দাও। সৎকারে খুঁত রেখে ফিরব না। পুড়িয়ে ছাই করে জেঠামণিকে গঙ্গায় দিয়ে যাব।

শশীকান্ত কোনদিকে ছিল, ভাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলে, অত ভয় কিসের? যা পোড়া পুড়েছে, আর জেঠামণি উঠে আসবে না।

সতীকান্ত খিঁচিয়ে ওঠে: ধর্মাধর্ম মানো না, অবিশ্বাসী নাস্তিক। তুমি কেন শ্মশানঘাটে এসেছ শুনি?

মুচকি হেসে শশীকান্ত বলে, এতগুলো লোক যে জন্যে এসে পড়েছে। জেঠামণির মতো মানুষ সত্যি সত্যি চিতায় উঠেছে নিজের চোখে দেখে তবেই প্রত্যয় হয়। তুমি কিন্তু ভাই মিছামিছি অত পেটান পেটালে। অবিচার করেছেন খুব মানি—বছর বছর তোমার কাজ বাড়িয়েছেন আর মাইনে কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বাঁশ পিটিয়ে হাতই ব্যথা হবে তোমার, মড়ার মাথায় লাগে না।

ঠিক পরের দিন এটর্নি ফণী দত্ত দেখা দিলেন। বাড়ির সকলকে ডেকে উইল পড়ে শোনাচ্ছেন। ইস্টার্ন বিল্ডার্স কোম্পানি এবং সংসার যেমন চলছে চলবে। সমস্ত ঠিক আছে। সিন্দুকের যাবতীয় সোনা ও টাকাকড়ি দিয়েছেন—পরমাশ্চর্য ব্যাপার!—মন্দাকিনী, সতীকান্ত, ভাইঝিরা, শঙ্করী কাউকে নয়, দিয়ে গেছেন সমরকে। সকলের বড় শত্রু যে জন, যে তাঁকে জেলে পুরতে গিয়েছিল—নিজের ক্ষমতায় বেঁচে এসেছিলেন। সিন্দুকের চাবি সিল করে জেলাম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে পাঠানো হয়েছে, উইল প্রোবেটের পর সমর নিয়ে নেবে।

ইংরেজিতে লেখা উইল। সকলে যদি না বোঝে, ফণী দত্ত জায়গায় জায়গায় বাংলা করে দিচ্ছেন: যত লোক দেখলাম, সবাই মিথ্যাচারী স্বার্থপর। আমি সকলকে চিনেছি। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ আমার ভাগিনেয় শ্রীমান সমর চৌধুরি। সত্যের জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে সে দ্বিধা করে নি। যাবতীয় সোনা ও টাকাকড়ি আমি পরম বিশ্বাসে তার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ অর্থে সে এমন-কিছু করবে, আমার নাম যাতে চিরজীবী হয়। কী করবে সেটা সম্পূর্ণ তার বিবেচ্য। পবিত্রচেতা সে—আমার চেয়ে এই ব্যাপারে ভাল বুঝবে। তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর। আমার সকল আত্মীয়স্বজনের যথোচিত ব্যবস্থা করেছি। অনুরোধ, সমরের কাজে যেন তারা সহযোগিতা করে।

শশীকান্ত দেমাক করে: আমি ঠিক এইটাই ভেবেছিলাম। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বলেছি তো, এ বাড়ির মধ্যে বুদ্ধিমান দুইজন—

আমি আর জেঠামণি। মানুষ চিনতেন তিনি। তিনি গেলেন, এবারে এই একজন আমি শুধু রইলাম।

গল্পের আর একটু আছে। উপসংহার।

উইলের বৃত্তান্ত শুনে কন্ট্রাক্টর বীরেন পাল পাটনায় সমরের কাছে গিয়ে পড়লেন। মুচকি হেসে বললেন, মামার কী রকম স্মৃতিরক্ষা করবেন, ভেবেছেন কিছু?

সমর আজ হাসল না। বলে, করুণাকিঙ্কর কনস্ট্রাকসন নাম দিয়ে নতুন ব্যবসা খুলব। ব্যবসা থাকলে মামার নামও থাকবে। পার্টনারশিপে আর কাজ করব না আমি। আপনার সঙ্গে তো নয়ই। বুধহাটা পুলের কাজটা ধরুন আমিই পাইয়ে দিলাম কত চক্রান্ত করে। কম-সে-কম বিশ হাজার নিট মুনাফা পিটলেন। আধাআধি দেবার কথা, ঠেকালেন শেষ পর্যন্ত হাজার আড়াই কি তিন। অনেস্টি ছাড়া ব্যবসা হয় না। মূলধন ছিল না বলেই আপনার মতো লোকের পিছনে এদ্দিন ঘোরাঘুরি করেছি। মামা মূলধন দিয়ে গেলেন।

ঘরণী

অফিসের কাজে কয়েকটা দিনের জন্য গুণেশ কলকাতা এসেছে। বছর তিনেক পরে। সর্বকর্ম ফেলে পুষ্পিতার বাড়ি যেতে হবে, বিয়ের পর এই তাকে প্রথম দেখবে।

মামাতো বোন পুষ্পিতা—কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট হল না। সহোদর বোন নেই, কিন্তু সহোদরার অধিক এই পুষি। তখন গুণেশ য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে—সোনারপুরে বাসা, ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে সেখান থেকে। মাসের অন্তত অর্ধেকগুলো দিন পুষ্পিতার গুণেশদের বাসায় কাটে। মা হারিয়েছে ছোট বয়সে—গুণেশের মা অর্থাৎ পুষির পিসিমাই মা হয়ে গিয়েছিলেন। পুষির বাবা হঠাৎ একদিন এসে পড়ে মেয়ে নিয়ে যেতেন—কোন একটা অজুহাত করে আবার সে চলে আসত। বেহালায় পুষ্পিতার কাছে চলল গুণেশ অতএব সকলের আগে।

শুধু পুষ্পিতা বললে ঠিক হবে না—পুষ্পিতা-সমীরণের কাছে। দু'টিতে কেমন সংসার করছে দেখবে। যে ক'টা দিন কলকাতায় আছে, হোটেল ছেড়ে ওদের বাড়িতেই উঠবে না-হয়।

সমীরণ আর গুণেশ সাত সাতটা বছর ইস্কুলে ও কলেজে এক সঙ্গে পড়েছে। পাশাপাশি বসত। সমীরণ প্রায়ই যেত সোনারপুরের বাসায়, একজামিনের মুখে রাত্তিরেও থেকেছে কত দিন। গভীর রাত্রি অবধি দু-জনে অঙ্ক কষত। একটা দুটো বেজে গেছে—খেয়াল নেই, অঙ্ক কষে চলেছে। হঠাৎ ডাকাত ঢুকে টেবিলের হারিকেন নিয়ে দে-ছুট। নিভিয়ে দিয়েছে আলো তারপর দড়াম করে ও-ঘরের দরজায় হুড়কো। অর্থাৎ ডাকাতের কাছে কাকুতিমিনতি করে আলোটা একটুক্ষণের জন্য নিয়ে আসবে, সে উপায় রইল না। মা ঐ ঘরে ঘুমোচ্ছেন, বেশি সাড়াশব্দ করবারও জো নেই।

সমীরণ বিরস হয়ে বলে, পুষি চলে যায় নি? ওটা আছে জানলে কখনো আসতাম না। রাতটা বাজেখরচা হয়ে গেল।

গুণেশ বলে, আমি তো ভাবলাম পুষি আছে জেনেই এসেছিস তুই—

হেসে উঠে আবার বলে, রক্ষে কর্, রাগ দেখাতে হবে না—আমি বিশ্বাস করছি। খিল দিয়ে দিয়েছে, ঘুমোক—তার পরে বাতি জ্বালাব। মোমবাতি কিনে রেখেছি। তোর জন্যে নয়, নিত্যিদিন আমায় এই ভোগ ভুগতে হয়। একফোঁটা মেয়ের খবরদারি—রাত জেগে পড়তে দিবিনে তো একজামিনের খাতার উত্তরগুলো তুই লিখে আসবি?

সমীরণের সঙ্গে বিয়ে হল পুষ্পিতার। পুষ্পিতার মা নেই, সমীরণেরও নেই। ছন্নছাড়া সংসার। ভাইয়ের মধ্যে একলা সে, বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে—ভবঘুরে বাপ পালাক্রমে মেয়েদের বাড়ি চক্কোর দিয়ে বেড়ান। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এই নিয়ে কথা উঠেছিল। কিন্তু পুষ্পিতার বাবা বললেন, বাড়িটা নিজস্ব—সেটা আমি ভাল করে দেখে নিয়েছি। ছেলে আর বাড়ি দুটো জিনিস দেখে মেয়ে দেব। মেয়ে হুরী-পরী নয়, টাকার বাণ্ডিলও নেই আমার—মাথায় টোপর চড়িয়ে লাটবেলাট কে আমার জামাই হতে আসছে?

আত্মীয়েরা মুখ টিপে হাসে: চালাক মানুষ তো! যে জিনিস ঠেকানো যাবে না, আপোষে সেটা মেনে নেওয়া ভাল। গণ্ডগোল বাইরে যেতে দিতে নেই।

বন্ধুর হয়ে গুণেশ তর্ক করে: সম্বন্ধটা খারাপ হল কিসে? টাকাকড়ি আজ না থাকতে পারে, কিন্তু একদিন হবেই। অতুল ঐশ্বর্য হবে, আমি লিখে দিতে পারি।

গুণেশের মা অর্থাৎ পুষ্পিতার পিসি জুড়ে দিলেন: একলার সংসার—সেই

আপত্তি? আমি বলি, এ জিনিস অনেক ভাল। বিস্তর মানুষ একসঙ্গে কুকুরকুণ্ডলী না করে একা-দোকা ওরা দিব্যি থাকবে।

বিয়ে হয়ে পুষ্পিতা শ্বশুরবাড়ি উঠল। এবং চাকরি পেয়ে গুণেশ সপরিবারে বম্বে রয়েছে। সেই থেকে দেখাসাক্ষাৎ নেই। দিন পাঁচেকের জন্য কলকাতায় এসেছে অফিসের একটা জরুরি কাজে অফিসের খরচায়। সকলের আগে সে বেহালায় পুষির বাড়ি ছুটেছে।

এই বাড়ি। তবু গুণেশ ঠিকানার নম্বর মিলিয়ে দেখে। নিঃসংশয় হয়ে কড়া নাড়ল এবার। ডাকছে: কে আছেন? সাড়াশব্দ নেই।

মানুষ এসেছে ওদিকে, জানলার পাখি তুলে দেখল কে যেন। গুণেশ বলছে, বম্বে থেকে আসছি আমি, দরজা খুলুন। একটা ব্যস্ততার ভাব যেন ভিতরে, ছুটোছুটি পড়ে গেছে। কী ব্যাপার? একবার ভাবছে ফিরে যাবে কি না—

এমন সময় দরজা খুলে চৌকাঠের দু-দিকে দু হাত মেলে পুষ্পিতা হাসি-মুখে এসে দাঁড়াল।

ঘুমিয়ে ছিলাম দাদা। ঝিক্কিঝাট সংসারে দিয়েছ—দুটো তো মানুষ—ঘুমোনো ছাড়া কাজটা কি বল?

বেশ তবে আছে দু'টিতে। গুণেশ বলে, সমীরণ কোথা?

সে আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়! এই তিনটে বেলায় পুরুষরা যেখানে থাকে। বম্বে হলে তুমি যেখানে থাকতে।

ঘরে ঢুকে তক্তাপোষে বসে পড়ে গুণেশ বলে, চাকরি নিয়েছে সমীরণ—বাণিজ্যের ভূত কাঁধ থেকে নেমে গেছে? ভাল, ভাল। তুই নামিয়েছিস ঠিক পুষি, বাহাদুরি তোর। কি চাকরি—কোন অফিসে?

প্রশ্ন শেষ হবার আগেই পুষ্পিতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, বোসো দাদা—আসছি। ফরফর করে ওদিককার দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। কেন যাচ্ছে, বুঝতে বাকি থাকে না।

খবরদার!

গুণেশ তাড়া দিয়ে ওঠে: ভেবেছিস কি পুষি? জল-টল খাইয়ে কুটুম্বকে খাতির দেখিয়ে বিদায় করে দিবি—সেটি হচ্ছে না। হোটেল-খরচা করছিনে—এই ক'টা দিন তোর এখানে এসে থাকব। হোটেলে বলে এসেছি—চার্জ মিটিয়ে দিয়ে স্যুটকেসটা নিয়ে আসব এক সময়।

বেশ তো, বেশ তো—

ফিরে দাঁড়াল পুষ্পিতা মুহূর্তকাল। গুণেশ দেখল, দেখার ভুলও হতে

পারে—মুখ তাঁর পাংশু হয়ে গেছে: বেশ তো, থাকবেন তাই—থাকতেই হবে। বলতে বলতে পুষ্পিতা সিঁড়ি ধরে দোতলায় চলল। পালিয়ে যাচ্ছে, এমনিতরো ভঙ্গি।

দোতলাটা ভাড়া-দেওয়া। সমীরণের বিয়ের আগে থেকে এই ব্যবস্থা—ভাড়ার টাকায় সংসার চলত। নিচের দুটো ঘর নিয়ে এরা আছে। বাইরের ঘর—যেখানটা গুণেশ এসে বসেছে। অন্যটা শোবার ঘর, মাঝের দরজা ভেজানো। চেয়ে চেয়ে গুণেশ বাইরের ঘরের অবস্থা দেখে, উঠে গিয়ে তারপরে ভেজানো দরজা একটুখানি ফাঁক করে ও-ঘরে উঁকি দেয়। পুষ্পিতাও এমনি সময় দোতলা থেকে নেমে এসে ঢুকল। জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে এসেছে—চাদর, বালিশ, টেবিলক্লথ, তোয়ালে, এমন কি দেয়ালে টাঙাবার ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি দু'খানা। রজনীগন্ধার গুচ্ছ সমেত ফুলদানি। যেখানে যেটি মানায়—দ্রুত-হাতে সে ঘর সাজাচ্ছে। এমনি সম্পর্কই বটে আজ পুষ্পিতার সঙ্গে—বাইরের কোন মহাকুটুম্ব যেন এসেছে, অগোছালো আটপৌরে ঘর তাকে দেখানো যাবে না। হোটেলে জিনিসপত্র ফেলেই এই যে ছুটতে ছুটতে বেহালা অবধি এল—এসেছে যেন পুষিকে দেখতে নয়, তার ঘরবাড়ি দেখতে। দু-খানা হাত দশখানা হাতের মতো করে ঝাড়পোঁছ করছে ঐ দেখ—এটা সরাচ্ছে ওটা ঢাকা দিচ্ছে, শাড়ির আঁচল ফেরতা দিয়ে কোমরে বেঁধে কী খাটুনিটা খাটতে লেগেছে! আর বাইরের ঘরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে গুণেশ ভাবছে: যাই ফিরে। সাজিয়েগুছিয়ে পুষি এসে দেখবে, যার জন্য এত সমস্ত—সে মানুষ চলে গেছে। খাসা হবে।

হেনকালে সমীরণ। ঘরে পা দিয়ে সে অবাক: গুণেশ না?

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: আরে আরে, গুণি এসে কুটুম্ব হয়ে আলগোছে দাঁড়িয়ে আছে—

আর পুষ্পিতা ঘর সাজানোর কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে এল দুয়ের মাঝখানে। সমীরণকে আগলে দাঁড়িয়ে বলে, ওমা, তুমি যে অবেলায়? অফিস ছুটি হয়ে গেল?

হতভম্ব হয়ে সমীরণ বলে, অফিস?

খিলখিল করে হেসে পুষ্পিতা বলে, বুঝেছি গো বুঝেছি, পালিয়েছ আজকেও। রোজ রোজ এমন ভাল নয়, দেখে ফেলবে কোন দিন।

মালার মতন সমীরণের কণ্ঠলগ্ন একেবারে—গুণেশ রয়েছে তা বলে সমীহ নেই। হাসছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে চোখের ঝিলিক দিয়ে বলছে কত কি! কত দূর থেকে গুণেশ এসেছে, তা একবার তাকিয়েও দেখতে দেয় না।

হঠাৎ এক সময় পুষি যেন সম্বিত ফিরে পায়: চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি—দেখ ভুলো-মন আমার! তোমরা গল্প করো দাদা, চা নিয়ে আসছি।

পুষি চলে যেতে সমীরণ গুণেশকে জড়িয়ে ধরল: কবে এলি কলকাতায়, থাকবি কত দিন?

অভিমান ভরে গুণেশ বলে, তবু ভাল, কথা বলার ফুরসত হল এতক্ষণে।

দেখলি তো চোখের উপর। উপায় ছিল? ইচ্ছা মতন কিছু বলতে গেলে মুখই চেপে ধরত হয়তো।

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নিচু করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সমীরণ বলে, অফিস না ঘোড়ার-ডিম—তোর বোন ধাপ্পা দিয়েছে তোর কাছে। চাকরি বাকরি আমার ধাতে সয় না। অবস্থা বিবেচনা করে জুটিয়ে ছিলাম এক চাকরি, মাস পুরতে না পুরতে ইস্তফা দিলাম। সেই সঙ্গে একটা থাপ্পড়ও দিচ্ছিলাম মনিবের গালে, বিস্তর কষ্টে সামলে নিই। তোর কাছে ফাঁস না করি, পুষি সেই সমস্ত সমঝে দিল। অত যে নাচন-কোঁদন, তুই ভাবলি প্রেমে গদগদ অবস্থা—কিছু নয় দাদা, অভিনয়। কানে কানে আমায় পরামর্শ দিচ্ছে, তুই যাতে ধরতে না পারিস।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলে, হায় রে কপাল, তোর কাছেও ধাপ্পা দিতে বলে। বোন হয়ে নিজেও তাই করে গেল।

গুণেশ এ সব কথার মধ্যে যায় না। বলে, চাকরি করিস নে—সংসার কি করে চলছে। ভাড়া তো পাস যদ্দুর জানি—

পঞ্চাশ টাকা। পুরানো ভাড়াটে—বাড়ানোর কথা বললে রেন্ট-কনট্রোলারের ভয় দেখায়। সংসার কেমন চলছে! যে চাদরে বসেছিস, তুলে দেখ একটুখানি।

নিজেই একটা দিক তুলে ধরে। নোংরা শতচ্ছিন্ন। মানুষে ব্যবহার করে না এমন জিনিস—মড়া শুইয়ে শ্মশানে পাঠালে সে মড়াও বোধকরি গা-মোড়া দিয়ে 'উঁহু' বলে উঠবে। হেসে হেসে সমীরণ তাই দেখাচ্ছে।

বলে, কেমন ঢেকেঢুকে তোর বোন সংসার চালায় দেখ। বাইরে থেকে টের পাবি? কিন্তু চাদর আমাদের সর্বসাকুল্যে এই একখানা—শোবার ঘর কিসে ঢাকবে কে জানে?

জানে সেটা গুণেশ, নিজ চক্ষেই দেখেছে। একটুখানি ইতস্তত করে সে বলে, তুই যদি কিছু মনে না করিস সমীরণ—

সমীরণ লুফে নিয়ে বলে, টাকা ধার দিতে চাস—এই তো? দিস তাই, কিছু মনে করব-না। পাম্পে জল তুলতে হলে এক বালতি দু-বালতি জল

আগে তার মধ্যে ঢালতে হয়। সেই একটা বালতিরও সম্বল নেই বলে আমার এত দুর্দশা। নইলে বুদ্ধি মগজে টনটন করছে—

পুষ্পিতাকে দেখে চুপ হয়ে যায়। ঝকঝকে রূপোর গ্লাসে জল ও উলে-বোনা আসন নিয়ে সে ঢুকল।

গুণেশ বলে, চা দিবি, তা আসন কি হবে রে? চায়ের কাপ হাতে হাতে দিয়ে দে।

পুষ্পিতা বলে, গৃহস্থবাড়ি যা-ই দেব আসনপিঁড়ি হয়ে খাবে, হাতে কেন দিতে যাব?

মেঝেয় জল ছিটিয়ে ঠাঁই করে রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে এল। ভারিক্কি আয়োজন—থালা-ভরা গরম লুচি, বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি, প্লেটে মিষ্টান্ন।

গুণেশ হেসে বলে, চায়ের জল চাপিয়েছিস বলে ছুটে গেলি। চা তরল পদার্থ, এই তো জানতাম।

তা-ও হবে। এগুলো আগে চেটেমুছে শেষ করো, তারপর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ খাওয়া দেখে পুষ্পিতা চা আনতে যায়। সমীরণকে বলে, একটা জিনিসও পড়ে না থাকে—দেখবে তুমি।

ফেলবিনে কিছু গুণি—

সমীরণ গিয়ে মেঝের উপর গুণেশের পাশটিতে বসে পড়ল। নিম্নকণ্ঠে বলে, অনেক হাঙ্গামা করে এসব জুটিয়েছে। কাটলেট দোকানের। লুচিটা মনে হচ্ছে বাড়িতে ভাজা—ওদের চাকরকে দিয়ে ঘি আনিয়ে নিয়েছে। থালা-গেলাস-বাটি কোনটাই আমাদের নয়, উপর থেকে চেয়ে আনা।

গুণেশ রাগ করে বলে, পুষির সঙ্গে রাগারাগি তোর? কেন ওর সংসারের কুচ্ছো করতে বসলি?

সত্যিই রাগ হচ্ছে। অবস্থা বাইরে ঢেকেঢুকে বেড়াক, তাই বলে তোর কাছেও? বোন হয়ে এত পর ভাববে কেন ভাইকে?

রাগের মধ্যেও সমীরণ হেসে ফেলল। বলে, থেকে যা, তুই আমাদের বাড়ি, ধাপ্পা কতক্ষণ টেকে দেখি। বেশি নয়, রাতটুকু অন্তত থাক। দেখবি থালাবাটি নিয়ে নিয়েছে ওরা—আমাদের কলাইয়ের থালা বেরিয়েছে। ধবধবে বালিশ-চাদর লোপাট। আমরা কি খাই কিসের উপর শুই, নির্ভেজাল সেই আদত চেহারা দেখবি।

চা করে নিয়ে এবারে পুষ্পিতাও এসে বসল। খানিক গল্পগাছার পর গুণেশ বলে, চলি এবারে পুষি। আছিস ভালো দেখে গেলাম। মাকে সব বলব।

পুষ্পিতা বলে, বাঃ রে, কথা হল না হোটেলে গিয়ে স্যুটকেস নিয়ে তুমি চলে আসবে। দরদ তোমার মুখে মুখে দাদা।

বরকে সাক্ষি মানে: দেখছ? চুপ করে রইলে কেন গো, তুমিও বলো।

সমীরণ কিন্তু একেবারে উল্টো কথা বলে, অফিসের কাজে এসেছে গুণি, তারা খরচা করে পাঠিয়েছে। বেহালা থেকে যাতায়াতে বড্ড ধকল হবে বেচারির।

হোক গে, আমি জানিনে। জানতে চাইনে আমি—

অবুঝ মেয়ে বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না, জেদ ধরে বলে, অতদূর থেকে দাদা এসে চোখের দেখা দিয়ে চলে যাবে, কিছুতে তা হবে না।

সমীরণের দিকে চেয়ে অভিমানের সুরে বলে, বাড়ি তোমার, তুমিই যদি উল্টোপাল্টা বলো, কেন দাদা থাকতে যাবে?

সমীরণ বলে, চাকরি যে আমিও করি—মনিবের ভাবগতিক বুঝি। বোনের বাড়ি থাকতে গিয়ে যদি চাকরি খোয়াতে হয়, সে জিনিসে সায় দেব কেমন করে?

বেরুল গুণেশ, সমীরণ ট্রামরাস্তা অবধি এগিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ এক সময় সমীরণ বলে, থাকলে পারতিস গুণি। গল্পে গল্পে রাত ভোর করে দিতাম, পুষি এসে হুমকি দিয়ে পড়ত সেই আগেকার মতো।

গুণেশ বলে, এখন এই কথা বলছিস—আর পুষি যখন বলল, তুই-ই তো বাগড়া দিচ্ছিলি।

নিরিবিলি এবারেই মনের কথা বলছি, তখন বলেছিলাম মন-রাখা কথা।

হেসে উঠে সমীরণ বলতে লাগল: যেমন যেমন শিখিয়ে দিল, তোতা-পাখির মতন তাই বলে গেলাম। বরে-বউয়ে তর্কাতর্কি দিব্যি শোনাল—না রে? মনের কথা তার মধ্যে বলতে গেলে রক্ষে রাখত না পুষি। কষ্টে-দুঃখে সংসার চালায়, বুঝিস তো—মাঝে মাঝে মোটা টাকা গুঁজে দিতে পারতাম, তা হলে জোর খাটত বউয়ের উপর।

বড়রাস্তায় এসে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়ে গুণেশ গভীর কণ্ঠে বলল, এখানে তোদের কাছেই থাকব ইচ্ছে ছিল। পুষি আমার আদরের বোন, তার মুখ চেয়েই থাকলাম না। ঘরণী হয়েছে, ঘরের চেয়ে বড় অহঙ্কার কিছু নেই তার কাছে। সে অহঙ্কার ভাঙতে দিতে পারিনে। চেষ্টা কর্ টাকাপয়সা করতে, সে তুই ঠিক পারবি। তখন এসে থাকব।

চলতি ট্রাম পেয়ে গুণেশ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

ভোলেনি এদের গুণেশ, বম্বে ফিরে গিয়ে সমীরণকে টাকা পাঠিয়েছিল। হাজার দুই মাত্র। প্রতিভাধর সমীরণ—সেটা গুণেশ নিঃসংশয়ে জানত। একটা অতি-ছোট কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি করল সেই টাকায়। এই জিনিসটা সমীরণ ভাল বোঝে—এমনি কোন ব্যবসা গড়ে তুলবে, পাঠ্যজীবন থেকে স্বপ্ন দেখে এসেছে। ফল ফলতে দেরি হল না—কিছু সরকারি সাহায্য এবং বাইরের মূলধনও আসছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে মাঝারি এক প্রতিষ্ঠান—ভারত কেমিক্যালস করপোরেশন। নাম শুনে থাকবেন।

টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছে গুণেশ, কলকাতায় আসছে। বালিগঞ্জে একটা ভাল জমির সন্ধান পেয়েছে, স্বচক্ষে দেখে পছন্দ হলে বায়না করে যাবে। সমীরণ নিজে গাড়ি নিয়ে এরোড্রোম গেছে। উল্লাসে লাউঞ্জ থেকেই চেঁচাচ্ছে: এসেছি আমি—

বেহালার সেই পৈতৃক বাড়ি—কিন্তু চিনবার উপায় নেই। ভাড়াটে তুলে দিয়ে ভেঙেচুরে আধুনিক ঢঙে গড়ে নিয়েছে—বড়লোকের বসবাসের জন্য যেমনটা হওয়া উচিত।

গুণি এসে গেছে, ও পুষ্প—

হেলতে দুলতে পুষ্পিতা দেখা দিল—এর চেয়ে বেশি দ্রুত আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই পুষি কে বলবে! বিষম মোটা—বড়লোকের বাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে। গুণেশ পরিহাস করতে যাচ্ছিল: বাড়িটার মতন তোকেও আর চেনা যায় না রে—

হাসি মুছে যায়, মুখের কথা মুখে আটকে থাকে। হঠাৎ পুষ্পিতা ক্ষেপে গেল, চক্ষু বিঘূর্ণিত করে বলে, ঝাঁটা আন ওরে বাচ্চুর-মা। ঝাঁটা, ঝাঁটা—

সভয়ে গুণেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। অজান্তে কী অপরাধ করেছে, ঝাঁটা চায় কি জন্যে?

দাসীর বাচ্চুর-মা ঝাঁটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল। পুষ্পিতা খিঁচিয়ে ওঠে: শুধু-ঝাঁটায় কাজ হবে, জল লাগে না?

চাকরের উপর হুঙ্কার দেয়: দাঁত মেলে দাঁড়িয়ে রইলি, ঝাড়ন কোথা?

অপরাধ এতক্ষণে বোধগম্য হল। গুণেশের জুতোয় কাদা—এরোড্রোমে মোটরে উঠবার সময় লেগেছিল বোধহয়। মার্বেলের মেজের উপর কাদার ছাপ পড়েছে। ঢোকবার সময় পাপোষে ভাল করে জুতো ঘষে নেওয়া উচিত ছিল। অবহেলা করেছে—অপরাধ অমার্জনীয় বইকি! পর্বতাকার দেহ নিয়ে পুষি নিজ হাতে ঝাঁটা ধরেছে, বাচ্চুর-মা বালতি থেকে জল

চালছে, চাকরটা উবু হয়ে ঝাড়ন দিয়ে ঘষতে ঘষতে এগোচ্ছে। সমারোহ ব্যাপার। নিশ্চল নিঃশব্দ গুণেশ বজ্রাহতের মতো দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সমীরণ হাত ধরে টানল: চলে আয়। হাঁ করে দেখার কি—এ আমাদের নিত্যিদিন চব্বিশঘণ্টার ব্যাপার।

গুণেশও ততক্ষণে ধকল কাটিয়ে উঠেছে। বলে, বড় আনন্দ হল। একদিন এই বাড়িতেই দুটো এঁদো ঘর নিয়ে ছিলি তোরা—

পুষ্প লজ্জা পাবে, সেই ভয়ে তুই পালিয়ে গেলি। বলেছিলি, মনে আছে, আমাদের টাকাপয়সা হলে তখন এসে থাকবি? খুব বেশি না হোক, হয়েছে মোটামুটি। তোর কথা ঠিক থাকে যেন গুণি।

গুণেশ প্রস্তাব করে: উপরে নিচে ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখি। বড় ভাল লাগছে।

ব্রেকফাস্ট হয়ে যাক, তার পরে।

কিন্তু হোস্টেসই যে ঝাঁটা নিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই একটা চক্কোর হয়ে যাবে।

একটা কেন, তিন চক্কোর হয়ে যাবে আমাদের। চল্ –

হাসতে হাসতে সমীরণ বলে, যদ্দুর অবধি জুতোর দাগ, বাহিনী নিয়ে ধোয়ামোছা করতে করতে এগোবে। তুই আমি কিছু দেখছি নে—তার মধ্যেও পুষ্প দাগ দেখতে পায়। অনুবীক্ষণ হার মানে ওর চোখের কাছে।

ঘর দেখে গুণেশ অতিশয় প্রসন্ন। সত্যিকার টান আছে মামাতো বোনটির উপর। বিয়ের পর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে আজ এদের এত ঐশ্বর্য।

পাঁচ বছর আগে এসেছিল, সেদিনের সঙ্গে তুলনা করছে: দুটো মাত্র ঘর, তাই ভদ্রস্থ করতে বোন আমার হিমসিম খাচ্ছিল। চাদর-বালিশ থালা-বাটি চেয়েচিন্তে আনল—উঞ্ছবৃত্তি না দেখতে পেরে পালিয়ে গেলাম আর এবারে কত দামের জিনিসপত্র কতদিকে ফেলানো ছড়ানো—

সমীরণ ঘাড় নাড়ে: ফেলানো-ছড়ানো একটাও নয়—যেখানকার যেটি, ঠিক করে রেখে দিয়েছে। ইঞ্চি দুই সরিয়ে রাখ্, তা-ই বা কেন—হাত দিয়ে ছুঁয়ে দে একবার, তা-ও পুষ্প ধরে ফেলবে। ঐ যে বললাম, আলাদা রকমের চোখ—আমাদের একজোড়া চোখ, ওর বোধহয় তিন নম্বরের বাড়তি চোখ একটা অদৃশ্য রূপে রয়েছে। বিশ্বাস না হলে পরখ করে দেখতে পারিস। তোলপাড় পড়বে ঐ জুতোর কাদার মতোই, মেরামতে কতক্ষণ লাগে, ঠিকঠিকানা নেই। কাজ নেই রে ভাই, ব্রেকফাস্টে বাগড়া পড়ে যাবে।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে তবু তোলপাড়—নিদারুণ ভাবেই। বোধকরি অতি-মাত্রায় সতর্ক হতে গিয়েই গুণেশের চামচে থেকে ধবধবে চাদরে স্যুপ পড়ে গেল। এক ফোঁটা দু-ফোঁটার বেশি নয়। পুষ্পিতা যেন বিদ্যুতের শক খেয়ে তাকিয়ে পড়ে। খাওয়া ঘুচে গেছে। তাকায় একবার গুণেশের মুখে, আর একবার চাদরের দিকে। ব্যক্তিটি নিতান্তই তার গুণি-দাদা, এবং সেই ব্যক্তি সুদূর বম্বে থেকে এসে পৌঁছল—এই খাতিরে চুপচাপ রয়েছে। কিন্তু কতক্ষণই বা পারা যায়—

শেষটা—মুখে কিছু নয়, তড়াক করে উঠে পুষ্পিতা পাতিলেবুর টুকরো এনে চাদরের সেই জায়গায় ঘষছে। দেরি সইল না, গুণেশের একেবারে চোখের উপরে। গুণেশ হতভম্ব—কোন এক মহাপাপ করে ফেলেছে যেন।

সতিক বুকে সমীরণ বলে, হাত গুটিয়ে বসলি কেন গুণি? খা, লেবু ঘষছে—হাত তো চেপে ধরেনি তোর।

তা বটে! চেষ্টা করল গুণেশ, কিন্তু হাত কাঁপে গ্রাস তুলতে গিয়ে। পুষির মুখে তাকাতে সাহস করে না—না-জানি কী অগ্নিকাণ্ড চলছে সেথায়। চামচে থেকে ফোঁটা দুই স্যুপ পড়ে এই কুরুক্ষেত্র। হাত কেঁপে গোটা চামচেটাই যদি পড়ে যায় টেবিলে, অথবা ঘরের মেজেয়? ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই বাবা, চুপচাপ একটুক্ষণ থেকে উঠে পড়া যাক।

সমীরণ প্রবোধ দিচ্ছে: স্যুপ পড়েছে—মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে নাকি? ইচ্ছে করে তো ফেলিস নি। আমারও কত সময় পড়ে—

এবং সেই পড়াটা আজকেও হল আবার। বলার সঙ্গে সঙ্গেই। প্লেটের এক প্রান্ত বাঁহাতে উঁচু করে সমীরণ চামচেয় তুলে তুলে খাচ্ছে, পুষ্পিতা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সযত্নে চাদরে লেবু ঘষছে—প্লেটটা হঠাৎ বেহিসাবি রকম উঁচু হয়ে গিয়ে যাবতীয় তরল বস্তু পুষ্পিতার শাড়ির উপর। বাহারের শিফন শাড়ি পরেছে, নাকি প্যারিসের আমদানি। স্যুপ নয়, যেন নাইট্রিক এসিড ছুঁড়ে দিল নিষ্ঠুর স্বামী। শাড়িতে নয়, বুঝি তার গায়ের উপরেই। এসিডের জলুনির মতন আর্তনাদ করে সে ছুটে বেরুল।

মুহূর্তমাত্র—তার পরে সারা বাড়ি নিঃশব্দ। পুষ্পিতা নিচের তলাতেই নেই, উপরে উঠে গেছে—শাড়ির দুর্দশায় সম্ভবত অচেতন হয়ে সোফার উপর পড়েছে। অথবা, হতেও পারে, বাথরুমে ঢুকে শাড়ি কাচতে বসে গেছে। মোটের উপর ডাইনিং-রুমের এদিকটা সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব।

গুণেশ এদিক-সেদিক চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, ইচ্ছে করেই করলি তুই। এমনি পড়েনি। এমন চমৎকার শাড়িটা নষ্ট করে দিলি।

সমীরণ সগর্বে সায় দিল : হ্যা—

সাংঘাতিক এক রণজয় করেছে, এমনিতরো ভাব। বলে, তোর জন্মেই গুণি। আদরযত্ন করে বাড়িতে এনে অতিথিকে উপোস করাতে পারিনে। সুস্থ হতে পুষ্পর সময় লাগবে—আধ ঘণ্টা অন্তত। ততক্ষণের ছুটি। হাতের পাঁচআঙুলে মাখামাখি করে ইচ্ছাসুখে হল্লাফুর্তি করে ছুটির-খাওয়া খাব।

মুখে যা বলল, কাজেও তাই অমনি। চেয়ারের উপর উঁচু হয়ে হয়ে বসে কাঁটা-চামচে সরিয়ে হাতে তুলে গোগ্রাসে খাচ্ছে। একবার মুখ তুলে গুণেশের দিকে চেয়ে বলে, গরিব ছিলাম। অভাবে-অনটনে তখন পেট ভরে খাইনি, বড়লোক হয়ে এখনো পেট ভরে না। মাস্টারনি চোখ পাকিয়ে আছে, হেরফের হলেই ধমক দেবে—খাওয়া যায় তার মধ্যে? ঘুমের বেলাও ঠিক তাই। বালিশ-বিছানায় যেখানে যেটুকু কুঁচকে গেছে, জেগে উঠে সকলের আগে সমস্ত চৌরস করে তবে সোয়াস্তি।

এক লহমা থেমে আবার বলে, সোয়াস্তি পুষ্পরও কি আছে? একদিন সোয়াস্তি ছিল না ঘরের গরিবানা চাউর হয়ে পড়ে পাছে। এখনকার অস্বস্তি, যেমনটি যেখানে তেমনি সব ছিমছাম থাকে যাতে। ঘরবাড়ি আসবাবপত্তোর আদবকায়দার মধ্যে ওর প্রাণ—রূপকথার রাক্ষসীদের যেমন ভোমরার মধ্যে প্রাণ থাকত।

গুণেশ ভয়ের কথা পাড়ে: ফেলে ছড়িয়ে টেবিল নোংরা করে রাখছিস। সুস্থ হয়ে নেমে তো আসবেই পুষি। এখন না হল, দু-দণ্ড পরে। তখন?

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে সমীরণ বলে, তা-ও ভেবে রেখেছি। কিছু বলতে গেলে হো-হো করে ছাত-ফাটানো হাসি হাসব—সেই এককালে তোর সঙ্গে যেমন হাসতাম। অব্যবহারে প্রায় যা ভুলেছি। বড়লোকের ফ্যাশানদুরস্ত বউয়ের সে জিনিস সহ্য হবে না—পুনশ্চ মূর্ছা। এমনি করে ছুটি বাড়িয়ে যাব যতক্ষণ তুই আছিস। তারপরে—

ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিল বুঝি। বলে, পরের কথা ভাবব না। আখের ভেবে উপস্থিত-সুখ যে নষ্ট করে, সে হল পয়লানম্বরি আহাম্মক।

কল্পতরু

বাসু মল্লিক গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম। সে নামের উল্লেখ নিষেধ। ইদানীং পরিব্রাজক শ্রীমৎ বাসবানন্দ স্বামী। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি পায়ের নিচে। কাগজে খবর বেরোয়ঃ পরিব্রাজক মহারাজ আজ অমুক জায়গায়, কাল তমুক জায়গায়। ভক্তদল মুকিয়ে থাকেন, আমাদের কলকাতা শহরে আবার কবে পদরজ পড়বে? এবং কোন ভক্তগৃহ ধন্য করবেন এবারে?

যে পাড়ায় যার বাড়িতে পরিব্রাজক মহারাজের আস্তানা, আগেভাগে থানায় এত্তেলা দিতে হয়। মেলা জমে। ট্রাফিক-পুলিস হিমসিম খেয়ে যায় মোটর চলাচলের বিধিব্যবস্থায়। বন্যাস্রোতের মতো মানুষের স্রোত সেই মুখো। রাত থাকতে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি। সন্ধ্যার পরে মহারাজ ধ্যানঘরে আশ্রয় নেন, তখন আর কেউ থাকতে পায় না। ফুলের দাম চড়ে গিয়ে দুনো তেদুনো হয় সেই অঞ্চলে। দু-গাছি করে মালা নিয়ে আসেন ভক্তরা, মহারাজকে পরিয়ে দেন। মহারাজ তার মধ্যে একটি খুলে ভক্তের গলায় পরান। আশীর্বাদী মালা। ভববন্ধন-মোচনের উপদেশ দেন মহারাজ। দুই কানে সেই উপদেশামৃত পানের জন্য ভক্তেরা দূর-দূরান্তর থেকে ছোটে। কী মধুর কণ্ঠস্বর, শানাই কোথায় লাগে! গীতা ও ভাগবত পাঠ হয়, শোরি মিঞার গান তার কাছে নস্যি।

কিছুকাল থেকে পরিব্রাজক মহারাজ বরানগরে বেচু শিকদারের বাড়ি এসে উঠছেন। বেচু ইদানীং প্রধান শিষ্য। ছায়ার মতো সাথেসঙ্গে ঘোরে। উপদেশামৃত বর্ষণের মুখটায় বেচু ঝকমকে রুপোর থালা পেতে দেয় মহারাজের সামনে। মুষলধারে নোট পড়তে থাকে। মোহর পড়ে, হীরের আংটি পড়ে, মবচেন পড়ে, কাঁচাটাকাও পড়ে কিছু কিছু। এ ছাড়া বিদঘুটে মানত থাকে কারও কারও—সোনার কেয়ূর-কঙ্কন দিলেন এবারে একজনা। এক বিধবা দিলেন সোনার কাজ-করা লপেটা জুতা। মহারাজের সামনে এনে নিবেদন করেন, যদি তিনি একটুখানি স্পর্শ দেন। কী বিদঘুটে আশা বিবেচনা করুন—ঐহিক বস্তুতে অঙ্গ ঠেকাবেন মহারাজ! ভক্তরা অগত্যা বলে, জিনিসগুলো আসনের উপর রেখে দাও বেচু, আলটপকা নজর যাতে পড়ে।

মহারাজ বিষম বেজার ভক্তদের ব্যাপারে। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যানঃ এ সমস্ত কি! ঠাকুরের নাম করতে বসি, চোখের উপর তোমরা ছাই-মাটির

পাহাড় করে রাখ। এমনি অত্যাচার করলে হিমালয়ের গুহায় ডুব দেব, কোনদিন আর দেখতে পাবে না।

বেচু শিকদার পাকা লোক। মহারাজকে কি করে সামলাতে হয়, সে জানে। সমান তেজে বেচুও বলে, ছাই বলুন মাটি বলুন, এক কাচ্চাও তো ঘরে থাকে না। সূর্য হয়ে যদি টেনে নিলেন, বৃষ্টির জলে সমস্ত ঢেলে দিয়ে অবসর। কতই তো দিয়েছে এ যাবৎ ভক্তজনে, একখানা আস্ত সিকি বের করুন দিকি তবিল থেকে। তবে বুঝব।

মুখের মতন জবাব পেয়ে মহারাজের আর রাগ দেখানোর উপায় থাকে না। হেসে ফেললেন: কথাই তো তাই। কিছুই যখন থাকে না, ভূতের বোঝা কেন এমন বাঁধাছাঁদা কর? খেটেখুটে কার জন্য লিস্টি করছ?

কানে কথা না নিয়ে বেচু অবিচলভাবে কাঁচাটাকা গণে গণে থাক দিচ্ছে। আংটি ও মোহর কতগুলো পড়ল, লিস্টি করে যাচ্ছে।

কথা শোন বেচারাম! ভক্তদের মানা করে দাও। খালি-হাতে যেন সকলে আমার কাছে আসে।

বেচু মুখ তুলে প্রশ্ন করে, যখন কল্পতরু হবেন, তখনকার উপায় কি? অন্ত-লোকে থাকেন যে-সময়টা, কিছুই টের পান না। আমাদেরই ভাবতে হয়। অভাবী লোক কাতর হয়ে এসে হাত পাতবে, কী দেবেন তাদের হাতে।

জবাব দেবার কিছু নেই। বেকুব হয়ে মহারাজ মৃদু মৃদু হাসেন।

জো পেয়ে গিয়ে বেচু শিকদার ফলাও করে বলে, ধনীরা ভক্তি ভরে দিয়ে যান, দরিদ্র লাভবান হয়। আপনি নিমিত্ত হয়ে করেন, আমরা মাঝে পড়ে একটু খেটেখুটে দিই। হেন অবস্থায় কেমন করে আপনার আপত্তি মানতে পারি বলুন।

বাসবানন্দ বলেন, বিচার করে দেখলে তাই বটে। কিন্তু কি জান, ঐশ্বর্যের ছায়ামাত্র দেখলে মন আমার কুঁকড়ে আসে। অস্বস্তি জাগে। সেখানে যুক্তি-বিবেচনার ঠাঁই নেই। কথা দাও তবে, যত-কিছু জমা হয় কল্পতরুর সময়টা সমস্ত হাতের কাছে ধরে দেবে তুমি। পাইপয়সার বস্তু ঘরে থাকবে না। তুমি যদি দায়িত্ব নাও, সেই বিশ্বাসে যা-হোক করে সামলে নেব।

পরহিতের জন্য বেচারাম শিকদারকে সেই কঠিন দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ভক্তেরা যা দিয়ে যাচ্ছে, কাল তার তিলেকমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না—সমস্ত কল্পতরুতে শেষ হয়ে যাবে। এতক্ষণের বাগবিতণ্ডায় মন বিক্ষিপ্ত—মহারাজ ধ্যানঘরে ঢুকে দরজা দিলেন।

মহারাজ' যা-ই বলুন, ভক্তকুল ভারি প্রসন্ন বেচুর উপর: তুমি আছ বেচারাম, তাই রক্ষে। নইলে এই যত প্রণামী মহারাজ হয়তো আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিতেন।

বেচারাম জুড়ে দেয়: দিয়ে হিমালয়ে পালাতেন। হিমালয়-হিমালয় করে বড্ড ঝুঁকেছেন। আমি ঠেকিয়ে আসছি। নরলোকের কল্যাণে ওঁকে ধরে রাখতেই হবে। এত যে প্রণামী দেখছ, কাল সকালে কিছুই নেই— কল্পতরু হয়ে দানসত্র করে দিয়ে পুরোপুরি ফোকতারাম।

কল্পতরুর ব্যাপারটা সবিশেষ জানবার জন্য ভক্তরা বেচারামকে চেপে ধরে: কী রকম অবস্থা হয় তখন? কি করেন?

লক্ষণাদির যথাযথ বর্ণনা দিল বেচারাম। বলে, সেই অবস্থায় যে যা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। এতকাল ধরে এত যে পুণ্যফল জমিয়েছেন, জোর করে চাইলে তা-ও বোধহয় দেবেন।

আমাদের রাতুলকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভক্তদলের মধ্যে জেঁকে বসেছে। সে জিজ্ঞাসা করে, এইসব আংটি-মোহর যদি চেয়ে বসে, দিয়ে দেবেন?

তা ই তো চায় ঐহিক মানুষ। আসল বস্তু চাইতে তো দেখলাম না কাউকে। প্রণামীর থালাখানা সেই সময় সামনে নিয়ে ধরি। যে যা চায়, মহারাজ নেশার ঘোরে হরির লুঠের মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেন।

রাতুলও সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে: যায় যাকগে ছাইভস্ম জিনিস। আসলের কপর্দক যাচ্ছে না—তা হলেই হল।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত দিয়েথুয়ে দেন, কিছু রাখেন না?

সগর্বে বেচু শিকদার বলে, সমস্ত। নতুন আবার না পড়ল তো খোদ মহারাজকেই নিরম্বু উপোসি থাকতে হবে! হর্ষবর্ধনের সেই দানযজ্ঞের মতো। একদিন কী হল—যে থালার উপরে প্রণামী পড়ে, সেই থালা অবধি দান করতে যাচ্ছেন। আন্দাজ পেয়ে আমিই প্রতিগ্রাহী হয়ে থালাখানা ভিক্ষে নিলাম। আমার জিনিস এখন, ওঁর দানের এক্তিয়ার নেই।

রাতুলকৃষ্ণ তারিফ করে: খুব কায়দা করে আটকেছেন কিন্তু জিনিসটা। সত্যিই তো, ভক্তজনের প্রণামী পড়বে, জায়গা একটা চাই তার জন্যে। থালা না থাকলে কিসের উপর সবাই দেবে?

পরিব্রাজক মহারাজের কল্পতরু হয়ে বসার কথা মুখে মুখে অনেক দূর অবধি রটনা। নানা জনে এসে বেচুকে শুধায়, কোন সময়টা হয় বলুন দিকি?

বেচারাম উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, পাঁজিপুঁথি দেখে তিথিনক্ষত্র ধরে হয় না তো! স্বেদ-কম্পন ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সহ দশাপ্রাপ্ত হন হঠাৎ।

চেহারা দেখতে দেখতে ভিন্ন রকম হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, এইবারে—

রাতুল পরমোৎসাহে বলে, বটে বটে! রোজই একবার করে হয় অন্তত?

তার কোন মানে নেই। একদিনে হয়তো দু'বার—তিনবার। আবার কোনদিন হলই না।

মুশকিল তবে তো!

বলে রাতুল তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, ধুলোমাটি জিনিসের আমি কোন পরোয়া করিনে। মহারাজের সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা একটিবার শুধু চোখে দেখবার বাঞ্ছা।

রাতুলকৃষ্ণ যে ইস্কুলে পড়েছে, বনমালী ভট্টাচার্য সেখানে সেকেণ্ড-পণ্ডিত ছিলেন। রিটায়ার করার পর বড় অর্থসঙ্কটে আছেন। তার উপরে কন্যাদায়। বিয়ে ঠিকঠাক, কিন্তু খরচার জোগাড় হচ্ছে না। একদিন এসে রাতুলকে ধরলেন: তুমি একটা উপায় কর বাবা। কী করি বলে দাও।

রাতুল বলে, আজেবাজে জায়গায় ঘুরে কী হবে। বাসবানন্দকে গিয়ে ধরুন—কল্পতরুর সময়টা। শুনেছি, যে যা চায় পেয়ে যায়। শ-পাঁচেক টাকাও যদি অন্তত বাগাতে পারেন—

পণ্ডিত বলেন, আমিও সেই রকম শুনেছি। চেষ্টা ঢের করেছি, কিন্তু সময়টা ধরতে পারছি নে। কত ভক্তজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সকলের এক গতিক। একজন বললেন, তাঁর ফসকে গেছে অতি অল্পের জন্যে। টাটকা দশা ভেঙেছে মহারাজের—তখনও রেশ আছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। আবোল-তাবোল বকছেন, স্বাভাবিক জ্ঞান আসেনি। বেচারাম ধরে তাঁকে ধ্যানঘরে পুরে ফেলল।

বলেন, আমি হদ্দ চেষ্টা করেছি বাবা। বেচারামের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাত থাকতে গিয়ে বসেছি। দুপুর গড়িয়ে যায়। বেচা বলে, দেরি আছে পণ্ডিতমশায়। অভুক্ত আছেন আপনি, খেয়েদেয়ে আসুন গে। নাকে-মুখে গুঁজে পৌনে-দুটোর মধ্যে ছুটেছি। বেচা বলে, এই যাঃ, এক্ষুনি তো হয়ে গেল।

ইতস্তত করে পণ্ডিতমশায় বলেন, মহাপুরুষের ব্যাপার—বলতে নেই—কিন্তু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আজ অবধি একজনকেও পেলাম না। পাপ-মনে এক এক সময় সন্দেহ জাগে—

রাতুল হেসে ঘাড় নাড়ে: সন্দেহের কিছু নেই। পারমার্থিক তত্ত্ব মহারাজ ঢালাও দান করে যান। কিন্তু ঐহিক বস্তু সে রকম নয়, একবারের

বেশি দু-বার কাউকে দেন না। আর ঐ একবার যে পেয়ে গেল, ঈশ্বর-লাভের জন্য সে আর ঘোরাঘুরি করে না। একেবারে হাওয়া।

বনমালী পণ্ডিত রাতুলের হাত জড়িয়ে ধরলেন: তুমি ভক্তমানুষ। সর্বদা যাতায়াত তোমার ওখানে। এই কাজটা আমার করে দাও, বড্ড ঠেকে গেছি। যা তুমি বললে—খান পাঁচেক একশ' টাকার নোট অন্তত।

একটু ভেবে রাতুল বলে, দেখা যাক কদ্দুর কী করা যায়। সময় ঠিক বের করে ফেলব। আপনি এখন আসুন গে পণ্ডিতমশায়।

দিন দুই কেটেছে। মিথ্যা ভরসা দেয় না রাতুল। বেচুর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না—বেচুর বাড়িতেও নয়, এদিক-সেদিক খুব ঘোরাঘুরি করছে, সুলুকসন্ধান নিয়েছে। দুইদিন পরে রাত্রি ন'টার সময় সে ট্যাক্সি নিয়ে বনমালীর বাড়ি চলে এল: উঠে পড়ুন পণ্ডিতমশায়। এক্ষুনি।

বনমালী ভট্টাচার্য রাত্রে যৎসামান্য ছানা-চিনির ফলার করেন। সবে কেবল আচমন করে বসেছেন। রাতুল বলে, খেতে গেলে ফসকে যাবে। উঠে আসুন শিগগির। ট্যাক্সিতে উঠুন।

ট্যাক্সিতে উঠে বনমালী জিজ্ঞাসা করেন, কল্পতরু লেগে গেল বুঝি?

হুঁ—। বলে রাতুল ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া দিচ্ছে: জোরে—খুব জোরে। এক টাকা বেশি ধরে দেব।

পণ্ডিতকে একবার বলল, বৃদ্ধমানুষ আপনি। মহারাজের চেয়ে বয়সে বড়। তায় ব্রাহ্মণ। পা ধরতে যাবেন না, হাত জড়িয়ে ধরবেন আমি যখন ইশারা করব। পা ধরলে মহারাজ চটে যাবেন, কিছুই হবে না।

বেচারামের বাড়ির অদূরে ট্যাক্সি ছেড়ে টিপিটিপি দু-জনে বৈঠকখানায় বড় আলমারির আড়াল হয়ে দাঁড়াল। একটি ভক্তও আর এখন নেই। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সকলের কাজকর্ম মিটিয়ে সন্ধ্যাকালে একটু ভ্রমণে বেরোন। একেবারে গঙ্গাস্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে ফেরেন। ফিরে এসে নিঃশব্দে ধ্যানঘরে ঢুকে পড়েন। আজকে এখনো প্রত্যাগমন হয়নি, রাতুল খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। আহারে ভণ্ডুল ঘটেছে, বনমালীর সেজন্য কিছু ক্ষোভ আছে। বললেন, কল্পতরু শুরু হয়েছে বলে ছুটোছুটি করে নিয়ে এলে। মহারাজেরই তো খবরই নেই।

রাতুল বলে, এসে পড়বেন এক্ষুনি, সময় হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নামবেন একেবারে কল্পতরু অবস্থায়। কিন্তু ঐ যা বললাম—পা ধরে বলে মহারাজ বিরক্ত হন। হাত ধরে ফেলবেন আপনি। বেচু শিকদার হুমকি দিতে পারে—কানে নেবেন না।

বলতে বলতেই মোটরগাড়ি এসে থামল। বেচারামের টু-সীটার গাড়ি—চালাচ্ছে বেচারাম নিজেই। নেমে পড়ে স্বামিজী বৈঠকখানায় ঢুকলেন। বনমালী চক্ষের পলকে ধ্যানঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান। রাতুল তাঁর পাশে।

বাইরে থেকেই বেচু হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: অ্যাঁ, কী চাই তোমাদের? সারাদিন ধরে এই কাণ্ড চলেছে। স্বামীজি নিজের কাজে বসবেন একটু, ধ্যানঘরে যাবেন। সেই ফাঁকটুকুও দেবে না?

ছুটে ঘরের মধ্যে এসে বলে, বেরিয়ে যান। দরকার থাকে, কাল সকালবেলা আসবেন।

থতমত খেয়ে বনমালীপণ্ডিত রাতুলের দিকে তাকান। রাতুল অবিরত ইঙ্গিত করছে। শুভক্ষণ সমাগত। এক্ষুনি—এই মুহূর্তে হাত ধরতে হবে।

আগের শেখানো কথাগুলো বনমালী আবৃত্তি করে যান: আমি যাব না মহারাজ। মেরে ফেললেও নড়ব না। মেয়ের বিয়ে আসন্ন। আপনাকে হাত ধরে বলছি—

বেচু শিকদার চিৎকার করে ওঠে: স্বামীজীর হাত ধরবে, এত বড় আস্পর্ধা! রামকৃপাল সিং—

হাত উঁচিয়ে বনমালী ভট্টাচার্য সত্যি সত্যি এগিয়ে আসেন। বাসবানন্দ ত্বরিত বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন, কত চাই জিজ্ঞাসা কর বেচারাম। টাকার অঙ্কে বলতে বল।

বনমালী শেখানো কথা বললেন, পাঁচ-শ' টাকা—

দিয়ে দাও বেচারাম। আমি বলছি, শিগগির নিয়ে এস।

বনমালী আবার বলেন, আর আংটি একটা বরের জন্য।

কল্পতরু অবস্থা চলছে বাসবানন্দের। বললেন, ভাল দেখে একটি আংটিও নিয়ে এস বেচারাম।

মহারাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি। এঁরাও ধ্যানঘরের দরজায়। বেচারাম ভিতর থেকে টাকা এনে গণে গণে পাঁচশ' মিলিয়ে দিল। তারপর ঠকাস করে আংটিটা টেবিলের উপর ঠুকে বলে, হল তো? বিদেয় হন।

আশীর্বাদ নিয়ে ভক্তদ্বয় দরজা ভেজিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দাঁতে দাঁত ঘষে বেচারাম বলে, আপদ!

মহারাজ বললেন, পা ধরলে ক্ষতি ছিল না। হাত ধরবার বায়নাক্কা মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল রে! ইন্দ্রত্ব চাইলেও তো না দিয়ে উপায় ছিল না। দুয়োর এঁটে দাও বেচু, আবার এসে কেউ না জ্বালায়।

বেচারাম দরজায় খিল দিল, ছড়কো তুলে দিল। মহারাজের হাতে বিলাতি কারণবারি—এক বোতল হুইস্কি। পশমি অলবাসের নিচে ঢাকা। গুরু আর প্রধানশিষ্য অতঃপর ধ্যানঘরে প্রবেশ করলেন।

ভেজালের উৎপত্তি

চাল-তেল মাছ-মিঠাইয়ের আকাল। আবার ভূতেরও আকাল যাচ্ছে, সেটা ঠাহর করেননি বোধহয়। কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে কত ভূতের-বাড়ি ছিল, ভুলেও কেউ ছায়া মাড়াত না, ভূত সরে গিয়ে এখন মানুষ কিলবিল করে সে সব জায়গায়।

বাড়িওয়ালাদের প্রতি অনুকম্পা বশত ভূতেরা শহরের বাস তুলে পাড়াগাঁয়ে আস্তানা জুটিয়েছে, তা-ও নয়। ভূতের উপদ্রব পাড়াগাঁয়েই বা কই? দু-একটা যা শোনেন অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, ভূত নয় তারা—ভূতবেশী মানুষ। বলতে পারেন মানুষভূত। এরা টিট হয় রোজার মন্ত্রে নয়, সরকারের আইনেও নয়, পাড়ার ছোঁড়ারা জুটেপুটে যখন সহিংস দাওয়াই প্রয়োগ করে। মোটের উপর রোজার রুজিরোজগার বন্ধ—দিনকে-দিন তারা উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শহরের অগুন্তি হানাবাড়িতে, এবং পল্লীর শ্মশানে গোরস্থানে বাঁশবাগানে এত যে ভূত থাকত, গেল কোথায় তারা সব?

শুনুন বলি। কিন্তু তারও আগে জন্মান্তর-তত্ত্বটা কিঞ্চিৎ সড়গড় করে নিন।

ধরুন, মরে গেলাম। আপনারা নন, বালাই ষাট!—আমি একলা। মৃত্যুর পর দেহ-খাঁচা থেকে আত্মা ছাড় পেল। যমদূত ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি যমের দরবারে হাজির করে দেবে। রেজেস্ট্রি-খাতায় আত্মা নম্বরভুক্ত হল, তারপরে ছুটি। এই অবস্থার নাম ভূত। পরলোকের কর্তারা সাতিশয় বিবেচক—দেহ-খাঁচার অভ্যন্তরে এতদিন কষ্ট করে এলে, ছুটি ভোগ করো এবারে। যদ্দিন না আবার আহ্বান আসছে।

তাই করে বেড়ায় ভূতেরা। গাছের চূড়ায় চড়ে প্রাণ ভরে মুক্তবায়ুর নিশ্বাস নিচ্ছে খানিক, ঝুপ করে নেমে পড়ে ঢিলপাটকেল ছুঁড়ছে এর বাড়ি তার বাড়ি, কিম্ভুত-কিমাকার মূর্তি ধরে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছে, এলোচুলে ডবকা ছুঁড়ি দেখে শেষমেশ তার কাঁধেই বা চেপে পড়ল। রোজা এসে লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধরে, গালিগালাজ করে, পিটুনি দেয়—কিছুতে না পেরে কড়া

মন্তোরের ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ ছাড়ে শেষটা। ভূত অগত্যা এই কাঁধ ছেড়ে পছন্দসই আর-একটা দেখে নিয়ে সেখানে চড়ে বসল। রোজারা আবার হানা দিয়ে পড়ে।

চলে এমনি ভূতের নৃত্য—তারপরে একদিন তলব এসে যায়। পিতামহ ব্রহ্মা ফরমান পাঠিয়েছেন: আড়াই লক্ষ বাচ্চা গর্ভগত হয়েছে, অতএব সমপরিমাণ আত্মার জরুরি আবশ্যক। চিত্রগুপ্ত লিস্টি করে দিলেন, দূতগণ ভূতের আস্তানায় আস্তানায় ছুটোছুটি করছে: ফুর্তিফার্তি অঢেল হল, আবার কি! ডিউটিতে ঢুকে পড় এবারে।

সেই বন্দীজীবন। দুই পাঁচ পনের পঁচিশ পঞ্চাশ—তেমন তেমন আয়ুষ্মান হলে নব্বুই-পঁচানব্বুই বছর অবধি টানবে। মানুষটা না-মরা অবধি ছুটি নেই। খোদ ব্রহ্মার হুকুম, তার উপরে আপিলও চলবে না। মুখ চুন করে ভূতেরা ফের আত্মা হয়ে নির্দিষ্ট ভ্রূণের মধ্যে ঢুকে গেল।

এই নিয়মে চলে আসছে বরাবর। কাজ বড় কষ্টের, তবে দুই জন্মের ফাঁকে ভৌতিক স্ফূর্তিতে কষ্টের অনেকখানি উশুল করে করে নিত। ইদানীং অবস্থা বড় জটিল—ছুটি কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় ধেয়ে আসছে। এই বেরুল এক দেহ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহে ঢুকে পড়ার পরোয়ানা। নিশ্বাস ফেলার ফুরসত দেয় না। জন্মের হার নাকি সাংঘাতিক রকম বেড়েছে, আত্মার জোগান দিতে হিমসিম হয়ে যাচ্ছেন যমালয়ের প্রভুরা।

জন্মাচ্ছে দেদার, আবার ওদিকে মরণ ব্যাপারটা লোপ পেয়ে যাবার গতিক। ভাল ভাল অষুধপত্তোর বেরুচ্ছে—সেসব অষুধ ডেকে কথা কয়, রোগ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সার্জারিও এমনি নিখুঁত, একটা আস্ত মানুষ কেটে দু-খণ্ড করে বেমালুম আবার জুড়ে দিচ্ছে। ফলে যমরাজের সেরেস্তায় কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। এবং ধরণীতে হু-হু করে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফ্যামিলি-প্ল্যানিং-এর বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে—নিতান্তই বালির বাঁধ, স্রোতের মুখে দাঁড়াতে পারছে না।

বিষম গণ্ডগোল—যেমন এই ধরালোকে, তেমনি পরলোকেও। ছুটি বন্ধ হয়ে বিক্ষুব্ধ ভূতেরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু এত করেও তো সামলানো যায় না। উপর থেকে ঘন ঘন তাগাদা: আত্মার সাপ্লাই অভাবে সৃষ্টি বানচাল হয়ে যাবার গতিক। তার সঙ্গে কড়া-নোটও আসে সরাসরি যমের নামে: সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন কাল জুড়ে তিন টার্মে রাজত্ব করলে—লোভ ছাড়ো এবারে, পোর্টফোলিও কোন কর্মঠ তরুণ দেবতার চার্জে দিয়ে দাও।

ব্যাকুল হয়ে যমরাজ নিজেই সেকসনে ছুটলেন। ম্যানেজার চিত্রগুপ্ত টেবিলে পা তুলে নাসাধ্বনি করে ঘুমুচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে কৈফিয়ৎ দেয়: কাজ না থাকলে ঝিমুনি ধরবে। বসেই তো আছি নিমতলা-কেওড়াতলার মতো অহোরাত্রি অফিস সাজিয়ে। মরে না মানুষ- কী করব?

দূতগুলো তোমার কি করে? শুয়ে বসে আর তাস খেলে ভুঁড়ি যে ওদের পর্বতাকার হল! ধরাতলে নেমে পড়ুক।

চিত্রগুপ্ত মিনমিন করে বলে, মরে গেলে তার পরেই তো ওদের কাজ—আত্মা এনে হাজির করে দেওয়া। মরে না যে!

যম খিঁচিয়ে উঠলেন। পুরানো নবাবি চাল ছাড়ো দিকি। আপোসে একটা লোকও মরবে না, বিনি ক্যানভাসিং-এ আপনা-নিয়মে কাজ হবার দিনকাল চলে গেছে। দূতেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখুক। আত্মা জোটাতে না পারলে বরখাস্ত করবে। এখন গদি চেপে লাটসাহেবি করছ—চাকরি গেলে একটা দারোয়ানের কাজেও ডাকবে না, মনে রেখো।

চাকরির দায় বড় দায়। যমদূতেরা ডুড়দাড় বেরিয়ে পড়ল। চিত্রগুপ্তও চুপচাপ থাকতে পারে না—চাকরির উদ্বেগে নিজেও বেরুল এক সময়।

গিয়ে হাজির কলকাতা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক ঝানু লেখকের বাড়ি। দোতলা ছিমছাম বাড়িখানা—ঠিকানা বলব না, বাড়ির সামনে খাটিয়া পেতে দুটো হিন্দুস্থানী গোয়ালা ঘুমুচ্ছে—এই থেকে যদি চিনে নিতে পারেন। নিচের ঘর দুটোয় লেখকের মা ও বাবা আছেন, উপরটায় লেখক একলা। অকৃতদার, এবং ঘুরানো সিঁড়ি রাস্তা থেকে সোজা দোতলায় উঠে গেছে—প্রেমচর্চারও সুযোগ-সুবিধা প্রচুর।

রাত দশটা। কামারের হাপরের মতো শাঁ-শাঁ একটা আওয়াজ আসছে একটানা। ছায়ামূর্তি প্রথমটা সেই নিচের ঘরে ঢুকে মা-জননী বলে ডাক দিল: হাঁপানির বড় কষ্ট মা-জননী, প্রাণ যেন নিঙড়ে বের করে।

বেরোয় না তবু যে আপদবালাই—মরলে তো বেঁচে যেতাম।

একটা কথা ছুঁড়েই চিত্রগুপ্ত এতখানি ফল প্রত্যাশা করে নি। তবে যে মানুষের বদনাম দেয়, প্রাণ কড়া-মুঠোয় আঁকড়ে ধরে থাকে, মরতে চায় না কিছুতে!

পুলকিত চিত্রগুপ্ত আরও তাতিয়ে দিচ্ছে: রত্নগর্ভা আপনি মা, আপনার লেখক-ছেলেকে দুনিয়াসুদ্ধ একডাকে চেনে। আপনার মরা তো পাঁচি-খেঁদির মরা নয়—মরে দেখুন, কী মজা তখন। কাগজে কাগজে সচিত্র শোক-সংবাদ,

আপনার লেখক-ছেলের ভক্তরা সব খোল বাজিয়ে খই-পয়সা ছড়িয়ে মিছিল করে নিয়ে যাবে—

মা-জননী প্রলুব্ধ কণ্ঠে বলেন, লোক আসবে অনেক, মচ্ছব হবে, কাগজে ছবি উঠবে—বানিয়ে বলছ না তো বাবা? সত্যি?

সত্যি না ঝুটো, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন। না, মেলাবেন আর কেমন করে—তখন যে মরে গেছেন। ফুল দিয়ে খাট সাজিয়েছে, ফুলে ফুলে মড়া দেখবার জো নেই। পুলিসে ভাবতে পারে, মড়াই নয়—কেরোসিনের টিন খাটে তুলে ফুলে ঢেকে ব্লাকে পাচার করছে। সেই সেকালে ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন - মনে পড়ে মা-জননী? আবার তেমনি।

মা-জননী মহোৎসাহে বলেন, বটে বটে!

মড়ার খাট তো শ্মশানে নিয়ে নামাল। ডবল-চিতে সাজিয়ে ফেলেছে ওদিকে—কিলো কিলো চন্দনকাঠ। এক-ঝিনুক ঘি লোকে খেতে পায় না, টিন টিন ঘি ঢালছে চিতের আগুনে—

চিতের তুলে আগুনে দগ্ধাবে? ওরে বাবা, ওরে বাবা—

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে মা-জননী আর্তনাদ করে ওঠেন: সেটি হচ্ছে না, আগুনে পুড়তে পারব না বাপু। ভীষণ জ্বালা করে। বাঁ-পায়ে কেটলির জল পড়ল সেবার, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিলাম। সে তবু একখানা মাত্তোর পা, চিতের উপর কোনো অঙ্গই বাকি রাখবে না। সে ছিল গরম জল, এবারে চিতের গনগনে আগুন।

পাকা-ঘুঁটি কেঁচে যায়, চিত্রগুপ্ত মনে মনে নিজের গালে চড়াচ্ছে। বর্ণনা এতদূর না টানলেই ভাল ছিল। ঠাণ্ডা করার মানসে বলে, ধর্মীয় আপত্তি না উঠলে কবরের ব্যবস্থাও হতে পারে।

না বাপু, অন্ধকারে থাকতে পারিনে, ঘরে আমার সারারাত আলো জ্বলে। মাটির নিচে ঘুরঘুট্টি পাতালে থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না।

কিছু বিরক্ত হয়ে চিত্রগুপ্ত শুধায়: তবে কি রেখে দিতে বলেন দেহটা?

ওয়াক-থুঃ, পোকা পড়বে, গন্ধ-গন্ধ হবে—

ধৈর্য হারিয়ে মা-জননী গর্জে উঠলেন: মোলো যা! ঘরে শুয়ে আমি হাঁপ টানি আর জগঝম্প বাজাই—কোথাকার কোন মুখপোড়া এসে মরা-মরা করছে দেখ! বেরো—

কথাবার্তার মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁপানির বিরাম ছিল। শোধ নিচ্ছেন তার, প্রাণপণে হাঁপাচ্ছেন। চিত্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকে—হাঁপানি কমলে আবার

দু-এক কথা বুঝিয়ে বলবে। না, এ হাঁপানি রাতের মধ্যে কমবে না—চোখ পাকিয়ে মা-জননী হাত নেড়ে দিলেন।

ছায়ামূর্তি অগত্যা চলল পাশের ঘরে।

তথায় পিতা—কর্তামশায়। তাঁর অবস্থা বিপরীত। শব্দসাড়া নেই, আফিমের নেশায় ঝিম হয়ে আছেন। ও-ঘরের মা জননী তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় বিয়ের সময় কর্তার বয়স চুয়াল্লিশ, মা-জননীর চোদ্দ। ছাকা তিরিশটি বছরের ব্যবধান।

তালগোল পাকিয়ে কর্তামশায় তক্তাপোশের উপর শুয়ে আছেন। অথবা বসেই আছেন—দু-রকমই হতে পারে। শোওয়া-বসার তফাত করার অবস্থা নেই।

ছায়ামূর্তি পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভাব জমাচ্ছে: বয়স কত হল কর্তামশায়?

তোমার কি দরকার বাপু?

বলেই বুঝি হুঁশ হল, কথা বাড়ানোয় তাঁরই ক্ষতি—মৌতাত চটে যাবে, তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। বললেন, আটের কোঠার শেষাশেষি—অষ্টাশি কি উননব্বুই।

কী সর্বনাশ!

চিত্রগুপ্ত আঁতকে ওঠে। এমন বেয়াড়া রকম বাঁচলে আত্মার দুর্ভিক্ষ হবে ছাড়া কি! বলেই ফেলল, এদ্দিনে তিন বার অন্তত মরা উচিত।

কর্তা বলেন, মরা কি আমার হাতে?

আপনার হাতে বই কি! ধরুন, দোতলার ছাতে উঠে আলশের উপর থেকে হাত-পা ছেড়ে যদি রাস্তায় পড়েন। এ বয়সে ধকল সামলাতে পারবেন না, নির্ঘাত মরবেন।

কর্তা বললেন, উঠব কেমন করে ছাতে? হার্টের দোষ—সিঁড়ি ভাঙতে গেলে বুক ধড়ফড় করে।

তবে রাস্তায় নেমে লরি চাপা পড়ুন গে। ড্রাইভারগুলোর পাকা হাত—তিনটে চারটে একসঙ্গে চাপা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যায়। কাজখানিও এমনি নিখুঁত, মানুষগুলো রাস্তার ওপরেই খতম। হাসপাতাল অবধি বড় যেতে হয় না।

কর্তা করুণ কণ্ঠে বলেন, গাঁটে গাঁটে বাত—মাটিতেই পা ছোঁয়াতে পারিনে, রাস্তা অবধি কেমন করে যাই? হাড়গোড়-ভাঙা দ হয়ে পড়ে আছি, দেখতে পাও না? সাত-সাতটা বছর এই অবস্থা।

কথা-কথান্তরে মৌতাত কিছু চটে গিয়ে থাকবে। কৌটো খুলে আফিমের

একটা বড়ি তিনি মুখে ফেলে দিলেন। আশায় আশায় চিত্রগুপ্ত বলে, এক তাল আফিমই তবে খেয়ে নিন না। হাতের কাছে রয়েছে—কষ্ট করে উঠে বসতেও হবে না, শুয়ে শুয়ে কাজ হয়ে যাবে।

আফিমের আকাল চলছে, জানো না বুঝি? লাড্ডু সাইজের খেতাম, মালের অভাবে এখন সরষে প্রমাণ ধরেছি। কে হে তুমি এ বাজারে এসে তাল তাল ফরমাস দিচ্ছ?

লোলুপ চোখে কর্তা তাকিয়ে পড়লেন চিত্রগুপ্তের দিকে: এই ক'টা বছর কায়ক্লেশে বাঁচতে পারলে হয়। বলি ঘাঁত-ঘোঁত আছে নাকি জানা? দাও না কিছু মাল জুটিয়ে।

অনুরোধের জবাব না দিয়ে কৌতূহলী চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন করে: কি হবে এই ক'টা বছর পরে?

সমস্ত হবে—কল্পতরু হয়ে যাবে আমাদের সরকার। চাল-চিনির পাহাড়, দুধ-সর্ষেরতেলের সমুদ্দুর। ষষ্ঠ প্লানের শেষাশেষি কোন-কিছুর অনটন থাকবে না, কর্তারা কসম খেয়েছেন। বাইশ বছর কষ্ট করেছি, আরও না-হয় দশ বারোটা বছর। সে তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে!

নাঃ, বুড়োহাবড়া দিয়ে হবে না। বেশি দিন বেঁচে বেঁচে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—পুরানো অভ্যাস ঘোচানো কঠিন। তেড়েফুড়ে চিত্রগুপ্ত এবারে ঘুরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় খুদ লেখকের কাছে গিয়ে উঠল। ছটকো বয়স—মরলে এরাই মরতে পরে। মরেও তাই—ভাল কাজে, এবং মন্দ কাজেও।

কুহুর খবর জানো?

প্রশ্নটা লেখকের কানে যায় না, কানে যাবার সময় নয় এখন। পূজোর লেখার চিন্তা। আঙুল টনটন করছে, মাথা ফোঁপরা—যা-কিছু ছিল, ছাড় করিয়ে দিয়েছে ছ'টা উপন্যাস ও পুরো ডজন গল্পে। তবু লিখতে হবে, না লিখে পরিত্রাণ নেই, হাঁ করে বসে আছে সব। পাকেপ্রকারে শাসিয়েও গেছেন কেউ কেউ: বিজ্ঞাপনে নাম ছেপে বসে আছি—লেখা না দিলে কোর্টে দাঁড়াতে হবে কিন্তু।

নাছোড়বান্দা চিত্রগুপ্ত কানে না ঢুকিয়ে ছাড়বে না। বলে, তোমার কুহু যে উড়ছে।

মুখ না তুলে লেখক অন্যমনস্কভাবে বলে, আগরতলা না এর্নাকুলাম? আমায় যেন বলেছিল মামদোভূত না পিসভূত কি রকমের দাদা আছে ঐ ঐ জায়গায়।

অদূরে নয়, এই শহরের ভিতরেই। ভেবে ভেবে তুমি মাথার চুল ছিঁড়ছ, ট্রামে-বাসে সিনেমায়-রেস্তোরাঁয় দিব্যি সে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ হেন মর্ম-ছেঁড়া সংবাদে লেখক খুব যে বিচলিত হয়েছে, মনে হয় না। কলম তুলে আঙুল মটকে তাকাল সে একবার।

বিশ্বাস হয় না? বেশ, মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়াও গে—শো ভাঙলে দেখতে পাবে, সোমের সঙ্গে গলাগলি হয়ে বেরুচ্ছে।

লেখক বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখন নয়। দশটা লেখার দাদন নিয়ে বসে আছি। লেখাগুলো হয়ে গেলে তখন একদিন আসবেন, ভাল করে শুনব।

তদ্দিনে বেহাত হয়ে যাবে তোমার কুহু—

তাচ্ছিল্যের সুরে লেখক বলে, কুহু গেল তো দেবিকা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রিকারা সব রয়েছে। ভিন দেশেরও আছে—আফরোজা, ফিলোমেলা। ট্রাম একটা চলে গেলে আমি পিছনে ছুটিনে, পিছনে কত কত আসছে!

সময়ের আর অধিক অপব্যয় না করে লেখক ঘাড় নামিয়ে খসখস করে কলম চালাতে লাগল।

ছিঃ ছিঃ, প্রেমের মাহাত্ম্য শুধু কাগজে-কলমে: নিজের বেলা দিব্যি কেমন হাত ঘুরিয়ে দিল। গল্পের মধ্যে হতাশ-প্রেমিক ডজন-ডজন তুমি বধ করে ফেল—হিটলারের গ্যাস চেম্বারও হার মেনে যায়। গল্পের চরিত্র মরে গিয়ে ভূত হয় না যে-টের পেতে তা হলে বাছাধন! গল্পের ভূত লেলিয়ে দিতাম, দলবদ্ধ হয়ে এসে ঘাড় মটকে যেত তোমার।

রাগে গরগর করতে করতে চিত্রগুপ্ত যমলোকে ফিরল। যমদূতরাও শূঁয়ে শূঁয়ে ফিরে এলো সর্বদেশ থেকে। একই খবর—আপসে কেউ মরবে না দুটো-চারটে ফটকো ছোঁড়া ছুঁড়ি ছাড়া। ভাল ভাল বচন ছাড়ে: মরণের শতপথ খোলা—মরণ মানেই পরাজয়। বাঁচা মানে শতেক সংগ্রামে জয়ী হয়ে বর্তমান থাকা। কবিতা আওড়ায় আবার: 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' আরে বাপু, সে যখন ছিল তখন ছিল। কবিগুরু বেঁচে থাকলে ভুবনের নতুন চেহারাটা দেখে কবিতার লাইন স্বহস্তে পালটে দিতেন। কিন্তু শুনছে কে! হাত ঘুরিয়ে সবাই পথ দেখিয়ে দেয়। এক ডাগড়া মেয়ে পায়ের স্যাণ্ডেল তুলেছিল, যমদূত তখন পালানোর দিশা পায় না।

যমরাজ আর চিত্রগুপ্ত মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন। আত্মার দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর উপায়টা কি?

মাথা খুলে গেল হঠাৎ—চিত্রগুপ্তেরই। বলে, ভেজাল—

একটুখানি ভেবে নিয়ে কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে, অব্যর্থ দাওয়াই। রামা-শ্যামা ইতরজনদের কাছে যাওয়া ভুল হয়েছে—যেমন আছে থাকুকগে, ওদের ঘাঁটা দিয়ে কাজ নেই। দূতরা চলে যাক এবারে সেরা সেরা লোকের কাছে—যারা ম্যানুফ্যাকচার, বিজনেস-ম্যাগনেট। পাইকার-দোকানদার-গুলোকেও চোখ টিপে আসবে। প্ল্যানটা লুফে নেবে ওরা। দুধে নর্দমার জল, চায়ে চামড়ার কুচি, চালে কাঁকর, ওষুধে ময়দা ময়দায় তেঁতুল-বীচি- এ সমস্ত বহু-পরীক্ষিত পুরানো রেওয়াজ—কোলের বাচ্চাটা অবধি জানে। চুমরে দিলে মাথা আরও কত শত নতুন মশলা বের করবে। ভেজাল খেয়ে কতকাল মানুষ 'সুন্দর ভুবন' আঁকড়ে ধরে থাকে, দেখা যাক।

প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভাল করে বিবেচনা করে দেখে যমরাজ সায় দিলেন: মন্দ বলো নি—কাজ হতে পারে।

পরমোৎসাহে চিত্রগুপ্ত বলে, ভি. আই. পি. রাজপুরুষের কাছেও দূতরা যাবে। জেনেশুনে তাঁরা যাতে চোখ বুঁজে থাকেন। তা থাকবেন নিশ্চয়ই —কাজটা আসলে তাঁদেরই তো। ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালিয়ে ফলের আশায় ভবিষ্যতের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়—ভেজালে তড়িঘড়ি ফলপ্রাপ্তি। ঠিক মতন চালু হলে জনসংখ্যা তরতর করে নেমে আসবে।

যমরাজ ভাবছিলেন। তাঁর মাথায় সহসা আলাদা এক প্ল্যান চাড়া দিয়ে উঠল। বলেন, নরলোকে থাদ্যে ভেজাল দিক—আমরাও এদিকে আত্মার ভেজাল চালিয়ে যেতে পারি। মানুষ-আত্মার আকাল তো ভ্রূণের মধ্যে গরু-গাধা নেড়িকুত্তা-পাতিশিয়ালের আত্মা ঢুকিয়ে যাও। সাপ-ছুঁচো কেন্নো-বিছেতেই বা দোষ কি? বায়ুভূত নিরাকার জিনিস—ভাল রকম মিশাল করে করে দিও, বুড়ো ব্রহ্মার পিতামহও ধরতে পারবে না।

সেই জিনিস চলছে। নরসমাজে ইদানীং এত যে জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব, গূঢ় রহস্য এইখানে।

ওনারা

চেনাজানা নেই বলেই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আছেন। মানুষের সঙ্গে বিরোধ নাকি ওনাদের—মানুষ কিসে জব্দ হয়, সেই ফিকির সর্বদা। গাঁ-গ্রামের মানুষ আমরা কিন্তু বলি উল্টো কথা: অতিবড় সুহৃৎ আমাদের। আমায় না মানলেন, রমণী দাসীকে আলবৎ মানবেন—খাল-বিল জল-জাঙাল, বনজঙ্গলে

গেলে, গোটা ত্রিভুবনই যার পায়ের তলে। নটবর চৌকিদারকেও মানতে হবে—নীল-জামা গায়ে চড়িয়ে মাথায় পাগড়ি পরে কোমরে চাপড়াশ এঁটে নিশিভোর যে গৃহস্থ সামাল দিয়ে বেড়ায়।

রাত বাড়ে। আসর ছেড়ে দিয়ে আমরা তো শয্যা নিলাম, ওনাদেরই তখন চলাফেরা কাজকর্ম রঙ্গরসিকতা। চিরকাল পাশাপাশি থেকে দহরম-মহরম দস্তুরমতো আমাদের উভয় তরফে। ঝগড়া-কচকচি কি আর হয় না—একসঙ্গে থাকতে গেলে সময় বিশেষ একটু-আধটু হবেই। দুটো ঘটি-বাটি এক জায়গায় রাখলে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়, এ তবু—

এই দেখুন, উপমায় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিলাম 'এ তবু মানুষ' —ঢোঁক গিলতে হল। একপক্ষ আমরা মানুষই বটি, কিন্তু দেহের জেলখানা থেকে ছাড় পাবার পর ওনারা আমাদের সঙ্গে এক-ব্রাকেটের অন্তর্ভুক্ত কেন হতে যাবেন! এবং দেহ বাতিল করে বায়ুভূত অবস্থায় যখন আছেন, ঠোকাঠুকিই বা কেমন করে হবে?

চটে যাচ্ছেন—নাম না ধরে 'ইনি' 'উনি' বলে অত খাতির কিসের? আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম করতে নেই। সাহসে কুলায় না, কবুল জবাব দিচ্ছি। ছা-পোষা গৃহস্থমানুষ, ক্ষমতা দেখলেই 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করি আমরা—লুকোছাপা নেই। বাদাবনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ আর নেই—তিনি হলেন 'বড়মিঞা'। বউদেরও দেখুন না। গাঁয়ের পুরুষ অদ্যাপি প্রতাপশালী—ভদ্রলোক কিংবা স্ত্রীলোক হয়ে যায়নি। কোন বউ সেই কারণে শ্বশুর-ভাসুর বা বরের নাম ধরবে না। মরে গেলেও না। দক্ষিণ-বাড়ির মেজোবউর অসুখ হলে ধনঞ্জয় কবিরাজ অষুধ দিয়ে গেলেন। বড়জা জিজ্ঞাসা করে: অনুপান কি দিল রে মেজো. অষুধ কি দিয়ে খেতে হবে? মেজোবউ বলল, ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিটে। বুঝলেন কিছু? তুলসীপাতার রসে অষুধ মেড়ে মধু ছিটিয়ে খেতে হবে—কবিরাজের নির্দেশ। কিন্তু তুলসিচরণ হলেন ভাসুর এবং মধুসূদন স্বামী। নাম করবার জো নেই, ঠারেঠোরে বলতে হল।

হাসছেন, কিন্তু আপনারাই বা কি। ক্ষমতাবানের নাম ধরেন আপনারা, বলুন। পুঁটিরাম দাস স্বদেশি সভার চেয়ার-বেঞ্চি বয়ে এবং কারবাইড জেলে দিয়ে বরাবর দেশের কাজ করে এসেছে। স্বাধীনতার পরে তালেগোলে সে-ও এক মন্ত্রী। আপনাদের মুখে তখন আর পুঁটিরাম নেই—এইচ-এম অর্থাৎ অনারেবল মিনিস্টার। বাতে অথর্ব হয়ে সেই পুঁটিরামের মন্ত্রিত্ব গেল তো রাজ্যপাল হবার তদবিরে লাগল। আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে 'হিজ এক্সেলেন্সি'

জিভে শড়োগড়ো করতে লেগেছেন। তদ্বিরে কিন্তু কাজ দেয় নি, বাতের ব্যথা নিয়ে ঘরে ফিরতে হল তাকে। এবং ঘুরে-ফিরে, সেই 'পু্ঁটিরাম'ও নয়—'পুঁটে দাস' এবারে।

গাঁয়ের পুবদিকে তেপান্তর বিল। এখানে-সেখানে খানিক খানিক উঁচু জায়গা—দ্বীপের মতন। একটা জায়গার নাম বামুনভিটা—কোনো এক কালে ব্রাহ্মণের বাস্তভিটা ছিল সম্ভবত। পুকুর ছিল, ভরাট হয়ে গিয়ে এখন ক্ষুদ্র ডোবা। আর বেল ও তেঁতুলগাছ কয়েকটা, কালকাসুন্দে ভাঁট বৈচি ও ভাওড়ার জঙ্গল। আর আছে অতি-বিশাল এক বট—ঝুরির ঠেকনো দিয়ে বিস্তর কাল ঝড়ঝাপটা ঠেকিয়ে আসছে। সর্ব অঞ্চল থেকে এই বটগাছ দেখতে পাবেন। যত তুখোড়ই হোন, বিলে নেমে পথ ভুল হবেই—বটগাছ তখন নিশানা। বটতলায় দাঁড়িয়ে দিক সাব্যস্ত করে নেবেন। চাষবাসের মরশুমে ভর দুপুরে লাঙল ছেড়ে চাষীরা বটের ছায়ায় শুয়ে বসে জিরোয়, হালের গরু ডোবায় নেমে জল খায়। দিনমানে এই—সন্ধ্যার পরেও নিশানা বটগাছ। ভুলেও কিন্তু তখন বামুনভিটা মাড়াবেন না—খবরদার! ওনাদের আস্তানা - হাই তুলে গা-ঝাড়া দিয়ে এইবারে সব ভুঁয়ে নামছেন, বিষয়কর্মে বেরোবেন। নিতান্তই আপনার যাবার প্রয়োজন তো দু-তিন রশি অন্তত দূরে-দূরে যাবেন।

কত শতবার বামুনভিটায় গেছি—বটের ডালে ডালে যত পাতা তত বাদুড়। সারা দিনমান নিঃসাড়ে ঝুলে থাকে, সন্ধ্যা হলে সম্বিত পায় যেন সহসা—কালো পাখায় অন্ধকারের গায়ে ঝাপটার পর ঝাপটা মেরে চতুর্দিকে গাঁ-গ্রামে চরতে বেরোয়। নটবরের মতে বাদুড়ই নয় আদপে—ছলা-কলা ওনাদের, দিনমানে বাদুড়মূর্তি ধারণ করে থাকেন। স্বচক্ষে নটবর একদিন মূর্তি-বদলও দেখে ফেলেছিল—সহসায় বাদুড় বিকটাকার হল। সেই তিনি ঠাহর পেয়ে রেগেমেগে বললেন, দেখলি বুঝি? যে চোখে দেখেছিস, সেই চোখ দুটো খুবলে তুলে নেবো, দাঁড়া। নটবর ডরাতে যাবে কেন, অষ্টবন্ধন সেরে নিয়মরক্ষার তাগা-তাবিজ ধারণ করে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। বলল, ক্ষমতা থাকে চলে আসুন না, কে কার চোখ খুবলে নেয় দেখি। বেগতিক বুঝে উনি তখন সরে পড়লেন।

বামুনভিটার ডোবাটা হল আলচোরাদের আড্ডা (সংক্ষেপ করে আপনারা আলেয়া বলে থাকেন)। রাত্রি হলে জলতল থেকে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে সারা বিল গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ান। কালো রঙের মস্ত মস্ত হাঁড়া (রমণী দাসীর রূপ-বর্ণনা—হাঁড়ি আকৃতিকায় পেয়ে পুংলিঙ্গে 'হাঁড়া' নাম দিয়েছে)—

নিশ্বাস নেবার কারণে মুখগহ্বর ক্ষণে ক্ষণে হাঁ হয়ে পড়ে, ভক করে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে অমনি। মুখ বুঁজলে আবার অন্ধকার। ভীতু লোকে বদনাম রটায়, নাকি পথভ্রান্ত পথিককে আলোর ধাঁধায় ফেলে জলার দিকে নিয়ে ঘাড় মটকে রক্তপানের মতলব। বিলকুল মিথ্যে—আমার ভাইঝির কাছে শুনুনগে যান, প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ—

বর্ষা-রাত্রে একবার ডিঙিনৌকায় বিল পাড়ি দিয়ে বাপের বাড়ি আসছে, পথ ঠাহর পাচ্ছে না—দপ করে আলো জ্বলল দূরে। ঐ তো, গ্রাম তবে ঐদিকে—দ্রুত বোঠে বেয়ে সেইখানটা এসে দেখল, কোথায় কী, নিঃসীম জলরাশি কেবল। এবং দূরে আবার আলো দপ-দপ করছে। মাঝি বলল, গতিক ভাল নয় দিদিমণি, ধবজি পুঁতে এখানেই থেকে যাই। নির্ভীক ভাইঝি শুনল না: চিরকাল ওনাদেরই আশ্রয়ে আছি, আমাদের সঙ্গে কেন গোলমাল করবেন? চলো মাঝি, কোন চিন্তা নেই। চলতে হল হুকুম মেনে। সেই জায়গায় পৌঁছানোর পর আর কোনো দিকে নতুন করে আলো জ্বলে না। নিরিখ করে দেখা গেল, গাছগাছালির ফাঁকে দক্ষিণ-বাড়ির চিলেকোঠা। এসেই গেছি তবে তো—ওনারাই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

জাতবেজাত আছে দস্তুরমতো, মরে গিয়েও মানুষ জাত ছাড়ে না। ব্রাহ্মণ যিনি ছিলেন, এখনো বর্ণশ্রেষ্ঠ ওনাদের মধ্যে—ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদৈত্যও একটি নাকি আছেন বামুনভিটায়—যাঁর নামে বামুনভিটা, হয়তো বা তিনিই। বারোয়ারি নিবাস বটগাছে সকলের সঙ্গে থাকতে নারাজ বলে পবিত্র বেলগাছ একটা তাঁর জন্যে। ধবধবে পৈতে ঝুলিয়ে খড়ম খটখট করে এঁটোকাঁটা এড়িয়ে নিশিরাত্রে সতর্ক পদক্ষেপে বিচরণ করছেন—এমনি অবস্থায় নটবর বহুবার দেখেছে তাঁকে।

বাস্তুসাপ থাকে—সেকালে দক্ষিণ-বাড়িতেই একটি ছিল শুনেছি। খুব সহিষ্ণু—অন্ধকারে না দেখে ঘাড়ের উপর পা চাপিয়ে দিলেও কিছু বলত না। বাচ্চা ছেলেপুলে বড় প্রিয়, ঘুমন্ত শিশুর মাথার উপরে ফণা তুলে পাহারা দিত। সাপ ফণা মেলে রয়েছে, কার সাধ্য কাছে এগোয়! গর্ভধারিণী মা পর্যন্ত সাহস পান না। কাকুতিমিনতি করেন: খোকন দুধ খাবে, ছেড়ে দাও মা এবারে। ফণা নামিয়ে ধীরে ধীরে সাপ গর্তে ঢুকে গেল। পরের দিন মনসাতলায় দুধ-কলা দিয়ে গিন্নি আরও খুশি করে এলেন। খুশি ছিল সত্যিই সে গৃহস্থর উপর। মণিমাণিক্য কোথায় থাকে, সাপদের জানা—মাথায় কেউ কেউ মণিধারণ করেও বেড়ায়। জনশ্রুতি, একটা মণি দক্ষিণ-বাড়ির কর্তাকে দিয়েছিল। গাঁয়ের মধ্যে প্রথম দোতলা পাকাবাড়ি উঠল সেই মণি বিক্রির পয়সায়।

রাগও তেমনি প্রচণ্ড। সাবরেজিস্ট্রারবাবু বিলে পাখি শিকার করতে এসে দক্ষিণ-বাড়ি উঠেছিলেন। সাপে ব্যাঙ ধরেছে, ব্যাঙ কাতরাচ্ছে—সাবরেজিস্ট্রার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মারলেন সাপের মাথায়। ব্যাঙ ছেড়ে সাপ পালিয়ে গেল। কর্তা বললেন, সর্বনাশ করেছেন মশায়—কাকে ঘাঁটা দিলেন, জানেন না। সাত ক্রোশ দূরে মহকুমা-শহরে ফিরে গেছেন সাবরেজিস্ট্রার, সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়ে পাশায় বসেছেন। সাপ খোঁজে খোঁজে ঠিক চলে গেছে। এঁকে-বেঁকে সকলকে বাদ দিয়ে সাবরেজিস্ট্রারের পিঠের উপর ছোবল দিল, শত চেষ্টাতেও সে বিষ সাহায্য হল না।

মারা যাবার পরে মেজোবউও অমনি বাস্ত জুড়ে ছিল। দক্ষিণ-বাড়ির অবস্থা পড়ে গিয়েছে তখন, দোতলা কোঠাবাড়ি খসে-গলে পড়ছে। মেজোকর্তা মধুসূদন নড়াল-এস্টেটের নায়েব—সদরে থাকেন, বাড়ি কালেভদ্রে আসতে পান। এই সময়ে তৃতীয় কন্যা সুরি অর্থাৎ সুরবালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মাছনার বনোয়ারী দত্তর ছেলের সঙ্গে। চার-পাঁচ মাস হাতে রেখে লগ্নপত্র পাকা করেছেন, আয়োজন এই সময়ের ভিতরে সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। টাকাকড়ি যখন যা জোগাড় হয়, বাড়ি এসে মেজোবউর কাছে রেখে যান।

এক বুড়োমানুষ একদিন অতিথি হয়ে এলেন। বড়বউ বাপেরবাড়ি গেছে, মেজোবউ গিন্নি আপাতত। বউটা ভাল, অতিথ-অভ্যাগত এলে খুব যত্নআত্তি করে। আপ্যায়নে বৃদ্ধ গলে গেলেন একেবারে, শতেক বার মা-মা করছেন। আহারাদি অন্তে চলে যাবার মুখে মেজোবউকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, কিছু গয়না আছে আমার সঙ্গে। একজনে বেচতে দিয়েছে, বেচে দিলে কিছু কমিশন পাব। ক্ষিধের মুখে অন্ন দিয়েছ মা, তুমি যদি নিতে চাও সস্তা দরে দিয়ে দেব। গঞ্জ অবধি তা হলে আর যাইনে।

চোখ টিপে বললেন, ধর্মপথের জিনিস নয়—বুঝতেই পারছ। দশ জায়গায় যাচাই চলে না। এর বেশি আর দর উঠল না—সেই মানুষকে গিয়ে বলব। ব্যস, খতম।

গামছার পুঁটলি খুলে গয়না দেখালেন। বালা-তাগা-বিছেহার—ভারীসারি জিনিস, তবে প্যাটার্ন সেকেলে—ভেঙে নতুন করে গড়াতে হবে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মেজোবউর কাছে ষাটটি টাকা হল, মহদাশয় বৃদ্ধ তাতেই দিয়ে দিলেন। ষাট টাকায় নেহাতপক্ষে দেড়-শ টাকার জিনিস—দাঁও-মারা দস্তুরমতো। বোকাসোকা বলে মেজোবউকে মেজোকর্তা বিদ্রূপ করেন—বাড়ি এলে এইবারে জিজ্ঞাসা করব: কেমন?

তৎপূর্বেই বড়জা বাপেরবাড় থেকে ফিরে একেবারে বলিয়ে দিল: সর্বনাশ করেছ মেজো, ভালমানুষ পেয়ে তোমায় ঠকিয়ে গেছে।

অমন মুনিঋষির মতন চেহারা, প্রতি কথায় একবার করে 'মা' বলে নেন—হতে পারে তাই কখনো! গঞ্জ থেকে স্যাকরা ডেকে এনে কষ্টি ঠুকে দেখা হল। সোনা-ই নয়—কোন সন্দেহ নেই আর। কন্যাদায় মোচনের জন্য দরিদ্র মধুসূদনের তিলে তিলে সঞ্চয়ের টাকা—পাখি যেমন ঠোঁটে করে খড়কুটো বয়ে বয়ে আনে। যা রাগি মানুষ—বাড়ি এসে কুড়াল নিয়ে বউয়ের মাথায় মেরে বসবেন, অথবা নিজের মাথায়।

সেই বাড়ি আসা অবধি মেজোবউ সবুর করল না। তিনমাসের ছেলে কোলে। শেষরাতের দিকে ছেলে বিষম কান্না কাঁদছে, গলা শুকিয়ে উঠেছে দুধের জন্য। ওঘর থেকে বড়বউ উঠে এসে দরজা ঝাঁকাচ্ছে: মরে ঘুমুচ্ছ নাকি মেজো, শুনতে পাও না? ধাক্কা দিতে জানলার কবাট খুলে গেল, চাঁদের আলো পড়ল ঘরের মধ্যে। মেজোবউ শূন্যে ঝুলছে—ছাতের কড়ির সঙ্গে শাড়ি বেঁধেছে, ভিন্ন প্রান্ত নিজের গলায়।

বাইরে রটনা, ভেদবমি হয়ে মেজোবউ মারা গেছে। আত্মঘাতী হয়েছে, থানায় টের পেলে দেহ সদরে চালান দেবে কাটাকুটির জন্য। বাড়ির লোক নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে। বিস্তর হাঙ্গামা।

সেই থেকে আজব কাণ্ড। মেজোবউ বাড়ির মায়া ছাড়তে পারলেন না। নিজের কোলের ছেলে বলে নয়, জায়েদের ননদের যাবতীয় ছেলেপুলের দেখাশুনো তদ্বির-তদারকের দায় তাঁর উপর। দিনমানে পারেন না, সন্ধ্যার পর থেকে। সেই তো বিস্তর। মেজোর উপর দায় চাপিয়ে বউরা নিশ্চিন্তে রান্নাঘরে থাকে রাত দুপুর অবধি। আসবার মুখে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করবে, এই খেয়ালটুকু থাকে যেন। দরজা খোলা থাকুক বা বন্ধ থাকুক, যায় আসে না। বাচ্চা ঘামছে তো মেজো অমনি তালপাতার পাখায় হাওয়া করবেন। দোলনায় আছে তো দোল দিচ্ছেন মৃদু মৃদু, গায়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। এ সমস্ত উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেছে বাড়ির লোক। গোড়ায় ভয়-ভয় করত, এখন সোয়াস্তি। ঝি-চাকর দুর্লভ আজকাল। যদিই-বা মেলে, শতেক বায়নাক্কা সে-ম হবের। মাইনে দশ টাকা, চারবেলা খাওয়া, বছরে চারখানা কাপড় এবং হাটবাজারের ষোলআনা দায়িত্ব। এই শেষেরটা অতি-অবশ্য—কারণ কে না জানে! তার উপরেও আছে—আজ নিজের অসুখ, দু-দিন বলে গেল তো বিশ দিনের আগে দেখা নেই। মেজোকে নিয়ে খরচ-খরচা ঝক্কি-ঝামেলা কিছুমাত্র নেই। দোতলা

একতলা অথবা টিনের-ঘরে যেন উড়ে বেড়াচ্ছেন—যেখানে যে বাচ্চা একটু কুক করে আওয়াজ দিল, চক্ষের পলকে মেজো অমনি তার পাশে।

সুরির বিয়ে। বনোয়ারী দত্ত তারিখ পিছানোর জন্য বলেছিলেন—একটা গোমমেলে ফৌজদারিতে পড়েছেন, বিয়ে যেদিন মামলা ঠিক তার পরের দিন। কিন্তু মধুসূদনও কম ঘড়েল নন। দশের মুকাবেলা সিঁদুরে রাজমুণ্ডের ছাপ দিয়ে লগ্নপত্রে সই হয়েছে—সে বস্তু রেজেস্ট্রি-দলিলের বাবা। চুক্তির কোন অঙ্গের হেরফেরে রাজি নন তিনি, দলিল তাতে কেঁচে যায়। বাইরে অবশ্য করজোড়ে ছলছল-চোখে বললেন, আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতের যার বড় সাধ, যে চলে গেছে। শরীর আমারও বেশ ভাল যাচ্ছে না। শুভকর্ম নিয়ে আলাদা কোন আদেশ করবেন না বেহাইমশায়। তা ছাড়া নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ সারা—দিন পালটালে অপদস্থের কারণ ঘটবে। দু-হাত এক করে দুটো ফুল ফেলেই আপনাকে ছেড়ে দেবো—জোয়ার ধরে বেলা আটটার মধ্যে সদরে পৌঁছে যাবেন। মামলার কোন হানি হবে না।

অগত্যা তাই। বর-বরযাত্রীরা সব পৌঁছে গেছে। বনোয়ারী বিশেষ কয়েকটিকে বরযাত্রী করে নিয়ে এসেছেন, বিয়েথাওয়ার পরে বনোয়ারীর সঙ্গে একত্র সদর চলে যাবে—ফৌজদারির সাফাই-সাক্ষি তারা। মধুসূদনের কাছে বনোয়ারী পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন: মস্ত দরের মানুষ এঁরা সব, আমার বড্ড আপন—বলেকয়ে অনেক করে এনেছি।

মধুসূদন তটস্থ হয়ে বললেন, আপন-জন আপনার- দরের কথা তবে আর আলাদা করে বলতে হবে কেন? এ-বাড়ির পরম ভাগ্য, এঁদের মতন মানুষের পদধূলি পড়ল।

বনোয়ারী অতঃপর আসল কথায় এলেন: মা-লক্ষ্মীর গয়নাগুলো এঁরা একটু দেখতে চাচ্ছেন। আমি সব বলে দিয়েছি—বেহাই আমার বনেদি বাড়ির শৌখিন মানুষ। মেয়ে তো চোখের মণি একেবারে—গয়না যা দেবেন, সাইতকের মধ্যে কেউ তা চর্মচক্ষে দেখেনি।

শেখানো ছিল, লোকটা গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল: শুনেই তো লোভ বাড়ল মশায়। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে—পাত্রস্থ করতে হবে। আজকাল কোন প্যাটার্নের কেমন সব গয়না চলে, দেখব। কনের গায়ে উঠে গেলে তখন তো একঝলক একটুখানি চোখের দেখা। তাতে হবে না আমার, হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে জিনিসগুলো খানিক খানিক মুখস্থ করে নেবো।

এই কথার ভিতরেই মধুসূদন অজুহাত খুঁজে পেলেন: কনে সাজিয়ে ফেলেছে বেহাইমশায়রা, গায়ে তো উঠেই গেছে গয়না।

বনোয়ারী এবার কড়া হয়ে বললেন, গা থেকে তবে খুলে আনতে হবে—উপায় কি! বিশিষ্ট এঁরা সব দেখতে চাইছেন—ভিতরে মায়েদের বলুন গিয়ে, এ আবদারটুকু না রাখলে আমি অত্যন্ত অপদস্থ হবো।

শুকনো মুখে মধুসূদন ভিতর-বাড়ি চলে যান। যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যে হয়। গয়নার কারসাজি ঘুঘু বনোয়ারী কেমন করে টের পেয়েছে। মরা-সোনার মিশাল আছে, আবার লগ্নপত্র অনুযায়ী সোনা যে পরিমাণ দেবার কথা ওজনেও তার চেয়ে কিছু কম। মৃত মেজোবউয়ের উপর খাপ্পা হয়ে কলহ করেন: কাণ্ডটা ঘটালেন তো উনি। এ-বাজারে ষাট-ষাটটা টাকা গচ্চা দিলেন—প্রাণদান দিয়েও তো ষাটটা পয়সা উশুল হল না। ধরা-ছোঁওয়া এড়িয়ে মজাসে উনি সাড়াগাছে ঠ্যাং দোলাচ্ছেন—মর্ শালারা এখন কানমলা খেয়ে।

জ্যেষ্ঠ তুলসীচরণের পুত্র রাখালরাজ ডনবৈঠক করে—তাগড়াই জোয়ান। সে সাহস দিচ্ছে: গয়না নিয়ে দেখানগে কাকা, কী হয়েছে! বলি, বাড়িটা আমাদের না বনোয়ারী দত্তর? কে কার কান মলে, দেখা যাক। পরিবেশনের ছুতোয় ক্লাবের বন্ধুদের এনে আমিও মজুত করে রেখেছি।

তৈরি হয়ে এসেছেন বনোয়ারী সত্যিই। গয়না বৈঠকখানায় আসতেই এক বরযাত্রী চাদরের নিচে থেকে ওজনের নিক্তি বের করলেন, চুড়িদার পাঞ্জাবির পকেট থেকে অপরে এক ঠুকনি-পাথর। রাখালরাজ অমনি বাঘের মতন লম্ফ দিয়ে পড়ে পাথর-নিক্তি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে: ভেবেছেন কি মশায়রা! কুটুম্বিতে করতে এসে কুটুম্বর মুখের কথায় বিশ্বাস নেই—পাথর ঠুকে ওজন করে দেখতে হবে?

সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে বরকর্তাও এবারে নিজ-মূর্তি ধরলেন: মনে পাপ বলেই মেজাজ, সে কি আর বুঝিনে বাপু! লগ্নপত্রে আবদ্ধ আছি—নয়তো মা অপঘাতে মরেছে, সে মেয়ে অনেক আগেই বাতিল হত। কিন্তু চুক্তির খেলাপ আপনারাই করেছেন- শুভকর্ম আর হতে পারবে না। ফৌজদারি-ফারাকা হয় হবে—তিন নম্বর ঘাড়ে ঝুলছে, আরও না-হয় দু-এক নম্বর বাড়বে। কেয়ার করি নাকি?

ছেলের উপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: উঠে আয় ফটিক, বিয়ে করতে হবে না! মালা-টোপর খুলে ফেল।

ফটিক তা-বলে কাঁচা-ছেলে নয়—মচ্ছব কদ্দুর গড়ায়, শেষ পর্যন্ত না দেখে বরাসন ছাড়ছে না। বনোয়ারী বড় বেশি ধমক-ধামক লাগালেন তো ফটিক নড়েচড়ে উঠল, দম ফুরিয়ে নরম হলেন তো সে-ও পায়ের উপর পা চাপিয়ে চেপে বসল আবার।

ধৈর্য হারিয়ে বনোয়ারী বললেন, পিতৃ-আজ্ঞা কানে ঢুকছে না? বলি, কানে ধরে ওঠাতে হবে নাকি এত লোকের মধ্যে?

রাখালরাজের বন্ধুরা পাল্টা বলে ওঠে, পাড়া থেকে বর তুলে নেবেন—মাইরি আর কি! ধরুন আপনারা কান, আমরাও আর এক কান ধরি। কাদের কত জোর, পরখ হয়ে যাক।

এক ছোঁড়া বলল, পারবেন না মশায়। ইস্কুলের মাঠের টাগ-অব-ওয়ারে এই সেদিনও আমরা জিতে এসেছি।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রাখালরাজ ও বন্ধুরা, মালকোঁচা আঁটছে। বনোয়ারীও গোঁ ছাড়বেন না: মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি হে? গয়নাপত্তোর বরসজ্জা নগদ-পণ পাইপয়সাটি অবধি মিটিয়ে তবে বর ছুঁতে আসবে। নয়তো আলাদা সস্তার বরের তল্লাস করো। সময় আছে—শেষরাত অবধি লগ্ন—কানা-খোঁড়া মুখ্যুসুখ্যু মিলে যাবে যা-হোক কিছু।

ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না কন্যাপক্ষীয়েরা। দুই জোয়ান-মরদ দু-দিক দিয়ে ফটিকের ডানা ধরে উঁচু করে তুলেছে। বলে, ঝগড়াঝাটির মধ্যে কেন থাকা! বর অগেই না হয় ছাদনাতলায় গিয়ে বসলেন। তাতে কোন দোষ হয় না। মেয়ের দঙ্গল আছে, ফষ্টিনষ্টি করবে—দিব্যি সময় কেটে যাবে।

প্রস্তাব হতে না হতে—আরও বিস্তর তৈরি ছিল বাইরে, রে-রে করে বৈঠকখানায় ঢুকে গেল। হাত তো ধরাই আছে—ঠ্যাং ধরেছে কয়েকজন, কোমর ধরেছে, মুণ্ড ধরেছে—চ্যাংদোলা করে বরকে পাঁচিলের দরজা দিয়ে চক্ষের পলকে বাড়ির ভিতরে ঢোকাল।

বনোয়ারী হতভম্ব মুহূর্তকাল। তারপরে চেঁচাচ্ছেন: মন্তোর পড়িসনে ফটকে। খুন করে ফেললেও না। পিতৃ-আজ্ঞা—পিতা-স্বর্গ পিতা-ধর্ম—খেয়াল রাখিস।

এক ছোঁড়া খলখল করে হেসে বলল, সে বোঝা যাবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনি বউভাতের বন্দোবস্ত করুনগে দত্তমশায়। বর-বউ যথাকালে গিয়ে পৌঁছবে, আমরাও সাথেসঙ্গে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে আসব।

ঘড়াং করে পাঁচিলের দরজায় হুড়কো পড়ে গেল।

মধুসূদন গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন—এতক্ষণে আবির্ভূত হয়ে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছেন: হারামজাদা নচ্ছার ছোঁড়াগুলো—কাজের বাড়ি বলে এখন কিছু বলছি নে, ধরে ধরে আগাপাস্তলা চাবকাব আপনাকে বলে রাখলাম বেহাই। আসুন এইবারে আপনার ঐ সব আপনদের নিয়ে। জোয়ার এলেই তো বেরিয়ে পড়বেন—আগেভাগে চাট্টি সেবা সেরে নিন। জায়গা হয়েছে।

আগুনে আরও ঘৃতাহুতি। মুখের আড় রইল না বনোয়ারীর, 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে বললেন, তোমার জায়গার মুখে ইয়ে করি আমরা। চলো হে চলো—যতক্ষণ জোয়ার না আসছে, নৌকোতেই পড়ে থাকব। এখানে তিলার্ধকাল নয়।

অন্যদের কিন্তু চনমনে খিদে পেয়ে গেছে। ক্রোধও এতদূর প্রবল নয়। বলে, যেভাবেই হোক বেহাই তো হতে চলেছেন! ভদ্রলোকের এত আয়োজন নষ্ট হবে, এ-বাজারে মোটেই সেটা উচিত হবে না।

বনোয়ারী দত্ত আগুন হয়ে বললেন, বুঝতে পেরেছি। ঘাটের উপর উৎকৃষ্ট চিঁড়ে-মুড়ি বেগুনি-ফুলুরির দোকান। দু-খানা শুকনো লুচি না ই বা চিবোলে! গণ্ডে-গণ্ডে গেলাবো তোমাদের ঘাটে নিয়ে। চলো—

গরু তাড়ানোর মতন বনোয়ারী তাদের তাড়িয়ে বের করলেন। রাখালরাজ অভয় দিয়ে বলে, কিচ্ছু ভাববেন না কাকা, আয়োজনের একটি কণাও ফেলা যাবে না। যতগুলো আমি এনেছি, গণে দেখুন। আরো সব ক্লাবে বসে তাস-পাশা খেলছে, খবর দিলে দুড়দাড় করে এসে ভাঁড়ারে যা-কিছু আছে চেটেপুঁছে শেষ করে দিয়ে যাবে।

পাঁচিলের দরজায় হুড়কো পড়েছে, এবারে সে ঢাউস তালা সংগ্রহ করে বৈঠকখানার দরজায় লাগাচ্ছে।

মধুসূদন বললেন, দক্ষিণ-বাড়ি দুর্গ বানিয়ে ফেলছ যে!

রাখালরাজ বলে, ঘাটের নৌকোয় নৌকোয় বিস্তর মাঝিমাল্লা। জেদাজেদির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—বলা যায় না কাকা, হয়তো-বা তাদেরই সব জুটিয়ে এনে হামলা দিয়ে পড়ল বর তুলে নেবার জন্যে। ঘাঁটি সামলে রাখা ভাল।

তারপরে আধঘণ্টাও হয়নি। রাখালরাজের ছোঁড়াগুলো কোঁচা ছেড়ে ভদ্রলোক হয়েছে। বরকে ঘিরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, ইয়ার্কি-তামাসা করছে। হেনকালে পাঁচিলের দরজায় প্রবল কড়া নড়ে ওঠে। এবং দমাদম ঘা। কান পেতে বনোয়ারীর কণ্ঠও শোনা গেল: দুয়োর খুলুন, ও বেয়াই-মশায়—

রাখালরাজ ফিসফিস করে বলে, যা বলেছিলাম কাকা। এসে পড়েছে। পুরুতঠাকুরকে এত করে বলছি, মন্তোর ক'টা পড়িয়ে তাড়াতাড়ি সাত-পাক ঘুরিয়ে দিন। তা যত বায়নাক্কা—সুতহিবুক যোগ নাকি পড়েনি এখনো। দলবল জুটিয়ে এসেছে—কী কুরুক্ষেত্তোর বাধে এবারে দেখুন। সুতহিবুক ধুয়ে খাবেন তখন ঠাকুরমশায়।

ভিতর থেকে রাখালরাজ সন্তর্পণে সাড়া দিল: হল কি, আবার যে ফিরে এলেন?

বনোয়ারী ব্যাকুল হয়ে বলেন, বলছি সব। দরজা খোল বাবা!

আজ্ঞে না। ভণ্ডুল দিতে এসেছেন আবার। বিয়েথাওয়া চুকে যাক, তারপরে দরজা খুলব। কাকার হুকুম।

বনোয়ারী বলেন, বিয়ে আলবত হবে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবো। বিশ্বাস করো বাবা, বাপান্ত-দিব্যি করছি।

মধুসূদন থাকতে না পেরে বললেন, দরজা খোল রাখাল। বেয়াইমানুষ এমন করে বলছেন—

বলতে বলতে নিজ-হাতেই দরজার হুড়কো উঠিয়ে দিলেন। যেই মাত্র দরজা খোলা, হুড়মুড় করে সব ঢুকে পড়ল। যত গিয়েছিল, ঠিক ততগুলো। বেশি নয়, কমও নয়।

মধুসূদন বললেন, হল কি বেয়াইমশাই, ঘাটে যাননি?

যেতে আর পারলাম কই? ছেলের বিয়ে চোখে দেখব না, মনের মধ্যে বড় খচখচ করতে লাগল। ভেবে দেখলাম, গয়না-টাকা অনিত্য জিনিস—আজ আছে কাল নেই। পরের মেয়ে আমার বউমা হতে যাচ্ছেন—তাঁর চোখেও আমি তো ছোট হয়ে যাচ্ছি। দশরকম এমনি ভেবে দেখে মান-অপমান অগ্রাহ্য করে ফিরে এলাম।

খাসা করেছেন। মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাপ আমারও ভাগ্যি।

কৃতার্থ হয়ে মধুসূদন শতকণ্ঠে তারিফ করছেন। রাখালরাজকে বললেন, চাবি খোল বৈঠকখানার। আলো পাঠিয়ে দাও ওখানে। আর গড়গড়া। বসি গিয়ে আমরা।

কিন্তু দলবলের এবং বনোয়ারীর নিজেরও ঘোরতর আপত্তি: বিয়ে দেখব বলে দৌড়ঝাঁপ করে এলাম। বৈঠকখানায় ঘটকর্পূর হয়ে বসতে যাব কেন?

লগ্নের তো দেরি আছে—

তা হোক, তা হোক। এত মানুষ রয়েছেন, আমরাই বা কেন বাইরে যেতে যাব?

ছাদনাতলায় কোনক্রমে বনোয়ারীর একটু বসার জায়গা করা গেল। অন্যেরা ভিড়ের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে। তবু বাইরে গিয়ে ভাল হয়ে বসবে না।

রাখালরাজ খপ করে জিজ্ঞাসা করে বসে: কাঁপছেন কেন তালুইমশায়?

কাঁপছি বুঝি? সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বনোয়ারী নিঃসংশয় হলেন: কাঁপছিই তো বটে! কেমন যেন হঠাৎ শীত ধরে গেল।

বোশেখ মাসে শীত ?

হয় বাবাজী। সান্নিপাতিকের ধাত যে আমার।

রাখালরাজ বলে, এই যত আছেন সবাই তো কাঁপছেন—সকলের ধাত সান্নিপাতিক ?

মধুসূদন এই সময়ে এসে বললেন, বরসজ্জা সমস্ত দরদালানে সাজিয়ে দিয়েছে। দেখে আসুন একবার বেয়াই।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বনোয়ারী হাত ঘুরিয়ে দিলেন: বরকনের ব্যাভারে লাগবে—দেখতে হয়, তারা দেখুক গে। আমার কী গরজ! বিয়ের অঙ্গে খুঁত না থাকে, মন্তোরগুলো নির্ভুল পড়ানো হয়, আমি দেখব শুধু তাই।

সত্যি, নিষ্ঠা বটে বনোয়ারীর। তীক্ষ্ণ চোখে পুরুতের প্রতিটি কাজ দেখছেন, কান পেতে মন্তোর পড়ানো শুনছেন। হেরফের হলে ক্যাঁক করে অমনি ধরেন: ছেলের না-হয় পয়লা বিয়ে। আমি নিজে তিন তিনটে বিয়ে সেরে এ-কর্মে ওস্তাদ হয়ে আছি ঠাকুরমশাই। রীতকর্ম সমস্ত মুখস্থ। পান থেকে চুন খসলেই ধরে ফেলব।

খাওয়াদাওয়া অন্তে বনোয়ারী মউজ করে তামাক খাচ্ছেন, আপন-লোকেরা ঘিরে রয়েছে। মাঝি ঘাট থেকে বিয়েবাড়ি অবধি এসে তাগাদা দিচ্ছে: গোন লেগেছে দত্তমশায়—

হুঁ—বলে বনোয়ারী নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন।

মাঝি বলে, দেরি করলে জোয়ারের মধ্যে পৌঁছে দেবো কেমন করে ?

বনোয়ারী বিরক্ত হয়ে বলেন, গাঙের জোয়ার এই শেষ নাকি—আর আসবে না ?

মাঝি মিন-মিন করে বলল, ফৌজদারি-মামলা আছে বলছিলেন কিনা।

বনোয়ারী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ফৌজদারির ভয় কেউ যেন আমায় না দেখাতে আসে! তিন নম্বর ঝুলছে এখন মাথায়—কোন না আরও তিরিশ নম্বর কেটে বেরিয়ে এসেছি। ফৌজদারি ডাল-ভাত আমার কাছে। ঘাটে গিয়ে ঘুমোওগে মাঝি, কাল দিনমানে যাব।

রাখালরাজকে হাতের ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন: শোন। বেয়াইমশায়কে দেখছিনে, তোমাকেই বলি। আমি বাপু তোমাদের ঐ তেপান্তরের বৈঠকখানায় শুতে পারব না। কন্যাপক্ষেরই তো কত লোকজন, তাদের নিয়ে শোয়াওগে। বাড়ির ভিতরে কোথাও একটা মাদুর ফেলে দিও, সেইখানে আমি পড়ে থাকব।

বনোয়ারীর আপনগুলির মধ্যে একটি বেশ কমবয়সি, গোঁফ ওঠেনি ভাল

করে। তারই উপরে রাখালরাজ তাক করেছে, ঘন ঘন তাকে পান-সিগারেট খাওয়াচ্ছে। নিভৃতে নিয়ে বলে, বিয়েয় হাজির থাকবার জন্য মন আপনাদের চনমন করে উঠল—ও-জিনিস তো শুধু-শুধু হয় না। পথে কিছু খেল দেখে ফিরেছেন জানি। আমরাও হরবখত দেখে থাকি। আজকের খেলটা কি, নতুন-কুটুম্বদের উপর কোন্ খাতিরটা হল, বলুন তো।

বলতে কি চায়! নাছোড়বান্দা রাখালরাজ পুরো এক প্যাকেট সিগারেট উজাড় করে দিয়ে তবে দুটো-চারটে কথা বের করল: সাংঘাতিক গ্রাম মশায়, থাকেন কি করে আপনারা? মোড় ঘুরতেই মস্ত বড় তালগাছ রাস্তার ঠিক মাঝখানটায়। এমন স্থানে তালগাছ কি করে জন্মায়—যাবার বেলা তো দেখতে পাইনি। এমনি সব কথাবার্তা হতে হতে বাঁশঝাড়ের পাশে এসেছি। সকলের সবগুলো চোখ একসঙ্গে ঝাড়ের দিকে—ঝড় নেই বাতাস নেই, বাঁশগাছ নুয়ে পড়ছে আমাদের ঘাড়ে, কঞ্চিগুলো সপাং-সপাং করে গায়ে-পিঠে বেত মারছে। আগের মানুষ দত্তমশায় তো চোঁচা-দৌড়—। মানুষটার কী দুর্গতি—আছাড় খেয়ে পড়লেন তো গড়াতে গড়াতে উঠে আবার দৌড়। পিছন ধরে আমরাও সব দৌড়চ্ছি। বাঁশবন পার হয়ে ফাঁকায় এলাম। তারপরে যা কাণ্ড—

সিগারেটে হল না—গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জল চেয়ে নিল। ঢকঢক করে পুরো একটি গ্লাস খেয়ে বলে, লম্বা-ঢিড়িঙ্গে এলোচুল এক মেয়েলোক সামনেটায় এসে দাঁড়াল দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে। হাত এক-একখানা কম সে-কম পনের-বিশ হাত—বেড়জালের মতন সব ক'টাকে আমাদের টেনে কোলের মধ্যে ফেলবে।

রাখালরাজ শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেছে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, মেজো-কাকিমা—দেখতে হবে না।

গড় হয়ে সে প্রণাম করল মেজোবউয়ের নামে। বলে, বুদ্ধির ভুলে গয়নার টাকা গড়বড় করে ফেলেছিলেন। রাগারাগি ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে শেষ তুলে দিলেন তিনিই আবার। মেয়ের বিয়ের কোন অঙ্গে খুঁত থাকতে দিলেন না।

সত্য ঘটনা

চাকরি হল—ফ্যাসান-স্টোরসের সেলসম্যান। পড়াশুনোয় সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা। যে কারণে পড়াশুনো, তাই তো হয়ে গেল। জীবনে আর বই ছুঁচ্ছি নে। কঠোর সঙ্কল্প।

মামাতো বোন চুমকির বিয়ে লাগল এই সময়টা। বড়মামি লিখেছেন: তুই না এলে কিছুতে হবে না। চাকরি তো চিরকাল আছে, চুমকির বিয়ে নিত্যি নিত্যি হবে না।

সঙ্গত কথা। ছোট বয়সটা তায় মামার বাড়ি কেটেছে আমার, বড়মামি মায়ের মতো করেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট বিনে ম্যানেজার ছুটি দেয় না। পাড়ার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও নামঞ্জুর—এম. বি., বি. এস.-এর সার্টিফিকেট চাই। তাঁরা আবার রেট বাড়িয়ে চার টাকায় তুলেছেন। তাই সই, চুমকির বিয়ে এই একমাত্রই। চারটে টাকা গচ্চা গেল।

ঝঞ্ঝাটের পথ। চাঁদপাড়া অবধি ট্রেন। বাসে সেখান থেকে দোমোহানি-ঘাট। খেয়ায় পার হয়ে পায়ে-হাঁটা তারপর।

তিল-ধারণের জায়গা থাকতে বাস ছাড়ে না। সেই বাবদে বেশ খানিকটা দেরি হল। শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘে থমথম করছে। হঠাৎ বা ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি। বাসের ছাতে যে মানুষগুলো, বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে তারা ঝোড়ো-কাকের মতো। ভিতরে আমাদের সেদিক দিয়ে বাঁচোয়া, কিন্তু ভিড়ের চাপে জমে গিয়ে সবসুদ্ধ একখানা নিরেট পাথর হয়ে আছি। মাঝে আবার বিভ্রাট—একটা চাকা খুলে পগারে গড়িয়ে পড়ল। কপাল ভালো, উল্টে যায় নি বাস।

ড্রাইভার দেমাক করছে: লাইনের বাস, ছোটখাট এ-সব হবেই। কিন্তু কিন্তু উল্টোয় না কখনো। ধাক্কা-গুঁতো খেয়ে জখম একটু-আধটু হতে পারেন, বড়-কিছু হবে না।

রগ-চটা এক প্যাসেঞ্জার এই মারে তো এই মারে: ভাঙা গাড়ি নিয়ে বেরোও কোন আক্কেলে?

ড্রাইভারও সমান তেরিয়া। চাকা লাগাচ্ছিল, কাজ ফেলে কোমরের দু-দিকে দু-হাত রেখে রুখে দাঁড়াল: আসেন কেন গাড়িতে, মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? পায়ে পায়ে চলে গেলেই হত! বাস চালু হবার আগে যেতোও লোকে তাই।

ধরে পেড়ে দু-তরফকে ঠাণ্ডা করে ঘাটে পৌছলাম। বৃষ্টি-বাতাস চলছে মাঝে মাঝে—এক ঝাপটা বাতাস এসে ছাতা উল্টে দিল আমার, দু-তিনটে শিকও ভাঙল। জোর বৃষ্টি নামে তো চিত্তির—ভাঙা-ছাতায় ঠেকানো যাবে না। চাকার হাঙ্গামা ও ঝগড়াঝাটিতে দেরি করে ফেলেছে। দুপুর নাগাত দোমোহানি পৌছানোর কথা—খেয়ায় উঠলাম, বেলা ডুবু-ডুবু তখন।

ওপারে পা দিয়েই দ্রুতবেগে চলেছি। দৌড়ানো বলতে পারেন। এ তবু রাস্তাপথ—রাস্তা ছেড়ে অতঃপর কেশেডাঙার মাঠে নামব। গোলমেলে জায়গা—ছেলেবয়সে দিদিমার কাছে নানান গল্প শুনেছি। নটবর গুণীনও বলত। মাঠ পাড়ি দিয়ে বেলাবেলি ওপারে উঠতে চাই। কুসংস্কার বলে তখন না-হয় নির্বিঘ্নে হাসাহাসি করা যাবে।

ঠাকরুনতলায় এসে গেলাম। ঝুরি-নামা বিশাল বটগাছ—ছেলেবয়সে যেমন দেখেছি, এখনো তেমনিটি। ঠাকরুনতলার পাশ দিয়ে মাঠে নামার সুঁড়িপথ।

মেঘ জমে জমে নিশ্ছিদ্র হয়েছে, বাতাস বন্ধ। বৃষ্টি জোর চালবে, অথবা বাতাস উঠে ছিন্নভিন্নও হতে পারে এ মেঘ। কেমনটা দাঁড়ায়, মাঠে পড়ার আগে দেখে যাওয়া ভালো। বটতলায় ছোট্ট দোচালা-ঘর, হাটের দিনে নুন-কেরোসিন নিয়ে বসে। আমার ছেলেবয়সেও ছিল এমনি ঘর। ঘরের মধ্যে বাখারির বেঞ্চি বানিয়ে রেখেছে হাটুরে লোকজনের বসার জন্য। বেঞ্চিতে বসে পড়ে সিগারেট ধরালাম।

হেনকালে আর একজন এলেন। একটি মেয়ে। যুবতী এবং রীতিমত রূপসী বলেই মালুম হয়। বটগাছতলা এবং মেঘান্ধকার—ঝাপসা রকম দেখতে পাচ্ছি। অতএব দেহ-রূপের কতখানি বিধাতার দেওয়া এবং কতটা আমাদের অর্থাৎ জামাকাপড় ও প্রসাধন-ওয়ালাদের দেওয়া, সঠিক বলতে পারব না। হাজার-পাওয়ার বাতির নিচে ফ্যাসান-স্টোরসে যখন ঘুর-ঘুর করে এঁরা মাল পছন্দ করে ঘোরেন, তখনও অবশ্য পারি নে। উর্বশী মেনকা রম্ভা স্বর্গধামে একটি করে আছেন শুনেছি—আর কী ভাগ্য বঙ্গদেশের! শুধু আমাদের দোকান-ঘরের মধ্যেই সন্ধ্যাবেলা ডজনে ডজনে তাঁদের পেয়েথাকি।

আগ বাড়িয়ে সুন্দরী শুধালেন: যাবেন কোথা?

গ্রামের নাম বললাম।

উল্লসিত হয়ে বলেন, কেশেডাঙার মাঠে নামছেন তা হলে?—আমিও। সাতাশকাটি চৌধুরিবাড়ি যাবো। বেশ হল, দিব্যি হল। দু-জন হলাম মাঠ পাড়ি দেবার।

সঙ্কোচের বালাই নেই। দেখেন কি, প্রগতি আমাদের অজ-পাড়াগাঁ অবধি ধাওয়া করেছে। সাতাশকাটি অবশ্য বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ঐ এক গ্রাম থেকেই উকিলে ডাক্তারে তিন-চার গণ্ডা বেরিয়েছে। বাঘা বাঘা চাকরিওয়ালাও অনেক। মেয়েদের পর্যন্ত হাই-ইস্কুল। আমি যখন মামার-বাড়ি থাকতাম, তখন এই ছিল। তার পরে এত বছরে আরও বিস্তর এগিয়েছে। সে যে কতদূর, হাতে-হাতে এই দেখছেন। জলকাদার মেঠো পথ, কোনো দিকে জনমানব নেই। আসন্ন সন্ধ্যায় তরুণী মেয়ে একা একা মাঠে নামছিলেন—জোয়ানযুবা আমায় পেয়ে বর্তে গেছেন একেবারে। সঙ্কোচ করবেন কি—উল্টে নেমন্তন্ন করছেন আমায় সঙ্গী হবার জন্য।

মুখ তুলে ফিক করে হেসে বললেন, একদৃষ্টে কি দেখেন?

জবাব দিলাম—ফ্যাসান-স্টোরসের সেলসম্যানের পক্ষে যেটা অতি-স্বাভাবিক: আপনার শাড়িতে-জামায় অপরূপ ম্যাচ করেছে।

জুতো?

সুখ্যাতিতে গলে গিয়ে রূপসী জুতোসুদ্ধ-একটা পা আমার নাক বরাবর তুলে ধরলেন: জুতো কেমন মানিয়েছে বলুন?

চমৎকার!

আর চুল বাঁধা?

মাথাটা তৎক্ষণাৎ নুইয়ে আনলেন রসা অবস্থায় ভাল রকম যাতে দেখতে পাই। তালগাছে বাবুইপাখি বাসা বানায়, বাগড়োয় বাগড়োয় বাসা ঝোলে, তারই একটা ছিঁড়ে এনে মাথায় যেন উপুড় করে বসিয়েছেন। ললনাটি চলন্ত ফ্যাসান একখানি—চরম আধুনিকারা কি মূর্তি নিচ্ছেন, আপাদমস্তকে নজর বুলিয়েই বুঝতে পারি। আমাদের ফ্যাসান-স্টোরসের কাচের জানলায় পুতুলের বদলে এঁকে দাঁড় করানো গেলে কী মনোরমই হত!

খোঁপা কেমন দেখছেন? পুনরপি প্রশ্ন।

খাসা, খাসা। পাঁচ-সাত শ' গ্রাম চুল নিদেনপক্ষে মেশাল দিতে হয়েছে। এ জিনিস টাকা পনেরোর নিচে উতরায় নি, কী বলেন?

আর আমি?

চেহারাই শুধু সুন্দর নয়, গলাতে মধু। কথা যেন মধুতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছাড়ছেন। এক দোষ, প্রশংসা কুড়ানোর লোভ। এ লোভ কারই বা নয় স্ত্রীজাতির মধ্যে! বললেন, পোশাকের তারিপই শুধু করলেন—পোশাকের নিচে মানুষটি যে আছে, সে কেমন?

এঁদের খুশি করতে হয় অন্যদের কথে নিন্দেমন্দ করে। কায়দাটা আমার

জানা। ছাড়ব কেন, সেই অন্ধেরা যখন কানে শুনতে আসছেন না। বললাম, সুন্দরী বলে যাঁদের বড় ঠেকার, তাঁরা সব আজ থেকে পেত্নী-শাকচুন্নি—আপনাকে এই চোখে দেখার পর।

তাক ফসকায় নি, ঠিক লেগেছে। পুলকে গদগদ রূপসী। আদুরে গলায় বললেন, বাজে কথা, মিথ্যে কথা, মন-রাখা কথা। বেশ, গা ছুঁয়ে বলুন আমার—

আমি কি ছোঁব, খপ করে উনিই হাত এঁটে ধরলেন। আহা, কী কোমল—গা শিরশির করে উঠল। বসেছিলাম—হাত টেনে বলেন, উঠুন, মাঠে নেমে পড়ি।

বাহারের জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছেন, খালি পা। আমিও তাই। মিন-মিন করে তবু একবার বলি, আকাশের অবস্থা একটু দেখে গেলে হত না?

বৃষ্টির ভয় করেন তো শ্রাবণ মাসে পথে বেরিয়েছেন কেন?

মাঠে নেমে হাত ছাড়তে হল। সঙ্কীর্ণ আ'ল-পথ, দু-পাশে ধানবন। পাশাপাশি জায়গায় কুলোয় না, আগে-পিছে চলেছি। খানিকটা যাবার পর ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। আর বাতাস। ফাঁকা মাঠ বলে জোরটা বেশি লাগছে।

ছাতা খুলুন—শিগগির, শিগগির। ভিজে গেলাম। চুল ভিজলে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

খুলেছি ছাতা। বৃষ্টি ঠেকাতে দাঁড়িয়েছেন এসে একেবারে গায়ে গা লেপটে। কিন্তু খেয়া পার হবার মুখে আগেই তো ছাতার বারোটা বেজে আছে। এ-ছাতা মুড়ি না দিয়ে একখানা হাত চিতিয়ে মাথার উপর ধরলে বেশি আচ্ছাদন হবে।

রূপসী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, চুল-বাঁধা নিয়ে এত তারিপ করছিলেন—এক-পুকুর জল জমে গেল যে আমার খোঁপার মধ্যে।

খোঁপা খুলে চুল আলুল করে দিলেন। মিথ্যে বলেন নি—খোঁপায় আবদ্ধ বোধকরি আধেক মন বৃষ্টির জল হড়াস করে বেরিয়ে সর্বাঙ্গে ধারাস্নান করিয়ে দিল। জল সরল তো আর এক বিপদ। এলোচুল মুখের উপর উড়ে দৃষ্টি আটকে দিচ্ছে। জুতো নিয়ে একটা হাত আটক, বাকি হাতে কতক্ষণ আর বাতাসের সঙ্গে লড়াই করা চলে। ফলে, যা হবার তাই হল—পা হড়কে ভূতলে পতন। গড়িয়ে পাশের ধানবনের ভিতরে। ধরে তাঁকে আ'ল-পথে এনে তুললাম।

বেকুব হয়েছেন। লেগেছেও হয়তো। এত সাধের সাজগোজ জলে-কাদায় মাখামাখি।

বড্ড জ্বালাচ্ছে তো চুল!

রেগেমেগে ললনা চুলের মুঠি ধরে দিলেন এক টান। যথাধর্ম বলছি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিজ-চোখে সুস্পষ্ট দেখলাম, একবিন্দু এর মধ্যে বানানো নেই—মুখ খিঁচিয়ে রেগেমেগে চুল ধরে টান দিলেন। আর, যাত্রা-থিয়েটারে পরচুলোর মতো আলগোছে সমস্ত চুল উপড়ে এলো। চুলের সঙ্গে মাথার এবং সমগ্র মুখমণ্ডলের চামড়া। এবং সেই সঙ্গে দু-পাশের কান দুটো, দাঁতের পাটি-ঢাকা লিপস্টিকে-রঙিন ওষ্ঠ এবং চোখের পল্লব দু-খানি। বাকি সমস্ত ঠিক আছে। গলা থেকে নিম্নদেশ যুবতী নারী, উপরটা করোটি। চোখের দুই গহ্বরে এ্যাব্বড়ো-এ্যাব্বড়ো মণি দুটো ঝকমক করছে।

আমার কী অবস্থা, বুঝতে পারেন। তবু ওরই মধ্যে টনটনে বোধ রয়েছে, চেতনা হারিয়ে দুম করে পড়লে চলবে না—ছুটে গিয়ে মাঠের ওপার পাড়ার মধ্যে উঠতে হবে।

ক্রোধ বশে কাজটা করে ফেলে মেয়েটি (এখনো মেয়ে বলা ঠিক হচ্ছে কি?) হতভম্ব হয়ে গেছেন। বলছেন, অত জোরে কেন? কী আশ্চর্য, ভয় পেয়ে গেলেন?

এতক্ষণের বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর এখন দুই পাটি উলঙ্গ দাঁতের ঠকঠকানি। ভর্ৎসনা করছেন: সাজ-পোশাকেরই তারিফ আপনাদের কাছে। পোশাকের তলে আসল যেটি, তাকে দেখে দাঁত-কপাটি লাগে। বলি দৌড়চ্ছেন কি জন্যে, কিসের ভয়?

আমি পিছন তাকাই আর দৌড়ানোয় আরও জোর দিই। ভয়টা কিসের এতক্ষণে বোধহয় মালুম হল শ্রীমতী করোটির। মংকিক্যাপ পরার কায়দায় সেই চুল-কান-ঠোঁট ইত্যাদি টুক করে মাথা গলিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। অতুলন রূপসী পূর্ববৎ। মিষ্টি গলায় অভিমান ভরে ডাকছেন: দেখুন না আমায়, কাছে এসে ভাল করে দেখুন। সেই আগেকার আমি। কী আশ্চর্য, চোখের দেখা দেখে যেতেও দোষ!

কানে আসছে কণ্ঠধ্বনি। পঞ্চাশ-ষাট গজ এগিয়ে আছি। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মাঠেরও শেষ। আবছা ঘরবাড়ি দেখা যায় অনতিদূরে।

মানুষও দেখতে পেলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা! হাতে চৌখুপি-লণ্ঠন, কাদা ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন ১ পুরুষটি। আলো নিরিখ করে ছুটতে ছুটতে কাছে গিয়ে পড়লাম। বুড়া মানুষ। চাষীপাড়ায় চাল কিনতে গিয়েছিলেন বুঝি—গামছায় বাঁধা চাল এক হাতে, অন্য হাতে লণ্ঠন।

লণ্ঠন উঁচু করে ধরলেন আমার দিকে। এক-মুখ পাকা দাড়ি। আলো পড়ে দাড়ি চিকচিক করে উঠল। বললেন, কোথা থেকে আসছ বাবা? হাঁপাচ্ছ কেন, কি হয়েছে?

সাংঘাতিক ব্যাপার—

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়লেন: কি হয়েছে বলো।

আনুপূর্বিক শুনে হি-হি করে হাসেন: দূর, তাই কখনো হয়! তুমি বানিয়ে বলছ। নয়তো স্বপ্ন দেখেছ।

স্বপ্ন নয়, চোখের উপর সত্যি সত্যি ঘটল। এইমাত্র দেখলাম। সে-মেয়ে নিশ্চয় পথে আছে, সাতাশকাটি পৌঁছয় নি এখন অবধি।

বৃদ্ধ বললেন, কী জানি! এতখানি বয়স হল, আকচার মাঠ পারাপার করে থাকি। মেয়েমানুষে চুলের মুঠি ধরে টান দেয়, আর মুখের খোসা আলগা হয়ে বেরিয়ে আসে—এমন তাজ্জব কোনদিন দেখি নি আমি। কানেও তো শুনিনি।

সহায় একটি যখন পেয়েছি, বৃদ্ধের আমি পিছন ছাড়ি না। নিঃশব্দে চলেছি। খানিকটা গিয়ে কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন, উই যে আমার বাড়ি। তুমি বাপু বড্ড হাঁপাচ্ছ, বসে একটু জিরিয়ে যাও। ভয় করে তো রাত্তিরটা থেকেও যেতে পারো এখানে। বাইরের-ঘরে আমি থাকি, তোমাকেও মাদুর-বালিশ দেবে। খুব-একটা অসুবিধে হবে না।

পুকুরঘাটে পা ধুয়ে সেই বাইরের ঘরে বৃদ্ধের পিছু পিছু ঢুকে গেলাম। বৃদ্ধও ক্লান্ত, তক্তাপোষে পা ঝুলিয়ে আয়েশ করে বসে পড়লেন। আমি জলচৌকির উপর। এতক্ষণে সোয়াস্তি। ধকলে জলতেষ্টা পেয়ে গেছে। বললাম, এক গ্লাস জল—

বৃদ্ধ হাঁক দিলেন: কোথায় রে আন্না? জল দিয়ে যা—

দাসী গোছের একজন জল নিয়ে এলো। বৃদ্ধ জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়েছেন এতক্ষণে। জল দিয়ে আন্না চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বললেন, পায়ে যেন কাদা কামড়ে রয়েছে। কিছুতে গেল না। পা-দুটো তুই ঘাটে নিয়ে রগড়ে রগড়ে ভাল করে ধুয়ে যা। তাকের উপর রেখে দিবি। রাতে আর লাগছে না। বড় কষ্ট হয়েছে, এক্ষুনি আমি শুয়ে পড়ব।

বলে কী গো! কথার কথা নয়, সত্যি সত্যি তাই করলেন—আয়না নেই, নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি নে। তবু নির্ঘাৎ জানি, চোখের মণি বড় বড় হয়ে মিঠেকুমড়োর সাইজে এসে গেছে। বৃদ্ধ করলেন কি—যেমন কায়দায় বাঁধানো দাঁত খোলে, তেমনি ভাবে পা একটু উপর মুখো ঠেলে হাঁটু থেকে খুলে

ফেললেন। একটা পা খুলে আমার হাতে দিয়ে তারপর দ্বিতীয় পাখানিও। রক্ত পড়ল না, কিছু না—তবু জলজ্যান্ত দু-দুখানা পা, সন্দেহমাত্র নেই। চামড়ার উপরে লোম পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।

আমাকে বিশেষ করে তালিম দিয়ে দিচ্ছেন: শুধু জলে যদি কাদা না ওঠে, সাবানে রগড়াবি। ভাল সাফাই হওয়া দরকার। বিয়ের নেমন্তন্ন আছে কাল।

আমার কথাও বললেন, এই ছেলেটি রাত্রে থেকে যাবে। মেজেয় একটা বিছানা করে দে।

কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম। সম্বিত পেয়ে তাড়াতাড়ি বলি, আজ্ঞে না। আমি চলে যাবো।

বলতে বলতে নেমে পড়েছি দাওয়ায়। সেখান থেকে এক লম্ফে উঠানে। সেখান থেকে রাস্তায়। বৃদ্ধ খল খল করে হাসছেন। মন্তব্যও কানে এলো: ভীতু লোক। জোয়ান মেয়েকে ভয় করে, তার একটা মানে আছে। বুড়ো মানুষ—আমাকেও?

এই দেখুন, আমার অবস্থার আন্দাজ নিলেন না—আপনারাও হাসতে লেগেছেন। সত্য ঘটনা। ঈশ্বর আল্লাহ্ গড জেহোবো যে নামে বলবেন, দিব্যি গালতে রাজি আছি। খবরের-কাগজে হরবখত তো সত্য খবর পড়েন—আমার এই ঘটনা তার চেয়েও কড়া রকমের সত্য।

ছায়াময়ী

জন্ম থেকে শহরে বসবাস। কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল। চাকরি নিয়ে সেই আমাকে বিরাটগড় যেতে হল। নাম শুনে ভেবেছিলাম বিরাট বিপুল কোন জায়গা। ছিল বটে তাই নীলকুঠির আমলে। ভাঙাচুরো দালানকোঠা, তার উপর বট-অশ্বত্থ হরেকরকম ঝোপজঙ্গল। সাপ আর বুনোশুয়োর মজাসে পাকাদালানে বসবাস করে। শীতকালে নাকি বড়-মিঞারাও (রাতের বেলা লিখছি—খোলাখুলি নাম করে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব!) বেড়াতে আসেন। এ হেন স্থানে এসে দুদিনে পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছি। ইচ্ছা করে, চাকরির পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে শহরের ছেলে শহরে গিয়ে যথারীতি রাজাউজির-নিধনকর্মে লেগে যাই।

কিন্তু মুরুব্বিরা নিষেধ করেন। খুঁটোর জোর নেই, কাকে ধরলে কি

হয়—এই তত্ত্বে একেবারে আনাড়ি। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসলাম- এবং কি আশ্চর্য, টায়েটোয়ে পাশও হয়ে গেলাম। বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যবল না থাকলে এমন অঘটন ঘটে না। আরও বছর দেড়েক কেটে গেলে হঠাৎ সরকারি চিঠি—আমাকে সাবরেজিস্ট্রার করা হয়েছে বিরাটগড়ে। এ চাকরির নিয়ম—আজ এখানে কাল ওখানে, তামাম ঘাটের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়ায়। মুরুব্বিরা তাই ভরসা দিলেন—থাকো না বাপু চেপেচুপে। উপরে যাওয়া-আসা কর, তড়িঘড়ি যাতে বদলি হতে পার ভাল জায়গায়। ভাল অর্থে তাঁরা ভাবেন, যে জায়গায় দু-চার পয়সা উপরি আছে; আমি ভাবি, আছে যেখানে আড্ডা দেবার জুত।

আছি তাই। হরিশ নামে ওখোড় একটি লোক পেয়েছি। সাবান কেচে রান্না সেরে জুতোয় বুরুশ ঘষে বাসন মেজে তার পর ধাঁ করে উর্দি চাপরাস পরে নিয়ে গোঁফ চুমরে হরিশ আমার অফিসের চাপরাসি হয়ে যায়। বেলা দশটায় চাপরাসি সহ হাকিম গিয়ে এজলাসে ওঠেন। এই পাড়াগাঁয়ে সাবরেজিস্ট্রারকে বলে 'হাকিম'—সকলে হুজুর-হুজুর করে। শুনতে খাসা লাগে। চারটে অবধি তালেগোলে কেটে যায় এমনি

সন্ধ্যার পর থানায় ডাক পড়ে প্রায়ই। হেরিকেন ও লাঠি-বন্দুক নিয়ে কনস্টেবল চলে আসে। ছোট-দারোগার তাসের নেশা। কাজকর্মে বাইরে গেলেন তো আলাদা কথা—থানায় উপস্থিত থাকলে তাসে ওঁরা বসবেনই। অঞ্চলটার অধিপতিই হলেন ওঁরা—যার তার সঙ্গে মিশতে পারেন না। তাসখেলায় চারজন চাই—তা ছোটবাবু ছাড়া আছেনও বড়-দারোগাবাবু, সরকারি-ডাক্তার আর দশ-আনির নায়েব দয়ালহরি সেন একজন কেউ গরহাজির থাকলে আমার খোঁজ পড়ে যায়। ছাড়ান নেই কোন রকমে। খুনী আসামীকে গ্রেপ্তার করে হিড়হিড় করে থানায় নিয়ে যায়—প্রায় সেই গতিক। আমার ভাল লাগে না। নিরিবিলি একটু লেখাপড়া করতে চাই। চুপি চুপি বলি—বয়সটা খারাপ এবং চতুর্দিকে গাঙখাল ও সবুজ গাছপালা থাকায় কিঞ্চিৎ পদ্য লেখার বাতিকে পেয়েছিল ঐ সময়টা।

রেজেস্ট্রী অফিস পাকা-দালানে, তারই কাছাকাছি খান-দুই দোচালা খোড়োঘর নিয়ে বাসা আমার। রাত ঝিমঝিম করে। তক্ষক ডাকে ঘরের আড়ায়। আর কেউ ডাকে জঙ্গলে—তার মানে, বড়-মিঞা বা ঐ জাতীয় বড়দের কেউ দর্শন দিয়েছেন। বাদুড়ের ঝাঁক দেবদারুবনে পাকা ফল খাচ্ছে—গাছের উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সেই শব্দেও গা শিরশির করে। পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে মানুষে মানুষে তফাৎ হয়ে থাকা

একান্ত অনুচিত, এই মহাতত্ত্ব মনে পড়ে যায় তখন। হরিশকে ভিতরে ডেকে নিই। হাকিম ও চাপরাশির পাশাপাশি শয্যা। দশে-ধর্মে দেখে না এই যা—দেখতে পেলে ধন্য ধন্য করত।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে হরিশ ডাকছে: উঠে পড়ুন হুজুর, বেড়ার ওধারে জলের তোড শোনা যাচ্ছে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। তাই বটে! উঠানে জল বয়ে চলেছে। বৃষ্টি চলছে দু'দিন ধরে—তাই বলে এত জল?

এদিক-ওদিক তাকাই। সীমাহীন জল। মেঘ-ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অদূরের অফিসবাড়িটা দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে। দাওয়ায় বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। ভারি এক আফালি করল। হরিশ চুকচুক করে: ইস—একেবারে চাঁচতলায় গো! বড় কাতলা। কুঠির-পুকুর ভেসে সব মাছ বেরিয়ে পড়েছে। খেপলা-জাল থাকলে এক্ষুনি এটাকে কায়দা করে ফেলতাম।

বান ডেকেছে। লটবহর কাঁধে নিয়ে একহাঁটু জল ভেঙে অফিসের দালানে এসে উঠলাম। এসেছিলাম ভাগ্যিস। বানের তোড়ে সন্ধ্যা নাগাত আমার সেই কাঁচা-বাসঘর ভেঙে পড়ল। চাল-খুঁটি-বেড়া এদিক-সেদিক ভেসে চলল. ওখানে থাকলে আমাকেও ভাসতে হত।

দিন তিনেক পরে জল সরে গিয়ে ফের ডাঙা দেখা দিল। তখন ঘরের সমস্যা। সরকারি অফিসে চিরকাল বসবাস চলে না। খোড়োঘরে আবার গিয়ে উঠতে আমার ঘোরতর আপত্তি। তাসের আড্ডার বন্ধুবর্গও চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু ভেবে কোন্ সুরাহা হবে—পাকা-কোঠা এই জায়গায় কে বানিয়ে রেখেছে আমার জন্য?

দশ আনির নায়েব দয়ালহরি একটা খোঁজ দিলেন—কুঠিবাড়ি যেতে চান তো বলুন। নীলকরদের বাড়ি—ভেঙেচুরে পড়ে ছিল। দশ-আনির সেজোকর্তা সেই বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করে দরজা-জানলা পালটে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য করলেন। ইচ্ছে ছিল, মাঝে মাঝে মহালে এসে ঐখানে থাকবেন। কিন্তু প্রথম বারেই ক-দিন থেকে চোঁচা-দৌড় মারলেন. আর এ-মুখো হন নি তার পর। ভূতের বাড়ি—ভূতরা কিলবিল করছেন কুঠিবাড়ির অন্দিসন্ধিতে। গল্প শুনে সরকারি-ডাক্তার হেসে খুন। ভূত না ঘোড়ার-ডিম মশাই। ডাক্তার হিসেবে আমার জানতে কিছু বাকি থাকে না। সেজোকর্তা বেএক্তিয়ার হয়ে থাকতেন—সে চোখে গরু-মানুষ পেত্নী-ভূতের তফাৎ বোধ থাকে না! আপনিও যেমন!

দয়ালহরি আমার দিকে চেয়ে বলেন, তা সাহস থাকে তো বলুন। চাবি-ছোড়ান আমার কাছে—এক্ষুনি তালা খুলে দিচ্ছি। রঙিন মেঝে, ডিসটেমপার-করা দেয়াল, সেজোকর্তার শখের আসবাবপত্তর—যদ্দিন ইচ্ছে ভোগদখল করুন গে। কাছেই আমার বাসা—ছাড়া-বাড়ি দেখে মেয়েদের গা ছমছম করে। মানুষের আনাগোনা হলে তারা সোয়াস্তি পাবে।

বড়-দারোগাও অভয় দেন: ঠিক আছে মশায়—ঐখানে উঠুন। লেখাপড়া শিখে কুসংস্কার থাকবে কেন? সারারাত্তির বরঞ্চ কনস্টেবল মোতায়েন করে দেব ওখানে। বন্ধুলোক আপনি, সরকারি লোকও বটেন।

উঠলাম তো কুঠিবাড়ি। গোড়াতেই হরিশ জবাব দিল—কাজকর্ম সবই সে করবে, কিন্তু রাতে থাকবে না। সন্ধ্যাবেলা রান্নাবান্না সেরে চলে যাবে। যা গতিক, চাপাচাপি করতে গেলে চাপরাসির চাকরিটাই ছেড়ে দেবে হয়তো।

যাক গে, বয়ে গেছে! দারোগাবাবু কথা রেখেছেন। রাত্রিবেলা এক ঘুমের পরেও জানলা দিয়ে দেখছি, বসে আছে লোকটা বারাণ্ডার উপর। মাস চারেক কেটে গেল। আরামেই আছি। সেজোকর্তা কি দেখেছিলেন জানি না—যাঁরাই হন, বাস উঠিয়ে সরে পড়েছেন। দয়ালহরি খুব দৃষ্টিমুখ দেন। ইদানীং কুঠিবাড়ির সামনে দিয়েই তাঁদের যাতায়াত। আমায় দেখলে বারাণ্ডায় উঠে আপ্যায়ন করেন: আছেন ভাল? বেশ, বেশ—

স্ত্রীর নাম করে হরিশকে বলেন, বড়বউ কি জন্যে ডাকছে একবার তোকে। শিগগির শুনে আয়।

তার মানে, রান্না-করা দু-একটা তরকারি কিম্বা পিঠা পায়স। হররোজ এই চলে। বিদেশি মানুষ একলা পড়ে থাকি—আর হরিশের যা রান্নার তরিবৎ! ক্ষিধের জ্বালায় সেই বস্তু গলাধঃকরণ করি। অভ্যাস না থাকলে কক্ষনো আপনারা তা পেটে রাখতে পারবেন না—নোংরা কাণ্ড করে বসবেন।

কুঠিবাড়ি আর দয়ালহরির বাসার মাঝে একখানা শুধু আউশ-ক্ষেত। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ওদের সব দেখা যায়।

আচ্ছা হরিশ, একটা মেয়ে দেখতে পাচ্ছি ক-দিন—

অফিসে হরিশ চাপরাসি, কিন্তু অনেকদিন পাশাপাশি রাত কাটানোর দরুন বাড়িতে সময়বিশেষে সে সখাস্থানীয়।

উই যে ঢ্যাঙা এক হাড়গিলে ঘুরছে যেন।

হাড়গিলে কোথায় হুজুর—শহুরে মেয়ে, অতি শ্রীমন্ত।

গাঁয়ের তাবৎ খবর হরিশের নখদর্পণে। বলে, নায়েবের ভাগনী হন উনি। মা নেই—বাপের দ্বিতীয় পক্ষ। নানান গণ্ডগোলে মামার-বাড়ি এসে উঠেছে।

ফিক ফিক করে হেসে বলে, চালচলন অবিকল হুজুরের সঙ্গে মিলে যায়। পুকুরে নামবে না কিছুতে, ডুবে যাবার ভয়। তোলা-জলে চান করে। কে জল তুলে দেবে—তা দেখুন গে, সারা বেলা নিজেই বইছে কলস ভরে ভরে।

ঐ এক পরিচয়েই মেয়েটাকে আপন মনে হল। গ্রামের মধ্যে দু-জন আমরা স্বতন্ত্র নরনারী। ঘাটে গিয়ে গা ডুবিয়ে নাইতে পারি নে। অদৃষ্টবশে জঙ্গুলে গ্রামে নির্বাসনে এসেছি, কিন্তু শহরের অভ্যাস নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। এখানকার একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি যেমন নিশ্বাস ছাড়ি, ঐ মেয়েটাও ছাড়ে তেমনি নিশ্চয়।

অথচ দেখি নি তাকে—আউশ-ক্ষেতের ওপারের একটুকু ছায়ামূর্তি ছাড়া। দশটায় অফিস চলে যাই। এক রবিবারে স্নানের জল বওয়া ব্যাপারটা চোখে দেখলাম। কত মেয়ে-বউ তো কুঠির-পুকুরের জল নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত দূর থেকে এক নজরেই মালুম হল, ঐ মেয়ে আলাদা। কলসি কাঁখে ধরবার কায়দাও জানে না—অর্ধেক জল চলকে পড়ে শাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে, সাবরেজিস্ট্রার-হাকিম কুঠিবাড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে নজর হানছে। অন্য মেয়ে-বউ যেমন করে—কেউ আধ-হাত ঘোমটা তুলে দেয়, কেউ বা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খায়, কোনো লজ্জাবতী মাঠ-পগার পেরিয়ে শজারুর মতো চোঁচা-দৌড় মারে (শজারু বললাম এই জন্যে যে পায়ের তোড়া ঝুনঝুন আওয়াজ তোলে দৌড়ানোর সময়)—আর এ মেয়ে সোজা একবার আমার দিকে তাকিয়ে যেমন যাচ্ছিল ধীরে ধীরে তেমনি চলে গেল।

অঘ্রানে খানাডোবায় পাট-পচানো জল কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। যথারীতি কুইনাইন সেবন সত্ত্বেও হাড় কাঁপিয়ে একদিন জ্বর এলো। বিছানা ছেড়ে উঠবার তাগত নেই। রেজেষ্ট্রি-অফিসের কাজ একরকম বন্ধ—চাপরাসি হরিশকে তবু গিয়ে হাজরে দিতে হয়। দুপুরবেলাটা নিঃসঙ্গ লাগে। মা কবে মারা গেছেন, তাঁর কথা মনে আসে। শহরের বন্ধুবান্ধবদের কথা ভাবি। আর ভাবি দয়ালহরির ভাগনীটাকে। জ্বর কম থাকলে মাঝে মাঝে জানলায় বসি। যদি সে কুঠির-পুকুরে জল নিতে যায়, কিম্বা দয়ালহরির স্ত্রী বার্লি রেঁধে পাঠিয়ে দেন তার হাত দিয়ে।

বার্লি নিয়ে নয়—শুধু-হাতে সে এলো। মাথা কামড়াচ্ছিল, দু-আঙুলে রগ টিপে ধরে ছটফট করছিলাম। হঠাৎ দেখি, শিয়রের পাশে কখন

এসে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেমের মতো ফরসা চেহারা—আপনার আমার ঘরে এমনটা কদাচিৎ দেখা যায়। তাকিয়ে পড়তে জিজ্ঞাসা করল: বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

না, না বেশ তো আছি—

মিথ্যাও নয় জবাবটা। বলুন দিকি, কষ্ট থাকে অমন মেয়ে ঐভাবে সমবেদনা জানানোর পর? এতক্ষণের আর্তনাদ চক্ষের পলকে গানের মতো সুরেলা হয়ে উঠেছে।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না।

চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু না বসে চকিতে বেরিয়ে চলে যায়: আজকে যাচ্ছি আমি। আবার আসব—কেমন?

দেখলাম, হরিশ এসে পড়েছে। তাই পালাল। কখন কি লাগে না লাগে—অফিস থেকে হরিশ সকাল সকাল এসেছে সেজন্য। মনিবের জন্য উদ্বেগটা কিছু কম হত যদি হতভাগার!

মাসখানেক ভোগান্তির পর জরটা গেল। দুপুরের দিকে মেয়েটা রোজই আসে। কথাবার্তা বেশি নয়, মধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই গ্রাম-অঞ্চলে সাধু-ফকিরেরা ঝাড়ফুক দিয়ে ব্যাধি সারান। সরকারি-ডাক্তার যতই দেমাক করুন, আমি জানি, দু-চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে মেয়েটাই আমার জর সারিয়ে দিয়েছে।

জর বন্ধ হবার পরে আর দেখা পাই নে। তখনও ঠাণ্ডা লাগানো বারণ—সন্ধ্যার পর দরজা-জানলা ভেজিয়ে ঘরে থাকতে হয়। এক কালে গানের চর্চা করতাম, গলার সুরের বিস্তর তারিফ পেয়েছি। দয়ালহরির বাড়ি থেকেই এক হারমোনিয়াম জুটিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় লেগে গেলাম আবার। ডাক্তারের সব উপদেশ মেনে চলা যায় না—শেষটা দুয়োর-জানলাও খুলে দিয়েছি। কিন্তু গানে বনের পশু হয়তো বশ হয়, শহুরে মানুষ নৈব নৈব চ। ওরা বেশি কঠিন।

মরীয়া হয়ে এক চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত সোজা কয়েকটা কথা: গান গেয়ে গেয়ে গলার নলি ছিঁড়ে গেল, তবু একবার দেখা পাই নে। অসুখের সময় রোজ আসতে - অসুখই তবে তো ভাল ছিল আমার পক্ষে। রোজ আমি দরজা খুলে ঠাণ্ডা লাগাই—ভাগ্যবশে অসুখ করে যদি আবার।

হরিশ কি মনে করবে, তাকে দিয়ে হয় না। পথের এক রাখাল-ছোঁড়াকে ডেকে নগদ পাঁচ পয়সা কবুল করলাম: নায়েবমশায়ের ক্ষেতে উই যে একজন বেগুন তুলছে, ওকে দিয়ে আয় তো কাগজখানা। কী বলে সেটা শুনে আসিস।

ছোঁড়া এসে বলে, গোখরোসাপের মতন ফোঁস করে উঠল হুজুর। কোনদিনও কোনখানে আসে নি—মিছে কথা লিখেছেন নাকি আপনি। কাঁটাসুদ্ধ বেগুন ছুঁড়ে মারতে গেল। ভয়ে ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।

আরও পাঁচ পয়সা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদায় করলাম গোখরোসাপের মুখ থেকে বেঁচে এসেছে বলে। এসো নি তুমি—মিথ্যে কথা? বেশ, তাই মেনে নিলাম। আমারই চোখের ভুল, দিনের পর দিন চোখ ভুল দেখেছে। তোমার মুখে হেন বাক্য - কেউ নেই তবে আমার বিশ্বভুবনে! সেই ভাল—আমার কেউ নেই।

একটু-আধটু অফিসে যাচ্ছি এখন, সকাল-সকাল ফিরে আসি। এসে দেখি, ঘরের মেঝের উপর আঁটা-খাম। জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

লিখছে—রাগের বশে ছোঁড়াটাকে যা বলেছি, পুরোপুরি ঠিক নয়। এক-শ পাঁচ জ্বর শুনে গিয়েছিলাম একদিন। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে আসি। রোজ যেতাম, একথা বলা হল কেন তবে? এই ছোট ব্যাপার নিয়ে চিঠি লেখাও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আপনার পক্ষে।

নাম লিখেছে লাবণ্য। নাম পেয়ে গেলাম—এই বা কম কিসে? আমি চুপচাপ। স্রেফ বেকবুল দিয়ে বেগুন নিক্ষেপ হচ্ছিল—তবু অন্তত একটা দিনের নিশানা পাওয়া গেল। একটা দিন ছাড়া বাকি সমস্ত মায়া!

আবার চিঠি ক-দিন পরে: না-হয় গিয়েছি চার-পাঁচ দিন। বিদেশি মানুষ রোগে আই-ঢাই করছেন—কানে শুনে অমন সবাই দেখতে যায়। ঘরের ভিতরে যাইনি তো। মামা-মামির কানে এ সমস্ত না ওঠে—দোহাই আপনার!

চিঠি পড়ছি—চোখ তুলে দেখি, লেখিকাই অদূরে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। হাসছে মুচকি মুচকি।

জিজ্ঞাসা করলাম: এত খেলানো হচ্ছে কেন?

মজা করি।

সাহস পেয়ে বলি, এখন মোটেই আসছেন না। একা একা বড্ড কষ্ট হয় আমার। এত কঠিন আপনি, ভাবতে পারি নি।

খিলখিল করে হাসে: আপনি-আপনি করেন—মনে হচ্ছে কত দরের লোক যেন আমি!

অপরূপা ইতিমধ্যে এতখানি অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে—হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেলাম: বেশ, তুমি বললে যদি আপদ চোকে তো তাই।

দিন কতক তার পরে ভারি মজা চলল। নিরিবিলি থাকলেই সে চলে

আসে। নানান ছলছুতোয় আমিও হরিশকে বাইরে রাখি। এমন হল, সন্ধ্যার পর সবে একটু প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ উঠেছে—

দেখেছি গো, দেখতে পেয়েছি। আমার চোখে লুকিয়ে থাকবে, এত ক্ষমতা নেই তোমার লাবণ্য। এসো, খাটের উপর ভাল হয়ে বসে গান শোন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল আলাদা একজন কালো-রঙের—খুড়ি, একটুখানি চাপা-রঙের মেয়ে। আর ঝকমকে সেই লাবণ্য স্বচ্ছন্দে করে কোন ফাঁকে সরে পড়েছে। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি: কে আপনি?

হকচকিয়ে গেল সে। কণ্ঠস্বর কাঁপছে, কথা আটকে আটকে যায়।

কেউ নই, কেউ নই। গান হচ্ছে শুনে একটু এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ডাকলেন, তাই ভিতরে এসেছি। পথ ছাড়ুন, চলে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাটা মনোরম হয়ে উঠেছিল, মাটি করে দিল। আচ্ছন্নের মতো মেয়েটা চলে যাচ্ছে—তবু মায়াদয়া হয় না, যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছি: চরবৃত্তি করতে এসেছিলেন—পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, কে আপনি? কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

অদৃশ্য হয়ে গেল ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালার আড়ালে। রাত্রিবেলা পিছনে ছুটে গিয়ে ধরব, এত সাহস নেই শহুরে ছেলের। যাই হোক, আর দেরি করা ঠিক নয়—বদনাম রটে যেতে কতক্ষণ! নিশ্চয় কারো নজরে পড়ে গেছে, অন্তত পক্ষে যে মেয়েটা ঐ পালিয়ে গেল।

যা থাকে কপালে—দয়ালহরির কাছে পরদিন কথা পেড়ে ফেললাম: আপনার ভাগনীর সঙ্গে যদি বিয়ে হয়—নিতান্ত অযোগ্য আমি, তবু যদি দয়া করে—

আপনি—তুমি বাবা, পায়ে ঠাঁই দেবে লাবণ্যকে? যার মা নেই, তার কিছুই নেই। অনেক কষ্ট পেয়েছে এই বয়সের মধ্যে। ও-মেয়ের এত ভাগ্য—

আনন্দে দয়ালহরি কেঁদে ফেললেন।

কেল্লা ফতে! ক-দিন পরেই লাবণ্য তুমি একেবারে আমার। শোন, শোন—ও লাবণ্য, খবর রাখ?

দুষ্টুমি-ভরা চোখে চেয়ে সে বলে, মামি তো রেগে আগুন—কী করে জানল তোকে হতভাগা মেয়ে? যাতায়াত চলে বুঝি—প্রেম করে বেড়াস? একছুটে পালিয়ে এসেছি—ধরতে পারলে মামি দিত দেখিয়ে। কই, গান-টান হবে না আজকে?

সত্যি হাঁপাচ্ছে। আর ঐ ভুবনমোহন হাসি। ক্ষেপে গেলাম যেন। ধরতে পারলে—মাস্মি কেন, আমিও দিই দেখিয়ে এমনি করে খেলানোর জন্য।

পালাচ্ছে, আমিও পিছনে ছুটি। ভয়-টয় গিয়ে অকস্মাৎ বিষম বীরপুরুষ হয়েছি। থমকে দাঁড়াল সে হঠাৎ একবার। খিলখিল হাসি: ধরুন দিকি কত ক্ষমতা! সে আর পারতে হয় না। ধরুন- ধরুন—

একেবারে কাছে গিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। শুধু-হাত ফিরে এল, কারও গায়ে ঠেকল না তো! একটুকু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারি স্ফূর্তি আমায় বেকুব বানিয়ে দিয়ে- জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাস্যধ্বনি মিশে চারিদিক তরঙ্গিত হচ্ছে। পাঁকাল-মাছের মতন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। তাই বা কোথায় এত ছুটছি, তবু একটুকু স্পর্শ পাই নে।

আচ্ছা এইবারে—চু-উ-উ-উ -

পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কপাটিখেলায় যেমন দম ধরে ছোটে। নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ভ্রমরার একটানা গুঞ্জন। খালি-পায়ে মাটির ঢেলায় ঠোক্কর লাগছে —তখন মালুম হল, আউশক্ষেতে চলে এসেছি। ধান কাটা শেষ হয়ে নতুন চাষ দিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার ঝিকিমিক ফুটছে চারিদিকে। ক্ষেতের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে সে ডাক দেয়: কই—পারলেন না তো!

ধরেছি—ধরলাম এইবারে বুঝি! উঁহু, ফসকে গেল, সামান্য একটুখানির জন্য। আলেয়া এমনি করে ভুলিয়ে নিয়ে যায় পথিককে—নিয়ে গিয়ে রক্ত শোষে।

রক্তে আগুন ধরে গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভাল-মন্দ ভাবি কখন? এসে পড়েছি দয়ালহরির বাইরের উঠানে। আমি হেন হাকিম মানুষ রাত্রিবেলা এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি—দেখতে পেলে লোকে ভাববে, নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা সে যা-ই হোক, জিতেছি—জিতেছি—হাত ধরে ফেলেছি অবশেষে। সুকোমল হাতখানা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, অসুখে কাবু হয়ে পড়েছি, কত কষ্ট আর আমায় দেবে লাবণ্য?

চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেন—বাড়ি এসে আবার মিষ্টি মিষ্টি বুলি! কী ভাবেন আমায়? খেলার পুতুল নই—যা ইচ্ছে করা যায় না আমায় নিয়ে।

গর্জন করে উঠল সেই মেয়েটা, চর সন্দেহে যাকে গালিগালাজ করেছিলাম। আর, যার পিছন ধরে এতদূর চলে এলাম, চক্ষের পলকে সে জ্যোৎস্নার সঙ্গে গলে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দয়ালহরির ভাগনী লাবণ্য তবে তো এই। হাত ধরে লাবণ্যর মান ভাঙাতে আর-একজন এখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে সে নেবেই—আমি আরও শক্ত করে ধরি: বিষম এক গোলমাল আছে এর ভিতরে। নিশ্চয়ই। খুলে বলো লাবণ্য, আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

কী জানে লাবণ্য, আর কী-ই বা বলবে! শহরের নিঃসঙ্গ মানুষটার কষ্ট শুনে চুপিসারে সে গিয়ে বাইরে দাঁড়াত। সে ই আরও অবাক হয়ে গিয়েছে—মানুষটার পিছনে দুটো চোখ আছে নাকি? মুখ না ফিরিয়েই আমার খবর কেমন করে টের পায়? চিঠিতে লিখে পাঠায় আবার সেই কথা…

মামাকে দেখে লাবণ্য তাড়াতাড়ি সরে গেল, সমস্ত কথা শুনতে গেলাম না। যাক গে যাক গে, পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। উল্লসিত চিৎকারে দয়ালহরি আহ্বান করলেন: এসেছ বাবাজী, এসো। থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুকে বললাম তোমার কথা। সবাই ধন্য-ধন্য করছেন। এমন দরাজ দিল পাপ-কলিযুগে কেউ কানে শোনে নি।

এর পরে, আর একটা দিন তাকে দেখেছিলাম। বিরাটগড় থেকে বদলি হয়েছি, পরের দিন চলে যাব। কুঠিবাড়িতে সেই আমাদের শেষরাত্রি। আমি আর লাবণ্য—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন এক আমরা। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। জানলা দিয়ে পশ্চিম-আকাশের চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে এসে পড়েছে। চাঁপাফুল ফুটেছে কোথায়, ফুলের গন্ধে ঘর আমোদ করছে।

খাটের বাজু ধরে আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে সে মুচকি মুচকি হাসছে। দেখা পেয়ে বড় আনন্দ হল: এত সুখ তুমি এনে দিয়েছ, লাবণ্যকে তোমার জন্য পেলাম। যেখানেই থাকি, সারা জীবন তোমায় মনে করব।

হাসতে হাসতে সে বলে, বড় যে তুমি-তুমি করছ—কত বয়স আমার জান?

অনেক ছোট নিশ্চয় আমার চেয়ে—

অনেক বড়। কুঠিয়াল গ্রাণ্ট আমার বাবা, নয়নতারাকে ধরে আনা নিয়ে হরিশ মুখুজ্জের কাগজে খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল—সেই নয়নতারার গর্ভের মেয়ে আমি। কত বয়স তা হলে হিসেব করে দেখ।

বললাম, মেয়েরা বয়স কমায়—তোমার রুচি উল্টো। কিন্তু 'আপনি' বললে তুমিই তো হেসে উঠেছিলে আর একদিন।

হেসেছিলাম বুঝি! তাই হবে। মন খারাপ লাগে এক একসময় - ভালবাসার কথা শুনতে লোভ হয়, সাধ হয় মানুষের ছোঁয়া পেতে।

গভীর এক নিশ্বাস ফেলল। কণ্ঠ ছলছলিয়ে ওঠে। বলল, ধোঁয়ার কুণ্ডলী হে আমি। তোমাদের চোখে ধোঁয়াটা রঙিন লাগে ভাগ্যিস! তোমার লাবণ্যর বকলমে ফাঁকি দিয়ে অনেক ভালবাসার কথা শুনে নিয়েছি। হি-হি-হি—

চলে গেল। হাসি ছাড়া কান্না দেখাবে না বুঝি—পাগলের মতন হাসতে হাসতে চলে গেল তাই।

প্রেমলীলা

তিন দিকে গড়খাই আর একদিকে নদী—প্রাচীন গড়খাই-এর সুস্পষ্ট নিশানা। নামেও তাই—সন্ন্যাসীরাজার গড়। কে এই সন্ন্যাসীরাজা, কোন সময়ে তাঁর রাজত্ব, এসব তত্ত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকরা মাথা ফাটাফাটি করুনগে। তাই করবেনও এবারে—খবরের-কাগজে নিত্যিদিন যখন এ জায়গার নাম বেরুচ্ছে। নাড়িনক্ষত্রের হদিস টেনে টেনে বের করবেন।

গড়ের মাঝখানটায় প্রাচীন রাজবাড়ি। তারই ঝকঝকে লাউঞ্জে চা খেতে খেতে কনস্ট্রাকসন-ইঞ্জিনিয়ার কুমারদেব হরিশঙ্করের মুখে পুরনো কথা শুনছে। স্থানীয় লোক হরিশঙ্কর, অনেক জানে। গোটা বাড়িটা নিয়ে হোটেল চালু হল অয়েল-কোম্পানির ব্যবস্থায়। হোটেলের সুপারভাইজার হরিশঙ্কর।

বলছে, রাজ্যপাট ছেড়ে ভস্ম মেখে রাজা নিরুদ্দেশ হলেন। দুর্ভিক্ষে দেশ উজাড় হচ্ছিল—প্রজাবিদ্রোহের ঘোরতর আতঙ্ক। তার উপরে নবযুবতী ছোটরাণী প্রাসাদ-প্রহরীর সঙ্গে আসনাই করে পালিয়ে গেল—সেই নিদারুণ লোকলজ্জা। কারণ যাই হোক, ঈশ্বরে মতি হল রাজার, তিনি সন্ন্যাস নিলেন। অরাজক অবস্থায় রাজ্য লণ্ডভণ্ড। বিস্তর কাল কাটল সেই অবস্থায়। রাজবাড়িতে এক-হাঁটু জঙ্গল, সাপ-শিয়াল আর বুনোশুয়োরের আস্তানা। আপনিও এসে গোড়ায় এই অবস্থা দেখেছেন—

এক আজব কাণ্ড ঘটে গেল হঠাৎ। সন্ন্যাসীরাজার পরিত্যক্ত রাজধানীতে দ্রুত আবার শহর গড়ে উঠছে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞেরা মাটির নিচে তেলের খবর দিয়েছেন। পেট্রোলিয়াম—যার অপর নাম তরল-সোনা। সভ্যতার রথচক্র যার বিহনে অচল। গড়ের চতুর্দিকে উঁচু-নিচু কাঁকুরে মাঠ। সে-মাঠে লাঙল চালানো অসাধ্য, কোদালি মেরে মেরে হয়রান হয়ে চাষীরা খোরাকি ধানটাও ঘরে তুলতে পারত না। সেই মাঠের নিচে নাকি অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার—কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

রেলস্টেশন কুড়ি মাইল পথ। নতুন পিচের রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে,

রাস্তায় ট্রাক আর মোটরগাড়ির অহোরাত্র চলাচল। ড্রিলিং-এর দৈত্যাকার যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে। লম্বা ডর্মিটারি বানিয়েছে রাস্তার দু-ধার দিয়ে, চাষাভুষো সব উঠেছে গিয়ে সেইখানে। লাঙলের মুঠো আর ধরবে না, অয়েল-কোম্পানির মজুর তারা। ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎ বানাচ্ছে, সন্ধ্যা হতে না হতে নতুন করে আবার দিনমান। রাজবাড়িরও আলাদা চেহারা। মোজেয়িকের মেঝে, কংক্রিটের ছাত, দেয়ালের পলস্তারা খসিয়ে হালকা রঙের ডিসটেমপার, নতুন ফার্নিচার। ঝকঝক তকতক করছে।

হোটেলের লাউঞ্জে চায়ের বাটি সামনে নিয়ে গল্প জমিয়েছে দুজনে। আজই সকালবেলা কুমারদেব মাঠের তাঁবু ছেড়ে হোটেলে এসে উঠল। এ জায়গায় গোড়ার দিকে কথার দোসর মিলত না—হরিশঙ্করের সঙ্গে ভাবসাব সেই তখন থেকেই।

হরিশঙ্কর হেসে বলে, দোতলার স্যুইটগুলো সত্যি সত্যি চমৎকার। খেটেখুটে বানালেন, তবু নিজের ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। নিচের ঘরে আস্তানা নিতে হল।

কুমারদেব বলে, আর দুটো মাস—মাঘ মাসটা পড়তে দিন না। মাঠের তাঁবুতে বউ এনে তোলা যায় না বলেই বিয়েটা মুলতুবি আছে। দক্ষিণ দিকটার স্যুইটাটাও মতলব করে শেষ হতে দিইনি, শেষ হলে অন্য অফিসারে দখল নিয়ে নিত। বিয়ে হবে, আর স্যুইটের কাজও শেষ হবে। বউয়ের পিছন ধরে একতলা থেকে দোতলায় প্রোমোশান।

পরের দিন সকালবেলা দু'জনে আবার সেই লাউঞ্জে।

সন্ধ্যারাত্রে যা একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম—

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে গলা খাটো করে কুমারদেব বলে, আচ্ছা নিচের ঘরগুলোয় সত্যিই কি মানুষ এক জন করে আছে?

নিশ্চয়। দস্তুরায় দেখেশুনে নিজে হুকুম দিয়ে গেছেন।

মানছে না হুকুম। পাশের রুমে সারা রাত্তির প্রেমলীলা চলেছে, ঘুমুতে দেয়নি।

অসম্ভব। হরিশঙ্কর ঘাড় নাড়ল: কোন পাশের রুমের কথা বলেছেন—পুবে না পশ্চিমে?

একটুখানি ভেবে দিক নিরূপণ করে নিয়ে কুমারদেব বলে, পশ্চিমে।

হরিশঙ্কর খাতা বের করে আনল: আপনার হল বাইশ নম্বর ঘর, তার পশ্চিমে তেইশ। মানুষ আসেনি এখনো সে-ঘরে, রেজিস্টার দেখুন। খালি পড়ে আছে।

একজন নয়, দু-দুটো মানুষ। মেয়ের গলা, পুরুষের গলা। প্রেমে মাতোয়ারা—লজ্জাশরম জ্ঞানবুদ্ধি তখন লোপ পেয়ে গেছে। দেয়ালের আড়াল, তবু জানতে কিছু আর বাকি রইল না।

হরিশঙ্কর বলে, স্বপ্ন দেখেছেন আপনি। গুলিয়ে ফেলছেন।

বেশ তো, আপনিও আজ রাতে আসুন না বাইশ নম্বরে। কপালে থাকে তো স্বপ্ন দেখবেন।

গম্ভীর হয়ে কুমারদেব বলে, নিজের কান দুটো অবিশ্বাস করতে পারিনে।

দশটায় ফটক বন্ধ হয়ে যায়, দারোয়ান মোতায়েন থাকে। বাইরের লোক হতেই পারে না দোতলা থেকে কোনো একজোড়া যদি নেমে এসে থাকে।

আবার একটু ভেবে নিয়ে উজ্জ্বল মুখে হরিশঙ্কর বলে, হয়েছে। ব্যানার্জি সাহেব সদ্য ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। সুইটের আঁটোসাটো জায়গায় জুত হয় না, তারাই ঠিক নেমে চলে আসে।

ঘর খালি তো দরজায় তালা দিয়ে রাখলে হয়। ইচ্ছে মতন তাহলে ঢুকে পড়তে পারে না।

হরিশঙ্কর ফিক ফিক করে হাসে: আচ্ছা বদরসিক কিন্তু আপনি। নিখরচার প্রেমালাপ শুনছেন, জিনিসটা মন্দ হল কিসে?

আলাপের যে মাথামুণ্ডু কমা-দাঁড়ি নেই। রাত পুইয়ে যায়, তবু শেষ হয় না।

ও জিনিসের মজাই তো এই। গীতাপাঠ নয় যে অধ্যায় শেষ আর পুঁথি কপালে ঠেকিয়ে চুপ হয়ে যাবে। মাঘমাসে নিজেই তো মাথা মুড়োচ্ছেন, তখন বুঝবেন। তার চেয়ে আমি বলি কি—

হাসিমুখে মুহূর্তকাল তাকিয়ে হরিশঙ্কর আবার বলে, দুম করে আকাশ থেকে কিছু পড়ে না। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই যে ঘরবাড়ি বানাচ্ছেন, হাতে-কলমে কত কাল ধরে রপ্ত করতে হয়েছে ভাবুন। শুয়ে শুয়ে আপনাআপনি যখন কানে ঢুকছে, এ বিদ্যেরও কিছু পাঠ নিয়ে নিন। মেয়েমানুষ কি বলে, পুরুষে তার জবাবটা কি রকম দেয়। পালটা আবার মেয়ে কি বলে। শুনে শুনে আধ-মুখস্থ করে নিন, বিয়ের পর কাজে আসবে।

কুমারদেব এবারে কিছু কঠিন হয়ে বলে, হাসি-মস্করা ছাড়ুন। এ জিনিস চাপা থাকবে না। আপনার নামে দোষ পড়বে। শুধু আপনি কেন, আমাকে সুদ্ধ জড়াতে পারে। খালি-ঘরে কালই তালা ঝুলিয়ে দেবেন।

পরের রাতে আবার। প্রেমালাপ বটে, কিন্তু কথা একবর্ণ বোঝা যায় না। সমস্ত মিলিয়ে মিষ্টি গুণগুণানি। কালকের সেই জুটি, সন্দেহ নেই।

আগের দিন বেদম মজা লুটে গেছে, লোভে লোভে আবার এসেছে। পথ খোলা পেলে নিত্যিদিন এসে জুটবে এমনি।

কুমারদেব খাটের উপর চিৎপাত হয়ে থাকতে পারে না। হরিশঙ্কর মন্দ বলেনি—শুনে নেওয়া যাক, কি কথার পৃষ্ঠে কোন জবাব পড়ে। মনে গেঁথে নেওয়া যাক। দেয়াল ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এখন—এবারে ধরতে পারছে কথা। অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি যেমন খুলে যায়।

আঃ, লাগে না বুঝি!

মেয়েটা বলছে, আরাম লাগে আমার। এক হয়ে এমন গায়ে-গায়ে থাকব, ভাবতে পেরেছি? পালানোর তাড়া নেই—হোক না দিনমান, আসুক না আবার রাত্রি। কাউকে এখন পরোয়া করিনে।

হঠাৎ নিস্তব্ধ। কতক্ষণ এমনি রইল। ঠোঁটে কথা নেই, ঠোঁটের এখন অন্য কাজ বুঝি! নাকি টের পেয়ে গেছে—

টুক টুক—দরজায় টোকা। কুমারদের ছিটকে পড়ে দেয়াল থেকে। ও-ঘরের ওরা কেমন করে টের পেয়েছে তার হ্যাংলামি, চুপিসাড়ে প্রেমলাপ শোনা। পুরুষটি বুঝি রুখে এসে পড়ল এবার।

কুমারদেব খাটের উপর চোখ বুজেছে, যেন কোন-কিছুই সে জানে না। দরজা ঠেলছে বাইরে থেকে, চাপা আওয়াজ: খুলুন না—

আরে, আরে, হরিশঙ্কর আমাদের। পাজামা-পরা অবস্থায় চলে এসেছে। দিনমানে এ বেশে কখনো দেখা যায় না।

ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি?

কুমারদেব পাল্টা প্রশ্ন করে: তালা দেননি তেইশ নম্বরে?

দিলাম আর কই। বাড়তি তালা ছিল না, নতুন কেনা হয়ে ওঠেনি। ভাবলাম, খরচা করবার আগে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করে আসিগে। আজকে হচ্ছে না কিছু? ঠাণ্ডা?

জবাব অবধি সবুর করতে হয় না। ক্ষণবিরতির পর খুক-খুক চাপা হাসি। হাসির পরে গুঞ্জন। মণিরত্ন কুড়িয়ে পাবার মতন একছুটে হরিশঙ্কর দেয়ালের গায়ে। তা হচ্ছে পাওনা সুপ্রচুর—একমুখ হাসিতে সেটা মালুম। কুমারদেবেরও তবে আর একাকী খাটে ভালমানুষ হয়ে শুয়ে থাকার মানে হয় না।

দেয়ালের দুই প্রান্তে দুজনের কান—কান দিয়ে প্রেমালাপ যেন শুষে নিয়ে আসছে। কুমারদেবের মন আগে আগে উড়ছে, ছুটো মাস পার হয়ে লহমার মধ্যে মাঘে পৌঁছে গেল। তাদেরও যেন এমনি রাত্রি পর রাত্রি

এই হোটেলের দোতলার স্যুইটে দুই যৌবনস্ফুট দেহ জড়াজড়ি হয়ে গানের গুঞ্জরণ করছে। গা শির-শির করে ওঠে—সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দিয়েছে, কুমারদেব হাত বুলিয়ে দেখল।

আর হরিশঙ্করের মন টলতে টলতে পিছিয়ে যায় চার বছর—না, পাঁচ বছর। রেবাকে যেবারে বউ করে আনল। এমনি সব রাত্রি—পলকে রাত ফুরিয়ে যায়, কথাবার্তা সারা হয় না। রেবা নামক সেই রমণীই বিপুল দেহ নিয়ে হোটেল-সুপারভাইজারের কোয়ার্টারে ঘুম দিচ্ছে, হরিশঙ্কর একই শয্যায় এতক্ষণ শুয়ে ছিল তার সঙ্গে। না শুয়ে রেহাই নেই বলে। কপাল ঠুকে টিপি-টিপি এই পালিয়ে এসেছে।

এই পালানো চাট্টিখানি কথা নয়, দস্তুরমতো অ্যাডভেঞ্চার। পতিপ্রাণা বউ বরকে চোখে হারায়। বিয়ের দিন গাঁটছড়া বেঁধেছিল, বেঁধে রাখার পাকা স্বত্ব সেই থেকে জন্মে গেল। ইদানীং প্রতি রাত্রেই—নিজের আঁচলে আর হরিশঙ্করের কোঁচায় গিঁট বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখে। বরের বাপের সাধ্য নেই, গিঁট খুলে বেরিয়ে পড়বে।

তবু কী আশ্চর্য, সেই অসাধ্যসাধন করে এসেছে আজ। দায়ে পড়ে বুদ্ধি খোলে। ঈশ্বর ভয়ানক ভয়ানক বস্তু সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু করুণা করে ছিদ্র রেখে দেন বুদ্ধিমানেরা যাতে পরিত্রাণ খুঁজে নিতে পারে। প্রচণ্ড মেয়েমানুষ বটে রেবা, কিন্তু ঘুমখানি নিশ্ছিদ্র। ঘুমের অবস্থায় যা-কিছু করবার, করে নিতে পারো। হরিশঙ্কর তাই করে এসেছে। পরনের ধুতি যেমন-কে-তেমনি ছেড়ে রেখে পাজামা পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। ছাড়া-ধুতির প্রান্ত আঁচলে বেঁধে রেবা ঘুমুচ্ছে।

কয়েকটা কথা দেয়াল ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে ছিটকে এল : বড় রূপসী তুমি—রূপ না ছাই!

দেহটুকু জুড়ে ফুল আর ফুল। আর পদ্মকলি।

হরিশঙ্কর আঁকুপাঁকু করে। এত রূপের কথা বলছে, চোখ মেলে দেখা যেত একটি বার! রাজবাড়ির ছাত-মেঝে ভেঙেচুরে নতুন করে বানাল, কঠিন দেয়ালের একখানি ইটও খসায়নি। কলি ফিরিয়ে রং করে দিয়েছে শুধু। জানলা রাখত না সেকালে, ছাতের কাছাকাছি ঘুলঘুলি সামান্য বাতাস চলাচলের জন্য। চাক্ষুষ দেখার অতএব উপায় নেই, কানে শুনেই যেটুকু চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। অফিস-ঘড়িতে একটা বাজার আওয়াজ। সর্বনাশ, পুরো ঘণ্টা কেটে গেছে। এত দুঃসাহস ভাল নয় কিন্তু। রেবা যখন

বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে রয়েছে, জেগে পড়া একেবারে অসম্ভব কিসে? ভাবতে গিয়ে বুক ঢিবঢিব করে।

না, ঘুমোচ্ছে রেবা নির্ভাবনায় কোঁচার গিঁট কোমরে গুঁজে রেখে। ঘুমোও, ঘুমোও। পাজামা বদলে ধুতি পরে হরিশঙ্কর নিপাট ভদ্রলোক হয়ে পাশটিতে টুক করে শুয়ে পড়ল।

হরিশঙ্কর জানে না—ব্যাপার কিন্তু সঙ্কটময়। অন্য দিন না হোক, আজ রেবা জাগ্রত। হরিশঙ্করের অদৃষ্ট! কী দেখে পোষা বিড়ালটা জানলা থেকে লাফ দিয়েছিল—টিপয়ের কাচের গ্লাস মেঝেয় পড়ে চুরমার। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রেবা। ভেবেছে চোর। গিঁট-দেওয়া ধুতি শয্যায় লুটাচ্ছে, মানুষটা সরে পড়েছে। পাগল হয়ে রেবা বেরুল। ফটকে একটা আলো জ্বলছে, তা ছাড়া অন্ধকার চতুর্দিক। জনহীন। ভয়ে গা ছম-ছম করে। রাত্রিবেলা কোথায় এখন হুড্ড হুড্ড করে খুঁজবে। তার চেয়ে ঘরে গিয়ে দরজার পাশে বিড়ালের ইঁদুর ধরার মতো ওত পেতে বসে থাকুক। ফিরবে তো এক সময়!

বসে বসে আরও এক মোক্ষম মতলব এলো। ফিরবে হরিশঙ্কর—এখনই কিংবা এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টা পরে। এবং রেবা যথোচিত কটুকাটব্যও করবে। তা সত্ত্বেও কায়দা করা যাবে না, আজে-বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে ভালমানুষ হয়েই থাকবে। হাতে-নাতে একেবারে স্ত্রীলোক-সহ ধরতে পারলে তখন আর বলবার মুখ থাকবে না। তাই করতে হবে।

কপট ঘুমে আবার সে বিছানায় পড়ল। দিনমানেও বুঝতে দিচ্ছে না—কোন-কিছুই হয়নি, এমনি তার ভাব। যাতায়াত এমন কতদিন ধরে চলছে কে জানে! নেশায় যখন পড়েছে, রোজই যাবে। না গিয়ে উপায় নেই। কালকের রাত্রিটা অবধি ধৈর্য ধরে থাকা।

পরের রাত্রে প্রেমময় স্বামী-স্ত্রী বাহুবন্ধনে আঁটো হয়ে এবং শাড়িতে-কোঁচায় গিঁট দিয়ে যথারীতি ঘুমুচ্ছে। হরিশঙ্কর একসময় উঠে ধুতি ছেড়ে পাজামা পরে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্ত পরে রেবাও। কী সর্বনাশ! কেলিকুঞ্জ হোটেলের ভিতরেই—কয়েকটা মাত্র ঘর পার হয়ে গিয়ে। লজ্জা-ভয় একেবারে পুড়িয়ে খেয়েছে! হয় এমনি, এ রোগের লক্ষণই এই।

কুমারদেব দরজা আজ খুলে রেখেছে। নিজেও বসে আছে। হরিশঙ্কর ঢুকে পড়ল। একটু পরেই দ্বিতীয় একজন—অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দত্তরায় স্বয়ং। কুমারদেব ঘটনাটা বলেছে তাঁকে। প্রতিকার হরিশঙ্করকে

বিয়ে হবে না—তার ইচ্ছা, চলুক এমনি—সে এসে নিত্যিরাতে দু-কান ভরে মজা লুটে যাবে। কিন্তু পাশের ঘরে মচ্ছব চলবে, এ জিনিস হতে দেওয়া যায় না। হোটেলের বদনাম, কুমারদেবের নামেও দোষ পড়বে।

প্রবীণ গম্ভীর মানুষ দত্তরায়। কান খাড়া করে মুহূর্তকাল শুনে নিলেন। টর্চ জেলে ধরে ডাকলেন: আসুন—

পাশের তেইশ নম্বর রুম ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরে ঢুকে সেই যুগলে খিল এঁটে দিয়েছে। দত্তরায় সজোরে কড়া নাড়লেন। লাথি দিলেন দরজায়: খোল বলছি—নয়তো ভেঙে ফেলা হবে। শিগগির খোল।

দরজা খুলে গেল। নারী-মুখের উপর দত্তরায় টর্চ ফেললেন। হায় ভগবান, হায় ভগবান—হরিশঙ্কর বজ্র হত, রেবা এখানে! যে কণ্ঠের প্রেমালাপ শুনছিল, সে হল রেবা? পারে না যে এমন নয়, চার বছর আগেও তো কলকল করে বলত। আজ না-জানি কার সঙ্গে বলছিল চার বছর আগেকার সেই সব কথা—কোন পুরুষ?

দত্তরায় গর্জন করে ওঠেন: অন্য জন কোথায়?

নিজের ঘরে রেবার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। এত লোকের মাঝখানে লজ্জায় অপমানে সে কেঁদে পড়ল: অন্য কে আবার?

একলাই বুঝি দুইজন হয়ে দুই সুরে কথা বলছিলেন? এমন জিনিস বিশ্বাস করতে বলেন?

দুইজনের কথা—সে তো পাশের ঐ ঘরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুস্পষ্ট কথা শোনা গেল: দুজনে কেমন বেশ এক হয়ে আছি।

অন্য কণ্ঠ: কোনদিন কেউ আর আলাদা করতে পারবে না।

রেবা চেঁচিয়ে ওঠে: ঐ যে, বলছে এখনো। ও-ঘরে। আমায় বড় দুষছিলেন - শুনতে পাচ্ছেন?

কুমারদেবের বাইশ নম্বর রুম ছেড়ে এইমাত্র সবাই এসেছে—প্রেমলীলা লহমার মধ্যে সেখানে চালান হয়ে গেছে। ক্ষিপ্ত দত্তরায় ছুটলেন আবার বাইশ নম্বরে। কিছুই না—খালি ঘর। কথাবার্তা যত-কিছু পাশের তেইশ নম্বর থেকে আসে।

বেড়ে মজা! অদৃশ্য কৌতুকীরা প্রেমের খেলা নিজেরা খেলছে, খেলাচ্ছেও আবার এদের সকলকে নিয়ে। এরা যখন বাইশ নম্বরে হামলা দিয়েছে, ওরা চলে যায় তেইশে। এরা যখন তেইশে, ওরা ফের বাইশে গিয়ে জোটে। অদৃশ্য চলাচল—পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, তারও আগে।

অনেক লোক জুটে গেছে এখন, উপর থেকে নিচে থেকে ঘুম ভেঙে এসে পড়েছে। এ-ঘরে ও-ঘরে—দু-ঘরেই লোক। বাইশ নম্বরের লোক বলছে, তেইশ নম্বরে কথাবার্তা। তেইশের লোক বলছে, না না—বাইশে। তরাস লেগেছে—এ-হেন তাজ্জব ব্যাপার কী করে সম্ভব হয়?

কুমারদেব কী একটা ভেবে নিয়েছে। বলে, আচ্ছা, আসুনগে সব আপনারা। কাল দিনমানে দেখা যাবে।

হোটেলে সারা রাত কেউ ঘুমাল না। হেথায় হোথায় জটলা। বিস্তর ঘর-বাড়ির কাজ হচ্ছে, মিস্ত্রিমজুর খাটছে—পরদিন প্রহরখানেক বেলায় কুমারদেব তাদের কতকগুলো নিয়ে এলো। তেইশ ও বাইশ নম্বরের মাঝের দেয়ালের এখানে ওখানে গাঁইতির ঘা দিচ্ছে। গুমগুম করে আওয়াজ এক জায়গায়—অর্থাৎ গাঁথুনি নিরেট নয়, ভিতরটা ফাঁপা। এমনি কিছু কুমারদেব আন্দাজ করেছিল। জায়গাটা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিল: খোঁড় এখানটা, দেখা যাক।

এঘরে ওঘরে দেয়ালের দুই পাশ থেকে দুমদাম গাঁইতি পড়ছে। একটা ইট খুঁড়ে ফেলতেই কাঠের গায়ে ঠোকর লাগে। হয়েছে, হয়েছে, সবুর—

লম্বা সাইজের কাঠের বাক্স—জিনিসটা মাঝখানে বসিয়ে দু-পাশে গেঁথে দেয়াল ভরাট করে দিয়েছিল। বাক্স ঠিক বলা চলে না—ডালা নেই, বড় বড় গুলপেরেক ঠুকে মজবুত করে চতুর্দিকে তক্তা আঁটা। কোন একটা যন্ত্র, গ্রামোফোন জাতীয় জিনিস—রাত দুপুরে যেখান থেকে অনর্গল প্রেমালাপ বেরোয়।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে গাঁইতির চাড়ে অবশেষে একদিককার তক্তা উঠে গেল। যারা কাজ করছিল, বাবা রে—বলে ছিটকে পড়ে। বাঘ বেরুল, না কেউটেসাপ? তার চেয়েও সাংঘাতিক—কঙ্কাল। একটা নয়, দুটো মানুষের কঙ্কাল।

দুটো মানুষ মুখোমুখি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। একজন নারী—হাতে গয়না, গলায় গয়না, কোমরে গয়না, পায়ে গয়না। মাথায় দীঘ চুল খসে খসে পড়েছে, তার মধ্যেও গয়নার মণিমাণিক্য জলজল করছে। অন্যটি পুরুষ। বেঁধে দিয়েছে দুজনকে—তার মধ্যেও পুরুষ-কঙ্কাল দুহাতে নারী-কঙ্কালকে বেড় দিয়ে ধরে আছে। দুই কঙ্কালের নিরাবরণ দু-জোড়া দাঁতের পাটি হাসছে—কফিনের নিরিবিলি ঠাঁই পেয়ে বর্তে গিয়েছে দুজনে।

হরিশঙ্কর কুমারদেবের কানে কানে বলে, বুঝতে পারলেন? ছোটরানী। তারা পালিয়ে যায়নি, রাজবাড়িতে রয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরাজা নিজেই বোধহয় বনবাসের এই পাকা জায়গা করে দিয়েছিলেন।

ফেরা

কাশী, প্রয়াগ, কিংবা মথুরা ?

ফিক করে সুষমা হেসে ফেলল। বলে, তীর্থধর্মের বয়স কি আমাদের ? আর কোনো জায়গা পেলে না বুঝি ?

ধর্মের আবার বয়স আছে নাকি ?

সুষমা রায় দিল : এখন বাইশ তোমার বয়স—যখন বাহাত্তর হবে, সেই সময় অনুমতি দেবো। তার আগে নয়।

তারক হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, তুমিই ঠিক কর তবে কোথায় যাওয়া যায়।

বাঁ-হাতের উপর থুতনির ভর রেখে সুষমা স্বামীর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। অবাধ্য ক'টি চুল এসে পড়েছে মুখের উপর। সরিয়ে দেয়, আবার এসে পড়ে। বাংলা বিশ সনের সেই অষ্টাদশী সুষমাময়ী।

জয়পুরে পিসিমা আছেন। তিনি তো চিঠির পর চিঠি দিচ্ছেন যাবার জন্যে।

তারক সায় দেয় : চমৎকার জায়গা। গোবিন্দজী আছেন সেখানে। আর কাছেই অম্বরপাহাড়ে যশোরেশ্বরী।

ঘাড় নেড়ে সুষমাময়ী বলে, উহু, কক্ষনো ওখানে নয়—

তারকও সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে : মরুরাজ্যে মন টিকবে না সত্যি। জল না দেখতে পেলে বাঁচি আমরা বাংলাদেশের মানুষ ?

চিল্কায় চলো তা হলে। রম্ভার কাছাকাছি ইঞ্জিন বিগড়ে একবার ছিলাম আধ-ঘণ্টা খানেক। তার পরে গাড়িতে আর উঠতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল না।

বড্ড জ্বরজারি ওদিকটায়। ডাক্তার-কবিরাজ নেই। আমি একবার ছিলাম কিছুদিন। জ্বর হলে একটা কুইনিনের বড়ি পাবার উপায় নেই, ওসব এমনি জায়গা।

কত আর ভেবে ভেবে বলা চলে! তখন রেলওয়ে টাইম-টেবল এনে সুষমা জায়গার নাম পড়ে। সারা ভারত প্রায় চুঁড়ে ফেলল, কিন্তু পছন্দসই জায়গা মেলে না। সর্বত্রই একটা না একটা খুঁত।

আপাতত স্থগিত রইল। কাল সকালে আবার দেখা যাবে। বেরুতেই হবে কোথাও—মানুষের ভিড় ও সংসারের ঝামেলা ছেড়ে যে জায়গায় ছুটিতে মুখোমুখি বসতে পারবে। একের মন অন্যকে জড়িয়ে থাকবে, নিবিড় করে পাবে যেখানে পরস্পরকে।

পছন্দ হল অবশেষে চাকদা—প্রাচীন চক্রদহ। বনেদি জায়গা। অথচ ঠাকুরদেবতার হাঙ্গামা নেই। অজানা একটু-আধটু থাকেনই যদি—কী করা যাবে, তেত্রিশ কোটি দেবতার ভূমি ভারতবর্ষে ওঁদের হাত একেবারে এড়ানো সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের পথ—বেগতিক বুঝলে পালিয়ে চলে আসা যাবে। আর যা চেয়েছিল—নিরিবিলি জায়গা। সব চেয়ে সুবিধা, গঙ্গার উপরে চমৎকার এক বাগানবাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। তিন দিকে পাঁচিল-ঘেরা—গঙ্গার দিকটা মুক্ত কেবল। প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে গেছে নদীগর্ভে। স্নিগ্ধ জোলো-হাওয়ায় সিঁড়ির উপরে বসে কলগুঞ্জনে দিব্যি দিন কাটবে। বাগানবাড়ির মালিক তারকের পুরানো বন্ধু। ভাড়ার প্রসঙ্গে বন্ধু বলে, আমিই তো ভাবছিলাম তুই কত চেয়ে বসিস আমার ঐ জংলি বাড়ি পাহারা দেবার দরুন। হাসির উচ্ছ্বাসে সকল প্রস্তাব সে উড়িয়ে দিল।

সুষমাময়ীর ভারি পছন্দ। তারককে বলে, বিক্রি করেন তো কিনে ফেল। বিনি-ভাড়ায় কদ্দিন থাকা চলে! এমন জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাব না আমি।

শুধুমাত্র বিশুয়া চাকর, আর একটা ঝি—বেশি লোকজন রেখে ভিড় বাড়াবে না। রাঁধাবাড়া সুষমাই করবে। দুটো চাল ফুটিয়ে খাওয়ানো—এতেও যদি বাদ সাধতে চাও, বিষম ঝগড়া হবে, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে একেবারে।

তারক, সুষমা আর কলস্বনা গঙ্গা। এক একটা দিন শান্ত মন্থরতায় কেটে যাচ্ছে পাল-ফোলানো ঐ নৌকোগুলোর মতো। কে বলবে, আঠারো আর বাইশের তরুণ দম্পতি—যেন আট আর বারো বছরের চপল দুই শিশু। হাঁটে না, ছুটে বেড়ায়। গানের কলি এক একটা গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কেউ নেই আড়ি পেতে দেখবার, এবং মুখরোচক আলোচনা চালাবার। এই সব ভেবেই তো দুজনে একা একা এসেছে।

রোদে ঘরবাড়ি ভরে গেছে, তারক তখনও বিছানায়। সুষমা এসে হাসিমুখে ডাকে: ওঠা হবে না আজ মশায়ের?

তারক ধড়মড়িয়ে ওঠে: এসেছে কেউ?

কে আসবে—কে-ই বা চেনে আমাদের এ জায়গায়?

তবে শুয়ে থাকি আরও খানিকক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে।

সুষমার খুশির অন্ত নেই। পুরুষমানুষ আয়েশি ও পরনির্ভরশীল তো হবেই—নইলে মেয়েদের কোন কাজ থাকে না। সুষমা হাঁটছে না আজকাল মাটির উপর দিয়ে। যেন উড়ে চলে। আঁচল যেন পাখনা। এই সকালেই

স্নান সেরে পাটভাঙা শাড়ি ও সিঁদুরের টিপ পরে প্রসাধনে ও পরিমার্জনায় বাড়িময় সে ঝিলিক দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এবার যে একটু উঠতে হবে লক্ষ্মীটি! তারপর আবার শুয়ো।

থালায় লুচি, বাটিতে গরম দুধ। মেঝের উপর আসন পেতে সুষমা থালা-বাটি সাজিয়ে দিল: ওঠো—

এত সব করে আনলে এর মধ্যে? নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি তোমার!

কী আর করেছি! নতুন জায়গা, কোন-কিছুর জোগাড় নেই—ভাবলাম, মাছের তরকারি করে দেব। বিশুয়াকে পাঠিয়েও ছিলাম ঘাটে। এত সকালে মাছ পাওয়া গেল না।

পনের-বিশ দিন চলল এই নিয়মে। তার পরে একদিন খাবার তৈরিতে ব্যস্ত—পিছন ফিরে দেখল, তারক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

উঠে পড়লে এর মধ্যে?

সরো, আমি লুচি বেলে দিই, তুমি ভাজো। দিয়েই দেখ না, পারি কিনা—

তোমার কাজ তুমি কর গে। রান্নাঘরে ভণ্ডুল করতে এসো না বলছি।

আমার কাজ কি বল তো? খাওয়া আর ঘুমানো?

সুষমা দয়াপরবশ হয়ে বলে, একটু-আধটু বেড়াতেও পার। কিন্তু খাবার হয়ে গেলেই চলে আসবে। তখন যেন ডাকাডাকি করতে না হয়।

এই দিনগুলির স্মৃতি সুষমাদেবী ভুলতে পারেন নি দীর্ঘ জীবন-কালের মধ্যে। মন্দিরের চাতালের উপরে আসীন পলিতকেশ স্বল্পবাক্ মহিলাটিকে কেউ কেউ দেখেছেন হয়তো। তা থেকে সেকালের সুষমাময়ীর কোন আন্দাজ পাবেন না। সমস্ত বদলেছে—ভাঙা মন্দির নতুন হয়ে গেছে, পুরানো সেই বাগানবাড়ির চেহারাও একেবারে ভিন্ন। সামনের দিকটায় কংক্রিটের ব্যালকনি সংযুক্ত হয়েছে। শুধুই বাড়ি - বাগানের চিহ্নমাত্র নেই। উদ্বাস্তুর ভিড়ে চাকদা এখন আধা-শহর জায়গা—বাগান করে ফেলে রাখার মতন জায়গা কোথায়?

এর পরে একদিন সুষমা জলখাবার সাজিয়ে তারককে আর খুঁজে পায় না। কোথায় গেলে—ওগো?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকাচ্ছে। গঙ্গার ধারটাও একবার ঘুরে এলো। দেখে, তারক কখন ইতিমধ্যে চলে এসে আসনে বসে পড়েছে।

গিয়েছিলে কোথা?

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কাল তোমায় নিয়ে যাব। দেখবে, কী চমৎকার ওদিকটা।

আমি যাবো কেমন করে? হাওয়ায় তো পেট ভরবে না।

মন ভরবে সুষি। তখন মনে হবে, এমনি সব সকাল নষ্ট হয়েছে রান্না-ঘরের কালিঝুলির মধ্যে বসে বসে।

সুষমা হেসে বলে, আমার জন্য ভাবনা করতে হবে না মশায়। মন আমার ভরেই আছে। ঠাকুরের বিদঘুটে রান্না মুখে তুলতে পারতে? ঘেন্না-ঘেন্না করে খেতেও যদি, অসুখ করত।

কিন্তু ব্যাপার সঙিন হয়ে উঠল। এক সকালে খাবার ঠাণ্ডা হল, তারকের দেখা নেই। উদ্বেগে সুষমা ঘর-বা'র করছে। কোথায় গেছে, কার কাছে খোঁজ করবে—কিছুই ভেবে পায় না। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে কুলবধূর শালীনতা বজায় রেখে গলা যতটা উঁচু করা যায়—তেমনি করে ডাকছে: গেলে কোথা?

অনেক বেলায় তারক ফিরল। সুষমার মুখ থমথম করছে—খেতে যাচ্ছে, থালাসুদ্ধ নিয়ে সে ঢেলে দিল আঁস্তাকুড়ে।

তারক হাসিমুখে বলে, বেঁচে গেলাম। খেতে মোটে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু নষ্ট না করে বিশুয়া ওদের দিলে না কেন সুষি?

রাগ করল না, বরঞ্চ বলবার এইরকম শান্ত ভঙ্গি—সুষমা ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। উপযাচক হয়ে কৈফিয়ত দেয়, ঠাণ্ডা লুচি খেতে বিশ্রী—সেই জন্যে ফেলে দিলাম। এক্ষুনি আবার ভেজে দিচ্ছি। বিশুয়ারা খেতে চায়, তাদের জন্যেও করব।

তারক বলে, আর ভাজাভাজি করতে যেও না। আমি খাব না!

খেতেই হবে, কিছুতে শুনব না। ময়দা মাখা আছে, কতক্ষণ লাগবে!

যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, তুমি রাগ করেছ। হ্যাঁ—নিশ্চয়। রাগ না করলে মুখ অমনধারা কেন?

কেমন আবার! রাগ করলে মানুষ বুঝি হাসে?

তুমি হাসো। সব তোমার আলাদা। কেন এমন করবে? আমি যেন কী করেছি—এমনি ভাব তোমার।

বলতে বলতে সুষমাময়ীর গলার স্বর কাঁপে, চোখে জল এসে যায়। তারক তার হাত ধরল। কোমল মুখখানা পরম স্নেহে বুকের উপর ধরে জল মুছে দিল। সুষমা সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, দেখ দিকি কাণ্ড! ছাড়ো—ছেড়ে দাও, বিশুয়া ঘুরছে ঐ।

হাসবে তুমি—ঠিক এই আমার মতন হাসবে। তার পরে ছেড়ে দেব।

ভাল রে ভাল! তুমি রাগ করবে, হাসতে হবে আমায়! আচ্ছা, আচ্ছা—হাসছি আমি মশায়। হল?

'খাবে না' বলার ফলে এতদূর। অতএব খেতেই হল। খেতে খেতে তারক বলে, রাগ-টাগ নয়। একটা কথা ভাবছি তখন থেকে। জীবনের কত অমূল্য সময় আমরা হেলাফেলায় নষ্ট করি। অথচ কত কী করার আছে।

সুষমার ভয় করে। ঘনিষ্ঠ ভাবে পাবে বলে সকলের কাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে এলো, কিন্তু এই পরম নির্জনতায় আবার এসব কী আজব ভাবনা ঢুকছে তার মনে—যার অর্থ সুষমাময়ী একবর্ণ বুঝতে পারে না?

পরদিন ভোরে স্নান করে বাইরে এসে দেখল, তারক তেল মেখে কাপড়-গামছা নিয়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে।

ও কি?

প্রাতঃস্নান তুমি কর, আমিও করব। শরীর তো বটেই, মনটাও বেশ পরিচ্ছন্ন হয়।

স্নান সেরে হন হন করে বেড়াতে বেরুল। ফিরতে প্রায় দুপুর। এসেই তারক বলে, মিথ্যে হয়রানি তোমার সুষি। খাবারের দরকার নেই। সকালে আমার খিদে পায় না। তুমি দুঃখ পাবে বলে খেয়ে ফেলি। কিন্তু শরীর খারাপ লাগে।

ইদানীং সুষমা বড় অসহায় বোধ করছে নিজেকে। অভিমানে গুমরে মরে। কিন্তু বলবে কাকে, কে তার মুখে তাকিয়ে দেখছে! নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ এত কি বিরক্তিকর হয়ে উঠল এর মধ্যে? ভুল করেছে সে। চিনি মিষ্টি বলে যত খুশি খাওয়া চলে না।

চলে যাই কলকাতায় ফিরে—

তারক আশ্চর্য হয়ে বলে, বাগানবাড়ির বায়নাপত্র হয়েছে। টাকাকড়িরও কতক লেনদেন হল। কিনতে বলেছিলে তুমিই তো।

কাজ নেই, চলো ফিরে যাই।

এখন আর উপায় নেই। বেশ তো জায়গা। বিগড়ে যাচ্ছ কেন বলো দিকি?

সুষমাময়ী তাড়াতাড়ি সরে যায়। ভয় হল, কেঁদেই ফেলে বুঝি বা! আগে হলে তাই হত—এখন তারকের সামনে কিছুতে চোখে জল আসতে দেবে না। নানা সন্দেহ মনে উঠছে একটা কিছু ঘটেছে—কেউ এসে পড়েছে নিশ্চয় সুষমা আর তারকের মধ্যে।

বিশুয়ার কাছে অবশেষে সঠিক খবর পাওয়া গেল। চাকরকে চর হতে বলা চলে না—বলল, ডেকে নিয়ে আয় দিকি বাবুকে। এই দিকে গেলেন—বেশি দূর গেছেন বলে মনে হয় না। নজর করে দেখতে দেখতে যাবি।

বিশুয়া খবর আনল, ঘুরে যায় নি তারক। বাগান ছাড়িয়ে জীর্ণ শিবমন্দির—জীর্ণ হলেও বিগ্রহ রয়েছেন। তাঁর সামনে তদ্গত হয়ে বসে আছে।

কোন-একটা মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে—এ খবর পেলে সুষমা এত বিচলিত হত না। শহর ছেড়ে এসে বড় ভুল করেছে। শহরের বিলাসবিভ্রমে ভয় নয়—ভয় বেশি ভগবানের। তারকের প্রপিতামহ সংসার ও স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। পিতামহ শ্মশানে-মশানে কালীসাধনা করে বেড়াতেন—শেষটা পাগলা-গারদে স্থান হয় তাঁর, সেইখানে তিনি মারা যান। তারকের এযাবত ঐ সব লক্ষণ দেখা যায় নি বটে, কিন্তু বড় বেশি সদাচারী সে। ভুলেও মিথ্যা বলে না। মুখ ফসকে কথা একটা যদি বেরিয়ে পড়ে, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে।

পাগলের মতো সুষমা মন্দিরে চলে গেল। পাষাণ-বিগ্রহের সামনে নিস্তব্ধ আর এক পাষাণ-মূর্তির মতন তারক চোখ বুঁজে বসে আছে।

বাড়ি যাবে না, ওগো?

কানেই গেল না তারকের। যেন কোন্ লোকে চলে গেছে, সুষমার ব্যাকুল ডাক তত দূরে পৌঁছায় না। গায়ে হাত দিতেও সাহস হয় না—এ মূর্তি নিতান্তই অপরিচিত, সুষমার সঙ্গে চেনা-জানা নেই যেন।

আর্তকণ্ঠে সুষমা চেঁচিয়ে ওঠে: বেলা হয়েছে—বাড়ি চলো।

তারক চোখ মেলে তাকাল। শূন্য দৃষ্টি, সুষমাকে বুঝি চিনতে পারছে না। উঠে দাঁড়াল ক্ষণ পরে। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে বাড়ি চলে এল। ঘরে এসে তারক কথা বলে। সম্মোহন অবস্থা কেটেছে। বলে, তোমায় নিয়ে তো বিষম মুশকিল সুষি। অদ্দুর অবধি চলে গিয়েছিলে—একটুতেই এমন উতলা হয়ে পড় তুমি!

সর্বনাশ ঘটল কয়েকটা দিন পরে। তারকের জন্য জলখাবার করতে হয় না। আর তারকই যখন খায় না, সুষমার খাওয়ার কি গরজ? চাড় নেই সকাল-সকাল উঠবার। তারকই আগে-ভাগে উঠে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে বসে।

বিশুয়া এসে বলল, মা. কাপড়-গামছা ঘাটে পড়ে আছে—বাবু কোথায়?

সুষমা ছুটল শিবমন্দিরে। কেউ নেই। বর্ষায় গঙ্গার দু-কূলপ্লাবী ঘোলা জল খরস্রোতে আবর্ত রচনা করে চলেছে।

সুষি আছে আর তারক নেই—ভাবতে পারে না সুষমাময়ী। চলে গেছে কোথাও—সন্ন্যাসী হয়ে গেছে হয়তো সেই প্রাচীন প্রপিতামহটির মতো।

সুষমা ফিরিয়ে আনবে—তারক ছাড়া সে থাকবে কেমন করে? কারও কোন ক্ষতি-অন্যায় করে নি, নিজের ছোট সংসারটি সাজানো-গোছানোর সাধ ছিল কেবল—তার সুখে কেন দেবতা বাদ সাধবেন?

দিনরাত্রি সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে: এসো গো, তুমি ফিরে এসো—

এসব হল বাংলা বিশ সনের ঘটনা। সে চোখের জল সুষমাদেবীর অনেক দিন শুকিয়ে গেছে—এখন কান্না নেই। সেই প্রথম দিন বলেছিলেন, চাকদা ছেড়ে কোথাও যাবেন না—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে বজায় আছে। চাকদায় জীবন কাটিয়ে দিলেন। শিবমন্দিরের সংস্কার করেছেন তিনি—মন্দিরের সামনে গঙ্গার উপর প্রশস্ত চাতাল তৈরি হয়েছে। আরও বিস্তর দানধ্যান আছে সুষমাদেবীর। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরের চাতালে ভাগবত-পাঠ হয়, পুণ্যার্থী নরনারী অনেকে আসেন। সকলের পিছনে একেবারে শেষপ্রান্তে সুষমাদেবী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হাতে দু-গাছা সরু সোনার চুড়ি, মাথায় শনের মতো সাদা চুলের রাশি। সবাই চেনে তাঁকে, সকলে সমীহ করে।

পাঠ সমাধা হবার পর কথকঠাকুর বিদায় নেন, যে যার ঘরে চলে যায়। সকলে নমস্কার করে যায় সুষমাদেবীকে, হাসিমুখে তিনি মাথা নোয়ান। মুখে কিছু বলেন না—কেমন আচ্ছন্ন ভাব। দেহটাই পড়ে আছে, আর কোন জগতে ভেসে বেড়াচ্ছেন যেন তিনি—বুঝি কথকের বর্ণনায় সেই অতীত পৌরাণিক কালে ঋষি ও দেবগণের সঙ্গে। অভ্যাসবশেই হাসেন তিনি এবং ঘাড় নোয়ান।

গঙ্গার কূল একেবারে নির্জন হয়ে যায়। চাতালের ভিত্তিমূলে জল ছলছল করে, তাছাড়া কোনদিকে শব্দ মাত্র নেই। গভীর রাত্রি অবধি একলা তিনি বসে থাকেন গঙ্গার দিকে চেয়ে। তারপর এক সময়ে ধীরপায়ে ঘরে আসেন। চোখে ভাল দেখেন না, কিন্তু এ পথটুকু মুখস্থ হয়ে গেছে।

চারু বলে এক অল্পবয়সী বিধবা তাঁর সঙ্গে থাকে। ঝি তাকে বলতে দেন না—বলেন মেয়ে। শুয়ে থাকে সে সুষমাদেবীর রাত্রির খাবার পরিপাটি ভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে। সাড়া পেয়ে উঠে এসে একপাশে দাঁড়ায়। সুষমা দেখেও দেখেন না, খাবারের কাছে বসেনও না অধিকাংশ দিন, শয্যায় শুয়ে পড়ে চোখ বোঁজেন।

গেল ভাদ্র মাসে তিনি মারা গেছেন। শরীর বেশ ভাল—হঠাৎ সর্দি হয়ে জ্বর হল। অবিচ্ছেদি জ্বর—কোন সময় ছাড়ে না। বড় দুর্যোগ সেদিনটা। কী বৃষ্টি, কী রকম মেঘের ডাক! যত বেলা শেষ হয়ে যায়, বাতাসের জোর

তত বাড়ে। সারাদিন গঙ্গা কালো মুখ করে আছে, তিলেকের তরে হাস্যজ্যোতি ফুটল না। আকাশে মেঘ, জলের উপরেও মেঘছায়া। নৌকো-ডিঙি নেই নদীতে—মোটা কাছি দিয়ে নোঙর করে রেখেছে। খেয়া-পারাপার বন্ধ। পথে-ঘাটে লোক নেই—পার হতে যাচ্ছেই বা কে!

রাতে বাতাস উন্মত্ত হয়ে উঠল। নদী মাথা ভাঙছে পাড়ের উপর। উঠানের পাশে আম-কাঁঠালের গাছ ক'টিও পাগল হয়ে উঠেছে, ভূমিলগ্ন হয়ে থাকতে চায় না—ডালপালা ভেঙে মুচড়ে প্রাণপণ প্রয়াসে উড়ে যেতে চাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। ঝড় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দালানের গায়ে, দরজা-জানলা ঠকঠক করে নড়ছে অবিরত, গোটা দালানটাই যেন থরথর কাঁপছে। ভেঙে না পড়ে! জ্বর খুব বেড়েছে, চমকে চমকে ওঠেন সুষমাদেবী। এরই মধ্যে একটু উঠে বসে সন্তর্পণে জানলার কপাট খুলে বাইরের অবস্থা আন্দাজ করার চেষ্টা করেন।

অন্ধকারেও গঙ্গা চিকচিক করছে—বাতাস হাহাকার করে ফিরছে ফাঁকা নদীর উপরে। কত কোটি কোটি মানুষ মরে গেছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে—তাদের বিদেহী আত্মা দুর্যোগ-নিশায় মুক্তি পেয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে ভুবনের একটুকু গৃহ-বন্ধনের আশায়।

সুষমার চোখে এতদিন পরে জল এলো। আকুল হয়ে কাঁদেন তিনি। চারিদিকে এত সুখ্যাতি - মা-মণি বলে দেশ-দেশান্তরে নাম—কিন্তু আজ শেষ-বয়সে একাকী রোগশয্যার উপর অসহায় মনে হল নিজেকে। এত যশ-সমারোহের কিছুমাত্র মূল্য নেই—জরজর্জর দেহ চাইছে প্রীতিপর আর একটি দেহের উষ্ণ সান্নিধ্য। কতকাল আগে হারিয়ে-যাওয়া একটি মানুষ—তারক যার নাম। চিরজীবন আত্মবঞ্চনা করে সুষমাদেবীর ধৈর্যের বাঁধ ভেসে গেল অকস্মাৎ।

কোথায় চলে গেলে, ফিরে এসো। আমারও তো চলে যাবার সময়—চিরদিন তোমায় চেয়েছি, ভাল ছাড়া মন্দ কখনও কারও করি নি। কেন আসবে না?

চারু উত্তরের-কুঠুরিতে শোয়। উঠে দেখতে এল। ভেজানো দরজা ফাঁক করে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, মা-মণি!

সুষমার সাড়া নেই। চারু ভিতরে এলো। প্রদীপ মিটমিট করছে—সলতে বাড়িয়ে তেল ঢেলে দিল একটুখানি। বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন সুষমা। ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙাতে চায় না—আহা, ঘুমোন উনি। আজকে বেশ ভাল আছেন, মনে হচ্ছে। এমন শান্ত হয়ে ঘুমোন নি ক-দিনের মধ্যে।

শেষ রাতে সুষমার ঘুম ভাঙল। ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। খুব ভাল লাগছে—সত্যিই ভাল আছেন তিনি। ঠক-ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক!

পাশ ফিরে তাকালেন সুষমাদেবী। শরীর যেন অবশ। কিন্তু আরাম আছে সর্বাঙ্গ জুড়ে। দালানের দরজায় কে টোকা দিচ্ছে: ঠক-ঠক ঠক!

আলসেমি লাগে। তবু উঠতে হবে। উঠে খুলে দিতে হবে দরজা। মন্থর পায়ে চললেন দরজায়। প্রদীপের আবছা আলোয় দেখলেন, খিল দেওয়া নেই—ঠিকই তো, চারু খুলে রেখে দিয়েছে ওষুধ খাওয়াতে আসবে বলে।

কে, চারু? আয় না রে, ভিতরে চলে আয়—

দরজা খুলে ফেললেন। দালান পার হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা লোক।

শোন, কে তুমি?

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সারাটা দিন এবং অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত যে ঝড়বৃষ্টি, সবই দুঃস্বপ্ন যেন একটা। চারিদিক ঝিকমিক করছে।

ফিরে যাচ্ছ কেন? শোন—

সেই স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মধ্যে এসে দাঁড়াল—চারু নয়—রমণীয়কান্তি এক যুবা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সুষমাদেবী। চোখে ভাল দেখেন না—তবু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কবে যেন দেখেছিলেন একে! ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে, তেমনিভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন।

যুবা মৃদু হেসে বলে, চিনতে পারছ না?

সুষমার রাগ হল বিষম। পাড়ার কোন্ বখাটে এসে ঢুকল? কোন্ বেপরোয়া? একবার মনে হল, নষ্টচন্দ্র আজ—কেউ বুঝি মাচার কুমড়ো পাড়তে এসেছে, দরজা ঠকঠকিয়ে গৃহস্থের সাড়া নিচ্ছিল। সুষমাদেবীকে তুমি-তুমি করে বলছে—কী আশ্চর্য! কোনকালে 'তুমি'-ডাক শুনেছেন, একেবারে তা মনে পড়ে না।

যুবা এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরল। গভীর ভালবাসার সুরে বলে, অসুখ করেছে?

ছি ছি ছি! নির্জন দালানে একটা বুড়িকে নিয়ে কী কাণ্ড রাত্রিবেলা! হাত ছাড়িয়ে নিলেন সুষমাদেবী। সর্বদেহ অশুচি লাগছে, ঘৃণায় রি-রি করছে মনের ভিতর।

চারু!

চারুকে ডাকবেন। আর চেঁচিয়ে ডেকে তুলবেন নতুন দারোয়ান রামভরসাকে। লাঠিপেটা করে ছোঁড়াটাকে দিয়ে আসুক অঞ্চল-ছাড়া করে।

কিন্তু গলায় আওয়াজ বেরোয় না। এই অসহায় অবস্থা ছোঁড়া যেন বুঝতে পারল। মিটিমিটি হাসছে—গা-জ্বালানো হাসি।

চিনতে পারলে না সুষি? ভাল করে দেখ একটু চেয়ে।

চেয়ে আর কী দেখবেন—দৃষ্টি আছে কি সুষমাদেবীর? দুটো চোখে ছানি পড়েছে, কপালের চামড়া ঝুলে এসেছে চোখের উপর। চোখে দেখে কিছু চিনবার জো নেই—বিশেষ রাত্রিবেলা। কিন্তু ঐ যে সুষি বলে ডাকল—

পঞ্চাশ বছরের ওপার থেকে ডাক আসে: সুষি!

তুমি এলে? এত দিনে সময় হল তোমার?

একটুতেই এমন উতলা হও, এক পলক না দেখলে অস্থির হয়ে পড়। বিষম মুশকিল তোমায় নিয়ে। জান তো, বেড়ানো বাতিক আমার—একটুখানি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

এক পলক—তা বই কি!

অষ্টাদশী মেয়ের অভিমান ফিরে আসে সুষমাদেবীর কণ্ঠে: কত যুগ কত বছর হয়ে গেল, হিসেব কর দিকি! কী ছিলাম আর কী হয়ে গেছি, দেখ।

তারক বেদনাভরা স্বরে বলে, বড্ড ধুলোমাটির জায়গা পৃথিবী। চেহারা তোমার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে সুষি।

ব্যাপারটা সহসা পরিষ্কার হয়ে গেল সুষমার কাছে। কথকঠাকুরের কাছে শুনেছে, আমাদের শতাব্দীতে ওদের এক-একটা দিন। মিথ্যে বলছে না—পলক মাত্র কাটিয়েই সে এসেছে। রূপ তাই অটুট রয়েছে। যৌবনও।

দুরন্ত যৌবন-আবেগে তারক কোলের মধ্যে টেনে নেয় সুষমাকে। বলিরেখাঙ্কিত মুখ পরম স্নেহে চেপে ধরে বুকের উপর। সুষমাদেবী ব্যাকুল হয়ে বলেন, ছাড়ো—ছেড়ে দাও বলছি। চারু আসবে এক্ষুনি ওষুধ খাওয়াতে। তুমি চলে যাও।

এত যে ডাকাডাকি করছিলে?

যাও, যাও। একফোঁটা ছোঁড়া তুমি—কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তাকে। হুড়মুড় একটা আওয়াজ উঠল।

চারু জেগে ছিল। শব্দ শুনে ছুটে এলো। চেঁচিয়ে উঠল সে। রামভরসা এলো লণ্ঠন নিয়ে।

সুষমাদেবী দালানের মেঝেয় পড়ে আছেন। দেহে প্রাণ নেই।

রাতের আশ্রয়

রাত দুপুরে মোটরবাস রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল। গাঁ-বসতি নেই কোন দিকে। আউশ-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাঁচারাস্তা চলে গেছে। দুর্যোগও বিষম। হু-হু করে হাওয়া বইছে, রাস্তা থেকে উড়িয়ে ধানবনে ফেলে না দেয়। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি। অন্ধকারে চারিদিক লেপে পুঁছে গেছে। একমাত্র সুবিধা, ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এই আলোয় পথ দেখে এগুচ্ছি।

অথচ কোন গোলমাল হবার কথা নয়। সন্ধ্যা নাগাত বাস নামিয়ে দেবে, পাল্কি থাকবে। বাস থেকে নেমেই পালকি —এই সমস্ত লিখেছিল দীপেশ। বি ডি ও অর্থাৎ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসে কাজ করে সে। মাইল তিনেক পথ। কাঁচারাস্তা বটে, কিন্তু বাঁকচুর নেই, নাকের সোজা চলে গেছে। অন্ধ মানুষও অবাধে চলে যেতে পারে—আর আমার জন্যে তো পাল্কি।—দীপেশ সবিস্তারে জানিয়েছিল।

কিন্তু বাসটা বদমায়েশি করল। গোড়ায় বেশ ভাল। এসিস্টাণ্ট বার পাঁচ-সাত হ্যাণ্ডেল মারতেই গর্জন করে উঠল। ড্রাইভার গদি থেকে নেমে এসে ইঞ্জিনের উপর গড হয়ে প্রণাম করল। ভাবখানা এই, ত্যাঁদড়ামি কোরো না আজকের এই দুর্যোগের দিনে, এক দৌড়ে গিয়ে কেশবপুরে থানার সামনে নিজের জায়গায় দাঁড়াও, রাতের মতন নিশ্চিন্ত। বাসও যেন কানে নিল কথাটা। ভকভক আওয়াজ করে পথের গরুছাগল মানুষজন ভয় দেখিয়ে দিব্যি স্ফূর্তি ভরে দৌড়চ্ছে। কুয়োদার হাট ছাড়িয়ে এসে মাথায় যে কী শয়তানি ভর করল—একেবারে নিশ্চুপ। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কত কাণ্ড করছে ড্রাইভার—এটা খুলছে, ওটা খুলছে, ইঞ্জিনের তলায় ঢুকে যাচ্ছে এক-একবার। কিছুতে কিছু নয়। শেষটা নিজের সিটে উঠে বসে যত প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিল। বলে, ঠেলুন মশায়রা—

পঁচিশজনের পঞ্চাশখানা হাত ঠেলছে তো গাড়ি চলতে লাগল। ঠেলা বন্ধ হল তো গাড়িও অচল। বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে গাড়ি যেন নেশা করে বুঁদ হয়ে আছে, আমরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

প্যাসেঞ্জার চেঁচামেচি করে: এ বেশ মজা হল। ঠেলতে ঠেলতে কেশবপুর পৌছে দিতে হবে নাকি? ভাড়া নিয়েছ তবে কেন?

ড্রাইভার বলে, বেশ, সীটে উঠে পড়ুন তবে মশায়রা। তাতে যদি গাড়ি কেশবপুর পৌছে দেয়, আমার কোন্ ক্ষতি?

না, তোমার ক্ষতি কোন দিকে নয়। গাড়ি না চলে তো আমরা ঠেলব, চললে তখন তো ইঞ্জিনই টানছে। তুমি থাক আরাম করে গদির উপরে।

আজেবাজে কথায় জবাব না দিয়ে নির্বিকার ড্রাইভার বিড়ি ধরাল একটা।

আমাদের কষ্টে ও কাকুতিমিনতিতে শেষটা বুঝি ইঞ্জিনের দয়া হল খানিকটা। আওয়াজ দিয়ে উঠল হঠাৎ। চলতেও শুরু করল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে ঝিমিয়ে আসে আবার, দাঁড়িয়ে পড়ে। পুনশ্চ ধস্তাধস্তি। এমনি ভাবে যেখানে ঠিক সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছবার কথা, সেখানে রাত্রি বারটায় এনে নামিয়ে দিল।

দিয়েই ছুট। ড্রাইভার বলে, দেরি করতে গেলে আবার হয়তো বিগড়ে যাবে, তা হলে চিত্তির। নামবার সময়টুকুও দেয় না এমনি অবস্থা।

ছুটে বেরুল মোটরবাস। নীরন্ধ্র অন্ধকার। ছড়ছড় করে এই সময় বৃষ্টি এল এক পশলা। কাঁচারাস্তার জলকাদা ভেঙে চলেছি। বিপদের উপর বিপদ—মাঠের উল্টোপাল্টা হাওয়া ছাতায় বেধে পটপট করে কতকগুলো শিক ভেঙে গেল, ছাতার কাপড় উড়ছে ঘুড়ির মতন পতপত করে। তখন আর চলা নয়—দৌড়ানো দস্তুরমতো। তেপান্তর মাঠ থেকে ছুটে পালিয়ে গাঁ বসতি কোথাও আশ্রয় পেতে চাই।

ছুটেছি, ছুটেছি। নদীর উপর এলাম। নদীর কথাও দীপেশ লিখেছিল বটে। নদীর উপর পাকা-পুলের কথা। পথ ভুল করি নি তবে। কিন্তু আর তো পেরে উঠি নে। শীত ধরে গিয়ে সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে, পা চলতে চাইছে না। অসাড় হয়ে পথের উপর পড়ে না যাই, এই এখন ভয়।

ঝিলিক দিল একবার। দেখলাম, পুলটা ছাড়িয়ে অদূরে অশ্বত্থতলায় পাকাঘর। চুনকাম-করা সাদা দেয়াল বিদ্যুতের আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। খেতে চাই নে। জায়গার অকুলান থাকে তো এমন কি শোওয়ার কথাও বলব না। রাতটুকু মাথা গুঁজে থাকবার মতো আশ্রয়।

কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। এমন নিশিরাত্রে জেগেই ছিল ভিতরের মানুষ। মাথায় আধ-ঘোমটা ফুটফুটে তরুণী বউ দরজা খুলে দিল। পিছনে এক বুড়ো মানুষ। বিদ্যুৎ চমকাল ঠিক এই সময়। দেখলাম কাঁদছিল বউটা। এখনো সামলাতে পারেনি। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। দু-গালে জলের ধারা গড়াচ্ছে। কোন্ দুঃখে জানি নে, ঘরে খিল এঁটে বসে কাঁদছিল। বুড়োর সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক বউটার—

বুড়ো পরিচয় দিয়ে দিলেন: আমার বউমা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ভিতরে এস। বৃষ্টিতে নেয়ে গেছ একেবারে। শুকনো কাপড়চোপড় আছে তো সঙ্গে—

হাতের কিটব্যাগ দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি সমস্ত আছে। বুড়ো বললেন, ও বউমা, বসবার একটা-কিছু পেতে দাও খাটের উপর। বাছার বড় কষ্ট হয়েছে।

কী মোলায়েম কথা বুড়োমানুষটির! কথা শুনে সব কষ্ট জুড়িয়ে যায়। চেহারাটিও মুনিঋষির মতন। বলবার আগেই বউটি বেরিয়ে চলে গেছে। ব্যাগ খুলে শুকনো কাপড় বের করে পরলাম। মাদুর বালিশ আর চাদর হাতে করে বউ ফিরে এল, পরিপাটি করে পেতে দিল যেমন শ্বশুর তেমনি বউ কী ভাল যে এরা! কিন্তু বড় দরিদ্র। নড়বড়ে ছোট একখানা খাট একেবারে খালি পড়েছিল। মাদুর বালিস চাদরে বিছানা করছে—তা-ও অতি জীর্ণ। চুপিচুপি বলছি, দোষ নেবেন না—সাধারণ অবস্থায় অমন চাদরে পা মুছি নে আমরা।

বিছানা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে আমি বললাম, রাত দুপুরে রাঁধা-বাড়াব হাঙ্গামায় যাবেন না আবার। মণিরামপুরে গাড়ি অচল হয়েছিল, সেই সময়টা পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি।

বউটি বড় বড় চোখ মেলে আমাব দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বুড়ো দেখছি মজলিসি মানুষ। এত রাত্রি, তবু খাটের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।

একেবারে কিছু খাবে না বাবা? না, লজ্জা করে বলছ? ছেলের মতো তুমি, খুলেই বলি। দুর্যোগে অতিথ হয়ে এলে। সত্যি ভাবনা হয়েছিল, কি খেতে দিই এখন। বউমার মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তবু সে মেয়ে বড্ড ভালো। তুমি নিজে থেকে মানা না করলে এতক্ষণে রান্নাবান্না বসিয়ে দিত।

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করি: কাঁদছিলেন যেন উনি? কি হয়েছে?

ফোঁস করে বুড়ো এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন: বড় দুঃখের বৃত্তান্ত। সংসারে আগুন ধরে গেল। রোজগেরে ছেলে বাসা থেকে দূর করে দিল আমাদের। আগে বউমাকে দিল, তার পর আমাকে। একটা বেলার এদিক-ওদিক। বাপ-বেটি সেই থেকে এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি। ছেলে আবার বিয়ে করছে শুনতে পেলাম। বউমা ছেলেমানুষ তো—খবর শোনা অবধি দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে তার।

স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বুড়ো আরও কত কি বলে যাচ্ছেন, এক বর্ণ আমার

কানে যাচ্ছে না। নিরপরাধ এই সুন্দরী মেয়েটাকে ত্যাগ করেছে। এবং বাপ বোধহয় পুত্রবধূর হয়ে দু-কথা বলতে গিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকেও তাড়িয়েছে। সেই পাষণ্ড টোপর মাথায় দিয়ে আবার নতুনবউ আনতে চলল। হাতের মাথায় পেলে লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম, তাতে আমার জেল ফাঁসি যা হবার হত।

এই সমস্ত ভাবছি। এমন সময় বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দরজা দিয়ে শুয়ে পড় বাবা। আমরা এই পাশেই রইলাম।

জোর বৃষ্টি-বাতাস তখনও বাইরে। বড্ড ধকল গিয়েছে, শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল দরজা খুলে দেখি, বিস্তর বেলা হয়েছে। চারিদিকে রোদ, রাত্রিবেলার অত দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই।

চলে যাওয়ার আগে বুড়োমানুষটিকে দু-এক কথা বলে যাওয়া উচিত। বড় ভাললোক এঁরা—

আরে সর্বনাশ, এ কোন্ জায়গা, ঘরের ঠিক পিছনে শ্মশানঘাটা মজা-নদীর কূলে। আধ-পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া মাদুর-বালিশ ইতস্তত ছড়ানো—গ্রাম্য শ্মশানের যে চেহারা হামেশাই দেখা যায়। যে কুঠুরিতে রাত্রিবাস করেছি, সেটা শ্মশানবন্ধুদের বসা-ওঠার জায়গা। দেয়ালে সাল তারিখ সব খোদাই করা আছে, রাত্রিবেলা নজরে আসে নি—নবীনচন্দ্র মালাকার নামে কোন এক ব্যবসায়ী পিতামাতার আত্মার কল্যাণে এই ঘর বছর খানেক আগে বানিয়ে দিয়েছেন। আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্বশুর আর পুত্রবধূ গেলেন কোথায় তবে?

ঘণ্টা কয়েক পরে বি. ডি. অফিসে হাজির হলাম। অদূরে দীপেশের কোয়ার্টার। ইস্কুলে পড়বার সময় দীপেশ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল আমার। অনেক বছর পরে হঠাৎ এই সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে দেখা—বিয়ের বাজার করে ফিরছে। আমায় নিমন্ত্রণ করে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বারম্বার যাবার জন্য বলল। কথা না দিয়ে পারলাম না। সেই কথা রাখতে গিয়ে এত দুর্ভোগ।

আমায় দেখে দীপেশ কলরব করে উঠল। বিয়ের তারিখ কাল। আত্মীয়স্বজন কিছু কিছু এসে পড়েছেন, ভিড় জমেছে মন্দ নয়। বলে, এক-গলা কথা জমে আছে, চল্। চেঁচিয়ে চা-খাবার দিতে বলে টানতে টানতে তার নিজের ঘরে নিয়ে চলল।

ঘরে ঢুকে চমকে উঠি। সামনের দেয়ালে হাসিমুখ তরুণীর ছবি। ঠিক তার উল্টো দিকের দেয়ালে বুড়োমানুষটি। কাল রাত্রে শ্বশুর আর পুত্রবধূ সেই যে দুজনকে দেখেছিলাম।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে দীপেশকে জিজ্ঞাসা করি: ছবি কাদের?

আমার স্ত্রী নীরা। আর ইনি হলেন বাবা—

দীপেশের চোখ ছলছল করে ওঠে: এই কোয়ার্টারে আসার পরেই সর্বনাশ হল। কলেরা হয়ে দুজনে মারা গেলেন। একই দিনে সকালে আর বিকালে। আটমাস হয়ে গেল দেখতে দেখতে। বউমা বলতে বাবা অজ্ঞান হতেন। বউ যেতে যেতে তিনিও তাই যেন দেরি করলেন না।

ভূত দেখা

ভূত দেখা যায়?

আলবৎ। আমি তো হরবখত দেখে থাকি।

দেখাও না একদিন—

ওস্তাদ নটবর সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলে, দিনে নয়—রাত্তিরবেলা। কাছাকাছি মজুমদারবাড়ি আছে, ঐখানে একটা রাত থেকে এসো। একা একা কিন্তু, সঙ্গে লোক থাকলে হবে না।

একলা পেয়ে ঘাড় মটকাবে না তো?

নটবর বুকে থাবা মেরে বলে, ঘাড় মটকাবেন তো আমি আছি কেন? লোকে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে গেলেই ওনারা বরঞ্চ রেগে যান—রেগেমেগে অঘটন ঘটিয়ে বসেন।

বোঝাচ্ছে আমায়: দেখ, মানুষের মধ্যে ভালমন্দ থাকে—ওনাদের মধ্যেও আছেন সব তেমনি। ভালই বেশি। মন্দ যে নেই, তা নয়—তারা নড়াচড়া না করে, সে ব্যবস্থা করে দেবো। তা ছাড়া মজুমদাররা ছিলেন জমিদার—চালচলনে বনেদিয়ানা, ছ্যাঁচড়া কাজকারবারে ওনারা বড় থাকেন না।

মজুমদারদের কাউকে আমি দেখি নি, প্রাচীনদের মুখে গল্প শোনা আছে। মহামারীতে কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়িসুদ্ধ খতম। মানুষজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে—মড়াগুলোর গতি হল না, পচে গলে শিয়াল-শকুনের পেটে গেল। জঙ্গলাকীর্ণ জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে মজুমদারবাড়ি—ভূতুড়ে বাড়ি বলে নাম।

ঐ বাড়ির লাগোয়া বোসবাড়ি—একটা আমবাগিচার ব্যবধান। তার

ওদিকে জেলেপাড়া। সন্ধ্যার পর কেউ তারা এদিককার পথ মাড়ায় না। নিতান্ত গরজ পড়লে দীঘির পাড় হয়ে দু' মাইল পথ ঘুরে চলাচল করে। এ হেন স্থানে রাত দুপুরে আমি চলেছি ভূত দেখার বাঞ্ছা নিয়ে। নিঃসঙ্গ—পকেটে শুধুমাত্র টর্চ একটা।

দুপুরবেলা একবার নটবরের সঙ্গে এসে অন্ধিসন্ধি দেখে গেছি। উপরের ঘর নিচের ঘর দরদালান সিঁড়ি বারান্দা সমস্ত আমার নখদর্পণে। রাত ঝিমঝিম করছে, শব্দসাড়া নেই কোন দিকে, বাতাসও বুঝি বন্ধ। টং করে একবার ঘড়ির আওয়াজ—বোসবাড়ির আওয়াজ এতদূর অবধি এসেছে। একটা বাজল বোধ হয়। সাড়ে-বারোটা দেড়টা বা আড়াইটে হবারও অবশ্য বাধা নেই।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে বেড়াচ্ছি। উপরতলাটা ঘোরাঘুরি করলাম। জানলায় বাইরে তাকিয়েছি। অন্ধকার চতুর্দিকে, অমাবস্যার কাছাকাছি কোন তিথি হবে। নামছি এবারে। থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করলাম—ক্ষীণ শব্দ যেন পিছনদিকে খানিকটা দূরে। থেমে গেল শব্দটুকু। দাঁড়িয়ে আছি—কোন-কিছু নেই—হাঁটছি তো আবার শব্দ। পায়ের শব্দ অতি স্পষ্ট—নিশ্চয় কেউ পিছু নিয়েছে। সিঁড়ির মুখে এসে গেছি। সিঁড়ি বেয়ে না নেমে স্যাট করে ঘুরে গিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। অনুসরণকারী সামনাসামনি হলে টর্চ ফেলে হকচকিয়ে দেবো।

এসেছে, এসেছে। নিশ্বাস পড়ল—ফোঁ-ও-স করে টানা এক নিশ্বাস। টর্চ ফেলেছি সঙ্গে সঙ্গে। কিছুই না। জোরালো টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি—কাকস্য পরিবেদনা।

অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নামছি- কাঠের সিঁড়িতে এতটুকু শব্দ না হয়। পিছনের সে-জনের কিন্তু দৃকপাত নেই, খুট-খুট করে সহজ ভাবে নামল—অনুভবে বুঝতে পারছি। টচ ফেলে কিছুই দেখা যাবে না, জানি। নিচে এসে সিঁড়ির ধারে গুটিশুটি হয়ে বসলাম। ঘোর অন্ধকার—এমনি অন্ধকারকেই বোধহয় সূচীভেদ্য বলে—চাদরের মতন সর্বাঙ্গে লেপটে আছে, সূঁচ দিয়ে সম্ভবত এফোঁড়-ওফোঁড় করা চলে।

শুনছি উৎকর্ণ হয়ে—কানে শোনা ছাড়া আর কি করব। এর পর একলা একটি নয়, অনেকজনের চলাফেরা। ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে সব। আমার ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে, এমন কি গা-মাথার উপর দিয়ে। দরজাটা বন্ধ ছিল—অল্প অল্প খুলে যাচ্ছে, নীরন্ধ্র আঁধারের মধ্যে সেই জায়গাটায় আলো-আলো ভাব।

যাবো ঐখানটা। উঠতে পারিনে, দেহ অসাড়। পা দুটো যেন দড়াদড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলেছে। তবু সর্বশক্তি আহরণ করে ছুটে গিয়ে হড়াস করে দরজা খুললাম। টর্চ টিপে দিনমান করে ফেলেছি। ঘরের কোণের টিকটিকিটি অবধি নজরে এসে গেল, কিন্তু ঐ টিকটিকি ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ খলখল করে হাসির ধ্বনি পিছন দিকে। মুখ ফেরালাম, কিছুই না। আমায় যেন বোকা বানাচ্ছে—হাসির মধ্যে সেই রকম স্বর। খিক-খিক করে আর এক ধরনের হাসি সামনের দিকে। পিছনের দৃষ্টি ঘুরিয়ে সামনে আনি, আলো ফেলি দরজা দিয়ে উঠান অবধি। শূন্য।

এই কাণ্ড চলল। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে মাথার উপরে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চকিত হাসি। নিরালম্ব বায়ুভূত মুহুর্মুহু ঐ হাসি আমায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনে, টর্চের আলোর উপর বিশ্বাস নেই—যেদিকে হাসি সেইখানটা ছুটে চলে যাই। চোখ দিয়ে নাই কিছু দেখি—গিয়ে পড়লে স্পর্শ কোন-কিছুর হয়তো পেয়ে যাব।

কিছুই না—ছুটোছুটিই সার! অথচ হাসি কানে ঢোকা মাত্রই মাথার মধ্যে গোলমাল লেগে যাচ্ছে, তখন সাধ্য কি এক জায়গার চুপচাপ থাকব। ছুটে গিয়ে পড়ছি যেখানটায় হাসি। মুহূর্তে হাসি চলে গেছে ভিন্ন একখানে। ছুটি আবার সেখানে। এদিক থেকে সেদিক—হাতে জলন্ত টর্চ, সমস্ত ঘর-দালান জুড়ে ছুটোছুটি। বিষম ক্লান্ত, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, পা দুটো টলছে, মুখ থুবড়ে পড়ে যাই বুঝি কঠিন মেঝের উপর—

আমি পড়বার আগেই হাতের টর্চটা পড়ে গেল। এবং নিভেও গেল কি গতিকে। অন্ধকার। অন্ধকার এতদূর ঘন হয়, আমার কল্পনায় ছিল না। মেজের উপর ঠুক করে পড়ল, শব্দ পেলাম। দু-হাত মেলে চারিদিক তন্নতন্ন করে হাতড়াচ্ছি, টর্চ মেলে না। ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না—গেল কোথায় তবে? হতাশ হয়ে শেষটা দাঁড়িয়ে পড়লাম—আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হাতের উপর টর্চ এনে ধরল, মুঠোয় নেবার অপেক্ষা। কে বুঝি সরিয়ে রেখে খেলাচ্ছিল আমায় এতক্ষণ ধরে—হার মেনে যেই খোঁজাখুঁজি ছেড়েছি, অমনি আমার হাতের উপরে এনে দিল। দিয়েই অমনি বাতাস হয়ে গেছে। টর্চ সেই মুহূর্তেই জেলেছি—কেউ নেই কিছু নেই। ঠিক সেই আগেকার মতো।

পাখপাখালি ডাকছে বাইরে, ভোরের আলো ফুটেছে। ভূতুড়ে বাড়িতে থাকার আর মানে হয় না। দরজা খুলে বাইরের রোয়াকে বেরিয়ে এলাম। বোসবাড়ি নিষুপ্ত—এক বৃদ্ধ কেবল উঠেছেন, বাগিচা পার হয়ে লাঠি ঠুকঠুক

করে আসছেন। ধবধবে-ফর্সা সৌম্য চেহারা, সুপুষ্ট পাকা গোঁফ। একটা চোখের মণি উল্টানো—কানামানুষ উনি। মোলায়েম কণ্ঠে শুধান: দেখলে কিছু বাবা, না মিছামিছি সারারাত কষ্টভোগ? চোখ তো জবাফুলের মতো রাঙা—রাতের মধ্যে পলক পড়েনি নিশ্চয়?

গাঁ-গ্রাম জায়গা—ভৌতিক অভিযানের বৃত্তান্ত জানতে কারো বাকি নেই। বৃদ্ধ বললেন, বোস বাবা এইখানটা। চা বানিয়ে পাঠাচ্ছি, খেয়ে যেও।

বলেই বাগিচার পথে ফিরলেন। মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন একটু—হাসিটা ব্যঙ্গের, মনে হল সেইরকম। চায়ের জন্য বসে থাকতে বয়ে গেছে আমার। সোজা একেবারে নটবরের বাড়ি।

নটবর ওস্তাদ আমারই অপেক্ষায় ছিল: বলো কি খবর—

পায়ের শব্দ পেয়েছি, হাসিও শুনেছি খুব। আলগোছে টচট, উঁচুতে তুলে দিল।

নটবর সগর্বে বলে, আর বেশি কি করবেন? দেহবন্ধন করে দিয়েছি, ছোঁবার জো ছিল না যে ওনাদের—

আমি অনুযোগ করি: চোখে দেখতে পাব, বলেছিলে না তুমি?

দেখ নি?

না।

নটবর সবিস্ময়ে বলে, একেবারে কিছুই দেখ নি—নরাকারে আসে নি কেউ।

নর-বানর ঘোড়া-ভেড়া কিছুই আসে নি।

নটবর বলে, হতে পারে না। ভেবে দেখ ভাল করে।

সকালবেলা বোসবাড়ির এক বুড়োমানুষ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চা পাঠাতে চাইলেন।

নটবর বলে, একটা চোখ কানা তো সে বুড়োর? দেখনি তবে বলছ কেন? উনিই তো রাধামাধব মজুমদার—মজুমদারবাড়ির মেজবাবু, বসন্ত রোগে বাঁ-চোখটা গিয়েছিল।

অবাক হয়ে বলি, উনি ভূত?

নটবর বলে, ভূত হলেও বনেদিয়ানা যাবে কোথা? সভ্যভব্য ভূত—কথাবার্তা চালচলতিতে বুঝলে না?

নতুন বাসা

পুরানো বন্ধু প্রভাত হালদার। প্রভাত-বস্ত্রালয় বরানগরে মস্তবড় দোকান—তার ষোলআনা মালিক। একসময়ে ওদের বাড়ি অনেক যাতায়াত ছিল, এখন কাজকর্মে সময় পাইনে। তিন ছেলে-মেয়ে প্রভাতের। বড়টি মেয়ে—শুভ্রা, বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে, ঘটকালি আমিই করেছিলাম। ছেলেটি ভাল—চালাক-চতুর, আত্মসম্মানী, একটু বেশি রকম জেদি এই যা। নিজের চেষ্টায় লিলুয়া স্টীল ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে। এবং মামার জোর না থাকা সত্ত্বেও প্রোমোশান পাচ্ছে। তবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে খিটিমিটি—গিয়ে গিয়ে পড়ে সেখানে, দশ কথা শুনিয়ে আসে। আমি কিন্তু মনে করি, দোষ প্রভাতদেরই। প্রথম সন্তান শুভ্রা একমাত্র মেয়ে। মা-বাপ তাকে চোখে হারায়। যেতে পাঠানোর কথা হলেই নানান বায়নাক্কা। তাই নিয়ে জামাইয়ের সঙ্গে লেগে যায়।

একবার তো গিন্নি বলেই বসলেন, তুমি বরঞ্চ এ বাড়ির ছেলে হয়ে থাকো। একসঙ্গে মজা করে থাকা যাবে।

সুবিনয় বলে, ফোরম্যান হয়েছি। আগে যদিই বা হত—এখন অনেক দায়িত্ব, এত দূরে থেকে কাজ করা সম্ভব নয়।

ছেড়ে দাও না। কী দরকার বাপু ভূতের-খাটনি খাটার?

আরও মোলায়েম কণ্ঠে সিন্ধুবালা বলেন, ছেলে আর জামাই কি আলাদা? আমরা তো জানি, ছেলে আমাদের দুটি নয়—তিনটি। বড়ছেলে তুমি—সকলের উপরে।

এমন কথার উপরেও সুবিনয় ফোঁস করে ওঠে: আপনারা যা-ই জানুন, দশে-ধর্মে জানবে ঘরজামাই আমি—শ্বশুরবাড়ির অন্নদাস। মরে গেলেও তা হবে না।

রাগ আরও বেশি শুভ্রার উপর। বাপ-মায়ের দলে সে। আহ্লাদি মেয়ে - দিন-রাত এখানে স্ফূর্তিফার্তি নিয়ে থাকে। মেয়েকে এঁরা সংসারের কুটোগাছটি নাড়তে দেন না। গেল-বছর বাসা ভাড়া করে সুবিনয় বিস্তর চেষ্টা-তদ্বিরে বউ নিয়ে তুলেছিল। বাসা অবশ্য মনোরম নয়—একতলায় দেড়খানা ঘর, চারিদিক প্রায় আঁটা। তার উপর পাড়াটা মজুরদের—বাপের বাড়ির মতন টই-টই করে বেড়ানো চলে না। সুবিনয় কারখানায় গেলে অতএব দুয়োরে খিল এঁটে চুপচাপ ঘুমানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কায়ক্লেশে

মাসখানেক কাটিয়ে শুভ্রা ক্ষেপে গেল একেবারে—ঝগড়া, কান্নাকাটি, কথায় কথায় বাক্যালাপ বন্ধ, উপোস করে পড়ে থাকা। এতেও হচ্ছে না তো বাপ-মায়ের সঙ্গে সড় করে বাসা ছেড়ে পলায়ন। সন্ধ্যাবেলা সুবিনয় ফিরে এসে দেখে, চিড়িয়া উড়েছে—খাঁচা হা-হা করছে। তক্তাপোশের উপর চাপা-দেওয়া বাবাজীবনের উদ্দেশে প্রভাতের চিরকুট: শুভ্রাকে লইয়া গেলাম, বাসা তুলিয়া দিয়া তুমিও আইস—।

বাসা ছেড়ে দিল সুবিনয়—গিয়ে উঠল শ্বশুরবাড়ি নয়, কাছাকাছি এক মেসে। কিন্তু অধ্যবসায় ছাড়ে নি। হঠাৎ-বা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ে। বাসা আবার করবে, শুভ্রাকে টেনে-হিঁচড়ে সেখানে নিয়ে তুলবে বলে শাসায়। এক-আধ রাত্রি কাটিয়েও যে না যায়, এমন নয়।

আজ সকালে জব্বলপুর থেকে এক দঙ্গল এসে পড়েছে, আত্মীয়ের মধ্যে পড়ে তারা। তাদের নিয়ে শুভ্রা মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছে। প্রভাত হালদার দোকান থেকে এসে যথারীতি পাড়ার ক্লাবে তাসের আড্ডায় গিয়ে জমেছে। ছেলে ছুটোর মাস্টার এসেছে, বাইরের ঘরে পড়ছে তারা। টং-টং করে ঘড়িতে আটটা বাজল। গিন্নি সিন্ধুবালা ভাঁড়ার থেকে ঘি-ময়দা বের করে ঠাকুরকে দিচ্ছেন। হেনকালে জামাইবাবু—করে ঝি ছুটে এল। অর্থাৎ সুবিনয় এসে উপস্থিত, এবং হবে এইবার একচোট।

শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দেওয়া, মুখে দেওয়া—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র খুঁত নেই। কিন্তু এ কী সর্বনাশ - সিন্ধুবালা চমক খেলেন—জামাইয়ের মাথায় মস্তবড় ব্যাণ্ডেজ। একটা চোখ ব্যাণ্ডেজে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে।

ব্যাকুল হয়ে সিন্ধুবালা শুধান: কি হয়েছে বাবা? এ কি!

সুবিনয় নির্বিকার ভাবে উড়িয়ে দেয়: হবে আবার কি? লোহালক্কড়ের কাজ—একটু-আধটু ঘা-গুঁতো লাগবেই। ক্রেন থেকে লোহার টুকরো ছিটকে এসে লাগল। নিয়ম মাফিক হাসপাতালে গেলাম, তারাও কাজ দেখাল - স্টকে যত ব্যাণ্ডেজ ছিল, মাথায় মুখে সমস্ত জড়িয়ে দিয়েছে।

খিক-খিক করে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর। বলে, হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি, ফিরে গিয়ে আবার যেমন-কে-তেমন শুয়ে পড়ব। যে জন্যে এসেছি মা, শুনুন। এইবারে বড় ভাল বাসা পাওয়া গেছে। এত চমৎকার, না দেখলে ধারণায় আসে না। শুভ্রাকে নিয়ে যাব। খুব ভাল থাকবে, আপনারা আপত্তি করবেন না

হাঁ-না কিছু না বলে সিন্ধুবালা চুপ করে রইলেন। সুবিনয় বলে যাচ্ছে,

সে এমন বাসা, শুভ্রা দেখবেন নড়বেই না আর সেখান থেকে। আর বাগড়া দেবেন না, খুশি মনে মেয়ে পাঠান।

সিন্ধুবালা বললেন, আসুন তোমার শ্বশুর—তাঁকে বলি।

সুবিনয় দপ করে অমনি জ্বলে ওঠে: বলাবলি বুঝিনে। ভাল মনে মেয়ে পাঠান, আনন্দের কথা। আপত্তি করে রুখতে পারবেন না। তারিখ দিয়ে যাচ্ছি, শুনে নিন। শ্রাবণ মাস চলছে—এই মাসটা বড় জোর, ভাদ্দর কিছুতে পড়তে দেব না, তার আগে বাসায় নিয়ে তুলব।

সিন্ধুবালা ঘাবড়ে যান। মুখে যতই উড়িয়ে দিক, জামাই অসুস্থ রীতিমত—মাথায় চোট পেয়েছে, মস্তিষ্কেরই গোলমাল। এরকম রূঢ় রুক্ষ কথাবার্তা এ ছেলের মুখে আগে কখনো শোনা যায় নি—বাসা ছেড়ে সেই যে শুভ্রা চলে এসেছিল, তখনো নয়।

রাগারাগি কেন বাবা? নতুন বাসায় তোমার শ্বশুর নিজে সঙ্গে করে শুভ্রাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। বলে পাশটিতে বসে পড়ে সিন্ধুবালা গায়ে হাতখানা রেখেছেন তো সুবিনয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল। ঝি ঠিক এই সময়টা প্লেটে রসগোল্লা এনে সিন্ধুবালার হাতে দিচ্ছে—দিল জামাই ধাক্কা, রসগোল্লা মেঝেয় পড়ল, প্লেট ভেঙে চুরমার। বাঘের মতন গর্জাচ্ছে: মিষ্টবচন অনেক শোনা আছে, আপনাদের হাড়ে-হাড়ে চিনি। শ্রাবণের তিরিশে যাবই নিয়ে—আমার শেষ কথা।

চেঁচামেচিতে দুই ছেলে পড়া ছেড়ে এসে পড়ল, তারা ভয় পেয়ে গেছে। সুবিনয় বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার গতিক ভাল নয়, যেন ছুটছে। সিন্ধুবালা পিছনে ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু রাস্তায় পড়ে যেন কর্পূর হয়ে উবে গেল—কোন গলি ঘুঁজিতে সুট করে ঢুকে পড়েছে।

ফিরে গিয়ে সিন্ধুবালা বজ্রাহতের মতো গড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলছে। চাকরবাকর মাস্টারমশায়—সকলের মধ্যে কী কেলেঙ্কারি! মুখ দেখানোর উপায় রাখল না হতভাগা জামাই। মাথা খারাপ সত্যি সত্যি—না চাকরিতে হঠাৎ প্রোমোশন পেয়ে সাপের পাঁচ-পা দেখেছে? প্রভাত আড্ডা থেকে ফিরলে গিন্নি সাত-কাহন করে বৃত্তান্ত বললেন।

উদ্বেগে সারা রাত্রি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ভোর না হতেই প্রভাত বেরিয়ে পড়ল। কোন হাসপাতালে আছে, হদিশ জানা নেই—সর্বাগ্রে অতএব মেসে যাওয়া যাক। সুবিনয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ধ্রুবও ঐ মেসে থাকে—পাশাপাশি সিটে। তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাবে। নতুন বাসার খবরও ধ্রুব নিশ্চয় জানে। সময় হলে নিজ চোখে একবার বাসাটা দেখে

আসবে। মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, মেয়ে পাঠানো নিয়ে গড়িমসি আর চলবে না—কচলে কচলে লেবু তেতো হয়ে উঠেছে।

পাওয়া গেল ধ্রুবকে, বিভোর হয়ে সে ঘুমোচ্ছে। এবং বাবাজীবন সুবিনয়কেও - কলতলা থেকে দাঁতন সেরে সুবিনয় ঘরে এসে ঢুকল। চোখ-ঢাকা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে থাকবার কথ—কী আশ্চর্য, সেই মানুষ বহাল তবিয়তে হেলতে-দুলতে এসে শ্বশুরকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মাথায় নাকি প্রচণ্ড জখম -আর প্রভাত তাকিয়ে তাকিয়ে দেহের কোনখানে ক্ষীণ একটা আঁচড়ও দেখতে পায় না। বিশাল ব্যাণ্ডেজ ও হাসপাতালের কাল্পনিক বৃত্তান্ত, বোঝা যাচ্ছে, শাশুড়ির মন গলানোর জন্য। এতদূর শঠ ধাপ্পাবাজ জামাই, ধারণায় ছিল না। রাতারাতি প্রোমোশানের য গল্প রটাচ্ছে, তা-ও নিঃসন্দেহে গুল।

তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুবিনয় ব্যস্ত হয়ে শুধায়: এত সকালে এসেছেন, কি ব্যাপার?

প্রভাত বলে, কাজে বেরিয়ে যাবে তুমি, তাড়াতাড়ি এসে ধরলাম। নতুন বাসা কোথায় ঠিক করলে দেখে আসি চল। অফিসের তাড়া থাকে তো ধ্রুব বরঞ্চ চলুক। ঠিকানা পেলে আমি একলাও গিয়ে দেখে আসতে পারি।

বাসা ঠিক করেছি—সে কি? কোথায় শুনলেন? সুবিনয় আকাশ থেকে পড়ল।

তুমি নিজে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে এসেছ। আমার সামনে এখন ভিজে-বেড়ালটি!

ধড়িবাজ জামাই, প্রভাত মনে মনে ভাবছে। এর পরে আর ধৈর্য রাখা চলে না। তিক্ত কণ্ঠে সে বলল, মাথায় মস্তবড় ফ্যাটা বেঁধেছিলে—আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে বুঝি? ছিঃ ছিঃ—

সুবিনয়ও গরম হয়ে বলে, ডাহা মিথ্যেকথা! সকালবেলা এই নিয়ে গালি-গালাজ করতে এসেছেন? গুরুজন আপনি, কী আর বলব—

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে ধ্রুব উঠে বসেছে। তাকে উদ্দেশ্য করে সুবিনয় বলে, কাল সন্ধ্যার সময় আমরা কোথায় ছিলাম, বলে দে ধ্রুব।

ধ্রুব বলল, সিনেমায় গিয়েছিলাম—সুবিনয়, আমি আর নীরদ।

তা নাকি নয়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঝগড়া করতে আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়েছিলাম।

ধ্রুব ঘাড় নেড়ে প্রবল প্রতিবাদ করে: না না, তা কেন হবে?

সুবিনয় বলে, আমি নতুন বাসা ভাড়া করেছি নাকি কোথায়—

ধ্রুব হেসে প্রভাতকে বলে, সুবিনয় বাসা ভাড়া করে ফেলেছে আর আমি কিছু জানলাম না—হতেই পারে না মেসোমশায়। বাজে কথা কানে নেবেন না।

সুবিনয় বলে, শাশুড়ি-মা'র রচনাশক্তি কি রকম, বোঝ ধ্রুব। তাঁর কী বিষ-নজরে পড়েছি, তা-ও বুঝে দেখ।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে প্রভাতের ঘোর বচসা: মিথ্যে বানিয়ে বলেছ আমায়। আর নয় তো স্বপ্ন দেখেছ।

সিন্ধুবালা বলে, তোমার দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর। চেঁচামেচিতে বাইরের ঘর থেকে তারা ছুটে এসেছিল। জিজ্ঞাসা কর ঝিকে, ঠাকুরকে। এত মানুষ সবাই কি একসঙ্গে স্বপ্ন দেখল?

প্রভাত বলে, তারা সিনেমায় গিয়েছিল, পকেট খুঁজে ছেঁড়া-টিকিটের তিনটে টুকরো আমায় দেখিয়ে দিল।

বলি, টিকিটে কি নাম লেখা আছে? ঐ টিকিটে মেসের অন্য লোক গিয়েছিল, তা-ও তো হতে পারে ওরাই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, আর এত জনে আমরা চাক্ষুষ দেখলাম সে জিনিস সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গেল?

কলহের উপক্রমণিকা। রীতি অনুযায়ী প্রভাত অতএব আর সেখানে নেই। ব্যাপারটা প্রহেলিকা হয়ে রইল।

প্রহেলিকা সাংঘাতিক হল আরও আটদিন পরে। ধ্রুবর ফোন প্রভাতের দোকানে। ক্রেনে তোলার সময় লোহা একখানা ছিটকে পড়ে সুবিনয়কে জখম করেছে। হাসপাতালে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে আনা হয়েছে তাকে, অপারেশন হয়ে গেছে। বাড়ি-সুদ্ধ হাসপাতালে ছুটল। অক্সিজেন দিচ্ছে সুবিনয়কে—অসাড়, একেবারে সম্বিত নেই। সিন্ধুবালা ও ছেলে দুটো স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ডান চোখ বেড় দিয়ে সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেই সন্ধ্যায় সুবিনয় গিয়ে পড়েছিল—তখনও মাথায় অবিকল এই আয়তনের এমনিধারা ব্যাণ্ডেজ, তিলেক হেরফের নেই। ক্রেন থেকে লোহা ছিটকে পড়ার কথাও বলেছিল সেদিন। আর বলেছিল, আঘাত অতি সামান্য—তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছিল। ভবিষ্যৎ এতদূর অক্ষরে অক্ষরে মিলে এসে, ভরসা করা যায়, পরিণামও মিলে যাবে—সেই সুরে সুবিনয় ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে ফিরবে।

কিন্তু ফিরল না আর। পোস্ট-মর্টেম সেরে শ্মশানে তাকে চুকিয়ে-বুকিয়ে এলো। পরের সকালে শুভ্রাও ওঠে না, রাত্রে নাকি জর এসেছে। জর অতি সামান্য, তবু প্রভাত চৌষট্টি টাকা ভিজিটের অনাদি সেনকে কল

দিল। রোগি দেখে ডাক্তার বলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা—তিন দিনে সেরে যাবে। বিনি ওষুধেও সারত। সামান্য ব্যাপারে এত নার্ভাস হয়েছেন প্রভাতবাবু, হাত পেতে টাকা নিতে আমার লজ্জা করছে।

এতেই শেষ নয়। আমার কাছে এসে পড়ল প্রভাত। উস্কোখুস্কো উৎকট চেহারা। দেখে আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বলে, ওস্তাদ নটবরকে কোথায় পাই, তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দাও ভাই।

ব্যাপার কি বল দেখি?

প্রভাত আদ্যন্ত সবিস্তারে বলল। সুবিনয় মারা গেছে—কোন খবরই আমি জানতাম না। জামাই নেই, এখন মেয়ে নিয়ে সে বড় শঙ্কিত। বলে, তোমার নটবরকে একবার দেখাব।

ক্ষেপেছ? অনাদি ডাক্তার দেখছেন—মুখোমুখি ভূতের ওঝা কি করবে সেখানে?

প্রভাত বলে, ভূতেরই তো কাজ। মরে ভূত হয়—এ হল সবার আগের ভূত। বেশি সাংঘাতিক। যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে সব মিল হয়ে যাচ্ছে। শুভ্রাকে নিয়ে যাবে, শাসিয়ে গেছে সে কথা ভাবতে গেলে প্রাণে জল থাকে না। শুভ্রার মা একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছে

প্রভাত ভূত মানে না, চিরকাল ঠাট্টা তামাশা করে। তার এই দশা। চললাম দুজনে নটবরের বাড়ি। সে কি এখানে—মাইল কুড়ি দূরে পাড়াগাঁ জায়গায়। কষ্ট অনর্থক—নটবর নেই, বাংলাদেশে গেছে কুটুম্বসজ্জন দেখতে। কবে ফিরবে, ঠিকঠিকানা নেই

ফিরলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে, ভাল করে বলে কয়ে এলাম।

প্রভাতের বাড়ির খোঁজখবর নিই। ভাল না। ডাক্তার গোড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেছিলেন, পরে বললেন টাইফয়েড। রক্তে কিছু পাওয়া যায় না, জ্বর কিন্তু অবিচ্ছেদে চলছে। অনাদি সেনের মতো এত বড় ডাক্তার অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। অসুখ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। উৎকট মাথার যন্ত্রণা—রোগি কাটা-কবুতরের মতন ছটফট করে। আবার বুকের মধ্যেও একটা যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে আজ ক'দিন। টাকা আছে প্রভাতের, একা অনাদি সেন নয়—ডাক্তারে ডাক্তারে ছয়লাপ করেছে, শুনতে পাই।

এক বিকালে নটবর ওস্তাদ হঠাৎ উদয় হয়ে কাঁধের চাদর নামিয়ে পায়ে গড় করল। চলো নটবর—বলে মিনিট দশ পনেরোর ভিতর আমি তৈরি। প্রভাতের বাড়ি থমথম করছিল, আমাদের দেখে তুমুল কান্না উঠল। শুভ্রা উঠানে খাটের উপর—ফুল দিয়ে অপরূপ সাজিয়েছে, কেওড়াতলায় নিয়ে

যাবে এইবার। মরণ কে বলে—একমুখ হাসি নিয়ে যেন পরম সুখে-শান্তিতে আছে যুবতী মেয়ে। নটবর ফিসফিসিয়ে আমার কানে বলে, হারানো বর আবার পেয়ে গেল, তাইতে হাসছে। আমি থাকলেও কিছু হত না। গাই-বাছুরে ষড় থাকলে বাইরে থেকে কে ঠেকাবে?

প্রভাত বলছে, হারামজাদা শয়তানটা! যা বলেছিল, ঠিক ঠিক তাই করে ছাড়ল। ভাদ্দর পড়তে দিল না, তিরিশে শ্রাবণ আজ।

প্রভাতের বউ সিন্ধুবালা ওদিকে মেয়ের পাশে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে: নতুন বাসায় চললি মা আমার, আমি যাব, আমি যাব, আমায় নিয়ে যা—

ঘাড়-বাঁকা পরেশ

পরেশকে দেখেছেন? একবার দেখলে আর ভোলা যাবে না। ঘাড় বাঁদিকে বাঁকানো—বাঁ-হাত বাঁ-পায়ের সমসূত্রে। ভাল সার্জন দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। একবার নয়, তিন তিনবার। বাঁকা ঘাড় সোজা হয়নি। হবে না, জানা কথা। কিন্তু মন বোঝে না—অকারণ অর্থনষ্ট। শুনুন বলি, সোজা ঘাড় কেমন করে বাঁকল।

বউ বনেদি ঘরের মেয়ে: ভাই নেই, চার বোন তারা। মায়ের যা-কিছু ছিল, চার বোনে ভাগ করে নিয়েছে। সেরিব্রাল-থ্রম্বসিসে পরেশের বউ হঠাৎ মারা গেল। রোগের শুরু থেকেই অচেতন-মরার আগে একটি কথাও সে বলে যেতে পারেনি।

দুই ছেলে, এক মেয়ে। বিধবা দিদি আছেন সংসারে—দিদির উপর ছেলেমেয়েদের ভার চাপিয়ে পরেশ হিমালয়ে বেরুল। লোকে বলছে, আহা রে, পত্নী-শোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। হৃষীকেশের কাছে এক আশ্রমে আস্তানা নিয়েছে। পাহাড়-পর্বতে বনে-জঙ্গলে অহরহ ঘুরে বেড়ায়—সাধু-সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষের খবর পেলেই চলে যায় সেখানে, যত-দূর যত দুর্গমই হোক সে জায়গা। সৎপ্রসঙ্গ হয়, পরলোক-ঘটিত ব্যাপারগুলো পরেশ বেশি করে জানতে চায়। একটা সন্ধান পেতে চায় সে ৺বউয়ের কাছ থেকে। মণি-মাণিক্যখচিত পুরানো জড়োয়া-হার একটা, লক্ষাধিক টাকা দাম, শাশুড়িঠাকরুন চুপিচুপি তাকে দিয়েছিলেন। অন্য সব-কিছু পাওয়া গেল, কিন্তু জড়োয়া-হার বউ যে কোথায় রেখে মারা গেছে—ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলল না। বের করে দিয়ে যাক সে একবার এসে। আসা নিতান্তই যদি অসম্ভব হয়,

জিনিসটা কোথায় আছে জানিয়ে দিক পশু-পাখি কিম্বা পেত্নী-শাকচুন্নির মারফতে (মানুষ কদাপি নয়—ঋষিতপস্বী হলেও নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে পাচার হবার সম্ভাবনা থেকে যায়)।

ত্রিকালদর্শী এক মহাসাধুর বৃত্তান্ত শুনে পরেশ তাঁর খোঁজে চলল। ভারি দুর্গম জায়গায় থাকেন তিনি। রাত থাকতে বেরিয়েছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পাহাড় জঙ্গল কত যে পার হল, অবধি নেই। অধ্যবসায়ীর অসাধ্য কিছু নেই, অপরাহ্নবেলা অবশেষে পৌঁছে গেল। দর্শনও মিলল—ভক্তি-গদগদ হয়ে সে সাধুমহারাজের পাদবন্দনা করল। এবং একতাল মিছরি ও রকমারি ফলমূল-মিষ্টান্ন পাদপদ্মে নিবেদন করে যুক্তকরে বসে আছে আশীর্বাদ-লাভের প্রত্যাশায়। পরেশের পানে মহারাজ একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন, শব্দসাড়া দেন না কিছু। অবস্থা দৃষ্টে আখড়ার দু-নম্বর সাধু চোখ টিপে পরেশকে কাছে ডেকে বললেন, মৌনীবাবা—সারাদিন সারা-রাত্তির ধন্না দিয়ে থেকেও সিকিখানা কথা বের করতে পারবে না বাপু।

পরেশ হাহাকার করে ওঠে: আমি যে বিস্তর আশা নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছি—

তার জন্যে ভাবনা নেই। মহারাজ অন্তর্যামী—মনের আশা খুলে বলতে হবে কেন, উনিই মন থেকে টেনে বের করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করছেন। করা হয়েই গেছে হয়তো এতক্ষণে।

এ হেন পাইকারি আশ্বাসে পরেশ তৃপ্তি পায় না। বহুদর্শী দু-নম্বরী বুঝলেন সেটা। জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন। মহারাজ-বাবার ইহলোক ও পরলোক-ঘটিত বিবিধ তাজ্জব ক্রিয়াকর্ম। দস্তুরমতো রোমাঞ্চক। বিশ্বাস করো চাই না-করো, গল্পের সমাপ্তির আগে কার সাধ্য উঠে পড়ে!

কতক্ষণ কেটে গেছে, পরেশের হুঁশ নেই। গুম-গুম-গুম—মেঘগর্জন। সচকিত হয়ে সে উপরমুখো তাকায়। সর্বনাশ, মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। পালা, পালা—

দ্রুত নামছে পাকদণ্ডীর পথ ধরে। উঠতে সময় লেগেছে—নেমে পড়তে কষ্ট কম, সময়ও কম লাগবে। ঘোর অন্ধকার—সে এমন, পথ তো পথ—নিজের হাত-পাগুলো চেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামল ছড়ছড় করে, সঙ্গে ঝোড়ো-বাতাস। ক্ষণে ক্ষণে গাছতলায় আশ্রয় নেয়, বৃষ্টি কমলে আবার হাঁটে। কতক্ষণ ধরে যাচ্ছে এমনি—শঙ্কা জাগল, দুর্যোগের মধ্যে পথ ভুল করেনি তো? জনপ্রাণী দেখা যায় না যে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

বৃষ্টি থামল অবশেষে। অন্ধকারও চোখে সয়ে এসেছে—চারিদিকে

আবছা রকম নজর চলে। হঠাৎ দেখা যায়, সামান্য দূরে দীর্ঘদেহ একজন। অতি দ্রুত চলেছে।

পরেশ যেন হাতে-স্বর্গ পেল। ডাকছে: ও মশায়, শুনছেন, হৃষীকেশ আর কদ্দুর?

সেই দীর্ঘদেহী খিক-খিক করে উৎকট হাসি হেসে উঠল: এদিকে কোথা হৃষীকেশ? পাহাড়ের একেবারে উল্টোদিকে। সারারাত হেঁটেও হৃষীকেশ পাবি নে।

পরেশ আর্তনাদ করে উঠল: মশায় গো মশায়, পথ হারিয়ে ফেলেছি। মারা পড়ব, একটা আশ্রয় কোথায় পাই বলে দিন।

যাবি কোথা?

পরেশ বলে, অ্যান্টিবায়োটিক কারখানার কাছাকাছি গেলেই সেখান থেকে চিনে আপন ডেরায় যেতে পারব।

সেই লোক বলে, আমি ঐদিকেই যাচ্ছি। চলে আয় আমার পিছুপিছু।

থেমে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, আবার সে চলল। চলা মানে রীতিমত দৌড়ানো। পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে দৌড়চ্ছে - কিছুই যেন তার গায়ে লাগে না।

পরেশ কাতর হয়ে বলে, আস্তে চলুন মশায়। অত জোরে পেরে উঠিনে আমি।

জোর কে বলল? আস্তেই তো যাচ্ছি রে। জোরে যাওয়া দেখতে চাস?

পরেশ তাড়াতাড়ি বলে, আজ্ঞে না। যা দেখছি, এতেই চক্ষু ছানাবড়া। বয়স হয়ে গেছে, ছুটোছুটি পেরে উঠিনে।

বয়স –কত বয়স তোর, শুনি।

পরেশ বলল, আজ্ঞে, পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করেছি।

তিন-পঞ্চাশং দেড়শ' বছর, আমার বয়স তা-ও ছাড়িয়ে গেছে। থপথপিয়ে চলিস—সেটা বয়সের জন্য নয়। গুচ্ছের হাড়-মাংস-চর্বি বয়ে বেড়াচ্ছিস, দেহখানি পাল্লায় তুলে দিলে ওজনে দেড় মন দু-মন দাঁড়াবে। এত বোঝা চেপে থাকলে ছুটোছুটি হয় না। যখন বেঁচে ছিলাম, আমারও ঐ রকম ছিল রে—বাতে ধরেছিল, হাঁটতেই পারতাম না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতাম। মরে গিয়ে কত সুখ এখন দেখ্। বাতাসের মতন হালকা হয়েছি, যেখানে খুশি পলকে চলে যাই।

তারপর আবদারের ঢঙে আদুরে গলায় ভূত বলে, মরবি? হ্যাঙ্গামা নেই, গলা টিপে এক সেকেণ্ডে শেষ করে দিচ্ছি। দেখতে পাবি, কী মজা তখন। মর্ না রে!

সভয়ে পরেশ বলে, আজ্ঞে না। একবার মরে তারপরে যদি ইচ্ছে হয়, আবার তো বাঁচতে পারব না।

ভূত বলে, তা পারবি নে বটে। কিন্তু ইচ্ছেই হবে না—নিজের অভিজ্ঞতায় বলে দিচ্ছি। বেঁচে থাকার ঝঞ্ঝাট কত! দেহ বয়ে বেড়ানোর মুটেগিরি তো আছেই, আবার যা দিনকাল—ঐ দেহটা ধারণ করে থাকাই বড চাট্টিখানি কথা নয়। মাছ-তরকারি চাল-ডাল অগ্নিমূল্য। আমরা বাতাসে বুড়োআঙুল নাচাই: চালের কুইন্টাল হাজার টাকা হোক না—আমাদের এই কলা!

পরেশ কেঁদে পড়ল: মরার মজা বুঝতে পেরেছি ভূতমশায়। কিন্তু তিন ছেলে-মেয়ে আমার পায়ের শিকল। আমি নিজে স্ফূর্তিতে থাকব, কিন্তু বাচ্চারা ভেসে যাবে একেবারে। মরাটা এখন মুলতুবি থাক। দয়া করে আপনি হৃষীকেশের কাছ বরাবর পৌঁছে দিন, চিরকাল আমি কেনা-গোলাম হয়ে থাকব।

ভূত তখন সদয় হয়ে বলে, চল্ তবে। এমনি ছুটে পারবিনে, আমি তোর হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

ধরতে গিয়ে ভূত তিড়িং করে পিছিয়ে গেল: উ-হু হু, তোর গায়ে লোহা আছে নাকি রে বেটা? হাত পুড়ে গেল আমার।

গলায় গুচ্ছের মাদুলি—পরেশের খেয়াল হল। একটা তার মধ্যে লোহারই বটে। লোহার মাদুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ভূত বলে, লোহায় আমাদের ভয়। লোহা ছুঁলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগে। আর একটা জিনিস তোকে মানা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছিস, সামনে ছাড়া কোন দিকে তাকাবি নে। ডাইনে বাঁয়ে পিছনে—কোন দিকে নয়। খবরদার!

যেই না ভূত মশায় হাত এঁটে ধরেছে—পরমাশ্চর্য ব্যাপার, পরেশ সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতন হালকা। ভূত হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘন জঙ্গল ভেদ করে আবেগে চলেছে—গাছপালা গায়ে বাধে না, শক্ত পাথরের ঘা লাগে না। ঝর্ণা পথে পড়লে দুই পা একত্র করে ভাসতে ভাসতে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়। মরা-লোকে একখানি মাত্র হাত ধরেছে তাতেই এমন, আর নিজে মরবার পরে না-জানি আরও কত সুখ!

সাঁ-সাঁ করে ভূত এক উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে এলো। নিচে আগুন দেখায়—আলোর সারি সেখানে। বলে, চিনতে পারছিস, হৃষীকেশের অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা। এবারে যেতে পারবি তো?

যে আজ্ঞে। বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন আপনি আজ—

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পরেশ ভূতের পদধূলি নিতে যায়। কিন্তু পা

কোথায়—খানিকটা ছায়া মাত্র। ছায়ায় ধুলো লাগে না। পায়ের কোন স্পর্শই পেল না। ভূত বলে, ঐ হয়েছে। নেমে যা এইবারে। আমিও বাড়ি এসে গেছি। ঢুকে পড়ব।

পরেশ শুধায়: কোথায় আপনার বাড়ি?

এই পাহাড়ের নিচে—তোর কি দরকার, তুই চলে যা।

হাত ছেড়ে দিল ভূত। পরেশ তরতর করে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ চড়-চড়-চড়াৎ—পিছন দিকে প্রচণ্ড আওয়াজ। দুনিয়া চুরমার হয়ে গেল বুঝি। ঘাড় ফিরিয়ে পরেশ দেখল, যেখানটা এইমাত্র দাঁড়িয়ে কথা বলছিল—সেই পাহাড় দু'দিকে দুই খণ্ড হয়ে হাঁ করে পড়েছে। ফাঁকের ভিতর দিয়ে পাতাল-তল অবধি নজর যায়—পথঘাট ঘরবাড়ি সেখানে, লোকজন কিলবিল করছে। টুপ করে ভূত তার মধ্যে গিয়ে পড়ল। আর, ঝিনুক যেমনধারা মুখ বন্ধ করে—ফাটা-পাহাড় দু-পাশ দিয়ে এসে বেমালুম জুড়ে গেল। জঙ্গল পাথর, ঝর্ণা - ঠিক আগেকার মতোই। গভীর রাত্রে নির্জন পাহাড়ে এই কাণ্ড ঘটে গেল, এতটুকু মাত্র নিদর্শনও আর পড়ে নেই। নিচে অদূরে অ্যান্টিবায়োটিক-কারখানা বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। কারখানার পাশ দিয়ে থপ-থপ করে পা ফেলে একলা পরেশ আস্তানায় ফিরছে।

পাহাড় ফাটার আওয়াজে পরেশ সেই যে ঘাড় ফিরিয়েছিল, ভূতের মানা মনে ছিল না তার—সেই ঘাড় কিছুতে আর সোজা হল না। পরেশের মুখ বাঁদিকে ফেরানো—বাঁ-কাঁধের সমসূত্রে।

অদৃশ্য আততায়ী

শশী দাস বাস চালায়—মল্লিকপাশ-বাবুগঞ্জ লাইন। মাস্তু অ্যাসিস্টান্ট ও সাগরেদ। এবং সুহৃৎও। মাস্তুও লাইসেন্স নিয়েছে—ড্রাইভারের চাকরি একটা এসেছিল, মাস্তু কিন্তু নিল না: দিব্য একসঙ্গে রয়েছি—আলাদা জায়গায় গিয়ে কেমন থাকব ঠিকঠিকানা কিছু নেই। বেশি টাকার দরকার কি আমার?

কাঁচা-রাস্তা বলে রাত্রিবেলা বাস-চলাচল বন্ধ—সন্ধ্যার মুখে শেষ-ট্রিপ সেরে মল্লিকপাশায় এসে স্থিতি। রাত্রে কাজকর্ম নেই—ফুর্তিফার্তি করো, খাও, ঘুমাও। ডিপোর কাছাকাছি এক চালাঘরে পাশাপাশি দুজনের খাটিয়া। লাগোয়া রান্নাঘর। মাস্তুর উপাধি চাটুজ্যে, অতএব জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ না হয়ে যায় না। সেই বাবদে শশী বলেছিল, বর্ণশ্রেষ্ঠ তুই—পুজোআচ্চা রসুইবাস ও-দুটো তোদের একচেটিয়া। রাঁধাবাড়া তুই করবি, বাসন-মাজা

বাটনা-বাটা আমার ভাগে। মাস্তুর ঘোর আপত্তি: তা বই কি! গরজে পড়ে এখন বর্ণশ্রেষ্ঠ হেনো-তেনো বলে খোশামুদি। ওসব হচ্ছে না— গাড়িতে যা, রান্নাঘরেও তাই। আমি তোর অ্যাসিস্টান্ট।

দুই বাউণ্ডুলের একসঙ্গে বাসা। এর মধ্যে রেণুকা নামে মেয়ে জুটে সমস্ত গড়বড় করে দিল। জোটাল এনে শশী—তখন দিন কতক মাটিতে আর পা পড়ে না। এদের বাসার আরও রশিটাক উত্তরে রেণুকাদের বাড়ি। রথতলায় সন্ধ্যাবেলা শেষবারের মতো প্যাসেঞ্জার নামিয়ে খালি বাস নিয়ে শশী ডিপোয় ফিরছে—এক-একদিন দেখে, ডাগড়াই মেয়ে ঘোর বেগে হ্যাণ্ডেল মেরে টিউবওয়েল থেকে কলসিতে খাবার জল ভরছে। ঢাউস কলসি, তার সঙ্গে ছোট কলসি একটা ফাউ। ভরা হয়ে গেলে এক ঝাঁকিতে বড়টা কাঁখে তুলে ছোটটার কানা ধরে টগবগিয়ে তেজি ঘোড়ায় মতো চলল— জল ছলকে পড়ে শাড়ির কাপড় ভিজে অর্ধেক নাওয়া হয়ে যায়।

শশীর পরোপকার-বৃত্তি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বলল, এত কষ্ট করার তো দরকার নেই।

ভ্রূভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়ে রেণুকা বলে, কষ্ট কোথায়? সিকে-বাঁক হলে এরকম চার কলাস আমি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু মেয়েলোকে বাঁক বইছে দেখলে লোকে হাঁ করে তাকিয়ে পড়বে। সে বড় বিশ্রী।

শশী বুঝিয়ে বলে, ডিপো অবধি বাস তো খালিই যাচ্ছে। কলসি দুটো তুলে দাও, তুমিও উঠে বসো। ডিপোয় গিয়ে নেমে পড়ো।

না—না—করতে করতে উঠে পড়ল রেণুকা। কথা হয়ে রইল, শুধু আজ বলে নয়—রোজই এমনি যাবে। এবং বাসের পৌছতে যদি কোনদিন পাঁচ-দশ মিনিট দেরিও হয়, ভরা-কলসি নিয়ে সে অপেক্ষা করবে। কয়েকটা দিন পরে দেখা যায়, ঘুরপথে বাস রেণুকাদের বাড়ি হয়ে জলের কলসি নামিয়ে দিয়ে তারপর ডিপোয় ফিরছে। কলসি কাঁখে মেয়েটাকে এক পাও আর হাঁটতে হয় না।

আবার একদিন দেখা যায়, টিউবওয়েলের চাতালের উপর ভরা-কলসি দুটো নয়, তিনটে—পাশাপাশি লাইন দিয়ে সাজানো। শশী বলে, এত জল কিসে লাগবে? রান্নাবান্নাও টিউবওয়েলের জলে নাকি?

রেণুকা বলে, কিনতে হচ্ছে না জল, বইতেও হচ্ছে না। রান্নায় অসুবিধে কি?

কিন্তু ব্যাপার তা নয়। তিনের মধ্যে দুই কলসি যথারীতি রেণুকা বাড়িতে নামিয়ে নিল। নিজেও নামল। মাস্তু বলে, এটা?

রেণুকা বলে, আপনারা নামাবেন।

আমাদের কি গরজ?

না, গরজটা আমারই। খাল-পারে ওলাওঠা লেগেছে, পচা পুকুরের জল খাওয়া চলবে না। এই জল খাবেন দুজনে।

ভাল রে ভাল—রেণুকা হুকুম ঝাড়ে কেমন দেখ! বলে, কলসি রান্নাঘরে নিয়ে রাখবেন। দরজায় শিকল তোলা থাকবে, কুকুর-শিয়াল না ঢুকতে পারে। আমার দুই কলসির সঙ্গে এই কলসিও আমি টিউকলে (টিউবওয়েলে) নিয়ে যাব কাল।

ওদের ঘরে এই মেয়েমানুষের পা পড়ল। কলসি নেবার অজুহাতে নিশিদিন রেণুকা রান্নাঘরে ঢোকে। হাঁড়িকুড়ি নেড়েচেড়ে ঘর-গৃহস্থালী বাবা খাওয়ারও কি আর আন্দাজ নেয় না? সকালে রোদ না উঠতেই বাস নিয়ে বেরুতে হয়, তখন রাঁধাবাড়ার সময় কই? সমস্তটা দিন চা-পাঁউরুটির উপর কাটিয়ে রাত্রে বাসায় ফেরে রাক্ষসের খিদে নিয়ে। দাউ-দাউ করে উনুন জ্বালিয়ে হাঁড় ভরে চাল চাপিয়ে দেয়। আলু বেগুন কুমড়ো ঝিঙে হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া গেল, ফেলে এনে হাঁড়ির মধ্যে। অধীর ভাবে বারম্বার হাঁড়ির ভাত টিপে দেখে, দাঁতে পিষ্ট হবার অবস্থায় পৌঁচেছে কিনা। নামিয়ে দুই থালায় ঢেলে গবাগব কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাঁড়ির ভাত কাবার।

আস্তে খান, এখন আর তাড়া কিসের?—বলতে বলতে এক রাত্রে ঝড়ের বেগে রেণুকার প্রবেশ। এক কাঁসর ডাল এনেছে—সুগন্ধ সোনামুগ। হড়াস করে এ-থালায় খানিকটা ও-থালায় খানিকটা ঢেলে দিয়ে মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্ধান।

মাস্তু খেতে ভালবাসে—মা যতদিন ছিলেন, ঠেসে ঠেসে খাওয়াতেন। তেমনি হয়েছে এখন। সারা দিনমান একরকম উপোস—রাত্রেও খাওয়া নয়, কোন গতিকে উদরের গর্ত বোজানো। অনেকদিন পরে এমনধারা ডাল পেয়ে বর্তে গেছে সে। পরের সন্ধ্যায় দেখা হলে গোড়াতেই ডালের প্রসঙ্গ: এমন খাসা রান্না তোমার—উঃ!

রেণুকা বিরস মুখে বলল, যাকে যে কাজ করতে হয়। আমার হল শীত নেই, বর্ষা নেই, দিনের পর দিন দুইবেলা রান্না করা। আগুনের কাছে গেলে মামীর মাথা ধরে।

মাস্তু বলে, দেওয়া ঐ একটা বেলাতেই যেন শেষ না হয়ে যায় রেণু। তুমি বরঞ্চ কিছু টাকা রেখে দাও। যখন যেটা পারো দিয়ে যেও। মুখ বদলে বাঁচব।

রেণুকা বলে, কাল ওরা ফকিরবাগানের মেলায় গিয়েছিল আমায় বাড়ির পাহারায় রেখে। কী রকম ছুটে বেরুলাম, দেখলেন না? নিত্যি নিত্যি ও ছুতো খাটবে না। রাত্রে উঠোনের বার হয়েছি, টের পেলে মামা গলা দু-খণ্ড করে কাটবে।

এমন কড়া—বলো কি গো?

ঝিনি-মাইনের চাকরানী ঝিনি-মাইনের রাঁধুনী বেহাত না হয়ে পড়ে—আসল ভয়টা হল সেইখানে।

মান্তু ফস করে বলে বসল, কিছু মনে কোর না রেণু। ছাইভস্ম গিলে গিলে পেটে চড়া পড়ে গেছে। তুমি যদি একবেলা চাট্টি করে রেঁধে দিয়ে যাও—সেই বাবদে তোমার মামা যা উচিত বিবেচনা করেন, তা-ই দিতে রাজি। বলে দেখ না একবার—টাকাটা তাঁরই হাতে দেব।

বলে যা হবে জানি। চটাস-চটাস করে চটির ঘা পড়বে আমার গালে-মুখে—

শশীর হাতে স্টিয়ারিং-চাকা, দৃষ্টি পথের দিকে—কান খাড়া করে এদের কথা শোনে আর ফিক ফিক করে হাসে। মান্তুর গা টিপে বলল, ওকে দিয়ে বলিয়ে কেন মার খাওয়াবি? সাহস থাকে নিজে গিয়ে বল্ তুই। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার—রাঁধুনি-টাধুনি নয়, একেবারে ঘরের বউ করে নেবো, কথা পেড়ে দেখ্ গিয়ে।

হাত-মুখ নেড়ে রেণুকা বলে, বউ হতে বাকি আছে বুঝি? দুশো টাকা খেয়ে এই মামাই পনেরো বছর বয়সে এক টেকো-বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আঠারো হতে না হতে বুড়ো পটল তুলল, মামার-বাড়ি ফিরে পাকাপাকি হাতা-বেড়ি-খুন্তি ধরলাম।

শশী বলল, মুফতে হবে না রে মান্তু, দর দিয়ে আসবি নগদ পাঁচশো টাকা। ঝক ঝকে বড় বড় নোট পাঁচখানা।

কথা ঐ পর্যন্ত—এই তিনের মধ্যে। মান্তু সত্যি সত্যি গিয়েছিল কিনা খবর নেই। মাস খানেক পরে শশী একদিন মান্তুকে ধরেছে: জেতে তুই বামুন, খেয়াল আছে?

মান্তু বলে, পুরো নাম মন্মথ চাটুজ্যে—'না' বলি কেমন করে?

যেমন-তেমন বামুন নয়, কুলীন বামুন। বিষধর কেউটে। হাতের মাথায় তুই রয়েছিস, একটা বড় দায় নিশ্চিন্ত।

কি হল আবার?

রেণুকাকে বিয়ে করে ফেলব। তুই মন্তর পড়াবি।

মাস্তু বলে, সেরেছে! সে যে মবলগ খরচা। পৈতে থেকে পুরোহিত-দর্পণ—

পৈতেটা বুঝি—পৈতে ঝুলিয়ে না বসলে মন্তর পড়ানো হয় না। পুরোহিত দর্পণ কোন কর্মে লাগবে শুনি?

মাস্তু বলে, বিবাহ-প্রকরণ চাট্টিখানি কথা নয়। জন্মে একটা ষষ্ঠীপুজোও করিনি। পড়ে শুনে রপ্ত করতে হবে না?

শশী বলে, তবেই হয়েছে! অত সমস্ত রপ্ত করতে নিদেনপক্ষে ছ'টি মাসের ধাক্কা। তদ্দিনে মামামশায় হাজার টাকায় ভাগনী বেচে হাত-পা ধুয়ে ঘরে উঠেছে। তড়িঘড়ি সারতে হবে রে—পঞ্জিকায় যে ক'টা মন্তর আছে, তাই ঢের। বেশি ঝামেলায় গেলে চাউর হয়ে পড়বে, মামামশায় বাগড়া দেবে তখন।

ঘরকানাচে বাতাবিলেবুতলায় মাস্তু পৈতে ঝুলিয়ে কুশাসন পেতে কোশাকুশি সামনে নিয়ে পুরুত হয়ে বসেছে। জঙ্গলে সুঁড়িপথ ধরে আঁধারে আঁধারে কনেও ঠিকঠিক এসে পৌঁছল। ভেবেচিন্তে কনেকে ঘরে তোলা হল না। খোঁজাখুঁজি করতে এসে সর্বাগ্রে লোকে ঘরেই ঢুকে যায়। বাড়ির দাওয়ায় পালিতদের পোয়ালের গাদা—কনেকে তার নিচে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, সময়ে টেনে বের করবে। হলধর কড়কড়ে জোয়ান—এদেরই এয়ারবন্ধু লোক। তারই মতন আরও তিনটিকে নিয়ে সে বরযাত্রী হয়ে আসছে। এরাই দেরি করিয়ে দিচ্ছে—নয়তো শুভকর্ম এতক্ষণে সমাধা হবার কথা।

দেখা মিলল অবশেষে। শশী ফিসফিসিয়ে তর্জন করে: দেরি করলি—ভাবনায় ছটফট করছি আমরা।

হলধর হাতের গুলি পাকিয়ে বলে, ভাবনাটা কিসের শুনি?

মামা সন্দেহ করেছে, রেণু বলল। জুটেপুটে এসে পড়তে পারে।

বাতাবিলেবুগাছে ঘুসি মেরে হলধর বলে, চারজনে আমরা গণ্ডা দুয়েকের মুণ্ডু অন্তত ছিঁড়ে তো নেব ধড় থেকে—

ইত্যাদি বীরোচিত কথাবার্তার মাঝখানে রেণুকার মামা ভোলানাথ এসে উপস্থিত। ডাইনে বাঁয়ে দুই ছেলে—স্বরূপ ও শ্যামল। মামামশায় শশীর দিকে চেয়ে গর্জে উঠলেন: রেণুকা পালিয়েছে। নিশ্চয় তোমার এখানে। কোথায় সে? বলে ফেল—ভালর তরে বলছি।

হলধর এক লম্ফে গিয়ে (—না, অসদাচরণ কিছু নয়, সমাদরে) ভোলানাথের হাত জড়িয়ে ধরল। টানছে: মামামশায়, আসতে আজ্ঞা হয়। দেরি করে ফেললেন, ভাবনায় ছটফট করছি আমরা।

আর শশী এসে ওদিক থেকে পদতলে চপাস করে প্রণাম। পদধূলি জিভে ঠেকায়। মাস্তুর উদ্দেশে হাঁক পেড়ে উঠল: সম্প্রদান করতে খোদ মামামশায় পৌঁছে গেছেন। ছাদনাতলা কানাচে আর কেন, উঠোনের উপর সদরে নিয়ে আসুক। হলধর, হেরিকেন ধরিয়ে ফেল্ রে ভাই। শুভকর্ম অন্ধকারে কেন হতে যাবে?

হলধর শোরগোল তুলেছে: পিঁড়ি কই রে, মামামশায় বসবেন কিসে? ছি-ছি, মাটিতে বসে সম্প্রদান করবেন?

হুঙ্কার ছাড়লেন ভোলানাথ: বিয়ের ষড়যন্ত্র—এত বড় আস্পর্ধা! শ্যামল, এক দৌড়ে থানায় চলে যা। পাড়ায় গিয়ে লোকজন ডেকে আন, ওরে স্বরূপ—

উভয় পুত্রেরই ইতিমধ্যে সঙ্গিন অবস্থা—হলধরের দুই সঙ্গী দু'দিক দিয়ে কষে ধরেছে। এবং বাকি লোকটি কাজের অভাবে শ্যামল-স্বরূপের পিঠে রদ্দা মারতে মারতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বসে, বসে। বসে বিয়ে দেখগে শালারা। গলা দিয়ে এক কাঁচ্চা আওয়াজ না বেরোয়। বিয়ের কাজ অন্তে একসঙ্গে সব ভোজে বসিয়ে দেওয়া হবে।

ভোলানাথ ওদিকে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন: হাত ছেড়ে গলা ধরলি কেন রে বাপু? ছাড়্, ছাড়্—দম আটকে আসে।

গলা ঠিক নয় হলধর কাঁধ ধরেছে, চাপ দিয়ে পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। বলে, জুত করে বসুন মামামশায়, একগাদা কড়া কড়া সংস্কৃত মন্তর।

ভোলানাথ চোখ পাকিয়ে বলেন, গলা চেপে ধরে মন্তর আদায় করবি? একটা মন্তরও বলব না, ভুল অং-বং করব—উঃ উঃ, বাবা রে—

কিছু-একটা করে থাকবে হলধর—ভোলানাথের চোখে জল বেরুনোর মতো। হলধর নিপাট ভালমানুষ হয়ে মাস্তুকে বলছে, আরম্ভ করে দাও এবারে ভাই, মামামশায় তৈরি।

বরাসন থেকে তড়াক করে উঠে এসে শশী মামামশায়ের কানে আলাদা এক মন্ত্র-পাঠ করল। ভোলানাথ ঝিম হয়ে ছিলেন, মন্ত্রের গুণে মুহূর্তে চাঙ্গা হলেন—মুখ হাসিতে ভরে গেল। এই গল্প লিখতে গিয়ে হলধরের কাছ থেকে মন্ত্রের বয়ান আমি আদ্যোপান্ত শুনে নিয়েছি। হলধর ধরে বসেছিল ভোলানাথকে, ভরসা করে ছেড়ে যায়নি—শশীর প্রতিটি কথা তার কানে গিয়েছিল। শশী বলল, মুখ গোমড়া করে থাকবেন না মামা, তাতে আমাদের মঙ্গল হবে না। সেই পাঁচশো টাকা পুরোপুরি আজকেই জোড়ে আমরা পাদপদ্মে প্রণামী দেবো। হপ্তার মধ্যে আরো দুশো। তাছাড়া আপনার

শ্যামল-স্বরূপের মতো আমিও ছেলে হয়ে যাচ্ছি তো, দায়ে-বেদায়ে কখনো মুখ ফেরাতে পারব না।

হলধরও সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়ঃ তা ছাড়া মন্তর না পড়েও তো বাঁচাবাঁচি নেই মামা। করতে যা হবেই, হাসিখুশির সঙ্গে করাই ভাল—তাই না ?

মন্ত্রগুণে মামার ভোলবদল। মাস্তু পাঁজি দেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়ছে—মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতে শুদ্ধ উচ্চারণে ভোলানাথের বলা সারা। স্বরূপ-শ্যামল মুখ গোমড়া করে বলে, ধাক্কা দিতে দিতে এনে ফেলল- হাসিখুশি আসে কেমন করে ?

ভোলানাথ বলেন, ধাক্কা কোথায় হল রে ? উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলি, দাওয়ার উপর নিয়ে বসাল—খারাপটা কি করেছে। জোয়ানমুরো ছেলেপিলে—ওদের আদর এর বেশি মোলায়েম হয় না।

স্বরূপ বলল, শালা-শালা করে গালি দিচ্ছিল—

শালা তো মিছে নয়। রেণুকার ভাই না তোর ? শশী বাবাজীর সঙ্গে শালা সম্পর্কই তোদের।

মোটের উপর ভোলানাথ একেবারে শশীর লোক হয়ে গেছেন। বরপক্ষের কোন রকম দোষ ত্রুটি তিনি মেনে নেবেন না।

বিয়ে হয়ে গেল, সুখশান্তিতে ঘরকন্না করবে— ভাবছেন, গল্পের শেষ, আমার কথাটি ফুরালো। ঠিক উল্টো, গল্প শুরুই হয়নি—ভূমিকা চলল এতক্ষণ। ভূমিকা কিছু ফলাও হয়ে গেছে, গল্প হবে সংক্ষেপে সারি।

সুখশান্তি না ঘোড়ার ডিম—বউ এসে যত ঝামেলা। আরম্ভেই মাস্তু উদ্বাস্তু। ঘর একখানা মাত্র। মাস্তুর খাটিয়ায় রেণুকা এসে চাপল। খেয়ে-দেয়ে মাস্তু হাটখোলার বেওয়ারিশ চালাঘরে গিয়ে শোয়। বিস্তর শিয়ালের উৎপাত সেখানে- মরামানুষ ভেবে এক রাত্রে খ্যাচ করে পায়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল। কামড়ে ঘুম ভাঙল। হাটের চালায় শোওয়া সেই থেকে বাতিল। খাওয়াটা কিন্তু উপাদেয় হচ্ছে—সোনামুগ খাইয়ে রেণুকা সেই পাগল করেছিল, নিত্য রাতে তারই হাতের এখন রকমারি রান্না। বাবুগঞ্জের হাটের খুব নামডাক বাজার ভাল [illegible] পড়ে মাস্তু এখন সারা হাট ঢুঁড়ে সকলের সেরা মাছ তরকারি কিনে এনে দেয়। 'পঞ্চ খাদ্য' অন্তে চোখ বোঁজে গিয়ে কোথায়, সেই দাঁড়িয়েছে সমস্যা। মামামশায় ভোলানাথের বাড়ি গিয়ে আপাতত শুচ্ছে, যে ঘরখানায় রেণুকা থাকত। অস্থায়ী ব্যবস্থা, জায়গা জুটলেই চলে যাবে— নতুন-কুটুম্বের বাড়ি কদ্দিন এমন থাকা যায় ?

অদ্ভুত ভাবে হঠাৎ সমস্যার সুরাহা হয়ে গেল। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, বলে যাকে

না—কত বড় সত্যি, হাতে হাতে দেখুন। এক রকম ডেকে নিয়েই শশীকে সরকারি চাকরি দিল সদরের উপর—খোদ এস-ডি-ও সাহেবের ঝকঝকে গাড়ি চালাবে সে লাইনের এই সব জবড়জং বাসের বদলে। মাইনে প্রায় ডবল এবং রবিবারে পুরো ছুটি। মাস্তু ছিল অ্যাসিস্টাণ্ট, এইবার সে ড্রাইভার হয়ে তাদের সেই লাইনের বাসের স্টিয়ারিং ধরে বসল। অ্যাসিস্টাণ্ট করে নিল হলধরকে—তার অনেক দিনের আশা। পুরনো বাসার ষোল-আনা দখলিকার এবারে মাস্তু—একলা মাস্তু। রেণুকা মামার-বাড়ি গিয়ে উঠেছে তার সেই আগের ঘরে। খায় অবশ্য আলাদা—রোজগেরে স্বামী থাকতে মামার অন্ন খেতে যাবে কেন? রবিবারে রবিবারে শশী আসে। মাস্তু যথাপূর্ব বাবুগঞ্জ থেকে হাট করে আনে এবং সন্ধ্যার পর এসে রেণুর হাতের রান্না খেয়ে খানিকটা গল্পগাছা করে বাসায় চলে যায়। সদরের উপর ঘর খুঁজছে শশী—জুত মতো একটা পেলেই রেণুকাকে নিয়ে যাবে।

অর্ধেক বছর কাবার হতে যায়, ঘর মেলে না। মফস্বল-শহরেও বস্তুটা এমন দুর্লভ, শশীর ধারণায় ছিল না। পছন্দসই একটা হয়তো মিলল, ভাড়া শুনে পিলে চমকে যায়। এতদিন যা হোক একরকম চলল—কিন্তু আর চলে না, মামামশায় বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রবিবারটা শশীকে বাড়ির উপর পেয়ে যান, তখন উঠতে তাগাদা বসতে তাগাদা। শশী বিরক্ত: বেকায়দায় পড়ে আছি না-হয় ঘর আটকে—ঘর তোমাদের গুলে খাচ্ছি না তো। পেলেই ছেড়ে দিয়ে যাব।

শ্যামল একদিন ফুটবল খেলতে সদরে গেছে। খেলার পর শশীর সঙ্গে দেখা করল। তাগাদা তার মুখেও। ভাবে-ভাবে নানান কথা বলল। যা পাচ্ছেন, সেখানেই এনে তুলুন তাড়াতাড়ি—ভাল ঘর পেলে ছেড়ে দিতে কতক্ষণ! মল্লিকপাশায় দিদিকে ফেলে রাখা মোটেই আর উচিত হচ্ছে না।

বাসা ঠিক হয়ে গেছে—শশী দুম করে বলে উঠল। শ্যামলের বিশ্বাস হয় না, বলে, সত্যি?

রবিবারে নিয়ে আসব, ঠিক করেছিলাম। ভেবে দেখছি, এখন যাওয়াই ভাল। জোর দিয়ে আবার বলে, এক্ষুনি যাব।

আকাশ মেঘান্ধকার। বাতাস নেই। শ্যামল অবাক হয়ে বলল, এই রাত্রে? বৃষ্টি তো নামল বলে।

শশী অবহেলায় উড়িয়ে দেয়: লাগবে কতক্ষণই বা! আমার বলা আছে, বাসা পাকাপাকি হলে হুট করে গিয়ে পড়ব। এখন যাওয়াই সুবিধে। সাহেবের গাড়ি নিয়ে চলে যাব—বারো মাইল পথ যাতায়াতে এক ঘণ্টাও লাগবে না,

আর গোছগাছ করতে না-হয় আরও এক ঘণ্টা। ফিরে এসে চুপিসারে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দেব—কাকপক্ষী টের পাবে না।

সত্যিই যাবে, তামাসা নয়। হোটেলে খেয়ে নিয়ে আরও খানিকটা রাত করে রওনা। জোরে বৃষ্টি নেমেছে তখন, সঙ্গে বাতাস। কোনদিকে কোথাও জনপ্রাণী নেই। চেয়েছে সে এই জিনিসই তো!

বৃষ্টির থামার লক্ষণ নেই। এক পশলা হয়ে সামান্য বিরতি, ডবল জোরে আবার ঝেঁপে আসে। কল কল করে জল গড়াচ্ছে রাস্তার উপর। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের চমক। বাড়ির কাছে তেঁতুলগাছ-তলায় মোটর রেখে শশী তড়াক করে দাওয়ায় উঠে প্রচণ্ড বেগে দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে: খোল, খোল শিগগির, ভিজে যাচ্ছি

শ্যামল উঠানের ওধারে গিয়ে বাপ-মাকে ডাকছে, ভাই স্বরূপকে ডেকে তুলল। ঘরে ঢুকেই শশী টর্চ টিপেছে। আন্দাজ ঠিকই—পিছন-দরজা খোলা, খুলে এই মাত্র যেন কেউ বেরিয়ে গেল, কপাট ঈষৎ নড়ছে এমনি মনে হয়। দেখেনি সে সত্যি কিছু, তবু ধাক্কা দিয়ে এলে, জলের মধ্যে চলে গেল—মানুষটা কে?

রেণুকা কম যায় না, তারও হাজির-জবাব: মানুষ কোথা দেখলে? কুকুর—খিল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, বাদলার মধ্যে নেড়িকুত্তা কখন ঢুকে পড়েছিল। তোমার দোর ঝাঁকাঝাঁকি আর চেঁচামিচিতে ভয় পেয়ে পালাল।

শশী আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। বাড়ির সকলে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে হাতে হাতে নিয়ে গাড়িতে তুলছে। বোঝা এমন-কিছু ভারী নয়—ট্রাঙ্ক তোষক বালিশ চাদর ইত্যাদি বিছানা এবং টুকিটাকি কিছু নতুন কেনা একটা। বাসনকোশন মামীর কাছ থেকে নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। ছুটি হবে কোন দিন সদরের বাসায় গিয়ে উঠবে—তাই নিতান্ত নইলে-নয় এমনি কটা জিনিস মাত্র কিনেছে। জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে মামা মামীর পায়ে প্রণাম করে নিশিরাত্রে তারা নতুন বাসায় রওনা দিল। শশী স্টার্ট দিয়েছে, পাশটিতে একেবারে তার গা ঘেঁষে প্রায় এক-দেহ হয়ে রেণুকা বসল।

ডালুকঘরা জঙ্গলের কাছে পরের দিন বউ ও যাবতীয় জিনিসপত্র পাওয়া গেল শুধুমাত্র শশী ছাড়া। ভুঁয়ের উপর রেণুকা মরে পড়ে আছে, গলায় সুস্পষ্ট আঙুলের দাগ। অনতিদূরে এস-ডি-ও সাহেবের ঝকঝকে গাড়ি—গাড়ির ভিতরের একটা জিনিসও খোয়া যায়নি। শশীরই কেবল নিশানা নেই। বলাবলি হচ্ছে, রাগের মাথায় বউকে মেরে সে দেশান্তরী হয়েছে।

আষাঢ় মাসে এই ব্যাপার। তারই মাস দেড়েক পরে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর রাত্রে আর এক দুর্ঘটনা—এই সেদিন কাগজে যে বৃত্তান্ত পড়লেন। কালীমন্দী-বাঁধের উপর থেকে বাস নদীর গর্ভে। করাল স্রোত অতবড় বাসটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে ত্রিমোহিনী অবধি নিয়ে ফেলল। জাঁতিকলে আবদ্ধ ইঁদুরের মতন মাস্তু-ড্রাইভার। একমাত্র সে—অ্যাসিস্টান্ট হলধর ছিল তার পাশটিতে, কিন্তু সর্বনাশের মুখে লাফিয়ে পড়ে সে বেঁচে গেল।

হলধর কিন্তু শতকণ্ঠে প্রতিবাদ করে: লাফায় নি সে, সম্বিতই ছিল না তার মোটে। শশীদা, মানে শশী ড্রাইভার, দেশান্তরী হয়েছে বলে যার নামে রটনা, জানলা দিয়ে সে-ই ছুঁড়ে দিয়েছিল। নরম বালুশয্যার উপর হলধর আলগোছে এসে পড়ল।

শশীকে দেখতে পেলে তখন?

হলধর ঘাড় নাড়ল—না, দেখেনি। কিন্তু চোখে নাই দেখুক, উঁচু করে তুলে ঐ যে ছুঁড়ে দেওয়া—এ জিনিস শশী ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে হতে পারে না। হলধরেরা চারজনে একবার কিশোর বয়সে গান শুনতে গিয়ে প্যাণ্ডেলে আগুন ধরে যায়, দলসুদ্ধ শশী ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ছোঁড়ার কায়দা এই দিনেও অবিকল সেই রকম।

হলধরকে নিয়ে চেপে বসলাম: যেমন যেমন হয়েছিল, আগাগোড়া বলো দিকি। গল্প লিখব। আমি বিশ্বাস করি না করি, পাঠকদের কেউ কেউ করতে পারে।

জন্মাষ্টমীর মেলার দরুন বাসে সেদিন তিলধারণের জায়গা ছিল না। প্যাসেঞ্জার রথতলায় সব নেমে খালি খালি করে দিয়ে গেল। মাস্তু যথারীতি ডিপোয় তুলতে যাচ্ছে। মাস্তুর পাশে হলধর। বেশি প্যাসেঞ্জার হলে এদেরও দু-পাঁচ টাকা উপরি লভ্য হয়—সে কারণে মন বড় খুশি। তড়বড় করে দুজনে রকমারি রসালাপ করতে করতে যাচ্ছে। মাস্তু হঠাৎ চুপ। হলধর কত কি বলে যাচ্ছে, মাস্তু রা কাড়ে না। হল কি তোমার মাস্তু-ভাই? জিজ্ঞাসার পরেও জবাব নেই। মাস্তুর দিকে তাকাল হলধর। আবছা আঁধারে দেখা যায় না ভাল। একনজরে মাস্তু সামনেটায় অত কি দেখে? চোখ বড় বড় হয়েছে তার, দৃষ্টি ভয়ার্ত। যাবে তো ডিপোয়—এই সামান্য একটু পথ, তার জন্য এত স্পীড দিচ্ছে কেন? আরে আরে—একেবারে উল্টোপথ ধরল যে—

হঠাৎ মাস্তু পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল: ঠেকা রে হলধর, ঠেকিয়ে দে। বেটার গায়ে অসুরের বল—একা আমি পেরে উঠছি নে।

কার কথা বলছ?

মাস্তু খিঁচিয়ে উঠল: দেখতে তো পাচ্ছিনে—সাতগুষ্টির নাম কেমন করে বলি? ব্রেক চেপে ধর্ প্রাণপণ শক্তিতে, আমার পায়ের উপর তুইও পা চাপিয়ে দে, হ্যাণ্ডব্রেক টেনে ধর্। ধাক্কা মেরে অ্যাকসিলেটর থেকে বেটার পা সরিয়ে দে। তাড়াতাড়ি। নয় তো রক্ষে রাখবে না—

হ্যাণ্ডব্রেক ধরতে গেছে হলধর, হাতের উপর অদৃশ্য আততায়ী দিল প্রচণ্ড থাবড়া। ঠিক এমনি থাবড়া মনে হচ্ছে আগেও খেয়েছে সে। হাত অসাড় হয়ে গেল, হ্যাণ্ডব্রেক টানবার জোর আর নেই।

পাগলা-হাতীর মতো ছুটতে ছুটতে বাস নদীর ধারে এসে পড়ল। করালস্রোত কালীমতী—বাঁধ বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে। একতলা সমান উঁচু দীর্ঘ বিসপিল কঠিন বাঁধ—এমন বাঁধও নদী এক একবার ভেঙে-চুরে চারিদিক ভাসিয়ে দেয়। বাস কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে উঁচু বাঁধে উঠছে। উঠেও গেল অবলীলাক্রমে। বেশ খানিকটা ছুটে বেড়াল বাঁধের উপরে। জানলা গলিয়ে হলধরকে ফেলে দিল হঠাৎ—ফেলে দেওয়া নয়, শুইয়ে দিল যেন ভিজেমাটির নরম শয্যায়। তারপর বাঁধের ওদিককার ঢালুতে পরম আলস্যে বাস যেন গা ঢেলে দিল। গড়াচ্ছে। গড় গড় করে তীরের বেগে নামতে নামতে ঝপাস করে নদীস্রোতে পড়ল। জলতলে অদৃশ্য।

ততক্ষণে হলধর বাঁধের উপর উঠে বসেছে। চোখের উপর সে সমস্ত দেখল। দু'দিন পরে ত্রিমোহিনীর বাঁকে বাসের খোঁজ হল। ড্রাইভারের সিটে মাস্তু মরে আছে। কে যেন আগাপাস্তলা পিটিয়ে হাড়গোড় চূর্ণ করে দিয়েছে তার।

নিজের মড়া নিজে পোড়ানো

ঘোর বর্ষা, ঝোড়ো বাতাস। চারিদিক মেঘান্ধকার। এ হেন দুর্যোগময় রাত্রে হরিবন্ধু সাহা হঠাৎ দেহ রাখলেন। পড়শিরা বিষম বিরক্ত: বিরাশি বছর বাঁচতে পারল বুড়ো—আর ঝড় বৃষ্টি থামবে, রাত পোহাবে, এইটুকু সময় সবুর করতে পারল না। ভরাব মধ্যে শুকনো কাঠকুটোর এখন কী করে জোগাড় হয়? আর কাঠ যতই দাও, ধারাবর্ষণে চিতার আগুনও বেশি টিকিয়ে রাখা যাবে না।

হরিবন্ধুর কৃতী পুত্র শহরে থাকে, ইনি গাঁয়ে পড়ে ছিলেন। ছেলের দোষ নেই। বাপকে শহরে গিয়ে থাকতে বলত, বার দুই-তিন টেনেহিঁচড়ে নিয়েও গেছে শহরে। হরিবন্ধু থাকতে পারেন না—অত সব পাকা-ঘরবাড়ি

বাঁধানো-রাস্তায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন তাঁর। এছাড়া গাঁ-গ্রামের বিষয়সম্পত্তির টানও রয়েছে মনে মনে। মোটের উপর শহরের বাসাবাড়িতে রাত্রে ঘুম হয় না, সারা দিনমানও কী করি কোথায় যাই—ছটফট করে বেড়াতেন। শেষের বার তো ছেলে-বউর সঙ্গে রীতিমত ঝগড় ঝাটি করেই চলে এলেন। সেই থেকে বাপকে নিয়ে আর তারা টানাটানি করত না।

বাড়িতে বোন সম্পর্কের নিঃসহায় এক বিধবা—নিস্তারের মা বলে সকলে। সে-ই রেঁধে-বেড়ে দেয়। আর একজন—গণেশ দাস আছে, সম্পত্তির দেখাশুনো করে, হাটবাজার করে দেয়। গণেশের বয়সও সত্তরের কাছাকাছি। হরিবন্ধুর সংসারে তিনি নিজে ছাড়া আর এই দু-জন—রক্তের সম্বন্ধ কারো সঙ্গেই নয়। এদেরই সহায় করে একমাত্র ছেলের সঙ্গে আলাদা হয়ে আমৃত্যু তিনি গ্রামে কাটিয়ে গেলেন। কপালের দুর্গ্রহ আর কাকে বলে!

বিপদের উপর বিপদ—গণেশও আজ হপ্তাখানেক ধরে জ্বরে শয্যাশায়ী। এরই মধ্যে হরিবন্ধু মারা গেলেন। মৃত্যুকালে মড়া বাইরে এনে নাম-শোনানোর বিধি—হরে-কৃষ্ণ হরে-রাম রাম-রাম হরে-হরে বলে কানের কাছে মুখ রেখে চেঁচায়। এই পুণ্যকর্মটুকুও হতে পারল না—অবিরাম বর্ষাধারার মধ্যে মড়া টেনে বের করার মতন লোকাভাব। যাই হোক, শেষ মুহূর্তে হরে-রাম ইত্যাদি না শোনানোর দরুন পরকালে কি দুর্গতি হবে জানা নেই, তবে ইহলোকের অন্তিম মুহূর্তে তুলোর তোশকের উপর বালিশ মাথায় কাঁথা-গায়ে হরিবন্ধু আরামেই মরতে পেরেছেন।

গণেশ গোমস্তা ধাঁইপাই জ্বরের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে কাপড়ের মুড়োয় মড়ার আপাদমস্তক ঢেকে দিল। নিস্তারের মাকে ছুঁয়ে বসতে বলে পাড়ায় লোক ডাকতে বেরুল সে। নানান অজুহাত—ঘোর বর্ষায় কেউ বেরুতে চায় না। গণেশ গোমস্তা শাসাচ্ছে: না বেরিয়ে কি চিরকাল বাঁচবে? তোমাদেরও দিন আসবে—দেখে নেব তখন। শহরে বাবুর কাছে তোমাদের রীতব্যাভার লিখে কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ ঠুকে নাস্তানাবুদ করা হবে।

ইত্যাকার নানাবিধ শাসানির পর শ্মশানবন্ধু আটটি জোটানো গেল। গেরো কত! শ্মশানঘাটা হরিবন্ধুর গ্রাম থেকে পাক্কা চার মাইল। এই এত পথ শুধুমাত্র মড়া নয়, মড়া পোড়ানোর কাঠ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অথচ মানুষ সর্বসাকুল্যে আট। কাঠের জন্য গরুর-গাড়ি নেওয়া যেত। কিন্তু রাস্তায় হাঁটুভর কাদা—বোঝাই গাড়ির চাকা কাদায় বসে যাবে, ঠেলেঠুলে চাকা তোলাই সঙ্কট হয়ে দাঁড়াবে তখন।

ভেবে-চিন্তে চিতার কাঠ বোঝায় বোঝায় ভাগ করে চারজনে বয়ে নিয়ে

চলল। অপর চারজন মড়ার দিকে। হরিবন্ধু রোগা-লিকলিকে মনুষেটি, একখণ্ড বাঁশের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, বাঁশের দুই প্রান্ত দুই শ্মশানবন্ধু কাঁধে তুলে নিল। তাই যথেষ্ট—হালকা মড়া নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে। কড়ি-কলসি কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে পিছন পিছন যাচ্ছে দু-জন—এদের কাঁধ খালি লাগলে ওরা এসে কাঁধ দেবে।

ঝুপ ঝুপ ঝুপ—বৃষ্টির বিরাম নেই। যত এগোচ্ছে—কী আশ্চর্য, মড়ার ভার ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। জলে ভিজে কাঠের ভার সামান্য বাড়লেও বাড়তে পারে—কিন্তু মড়া কেন? দু-জনে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাচ্ছিল—এখন আর পারছে না, পিছনের দুটিও এসে কাঁধ দিল। চার জনে নিয়ে যাচ্ছে—তা-ও অসাধ্য, মড়ার ওজন পাঁচ-সাত গুণ বেড়েছে, মালুম হচ্ছে। কাদার মধ্যে সব সুদ্ধ মুখ থুবড়ে না পড়ে!

উপায় কি এখন? পথের উপর ফেলে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় না। কাঠের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে দু-জন রাস্তার পগারে কাঠ ফেলে ভারমুক্ত হল। কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। কাঠ যতই থাক, এইরকম অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে চিতা জ্বালানো কোনক্রমে সম্ভব নয়। আগুন জ্বলবেই না - নিভে নিভে যাবে। মড়া সম্পূর্ণ পুড়বে না, খানিক খানিক ছ্যাকা হতে পারে বড় জোর। সেই কাজটুকুর জন্য কাঠ চার বোঝা না হয়ে দুই বোঝা, এমন কি এক বোঝা হলেও যথেষ্ট। দুটো কাঁধ এইভাবে খালি করে নিয়ে মড়া বইছে এবার ছয় জনে—এদিকে তিন, ওদিকে তিন। এবং বিস্তর কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শ্মশানঘাটে মড়া নামাল।

সামান্য যে দু-বোঝা কাঠ—নমো-নমো করে চিতা সাজাল তাই দিয়ে। ভিজে-কাঠ ধরতেই চায় না—অনেক কষ্টে ধরানো গেল। খোলা জায়গায় বৃষ্টির মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব—মড়া যদ্দুর পোড়ে পুড়ুক, গিয়ে ওরা অদূরের বাঁশতলায় আশ্রয় নিল। চিতাও সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়—আবার ধরানো চাট্টিখানি কথা নয়। লাভটাই বা কি? পোড়ানো যাবে না, খানিক খানিক ঝলসে গৌর অঙ্গের যত্রতত্র দগদগে ঘায়ের মতো হবে। সে বড় বিশ্রী। এ হেন দুর্বিপাকে আর দশটা মড়ার বেলা যা হয়ে হয়ে থাকে, এখানেও হোক তবে তাই। কুড়ালে বাঁশ কেটে চটপট কাপা বানিয়ে ফেলল গোটা ছয়েক। চিমটার মতো জিনিস—মড়া জলের নিচে চেপে চেপে কাপা আটকে দেয় সবদেহের উপর দিয়ে—কতকটা যেন পেরেক ঠুকে দেহ ভূমিলগ্ন করে রাখা, যাতে পচে ফুলে জলের উপরে ভেসে উঠে লোকচক্ষুর গোচরে না আসতে পারে।

মড়া জলে নামাচ্ছে। বলো হরি, হরিবোল—শ্মশানকৃত্যের শেষে যে

রকম হরিধ্বনি দেবার রীতি। বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়টা পর পর কয়েকবার। মৃত হরিবন্ধুর চোখ বোজা ছিল, চকিতে চোখ মেললেন তিনি—'হরিবন্ধু' নিজ নামের ডাক শুনেই যেন ধড়মড়িয়ে জাগলেন। চোখ দুটো বড় হচ্ছে—হতে হতে ক্রমশ বাতাবিলেবুর সাইজে এসে গেল। চোখের তারা যেন ক্রিকেট খেলার বল—অবিরত বিঘূর্ণিত হচ্ছে। একটিও দাঁত ছিল না, খুন্তির আকারের দাঁতে দু-মাড়ি এখন ঠাসা—দারুণ রাগে দন্ত কিড়িমিড়ি করছেন ৺হরিবন্ধু সাহা। ওরে বাবা, ওরে মা, রাম-রাম, জয় রাম—চেঁচাতে চেঁচাতে শ্মশানবন্ধুরা দে ছুট। আট জন আছে—কে কাকে ফেলে এগিয়ে ছুটিতে পারে! ছুটে গিয়ে সকলে গাঁয়ে উঠল—আর, দুর্যোগ নিশিরাত্রে চিতার কাষ্ঠশয্যায় স্বর্গীয় হরিবন্ধু শুয়ে পড়ে রইলেন।

না, শুয়ে ছিলেন না হরিবন্ধু—কুঞ্জ সর্দারের কথায় পরে জানা গেল। গৃহস্থ মানুষ কুঞ্জ, হরিবন্ধুর গাঁতির মধ্যে কিছু জমাজমি রাখে, সাতিশয় অনুগত প্রজা সে। বৈশাখের খরায় এবারে তার বড় তেঁতুলগাছটা মরে গেল। মরেই যখন গেছে, কাঠ কেটে গোয়ালের মাচা বোঝাই করে ফেলল—সারা বর্ষাকাল এখন মজাসে শুকনো কাঠ পোড়াচ্ছে।

শেষরাত্রি। বৃষ্টি ধরেছে, ভাঙা ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। গোয়ালে খুটখাট আওয়াজ। কুঞ্জর পাতলা ঘুম, ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ইদানীং এ-তল্লাটে চোরের উৎপাত—গরুচোর ঢুকে পড়েছে, কুঞ্জর সন্দেহ। দুর্জয় সাহসী মানুষ, বিছানার পাশে সড়কি রাখে, সড়কি উঁচিয়ে পা টিপে টিপে একাই সে গোয়ালে ঢুকে পড়ল। চুরি করছে গরু তো নয়—

হতবুদ্ধি কুঞ্জ সর্দার বলে, পেন্নাম হই সা'মশায়। রেতের বেলা গোয়াল-ঘরে কেন?

মুখে কথা নয়, হরিবন্ধু আঙুলে দেখালেন। পুরো এক গরুর-গাড়ির উপযুক্ত শুকনো তেঁতুল কাঠ মাচা থেকে পেড়ে গরুর-দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন—এখন মাথায় তুলে নেওয়ার উদ্যোগ।

কুঞ্জ শুধায়: কাঠ কি হবে সা'মশায়?

আমার চিতায় লাগবে—

অসংলগ্ন কথাবার্তা। হরিবন্ধুর সাংঘাতিক অসুখ, কুঞ্জর কানে এসেছে। শেষ অবধি পাগল হয়ে গেলেন নাকি তিনি—পাগল হয়ে খেয়াল মতন রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করল: অসুখ শুনেছিলাম—সেরে গেছে?

দেখতেছ তো পাচ্ছিস- খেঁকিয়ে উঠলেন হরিবন্ধু। পরক্ষণেই নরম হয়ে বললেন, মরে গেছি রে- মরলে কি আর অসুখ-বিসুখ থাকে?

অতিপ্রকাণ্ড সেই কাঠের বোঝা হালকা পালকের মতন হরিবন্ধু মাথায় তুলে নিলেন। বললেন, ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছিস কেন রে বেটা, দামের কথা ভাবছিস?

হা-হা, হা করে প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠলেন। আমগাছে কাকের বাসা। হাসিতে ভয় পেয়ে গিয়ে যত কাক কা কা করে মাথার উপর চক্কোর দিচ্ছে। হাসতে হাসতে হরিবন্ধু বললেন, বেঁচে থাকতে কাউকে ফাঁকি দিইনি, মরে গিয়েও দেবো না। কত হবে তোর কাঠের দাম?

দরাদরি করবে কি—কুঞ্জ সর্দার থরহরি কাঁপছে, জ্ঞান হারিয়ে ধুম করে পড়ে না যায়। হরিবন্ধু নিজেই তখন বলছেন, বাজার-দর টাকা পাঁচেক হতে পারে। তুই পনের টাকা নিয়ে নিস। গণেশের কাছে চাইলে দেয় কি না দেয়। ঘর কানাচে গাবগাছ আছে না, তারই দক্ষিণের গায়ে হাত খানেক খুঁড়লেই টাকার ঘটি পেয়ে যাবি। পনেরটি টাকা নিয়ে ঘটিসুদ্ধ গণেশকে দিয়ে দিস। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যেসব শ্মশানবন্ধু গিয়েছিল, তাদের ভাল করে মিষ্টি খাওয়ায় যেন।

বলে, ঐ তো আশি বছুরে বুড়ো তার উপর পাহাড়প্রমাণ বোঝা মাথায় — তা যেন উল্কার বেগে ছুটলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বলে যান, ঘটিসুদ্ধ মেরে দিসনে বেটা। খবরদার! তা হলে ঘাড় ভাঙব।

আট শ্মশানবন্ধু চিতায় মড়া রেখে পালিয়েছিল, খুব ভোরবেলা আবার তারা এসেছে। প্রবীণ মান্যগণ্য মানুষটা ঐভাবে পড়ে থাকলে শিয়ালে শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে—সে ভারি উৎকট। এরা যা করতে চেয়েছিল—কাদা দিয়ে জলতলে চেপে রাখা—এখনই সেটা সমাধা করে যাবে, মানুষজনের চলাচল শুরু হবার আগেই।

এসে তাজ্জব দেখল। ঘাটের সেই জায়গায় প্রকাণ্ড চিতা পুড়েজ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, ছাইয়ের গাদা রয়েছে। মড়া-হরিবন্ধুর চিহ্নমাত্র নেই— হাড় অবধি পুড়ে কয়লা।

বাঁশতলার দিকে আর একদল শবযাত্রী – তাদের কাছে কিছু হদিস পাওয়া গেল। শেষরাত্রে এসেছে তারা, এসে দেখল ঘাটের উপর দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে। অত কাঠ দিয়ে ঐ রকম সমারোহের চিতা রাজামহারাজারা মরলেও হয় না। এক বুড়ো লোক একাকী মস্তবড় বাঁশ হাতে চারিদিক ঘুরে ঘুরে আগুন খোঁচাচ্ছে, জোর আরো—আরো—যাতে বাড়ে। এত দূরে এই বাঁশতলা অবধি আগুনের হল্কা আসছে। হঠাৎ বুড়ো এদেরই চোখের সামনে লম্ফ দিয়ে সেই চিতার আগুনে পড়ল।

অথ লক্ষ্মীনারায়ণ-কথা

কলিকালে দেখা যাচ্ছে, ভক্ত বড় বেশি হয়ে পড়েছে। ডেকে ডেকে অস্থির করে তোলে। আর, কী সব দিন গিয়েছে সেকালে—কত কত শৌখিন মতলব আসত মাথায়! ক্ষীরোদসাগরে পদ্মপাতা পেতে নিয়ে তার উপরে অনন্তশয়ন, লক্ষ্মী কোমল হাতে পদসেবা করছেন···

সেই নারায়ণ শিলাভূত হয়ে আপাতত চৌধুরিদের অন্ধকার ভাঙাচোরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তা-ও কি রেহাই দেবে একদণ্ড?

প্রাচীন পরিবার চৌধুরিরা, অগুন্তি লোক, অবস্থা পড়ে গিয়েছে ইদানীং।

পুবের-কোঠা থেকে হঠাৎ কে ধমক দিয়ে ওঠে: নারায়ণ, নারায়ণ! আঁতুড়ের বউ ছুঁয়েছিলি, চানটান করবি নে? কী মেলেচ্ছ রে বাবা!

গলাটা মেজগিন্নির মতন। জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ।

নারায়ণ সন্ত্রস্ত: ম্লেচ্ছ কাকে বলছে? সকালের দিকে পাঁচ সাত জনে ঠাকুর-প্রণাম করে গেছে—ভেবে দেখলেন, বউও ছিল বটে দু-তিনটে। আঁতুড়ঘরের কোন্‌টা, বোঝেন কি করে তিনি? পাষাণদেহ নিয়ে স্নানেরই বা কী উপায় এখন?

মেজগিন্নি আবার বলেন, যা তুলসির জল ছিটিয়ে আয়। তার পরে খেতে বসবি।

সর্বরক্ষে! লক্ষ্য নারায়ণ ঠাকুর নন, বাড়ির কোন অবোধ ছেলে বা মেয়ে।

প্রায় তখনই পুঁটের মা রে-রে করে এসে পড়েন: বুকে-পিঠে তুলসি দিয়ে তোমার যে পুজো করলাম নারায়ণ ঠাকুর, পাঁচ-পাঁচটা পয়সা দক্ষিণে। ছেলে ফেল করে বাড়ি এল, কানা ঠাকুর একটিবার চোখ তুলে দেখলে না?

পুঁটে পড়াশুনো করবে না, আজেবাজে লিখে আসবে। তবে কি কর্তব্য হল, পুঁটের হয়ে পরীক্ষায় বসে ঠাকুর নির্ভুল উত্তর লিখে দেবেন?

মেজকর্তা বলাই চৌধুরি মশায়ের তেজারতি ও রাখি-মালের কারবার। তিনি স্বয়ং এলেন মন্দিরে। মাঝে মাঝে আসেন এমন। সঙ্গে যথারীতি একজন খাতক।

হ্যাণ্ডনোটে পঞ্চাশ টাকা কর্জ দিচ্ছি। সুদ লেখা রইল টাকায় এক আনা। লেখাজোখায় তার বেশি বে-আইনি। কিন্তু মুখে ঠিক রইল চার আনা। ঠাকুর নারায়ণ সাক্ষি রইলেন।

অনেক জরুরি ব্যাপারে নারায়ণকে এই রকম সাক্ষি থাকতে হয়।

যথা: নারায়ণ সাক্ষি। যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম—বলাইয়ের ভাই কানাই চৌধুরির মেয়ে সুচিত্রার বিয়ে। বিয়ের আসরে এই সময়টা গিয়ে বসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সম্ভব নয় বলে নারায়ণ উৎকর্ণ হয়ে মন্তর সমস্ত শুনে নিচ্ছেন।

পলক ফেলতেই দু-তিন বছর কেটে যায়।

সুচিত্রার বর এসেছে। দুজনে কোথায় গিয়েছিল, ফিরছে এখন মন্দিরের সামনে দিয়ে।

পানের দোক্তা দেবে না—বলি, বিয়ে করনি নারায়ণ সাক্ষি রেখে?

নারায়ণের মুখ শুকায়। গালিগালাজ শুরু হয়ে যায় এই বুঝি! বিয়ের মন্তরের মধ্যে পানের দোক্তা দেবার চুক্তি ছিল কি না, সঠিক মনে পড়ছে না। বুড়ো হয়ে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়েছে।

আবার ওদিকে বলাই চৌধু'রর টাকা শোধ দিয়ে গেছে হ্যাণ্ডনোটে লিখিত এক আনা সুদ হিসেব করে। বেশি একটা পয়সাও দিল না। বলাই মন্দিরে হামলা দিয়ে পড়েন: এত বড় অধর্ম! তোমার সামনেই তো কথা নারায়ণ। বলি, হাতপা-ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলে নাকি? মুখে রক্ত উঠে মরে না কেন খাতকটা? এমনি হলে লোকে আর ঠাকুর বলে মানবে কেন?

এক-কাঁসর পান্তাভাত মেরে পুরুতঠাকুর এসে পুজোয় বসলেন: এতে সচন্দনগন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ—

কলেজ-পড়া বউ তাপসীর উপর পুজো দেখাশুনোর ভার। সে হেসে বলে, চন্দন কোথা ঠাকুরমশায়? গন্ধপুষ্পই বা কই?

পুরুত বলেন, এদ্দিন ধরে পুজো করছি, ভারি তো করলেন ঠাকুর আমার! চন্দনে আর কাজ নেই। বেলপাতা আছে—গন্ধটন্ধ যা দরকার, ওই থেকে ঠাকুর শুঁকে নিন।

নারায়ণ ভেবে পান না, পুরুতের সঙ্গে কী রকম ব্যবস্থা করলে পুজোয় আবার ফুলচন্দন আসে।

একদিন রাত্রিবেলা ঘুমুচ্ছে বাড়ির লোকে। জন চারেক চোর ঢুকেছে। ফিসফিসিয়ে বলে, বাবুদের ঠাকুরবাড়ি। গড় করে যা।

সিঁদকাঠি নামিয়ে রেখে ভক্তিভরে তারা প্রণাম করে. ঠাকুর, ভাল রকম পাওনাগণ্ডা হয় যেন। কানাইবাবুর মেয়ে অনেক গয়না পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। আর কিছু নয়—গয়নার বাক্সটা দিয়ে দিও, তাতেই আমরা খুশি।

সিঁদ কেটেছে মাঝের-কোঠায়। ঘণ্টাখানেক পরে চলে যাচ্ছে। সোহার

সিঁদকাঠি নাচিয়ে বলে, এত করে মাথা খুঁড়ে গেলাম, তা দিলে এই ছেঁড়া মশারি আর পিতলের ঘটি ?

আর একজন বলে, ফুটো ঘটিতে তালি-আঁটা। কলির দেবতা, ওদের আর পদার্থ নেই।

যখন সিঁদকাঠি নাচাচ্ছিল, ভয়-ভয় করছিল নারায়ণের। দুর্জন লোক—দিল-বা এক ঘা বসিয়ে। অন্তর্যামী যদিচ, কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় সঠিক স্মরণ করতে পারেন না গয়নার বাক্সটা সুচিত্রা কোন্‌খানে রেখে দিয়েছে। তবে না-হয় অদৃশ্য হাতে বাক্সটা সরিয়ে সিঁদের মুখে রেখে দিতেন।

অহরহ এমন চলছে। এক বিপদ কাটে তো আর একটা। নারায়ণ উপায় খুঁজে পান না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। সব নারীই যেমন হয়। মন্দিরের কোটরে নারায়ণের সঙ্গে রাতদিন পড়ে থাকতে তিনি নারাজ। মাঝে মাঝে ত্রিভুবনে একটা করে চক্কর দিয়ে আসেন। এবারে ফিরে এসে চিন্তাকুল স্বামীর দিকে নজর পড়ল।

মুখপদ্ম এমন মলিন কেন প্রভু ?

নারায়ণ দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে শোনালেন।

লক্ষ্মী ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন কিছুক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁরও, কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহান্ত বিনে বয়স ধরা যায় না। দেখাচ্ছে তাঁকে অতি চমৎকার। বিহ্বল হয়ে বুড়ো নারায়ণ তাকিয়ে আছেন।

লক্ষ্মী বলেন, হয়েছে—

কি হল ?

অমন আর হাঁকডাক হবে না। শেষ করে দিচ্ছি।

কুবেরকে স্মরণ করলেন। কুবের এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

লক্ষ্মী বলেন, আমি নামেই শুধু লক্ষ্মী। ভাণ্ডারে কুলুপ এঁটে তুমি বসে আছ, ইচ্ছে হলে আমার কিছু করবার জো নেই।

কুবের বলেন, সে কি কথা! হুকুম হলে তক্ষুনি চাবি খুলে দেব। আমার কোন্ দায় বলুন।

চৌধুরিদের অগাধ বিত্ত ঢেলে দাও। আমার আদেশ।

যথা আজ্ঞা—বলে কুবের পুনশ্চ প্রণাম করে বিদায় হলেন।

তার পরে কী কাণ্ড! ছপ্পর ফুঁড়ে ঐশ্বর্য আসে চৌধুরিদের। বলাই চৌধুরি মশায়ের এবারে কী বুদ্ধি হল—যা-কিছু সম্পত্তি সমস্ত দিয়ে ধান কিনে গোলা বোঝাই করলেন। ধার-বাকি করেও কিনলেন। আর বর্ষার জল

একটু পড়তে না পড়তেই দেশব্যাপী বন্যা। এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ। পুলকিত চৌধুরি মশায় ব্লাকে সমস্ত ধান বেচে দিলেন তিনগুণ দামে।

পুঁটের মা একদিন গাঙের ঘাটে নাইতে গেছেন। ভাঁটার টানে একটা পুঁটলি ভেসে এসে গায়ে লাগে কোথাকার নোংরা আবর্জনা— সরে আর একদিকে গিয়ে ডুব দিচ্ছেন তো পুঁটলি ভেসে গেল সেখানেও। শক্ত জিনিস বলে ঠেকে, চৌকো সাইজ। ডাঙায় এনে পুঁটলি খুলে দেখেন, কারুকার্য-করা চন্দনকাঠের বাক্স। এবং পুলকিত দৃষ্টিতে দেখলেন, সোনার মোহরে ঠাসা সেই বাক্স।

এই চলল। চৌধুরিবাড়ির যে কেউ ছাইমুঠো ধরেছে তো সোনামুঠো হয়ে যায়। ফেঁপে ফুলে উঠলেন তাঁরা দেখতে দেখতে। ও-তল্লাটে এমন বড়লোক আর নেই।

পুরুতঠাকুর এসে শোনান: নারায়ণের দয়ায় সমস্ত হচ্ছে।

পুঁটের মা বলেন, আব আপনি তো এখনও সেই মুগের অঙ্কুর আর ছাঁচ-বাতাসায় ভোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। ও হবে না। মোটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি। ব্যাঙ্কে থাকবে। তার সুদ থেকে আপনি মেওয়া-মেঠাইএর ব্যবস্থা করবেন ঠাকুরমশায়।

নারায়ণ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলেন, শুনছ গো? ভোগের দুঃখ ঘুচে গেল এবার।

লক্ষ্মী হাসলেন একটু। জবাব দিলেন না।

মেজকর্তা দরাজভাবে বললেন, মন্দির মেরামত হবে—ঠিকাদার কাজে লাগবে কাল-পরশু থেকে। সামনে নতুন নাটমন্দির—অষ্টপ্রহর ভক্তদলের কীর্তন চলবে সেখানে। মণ্ডপের পাশে পুরুতঠাকুর মশায়ের কোয়ার্টার। অতদূর থেকে হেঁটে এসে হাঁসফাঁস করেন, মন্তরে মন থাকে না আর তখন।

নারায়ণ লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বলেন, এই সেরেছে। দুপুর আর সন্ধ্যায় পুরুত এখন দু-বার করে আসে। বাসা পেয়ে সগোষ্ঠি এসে উঠলে ঘণ্টা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করবে রাতদিন। তার উপরে ভক্তদের কীর্তনানন্দ। চোর তাড়িয়ে ডাকাতের পত্তন—এ তুমি কী করলে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী এবারেও হাসলেন।

শুভদিনে সপরিবারে পুরুত নতুন কোয়ার্টারে এসে উঠলেন। বাড়ির ভিতর থেকে এখন আর নৈবেদ্য আসে না। ব্যাঙ্ক থেকে সুদের টাকা তুলে মেওয়া মিষ্টান্ন সহ ষোড়শোপচারে আয়োজনের ভার পুরুতের উপর। হচ্ছেও তাই। আলোচাল-কলা ছাড়াও সন্দেশ-রসগোল্লা খেজুর-কিসমিস ইত্যাদি। সন্দেশ-

রসগোল্লা মাসখানেক আগে কিনে রেকাবিতে পরিপাটি করে সাজানো আছে। রেকাবিগুলো দুপুরে ও সন্ধ্যায় নিয়ে এসে বিগ্রহের সামনে রাখতে হয়। কি জানি, বাড়ির কোনো গিন্নি পুজোর সময় এসে পড়লেন-বা দৈবাৎ। খুঁত পেলে পুরুতের মুণ্ডপাত করবেন। তবে আসেন না ইদানীং কেউ। উদ্যোগ হয় না, সময়ও পান না। পুরুতেরও ক্রমশ আলস্য এসে যায়—সাজানো নৈবেদ্য বাসায় পড়ে থাকে, মন্দির অবধি বয়ে আনা ঘটে ওঠে না। নারায়ণের ভোগে আগে যাই-হোক মুগের অঙ্কুর ও ছাঁচ-বাতাসার অন্যথা হত না, এখন তুলসিপাতা বেলপাতা আম্রপল্লব ইত্যাদি পাতালতাই শুধু। নতুন নাটমণ্ডপে গোড়ার দিকে দু-পাঁচবার কীর্তন হয়েছিল। কিন্তু শ্রোতার অভাবে জমে না। কীর্তনীয়ারা খোল বাজিয়ে খুশি মতন গেয়ে বরাদ্দ দক্ষিণা নিয়ে চলে যেত। ইদানীং তা-ও বন্ধ। কড়িকাঠের ফোকরে চামচিকের বাসা।

সন্ধ্যার সময় পুঁটের মার পায়ে দাসী বাতের তেল মালিশ করছে। তাপসী বউকে দেখতে পেয়ে পুঁটের মা বললেন, নারায়ণের পুজো হচ্ছে তো ঠিকমতো ?

তাপসী বলে, টাকা খাচ্ছেন পুরুতমশায়—হবে না মানে ?

কই, আরতির ঘণ্টা আজকাল শুনতে পাই নে।

আপনারা বিন্তি খেলেন যে সেই সময়টা। আরতির ঘণ্টা কানে যাবে কেমন করে ?

কোন রকম উপদ্রব নেই, নির্বিঘ্ন শান্তি। নারায়ণ ভারি খুশি। লক্ষ্মীকে বললেন, বেড়ে হয়েছে। ক্ষীরোদসাগরে পদ্মপাতা পাততে বলো আবার। আর দশসেরি পটল একটা। বিস্তর ঝামেলা গেছে। পটল মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ি গে। তুমিও চলো লক্ষ্মী, পদতলে হাত বুলাবে।

স্বয়ংবরা

বিষম ফ্যাসাদ। দশ বিঘের চৌধুরিবাগান উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছে। কোথাও কিছু নেই, রাত পোহালে দেখা গেল—পাকা দালানটার ভিতরে এক বুড়া বিভোর হয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন, এদিকে ওদিকে পাঁচ-সাতটা নতুন চালা-ঘর, বাচ্চারা ট্যাঁ-ভ্যা করছে, তোলা-উনুনে আগুন দিয়েছে—ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী হয়ে, ঝিলের ঘাটে মেয়েরা বাসন মাজছে কাপড় কাচছে। যেন বাপ-পিতামহের সম্পত্তি—ইচ্ছামতো চিরকাল ভোগদখল করে আসছে এরা।

বিনয় খবরটা নিয়ে এলো। সে হল ম্যানেজার—হিসাব করলে চৌধুরিদের

সঙ্গে কিছু আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়ে। রণজিৎ চৌধুরি কতকগুলো দলিল বাছাবাছি করছিলেন, ভারি ব্যস্ত। মুখ তুলে তিনি ভ্রূকুটি করলেন: পুলিন ছোঁড়াটা কি করে? সে তো কাছেই থাকে। এত কাণ্ড হচ্ছে, থানায় গিয়ে খবরটা দিতে পারল না?

বিনয় বলে, কী জানি স্যার। গোড়ায় আমাদেরও কিছু বলে নি। উড়ো-কথা শুনে আমিই জিজ্ঞাসা করে বের করলাম। পুলিনও ঐ বাঙাল-দেশের মানুষ—

একটু হেসে বলে, মাইনে অল্প—এই সবেই ওদের রোজগার। কিছু পান-টান খেয়ে থাকবে, আবার কি!

রণজিৎ বলেন, যা করবার তুমি করো বিনয়। আমার সময় নেই। এখুনি ফের পাটনায় যাচ্ছি।

সকালবেলা তো এলেন—

কাগজপত্রগুলো নিতে। এমন অবস্থা, ছেলেমেয়েদের একটু চোখের-দেখা দেখব তার সময় হল না। রণ্টুর অসুখ করেছিল, নেবুতলায় গিয়ে দেখে এসো একবার। শাশুড়ি ঠাকরুনকে জিজ্ঞাসা করে যা যা দরকার, ব্যবস্থা কোরো। আর ইয়ে হয়েছে মীরা-বীরার কি কি বইয়ের দরকার ছোটবাবুকে বোলো, বইগুলো কিনে বোর্ডিং-এ যেন দিয়ে আসে।

দলিলপত্র ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটো নাকে মুখে গুঁজেই স্টেশনে ছুটবেন। বললেন, তুমি নিজে কাল বাগানে চলে যাও, পুলিসের ভরসায় থেকো না। গোলমালে কাজ নেই, মিষ্টিকথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে দেখগে। বিশ-পঞ্চাশ টাকা নিয়েও যদি আপসে চলে যায়, সে-ই ভালো। কোলিয়ারি নিয়ে ও'দিকে গণ্ডগোল— সকল দিকে মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে সামাল দেব কি করে?

অতএব পরের দিনই বিনয় বাগানে গিয়েছে। দালানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পাক চুল নাদুসনুদুস সেই বুড়া হাঁকডাক লাগালেন: আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। আপনি তো ম্যানেজার বাবু—পুলিন তাই বলছিল, খোদ ম্যানেজার আসছেন আজকে। কি করছিস ওরে বীণা মাদুর পেতে দিয়ে যা। ম্যানেজার বাবু পায়ের ধুলো দিয়েছেন, যাঁদের আশ্রয়ে আমরা এসে উঠেছি।

বীণা এসে রোয়াকের উপর মাদুর পেতে দিল। কুড়ি-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—দুধে-আলতায় রঙ বলে থাকে, সে বুঝি এমনিই। নাক-মুখ-চোখ বিধাতাপুরুষ প্রতিমার মতো ধরে ধরে গড়েছেন। আহা, রাজার ঘরে যাকে মানায়, সেই মেয়ে জঙ্গলপুরীতে এসে উঠেছে।

বিনয়ের কথা সরে না। মাদুর পেতে দিয়ে বীণা দালানের ভিতর ঢুকে গেছে, দৃষ্টি তবু দরজার দিকে। খানিক চুপচাপ থেকে শেষে বলে, বড়বাবু বড্ড চটেছেন।

কেন বাবা, চটবার কাজ কি করলাম?

এই যে না বলে-কয়ে আপনারা বাগানে এসে উঠেছেন—

ঘরবাড়ি মান-ইজ্জত সমস্ত ছেড়ে এসেছি। একেবারে বিনি-দোষে বাবা—কারো কাছে কোনো অন্যায় করিনি। বারো-ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি ঐ সোমত্ত মেয়ে নিয়ে। শেষটা একজন বলল, চৌধুরিদের বাগানে পাকা-দালান খালি পড়ে আছে। পাকা-দালানে দুয়োর এঁটে দিলে, আর যাই হোক, বেড়া কেটে চোর ঢোকার ভয়টা থাকে না। তা চলে যাব বাবা—মেয়ের বিয়ে যেদিন হয়ে যাবে তার পরের দিন দেখবে, বাগান তোমাদের খালি হয়ে গেছে। ঐ যত চালা দেখছ, সকলে আমার গাঁয়ের লোক— সবাই একসঙ্গে ফিরে যাব। ঘেন্না ধরে গেছে তোমাদের শহরের উপর।

একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, ঘোরাঘুরি বিস্তর হয়েছে বাবা। সেই যে বলে থাকে, বারো-উপোসি গেলেন তেরো-উপোসির বাড়ি—মানে, বারো দিন উপোস করে এক বাড়ি গিয়ে অতিথি হলাম, তারা দেখি তেরো দিন খায় নি আমাদের ঠিক সেই বৃত্তান্ত। চলেই যেতাম অ্যাদ্দিন, এখানে তোমাদের জ্বালাতন করতে আসতাম না—তা ঐ গলার কাঁটা মেয়ে, কাঁটা না উগরে যাই কেমন করে?

তারপর বিনয়কেই মধ্যস্থ মেনে বললেন, তুমি বলো না বাবা, মেয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়া কি ঠিক হবে? ভাল পাত্তোর মেলে না ও-দেশে, ভাল যারা ছিলে, প্রায়ই তো সব চলে এসেছ।

বিনয় সায় দেয়: তা সত্যি, ভাল পাত্তোর কোথায় ওদিকে? বিয়েথাওয়া দিয়েই তবে যাবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি। বড়বাবু, মনে হচ্ছে, এ মাসে আর ফিরছেন না। মাসের এই ক-টা দিনের মধ্যে শুভকাজ চুকিয়ে ফেলুন। ফিরে এসে যদি বাগান বেদখল দেখতে পান আমার চাকরি যাবে, আপনাদেরও আস্ত রাখবেন না তিনি।

বুড়া খপ করে বিনয়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন: তাহলে একটা ভাল সম্বন্ধ জুটিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কিছুই করতে হবে না তোমাদের—কথা দিচ্ছি, আপসে বাগান খালি করে দিয়ে যাব। হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মানুষ আমরা নই বাপু।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তার পর চিন্তান্বিত বিনয় ফিরে গেল।

দিন তিন-চার চলল এমনি। রণজিৎ ঠিক যেমনটা বলে গিয়েছেন—মিষ্টি কথায় বোঝাবুঝি হচ্ছে।

এরই মধ্যে বীণা একদিন পুলিনের বাসায় এসে পড়ল।

ও পুলিনদা, ম্যানেজার বিয়ে করতে চায় যে আমাকে। তিন-শ টাকা মাইনে পায়—চার মাসের মাইনে বাবাকে দিয়ে দিচ্ছে বিয়ের খরচপত্রের জন্য।

পুলিন বলে, ভালই তো। করো না বিয়ে।

এলুম-গেলুম হালুম-হুলুম ওদের কথা। মাগো মা—কথা শুনে হেসে খুন হই, বিয়ে করব কি গো?

হি-হি করে হেসে নিল খুব একচোট। সামলে নিয়ে অবশেষে বলে, এ কি বিপদ বাধালে তুমি ম্যানেজারটাকে লেলিয়ে দিয়ে!

পুলিন বলে, আমি কিছু জানি নে—আমার কি দায় পড়েছে বলো। বড়বাবু বলে গেছেন, সেইজন্যে আসা-যাওয়া করে। জবর-দখল কলোনি শুধু এই একটা হয় নি। এরা তড়পায়, ওরা তড়পায়—ফৌজদারি-দেওয়ানি রুজু হয়ে যায় আদালতে। এই চলে বছরের পর বছর। মালিকের লোক এসে ঝগড়াঝাটিই করে—ভাব জমাতে আসে, বিয়ে করতে আসে, প্রথম এই দেখছি রে বাবা!

কাঁদো-কাঁদো হয়ে বীণা বলে, টাকা ওড়াচ্ছে পুলিনদা। বাবাকে প্রায় পটিয়ে ফেলেছে।

পুলিন একটু ভেবে বলে, যেমন বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল হলে ঠিক জব্দ হবে। বড়বাবু নেই—ভালই হয়েছে, ছোটবাবুকে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎকে ধরল।

ছোটবাবু, বড়বাবু বাইরে। আপনিই তো আমাদের মাথা এখন।

ইন্দ্রজিৎ বড় খুশি। লোকজন কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করে না—বাড়ির পোষা বিড়ালটার যা খাতির, তার সেটুকুও নয়। এর জন্য সে মরমে মরে থাকে। দাদা অত্যন্ত রাশভারি, তিনি হাজির থাকতে বলাও চলে না কিছু।

ল্যাঙট-পরা, খালি-গা, সর্বাঙ্গে ধুলোমাটি মেখে দুটো থাবড়া মেরে ধুলো ঝেড়ে কতক পরিমাণ ভদ্র হয়ে সে বলে, কি হয়েছে?

পুলিন একটু ভূমিকা করে নেয়: ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবু। আমি বিল-সরকার, বিনয়বাবু হলেন ম্যানেজার—আমাদের উপরওয়ালা। কিন্তু মুখ দেখানোর উপায় রাখছেন না আর উনি। আপনি অবধি তাই আসতে হল।

অধীর কণ্ঠে ইন্দ্রজিৎ বলে, কি করেছে বিনয় বলো—

করেন নি এখনো। বাগানে উদ্বাস্তু এসে উঠেছে, বড়বাবু তাড়িয়ে দিতে বলে গেছেন—তা ম্যানেজার বাবু উলটে বিয়ে করে ফেলবেন তাদেরই একটা মেয়ে।

ঘুস খাচ্ছে। টাকা-পয়সা কোথায় পাবে উদ্বাস্তুরা, তাই মেয়ে ঘুস দিচ্ছে। ঘুস নিয়ে সমস্ত চাপা দিয়ে দেবে, সেইটে ভেবেছে বুঝি বিনয় ?

পালোয়ান মানুষ, গৌরচন্দ্রিকার ধার ধারে না, লহমার মধ্যে বিচার। বৈঠকখানায় ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: বিনয় কোথায় ? এদিকে শুনে যাও বিনয়।

পুলিন পিছুপিছু আসছিল—এক-ছুটে আড়ালে গিয়ে কান পাতে।

ইন্দ্রজিৎ বলে, বিয়ে করছ না কি তুমি ?

সহজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বিনয় বলে, হ্যাঁ—

উদ্বাস্তুদের এক মেয়ে ?

উদ্বাস্তু-সমিতির সভাপতি অশ্বিনী ধর মশায়ের মেয়ে।

ইন্দ্রজিৎ বলে, তুমি শুধুমাত্র কর্মচারী নও—আত্মীয়-সম্পর্ক আছে তোমার সঙ্গে। অজানা অচেনা যাকে-তাকে বিয়ে করে আনলেই হল। বিয়ের পুলক হয়েছে, তা মেয়ের কিছু অভাব আছে ? কত গণ্ডা চাই মেয়ে ?

বিনয় মৃদুকণ্ঠে বলে, বাজে লোক নন অশ্বিনীবাবু। সদ্বংশ, আমাদেরই স্বজাতি। ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি পশারপ্রতিপত্তি সমস্ত ছিল।

তবু হবে না বিয়ে। আমাদের বুকের উপর চেপে বসে দাড়ি ছিঁড়বার তালে আছে, তাদেরই সঙ্গে ভাব-সাব তোমার। কক্ষনো এসব হতে পারে না।

এবার একটু চটে গিয়ে বিনয় বলে, ভাব করতে হয়েছে বড়বাবুর হুকুমে। বড়বাবু বলে গেলেন, মামলা-মকদ্দমা না হয়—মিষ্টিকথায় সরিয়ে দিয়ে এসো। নয় তো, আমি কোন দিন গিয়ে থাকি আপনাদের বাগানের দিকে ?

তাই বলে দাদা বিয়ে করতে বলেছেন ?

নইলে কিছুতে ওঁরা সরবেন না। অশ্বিনীবাবু বলেছেন, যেদিন মেয়ের বিয়ে হবে তার পরের দিনই দেশেঘরে দলসুদ্ধ ফেরত যাবেন। সেখানে সমস্ত আছে, ভাল বরপাত্তোরের অভাব শুধু। কাজকর্ম ছেড়ে আমি এখন কোথায় পাত্তোর খুঁজে বেড়াব বলুন।

ইন্দ্রজিৎ বলে, পাত্তোর খুঁজতে হবে না তোমার, পাত্তোর হয়ে বরাসনেও বসতে হবে না। কক্ষনো আর ওমুখো হবে না—এই শেষকথা বলে দিলাম।

আর আমায় তো জানো ভাল করে। আমি ভার নিচ্ছি—যা করতে হয় আমিই সব করব। টুঁটি ধরে ধরে ঐ ক-টাকে রেল-রাস্তার ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে আসব। তেড়ে গিয়ে মামলা করবার তাগত থাকবে না—হাসপাতালে যেতে হবে।

আড়াল থেকে শুনে পুলিন প্রমাদ গণে। এ যে এক বিষম কাণ্ড বিনয়কে তাড়াতে গিয়ে। কাঁচাখেগো-দেবতা ক্ষেপে উঠেছে, একে সামলাবার উপায় কি?

জীপ হাঁকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বাগানে গিয়ে পড়ল। একা নয়, সঙ্গে বাছা-বাছা চারটি সাকরেদ। আরও সবাইকে বলে এসেছে, আখড়ায় হাজির থেকো, খবর হলে গিয়ে পড়বে।

বশিখানেক দূর থেকেই হাঁক পাড়ছে: অশ্বিনী ধর কোথায়?

তড়াক করে লাফিয়ে নামল জীপ থেকে। বুড়া অশ্বিনী ছুটে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ান: আসতে আজ্ঞা হোক ছোটবাবু। আপনার পায়ের ধুলো পাবে—বীণা তাই বলছিল। ওরে বীণা, চেয়ার বের করে দে রোয়াকের উপর। প্যান্টলুন-পরা ছোটবাবু মাদুরে বসতে পারবেন না।

ইন্দ্রজিৎ গর্জন করে ওঠে: বসবার জন্য আসি নি। মান থাকতে থাকতে আপসে চলে যাবেন কি না, জানতে চাই। না যান তো ওষুধ আছে। সে-ওষুধ কিছু সঙ্গে আছে, কিছু বাড়ি রেখে এসেছি।

বলে জীপের সঙ্গীগুলোকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সে কি কথা! আপসে নয় তো কি হাঙ্গামা করব? তেমন বাপের বেটা নই। সাত-পুরুষের হকের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এলাম—আর, এখানে কোন স্বত্ব আছে, কিসের বলে লড়ালড়ি করতে যাব?

বলতে বলতে অশ্বিনীর গলাটা ভিজে আসে। একবার গলাখাঁকারি দিয়ে মেয়েকে ডেকে বললেন, ওরে বীণা, পাঁচ কাপ চা করে দে বাবুদের। অত কাপ না থাকে, হরিদাসের বাড়ি থেকে নিয়ে আয়।

হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা রোয়াকে দিয়ে বীণা উঠান পার হয়ে হরিদাসের বাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রজিৎ, বসে পড়ল ঐ চেয়ারে।

কবে চলে যাচ্ছেন, ঠিক করে বলে দিন। পাকা কথা শুনে যাব।

অশ্বিনী বলেন, ঐ যে চলে গেল—আমার মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে

তার পরে একদিনও আর থাকব না। সোমত্ত মেয়ে কাঁধে নিয়ে ফিরে যাই কেমন করে বলুন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইন্দ্রজিৎ প্রাণধান করল যেন কথাটা। বলে, আসছে ভাল সম্বন্ধ কিছু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেছে একটা। আপনাদের ম্যানেজার বিনয়। অত্যন্ত সৎ ছেলে, বি এ. পাশ--

ইন্দ্রজিৎ খিঁচিয়ে ওঠে: বি এ পাশ বলে কপালে শিং উঠেছে নাকি ? কর্পোরেশনে ঝাড়ুদার চেয়েছিল—এক-শ বি. এ-র দরখাস্ত পড়ে গেল সেই চাকরির জন্ম।

অশ্বিনী বলেন, কিন্তু বিনয়ের তো ভাল চাকরি। তিন-শ টাকা করে দিচ্ছেন আপনারা বলছে, আরও ঢের উন্নতি হবে।

তিন-শ কি কত ঠিক বলতে পারি নে। দাদা জানেন। হলই-বা তিন-শ —একটা লোকেরই চলে না ও-টাকায়। এই ধরুন, তিরিশ দিনে সের ত্রিশেক মাংস—তাতেই লেগে গেল প্রায় সারা মাসের মাইনে। কি [illegible] বিয়ে করবার শখ হয় আবার মানুষের !

অশ্বিনী চমক খেয়ে বললেন, সর্বনাশ, অত শত ভেবে দেখি নি তো! উদ্বাস্তু মানুষ এখানকার হিসেব-পত্তোর মাথায় ঢোকে না ছোটবাবু। মেয়েটি তো দেখলেন, নিজের মেয়ের সম্বন্ধে জাঁক করে কিছু বলব না—

কথাবার্তার মধ্যে বীণা চা নিয়ে এসেছে। অশ্বিনী তার পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, দাঁড়িয়ে যা একটুখানি মা। এই দেখুন মেয়ে। রাজার ঘরে মানায় কিনা, বলুন আপনারা। আপনি বড্ড ভয় ধরিয়ে দিলেন ছোটবাবু। এই সোনার পদ্ম না খেয়ে মারা যাবে যার তার হাতে পড়ে ?

বীণা মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা হল। রাত্রি পহরখানেক হতে অবশেষে ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল। অশ্বিনী আবার বলেন, কি করব ছোটবাবু, আমি যে নিরুপায়। জেনেশুনেও হয়তো শেষ পর্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে। ঐ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ তো দেখি নে। আপনারাও বাগান ছেড়ে চলে যাবার জন্ম তাড়া দিচ্ছেন।

ইন্দ্রজিৎ বলে, তার চেয়ে মেয়েটাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েই চলে যান না। তাড়া দিচ্ছি বলেই যে ছুটে পালাতে হবে তার কোনো মানে আছে ? আচ্ছা, দেখি আমি একটু ভেবেচিন্তে—ভাল পাত্তোর কেউ মনে আসে কি না।

ভাবনাচিন্তা ইন্দ্রজিৎ অনেক করেছে, চিন্তার চোটে সে রাত্রি ঘুমুতে পারল না। ভোরে উঠে ডনবৈঠক করে—সে সব আজ বাদ পড়ে গেল জীপের পরোয়া করে নি—খানিক পথ বাসে চড়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে বাগানে এসে উপস্থিত। চোখ মুছতে মুছতে অশ্বিনী ধর বেরিয়ে এলেন।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম ধর মশায়—

বীণা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, এটা কি হল পুলিনদা? চোর তাড়িয়ে ডাকাত পত্তন, বিড়াল তাড়িয়ে বাঘ? ছোটবাবু সবুর মানছে না—বলে, মাসের এই ক টা দিনের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে

পুলিন বলে, কত বড়লোক, জান? গোটা সাতেক কোলিয়ারি, কলকাতায় বাড়ি চারখানা। এই বাগানবাড়ির মালিক দু-ভাই ওরা বাগানটা বড্ড পছন্দ তোমার—তা বিয়ে হয়ে গেলে তুমিই আটআনা হিস্যার মালিক হয়ে বসবে।

বীণা বলে, রক্ষে করো। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল—যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে, বুকের মধ্যে গুরগুর করছিল আমার। বিয়ে করে ভালবাসার কথা বলবে—তোমরা ছুটে এসে পড়বে, দাঙ্গা বেধে গেছে বলে। ভালবেসে একখানা হাত যদি ধরে তো গেছি আমি, মটমট করে হাড় চুরমার হয়ে যাবে।

পুলিন বিব্রত ভাবে বলল, এ তো ভারি ফ্যাসাদ। বর পছন্দ হয় না কিছুতে তোমার। ভাবিয়ে তুললে।

বীণা বলে, বিদেয় করো—কায়দা বের করো একটা কিছু। আবার তাও ভাবছি, এ তোমার রোগা-পটকা বিনয়বাবু নয়। রেগে গিয়ে ঘুসি টুসি যদি ঝাড়ে, তোমার তো নিশানা পাওয়া যাবে না পুলিনদা

পুলিন ভেবে বলে, কোম্পানির মধ্যে এক বড়বাবু আছেন, তিনিই শুধু ও-লোককে সামলাতে পারেন। এদিকে এত প্রতাপ দেখতে পাও, কিন্তু বড়বাবুর সামনে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ে যায় বড়বাবু এ মাসটা পাটনায় থাকবেন, সেই ফাঁকে বিয়ের কাজ চুকিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। একবার হয়ে গেলে তার পরে আর রদ হবে না তো!

চৌধুরি-বাড়ি গিয়ে পুলিন চুপিচুপি বিনয়কে খবরটা দিল: ছোটবাবুর যে বিয়ে! বাগানবাড়ি ধুমধাড়াক্কা পড়ে গেছে। বড়বাবুকে জানানো উচিত। নয়তো তিনি দুঃখ করবেন, আমাদের উপরে দোষ পড়বে। ভাই না হয় লজ্জায় লিখতে পারে নি, তোমরা সব ছিলে কি করতে?

বিনয়েরও ঠিক সেই মত। পাটনায় চিঠি চলে গেল। রণজিতের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে যেন। চিঠি হাতে নিশ্চল হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই কখনো হতে পারে? একটিমাত্র ভাই—কত সাধবাসনা তাকে নিয়ে! বিয়ের নামে বরাবর তেরিয়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ এমন সুমতিই যদি হয়ে থাকে, কত ভাল ভাল সম্বন্ধ রয়েছে—ইটেভিটে-শূন্য মানুষের জামাই হতে যাবে সে কোন দুঃখে?

মামলায় শনিবারের দিনটা সাবকাশ মিলল বিস্তর কষ্টে। রবিবার তো এমনই ছুটি। রণজিৎ চৌধুরি কলকাতা ছুটলেন। বাড়িতে পা দিয়েই ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

বিয়ে হচ্ছে, শুনতে পেলাম?

মেজেয় দৃষ্টি নামিয়ে অস্পষ্ট গলায় ইন্দ্রজিৎ বলে, আজ্ঞে—

আমার ভাইয়ের বিয়ের আমি কিছু জানতে পারি না—এ বিয়ের মাতব্বরটা কে, জিজ্ঞাসা করি?

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে থাকে।

নাম বলো, কে ঘটকালি করছে? পাটনায় নতুন এই জুতোজোড়া কিনেছি—জুতো ছিঁড়ব তার পিঠে। বলো।

ইন্দ্রজিৎ বলে, ঘটক এর মধ্যে নেই দাদা। দলবল নিয়ে বাগানে গেলাম ওঁদের উচ্ছেদ করে আসব বলে—

তার বদলে বিয়ের ঠিকঠাক করে এলে?

কি করব? কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে পড়েছেন, বড্ড ধরাধরি করতে লাগলেন অশ্বিনী ধর মশায়—

আরও লোক রয়েছে, তারাও ধরাধরি করছে—আজ নয়, দু-বছর ধরে। ঝামাপুকুরের দে সরকাররা। শুধু-হাতের ধরাধরি নয়, এক-শ ভরি সোনা দুই সেট জড়োয়া নগদ রুপেয়া বিশ হাজার—

ইন্দ্রজিৎ মরীয়া হয়ে বলে, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। দিনক্ষণও এক রকম স্থির।

রণজিৎ বলেন, কথা আমারও দেওয়া। ঝামাপুকুরদের বলা আছে, ভাই যদি কখনো বিয়েয় মত দেয় ওখানেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ নিঃশব্দে হাতের গুলি দেখছে। রণজিৎ আরো উত্তেজিত হলেন।

জবাব দিতে হবে তোমায়। দুই জনে আমরা কথা দিয়ে বসে আছি—কার কথা থাকবে? তোমার না তোমার বড়ভাইয়ের? কে সংসারের কর্তা? বিয়ের কথাবার্তা বলবার কার এক্তিয়ার?

আজ্ঞে, আপনার—

তা হলে আমার হুকুম রইল, বাগানমুখো কদাপি আর যাবে না। আমি বুঝব ঐ অশ্বিনী ধরের সঙ্গে। শয়তান লোক, নিজে তো বাগানবাড়ি চেপে বসেছে—আবার মেয়ে ঠেলে দিচ্ছে, সেই মেয়ে আমার বসতবাড়িতে বউ হয়ে চাপবে। ভেবেছিলাম মিঠে কথাবার্তায় সরিয়ে দেব। তা এত যখন চালাকি, নিজ-মূর্তি তবে ধরতে হল। আমার একটা মুখের কথা পেলে থানা সুদ্ধ হামলা দিয়ে পড়বে। হোক তবে তাই।

পুলিন লুকিয়ে শুনে গেল। শুষ্কমুখে অশ্বিনীর কাছে গিয়ে বলে, বড়বাবু আসছেন পুলিস সঙ্গে করে। থানায় ওঁর বড্ড খাতির। এস্পার ওস্পার করে তবে যাবেন।

অশ্বিনী ভয় পান না, কলরব করে উঠলেন: খোদ রণজিৎ চৌধুরি আসছেন—বল কি হে পুলিন। রোয়াকের উপর তবে তো একটা চৌকি পেতে রাখতে হয়। এসো, ধরাধরি করে নিয়ে আসি ঘরের ভিতর থেকে। সন্দেশ রসগোল্লা কিনে রাখতে হবে। আর একটা গড়াগড়া কোথায় পাই, বলো দিকি ?

আগে-পিছে কনস্টেবল ও কয়েকটা পশ্চিমা দরোয়ান নিয়ে হুড়দাড় করে রণজিৎ বাগানে ঢুকলেন। অশ্বিনী গেট অবধি এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আসুন বড়বাবু। আপন-ঘরবাড়ি ছেড়ে এখন আপনার আশ্রয়ে কোনো গতিকে বেঁচে আছি—এতদিনে তবু যা-হোক একবার পদধূলি পড়ল।

পোকামাকড়ের দিকে যেমন তাকায়, রণজিৎ তেমনি দৃষ্টিতে এক নজর দেখলেন। কানেই গেল না যেন কোন কথা—দারোয়ানদের দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলেন: হাঁড়িকুড়ি কাঁথা-মাদুর ছুঁড়ে ফেলে দেবে, উনুন ভাঙবে, মানুষ একটা একটা করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গেট পার করে দেবে।

অশ্বিনী বলেন, ঘাড় ধরতে দিলাম আর কি।

রণজিৎ হুঙ্কার দিলেন, দেবেন না ? জোরজার করবেন ? কার কত জোর দেখা যাক।

অশ্বিনী হেসে উঠে বলেন, এই দেখুন, তাই বুঝি বলছি ? পালিয়ে যাব ঘাড় ধরবার আগে। ঐ কাজটা খুব রপ্ত হয়ে গেছে বড়বাবু এই ক-বছরে। বোঁচকাবিড়ে কাঁধে নিয়ে ছেলেপুলের হাত ধরে এখান থেকে তাড়া খেলাম তো ওখানে পালাই। ওখানে তাড়া খেলাম তো আবার অন্য দিকে।

হা-হা করে হাসতে লাগলেন বুড়ামানুষ। কথাবার্তা হতে হতে দালানের

সামনে এসে গেছেন। চৌকির উপরে সতরঞ্চি-তোশক-তাকিয়ায় দিব্যি ফরাস পাতা। সেই দিকে ডান-হাত বাড়িয়ে দিয়ে অশ্বিনী বলেন, বসতে আজ্ঞা হোক বড়বাবু।

রণজিৎ ঘাড় নাড়লেন: বসতে আসি নি গদিয়ান হয়ে। গোলমাল না করতে চান তো এক্ষুনি আমাদের চোখের সামনে চলে যেতে হবে। এই মুহূর্তে। আজ হবে না, কাল—ওসব শোনাশুনি নেই।

অশ্বিনী কাতর হয়ে বলেন, তা বসে বসেই হোক না কথা। যেমন হুকুম করবেন, ঠিক তাই হবে। বলেন তো এক্ষুনি যাব। ওরে বীণা, কলকেটায় আগুন দিয়ে যা। আর চা-টা কি আছে তোদের, নিয়ে আয়।

এত কথার পরে ফরাসে একটু অঙ্গ না ঠেকিয়ে পারা যায় না। বসতে বসতে রণজিৎ বললেন, চা লাগবে না। যে কাজে এসেছি এখানে—

কিন্তু বলছেন কাকে? দুটো মাদুর হাতে নিয়ে অশ্বিনী ইতিমধ্যে দরোয়ান-কনস্টেবলদের দিকে নেমে গেছেন। আমতলায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলছেন, একটু বসতে দেব বাবাসকল—বাড়ির মধ্যে সে জায়গা নেই। তোমাদের বড্ড কষ্ট হয়েছে, ছায়ায় বসে জিরিয়ে নাও।

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে দিলেন। বলেন, বোসো বাবারা। চা দিয়ে যাচ্ছে। বড়বাবু ব্যস্ত হচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলি ওদিকে।

ফুঁ দিতে দিতে বীণা গড়গড়ার মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ফরসা মুখ আগুনের আভায় গোলাপি দেখাচ্ছে। অশ্বিনী ফিরে এসে গরুড়পক্ষীর মতন উবু হয়ে নিচে বসতে যাচ্ছেন—ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রণজিৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, নিচে কেন, ফরাসের উপর উঠে বসুন।

জিভ কেটে অশ্বিনী বলেন, সে কি কথা, আপনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারি?

কেন পারবেন না—আপনি মানুষ নন? নিজেকে অত ছোট ভাবেন কি জন্য?

এর পরে অশ্বিনী আর নিচে না বসে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন।

রণজিৎ বলেন, ঐ মেয়ে আপনার? মেয়ের বিয়ে না দিয়ে যাবেন না এখান থেকে?

জোর করে বলবার তো উপায় নেই হুজুর। আপনার জায়গা-জমি—আপনি যদি সদয় হয়ে আরও ক-টা দিন মঞ্জুর করেন।

সম্বন্ধ এলো কিছু?

ছোটবাবুই বলছিলেন যে—

রণজিৎ রায় দিলেন : হবে না। ছোটবাবুর গার্জেন আমি। ঝামাপুকুরে কথা দিয়ে বসে আছি।

অশ্বিনী বলেন, তার আগে আপনার ম্যানেজার বিনয়বাবুর সঙ্গে এক রকম ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল।

হবে না। বিনয়ের মনিব আমি। ছত্রিশগড়ে নতুন কোলিয়ারি কিনছি, সেইখানে ওকে পাঠাব। এ সনদটা বিয়ের তালে গেলে ওর চাকরি থাকবে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রণজিৎ প্রশ্ন করেন, আর কোথাও?

আজ্ঞে না। আর তো দেখছি নে আপাতত।

রণজিৎ গম্ভীর ভাবে আরও কিছুক্ষণ গড়গড়ার ধোঁয়া ছাড়লেন।

মেয়েটি কেমন?

নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কি বলব, ঐ তো চোখেই দেখলেন হুজুর।

চোখে দেখার ব্যাপার নয়। বলুন, রীত-প্রকৃতি কেমন? হিংসুটে কুঁচুটে নয় তো? ঝগড়া করবে না? নাকে কাঁদবে না কথায় কথায়?

অশ্বিনী গড়গড় করে এক রাশ পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন। রণজিৎ তাড়া দিয়ে উঠলেন, হাঁ কিংবা না বলুন। অত শোনবার সময় নেই।

আজ্ঞে না, ওসব কিছুই করবে না।

রণজিৎ বলেন, শুনুন, দশ বছর আমার গৃহশূন্য। বিয়ে করি নি বিমাতা এসে ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেবে বলে। এখন তারা বড় হয়ে উঠেছে। কোলের ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যায়, নেবুতলায় আমার শাশুড়ির কাছে সেই ছেলে মানুষ হচ্ছে। মেয়ে দুটো বোর্ডিং-এ থেকে পড়ে—বড়টির থার্ড ইয়ার, ছোটটি আই-এস সি দিচ্ছে এবারে। তাই ভাবছি, আপনার মেয়ের রীত প্রকৃতি সত্যি সত্যি যদি ভাল হয়—এখন বিয়ে করলে বোধহয় দোষের হবে না।

অশ্বিনী গদগদ হয়ে উঠলেন : পরম সৌভাগ্য আমার বীণার।

বলতে পারেন যে বয়স হয়েছে—

আরে সর্বনাশ, কার ঘাড়ে কটা মাথা যে আপনার বয়সের কথা বলতে যাবে?

রণজিৎ মৃদু হেসে বলেন, অবিশ্যি চেহারা দেখে কেউ তা বলবে না। খাড়া হয়ে পথ চলি, একটা দাঁত পড়ে নি। চুল নেই—কাজেই পাকা চুলের কথা ওঠে না। তবু বয়সের কথাটা ভাবতে হবে বই কি! যদি মরে যাই—একটা বাড়ি তাই আপনার মেয়েকে দানপত্র করে দেব। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই।

উঃ, বিবেচনা কত দূর! স্ত্রীর ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে। সাধে কি আপনি দেশবিখ্যাত হয়েছেন বড়বাবু!

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে রণজিৎ বলেন, রস্থন, আরো আছে। বিয়ে কিন্তু কালই দিতে হবে। তড়িঘড়ি কাজ আমার।

অশ্বিনী অবাক হয়ে বলেন, শুভকর্মে দিনক্ষণ লাগে। পাঁজিতে যদি দিন না থাকে—

গোধূলিলগ্নে হবে। গোধূলিতে হলে দিন লাগে না। পরশু সোমবার পাটনা হাইকোর্টে মকদ্দমা। মন্তোর ক-টা পড়েই স্টেশনে ছুটব। ছোট-ভাই, ম্যানেজার সবাই তো দেখছি ঘোরাঘুরি করে গেছে। পাটনায় চলে গেলে আবার তারা পাকচক্কোর না মারে, সেটা একেবারে শেষ করে রেখে যেতে চাই।

তবু অশ্বিনী ইতস্তত করেন: একটা দিনের মধ্যে যোগাড়যন্তোর হয়ে উঠবে কি? বিয়েথাওয়ার ব্যাপার, বুঝতে পারছেন।

টাকা থাকলে কলকাতা শহরে এক ঘণ্টায় বাঘের দুধের যোগাড় হয়ে যায় মশায়। সেই টাকাই পাবেন। সকালবেলা হাজার চারেক নিয়ে আসব, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমি যোগাড়যন্তোর করব। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই—আপনারা বাগানের এই কয়েক ঘর মানুষ। হাজার খানেকের মধ্যে এদিক-কার সব মিটে যাবে। বাকি টাকা আপনার। আর শ্বশুর হয়ে গেলে তখন উদ্বাস্তু রইলেন না—কুটুম্ব হলেন। কাজেই এই বাগানে থেকে যেতে পারবেন—নড়াচড়ার আবশ্যক হবে না। আপত্তি নেই, কেমন?

খুশিতে ডগমগ হয়ে অশ্বিনী বলেন, আজ্ঞে না—

রণজিৎ চটে উঠলেন: জামাইকে কেউ আজ্ঞে বলে না। বলুন—না, বাবাজি।

থতমত খেয়ে অশ্বিনী বলেন, সে তো বটেই। কিন্তু এত বড়লোক আপনি—এক দিনে হবে না, সইয়ে নিতে হবে। কন্যা-সম্প্রদানের পর মুখ দিয়ে বাবাজি বেরুবে।

এই যে কথাবার্তা হয়ে গেল, ঘুণাক্ষরে কারো কানে না যায়। ভাই বলুন, ম্যানেজার বলুন—কাউকে নয়। পুলিন কাছাকছি থাকে, তাকে হয়তো পারা যাবে না—কিন্তু আগে-ভাগে বরের নাম চাউর করে বলবেন না। শুভকাজে বাগড়া অনেক। কাজ চুকে গেলে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবেন। তখন আর পরোয়া নেই।

যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী ঘাড় নোয়ালেন।

কিন্তু একজন তো সঙ্গে সঙ্গেই শুনে ফেলল বাগানের ভিতর থেকে। পুলিনের বাসায় গিয়ে মুখ অন্ধকার করে বীণা বলে, ও পুলিনদা, সর্বনাশ হয়ে গেল। কাল আমার বিয়ে।

ভালই তো! ধর মশায়ের দায় উদ্ধার হল। শেষ পর্যন্ত বর কে দাঁড়াল শুনি? ইন্দ্রজিৎ না বিনয়?

ওরা কেউ নয়। তোমাদের বড়বাবু। রণজিৎ চৌধুরি।

পুলিন অবাক হয়ে যায়: বল কি গো? দশ বছর বউঠাকরুন গত হয়েছেন। এই দশ বছর মাসে গড়পড়তা একটা করে ধরলেও বারো দশকে এক-শ কুড়িটা সম্বন্ধ এসেছে। কাউকে আমল না দিয়ে বড়বাবু অ্যাদ্দিন তবে তোমারই জন্যে বসে ছিলেন। কপাল বটে তোমার বীণাপাণি!

হি-হি করে হাসতে লাগল। বীণা তাড়া দিয়ে ওঠে: দাঁত বের করে হেসো না অমন। গা জ্বালা করে। এখন কি করবে, সেইটে ভাবো। ঠেকাও বড়বাবুকে।

পুলিন হতাশ হয়ে বলে, কী মুশকিল! ম্যানেজার ঠেকালাম ছোটবাবুকে দিয়ে, ছোটবাবু ঠেকালাম বড়বাবুকে দিয়ে। বড়বাবুর উপরে আর নেই। এ বরও পছন্দ নয় তোমার? রাজার ঐশ্বর্য, দেশময় নামডাক—

মুখ বাঁকিয়ে তেমনি সুরে বীণা বলে, মাথাজোড়া টাক। কনে-পিঁড়িতে কিছুতে বসব না, এই বলে দিলাম। তার আগে ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে মরব।

বলে ফরফর করে বীণা চলে গেল। গতিক দেখে পুলিন চিন্তিত হয়েছে। বিশেষ করে ঝিলের ভয় ঐ যে দেখিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে সে চৌধুরি-বাড়ি গেছে। বিনয়ের কাছে গিয়ে বলে, একটা কথা ম্যানেজার বাবু। বড়বাবু ছোটবাবু দুজনেই আমাদের মনিব— উভয়ের নুন খাই। ঠিক কিনা বলুন।

বিনয় খবরের কাগজ পড়ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ—

ছোটবাবুর বিয়ের কথা যেমন বড়বাবুকে জানিয়েছিলাম, বড়বাবুর বিয়েও তেমনি ছোটবাবুকে বলতে হয়। নয় তো বলবেন, একচোখো কর্মচারী।

কাগজ ফেলে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিনয় বলে, বড়বাবুর বিয়ে হচ্ছে নাকি? কোথায় হচ্ছে—কবে?

বৃত্তান্ত শুনে বিনয় নিশ্বাস ফেলল: আমাদের সময়ে কুল-শীল গাঁইগোত্তোর গোল্লায় যাচ্ছিল। দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখল মানবের বেলা। ওঁরা দেবতাগোঁসাই, ওঁদের কিছুতে দোষ নেই। কিন্তু এমন আনন্দের ব্যাপার

কাকপক্ষীকে জানতে দিচ্ছেন না। আমরা না-হয় বাইরের লোক, গোলাম-বরদার—নিতান্ত আপন যাঁরা, তাঁদের মনের অবস্থা কি হবে?

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ইন্দ্রজিৎকে এক পাশে ডেকে বলে, বড়বাবুর বিয়ে আজকেই—গোধূলিলগ্নে। কিন্তু ধরে নিন, কেউ আমরা কিছু জানি নে। এ খবর মুখাগ্রে যদি আনেন, ঘাড়ের উপর আমার মুণ্ডু থাকবে না।

ইন্দ্রজিৎ একটুখানি ভেবে নিয়ে অভয় দিল: আমায় পর্যন্ত বলেন নি দাদা—আমি নিজেই যখন জানি নে, কাকে কি বলতে যাব? নিশ্চিন্ত থাক ম্যানেজার।

সেখান থেকে বিনয় নেবুতলা ছুটল। রণজিতের শাশুড়ি জাহ্নবী দেবী—এটা-সেটা নিয়ে প্রায়ই আসতে হয় এখানে—জাহ্নবী দেবীকে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

এদিকে এসেছিলাম মা, তাই ভাবলাম কেমন আছেন খবরটা নিয়ে যাই।

বেশ করেছ। ডাব পাঠাও নি তো অনেক দিন বাবা। রন্টু ডাব ডাব করে, বাজারে একটা ডাব চার আনা।

বিনয় হাঁ-হাঁ করে ওঠে: বাজারের কথা উঠছে কিসে? বাগানে কাঁদি-কাঁদি ডাব—রন্টুরই তো সমস্ত। কি আশ্চর্য, পুলিনকে আমি পরশু দিনও বলেছি। পাঠায় নি? উদ্বাস্তু এক দল বাগানে এসে ঢুকেছে, তবে গাছগাছালির তারা ক্ষতি করে না। আচ্ছা মা, এক্ষুনি গিয়ে পুলিনকে বাগানে পাঠাচ্ছি ডাব পাড়াতে।

জাহ্নবী দেবী বললেন, ডাব পাড়িয়ে রেখে দিও। আমি তো ফি রবিবার দক্ষিণেশ্বর যাই—ফিরতি মুখে বাগান ঘুরে আসব না-হয়।

বিনয় বলে, তা হলে তো ভালই হয়। নানান কাজে পুলিন দিয়ে যেতে পারে না। ডাব পাড়া থাকবে—এক কাঁদি দু-কাঁদি যা মোটরে ধরে নিয়ে আসবেন। এই তো ভাল। ফি রবিবারে ফিরতি পথে এক কাঁদি করে যদি নিয়ে আসেন, হপ্তার খরচ কুলিয়ে যায়।

আর ওদিকে ইন্দ্রজিৎ সোজা বোর্ডিংএ চলে গেছে। রণজিতের দুই মেয়ে মীরা-ধীরাকে ডাকিয়ে এনে বলে, বাগানে পিকনিকের কথা বলিস, তা আজ তো রবিবার আছে—

দু-বোনে নেচে উঠল: হ্যাঁ কাকামণি, আজকেই। চানটান করে আমরা তৈরি হয়ে নিই, জীপ নিয়ে তুমি চলে এসো।

ইন্দ্রজিৎ বলে, ছুটো ছুটো-খেয়েও নিস বরঞ্চ। এখন এই এত বেলা হয়ে

গেছে—আমি ভাবছি, জেলে ডেকে ঝিলে জাল নামিয়ে দেব। মাছ ধরা দেখবি তোরা। তার পরে সেই মাছ রেঁধে খাওয়া-দাওয়া করতে সন্ধ্যা হয়ে আসবে। এ বেলার মতো বোর্ডিং থেকে খেয়ে যাবি।

সেই ভাল কাকামণি। খেয়েদেয়েই যাব আমরা। আমাদের বন্ধু আরও চার-পাঁচটা মেয়ে যাবে কিন্তু।

অতএব ইন্দ্রজিৎ জেলের সন্ধানে বেরুল। জেলে মিলল না। শেষ অবধি বাজারের মাছ কিনে মীরা-ধীরা ও আর চারটি মেয়ে নিয়ে ইন্দ্রজিতের জীপ অপরাহ্নে বাগানবাড়ি পৌঁছল। জীপ দেখে রণজিৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলেন।

তোমরা?

ইন্দ্রজিৎ বলে, রবিবার বলে মীরা-ধীরার বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম। তা এরা কিছুতে ছাড়ল না, বাগানে পিকনিক করবে। তোড়জোড় করে বেরুতে দেরি হয়ে গেল। কখন যে কি হবে, জানি নে।

অদূরে দালানের দিকে তাকিয়ে বলে, বিদেয় হয়েছে উদ্বাস্তু বেটারা? উঃ, কী খাটনিটা খেটে যাচ্ছে আপনার দাদা! দুটো দিন পাটনা থেকে এলেন, তা তিলার্ধ জিরোবার ফুরসত নেই। এই এক ছ্যাঁচড়া তালে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

মীরা বলে, বাবা, তুমি খাবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

পাঞ্জাব মেল ধরতে হবে যে আমায়। কাল মকদ্দমা।

তার মধ্যে রান্নাবান্না হয়ে যাবে। কত তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারি, দেখিয়ে দেব। তুমি না খেলে হবেই না। কোন জায়গায় উনুন করা যায় বল তো কাকামণি?

ধীরা বলে, দালানের রোয়াকে হলে কেমন হয়? বনজঙ্গলে পোকামাকড়, বিষম নোংরা—খেতে আমার ঘেন্না করে।

রণজিৎ তাড়াতাড়ি বলেন, তবে আর বলছি কি! দালান উদ্বাস্তুরা দখল করেছে। উঁহু, ওদের ধারে-কাছে যাবি নে তোরা। পদ্মাপারের গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক—কী জানি কি বলে বসবে।

ইন্দ্রজিৎ গর্জে ওঠে: ইঃ, আমার ভাইঝিদের বলবে! আসুক দিকি বলতে—জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব না?

রণজিৎ বোঝাচ্ছেন: নাম হল যার বনভোজন—বনেই তো খেতে হয় রে! বনজঙ্গলে ঘেন্না করিস তো বোর্ডিং-এর ডাইনিংরুম তো ভাল—বাগানে আসা কেন? উই যে পাঁচিলের ধারে আমরুলতলা—ঐ দিকে উনুন খুঁড়ে নিগে যা।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বর ফেরত জাহ্নবী দেবীর মোটর এসে পড়ল। দিদিমার সঙ্গে রন্টুও এসেছে।

বাবা ঐ যে। ও বাবা, বাবা গো, তুমি এখানে?

ছেলে ছুটে গিয়ে বাপের হাত জড়িয়ে ধরল।

জাহ্নবী দেবী বলেন, পুলিন কোথায় গো? ভাব পাড়িয়ে রাখবার কথা—ও পুলিন, ডাব আমার গাড়িতে তুলে দাও।

পুলিন বেকুব হয়ে বলে, গণ্ডগোলে হয়ে ওঠে নি। আজকে আবার এখানে বিয়ের ব্যাপার কিনা! একটুখানি বসুন মা, এক্ষুনি আমি পাড়ানি ডেকে আনছি।

ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, রণজিৎ হাত ইশারায় ডাকলেন।

উঁহু, তুমি বেরুলে হবে না। দাঁড়াও, কাজ আছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, পাড়ানি ডাকতে অন্য কাউকে পাঠাও। বিয়েটা তোমাকেই করতে হচ্ছে পুলিন।

পুলিন আকাশ থেকে পড়ে: বীণাকে আমি বিয়ে করব?

তা ছাড়া তো উপায় দেখি নে। মেয়ে দুটো এসেছে, তাদের সঙ্গে কাউ এসেছে, আরও এক গণ্ডা। শাশুড়ি এসেছেন। আমি বরাসনে বসতে গেলে গজকচ্ছপের লড়াই বেধে যাবে। মেয়ের আব্যুত্তিক হয়ে গেছে, বিয়ে না হলে ওরাও এখন ছেড়ে কথা কইবে না।

পুলিন বলে, ছোটবাবু স্বয়ং যখন উপস্থিত রয়েছেন, তাঁকে বাদ দেওয়াটা কেমন যেন লাগছে বড়বাবু।

রণজিৎ চটে উঠলেন: ঝামাপুকুরের এক-শ ভরি সোনা, দুই সেট জড়োয়া, নগদ বিশ হাজার—এই সমস্ত বাদ দিতে বলো তুমি?

পুলিন চুপ করে যায়। রণজিৎ একটুখানি ভেবে বলেন, বিনয়টা কাছাকাছি থাকলে বরং—উঁহু, তা-ও হবে না, তাকে নতুন-কোলিয়ারিতে পাঠাব, বিয়ের রঙ্গে মাতলে এখন চলবে না। ভেবেচিন্তে দেখছি পুলিন, তুমি ছাড়া গতি নেই। গোধূলিও হয়ে এলো, মাথায় টোপর চড়িয়ে চট করে বসে পড়োগে।

পুলিন নিজের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রণজিৎ গরম হয়ে বলেন, চাকরি রাখতে চাও তো কথা শোনো, গড়িমসি কোরো না।

পুলিন বলে, আজ্ঞে না—অন্য কিছু নয়। কাপড়খানা ছেঁড়া, জামাটাও বড্ড ময়লা।

সিল্কের জোড় কিনে এনেছি—তোমারই কপালে আছে। পরে ফেলগে যাও।

অশ্বিনীর কাছে গিয়ে রণজিৎ বললেন, আমায় ট্রেন ধরতে হবে, সময় নেই। কথাবার্তা যা হয়েছিল, তার নড়চড় হবে না। খরচপত্রের তিন হাজার

টাকা, এই বাগানবাড়িতে বসবাস—সমস্ত ঠিক। বরটা শুধু পালটে যাচ্ছে—আমি নই, পুলিন। তা পুলিনের সঙ্গেই তো মহরম-মহরম আপনাদের।

অশ্বিনী বলেন, আমার মেয়েকে বাড়ি লিখে দেবার কথা—সেটার কি হবে বড়বাবু?

আর একবার রণজিৎ চতুর্দিক তাকিয়ে দেখলেন। মীরা-ধীরা ও তাদের সহপাঠিনী মেয়ে চারটি মহোৎসাহে রান্না চাপিয়েছে, ইন্দ্রজিৎ কাঠকুটোর যোগাড় দিচ্ছে। নারিকেলতলার ওদিকে শাশুড়ি ঠাকরুন ডাব পাড়াচ্ছেন। রণ্টু কোন দিক দিয়ে ছুটে এসে দু-হাতে আবার তাঁকে বেড় দিয়ে ধরল।

বিপন্ন রণজিৎ বলেন, আচ্ছা—দেখব সেটাও। কলকাতার বাড়ি না হোক, এই দমদমার দিকে ছোটখাট একটা-কিছু করে দেওয়া যাবে। পুলিন কাপড় বদলাতে গেছে। মন্তোর পড়তে লাগিয়ে দিয়ে আমি স্টেশনে রওনা হব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না মশায়, কাজে লেগে যান।

যে আজ্ঞে—বলে অশ্বিনী তৎক্ষণাৎ বিয়ের ব্যবস্থায় ছুটলেন।

সিল্কের ধুতি পরে সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে পুলিন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত বিয়ে—এই উদ্বাস্তু ক-ঘরের যে ক-টি মেয়ে, তাঁরাই শুধু আসবেন। শাঁক বাজসে চলে আসবেন তাঁরা। বীণাকে দেখতে পেয়ে পুলিন বলে, বরের যে চন্দন-টন্দন মাখতে হয় গো! কে-ই বা দেয় মাখিয়ে!

বীণা বলে, আয়না ধরে যা-হোক করে সেরে নাও। আমি দিতে গেলে লোকে কি বলবে।

পুলিন সেটা প্রণিধান করে: তা বটে, তোমার নিজেরও তো সাজগোজের বাকি।

কাছে এসে চুপিচুপি বলে, এটা কি হল বল তো? কত বড় বড় সম্বন্ধ এলো—বিদ্যেয় বড়, নামে-ডাকে টাকাপয়সায় বড়, গায়ে-গতরে বড়—সমস্ত বাতিল হয়ে গিয়ে সেই আমি!

বীণা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কোনটার টাক-মাথা, কোনটার অসুরের চেহারা, কোনটা বাঘের মতন হালুম-হুলুম করে—উঃ, কী বাঁচাটাই বেঁচে গেলাম!

তবে আর অ্যাদ্দিন ধরে বারো-ঘাটের জল খোলানো কেন? এ তো হাতের মুঠোয় ছিল।

বীণা মিষ্টি হেসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, নানান রকমের বর দেখে নিলাম। বর নয় ওরা, এক-একটা বাঁদর।

আংটি চাটুজ্জের ভাই

বর্ষাকাল। রাস্তাঘাটে জলকাদা, উঠানেও আসর বসানো মুশকিল। নীলকান্ত এই ক'টা মাস তাই যাত্রার দল ছেড়ে কবিরাজি করে। জায়গাটা খুব ভাল। ম্যালেরিয়া তো আছেই, তাছাড়া আজকাল আবার নতুন নতুন রোগ-পীড়া দেখা দিচ্ছে, সে-সব নাম নীলকান্ত বাপের জন্মে শোনেনি। অতএব কাজ-কারবার খাসা চলছে, এক-এক দিন নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ থাকে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যার পর আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ে একটুখানি আড্ডার বন্দোবস্ত চাই-ই। নয় তো তার রাতে ঘুম হয় না। জমজমাটের সময় কোন রোগি দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, সে বেচারা গালি খেয়ে মরে।

আজও দুই-এক করে সকলে জমায়েত হচ্ছে। হরিশ বেহালাদার এসে গেছে। কয়ালী ভীম সাজে, সে তো সেই দুপুর থেকে তক্তাপোশে গদিয়ান হয়ে হুঁকো টানছে। সামনের রাস্তা দিয়ে গুড়-বোঝাই খান পাঁচ-ছয় গরুর-গাড়ি যাচ্ছিল—তারই একখানা থেকে ছোকরা গোছের একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঢুকল। লোকটা বিদেশি—পায়ে পাম্প-সু, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ময়লা আধ-ছেঁড়া জিনের কোট, ডান হাঁটুর নিচে বেশ বড় আকারের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। সেই জায়গাটা দেখিয়ে সে বলে, পুঁজ পড়ছে, থুঃ থুঃ—একদম ঘা হয়ে গেছে মশায়। তার উপর আবার জ্বরে ধরেছে।

নীলকান্ত ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলে, ঘায়ের তাড়সে জ্বর। হুঁ, তাই—

ঘা থাকুক, জ্বরটার চিকিচ্ছে করে দাও দিকি। গাড়ি চেপে বেড়াচ্ছি, পা একটু জখম থাকলে কি আর এমন ক্ষতি হবে।

ডান-হাতখানা এগিয়ে দিয়ে লোকটা কবিরাজের পাশে বসে পড়ল। বলে, আগে আসছিল একদিন অন্তর—আজ দু-দিন সকাল-বিকাল দু-বেলা ধরেছে। খাওয়ার তোয়াজ দেখছে, তাই আরও কষে ধরেছে।

নীলকান্ত নাড়ি দেখতে দেখতে বলল, এত বড় জ্বর—তার উপর খাওয়া?

খাওয়া বলে খাওয়া! দুপুরে গাড়ি রেখেছিল মণ্ডলগাঁয়ের বাজারে। রান্নার সুবিধে হল না—তা মশায়, পাকি পাঁচ-পোয়া চিঁড়ে, পাঁচ-পোয়া কাঁচাগোল্লা আর ঘন-আঁটা দুধ—তা-ও সের খানেকের বেশি হবে তো কম নয়। আমার আবার এক বদ-স্বভাব—শরীর বেজুত হলে খিদে ভয়ানক বেড়ে যায়।

করালী প্রশ্ন করে: কোথায় যাবে তুমি?

পিরথিমের তদারকে। বলে সে সুর করে ছড়া কাটে:

জীবনপুরের পথে যাই,
কোন দেশে সাকিন নাই।

বসন্ত আমার নাম। আংটি চাটুজ্জের নাম শুনেছ—তস্য ভ্রাতা। তিনি থাকেন বাড়ি-ঘরদোর আগলে, বাকি জগৎ-সংসারের খোঁজখবর আমাকে নিতে হয়।

রকম-সকম দেখে মনে হয় লোকটা পাগল। নীলকান্ত বলে, জামাটা তোল দিকি। পিলে আছে বলে ঠেকছে।

বসন্ত হা-হা করে হেসে উঠল: তা আছে। আরও নানা রকমের চিজ আছে। কোমর টিপে দেখছ কি, সে চিজ আমি গাঁটে রাখি নে। এই দেখ।

বলে পা থেকে জুতো খুলে শুকতলার নিচে থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখাল।

এই দেখ দাদা, জাল নয়—আসল ত্রি-মূর্তি। আরও আছে, গরজের সময় ফুস-মন্ত্রে বেরিয়ে যাবে। হেঁ-হেঁ, আর দেখাচ্ছি নে। আংটি চাটুজ্জের ভাই আমি, তাঁর দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি। তোমার ভিজিট মারব না কবিরাজ মশায়।

নীলকান্ত আরও খানিকক্ষণ প্রণিধান করে দেখে আলমারি থেকে একটা গুঁড়ো ওষুধ বের করল। পিছন-দরজার দিকে চেয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিতে হবে যে মা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—মানুষটি দেখা গেল না—চুড়ি-পরা একখানা হাত দরজা একটু ফাঁক করে জলের গ্লাস রেখে দিল।

বসন্ত বলে, ঠিক করে বল কবিরাজ, সুরকির গুঁড়ো দিচ্ছ না তো? বজ্জ কাবু করে ফেলেছে। মাইরি বলছি। হাঁটা মুশকিল হয়েছে, নইলে শর্মারাম গরুর-গাড়ি চাপে! রাত্তিরের মধ্যে জরটা নির্দোষ করে সেরে দাও, বুঝব ক্ষমতা। তা হলে ঘোর-ঘোর থাকতে মা-গঙ্গা পাড়ি দিয়ে চাকদা-মুখো বেরিয়ে পড়ি।

নোট দেখিয়ে মন্ত্রের কাজ হয়েছে। নীলকান্ত মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করে, রাত্তিরবেলা ওঠা হচ্ছে কোথায়?

উঠেছি এই তোমার এখানে। তুমি জায়গা না দাও, বটতলা রয়েছে। সে জায়গা তো কেউ কিনে রাখেনি।

নীলকান্ত প্রস্তাব করে: একটা রাতের ব্যাপার যখন, তা বেশ তো—এখানেই থাক। অসুবিধা হবে না।

উপরে নিচে চারিদিকে বার কয়েক তাকাল বসন্ত। বলে, শুতে হবে কোন্ ঘরে?

এই এখানে, তক্তাপোশের উপর মাদুর পেতে দেব। তবে একটুখানি রাত হবে। এই এরা সব আসছে—চলে যাবে, তারপরে।

বসন্ত দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, না মশায়, তা হলে চলবে না। এরই মধ্যে চোখ বুজে আসছে। সকাল সকাল না শুলে ভোরবেলা রওনা হব কি করে?

কেন জানি না—করালীর বড্ড ভাল লেগে গেল বসন্তকে। বলে, এক কাজ কর—খেয়ে-দেয়ে বরং আমার ওখানে গিয়ে শুয়ে থেকো। এখানকার হাঙ্গামা চুকতে এক-একদিন রাত কাবার হয়ে যায়। ঐ টিনের দোতলায় থাকি আমি। একা থাকি। খুব হাওয়া।

বসন্ত আবার প্রশ্ন করে, শোওয়া তো হল, খাওয়াবে কি শুনি কবিরাজ? তুমি বাবা জরো-রোগির জন্য শঠির পালো এনে হাজির করবে না তো? আগেভাগে বলে দাও, না পোষায় সরে পড়ব।

নীলকান্ত বলল, জর পুরানো হয়ে গেছে। দুটো পুরানো চালের ভাত খেলে দোষ হবে না। তাই খেয়ো।

আর গাঁদালের ঝোল?

উঁহু, তোফা ভাজা-মুগের ডাল লাগিয়ে দেব ঐ সঙ্গে।

তবে বন্দোবস্ত করে ফেল।· দেরি কোরো না, পেট জলে উঠেছে। এক্ষুণি চাপাও গে। বলে, তৎক্ষণাৎ বসন্ত উঠে দাঁড়াল। করালীর হাত ধরে টেনে বলে, চল, তোমার দোতলা অট্টালিকা দেখে আসি। বলি, খাট-টাট আছে তো? হেঁ-হেঁ মশায়, রুই-কাতলা খাওয়াবে তো ঘিয়ে ভেজে খাওয়াও। দোতলায় গিয়ে মেজেয় পড়ে থাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।

আবার সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগে: ও কবিরাজ মশায়, ইদিকে শোন একবার। যোগাড়যন্তোর করছ, রাঁধাবাড়া করবে কে?

নীলকান্ত বলে, আমার মেয়ে হরিমতী। আর কেউ নেই বাড়িতে, ঘরসংসার সে-ই দেখে।

তা বেশ করে। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন আমরা। আংটি চাটুজ্জের ভাই। যার-তার হাতে খাইনে।

মুখ কালো করে নীলকান্ত বলে, তুমিই তবে রান্না কর। অন্দরের দিকে এগিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল: ও খুকি, যোগনোয় করে তুই শুধু ভাতটা চড়িয়ে দে। ছোঁয়াছুঁয়ি করিস নে—খবরদার!

একগাল হেসে বসন্ত বলল, হ্যাঁ—সেই ভাল। ভাল বামুনের অ।ও মেরে শেষকালে মহাপাতকের ভাগী হবে, তাই সামাল করে দিলাম।

করালীর সঙ্গে তার ঘরে ঢুকে বসন্ত সর্বাগ্রে দুয়োর ভেজিয়ে দিল। জুতোর ভিতর থেকে নোট বের করে বলল, নাও দাদা, ধর। তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক্‌।

ব্যাপার কি?

শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে, কাছে রাখলে রক্ষে আছে? বুঝি দাদা, বুঝি। নিজের বিছানায় এনে শোয়াচ্ছ, ওদিকে ভাজা-মুগের বন্দোবস্ত। এত সব খাতির আমাকে নয়, পদতলে এই যিনি আছেন তাঁর। ছোট ভাইকে ছলনা কর কেন, নেবেই তো—সহজে না দিলে পেটে ছুরি বসিয়ে নেবে। তার কাজ নেই। কিন্তু মা-কালীর কিরে, একা খেয়ো না—কবিরাজের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে বাদ-বাকি সমস্ত তোমার।

ধর্মভীরু মানুষ করালী। রাগ করে সে নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বসন্ত খানিক অবাক হয়ে থাকে। তারপর ঢিপ করে সে তার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। বলে, টাকা ছুঁড়ে দেয়—সে-মানুষ পরমহংস। না নাও, না-ই নিলে। রাতের মতন রেখে দাও তোমার কাছে। ওখানকার ঐ একঘর মানুষ দেখে ফেলেছে। তোমাদের দেশ-ভূঁই, তোমায় কিছু বলবে না—বুঝলে না? বড্ড পাজি জিনিস এই টাকাপয়সা। ঠেকে ঠেকে বুঝেছি।

তবে সঙ্গে নিয়ে এসেচ কেন?

আমি? বয়ে গেছে আমার সঙ্গে আনতে। ষড়যন্ত্র করে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মেয়ে আমার বউ-ঠাকরুন। কারে কাপড়-কাচা দেখে সন্দেহ করেছে। এক প্রহর রাত থাকতে রওনা হয়েছি, কিছু জানিনে। চানের সময় জামা খুলতে গিয়ে দেখি খস্‌খস্‌ করছে। আংটি চাটুজ্জের বউ কি না, নজর এড়ানো কঠিন। এক হিসাবে মন্দ হয়নি অবিশ্যি। শুধু দেখিয়ে দেখিয়েই কাজ হাসিল হচ্ছে। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন তো কেবল চেহারা দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা পয়সা খরচ হয়নি।

এমন সময়ে কবিরাজের বাড়ি থেকে ডাক এল, গিয়ে ভাত নামাতে হবে।

ডাল ফুটে উঠেছে। হরিমতী চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর মিটিমিটি হাসছে। অতি ছেলেবয়সে মা-হারা, তখন থেকেই গিন্নি। বাবাকে দেখে দেখে সে ধরে নিয়েছে, গোটা পুরুষজাতটাই আনাড়ি। তাদের সম্পর্কে কৌতুক ও করুণার অন্ত নেই। হঠাৎ মেয়েটা হাঁ-হাঁ করে

ওঠে: ও কি হচ্ছে? অত নুন দেয় নাকি? এই রকম রান্না শিখেছেন আপনি?

বসন্ত বিষম চটে যায়: ডেঁপো মেয়ে, রান্না শেখাতে এসেছ? তোমার জন্মের আগে থেকে এই কর্ম করছি। এ আর কতটুকু—দৈনিক আড়াই পোয়া নুন লেগে থাকে আমার।

বলে কেবল হাতের নুনটুকু নয়, আর একবার তার ডবল পরিমাণ নিয়ে ডালের মধ্যে দিল।

হরিমতী রাগ করে বলে, তা হলে আবার মশলা লাগবে, আরও জল ঢালতে হবে। ও যে পুড়ে অবক্কার হয়ে গেছে। মানুষে কেন, গরুতেও মুখে দিতে পারবে না।

ঘটির জল হড়-হড় করে সে কড়াইয়ে ঢেলে দিল।

বসন্ত উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত কোমরে দিয়ে রণমূর্তিতে বলল, জল ঢেলে দিলে যে বড়! কি জাত তুমি?

বামুন।

ওঃ, হলেই হল! বামুন অমন সবাই কপচে থাকে। কি রকম বামুন দেখি, গায়ত্রী মুখস্থ বলতে পার?

হরিমতী বিদ্রূপ করে বলে, সর্বস্ব ফেলে এসে জাতটাই শুধু সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? পৈতে তো ছেড়েছেন, তবু জাত ছাড়ে না—ও বুঝি কাঁঠালের আঠা?

একটুখানি চুপ করে বসন্ত এইবার হেসে ফেলল। বলে, রাঁধো মাণিক, তুমিই রাঁধো তবে। অন্নের উপর আজ জুত হবে না। কিন্তু রাঁধতে আমি জানি, খুব ভাল জানি। আর একদিন রেঁধে দেখাব, তখন বুঝবে।

খাওয়াদাওয়ার পর উদ্গার তুলতে তুলতে বসন্ত এদের আড্ডায় এল। করালীকে ডেকে বলে, ঘরের চাবিটা দাও—শুয়ে পড়িগে। একটা কুকর্ম করে ফেললাম দাদা। গঙ্গার পাড়ের উপর রয়েছি, গঙ্গাজলে রান্না—তেমন কিছু দোষ হবে না, কি বল?

সকালবেলা বসন্ত ঘুমন্ত করালীকে নাড়া দিচ্ছে: চারটে পয়সা দাও দিকি।

করালী চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করে: কি হবে?

পারানির পয়সা। গঙ্গা তো সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। যাই বল দাদা, মানুষের চেয়ে বানরের বুদ্ধি বেশি।

বসন্ত হঠাৎ ভাবুকের পর্যায়ে উঠে গেছে। মাথা দোলাতে দোলাতে

বলে, বিবেচনা করে দেখ, তাই কিনা। হনুমান গন্ধমাদন পর্বত এনেছিল, কাজকর্ম চুকে গেলে যেখানকার জিনিস সেইখানে রেখে এল। আর ভগীরথের কি রকম আক্কেল—মা-গঙ্গাকে এনে গুষ্টিসুদ্ধ বাঁচালি, তারপর শিবের মাথার জিনিস আবার সেখানে গুঁজে দিয়ে আয়—তা নয়, গরজ ফুরোলে কিছু আর মনে থাকল না। গাঙ-খাল যদি না থাকত দাদা, মনের সাধে একবার পায়ে হেঁটে বুঝতাম।

তোমার যে পায়ে ঘা। হাঁটবে কি করে?

ঠিক কথা। থুঃ থুঃ—ওদিকে নজর দিও না।

করালী নোটখানাই ফিরিয়ে দিল। বসন্ত বলে, শুধু চারটে পয়সার দরকার। নোট বন্ধক রেখেই না-হয় দাও। পয়লা খেয়া—ওদের এখন ভাঁড়ে মা-ভবানী। কোথায় ভাঙাতে যাই, কি করি! আবার যখন আসব, বন্ধকি জিনিস ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।

খুচরো পয়সা নেই। নোট ভাঙিয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে করোগে যাও। বলে করালী আবার শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। করালী বেরুবে-বেরুবে করছিল, কাঠের সিঁড়ি হঠাৎ মচমচ করে উঠল: দাদা, ও দাদা, ঘরে আছ?

তুমি চলে যাওনি বসন্ত?

যেতে পারলাম আর কই! ভাঙানি খুঁজতে গিয়ে গোলমালে পড়ে গেলাম।

কাঁধে বেহালা, বসন্ত ঘরে ঢুকল। হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে কালকের ঐ হরিশ-বেহালাদারের ওখানে গিয়ে পড়লাম। একখানা গৎ শোনাল—বলব কি দাদা, মন কেড়ে নিল যেন! দরদস্তুর করে বেহালাটাই কিনে নিয়ে এলাম।

বাজাতে জান?

কিছু না, কিছু না। কোনদিন এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না। নতুন করে এই প্যাঁচে পড়ে গেলাম। কর্মনাশা জিনিস। সাত টাকায় কিনেছি, দাঁও মারা গেছে, কি বল?

বিপুল আত্মপ্রসাদে সে যেন ফেটে পড়ছিল। বলতে লাগল, আর নোটের দরুন বাকি তিনটে টাকাও দিল না। তার বাবদ তিনখানা গৎ শিখিয়ে দেবে বলেছে। সে-ও সস্তা—কি বল? তারের ভিতর থেকে সুর বের করা, সোজা কথা?

তা হলে আর তোমার চাকলায় যাওয়া হয় কই? এখানেই থেকে যেতে হবে।

বসন্ত শুকমুখে বলে, তা ক'টা দিন থাকতে হবে বই কি! কপালই এই রকম দাদা। ভাবি এক, হয়ে যায় অন্য। ছোট একটা ঘর-টর দেখে দাও, স্বপাক শুরু করে দিই সেখানে।

করালীর নজরে পড়ল, বসন্তের গা খালি। ভিজে কাপড়-জামা পুঁটলি করে বগলে নিয়েছে।

বৃষ্টি হয়নি, ও-সব ভিজল কি করে?

ভিজিয়ে দিল কবিরাজের বাঁদর মেয়েটা। আগাগোড়াই ভিজেছিল। গা মুছে ফেলে কবিরাজের একখানা শুকনো কাপড় পরে এলাম।

করালী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, কেন, কি হয়েছিল বল তো—

ওদের বারান্দায় বসে একটু গৎ প্রাকটিশ করছিলাম। ছড়াৎ করে জল ঢেলে দিল। মেরে বসতাম—তা বলল, দেখতে পাইনি।

তাই হবে।

তোমরা বুড়োমানুষ, যা বলে তাই বিশ্বাস কর। মুখ টিপে হাসছিল। মনে মনে ওর দুষ্টুমি, যতই সাফাই দাও। আবার বলে, ভাল হয়েছে— মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার দরকার ছিল। এত বড় অপমান! বেহালা আমি শিখবই। তোমার এই নিচের ঘরটা ভাড়া দেয় না দাদা? দাও না ঠিকঠাক করে— একসঙ্গে থাকা যাবে।

করালী বলে, টাকাগুলো ছাইভস্ম করে উড়িয়ে দিয়ে এলে। খাবে কি?

আছে দাদা, আরও আছে। সাগরের জল ফুরোবে না। অঙ্গ চিরে বের করে দেবো। আংটি চাটুজ্জের বউ—নজর তার কত মোটা! নোট দিয়েছে কি একখানা?

দরজায় খিল এঁটে অতি সন্তর্পণে সে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলল। ঘা নয় পায়ে—কিচ্ছু হয়নি, সব ফাঁকি। ব্যাণ্ডেজের ভাঁজের মধ্যে নোটের গোছা। বলে, বিশ্বাস হল তো? এবার থাকার বন্দোবস্ত করে দাও। কাউকে কিছু বোলো না কিন্তু। খবরদার! ঋষিতুল্য লোক তুমি—টাকা ছুঁড়ে ফেলে দাও, তাই তোমায় শুধু দেখিয়ে দিলাম।

নিচের ঘরটাই সাব্যস্ত হল। তিন টাকা ভাড়া। সেইখানে থেকে সে বেহালা শেখে। ডালকলাই-বোঝাই দক্ষিণের বড় বড় নৌকা নদীর ঘাটে পনর দিন কুড়ি দিন এসে নোঙর করে থাকে, ধীরে সুস্থে কলাই বিক্রি হয়। তারই এক মাঝির সঙ্গে বসন্তর ভাব জমে গেল। লোকটা ভাল দাবা খেলে।

বেহালা বাজানো, দাবা খেলা, আর কোন গতিকে দু'টি চাল সিদ্ধ করে নেওয়া—এই তার কাজ।

একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, বেহালার চর্চা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়বে, এই মতলবে রান্নার যোগাড়ে গেল। উনানে হাঁড়ি চাপিয়ে দেখে, চাল নেই। দোকানপাট ইতিমধ্যে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি নদীর ঘাটে তার বন্ধু সেই মাঝির কাছে এল রাত্রের মতো চারটি চাল ধার করবার আশায়। বন্ধুর তখন সঙিন অবস্থা, দাবাখেলা খুব জমে গেছে, এক সুপারিওয়ালা তাকে মাত করবার জো করেছে। এমন দুঃসময়ে কি করে ফেলে যায়—জুত দিতে দিতে কখন এক সময় বসন্ত নিজেই বসে পড়েছে—হুঁশ নেই।

খেলা ভাঙল। তখন গভীর রাত, দশমীর জ্যোৎস্না ডুবে গেছে। ভয় হল, দরজায় তালা দিয়ে আসেনি—ইতিমধ্যে চোর ঢুকে যদি যথাসর্বস্ব নিয়ে গিয়ে থাকে! যথাসর্বস্ব অবশ্য অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয়—টাকাকড়ি বসন্ত কাছছাড়া করে না, গামছার পুঁটুলিতে বাঁধা একখানা ধুতি ও একটা উড়ানি, মাটির হাঁড়িকুড়ি দু-তিনটা আর ছড়িসহ বেহালাটি। ছুটোছুটি করে এসে দেখে, যা ভেবেছে তাই—চোর সত্যিই ঘরে ঢুকে পড়েছে তবে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার গরজ দেখা যাচ্ছে না, খিল এঁটে এমন দখল করে বসেছে যে বিস্তর চেঁচামেচি ও দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করেও সাড়া মেলে না।

চেঁচামেচিতে দূরবর্তী দোকানের লোকগুলা পর্যন্ত ঘুমচোখে সাড়া দিতে আরম্ভ করল। অবশেষে দরজা খুলল। নতনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে হরিমতী। নিজের ভাড়া-নেওয়া ঘর এতক্ষণ বেদখল হয়ে ছিল, তার উপর ক্ষিধের নাড়ি জ্বলছে, বসন্ত আগুন হয়ে উঠল।

আমার ঘরে ঢুকেছ কি জন্যে? কৈফিয়ৎ দাও বলছি।

হরিমতী কি বলতে গেল। শব্দ বেরোয় না, ঠোঁট দু'টি শুধু থর-থর করে কেঁপে ওঠে। বসন্ত বলে, চালাকির জায়গা পাও না? একদিন থাপ্পড় মেরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। টের পাবে সেই সময়।

কাণ্ডটা আজও যে অসম্ভব ছিল, তা নয়। কিন্তু হরিমতী হঠাৎ ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল। রাত দুপুর, কোন দিকে কেউ নেই, ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে বয়স্থা মেয়ে কাঁদছে—কি জানি কি রকমটা হয়ে গেল বসন্তর মন। বিব্রতভাবে সে বলতে লাগল, কেঁদ না—আর জ্বালাতন কোর না লক্ষ্মী। থাপ্পড়ের কথা শুনেই এদ্দূর, আর ঘা-গুঁতো একটা-কিছু খেলে কি করতে?

এই বীরত্ব নিয়ে মাথায় জল ঢেলেছিলে সেদিন? মারব না, কিছু করব না—বাপের ঘরের মাণিক, এবারে গুটি-গুটি চলে যাও দিকি!

হরিমতী নড়ে না। বসন্ত মারুক, খুন করে ফেলুক, সে কিছুতে যাবে না। বাড়ির নামে এখনও শিউরে উঠছে। অন্য দিনের মতোই রান্নাঘরে সে ঘুমিয়ে ছিল আড্ডা ভাঙার অপেক্ষায়। চোরের মতো চুপিচুপি গিয়ে একজনে তার হাত চেপে ধরে। জেগে উঠে চেঁচামেচি করতে করতে সে বেরিয়ে পড়ল। লোকটিও পিছু ছুটল। অবশেষে বসন্তের এই ঘর খোলা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়েছে।

বসন্ত রুখে ওঠে: এত সব কাণ্ড ঘটল, কবিরাজ ছিল কোন্ চুলোয়?

যেখানেই থাকুক, চোখ-কান বর্তমান থেকেও আজকের রাতে নীলকান্তর দেখাশোনা করবার অবস্থা নেই। কি-একটা উপলক্ষে আড্ডায় আজ বিশেষ একটু আয়োজন ছিল। গান-বাজনা ও গাঁজা সমানে চলেছে। যে লোকটা রান্নাঘরে ঢুকেছিল, সে নীলকান্তরই যাত্রা-দলের লোক, হরিমতী চিনতে পেরেছে তাকে।

উনানের ধারে চেলা-বাঁশ ছিল। তারই একখানা তুলে নিয়ে বসন্ত বলে, যাও—চলে যাও এবার। রাত দুপুরে বদনামের ভাগী করতে চাও আমাকে?

ভয়ে ভয়ে হরিমতী রাস্তায় নেমে পড়ে, এক-পা দু-পা করে এগোয়। বসন্ত বলে, রোসো—আমিও যাচ্ছি। বাপের ধন বাপের কাছে বুঝে দিয়ে আসি।

ঔষধালয়-ঘরে তখনও পাঁচ-ছ জন রয়েছে, বাঁয়াতবলায় একজনে মাঝে মাঝে চাঁটি দিচ্ছে, অপরগুলি যেন ধ্যানস্থ। একপাশে নীলকান্ত বোধকরি ঘুমিয়েই পড়েছে, প্রবল নিশ্বাস-ধ্বনি উঠছে। তবলচি লোকটা বসন্তকে চিনল। বলে, বেহালা এনেছ কই? নিয়ে এস, নিয়ে এস। আর জমবে কখন?

তাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে নীলকান্তর পিঠে ঘা-কতক চেলা-বাঁশ বসিয়ে বসন্ত বিনাবাক্যে ফিরে চলল। তখন সে এক মহাকাণ্ড। জেগে উঠে নীলকান্ত পিঠের জ্বালায় লাফালাফি করছে, বন্ধুমণ্ডলী সমস্বরে অভয় দিচ্ছে। হরিমতী ইতিমধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

অত রাত্রে রাঁধাবাড়া আর ঘটল না, মেয়েটাকে গালি পাড়তে পাড়তে বসন্ত শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসেছিল একটু। হঠাৎ জেগে উঠে শুনতে লাগল, ঔষধালয় থেকে মুষলধারে গালিবর্ষণ হচ্ছে, নৈশ নিস্তব্ধতায় প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু হয়েছে নীলকান্তর গলা। সকাল হোক, দেখা

খাবে কত বড় চাটুজ্জের ভাই। দেহটা দুই খণ্ড করে যদি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে না দেয়, তবে যেন তাদের নামে কুকুর পোষা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইসব হ্যাঙ্গামে বসন্তর ঘুমাতে দেরি হয়ে গেল, বেলা পর্যন্ত পড়ে থেকে পুষিয়ে নেবে এই ছিল মতলব। কিন্তু ভোর না হতেই দরজা ঝাঁকাঝাঁকি। নীলকান্ত ডাকছে। অতএব নেশার ঘোরে যা বলেছিল, নেশা ছুটলেও তা মনে রেখেছে। বিরক্ত হয়ে বসন্ত উঠল, গত রাতের চেলা-বাঁশখানা নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে খিল খুলে দিল। ঢুকে পড়লেই মাথা ফাটিয়ে দেবে, তা তারা যতজনে আসুক। কিন্তু নীলকান্ত ঘরে ঢোকে না, বাইরে থেকে মিনতি করতে লাগল: কৃপা করে এস না একটু। একটা কথা নিবেদন করি।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নীলকান্ত একাই, সঙ্গে কেউ নেই। বসন্তকে দেখেই সে নিজের গাল দু-হাতে চড়াতে লাগল।

কি, ও কি?

নীলকান্ত বলে, মহাপাতক করেছি মশায়। ওসব আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কালকেই শুধু দলে পড়ে—

এখন বসন্ত ভেবে পায় না, কি এমন অপরাধ নীলকান্তর—যার জন্য কাল সে অমন মারমুখি হয়ে গিয়েছিল। বেটা ছেলে—একটু-আধটু নেশাভাঙ করবে, সেটা এমন মারাত্মক-কিছু নয়। বলল, নেশা ছাড় না ছাড়, দলটা ছেড়ে দাও। নিতান্ত যদি ইচ্ছে করে, একা-একা খেয়ো।

এ সব যে দলেরই ব্যাপার! একা খেয়ে জুত হয় কখনো?

এ কথার সত্যতা বসন্ত খুব জানে। তখন সে অন্য দিক দিয়ে গেল। বলে, তোমার দলের লোকগুলো বড্ড খারাপ কবিরাজ। ওদের মধ্যে থেকেই তো কাণ্ডটা করল।

নীলকান্ত বলে, কিন্তু তা-ও বোঝ, ধর্মপুত্র-যুধিষ্ঠিরেরা কি আসবে আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে?

এর উপরে কথা চলে না। বসন্ত একটু ভেবে বলল, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। শ্বশুরবাড়ি চলে যাক, তারপরে যা-ইচ্ছে তাই কোরো।

নীলকান্ত এবার খপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সেই জন্যেই এসেছি। তুমি একটা ঠিকঠাক করে দাও। দেখ, কি রকম চেলা-কাঠ মেরেছিলে। কালসিটে পড়ে আছে। তা সত্ত্বেও এসেছি।

এখন দিনের বেলা ঠাণ্ডা মাথায় শাস্তির বহর দেখে বসন্তর করুণা হয়। সে

জুড়ালা দিল—চেলা কাঠ মারার দরুন যেন সত্যি সত্যি একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে তার—বলে, আচ্ছা—দেখব।

ইতিমধ্যে নীলকান্ত আর একদিন খাতির করে তাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াল। তাগিদ রোজই চলেছে। বিরক্ত হয়ে শেষে বসন্ত বলে, বেহালায় ইস্তফা দিয়ে আমি কি পাত্র খুঁজতে বেরুব? বেশ, আমার সঙ্গেই না-হয় দিয়ে দাও।

তোমার সঙ্গে?

দশ বছর তপস্যা করলেও এমন পাত্র পেতে না। আংটি চাটুজ্জের ভাই, চকমিলানো দালানকোঠা। মেয়েটার কপাল ভাল। নেহাৎ কথা দিয়ে ফেলেছি, তাই—

ইতিপূর্বেও অবশ্য আরও অনেক জনকে অনেক ক্ষেত্রে কথা দিয়েছে, ভাঙতে তার তিলার্ধ আটকায় নি। কিন্তু আংটি চাটুজ্জের ভাইয়ের মাথায় জল ঢেলে ঠাণ্ডা করবার আস্পর্ধা যার, তাকে বিয়ে করে সকাল-বিকাল দুইবেলা কানের কাছে অবিরত বেহালা শোনাতে হবে, এই তার সঙ্কল্প।

নীলকান্ত যথাসম্ভব পাত্রের খোঁজখবর নিল। বিয়ে হয়ে গেল। বসন্ত করালীর ঘরে এসে বলে, কাজটা গর্হিত হল, কি বল দাদা? কেবলই জড়িয়ে পড়ছি। এরা আবার নিচু-ঘর।

করালী বলে, আজকাল ও-সমস্ত দেখে না।

তা ঠিক। তা ছাড়া প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আছি তো গঙ্গার উপর। দোষ-টোষ ধুয়ে গেছে। কিন্তু আমার ভাই টের পেলে খুন করে ফেলবে। জাত আর ধনসম্পত্তি আগলে সে বাড়ি বসে থাকে। তবে টের পাবে না, বেরোয় না তো!

দুটো মাস যেন উড়ে চলে গেল। বিয়ের খবর শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনি, চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শোনা গেল, আংটি চাটুজ্জেরও কানে গিয়েছে। নিজে একদিন এসে ভাইয়ের কান ধরে টানতে টানতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবে, এই রকম সে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবার এক রাত্রে অভ্যাস অনুযায়ী বসন্ত পিঠটান দিল। আংটির ভয়ে নয়, নূতন নেশা ইতিমধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। আরও কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরে হাতের শেষ পয়সাটি অবধি খরচ করে অবশেষে সে বাড়ি গিয়ে উঠল। আংটির সামনে যায় না। বাগদি-পাড়ায় ভাবগানের দল করেছে, তাতে বসন্তর বড় উৎসাহ। নিরক্ষরেরা গানের পদ ভুলে যায়, বসন্ত খাতা খুলে পদগুলো ধরিয়ে দেয়। নিজে যে কয়টা গৎ শিখে এসেছে, তা-ও খুব কাজে লেগে গেল। দিনরাত সে এই সব নিয়ে মেতে আছে। দুপুরবেলা আংটি

ঘুমিয়ে পড়লে টিপিটিপি বাড়ি ঢুকে সোজা রান্নাঘরে এসে বসে। স্নান ইত্যাদি মাঠের পুকুর থেকে সেরে আসে। আংটির স্ত্রী পটেশ্বরী রান্নাঘরে তৈরি হয়ে থাকে, স্বামীর অজ্ঞাতে দেওরকে খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে সে বেঁচে যায়। রাতে বসন্তর ফুরসৎ নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে—বায়না লেগেই আছে। নেহাৎ বায়না যেদিন না থাকে, সেদিনও মহলা দিতে রাত কাবার হয়ে যায়। রাতে তাই বাগদিদের ওখানে ফলাহারের বন্দোবস্ত—চিঁড়ে, গুড়, নারকেল-কোরা। তোফা দিন কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, একদিন একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে আংটি বলল, এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছ এটা জগন্নাথ চাটুজ্জের বাড়ি। তাঁর অতুল ঐশ্বর্য রাখা যায়নি, কিন্তু নামটা আছে। সে নাম তুমি ডুবিয়ে দিচ্ছ।

বসন্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। কথা শেষ হলে দাদার পায়ের গোড়ায় ঠক করে প্রণাম করল।

আংটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করবে?

চলে যাব।

কোথায়?

চাকরি-বাকরি করব, আয়ের চেষ্টা করব, এমনধারা ঘুরে বেড়াব না আর।

আংটি জ্বলে উঠল: অসুবিধেয় পড়ে আমি কিছু দিন কালেক্টরির গোলামি করেছি। তা বলে গুষ্টিসুদ্ধ উঞ্ছবৃত্তি করবে? ভাই আমার একটা, তার ভাত আমি স্বচ্ছন্দে জোটাতে পারব।

বসন্ত জবাব দেয় না, তেমনই দাঁড়িয়ে আছে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আংটি পুনরায় প্রশ্ন করে, কি ঠিক করলে? যাবেই?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

শোন। বলে আংটি বসন্তর হাত ধরল। নিয়ে চলল অন্দরের শেষদিককার গোল-কুঠুরিতে, যেটায় সে আমলে জগন্নাথ চাটুজ্জে মশায় থাকতেন বলে সকলে জানে। ঘরের মাঝখানে গিয়ে বলল, দাঁড়াও। বাইরে এসে আংটি ঝনাৎ করে শিকল এঁটে দিল।

বসন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ঘরে আটকাচ্ছেন কেন? পোষাচ্ছে না বলেই তো চলে যাচ্ছি।

আংটি প্রবল হাসি হেসে উঠল। বলে, তা বই কি! বেহালা কাঁধে দেশ-বিদেশে জগন্নাথের মুখ পুড়িয়ে বেড়াবে। তাই আমি হতে দিলাম আর কি!

বসন্ত দরজায় প্রচণ্ড লাথি মেরে বলে, আমি থাকব না। যাব, যাব—

আংটি পটেশ্বরীর দিকে চেয়ে বলে, বউমাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। চাবি দিয়ে দেব বউমার কাছে, তোমাকেও বিশ্বাস করিনে ভাইয়ের ব্যাপারে।

হরিমতী এসে পৌছল। আংটি উচ্চকণ্ঠে বলে, উড়ো-পাখি পোষ মানাতে হবে মা-লক্ষ্মী। এই নাও খাঁচার চাবি, সামাল করে আঁচলে বেঁধে রাখ। তুমিই পারবে মা। সাত-পাকের বাঁধনে পড়েছে যখন, আস্তে আস্তে সমস্ত সয়ে যাবে।

বন্দী বসন্তর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল: বউ তো আদর করে ঘরে তুলছেন। কোন্ জাত, কি বৃত্তান্ত, খোঁজখবর নিয়েছেন?

আংটি বলে, আমার মা-লক্ষ্মী কি আমার চেয়ে আলাদা কিছু হবেন? হুঁ, ভয় পেয়ে গেছে, কথা শুনে বুঝতে পারছি। আমার মন ভাঙিয়ে দিতে চায়।...মোটে এলাকাড়ি দেবে না, বুঝলে তো মা?

হরিমতীর অপরূপ বেশ। এ চেহারার সঙ্গে বসন্ত একেবারে অপরিচিত। সমস্ত সন্ধ্যা পটেশ্বরী বসে বসে তাকে সাজিয়েছে, বসন্তর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সকল খবর দিয়ে তাকে পাখি-পড়ানোর মতো করে পড়িয়েছে। দুরন্ত দেওরকে বাঁধবার এই একমাত্র ফাঁদ, এ ফাঁদের কোন অংশে ত্রুটি থাকলে চলবে না।

বসন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দৃষ্টির সামনে হরিমতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নিটোল কপালে দুই বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বসন্ত বলে, বাঃ বাঃ—বেড়ে দেখাচ্ছে! এই বন্তায় এমন বালাম-চাল, টের পাইনি তো!

একটু আনাড়ি ধরনে হেসে হরিমতী বলে, এই ইয়ে—বেহালা বাজাও না একটু।

তুমি শুনবে বেহালা?

হরিমতী বলে, হ্যাঁ, শুনব বইকি! তুমি গুণীলোক হয়েছ, গাঁয়ে গাঁয়ে তোমায় ধরে বায়না গাওয়ায়। আমি শুনব না?

তেল এনেছ বুঝি বাটি ভরে—সেই সেবারের মতো গায়ে ঢালবে? দেখি, হাত বের কর দিকি। ও কি, চাঁপাফুল?

হরিমতী বলে, সত্যি, খুব নামডাক হয়েছে তোমার। সকলে বলে, বড় মিঠি হাত। তখন একেবারে নতুন ছিলে কিনা!

বেহালার প্রশংসায় বসন্ত গলে গেল। বলে, আজকের বকশিশ তা হলে কনকচাঁপা? তারপর চিন্তাকুল হয়ে বলে, কিন্তু এখানে তো হবে না। বউকে বাজনা শোনাচ্ছি, দাদা-বউঠাকরুন কি ভাববেন। না, সে হয় না।

আস্তে আস্তে—

ভাব এলে জোর বেড়ে যাবে যে! তখন কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে? বড্ড যাচ্ছেতাই জিনিস।

হঠাৎ এক মতলব মাথায় আসে। বলে, তুমি তো নৌকোয় এসেছ। সে নৌকো চলে গেছে নাকি?

উহু, ঘাটে রয়েছে। ভাঁটা না হলে গাঙে পড়বে কি করে?

এক কাজ করো—চলো টিপিটিপি ঘাটে যাই। ঐ নৌকোয় বসে বাজনা শোনাব। খুব মজাদার হবে।

হাসতে হাসতে দু'টিতে হাত ধরাধরি করে খালের ঘাটে গেল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। জলধারা রূপার রেখার মতো মাঠের ভিতর দিয়ে দূরে—কত দূরে চলে গেছে। দূরে, কত দূরে! মাঠের শেষ নেই—খালেরও যেন শেষ নেই। চেয়ে চেয়ে বসন্তর মন কি-রকম করে উঠল। হরিমতী লীলা-ভঙ্গিতে তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বসন্ত বলে, ইঃ—কাদার মধ্যে নিয়ে রেখেছে। দাঁড়াও এখানে—নৌকো ঘুরিয়ে আনি।

নৌকোয় উঠে বসন্ত বৈঠা ধরল। হরিমতী দাঁড়িয়ে আছে।

কই, এসো—

আসছি, আসছি—

ওপারে চলল যে!

উহু, টানের মুখটা কাটান দিয়ে ঘুরে আসছি।

হরিমতী কাতর কণ্ঠে বলে, বড্ড ভয় করছে। নৌকোয় কাজ নেই, ঘাটে বসে বেহালা শুনব। তুমি এসো।

বসন্ত বলে, ছড়ের গুণ ছিঁড়ে গেছে। বড্ড ঠকিয়েছে হরিশ বেহালাদার। তার কাছ থেকে নতুন ছড় এনে তোমায় শুনিয়ে যাব। তুমি দাঁড়িয়ে থাক, ফিরে এসে দেখতে পাই যেন।

হা-হা-হা—মাঠের বাতাসে তার ব্যঙ্গহাসি দূর-দূরান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ও দাদা, দাদা গো—

করালী দুয়োর খুলে বেরিয়ে এসে দেখে বসন্ত।

কি ঝঞ্চাটে যে ফেলেছিল দাদা! কবিরাজের মেয়ে হেসে হেসে কাছে আসে, আবার ওদিকে আংটি চাটুজ্জে দরজায় শিকল আটকে রাখলেন। খুব বেঁচে এসেছি এ যাত্রা। খাল পার হয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে এসেছি। পারানির চারটি পয়সা দাও দিকি এক্ষুনি। দিতেই হবে। নোট ভাঙাতে গিয়েই তো সেদিন থেকে এইসব গোলমাল।

পয়সা নিয়ে সেই মুহূর্তে বসন্ত সরে পড়ল।

বিকালে এসে পড়ল দশ আঙুলে দশ আংটি-পরা স্বয়ং আংটি চাটুজ্জে। কালেক্টরির চাকরি ছাড়বার পর জগন্নাথের অট্টালিকা ছেড়ে এই সে প্রথম বেরিয়েছে। নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে করালীর কাছে এল।

বউমার কাছে শুনলাম, বসন্তর বড্ড ভাব তোমার সঙ্গে। এসেছিল সে?

করালী বলে, এসেই চলে গেছে।

কোথায়? কোন্ দিকে?

উই যে চাকদার রাস্তা—

গঙ্গার ওপারের দিকে দেখিয়ে দিল। সীমাহীন ধান-ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে চাকদার রাস্তা চলে গিয়েছে। দু'পাশে সারবন্দি পত্রবহুল শিরিষগাছ। চেয়ে চেয়ে আংটি গর্জন করে উঠল।

তোমার মেয়ের হয়ে নালিশ করতে হবে কবিরাজ, খোরপোষের দাবি দিয়ে। আর তুমি করালী হবে সাক্ষি। ডিগ্রি করে দেওয়ানি জেলে আটকে রাখব। দেখি, সেখান থেকে কোন্ ছুতোয় পালায়। জগন্নাথ চাটুজ্জের নাম নিয়ে দিব্যি করছি, এ আমি করবই—

তা কোরো। ততদিন তো বসন্ত ঘুরে বেড়াক। নিয়মমাফিক খাওয়া-দাওয়া আর বেহালা-বাজানো—অসহ্য হয়েছিল তার। পরিচিত পথঘাট গাছপালা ঘরবাড়ি দেখে দেখে চোখ যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। আর, এ কী জীবন! সকালবেলা জানা নেই, রাতে কোথায় পড়ে থাকতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে বালু উত্তীর্ণ হয়ে আসবে জাঙাল, জাঙাল ছাড়িয়ে অড়হর-ক্ষেত—কাদের কাছাড়িবাড়ি, একটা পচা দীঘি, কত পদ্ম ফুটে আছে· । আমবন—তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখবে, দিগন্তবিস্তৃত বিল তোমার চোখের সামনে। সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে কে গান গাচ্ছে, একটি মেয়ে গরুর নাম ধরে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে, বাঁশঝাড়ে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। যে বাড়িতে খুশি উঠানে গিয়ে দাঁড়াও, নূতন মানুষের সঙ্গে পরিচয় কর, ভালবাসাবাসি হোক—এক রাত্রি বেশ কাটল, আবার ভোরবেলা বোঁচকা বগলে বেহালা কাঁধে বেরিয়ে পড়ো···

কৈলেসকাঠি কোন্ দিকে ভাই? হ্যাঁ গো হ্যাঁ—বারান্দি-কৈলেসকাঠি?

কলা-ক্ষেতে মাটি তুলতে তুলতে চাষীরা প্রশ্ন করে: মশায়ের সাকিন?

জীবনপুরের পথিক রে ভাই
কোন দেশে সাকিন নাই—

ইতিহাস

বিশ্বেশ্বর হেন লোকেরও শত্রু আছে। আত্মীয়-বন্ধু নামে পরিচিত তারা। তারা বলে, লেখক? হ্যাঁ—লেখক ছিলেন বটে আগে, যখন বিষেণচাঁদ কোম্পানিতে কেরানিগিরি করতেন। লেজার-পোস্টিং করতে করতে আঙুল ব্যথা হয়ে যেত। ঐতিহাসিক হবার পর কলম ছেড়ে দিয়েছেন। এখন গঁদের আঠা ও কাঁচি—এই দুই অস্ত্র নিয়ে কারবার। পুরানো কোথায় কি বেরিয়েছে, এইসব উদ্ধার করা তাঁর কার্য। নাকের উপর উচ্চশক্তির চশমা—কিন্তু গবেষণা ক্রমশ যে রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, চশমা ছেড়ে অচিরে তাঁকে অণুবীক্ষণের জোগাড় দেখতে হবে। রামরতন মুখুজ্যে—যাঁর বাড়ি পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে ওয়ারেন হেস্টিংস নেমন্তন্ন খেয়েছিলেন—ভদ্রলোক বাইশে আশ্বিন বুধবার জন্মেছিলেন, আপনারা জেনে রেখেছেন তো? কিন্তু বিশ্বেশ্বরের 'কোম্পানির আমল' বইয়ে জন্মদিন পাবেন আরও আট দিন আগে—ঐ বাইশে তারিখ আটকড়াই-ফুটকড়াই হয়েছিল নবজাতকের। আর এক ব্যাপার—পঞ্জিকার মতে সে বছরের বাইশে শ্রাবণ বুধবারই নয় মোটে—শুক্রবার। বুঝুন, কি সর্বনেশে ভুল চলে আসছে এতকাল! বিশ্বেশ্বরের নতুন বইয়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে—পড়ে নিঃসংশয় হবেন।

এমনি সব ভয়াবহ সঙ্কটমোচন-ব্যাপারে অহরহ তিনি ব্যস্ত। ছাতের উপরের ঘরখানায় থাকেন—যশোধরা স্নেহগলিত কণ্ঠে পরিচয় দেয়, আমার বাবার সাধন-পীঠ। জীর্ণ কীটদষ্ট বইপুঁথি-কাগজপত্রে ঠাসা—এক কোণে সঙ্কীর্ণ একটু বিছানা পড়েছে, বিছানায় বসেই ডেস্কের উপর বিশ্বেশ্বর লেখাপড়া করেন। প্রতিটি টুকরো কাগজ সম্পর্কে অতিরিক্ত যত্নশীল—দরজা বন্ধ করে কাজ করেন। কোন-কিছু উড়ে বাইরে চলে না যায়। বাইরের কেউ ঢোকে না সেখানে, স্থানও নেই। আর যশোধরার সতর্ক পাহারায় কারও পক্ষে সম্ভবও নয় একতলা ও সিঁড়ি পেরিয়ে এই জায়গায় উঠে এসে হানা দেওয়া। নিজে সে জানলা দিয়ে কর্মরত বাবাকে দেখে যায় মাঝে মাঝে—কথাবার্তা বলে ব্যাঘাত ঘটায় না। কিন্তু খাওয়ার সময়টা নেমে আসতে বিশ্বেশ্বর একটু যদি গড়িমসি করেন, চেঁচিয়ে অমনি সে কুরুক্ষেত্র বাধাবে।

বিশ্বেশ্বর বলেন, ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় খেতে হবে, এ তোর অন্যায় জুলুম মা। একটু এদিক-ওদিক হলে কী যায় আসে?

রান্নাঘর থেকে স্বরলা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন : আয়না ধরে চেহারা কি হয়েছে দেখে তারপর বোলো। কাজ না, কর্ম না—কী যে হচ্ছে রাতদিন ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থেকে—

স্ত্রীর কথাবার্তা এমনি ধরনের। মূর্খ মেয়েমানুষ—তাঁর কথায় বিশ্বেশ্বর কিছু মনে করেন না। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মেয়েও বলে, কেউ পড়ে না তোমার ওসব লেখা।

পড়ে না, তবে যত্ন করে নিয়ে ছাপে কি জন্যে? একেবারে গোড়ার পাতা খুললেই আমার লেখা।

যশোধরা বলে, ভারি প্রবন্ধ ছেপে কাগজের ইজ্জত বাড়ায়। পড়ে না কেউ—পাঠক তো নয়ই, সম্পাদকও নয়। পড়তে হয় হতভাগ্য কম্পোজিটার আর প্রুফ-রিডারদের—না পড়ে যাদের গত্যন্তর নেই।

বিশ্বেশ্বর অতিমাত্রায় আহত হয়ে বললেন, তুইও পড়িস নে? তবে যে সেদিন অমলের কাছে অত ভাল-ভাল করছিলি—

যশোধরা নির্লজ্জ কণ্ঠে বলে, আসল বই যতটা তার ডবল হয়েছে ফুটনোট। বারো হাত কাঁকুড়ের চব্বিশ হাত বীচি। তখনই বুঝেছি, বিরাট গবেষণা—ও বই নিশ্চয়ই ভাল, লোকে খুব সমীহ করবে। পড়ে দেখতে হবে কেন বাবা?

কিন্তু যশোধরা না হোক অমল অর্থাৎ শ্রীমান অমলেশ সিংহ সত্যিই পড়েছে বইটার আদ্যোপান্ত। পরীক্ষা করলে গড়গড় করে মুখস্থও বলে যেতে পারে—এত যত্ন করে পড়েছে। যেমন রূপ, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি—সেই ছেলে বিশ্বেশ্বরের ঠিকানা জোগাড় করে বড়রাস্তায় মোটর রেখে গলির গলি তস্য গলি পায়ে হেঁটে রাস্তার পচা-পাঁকে ধুতি-জুতো বিভূষিত করে এক বিকালে পরিচয় করতে এল।

যশোধরা যথারীতি ভাগিয়ে দিচ্ছিল : বাবা এখন বাড়ি নেই—

তারপর অমলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, আপনি বসুন। ফিরতেও পারেন এতক্ষণে। দেখে আসছি।

বিশ্বেশ্বরকে বলে-কয়ে ছাতের উপর শতরঞ্চি পেতে এক সঙ্গে সকলে জমিয়ে বসল। এরই মধ্যে এক ফাঁকে মাকে বলে এল—তিনি চা তৈরি করে ছাতে পাঠিয়ে দিলেন।

অমলের মতো ছেলে হয় না সত্যি। বিশ্বেশ্বর যা কিছু লেখেন বা বলেন, শুনতে না শুনতেই আহা-হা করে ওঠে। য়ুনিভার্সিটির ক্লাস সেরে প্রতিদিনই আসে সে এখানে। নানা কাগজে ছড়ানো বিশ্বেশ্বরের লেখা বহুশ্রমে একত্র

কুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে পড়ে ফেলেছে সমস্ত। আলোচনায় যেতে গিয়ে এক একদিন বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে যায়। কাজের ক্ষতি হচ্ছে, তা সত্ত্বেও রসগ্রাহী ভক্তজনকে বিশ্বেশ্বর ছেড়ে দিতে চান না—বলেন, সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছ বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে।

মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, কি খেতে দিবি—দেখ তো একবার নিচে গিয়ে।

অমল হাতঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে, এত হয়েছে, খেয়াল হয়নি তো! খাবারের দরকার নেই, আমি চলি।

একটু-কিছু মুখে দিয়ে যাও—বললাম যখন। শিগগির মা তুই মোড় থেকে ক'টা সন্দেশ আনিয়ে দে।

তারপর শুভ্র দু'পাটি দাঁতের স্বচ্ছ হাসি হেসে বললেন, দেখছ তো? সময়-অসময়ের জ্ঞান থাকে না—ভারি পাজি জিনিস হল ইতিহাস!

জলযোগ করে অমল নেমে চলে গেল। যশোধরা বলে, সন্দেশের ফরমাশ করো বাবা—কত টাকা আছে তোমার তহবিলে?

মুখ শুকনো দেখলাম কিনা—

অধীর কণ্ঠে যশোধরা বলে, কিন্তু সন্দেশ কেন? ঘরে যা আছে, তাই দিতাম।

বিশ্বেশ্বর বলেন, চিঁড়ে-মুড়ি ওরা কি খেয়েছে কখনো? বিষম বড়লোক।

তুমি বাবা ঢের ঢের বড় ওদের চেয়ে। তাই এসে পায়ের কাছে বসে থাকে। বড়লোকের সঙ্গে তাল দিয়ে আমরা পারব না। 'কোম্পানির আমল'-এ নাম তো হয়েছে—দেনাও কত হয়েছে, হিসেব করে দেখো দিকি।

বিশ্বেশ্বর এতটুকু হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে আর কথা সরল না।

যশোধরা বলে, কৃতান্ত হালদার এসেছিল সন্ধ্যাবেলা। গেল-মাসে কিছু দাও নি। এ মাসও যায়-যায়।

দিই কোত্থেকে? লোকে মুখেই তারিফ করে, পয়সা দিয়ে বই কেনে না।

ওরা তা বুঝবে না তো! রোয়াকের উপর চেপে বসেছিল, টাকা না নিয়ে নড়বে না। দোষও দেওয়া যায় না—ছাপা শেষ করে দিয়েছে, সে-ও ধরো এক বছর হতে চলল।

বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠ কাতর হয়ে উঠল।

আমি যে দু-বছর একটানা খেটে লেখাটা শেষ করলাম—আমি চেপে বসে কার কাছ থেকে দাম আদায় করি, বল্ তো মা?

যশোধরা বলে, বিপদ কেমন! সেই সময়টা উপরে অমলবাবু তোমার

কাছে। বলে দিলাম, হেঁদোয় বেড়াতে গেছেন—ধরতে হলে এক্ষুনি চলে যান। ওখান থেকে আরও দু-তিন জায়গায় যাবার কথা। হালদার মশায় অমনি লাঠি তুলে নিয়ে ছুটল।

খিল-খিল করে হেসে উঠল যশোধরা। হাসি থামল বাপের ঘাড় নাড়া দেখে।

কাঁচা কাজ করলি মা। এ্যাদ্দিনের মধ্যে ভাল করে দুটো কথা গুছিয়ে বলতে শিখলি নে। হেঁদো বলতে গেলি কেন? ঘুরে ফিরে আবার এসে হাজির হবে। দিল্লি-সিমলে না হোক—নিদেন পক্ষে বর্ধমান-আসানসোলেও পাঠাতে পারতিস। দু'দিনের মতো নিশ্চিন্ত থাকতাম।

যশোধরারও এখন মনে হচ্ছে বটে—এত কাছাকাছি না হয়ে দূর-দূরান্তরে পাঠিয়ে দিলেই হত। এই এক মুশকিল, লাগসই কথা ঠিক সময়ে ঠোঁটের আগায় পৌঁছয় না।

বিশ্বেশ্বর বললেন, জানলা দুটো বন্ধ করে দে—

যা গুমট পড়েছে, জানলা দিয়ে এই অন্ধকূপে থাকবে কি করে?

কি করা যাবে? যত বেটা রাস্তা থেকে উঁকিঝুঁকি দেয়। কৃতান্তটা দেখতে পেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে।

যশোধরা জানলা বন্ধ করে ছাতে এসে দেখে অন্ধকারে অমল দাঁড়িয়ে আছে: ফিরে এলেন আবার?

আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলাম।

বিশ্বেশ্বরের কাছে গিয়ে অমল তাঁরই কথার পুনরাবৃত্তি করে, ভারি পাজি জিনিস ঐ ইতিহাস—সমস্ত গোলমাল করে দেয়। পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে আমাদের বাড়ি। বাবা বলে দিয়েছেন। বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী—নইলে তিনি নিজেই আসতেন।

যশোধরা বলে, কাজকর্ম ছেড়ে বাবা তো যান না কোথাও—

একটুখানি উপলক্ষ আছে। জন কয়েক ঐদিন এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আসবেন। নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। আপনার বইয়ে শিবশম্ভুর কথা লিখেছেন—হিসেব করে দেখুন, ঐ দিন তিনি মারা যান।

বিশ্বেশ্বর আশ্চর্য হয়ে বললেন, মারা গেলেন কি কোথায় গেলেন—তা তুমি জানলে কি করে? নতুন আবার কোন-কিছু বেরুল নাকি?

অমল বলে, আপনার উপরে আবার কে কি বের করবে? এত নিষ্ঠা কার? কোম্পানির লোক একেবারে মেরে ফেলেছিল—আপনি শিবশম্ভুর পুনর্জীবন দিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর বললেন, সে যাই হোক, তোমরা কিন্তু বিষম একটা ভুল করেছ। মরার কথা বইয়ের কোনখানে নেই। পালকি চড়ে সকালবেলা ইম্পি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলেন, এই অবধি জানতে পারা যায়। ঐদিনই যে মরেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই। এমনও হতে পারে, কোন গোপন জায়গায় তাঁকে আটকে রেখেছিল, বহু বহু বছর পরে তিনি মারা যান।

অমল বলে, তবু পরশু একটা বিশেষ তারিখ আমাদের পক্ষে। আর এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হবার যোগ্যতা আপনার মতো আর কারো নয়।

যশোধরা জিজ্ঞাসা করে: শিবশম্ভু সিংহ কেউ হন বুঝি আপনাদের?

আমাদের পূর্বপুরুষ।

বিশ্বেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, গোষ্ঠিপতি সিংহদের অনেক কীর্তির কাহিনী আপনার বইয়ে আছে। সেই মহাবংশের অধমাধম সন্তান আমরা। বাবা বলে দিয়েছেন, পঞ্চাশখানা বই লাগবে ঐদিন—বন্ধুবান্ধবদের দেবেন। বাজারে অত বই পাওয়া যাবে না হয়তো—আপনার দপ্তরিকে বলে বাঁধিয়ে রাখেন যদি।

যশোধরা ভাবে, ছাতে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল—কৃতান্ত হালদারের ব্যাপার সবটা শুনে ফেলেছে হয়তো। বিশ্বেশ্বরেরও ঘটকা লাগে, 'কোম্পানির আমল' নিয়ে গদগদ অবস্থা শিবশম্ভুকে তিনি আকাশে তুলে ধরেছেন, সেইজন্যেই নাকি? শিবশম্ভুর সম্পর্ক না থাকলে এত উচ্ছ্বাস করত কি সে তাঁর গবেষণা নিয়ে?

জালিয়াতির অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল—আসল কারণ অবশ্য হেস্টিংসের ব্যক্তিগত আক্রোশ। এ সমস্ত সকলের জানা। জানেন না নন্দকুমারের পরমবন্ধু শিবশম্ভু সিংহের কথা। তার কারণ, আত্মপ্রচারে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি—নিজেকে পিছনে রেখে কাজকর্ম করতেন। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত চিঠিতে এই মানুষটির সম্বন্ধে সতর্ক হবার নির্দেশ আছে। বিশ্বেশ্বর সরকারি নথিপত্র থেকে আকস্মিক ভাবে তাঁকে আবিষ্কার করেছেন। সেই গোড়ার আমলেই ইংরেজের কু-মতলব যাঁরা ধরতে পেরেছিলেন, কুশাগ্রবুদ্ধি শিবশম্ভু তাঁদের একজন।

শিবশম্ভুর শেষ-পরিণাম রহস্যময়। সুপ্রিমকোর্টের এক জজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তারপর থেকে আর খবর নেই। পাল্কি করে গিয়েছিলেন—বেহারারা কখন ফিরল, ফিরে এসে কি বলল—এ সম্পর্কে কোনরকম লেখাজোখা পাওয়া যায়নি কোথাও। হেস্টিংসের অসংখ্য কু-কীর্তির মধ্যে

এ-ও একটা, সন্দেহ নেই। বিশ্বেশ্বর বইয়ে লিখেছেন এ কথা। নন্দকুমারের ব্যাপারে দেশময় বিক্ষোভ হয়েছিল, ফাঁসির দিন লোকে দলে দলে গঙ্গাস্নান করেছিল, ফেরঙ্গ-শহর কলকাতা ছেড়ে চলেও গিয়েছিল বহু জন— শিবশম্ভুর ক্ষেত্রে সেজন্য বিচারের ভান না করে সুগোপনে সম্ভবত কার্য সমাধা হয়েছিল।

দেশীয় প্রথায় গালিচার উপর তাকিয়া সাজিয়ে সভাপতির আসন। সামনে দেয়ালজোড়া সুবিশাল তৈলচিত্র।

ইন্দুশেখর বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনিই। ওঁর তৃতীয় ছেলে শিতিকণ্ঠ হলেন প্রপিতামহ। তা'হলে সম্পর্কে শিবশম্ভু আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হলেন।

বিদগ্ধ-জনের মধ্যে প্রাণ-ঢালা প্রশংসায় বিশ্বেশ্বর অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হলেন। এতো সম্মান এই প্রথম পেলেন তিনি জীবনে। দু-কথা গুছিয়ে বলবেন সে ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেছে। ছবির কাছে গিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগলেন। ছবির মানুষটি ভারি প্রীত হয়েছে—সকৌতুকে চোখ তুলে হাসছে যেন তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে।

ইন্দুশেখর বললেন, দেশের লোকের কথা বলতে পারিনে—কিন্তু সিংহ-পরিবার কেনা-গোলাম হয়ে রইল আপনার কাছে। আমাদের অতুল গৌরব দান করেছেন। আপনার কোন কাজে যদি লাগতে পারি, নিজেদের ভাগ্যবান মনে করব।

এইবার কথা ফুটল বিশ্বেশ্বরের মুখে।

কিছুই আমি করতে পারিনি। না-না, বিনয়ের কথা হচ্ছে না—অত বড় একটা জীবনের খাপছাড়া একটুআধটু বৃত্তান্ত পাওয়া যাচ্ছে। বেশির ভাগই অজানা।

ইন্দুশেখর সবিনয়ে বললেন, আমরা অবশ্য মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। তবু আমার যদি এ সম্বন্ধে কিছু করণীয় থাকে—

বৃটিশ-মিউজিয়ামে কোম্পানির আমলের নথিপত্র অনেক আছে। সেখানে খোঁজ করতে পারলে হয়।

অমল বলে, একথা তো বলেন নি আমায়। আমারই দু-তিনটি বন্ধু বিলেতে আছে—

ইন্দুশেখর বললেন, যাকে তাকে দিয়ে কাজ হয় না। আপনি নিজে যেতে চান তো বলুন বিশ্বেশ্বরবাবু। আমি ব্যয় বহন করব। নয়তো সুলুকসন্ধান দেবেন—এদেশে-ওদেশে যা খোঁজাখুঁজি করতে হয়, তার বন্দোবস্ত করব।

সে কি সমাদরের ঘটা! সেকালে গুরুঠাকুর এলে গৃহস্থ এমনি করত।

এত ঐশ্বর্য ও এমন প্রতিপত্তি—ইন্দুশেখর তবু যেন মাটির মানুষ। শিবশম্ভুর বংশধর বলেই হতে পেরেছেন এমনটা। অমলের মা-ও তেমনি। বনেদি বাড়ির বউ—ঠিক সামনে এলেন না, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাওয়ার সময়টা সর্বক্ষণ দরজার আড়ালে বসে—এটা দাও, ওটুকু না খেলে চলবে না—এমনি বলতে লাগলেন। এরপর বিশ্বেশ্বর যাকে পেয়েছেন—সিংহ-পরিবারের প্রশংসা শতমুখে করেছেন তার কাছে।

পাশ করে অমল দিল্লিতে সরকারি চাকরি পেয়েছে। একমাত্র ছেলের সঙ্গে বাপ-মাও গেলেন সেখানে। বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে চিঠিপত্রের মারফতে। দু-বছর পরে ছুটি নিয়ে অমলরা কলকাতায় এল।

কেমন আছেন? দেখতে এলাম। যশোধরা যেন রোগা-রোগা হয়ে গিয়েছে। তারপর—কাজকর্ম আপনার কি রকম এগোল বলুন।

পুলকিত স্বরে বিশ্বেশ্বর বললেন, অনেক মাল-মশলা হাতে এসেছে তোমার বাপের অনুগ্রহে। বিস্তর নতুন নতুন কথা জানা গেল। পুরানো বই আর লোকের কাছে বের করা চলে না। নতুন সংস্করণ বের করব। পাতা অনেক বাড়বে, অন্ততপক্ষে চতুর্গুণ তো হবেই।

শিবশম্ভুর সম্বন্ধে জানলেন আর কিছু?

অনেক—অনেক। একবারে তাজ্জব ব্যাপার!

আবদারের ভাবে অমল বলে, এবারে ছাপবার খরচটা কিন্তু আমাদের। একটুখানি থেমে জোর দিয়ে আবার বলে, বাবা বলছিলেন তাই। মানে —লিখবার ক্ষমতা নেই তো, কিছু টাকা খরচ করে পুণ্য-কর্মে সহভাগী হওয়া।

যুগসন্ধির এক বিচিত্র কাহিনী। মোহেঞ্জোদারোর মতোই বিস্মৃত এক বৃহৎ কালের নূতন আবিষ্কার। জঙ্গল ও নর্দমার পূতিগন্ধে আচ্ছন্ন মাত্র পৌনে দু-শ বছর আগেকার ফেরঙ্গ-শহর কলিকাতা। মাৎস্যন্যায় অবস্থা—এক শাসন-ব্যবস্থা উন্মুলিত হয়ে আর এক শাসনের প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সমুদ্র-পারের অভিনব এক জীবন-রীতি দুরন্ত আঘাত হানছে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সনাতন বাঁধের উপর। অমলেশ পাণ্ডুলিপি পড়ছে। ছবির পর ছবি—সরকারি রেকর্ড, ব্যক্তিগত চিঠি, হাকিমের রায় ও গোপন নথিপত্রে এখানে একটি ছত্র ওখানে দুটি ছত্র ছড়িয়ে ছিল—ছড়ানো অস্থিমাল একত্র করে বিশ্বেশ্বর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। সেকালের অতীত মানুষগুলি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলছে একালের সঙ্গে। পাতার পর পাতা চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছল তাদের কথা এসেছে যেখানটায়। সিংহ-বংশের কথা, এবং বংশের উজ্জলতম মণি শিবশম্ভুর কথা—

এ সব কি লিখেছেন ?

একটাও মন-গড়া কথা নয়। তোমার বাবার অনুগ্রহে দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র পেয়েছি। দেখ, তুমিই পড়ে দেখ না—

ডেস্ক থেকে অতি-সাবধানে রাখা একটা ফাইল বের করে দিলেন।

পড়ো বাবা।—পড়লে ? এইবার বলো দিকি, তোমায় লিখতে বললে ঠিক এই সবই লিখতে কিনা ?

অমল নেমে চলে গেল। এবং অনতিপরেই তরলা হুঙ্কার দিয়ে পড়লেন।

কি ছাইভস্ম লিখেছ শুনি ?

বিশ্বেশ্বরও ক্ষেপে গেলেন।

কে বলেছে ? ছাই ঠেলে আমারই বলে পরমায়ুর অর্ধেক কমে গেল—

দেখগে, অমল মুখ ভারী বসে আছে নিচে—

তা বলে একটা বাজে-কথা লিখেছি, বলতে পারবে ? ডাক দাও, বলে যাক আমার মুখের উপর—

তরলা বলেন, ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেল। হ্যা—আমি বলছি। মেয়ের বাপ তুমি—মেয়ের মুখ চেয়ে তোমায় করতে হবে।

খানিকটা ঝগড়াঝাটি হল। অবশেষে বিশ্বেশ্বর বললেন, আচ্ছা, যাও তুমি। ভেবে দেখছি।

বাড়িটা থমথমে। অল্পসল্প যে যোগাযোগ স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে, তা-ও বিলুপ্ত যেন আজ। বিকালে যশোধরা ম্লান মুখে ছাতের প্রান্তে এসে দাঁড়াল—বাপের ঘরের দিকে তাকিয়েও দেখল না। বিশ্বেশ্বর ডাকলেন, শোন্—

আর্দ্রস্বরে বিশ্বেশ্বর বললেন, সমস্ত দিন ভেবেছি মা। চেষ্টা করে ছাঁট-কাটও কিছু কিছু করলাম। কিন্তু একেবারে ওলট-পালট করা যায় কেমন করে ? তোর মাকে তুই বুঝিয়ে বল একটু।

পরদিন অভাবিত ব্যাপার—ইন্দুশেখর নিজে চলে এলেন বাতের ব্যথা উপেক্ষা করে। সরাসরি ছাতে উঠে এলেন।

খোল ভাই, দরজা খোল। তোমার সাধন-পীঠ দেখতে এলাম।

বিশ্বেশ্বর তটস্থ হয়ে দরজা খুললেন। ভিতরে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে ইন্দুশেখর বলেন, বাঃ বাঃ—বই-কাগজ ছড়িয়ে নৈমিষারণ্য বানিয়ে নিয়েছ। সাধনার স্থানই বটে। শহরের মধ্যে এরকম শান্তির জায়গা ভাবতে পারা যায় না। অমল কেন এত আসত, বুঝতে পারছি। সার্থক জীবন ভাই তোমার।

বিশ্বেশ্বর সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন। কি করে সম্বর্ধনা করবেন—কি বলবেন,

কোথায় বসাবেন—ভেবে পান না। উদার ইন্দুশেখর বলেন, থাক থাক, ব্যস্ত হতে হবে না। ঘরের লোক তো আমি। লোভ হচ্ছে এরই মধ্যে যতক্ষণ পারা যায় বসে থাকতে।

বিশ্বেশ্বরের মলিন বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে চুরুট ধরালেন। মুখ ফেরালেন অস্ফুট আওয়াজ শুনে। ভয়ব্যাকুল বিশ্বেশ্বর আমতা-আমতা করে বলেন, এত সমস্ত কাগজপত্র—এমন জিনিসও আছে, হীরের ওজনে দাম হয়—ধরুন, একটু ফুলকি গিয়ে যদি পড়ে—

ঠিক, ঠিক! ফুলকি না-ও যদি পড়ে, বাণীর পীঠস্থানে ধূমপান—সে-ই আমার ভয়ানক অপরাধ।

চুরুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ছাতে। কাগজের দাম হীরার ওজনে হয়—এই কথাটায় হাসলেন তিনি মুখ টিপে। এত মূল্যবান সম্পত্তি ঘরে রেখেও ছাপাখানা ও হরেক রকম দেনার দায়ে একশ গণ্ডা মিথ্যা রচনা করতে হয়—এ কাহিনী শুনেছিলেন তিনি অমলের কাছে।

তারপর অন্তরঙ্গ ভাবে বললেন, শোন ভাই, মাঘ আর ফাল্গুন দু-মাসের ছুটি নিয়ে অমল এসেছে। এরই মধ্যে ছেলের বিয়েথাওয়া দিয়ে বউমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাব। তোমায় আত্মীয়তা-সূত্রে পেতে চাই। আমার ইচ্ছে, অমলের মা'রও ভারি ইচ্ছে। অবিশ্যি সারা দেশের মানুষই তোমার আত্মীয়। তবু—

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে তাকালেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ইন্দুশেখর বললেন, বুঝতে পারছ না? ভাই না বলে বেহাই বলব—এই দরবারে এসেছি।

বিমূঢ় বিশ্বেশ্বর তবু যেন কথাটা বুঝতে পারছেন না: আমার অবস্থা তো জানেন—

ইন্দুশেখর বললেন, অপমান কোরো না ভাই। ছেলে-বিক্রি সিংহ-বাড়ির ব্যবসা নয়। চিরকাল দিয়েই এসেছে তারা। আমাদের শিববাড়ি অঞ্চলে গেলে দেখতে পাবে কত দীঘি, মন্দির, জাঙাল—

ঐতিহাসিক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সসঙ্কোচে বিশ্বেশ্বর বললেন, জাঙালটা কিন্তু আপনাদের নয়। নন্দকুমার টাকা জমা রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শিবশম্ভু সেই টাকায়—

বিরক্ত হয়ে ইন্দুশেখর বললেন, দেশসুদ্ধ লোক বলে আসছে সিংহির জাঙাল—

ভুল বলে। আসল কথা জানতে পারলে আর বলবে না।

কণ্ঠের দৃঢ়তায় ইন্দুশেখর চমকে গেলেন।

আসল কে জানতে যাচ্ছে? আর তোমার বইয়ে যদি একছত্র লিখে যাও, হাজার লোকের ঢাক পেটানোর চেয়ে অনেক বেশি কাজ হবে।

বিশ্বেশ্বর সবিনয়ে বলেন, আমায় উল্টো কথাই যে লিখতে হয়েছে সিংহ মশায়—

মানে? ভ্রুকুঞ্চিত হল ইন্দুশেখরের: লিখতে হয়েছে—জোর করে ধরে লেখাচ্ছে নাকি কেউ?

বিশ্বেশ্বরের স্বর কাতর হয়ে উঠল: তাই। ধরে লেখানোই বটে! আপনার দয়ায় এই সব পুরানো রেকর্ড পেয়েছি। পড়ে দেখুন, অন্য কিছু লেখা যায় কিনা!

ইন্দুশেখর হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন কাগজপত্র: তুমিই ঘেঁটে ঘেঁটে পকোদ্ধার করছ। আর কারও সাধ্য হত না এত সমস্ত বের করবার।

তা সত্যি। আত্মগৌরবে বিশ্বেশ্বরের মুখে হাসি ফুটল: যত গোবর-গণেশ পরের ধন বাটপাড়ি করে ইতিহাস লেখে। কি তারা জানে, আর কি লিখবে বলুন?

ইন্দুশেখর স্পষ্টাস্পষ্টি এবার কথা পাড়লেন: তোমার মেয়ের শ্বশুরকুল অসম্মানিত হবে, দেশের লোক তাঁদের গায়ে থুথু দেবে—এটা নিশ্চয় চাও না তুমি—

সে কি কথা! নিশ্চয় নয়, কক্ষনো নয়—

তা হলে যা লিখেছ, ছিঁড়ে-ফেলে দাও। পুরানো কাগজপত্র আগুনে পোড়াও।

বিশ্বেশ্বর নির্নিমেষ চোখে চেয়ে আছেন। ইন্দুশেখর বলতে লাগলেন, মেয়ের প্রতি নিশ্চয় তোমার কর্তব্য আছে। অজানা অচেনা মরা মানুষ-গুলোর চেয়ে মেয়ে নিশ্চয় বেশি আপনার। আচ্ছা, ছিঁড়বে কি না-ছিঁড়বে—আজকের দিনটা বরঞ্চ ভেবে দেখ। কাল খবর দিও। তারপর পরশু-তরশু এসে মা-লক্ষ্মীকে পাকা দেখে যাব।

কথা শেষ করেই উঠলেন। ধীর পায়ে একটা একটা করে সিঁড়ি অতিক্রম করে বেরিয়ে গেলেন, পিছন ফিরে তাকালেন না।

সারাদিন বিশ্বেশ্বর ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। বার বার পড়ে দেখছেন, কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া যায়। বাদ দিতেই হবে—মেয়ের উপর কর্তব্য আছে।

যশোধরা এসে স্নেহকণ্ঠে ডাকল: দুয়োর খোল বাবা। ধুলো জমে জমে বিচ্ছিরি নোংরা হয়ে আছে! ঝেড়েমুছে দিয়ে যাই।

বদলাতেই হবে। অতীত মানুষদের চেয়ে জীবিতের জোর বেশি। এরা ভালবাসা দেয়, জবরদস্তি করে পাওনা আদায় করে। পাওনার চেয়ে বেশিও চায় এরা।

রাত হল। রাত্রির এক প্রহর অতীত হয়ে গেছে। বিশ্বেশ্বর অকূল-সমুদ্র হাতড়ে বেড়াচ্ছেন এখনো। ইতিহাসের শুধুমাত্র মরা কাহিনী নয় তাঁর কাছে—বড় বেশি চেনা-জানা ওদের সঙ্গে। বোধকরি নিচের তলায় নিষুপ্ত তরলার ও যশোধরার চেয়েও। অতীতের নিরুদ্ধ দ্বার কোন্ মন্ত্রে খুলে গেছে—সর্বকালে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ তাঁর। সেই তো হয়েছে মুশকিল। কার কি রকম চেহারা পালটাবেন? কলম তুললেই যেন বহুকণ্ঠ কথা বলে ওঠে। কষ্ট হয় শিবশম্ভুর জন্য। বড় দরদ দিয়ে লিখেছিলেন 'কোম্পানির আমলে' শিবশম্ভুর অধ্যায়টি। সেই ভালবাসার জনকেই ছুরি মারতে হল। পাগড়ি-আচকান-পাজামা-পরা তৈলচিত্রে-দেখা শিবশম্ভু যেন দু'টি হাত যুক্ত করে কাতর চোখ তুলে বলেন, বিকৃত দুর্গন্ধ দেহ নদীস্রোত ঘৃণায় কূলে ছুড়ে দিয়ে গেল—শিয়াল-শকুনে ছিঁড়ে খেল এক একটা অঙ্গ—অনেক তো হয়েছে! আমায় মার্জনা কর। নতুন শাস্তির জন্য শাশ্বতকালের সামনে দাঁড় করিও না আর আমায়।

ওদিকে মহারাজ নন্দকুমার। বিশাল পুরুষ—ফাঁসির দড়ি মালার মতো বেরিয়ে এসেছে, দীর্ঘায়িত জিহ্বা ঝুলে পড়েছে বুকের নিম্নভাগ ঢেকে। অস্পষ্ট অবোধ্য স্বরে তিনি বলছেন, ইংরেজ হত্যা করল, পরম-বন্ধুরা বিশ্বাস-ঘাতক হল—ঐতিহাসিক, ন্যায়ের দণ্ড তোমার হাতে—তুমি বিচার করো।

শুয়ে পড়লেন আলো নিভিয়ে। ক্ষীণ জ্যোৎস্না বিছানায় এসে পড়ল। মৃদঙ্গ-নিক্কণ—কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা কারা অনেক দূরে···অশ্বের হ্রেষা··· আগুন লেগে যেন পুড়ে যাচ্ছে নগর-বন্দর, আকাশ-চেরা আর্তনাদ···মিষ্টি রিনরিনে গলায় কিশোরদল কোথায় পাঠ অভ্যাস করছে···

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিশ্বেশ্বর অনুভব করলেন, ঘরের মধ্যে মানুষ। ঘুম সত্যি সত্যি ভেঙেছে কিনা, সন্দেহ হচ্ছে। এতক্ষণ যাদের সঙ্গে ঘুরছিলেন, রক্তমাংসের দেহে মূর্তিমান হয়ে এল নাকি তাদেরই কেউ? কী যেন খুঁজছে, ডেস্কের তালার গায়ে এ-চাবি ও-চাবি পরখ করছে।

তুই?

তড়াক করে উঠে সুইচ টিপলেন। যশোধরা বাপের মুখোমুখি তাকাল। শেষরাত্রে এই প্রথম লক্ষ্য হল, অনেক কেঁদেছে সে—ঘনপক্ষ্ম চোখ দুটির নিচে অশ্রু শুকিয়ে আছে।

ঘরে ঢুকলি কেমন করে? কি করছিলি?

যশোধরা বলে, বড্ড নোংরা হয়ে আছে কিনা—

নোংরা কি ডেস্কের ভিতরে?

ঘাড় নেড়ে অসঙ্কোচ কঠিন স্বরে যশোধরা বলে, তাই। যত আবর্জনা পুরে চাবি দিয়ে রেখেছ। সম্মানী মানুষদের অযথা কুৎসা।

যাচাই করে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে নিয়েছি। মিথ্যের বেসাতি আমি করিনে।

যশোধরা আগুন হয়ে বলে, তোমার শেখানো মিথ্যে বলে বলে পাওনাদার তাড়াচ্ছি—ভাল করে কথা ফোটেনি, সেই বয়স থেকে। সত্যের বড়াই অন্য জায়গায় কোরো বাবা, আমার কাছে নয়।

বিশ্বেশ্বরের মুখ ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললেন, গরিব—কানাকড়ি সম্বল নেই—ঠিক বলেছিস মা, সংসার আমার মিথ্যাচারে ভরা।

যশোধরা বলতে লাগল, তোমারই মেয়ে তো! বিকেলে ঝাঁট দেবার সময় ওপাশের দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে গিয়েছিলাম। ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু বলে যাচ্ছি, ঐ সব পুড়িয়ে না ফেল তো আত্মহত্যা করব আমি।

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঝড়ের বেগে সে ছুটে বেরুল। বিশ্বেশ্বর তেমনি বসে আছেন। আর একবার পড়লেন ঐ অংশটা। অনুরোধ-উপরোধে বারম্বার পরিমার্জনা করে কয়েকটি ছত্রে এসে ঠেকেছে:

শিবশম্ভু সিংহ আসলে ওয়ারেন হেস্টিংসের চর। হেস্টিংস যত উৎকোচ লইতেন, তাহার অধিকাংশ শিবশম্ভুর হাত দিয়া পৌছিত। কিন্তু অতিশয় ধূর্ত লোকটি—বাহির হইতে কিছু বোঝা যাইত না। অবশেষে অন্তরঙ্গদের মধ্যে কু-কীর্তির কিছু কিছু প্রকাশ পাইল। এখন যেখানে চাঁদপাল-ঘাট, উহার নিকটবর্তী এক অশ্বথ-তলে তাঁহাকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—

ফুটনোটে প্রমাণের ঠাসাঠাসি, তিল পরিমাণ তর্কের অবকাশ নাই। কিন্তু পোড়াতেই হবে শেষ পর্যন্ত। শুধু শিবশম্ভু-কথা নয়—'কোম্পানির আমল'-এর সমগ্র পাণ্ডুলিপি। ও বই আর বেরুবে না।

ভোর না হতেই বিশ্বেশ্বর বেরিয়ে পড়লেন। কৃতান্ত হালদারের দরজায় ঘা দিলেন। হালদার চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলল।

তোমার কাগজটা বেরোয় না আজকাল?

পরশু-তরশু বেরুবে তিন মাস বন্ধ থাকবার পর। বেরোয় কি করে বলুন? আপনাকে বলতে কি—গ্রাহক নম্বর আছে দু'হাজার-একুশ অবধি। দু'হাজার অবটা ভাঁওতা—মূল্যে এখন একুশে এসে ঠেকেছে।

বেশ, বেশ!

অচিরে কাগজ বেরুবে, অথবা গ্রাহক-সংখ্যা মোট একুশ—কোনটার জন্য বিশ্বেশ্বর তারিপ করলেন, বোঝা গেল না।

এই একটু লেখা এনেছি তোমার জন্য—

কৃতান্ত পরম কৃতার্থ হয়ে হাত পেতে নিল।

আর, শোন—আমি নিজে এসেও যদি চাই, কখনো ফেরত দেবে না। এক্ষুনি কম্পোজ ধরিয়ে দাও।

একুশ জন গ্রাহকের কথা বলল, তা-ও নেই সম্ভবত। কেউ পড়ে না কৃতান্তর কাগজ—সরকারি নিলাম-ইস্তাহার ছেপে কোন গতিকে টিকে আছে। তবু বিশ্বেশ্বর সান্ত্বনা পাচ্ছেন। ছাপা হয়ে থাকুক। নিরবধি কালে বিপুলা পৃথিবীতে কত অনুসন্ধানী জন্মাবে। ভাগ্যবানও কেউ কেউ থাকবে—বিশ্বেশ্বরের মতো যারা দরিদ্র ও কন্যাদায়গ্রস্ত নয়। কৃতান্তর কাগজের অভিজ্ঞান থেকে তারাই মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দেবে বিস্মৃত কালের সঙ্গে।

একটুকু বাসা

কোর্ট থেকে ফিরে নৃত্যলাল হাঁক পাড়ছেন, ও মা! সুহাসিনী রোজ দুপুরে অন্নদা-খুড়িকে মহাভারত পড়ে শোনান। আজও হচ্ছিল। এবং তার পরে যেমন হয়ে থাকে—মহাভারত গড়াচ্ছে মেজের উপর, চোখ বুঁজে নিঃসাড় দুজনে। উঁহু, অন্নদার সাড় আছে—চোখ বুঁজলেই তাঁর আবার নাক ডাকে।

নৃত্যলাল গজর-গজর করেন: বুড়োমানুষটা আধপোড়া হয়ে আসছে, সে হুঁশ কারো নেই। বেশ, কাউকে চাচ্ছি নে—কোথায় আমার মা-জননী?

সুহাসিনী ধড়মড় করে উঠে বসলেন: কি বলছ? ঘুমুচ্ছে বোধহয় বউমা। কি দরকার, আমায় বলো।

নৃত্যলাল আরও রেগে যান: চিরটা কাল তুমি খেটে মরবে তো এদেশ-সেদেশ খুঁজে বউ নিয়ে এলাম কেন ঘরে?

ছেলেমানুষকে তাই বলে বুঝি সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে? ফিক করে হেসে উঠে বললেন, রাতে তেমন ঘুম-টুম হয় না বোধহয়।

সে-ও তোমার দোষ। পরের মেয়ে এসেছে—দেখা উচিত তার সুবিধে-অসুবিধে। আজ থেকে সন্ধ্যে হলেই তাকে ঘুমুতে হবে। না ঘুমুলে শুনবই না। কিন্তু দিনে ঘুমানো অত্যন্ত বদ, শরীর মেদের ঢিবি হয়ে দাঁড়ায়—

সুহাসিনী হেসে বলেন, তার মানে তাস খেলতে হবে তো তোমার সঙ্গে।

নিজের ঘরে গেলেন নৃত্যলাল। সেখান থেকে চিৎকার করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, এমন মা দেখিনে বাপু! ছেলেটা রোদে তেতে-পুড়ে এলো, তিনি বেহুঁশ হয়ে আছেন। আমার সেকালের সেই মা বেঁচে থাকলে ছুটে এসে পড়তেন এতক্ষণ। এখনকার মাগুলো পাষাণ।

আর মাঝের-কোঠায় অলকা ছটফট করছে। কিন্তু প্রতুলের হাত ছাড়াবে কেমন করে? না, থাকো শুয়ে যেমন আছ। হবে না। আড়াই পহরে এখন মা-জননী! কাজকর্মে তো মন নেই—মক্কেল তাগিয়ে কোর্ট পালাতে শুরু করেছেন।

অলকা বলে, ছেলে যেমনধারা কলেজ পালায়—

আঃ—প্রতুল তার মুখে হাত দিয়ে কথা ঠেকায়।—দিব্যি বেশ ঘুমিয়ে রয়েছ, ঘুমন্ত মানুষ বকবক করে নাকি?

মুখখানা টেনে নিল একেবারে বুকের উপর। আলুল চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে। গায়ের জোরে পারা যায় পুরুষের সঙ্গে? অতএব ঘুমিয়েই আছে অলকা—শ্বশুরের কাকুতিতে সাড়া দেবার জো নেই।

শ্বশুরটিও নাছোড়বান্দা। সাজ-পোশাক ছেড়ে একেবারে দরজায় এসেছেন।—উঠে আয় মা। বিকেল হয়ে গেছে—এখনো ঘুম? তোর শাশুড়ি ডাকছে। কী অবাধ্য বউ রে, শাশুড়ির কথা শোনে না! কালকের ছুটো কোঁটা ধরা আছে, আর তিনটে হলেই পাঞ্জা। পারবে ওরা আমাদের বা-পোয়ের সঙ্গে?

ঘা দিচ্ছেন দরজায়। জোরে—আরও জোরে। নিতান্তই মারা না গেলে এর পরে পড়ে থাকবার কথা নয়। অলকা জড়িত কণ্ঠে বলে, এসে গেছেন বাবা? আমিও ভাবছি, খেলার আধাআধি হয়ে আছে—তাস দিতে লাগুন বাবা, আমি যাচ্ছি।

নৃত্যলাল নড়লেন না। কাঁচা-কাজের মানুষ তিনি নন। ছেলেমানুষ, তায় ঘুম ধরেছে। অন্নদা-খুড়ি আর সুহাসিনী ওদিকে যে তাস পাতিয়ে বসেছেন

—সে দায়িত্ববোধ থাকে এই বয়সে? ছেড়ে গেলে আবার হয়তো বিছানায় গড়িয়ে পড়বে। তাগাদা দেন: কি হল রে? আমি দাঁড়িয়ে আছি—

সব চেয়ে বড় মুশকিল, খিল খোলা মাত্রই নৃত্যলাল ঢুকে পড়েন যদি ঘরে—যে ব্যস্তবাগীশ লোক, কিছুই বিচিত্র নয়। তা বুদ্ধি রাখে অলকা। পাখির মতো ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে ওদিক থেকে শিকল দিয়ে দিল। খেলার তাড়া রয়েছে, আর সন্দেহেরও কোন কারণ ঘটেনি—শিকল খুলে ঘরে ঢুকতে যাবেন কেন? হাওয়ায় দরজা খুলে গিয়ে আসামি যে আচমকা নজরে এসে যাবে, সে ভয়ও রইল না।

অনেকক্ষণ কেটেছে। খেলা জমেছে, ওঁদের হাসিহল্লায় মালুম হচ্ছে। ঘরের ভিতরে প্রতুল একা-একা করে কি? শীতের দিনে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকা—সেটা মন্দ নয়। কিন্তু পাঁচটা বাজে, কলেজ থেকে ফিরবার সময় হয়ে গেছে। খেলায় যত মত্ত থাকুন, ছেলে কখন বাড়ি ফিরল—সেদিকে বাপের খরদৃষ্টি। দেরির জন্য বিশ গণ্ডা জেরায় পড়তে হবে। পাকা উকিলের জেরা —বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে রচনা করতে।

রাগে হাত কামড়াবে-- না, কি করবে এখন? সোহাগী বউ হয়েছেন— শিকল আটকে রেখে হৈ-চৈ করে দিব্যি তাস পেটানো হচ্ছে। চা-কচুরিও দেদার চলছে, নইলে ফুর্তির অমন জোয়ার বইত না। এদিকে নিরম্বু এক প্রাণী ছটফট করে মরে খাঁচার ইঁদুরের মতো। এই হল একালের পতিভক্তি! ছেলেরা এই কারণে বিয়ে করতে চায় না। প্রতুলও করত না—কিছুতেই না —যদি না পরম বন্ধু অমলচন্দ্র বোন গছাবার জন্য অমন উঠে পড়ে লাগত। আর বাবারও কি হল—অলকা ঠিক জাদু জানে—এক নজর দেখেই তাকে ঘরে আনবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। সে সময়টা কত খাতির প্রতুলের— আকাশের চাঁদ চাইলেও বোধহয় আঁকশি দিয়ে পেড়ে দিতেন। বাজিতে বাজনায় পাটনা শহরটা সরগরম করে বউ তো বাড়ির উঠোনে নামাল—ব্যস, কাজ ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপের আবার পুরনো মূর্তি। সংসারের কেউ এখন প্রতুলকে গ্রাহ্য করে না-- বাড়ির বউটা পর্যন্ত করে না।

চেঁচামেচি বন্ধ, খেলার শেষ তবে এতক্ষণে! তাই—প্রদীপ হাতে অন্নদা আসছেন। বাড়িময় বিদ্যুতের আলো— তবু তেলের প্রদীপ জেলে ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দেখানো চাই তাঁর। ঝনাৎ করে শিকল খুলে এঘরেও ঢুকলেন। ঘোর হয়েছে, চোখেও একটু কম দেখেন— ঘরে পা দিয়েই হাউমাউ চিৎকার—

আমি দিদিমা, আমি—আমি—

কে কার কথা শোনে! ভর সন্ধ্যায় ভূত দেখেছেন। কিম্বা চোর।

হাতের প্রদীপ পড়ে গেছে। ওড়াক করে একেবারে বারাণ্ডার উপর—সেখান থেকে উঠানে। তবু রক্ষা, নৃত্যলাল বৈঠকখানায় চলে গেছেন। সুহাসিনী ছুটে এলেন: কি হল খুড়িমা?

ছেলের দিকে নজর পড়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুই কখন এলি কলেজ থেকে?

এসেছি—

কখন?

তা দুটো-আড়াইটে হবে, সেই সময়। দু-জন প্রফেসার আসে নি, সকাল-সকাল ছুটি দিয়ে দিল।

সুহাসিনী বলেন, দুটোয় তো দেখলাম পড়ে আছিস বিছানায়। বউমা বলল, দেরিতে আজ কলেজ। তা হলে গেলি কোন সময়, আর ফিরলিই বা কখন?

প্রভুল আমতা-আমতা করে বলে, তবে বোধহয় যাওয়াই হয়নি মা। হুঁ, তাই—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সুহাসিনী গম্ভীর হলেন: কাল বললি, মাথা টিপটিপ করছে। আজ ঘুমিয়ে পড়লি। উনি যদি টের পান—

টের যাতে না পান, তাই করো। মা গো, শুধু আজকের দিনটা। কাল থেকে দেখো। ঠিক দশটায় যাব, পাঁচটায় আসব—এক মিনিট এদিক-ওদিক নয়। তুমি মা ঘড়ি ধরে মিলিয়ে নিও।

অন্নদা সামলে নিয়েছেন। দন্তহীন মাড়িতে হাসি। বললেন, নাতবউ শিকল দিয়ে রেখেছে কেন রে? বিয়ের বছর না যেতে এই? বিস্তর ভোগান্তি তোমার কপালে দাদাভাই।

সুহাসিনী খুব বিরক্ত হয়েছেন প্রভুলের উপর। কিন্তু কাণ্ডকারখানা দেখে গম্ভীর মুখ রাখা দায়। সরে গেলেন তাড়াতাড়ি। পরের বাড়ির মেয়েটা আসার পর এ বাড়িতে কারো মুখ কালো করবার জো নেই।

খেতে খেতে নৃত্যলাল মুখ তুলে তাকালেন: এগজামিন কবে?

অবহেলার ভাবে প্রভুল বলে, দেরি আছে—

নেই দেরি—মাস দেড়েক মোটে। অ্যানাটমির প্রফেসার ঘোষের কাছে খবর নিলাম। তুই তো দিব্যি পায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিস, খাওয়ার পরেই অমনি ঘরে ঢুকিস।

সেখানে গিয়ে পড়ি—

হ্যাঁ, শুয়ে পড়িস একেবারে। আজ থেকে এগারোটার সিকি মিনিট

আগে শুতে গিয়েছিস তো টের পেয়ে যাবি। পরের মেয়ে এসেছে—তার সামনে গালমন্দ করব না ভেবেছিলাম। তা-ই কি হতে দিবি তুই হতভাগা?

প্রতুল আড়চোখে মায়ের দিকে চায়, বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দিলেন নাকি আজকের ব্যাপার?

নৃত্যলাল হুঙ্কার দিলেন: হাত চালিয়ে খেয়ে নে। খেয়েদেয়ে বসতে হবে আবার—

নৃত্যলালও বসেন মক্কেলের কাগজপত্র নিয়ে। তাঁর বৈঠকখানা পড়ার ঘরের পাশেই। সশব্দে পড়ছে প্রতুল। এগজামিনের পড়াই বটে—শব্দ ধাপে ধাপে তুমুল হয়ে উঠল। ছেলে যেন বাপের উপর শোধ নিচ্ছে। নৃত্যলালের কাজের ভণ্ডুল হয়ে যায়—একবারের জিনিস পাঁচবার দেখেও মাথায় ঢোকে না। ছেলের মঙ্গলের জন্য অথচ মানা করাও চলে না। কুলাতে না পেরে উঠে পড়লেন শেষটা।

এগারোটা—হায়, কতদূরে সে এখন? কাঁটা যেন গরুর-গাড়ি হয়ে চলছে। যা গতিক—রাত ভোর হয়ে যাবে এগারোটা বাজতে।

বাপ উঠে গেছেন—জোরদার পড়ার তত আবশ্যক নেই। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠে জানান দেওয়া, মনোযোগী ছাত্র চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। দরজার বাইরে এসে ক্ষণে ক্ষণে এদিক-ওদিক তাকায়। শীতের রাত্রি—এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি হয়ে উঠেছে। বাবার তো সারাদিন কোর্টে ছুটোছুটি—তাঁরও এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

পায়ে পায়ে ভিতরে এসে গলা খাঁকারি দিল। তারপর মৃদু কণ্ঠে সাড়া নেয়: কে আছ ইদিকে? ও মা!

অন্নদা বলেন, এতক্ষণ ছিল তোর মা। এই মাত্তোর উঠে ঘরে চলে গেল।

জল তেষ্টা পেয়েছে দিদিমা—

জোয়ান-যুবোরা উঠতে পারে না—বুড়োমানুষ দিদিমা তরতর করে নিজেই গিয়ে কলসি থেকে জল গড়াচ্ছেন।

এত শীতে তেষ্টা পেল?

পায় অমনি! এগজামিনের পড়া হল এর নাম। কিন্তু তুমি কেন কষ্ট করে উঠতে গেলে দিদিমা? আরও তো ছিল।

আবার কে? নাতবউ ঘুমিয়ে আছে।

প্রতুল চটে উঠল: তাই দেখ আজকালকার আক্কেল-বিবেচনা। তুমি শীতের মধ্যে উঠে কাজ করবে, আর লেপ মুড়ি দিয়ে কাঠ হয়ে থাকবে বাবার এক আহ্লাদি-পুতুল।

অন্নদা বলেন, ওর কি দোষ ? ও কি করবে বলো ! শশুরের তাড়া খেয়ে ঘুমুতে হয়। নিজে আজ দাঁড়িয়ে থেকে শুইয়ে দিয়েছে। নতুন এসেছে— ধমকধামক শুনে ভয় পেয়ে যায়।

প্রতুল বলে, কি অন্যায় দেখ বাবার ! সন্ধ্যেরাতে শুইয়ে রেখে শরীর একেবারে শেষ করে দেবেন। তিরিক্ষি মেজাজ— কথা বলতে যাবে কে মুখের উপর ?

এবার অন্নদা হেসে ফেললেন : তুমি তো আছ দাদাভাই—বাকি রাত জাগিয়ে রেখে শরীর আবার ভাল করে দিও।

জলের গেলাস নামিয়ে রেখে নিশ্বাস ফেলে প্রতুল ফিরল। ঘুমানো হচ্ছে—তা আবার দিদিমার বিছানায়। নিজেদের ঘরে একলা শুতে ভয় করে। কী কাপুরুষ যে মেয়েজাতটা ! জগতের কোন কাজে আসবে না এরা—

দাঁড়িয়ে পড়ল। বচসা হচ্ছে বাবা ও মায়ের মধ্যে। এ কিছু নতুন নয়, পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের হয়ে থাকে। কিন্তু হচ্ছে যেন তাদেরই কথা। কান খাড়া করল—হ্যাঁ, তাই বটে ! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল জানলা ঘেঁষে।

তোমার ঐ তাড়াহুড়োয় পড়ার আরও ক্ষতি হচ্ছে। উসখুস করে বেড়ায়, মন খুলে দুটো কথা কইতে পারে না বেচারিরা।

নৃত্যলাল উদারভাবে বলেন, তিনটে বছর হলে এখানকার ডিগ্রিটা হয়ে যায়। বিলেত গিয়ে ধরো আরও তিন-চারটে বছর। ফিরে এসে দেদার কথাবার্তা বলুক—কে মানা করতে যাচ্ছে ?

বিবেচনা উত্তম বটে ! একুনে বছর সাতেক দাঁড়াল। সাত বছর পরে —মন থাকবে তখন অসার ঐহিক কথাবার্তায় নয়—নিরঙ্কুশ মুখোমুখি হয়ে দিব্যি মহাভারত-পাঠ এবং হরি-মহিমা শ্রবণ করা যাবে। কেউ তাতে মানা করতে আসবে না।

মা রাগ করে বলেন, বিয়ে না দিলেই হত !

মা তুমি এমন ভালো ! বাবা উপস্থিত না থাকলে প্রতুল ছুটে এক্ষুনি মায়ের পদধূলি নিয়ে আসত।

বিয়ে দিতে গেলে কেন তবে ছেলের ?

বিয়ে বুঝি ওর জন্যে ? মেয়ে নেই বলে দুঃখ করতে গিন্নি, সে মেয়ে হেঁটে এসে ঘর আলো করল। আমি মা-জননী পেলাম। সংসার পেয়েছে অন্নপূর্ণা —ক'মাসে একেবারে শ্রী-ছাঁদ ফিরে গেছে, দেখছ না ?

চমৎকার ! সবারই বন্দোবস্ত হয়ে গেল—আর সে যে সারাদিন উপোস করে

বাদরের মেয়েগুলোর অশেষ লাঞ্ছনা সয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো, তার বেলায় ফক্কিকার! তার কেউ নয় অলকা।

হেন অবিচারে মেজাজ ঠিক থাকে না। বইটা সামনে মেলে দেয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে সে গুম হয়ে রইল। তারপর ঘণ্টামিনিটগুলো কায়ক্লেশে পার করে দিয়ে দুম-দুম পা ফেলে ঘরে ঢুকে ধপাস করে বিছানায় পড়ল।

সে-লোকের পাত্তা নেই এখনো। দিদিমার কাছেই রাতটুকু কাটানো হবে মনে হচ্ছে। বেশ—চাইনে কাউকে। উঠে আলো নিভিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল। ক্ষণপরে অন্ধকারে—কি-সমস্ত মাখে কিনা ওরা—মাদকতাময় মৃদু সৌরভ ··চুড়ির ঝিনিমিনি···তারপরে গায়ের উপরে এলিয়ে পড়ে পদ্মফুলের মতো কোমল দু-খানা হাতে প্রতুলের গালদুটো চেপে ধরে যেন জোর করে কথার জবাব আদায় করছে: ঘুমুলে?

প্রতুল ক্ষেপে ওঠে: ঘুমুব না—তবে কি সারারাত্তির জেগে ধ্যান করব? ক'টা বেজেছে?

এগারোটা—

গরগর করতে করতে উঠে প্রতুল সুইচ টিপল। টেবিল থেকে হাতঘড়িটা অলকার সামনে ধরে: ক'টা?

ঐ তো বললাম—

সাত মিনিট হয়েছে এগারোটা বেজে গিয়ে। সাত-সাতটা মিনিট—কে দেয় আমাকে? লোকে অমন দু-দশ মিনিট হাতে নিয়ে আসে। বিশ বছর অবধি নির্ঝঞ্ঝাটে এত ঘুম ঘুমিয়ে এলে, তবু সাধ আর মিটল না! ঘড়ি দেখে দেখে আমি ওদিকে লবেজান—তা কার যায় আসে?

অলকা মুখ ভার করে বলে, আর তোমার ঘড়ি দেখতে হবে না। চলে যাচ্ছি—পাটনায় পাঠিয়ে দেবেন আমায়।

চকিতে তাকাল তার দিকে প্রতুল। বকুনি খাওয়ার শোধ নিচ্ছে না তো এইসব সাংঘাতিক কথা বানিয়ে বলে? ও মেয়ে সব পারে। দৃষ্টির সামনে অলকা থতমত খেয়ে যায়। কষ্টও হয় বোধকরি। বলে, হ্যাঁ—হয়েছিল সেই কথা। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। মা বলছিলেন বাবাকে সেই তাস-খেলায় সময়।

মা তুমি এমন! মমতাময়ী সকলের মা—আর প্রতুলের বেলা এ কোন পাষাণী মা হয়ে বসেছেন!

অলকা বলে, কথা ঠিকই। রাতদিন আমরা গুরুজনদের ফাঁকি দেয়ার তালে থাকি, ওতে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। মা তাই বলতে যাচ্ছিলেন, বউমা

দিনকয়েক না-হয় পাটনায় ঘুরে আসুক। তা বাবা মোটে কানেই নিলেন না —না-না করে উঠলেন।

প্রতুল প্রীত হয়ে বলে, বাবা আমার বড় ভাল।

আমি চলে গেলে যে বাড়ি অন্ধকার!

দেমাকের হাসি চিকচিক করে উঠল অলকার চোখে মুখে। বলে, কদর বুঝলে না তো মশাই, কথায় কথায় তাই বকুনি দাও।

প্রতুল গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। তারপর বলে, মা ঠিক বলেছেন—যাওয়াই উচিত তোমার। কষ্ট করে বিয়ে করে আনলাম—এখন তুমি সকলের সব হলে, আমার ছিটে-ফোঁটাও নও। হোক অন্ধকার—একা আমি কেন, বাড়িশুদ্ধ সকলে মিলে জব্দ হোন।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, কী ভুলই করেছি! নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে যে বিয়ে করে, সে হল আস্ত গাধা। তিনটে বছর পরে ডাক্তারিটা পাশ করে—ধরো—কাজ নিয়ে গেলাম মফস্বলের এক ছোট্ট হাসপাতালে। নিরিবিলি একটুকু বাসা, সামনে ফুলবাগিচা—

অলকা বলে, ফলের বাগানও থাকবে। আম-জাম-পেয়ারা-লিচু। আমাদের পাটনার বাগান দেখনি তুমি—বাগানের ফল না হলে খেয়ে সুখ!

প্রতুলের আপত্তি নেই।

বাগানে বেশ ছায়া-ছায়াও হয়। রাত্তিরবেলা টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না ডালপাতার ফাঁক দিয়ে ফুলবাগিচায় এসে পড়ে। তার উপর বাতাস হলে তো কথাই নেই। আমার তো মনে হয়, ঢালা জ্যোৎস্নার চেয়ে কুচি-কুচি কাঁপা-কাঁপা জ্যোৎস্না অনেক ভাল। কি বলো?

অলকা উৎসাহিত হয়ে বলে, আর নদী চাই। পাটনার ছাত থেকে গঙ্গা দেখা যায়। অত বড় নয় কিন্তু—সরু ছিমছাম শামলা মতন নদী। নদী না থাকলে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

প্রতুল আশ্চর্য হয়ে বলে, বাঃ রে—তুমি কোথায় সে জায়গায়?

অলকা অভিমান করে বলে, আমায় বাদ দিয়ে তোমার বাসা? আমি এখানে পড়ে থাকব বুঝি? বেশ!

প্রতুল বলে, ডাক্তার হলাম, চাকরি নিয়ে তারপরে তো গেলাম নতুন বাসায়। সে অন্তত আরো তিন বছর পরের কথা—ততদিন পড়ে থাকবে বুঝি তুমি? যা ছুটোছুটি লাগিয়েছিল চড়কডাঙার চৌধুরিরা! নতুন বাসায় উঠে খোঁজখবর নিয়ে হয়তো দেখতাম চৌধুরি-বাড়ির ছোটবউ অলকা দেবী দুই

সন্তানের জননী—ট্যাঁ-ভ্যাঁ করছে ডাইনে বাঁয়ে, সব্যসাচী রূপে দু-হাতে সমান বেগে কিল-চড় ঝাড়ছেন—

অলকা রাগ করে ওঠে: যাও—

মোটে দিশে করতে দিল না। এই বুঝি হাত-ছাড়া হয়ে যায়! টোপর পরে ছাদনাতলায় দাঁড়িয়েও একমাত্র ভাবনা, চৌধুরিদের আগে মন্তোরগুলো তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে পারলে হয়।

অলকা হেসে বলে, যে চর তুমি লাগিয়েছিলে—রাতদিন সে তক্কে তক্কে থাকত। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করবার জো ছিল চৌধুরিদের?

প্রতুল গদগদ হয়ে বলে, অমলের কাছে আমি জীবন ভোর ঋণী হয়ে আছি। সে যেমন ভাল লোক, তার বোনটাও সেই রকম হত যদি!

অমলও পড়ে—বোর্ডিং-এ থেকে। দু-দিন পরে সে এসে উপস্থিত। কর্তা-গিন্নির মধ্যে তখনো গোলমাল চলছে- সাব্যস্ত হয়নি অলকাকে নিয়ে যাবার জন্য পাটনায় লেখা হবে কিনা।

বৈঠকখানায় ঠাসা মক্কেল। নৃত্যলাল কাজ করছিলেন।

এসো বাবা। বেহাই-বেয়ানের চিঠিপত্র পেয়েছ—আছেন সকলে ভাল?

শুকমুখে অমল বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। হার্ট দুর্বল, উপর-নিচে করতে বুক ধড়ফড় করে। চেঞ্জে চলে যাচ্ছেন শিগগির। আমাকে লিখেছেন, অলকাকে নিয়ে যেতে। বেশি নয়—আট-দশ দিন থাকবে মাত্র। আমিই আবার পৌঁছে দিয়ে যাব। অসুখ-বিসুখে মন দুর্বল হয়ে পড়ে কিনা—তা ছাড়া বাইরে চলে যাচ্ছেন। অনেক করে তাই লিখেছেন, ক'টা দিনের জন্য একটু চোখের-দেখা দেখে যাওয়া—এই আর কি!

নৃত্যলাল গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন। বললেন, আচ্ছা—ভিতরে যাও তুমি। হাতের কাজটা সেরে যাচ্ছি। গিয়ে শুনব।

বেশি দেরি হল না। মক্কেলদের বসিয়ে রেখে চলে এলেন। অমল ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। সুহাসিনী এক কথায় রাজি। সত্যিই তো, মা মেয়েকে দেখতে চেয়েছেন—এতে আপত্তি করা যায় কোন্ মুখে? নৃত্যলাল তখন শেষ ভরসাস্থল অলকাকে জিজ্ঞাসা করেন: তোর মতামতটা শুনি। যাবি?

অলকা ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ—

অমল বলে, যদি অনুমতি করেন—এই এগারটার ট্রেনেই। মোটেই এখন কলেজ কামাই করবার জো নেই। শনিবার আছে আজ, সরস্বতী-পুজোও পড়ে গেছে সেই সঙ্গে, পৌঁছে দিয়ে কালই আবার ফিরে আসব।

নৃত্যলাল বলেন, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে হবে কেন বাবা? মেয়েছেলের যাওয়া—দু'ঘণ্টার মধ্যে গোছগাছ হয় কখনও? শনিবার হলে সুবিধে হয়—বেশ তো, সাত দিন পরেও আবার শনিবার আসছে।

সুহাসিনী রাগ করে ওঠেন: তোমার যেমন কথা! মায়ের অসুখ—বাছার আমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। যাচ্ছে ক'দিনের জন্যই বা! এক গাদা জিনিসপত্র নেবে কি করতে? তোমরা ভাইবোন চান করে যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে নাও দিকি—জিনিসপত্র আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।

যাবার সময় অলকা বলে, তাসখেলা যেন বন্ধ হয় না বাবা—ও বাড়ির রেখাকে ডেকে নেবেন, চারজন হয়ে যাবে।

নৃত্যলাল বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, রেখা আবার খেলতে জানে নাকি?

ভাল খেলে—আমার চেয়ে অনেক ভাল। সাত-আটটা দিন তো বাবা, কোন রকমে কাটিয়ে নেবেন।

আমি বাইরের কারো সঙ্গে খেলিনে—

শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে অলকা ট্যাক্সিতে উঠল। প্রভুলও যাচ্ছে, হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে।

শ্যামবাজার অঞ্চলে একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামল। প্রভুল বলে, নামো—

অলকা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে: এ কোথায়?

সেই যে কথা হয়েছিল, মনে নেই? নিরালা একটুকু বাসা—

অমল, দেখা গেল, হি-হি করে হাসছে। অলকা জিজ্ঞাসা করে: হল কি মেজ-দা? পাটনায় যাওয়া হবে না?

অমল বলে, কি দরকার? মা দিব্যি আছেন। চেঞ্জে যাবার কথা আছে বটে—সে এখন নয়, বোশেখ মাসে। তার এখনো তিন-চার মাস বাকি। ধরে নে, পাটনায় উঠলি। দিন আটেক পরে আবার তোর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

অলকা বলে, কি সর্বনাশ! তাহা মিথ্যেকথা বলে নিয়ে এসেছ?

অমল বলে, ইচ্ছে করে কি বলেছি—ঐ দুরাচার মিথ্যুক বানিয়েছে আমায়। বাসা করে দিনকতক একা-একা থাকবে—হোটেলে রুম ভাড়া করে তারপর আমার কাছে গিয়ে পড়ল। সেই ইস্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছি—কোনদিন ওর হাত এড়াতে পারিনি, আজকেও পারলাম না।

প্রভুল ইতিমধ্যে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ঢুকে পড়েছে। অমল

বলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়—ভিতরে চলে যায়। কার আবার নজরে পড়ে যাবে—তোরা এখন ফেরারি আসামির শামিল।

তেতলার একপ্রান্তে দুই সিটের কুঠুরি। ঘরে ঢুকে অলকা ঘাড় কাত করে দেখে নিল তার নতুন সংসার। স্যুটকেশটা সরিয়ে কোণের দিকে রাখল, তোষক-চাদর পেতে ফেলল খাটের উপর। প্রতুল হাত-পা মেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, আঃ, কী সুন্দর বাসা আমাদের!

অলকাও পাশে এসে বসেছে। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আমি নদী চেয়েছিলাম—ঘরের ভিতর থেকে নদী দেখা যাবে। কোথায়?

খোলা জানলায় সদর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। প্রতুল বলে, ঐটাই ভেবে নাও নদী। অফিসের বেলায় জোয়ার আসে, দুপুরবেলা ভাঁটা।

অবস্থা গতিকে তাই ভাবতে হয়। বড় বড় কয়েকটা গাছও আছে ফুটপাথের উপর। আম-কাঁঠাল-পেয়ারা-লিচু নয়—নিম আর দেবদারু।

প্রতুল বলে, ফল না হোক—ছায়া দিচ্ছে তো বটে! কি বলো?

অলকা ঘাড় নাড়ে: এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ফুলের বাগান? ভাড়া বাসায় থেকে সুখ নেই। বাগান না হলে হবে না। না—কিছুতে হবে না। তার চেয়ে গাড়ি ফেল হয়েছে বলে বাড়ি ফিরে তাসখেলা ভাল।

মুশকিলে পড়ে এবার প্রতুল। এদিক-ওদিক তাকায়। খানিকটা নিরুপায়-ভাবে বলে, বাগানটা হচ্ছে না বটে—তাই তো, ফুলবাগানের কি করা যায়!

গভীর স্নেহে অলকার মুখখানা বুকের উপর নিয়ে এলো। বলে বাগান না হোক, শতদল পদ্মফুল আছে একটি। আমার এই এক ফুলেই পুরো বাগান হার মেনে যায়।

আর কি বলবে এবার অলকা? কেঁদে না ফেলে এত আনন্দে! কোথায় ছিলে এদ্দিন লুকিয়ে সমুদ্রের মতো অকূল ভালবাসা নিয়ে? কলেজে পড়বার সময় অলকা হাসত ঠাকুরমার সেকেলে কথাবার্তায়—স্ত্রী নাকি জন্মজন্মান্তর ধরে একই মানুষকে স্বামী পেয়ে আসছে। আজকে মনে হচ্ছে, এমন খাঁটি সত্যি জীবনে কমই শুনেছে। যুক্তি-বিচারে নয়, মনের কানায় কানায় বুঝতে পারছে।

বন্ধ দরজায় টোকা। ধড়মড় করে অলকা উঠে বসে, আঁচল তুলে মাথার উপর দেয়। নিরালা বাসা হল তবে আর কোথায়, একটুখানি শোওয়া-বসার জো নেই মানুষের উৎপাতে। মানুষগুলো যেন মুকিয়ে থাকে।

হোটেলের চাকর ডাকছে : বাবু—

বাবুটির উঠবার গতিক নেই, ডাক শুনে তিনি আরো চোখ বুঁজে পড়লেন। অলকা দরজা খুলে দিয়ে বলে, কি রে?

খেতে যাবার জন্ম ডাক এসেছে। আর সমস্ত লোকের হয়ে গেছে—এরাই শুধু বাকি। কামরা অবধি তাই চলে এসেছে।

অলকা বলে, খেয়ে এসেছি আমরা। এ বেলা খাব না।

প্রতুল তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসল। না হে, এককথায় জবাব দিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তুই বাপু একজনের মতো খাবার দিয়ে যা—তাই বাঁটোয়ারা করে নেওয়া যাবে।

আর অমল ঐ যে ফেরারি আসামি বলে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা আনাগোনা করছে অলকার মনের মধ্যে। বলল, এখন বলে নয়— দু-বেলাই ঘরে খাবার দিয়ে যাবি। ডাইনিং-রুমে গিয়ে খেতে পারব না।

ঘরে খাবার দেবার নিয়ম নেই দিদিমণি। এক যদি বেশি রকমের অসুখ-বিসুখ হয়—

হেসে উঠে প্রতুল বলে, অসুখই তো রে—অতি সাংঘাতিক অসুখ। আমাদের দু-জনেরই। দেখছিস নে, নড়ে বসবার তাকত নেই। তোর একটু কষ্ট—তা ঘাবড়াস নে, তার ব্যবস্থাও হবে।

ঠিক হল তাই। অলকার আবার এক চিন্তা, অসুখ হলে তো সাবু-বার্লি দেয়। তাই যদি নিয়ে আসে এক এক বাটি?

প্রতুল বলে, ক'টা অসুখের খবর রাখো যাদু? আমরা তাবৎ অসুখের নাম-ধাম কুলশীলের ফিরিস্তি মুখস্থ করি। এমন অসুখও আছে, খাওয়া দুনো তেদুনো বাড়িয়ে দিতে হয়। এই যে আমাদের—এ-ও অসুখ এক রকমের, ফার্মাকোপিয়ায় যদিও দাওয়াই বাতলে দেয় নি।

পরম আলস্যে আবার সে গড়িয়ে পড়ে।

দিন ক'টা ভালই যাবে পাটনায় তোমার এই বাপের বাড়িতে। আমার কিছু টানা-পোড়েন আছে অবিশ্যি—দিনে দু-বার রাত্রে দু-বার আসা-যাওয়া। কিন্তু তুমি একেবারে রাজরাজেশ্বরী—দিনরাত গদিয়ান হয়ে থাকবে। সিঁড়িতে পা ঠেকাতে হবে না কোন বাবদে।

যেতে কি মন চায়? কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দেওয়া—গাড়ি অবশ্য প্রায়ই দেরি করে ছাড়ে আজকাল—তবু মোটের উপর একটা হিসাব আছে।

ঘড়ি দেখে প্রতুল বলে, যাই এবারে—কেমন? রাত্তিরে আসছি—একটু

নিশুতি হয়ে গেলে তার পর—এই ধরো দশটা সাড়ে-দশটা। শেষরাত্রে আবার গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে বাড়ির সকলের উঠবার আগে। দিনমানেও এই রকম। কেবল মাঝের সময়টুকু তুমি একা-একা থাকবে।

অলকা আঁৎকে ওঠে: ওরে বাবা!

এমন কাপুরুষ! হোটেলে মানুষ গিজগিজ করছে—আর অমলও আসবে মাঝে মাঝে।

তাড়া খেয়ে অলকা আর কিছু বলে না। তা বলে ভয় ঘোচে নি—মুখ শুকনো করে রয়েছে। প্রতুল বলে, দরজা বন্ধ করে থেকো বরঞ্চ, বই-টই পোড়ো। রাতে আসবার সময় দু-একটা বই হাতে করে আসব।

অলকা জানলায় বাইরের দিকে চেয়ে। দু-হাতে জোর করে তার মুখখানা একেবারে সামনাসামনি এনে কাতর হয়ে প্রতুল বলে, হাসো। মাঝের এই পাঁচ-ছ'ঘণ্টা আমাকেও তো একলা কাটাতে হবে—হাসিমুখ না দেখে গেলে থাকব কেমন করে?

বেরুচ্ছে প্রতুল। ফটকের কাছে ভারী-গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, ছুটছেন মশায়—ডাক্তারের কাছে বুঝি?

প্রতুল অবাক হয়ে তাকাল।

তিনি পরিচয় দিচ্ছেন: আপনার পাশের ঘরে আছি। পাকিস্তান থেকে এসেছি—সৃষ্টিধর কর আমার নাম। মাসখানেক হতে চলল—তা মশায় একটা বাসা খুঁজে পাইনে। আপনার বাড়ি কোথায়?

ফস করে সত্যিকথাটা বেরিয়ে যায়: ভবানীপুর।

বলেই বেকুব। ভদ্রলোক অতিশয় সদালাপী, সহজে ছাড়বার পাত্র নন। আত্মীয়ের ভাবে গদগদ কণ্ঠে বললেন, অসুখের কথা বলছিলেন কিনা চাকরটাকে—কি অসুখ?

তখন মালুম হল প্রতুলের। তর্কের মধ্যে না গিয়ে জবাব দেয়: কি অসুখ—ডাক্তার জানে। আমি তার কি বলব?

সৃষ্টিধর বলেন, না—তাই বলছিলাম, ভবানীপুরে বাড়ি থাকতে শ্যাম-বাজারে হোটেলে উঠতে হল কি না!

কথার ধরনটা ভাল নয়। প্রতুল বলল, বাড়ি থেকে চিকিৎসার সুবিধে হয় না। ডাক্তারও থাকেন এদিকটায়।

আর কথা না বাড়িয়ে হন-হন করে সে চলল। ঠিক যে সৃষ্টিধরের ভয়ে তা নয়। নৃত্যলালেরও কোর্ট থেকে ফেরার সময় হয়ে এলো।

নাঃ—যেমন ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। বেশ হাসিখুশি অলকা।

হোস্টেলের জীবন দুটো দিনেই রপ্ত করে নিয়েছে। প্রতুলকে সে-ই এখন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, এত লোক গিজগিজ করছে—ভয় আবার কিসের? দুয়োর বন্ধ করে থাকতে যে বলে, সেই মানুষ হল কাপুরুষ।

এ জীবনের স্বাদ জানত না তারা আগে। দু-জনে মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে—কথা নয়, গানের গুঞ্জন। এত কথা কিসের রে বাপু? কথার শেষ নেই, মানেও হয় না। কথার মাঝে অলকার ঘাড় দোলানি, হীরের দুলের ঝিলিক দেওয়া, খিল-খিল করে হেসে ওঠা ক্ষণে ক্ষণে। আরো যদি প্রতুল পাশ করে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে সত্যি সত্যি কোন গ্রামের নিভৃত কোয়ার্টারে বসতে পারত—উঃ, ভাবতে মন-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! অলকা বলে, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পাশের ঘরের ওঁরা পাকিস্তান থেকে এসেছেন। গিন্নিটি ভারি মিশুক – টেনে ওঁদের ঘরে নিয়ে বসালেন। পান খাইনে—তা জোর করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন একটা খিলি। বাসা খুঁজে খুঁজে হয়রান। স্বামী-স্ত্রী আর একটি বাচ্চা ছেলে—কোন রকম ঝামেলা নেই। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়িটা তো খালি পড়ে আছে—বাবাকে বলে দিয়ে দেব খান দুয়েক ঘর।

প্রতুল ব্যস্ত হয়ে বলে, সে সব বলা-টলা হয়ে গেছে?

অলকা বলে, তা বলতে যাব কেন? বোকা নাকি! কত আলাপ-পরিচয় করলেন। ওঁর নাম তরলা, আমি কিন্তু নামটাও বলিনি। বললাম, পাটনায় বাড়ি—কলকাতা দেখতে এসেছি হপ্তাখানেকের জন্য। কেমন বানিয়ে বলতে পারি, দেখ।

এই সেরেছে! আমি যে বললাম, বাড়ি ভবানীপুর—

অলকা হেসে উঠে হাততালি দেয়: কী বোকা রে! মেজদার কথা মনে নেই? ফেরারি আসামি আমরা—খাঁটি কথা বলতে আছে? বাড়ির নম্বরও বলে ফেলেছ বোধহয়।

আর ওদিকে সুহাসিনীও বড্ড খুশি। কর্তার কাছে দেমাক করেন: কি বলেছিলাম? বউমা যাবার পর লেখাপড়ায় ছেলের কি রকম মন হয়েছে দেখ। সব কথা তোমায় বলতাম না—আগে তো নানান ছুতোয় কলেজ কামাই। এখন দশটার সময় খেয়েদেয়ে বইয়ের গাদা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। দশ মিনিট আগে হবে তো পরে নয়।

ছেলের সুবুদ্ধিতে নৃত্যলালের খুশি হওয়া উচিত। তবু মন খুলে সমর্থন করতে পারেন না: তা বললে হবে কেন গিন্নি? বউমা কি কলেজের পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকত? কড়া নজর থাকলে বাপ-বাপ বলে কলেজে যেতে

দিশা পেতো না। তা দুপুরটা তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুবে, আর আমি কোর্টে মক্কেল তাড়িয়ে বেড়াব। হবেই তো ঐ রকম। নিজেদের কিছু নয়—দোষ দিচ্ছ এখন পরের মেয়ের।

অভিনিবেশ দিবাভাগে শুধু নয়—রাত্রিবেলাতেও। এ বাড়িতে সন্ধ্যার পরেই খাওয়ার রেওয়াজ। খাওয়ার পরে প্রতুল বাইরে এক তিল সময় কাটায় না। অলকা ভয় পাবে, তাই মড়ার হাড়গোড় বাইরের ঘরে ছিল। সমস্ত শোবার ঘরে নিয়ে তুলেছে। বই-খাতাপত্রও সেখানে। খেয়েদেয়ে সে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নৃত্যলাল তবু খুঁত-খুঁত করেন: দুয়োর-জানলা এঁটেসেঁটে দেয় কেন বলো দিকি?

সুহাসিনী বলেন, শীতকাল কিনা! ও আমার বড় শীতকাতুরে—লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়ে আরাম করে পড়ে।

আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ে না, ঠিক জান?

একটা জরুরি মামলার ব্যাপারে সেদিন রাত বেশি হয়ে গেল। বিলাতি নজির ঘাঁটছেন। ইংরেজি ভাষার অনেক মারপ্যাচ—একটা কথার বিশ রকম মানে দাঁড় করানো যায়। ঠিক কোন্ জিনিসটা বোঝাচ্ছে এখানে, নৃত্যলাল ভাবতে ভাবতে দিশা করতে পারেন না। বাইরে এলেন। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। ঘরের ভিতর কাজের মধ্যে এসব বোঝা যায় না।

প্রতুলের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন: এই—শুনতে পাচ্ছিস? ডিক্সনারি কি আছে তোর কাছে, একটা কথায় মানে আটকে যাচ্ছে।

সাড়া নেই। এইরকম পড়া পড়ছে বটে—তারই দেমাকে সুহাসিনী বাঁচেন না! দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। তারপর ঠাহর হল, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। গেল কোথায় তা হলে—কি হল? ঘরে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ বসে রইলেন - দেখা নেই। চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। ঠিকই আছে, সদর দরজা বন্ধ।

রাত থাকতে প্রতুল যথারীতি পাঁচিল টপকে এলো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, শিকল খোলা। বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। খুলল কে শিকল? তার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে—সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ! নৃত্যলাল অপেক্ষা করতে করতে শুয়ে পড়েছেন ঐখানে. তারপরে ঘুম—

বাপের মুখোমুখি না পড়ে—প্রতুল বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসল। আর মনে মনে নানারকম কৈফিয়ৎ ভাঁজছে। নৃত্যলাল উঠে তারপর বৈঠকখানায় এলেন তো সুড়ুৎ করে সে চলে গেল ভিতরে। বাপে ছেলেয় লুকোচুরি

খেলা চলছে যেন। নৃত্যলাল এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি কাউকে—সুহাসিনী অন্নদা কেউ কিছু জানেন না। প্রতুলের ভয় আরও বেড়ে যায়, দুরন্ত অভিমানে চোখে জল আসবার মতো। বাবা, তুমি কি ভেবে বসে আছ? তোমাদের হাকিমরা অতি ঘৃণ্য আসামিরও জবাব জেনে নেয়—আর আমায় ডেকে একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করলে না!

নৃত্যলাল কোর্টে চলে গেলেন। এবং রোজ যেমন কলেজে যায়, প্রতুলও বেরুল। সোজা একেবারে অমলের হোস্টেলে। সে নেই—কোনদিন থাকে না এমন সময়। জানা আছে প্রতুলের—কিন্তু ঐ কাণ্ডের পর বাপের চোখের উপর দিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে আসে কেমন করে? ফিরবে কখন অমল—তার কোন ঠিকঠাক নেই। আচ্ছা, রইলাম বসে—

স্বস্তিধর দুপুরবেলাটা টো-টো করে বেড়ান, আজকে ঘরে আছেন। তরলা বলছিলেন, ছেলেটার অসুখ-অসুখ—সেইজন্যে নাকি? দু-জনে যেন বচসাও বেধে গেছে।

অলকার মজা লাগে। স্বামী-স্ত্রী হলেই কি এই? তাদের এখনো এদিন আসেনি—কিন্তু আসবে ঠিক বিয়েটা কিছু বাসি হয়ে গেলে। প্রতুলের আসার সময় হয়ে গেছে, আসে না কেন আজ এখনো? একা একা বই পড়তে ভাল লাগে না। তা এক কাজ হল অবিশ্যি, লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁদের ঝগড়া শোনা। কথাগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে, ঝাড়তে হবে প্রতুল এলে তার উপর। সেই কতক্ষণ থেকে তোমার পথ তাকিয়ে আছি—কথা বলব না তো, একটা কথাও নয়।

কান পেতে শোনে, কী বলছেন ওঁরা। সর্বনাশ, তাদের কথাই যে! ছেলেটার কি-একটু ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন হয়েছে—স্বস্তিধর তাই নিয়ে তিলকে তাল করছেন।

কেন যাও ও-ঘরে তুমি? কিসে কি হল, কে জানে! দেশ-ঘর ছেড়ে এই তো পথে পথে বেড়াচ্ছি। এর উপর যক্ষ্মার ছোঁয়াচ যদি কুড়িয়ে নিয়ে এসো—

সভয়ে তরলা বলেন, কার যক্ষ্মা?

ঐ যে বউটা, যার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব তোমার—

তরলা বলেন, কি বলছ? গোলগাল কেমন সুন্দর চেহারা—তার যক্ষ্মা হতে যাবে কেন?

ও রোগের লক্ষণই এই। বাইরে নাদুস-নুদুস, ভিতরটা ঝাঁঝরা।

ভবানীপুরে বাড়ি—তা বাড়ির লোকে দূর করে দিলে শেষটা এই হোটেলে এনে তুলতে হয়েছে।

তরলা প্রতিবাদ করেন: বাড়ি তো পাটনায়। বউ আমায় নিজে বলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, বোঝ তাহলে। স্বামী বলে ভবানীপুর বাড়ি, বউ বলে পাটনায়। পাপ না থাকলে ঢাকাঢাকি করতে যাবে কেন?

কলকাতায় শহর দেখতে এসেছে নাকি পাটনা থেকে! আমি তাতে বললাম, ঘর থেকে তো এক লহমা বেরোও না ভাই, জানলা দিয়েই শহর দেখছ নাকি?

সৃষ্টিধর বলেন, তাগত আছে বেরোবার? হাঁটাহাঁটি করলেই মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুবে—ও ব্যাধির এই নিয়ম।

অলকার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। প্রতুল বলেছে এই কথা—সত্যি নাকি তার এই অবস্থা? টি-বি রোগের প্রধান লক্ষণই, শোনা আছে, রোগি নিজে কিছু সন্দেহ করে না—সে ভাবে, চমৎকার স্বাস্থ্য তার—

বিকালের দিকে ছেলের জ্বর বাড়ল। তিনটি মারা গিয়ে তার পরে এই গুঁড়ো। সৃষ্টিধর ক্ষেপে গেছেন। যত অপরাধ যেন অলকার। বিষম চেঁচামেচি লাগিয়েছেন: বিষ ছড়ানো হচ্ছে হোটেলে অধিষ্ঠান করে। নিজে তো যাবেই, সাথেসঙ্গে আরো দু-পাঁচটাকে যদি সাপটানো যায়।

তরলা সামলানোর চেষ্টা করছেন: আঃ, হচ্ছে কি বলো তো? আমি বলছি, মিথ্যে সন্দেহ তোমার। রোগপীড়া কিছু নয়। ভদ্রলোক ঠাট্টা করেছেন তোমার কাছে। কিংবা অন্য কিছু হতে পারে।

বলো, কি তাহলে? ইনি একরকম বলেন, উনি অন্যরকম। ডাকাতির আসামি? না কি, ইলোপমেণ্ট—স্বামী-স্ত্রী সেজে লুকিয়ে রয়েছে।' পাজির পা-ঝাড়া হল ম্যানেজারটা—টাকার লোভে পাপ এনে ঢুকিয়েছে। হোটেলে কত ভাল ভাল মানুষ আসে, মেয়েছেলে নিয়ে আছেও কতজনা! দূর করে দেবো আজকেই ওদের। ম্যানেজার না শোনে—আমরা নিজেরাই বিহিত করব। উপর-নিচে জন পঞ্চাশ তো হবো—এ সমস্ত যে শুনবে, সে-ই ক্ষেপে যাবে।

অলকা আর দাঁড়াতে পারে না, ফিরে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। উঃ, কখন আসবে তুমি? আসবে না আজকে মোটেই? সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলে বুক কেঁপে ওঠে। ঘাড় ধরে এই বের করতে আসে বুঝি জন পঞ্চাশ! কি করবে সে এখন, কি উপায়? মেজদা'টাও এসে পড়ত যদি—ঈশ্বর মেজদা'কে না-হয় এনে দাও—

অমল হোস্টেলে ফিরে দেখে প্রতুল বসে আছে। উস্কোখুস্কো চেহারা।

সমস্ত শুনে সে হাসতে লাগল।

কর্তা ভেবেছেন, বউ বিহনে তুই বখে গেছিস তাই চুপচাপ আছেন। ছেলের কেলেঙ্কারি নিয়ে তো ঢাক পেটানো যায় না!

প্রতুল আহত কণ্ঠে বলে, এত বছর ধরে মানুষ করলেন—বাপের এই বিশ্বাসটুকু নেই ছেলের উপর?

বিয়ের সময় আর একটা ঘাড়ে চাপে, তখন থেকে মানুষ চতুষ্পদ হয়ে যায় কি না!—হাসি থামিয়ে অতঃপর অমল গম্ভীর হল: অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠেছে ভাই। আর কাজ নেই—পাটনা থেকে ফিরে আসুক এবার অলকা।

প্রতুল বলে, ফিরতেই হবে—না ফিরে উপায় আছে কিছু? এর পরে আর আমার রাতে বেরুনো হবে না। দিনমানেও আটকে ফেলবে কিনা, কে জানে?

ফোঁস করে এক নিশ্বাস ফেলল।

একটা হপ্তা থাকব বলে এসেছিলাম, দু'দিনে সব শেষ। হোটেলের এই দুটো দিন অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইল। একটা বড় শিক্ষা হল—বাপের ভাতের উপর থেকে যে বিয়ে করে, সে হল এক-নম্বর আহাম্মক।

আবার তাগাদা দেয়: ওঠ্ তাহলে। বোনকে পৌঁছে দিয়ে আয় পাটনা থেকে। সেই এগারোটা থেকে আমি ধন্না দিয়ে আছি।

অমল ঘাড় নাড়ে: উহু—আসব কিসে? ওদিক থেকে একটা ট্রেনও এ সময়ে নেই—

ঊর্ধ্বমুখী হয়ে একটুখানি হিসাব করে বলল, সকালবেলার আগে কোন উপায় নেই ভাই। ঐ সময় দিল্লি-এক্সপ্রেসে এসে পৌঁছবে।

প্রতুল বিরক্ত কণ্ঠে বলে, দুত্তোর! আবার ঘণ্টা দশ-বারো দেরি পড়ে গেল। হোস্টেলে তবে বলে কয়ে চল—ঐখানে রাতে থাকবি। বিষম ভীতু তোর বোন—এতক্ষণ কি করছে, কে জানে? যত বাহাদুরি তার আমাদের কাছে!

স্থিধর ম্যানেজারের অফিসে হামলা দিয়েছেন। রীতিমতো একটা দল সঙ্গে।

যে আসবে, তাকেই অমনি জায়গা দেবেন? খবরবাদ নেবেন না, কি মতলবে আসছে বুঝেসমঝে দেখবেন না—টাকা গণে দিলেই হয়ে গেল!

এক একজনে এক এক রকম বলে। জবাব দিতে গেলে আরও ক্ষেপে যায়। এই মারে তো এই মারে! বিপন্ন ম্যানেজার এমনি সময় প্রতুলকে দেখে অকূল-সমুদ্রে যেন কূল পেলেন।

আসুন—এই দিক দিয়ে হয়ে যাবেন মশায়। আপনার বাড়ি কোথায় শুনিয়ে দেন তো ভদ্রলোকদের—

প্রতুল বলে, ভবানীপুর—

আপনার স্ত্রী বলেছেন পাটনায়। আরও নানান রকম উল্টোপাল্টা কথা। আমি যে মারা যাচ্ছি মশায় সেই ঠেলায়।

তার বাড়ি সেখানে—মানে বিয়ের আগ পর্যন্ত বরাবরই ছিল কি না! অভ্যাস বশে বলে ফেলেছে।

সৃষ্টিধর বলেন, রোগি এনে তুলেছেন—কি রোগ সেটা ঠিক করে বলুন। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখান। নইলে ছাড়াছাড়ি নেই। এমন রোগ যে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করতে দিল না—

অমল পিছনে পড়ে গিয়েছিল। ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি সামনে এসে বলে, রোগ আর নেই। বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে। দুটো দিনেই বেশ ভাল রকম চিকিৎসা হয়ে গেছে।

ম্যানেজার চমকে ওঠে: হপ্তার কথা বলে ঘর নেওয়া হল যে?

হপ্তার টাকা মিটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা। অসময়ে কোথায় যাই—রাতটুকু শুধু রেহাই করুন আপনারা।

কথা পেয়ে সকলে নরম হল। আর সত্যি যে অসুখ-বিসুখ, বউটাকে যারা চোখে দেখেছে—তাদের সেরকম মনে হয় না। তরলা এসে এমনি সময় ডাকলেন: ছেলে খুব ঘামছে—জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে এইবার।

সকালবেলা অলকা এসে শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করল। চোখে দেখতে পেয়েই মন জুড়িয়ে যায়। নৃত্যলাল গাঢ় স্বরে বললেন, আয় মা। ক'দিন ছিলিনে—বাড়ি একেবারে অন্ধকার। তাসের আড্ডা ভুলে দিয়েছি।

অলকার নিজের কোর্ট—হোটেলের সেই ডাঙার-মাছের অবস্থা নেই। কালকের কান্নার পর ঝিকিমিকি হাসি এখন। হেসে মুখচোখ নাচিয়ে বলে, আমারও কি ভাল লাগছিল? তাই দেখে বাবা বললেন, কাজ নেই—তোর নিজের বাড়ি চলে যা। মা দুঃখ করতে লাগল: এতকাল খাইয়ে পরিয়ে দু-মাসের মধ্যে মেয়ে পর হয়ে গেল। মেজদা ফিরে আসছিল, তারই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লি-এক্সপ্রেসে—

ও বেহাই, মা-জননী এসে গেছে এই যে! আপনি বললেন, যায়নি মোটে পাটনায়। আপনারা এক ট্রেনেই তো আসছেন।

সবিস্ময়ে অলকা বলে, বাবা এখানে?

হ্যাঁ, কালকে টেলিগ্রাম করেছিলাম তোকে নিয়ে চলে আসবার জন্য। ব্যস্ত হয়ে উনি একাই চলে এসেছেন। কই, অমল গেল কোথায়?

অমল গতিক বুঝে চক্ষের পলকে সরে পড়েছে। আর প্রতুল এ সমস্ত কিছুই জানে না—বাইরের ঘরে মহাশব্দে সে পাঠাভ্যাস করছে। শক্ত এগজামিনের পড়া—বাজে ব্যাপারে মন দিলে চলে না।

সীমান্ত

শুনতে গল্পের মতো, কিন্তু খাটি বৃত্তান্ত। ইসমাইলের দালানটা পড়ল পাকিস্তানে কিন্তু দলিচঘর হিন্দুস্থানে। ঢেঁকিশালের ঢেঁকি তুলে ফেলে লেপে-পুঁছে সেইটে হল নতুন দলিচঘর। ঢেঁকির আর দরকার নেই—দু'টি মাত্র মানুষ, চাল কিনে খায়। এখন ইসমাইল পুরোপুরি পাকিস্তানি—কেউ আর কিছু বলতে পারবে না। আর এক কাজ করল অত্যন্ত গোপনে—দলিচঘরের মেজেয় একটি ঘটি পোতা ছিল, মেজে খুঁড়ে রাতারাতি সেটা নতুন দলিচঘরে এনে পুতল।

এমন আরও অনেকের হয়েছিল, যে যার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। চিরকালের পড়শি—কত ভাবসাব পরস্পরের মধ্যে। কিন্তু কী যেন হয়ে গেল! মেলামেশা এখনো আছে, 'বেহুলার ভাসান' শোনে এক আসরে বসে। বাইরে থেকে আগেকার মতোই, কিন্তু মনে মনে বেড়া পড়ে গেছে।

দিগন্তব্যাপ্ত বগাউড়ার মাঠ—ঐ মাঠের জমি নিয়ে কত মারামারি মামলা-মোকর্দমা, আবার পাশাপাশি ক্ষেত চষতে চষতে কত সখীসোনার গান—হাসি-মস্করা। ধান কেটে কেটে গাদা দিয়ে রেখেছে মাঠের ও-সীমানায়। মলছে, দলছে। কেষ্টপুরের গৃহস্থবাড়ির গোলাগুলো ঠিক একেবারে মাঠের প্রান্তে। বেঁটে বেঁটে গোলাঘর এই সীমানার রাধানগরকে দেখিয়ে জাঁক করছে বর্তুল উদর-বিস্তার করে। ফসল তুলে-নেওয়া জ্যৈষ্ঠের ফাঁকা মাঠে হু-হু করে অবিরাম হাওয়া বয়। একই হাওয়া। রাধানগরের ঘর-কানাচের সুপারিগাছ দুলিয়ে কুয়োর পাড়ের শরবনে বাজনা বাজিয়ে কাঁচা-সড়কে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সেই হাওয়াই মাঠ পার হয়ে কেষ্টপুরের দিকে চলে যায়। হাওয়াটা কেউ আলাদা করতে পারে নি। রাধানগরের প্রতিটি ঘরের দীর্ঘশ্বাসও চলে যায় ওদিকে—শূন্য উদরের লোলুপতা সারি সারি ধান-গোলার কাছে তৃপ্তি যাচ্‌ঞা করে ফেরে। আহা, গোলাগুলো ঠিক সীমান্তে না বেঁধে বাড়ির পিছন দিকে নজরের আড়ালে নিয়ে যদি বাঁধত!

কোথা দিয়ে কি হল। বুড়োরা প্রত্যয় করে না—ঘাড় নেড়ে হুঁকো টানতে টানতে বলে, হল কাঁচকলা—হল ঘোড়ার-ডিম। মাল-খাজনাটা এখন থেকে এই তরফে নিয়ে নেবে—আবার কি! নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, পাকা-পাঁচিল তুলুক আগে বগাউড়ার মাঠ বাঁটোয়ারা করে—সেই সময় বুঝব।

পাঁচিল তোলে নি। কালী পোদ্দারের কীর্তি—ছায়াময় পাকা-সড়কের পাশে পুরানো এক তেঁতুলগাছের গা কেটে ইংরেজি অক্ষর 'পি' লিখে দিয়েছে মাত্র। অর্থাৎ পাকিস্তান শুরু এই তেঁতুলগাছ থেকে। আর রাধানগরের দিকে লা-ভাঙার খাল পার হয়ে এবং কেষ্টপুরের দিকেও আধ-ক্রোশটাক দূরে সীমানা-বাবুরা বন্দুক-সিপাই নিয়ে ঘাঁটি জমিয়ে বসে আছে। গাড়ি-মানুষ সবাইকে থামতে হয় ঘাঁটির মুখে। দেখাশুনো হিসাবনিকাশ হয়। আটক হচ্ছে কেউ কেউ, আবার ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছে।

দুই ঘাঁটির মাঝখানে বগাউড়ার মাঠের প্রান্তে কেষ্টপুর ও রাধানগর দিনকে-দিন হতভম্ব হয়ে পড়ছে ঘাঁটিওয়ালাদের রকম-সকম দেখে। প্রাচীন মুরুব্বিদের বচনের আর সে জোর নেই। নানা গুজব রটনা হয়। বিষম গণ্ডগোল চলেছে নাকি চারি দিকে। স্টেশনে চলতি গাড়ির দিকে নজর করেও সেটার আন্দাজ পাওয়া যায়। মানুষজন পাগল হয়ে পালাচ্ছে। বাদুড়-ঝোলা বললে কিছুই বলা হল না- গাড়ির ছাতে মানুষ, পাশে মানুষ, নিচে মানুষ। আজ্ঞে হ্যাঁ—নিচেও, চাকার গায়ে মানুষ লেপটে আছে—সেখানে কয়টা শিকের উপর দিব্যি বসবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অবশেষে আরও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেল—ইসমাইলের ছেলে রমজান সদরের ইস্কুলে লেখাপড়া করত, সেইখানে মাথা ভেঙে দিল তার।

আর এক ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। দিনে-রাত্রে রেলগাড়ি দু-বার আসে, দু-বার যায়। সীমান্তের তেঁতুলগাছটা পার হয়ে পদ্মফুলে-ভরা পুরানো দীঘির কাছাকাছি ইঞ্জিন ধীর হয়ে আসে—কল বিগড়ায় অথবা আর কি ঘটে যেন। রোজই ঘটে। অগণ্য লোক অপেক্ষা করে দীঘির ওপাশে। আর যেই মাত্র থামা, শ'খানেক লোক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পিলপিল করে চলে কাঁটা-তার ডিঙিয়ে, পগার পার হয়ে। দেখতে দেখতে বাজার জমে যায় দীঘির পাড়ে। তর্কাতর্কি, দরাদরি, মাল ধরে টানাহেঁচড়া—প্রায় এক লড়াইয়ের ব্যাপার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেচাকেনা শেষ। বিক্রির টাকা-পয়সা নিয়ে তখন কতক গ্রামের মধ্যে কতক বা হাটে চলল—এদিককার জিনিসপত্র সওদা করে আবার ওদিকে নিয়ে বেচতে

হবে, সেই ব্যবস্থায়। এই এক খাসা ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে ক'মাসের মধ্যে।

এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার—মঞ্জুলা এসে ইসমাইলের দলিচঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছে।

এত বেলা অবধি ঘুমোও? ওঠো না। আমি মঞ্জু—

পোহাতি-তারা আকাশের গায়ে—আর বকছে, বেলা হয়েছে নাকি! হাঁক-ডাকে ইসমাইল বেরিয়ে এলো।

মঞ্জু বলে, অমন করে তাকাচ্ছ—চিনতে পারছ না আমায় দাদু? ভাসুর-জায়েরা তাড়িয়ে দিল—আর আমার জায়গা নেই কেষ্টপুর ছাড়া।

আসা হল কখন?

মঞ্জুলা রাগ করে বলে, কি ব্যাপার বলো দিকি? মাথা খারাপ হল নাকি যে আমার সঙ্গে ভব্যতা করছ—আসা হল কখন?

ইসমাইল নিরুত্তরে পাশ কাটিয়ে নেমে যায়। কিন্তু মঞ্জু ছাড়ে না।

কেন বকুনি দিলে না, খবরবাদ দিস নি—কোথায় মরে ছিলি এদ্দিন মুখপুড়ি? বলতে পারলে না, এলি কেন মড়কের রাজ্যে, এই মড়িপোড়া শ্মশানঘাটায়?

ইসমাইল মুখ ফিরিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে, এটা তোদের শহর-বাজার নয়—কেউ কাউকে মারে নি এ-তল্লাটে। মড়কের রাজ্য কিসে হল?

কায়েতপাড়া ঘুরে দেখে এসে তবে বলছি। না মেরেছ তো গেল কোথায় সব? ফাঁকা ঘরদুয়োর হা-হা করছে—গদখালির সেই ভুতুড়ে পাড়ার মতো।

মঞ্জুর ঠোঁট দুটো থর থর কাঁপে, চোখ জলে ভরে যায়। বাঁ-হাতে অলক্ষ্যে চোখ মুছে অস্ফুট স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তকরারই চালাবে- না বসতে দেবে একটু?

গলা শুনে কামরুনও এসেছে দালানের দরজা খুলে। সে বলে, অবাক করলি মঞ্জু। তোকে আবার ঘটা করে আসনপিঁড়ি দিতে হবে? ঘরদুয়োর তো আসমানে উড়ে যায় নি?

মঞ্জুলা নালিশ করে, দেখ না বড়দি। দাদু কী রকম হয়ে গেছে। সমীহ করে কথা বলছে—যেন আমি কত দরের মানুষ!

কামরুন বলে, চটি খুলে এসে বোস। বলুকগে আবোল-তাবোল। ইচ্ছে হলে জবাব দিবি, নয় তো মুখ ভেংচাবি।

মঞ্জুলা খুশি হয়ে বলে, মড়ার রাজ্যে তুমিই জ্যান্ত রয়েছ বড়দি। রক্ষে

পেলাম, ধড়ে প্রাণ এল। দাদুর রকম-সকম দেখে ভয় হচ্ছিল, এক্ষুনি আবার বাইশগজি হাত বের করে না বসে—

খান পাঁচেক গ্রামের পরে সুবিখ্যাত গদখালি—সেখানকার বাইশগজি হাতের গল্প না শুনেছে, এমন লোক নেই। মহামারীতে এক সময়ে ঐ গ্রাম উজাড় হয়ে যায়, মেয়েপুরুষ একজন-কেউ বেঁচে ছিল না। পণ্ডিতজনেরা বলেন, নিছক গালগল্প নয়—কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে কাহিনীর মধ্যে। খালবিল বেঁধে প্রথম যখন রেললাইন বসানো হল, ম্যালেরিয়ায় এমনি দশা-ই হয়েছিল এ-তল্লাটের। সে যাই হোক, জামাই আসছেন গদখালির শ্বশুরালয়ে নতুন রেলগাড়ি চেপে। সন্ধ্যার পর স্টেশনে নেমে হন হন করে এসে তো পৌঁছলেন। সমস্ত পাড়ার মধ্যে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল না, কোন বাড়ি আলো জ্বলছে না। শ্বশুরবাড়িতেও সেই ব্যাপার—জামাই সদরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে, কেউ সাড়া দেয় না। অবশেষে বউ বেরিয়ে এসে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। বলে, পুবপাড়ার বিয়েবাড়ি গেছে সবাই, আমার শরীর ভাল ছিল না—। মিষ্টি হেসে বলে, মনে মনে কেমন টের পেয়ে গিয়েছিলাম যে, তুমি আসবে- তাই যাইনি। তার পরে স্বামীর আদরযত্ন, জ্বালানি কাঠের অভাবে উনুনের আগুনে নিজের একখানা পা ঢুকিয়ে রান্নাবান্না করা, জানলা দিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত মাপের একখানা হাত বাড়িয়ে বাগানের নেবুগাছ থেকে নেবু সংগ্রহ করে পুনশ্চ সেই হাত গুটিয়ে নেওয়া- ইত্যাকার যাবতীয় কাহিনী সবিশেষ জানে সকলে। মঞ্জুও কতবার শুনেছে, আর আজকে কায়েতপাড়ায় গল্পের সেই মরা-গদখালি যেন চোখে দেখে এলো।

ইসমাইল চারা-নিমগাছ থেকে দাঁতন ভাঙছিল। কামরনকে জড়িয়ে ধরে মঞ্জু বলে, সে দাদু নেই আর! থাকলে এদ্দিন পরে এলাম— দাদু আমায় এমনি ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখাত? বাইশগজি হাতের থাপ্পড় কষে দেবে— বাইরে নয় বড়দি, চলো ঘরের ভিতর যাই।

হাসি-রহস্যে গুমোট ভাবটা উড়িয়ে দিতে চায়। ফল কিন্তু উল্টো হল। ঘুসি পাকিয়ে ইসমাইল বলে, ইচ্ছে করছে তাই। এক ঘায়ে দিই মাথা তোর ভেঙে—ঘিলু ছিটকে পড়ুক।

কামরন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: খুব বাহাদুরি! যারা হাঙ্গামা করল, তারা সব ফাঁক কাটিয়ে সরে পড়েছে—ক্ষমতা থাকে, তাদের উপর শোধ নাওগে। তা নয়—আপন মানুষ বাড়ি এসে উঠল, তার উপরে যত শাসানি!

ইসমাইল বলে, ঐ তো নিয়ম। মানুষ ধরে নয়, জাত ধরে হচ্ছে। ছুটো

জাত—মোছলমান আর হিন্দু। তার মধ্যে যে জাতের যাকে যখন কায়দায় পাবে ভিন্নজাত তার উপর শোধ তুলবে।

মঞ্জু বলে, তা বেশ, দাও মাথা ভেঙে। ভাঙো, ভাঙো—না ভাঙো তো অভিবড় দিব্যি রইল। উঃ, বড়-মুখ করে আমি জোরের জায়গায় ছুটে এলাম—পুল থেকে গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়াই উচিত ছিল।

রাগে কাঁপছে মঞ্জুলা। ছুটে যাবেই সে ইসমাইলের কাছে, কিম্বা হয়তো দালানের থামে মাথা কুটবে। রাগলে জ্ঞান থাকে না—চিরকাল মেয়ের ঐ মেজাজ। তার শ্বশুরবাড়ির বিস্তারিত খবর যদিচ শোনা হয়নি, তবু আন্দাজ করা চলে—এই দোষেই সেখানে জায়গা হল না।

কামরন টানতে টানতে তাকে দরদালানে নিয়ে গেল: কিছু মনে করিস নে সোনামাণিক। রমজান যাবার পরে ওর অমনি ভাব হয়েছে। এক এক সময় আমারই উপর খাপ্পা হয়ে ওঠে, কোন্‌দিকে লুকোব তখন ঠাহর পাই নে।

সম্পন্ন গৃহস্থ এরা—গোয়ালে গরু, গোলায় ধান। নতুন পাকা-দালান দেবার পর ইচ্ছা হল একমাত্র ছেলেকে ভাল লেখাপড়া শিখিয়ে দশের একজন করবে। এক নানা ছিলেন উকিল—তাঁর বাসায় থেকে সে শহরের ইস্কুলে পড়ত। সর্বনেশে খবর এলো, লাঠি মেরে রমজানের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—লাঠি পিটে পিটে যেমন ইঁদুর মেরে ফেলে তেমনি করে মেরেছে। ছ'মাস হাসপাতালে থাকবার পর ইসমাইল তাকে কেষ্টপুর নিয়ে এল—কাজ নেই আর পড়াশুনোয়, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে গ্রামের মধ্যে প্রাণে বেঁচে থাকুক। এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি ছেলের—উচ্চ-প্রাইমারিতে বৃত্তি পেয়েছে, হরিশ পণ্ডিত শতমুখে তার ব্যাখ্যান করতেন। সেই ছেলে কথাবার্তা বড়-একটা বলে না, ভাসা-ভাসা চোখ মেলে সকলের দিকে চায়, এ দুরন্ত দুর্বৃত্ত পৃথিবীকে বুঝে উঠতে পারে না যেন কিছুতে। হঠাৎ-বা আর্তনাদ করে ওঠে: ঐ যে—আসছে আব্বা, ধরো—আটকাও ওদের। আতঙ্কে ছুটে পালাতে চায়। একদিন অমনি পালাতে গিয়ে ছাত থেকে পড়ল রোয়াকের ওপর। কাটা মাথা আবার ফাটল—রক্ত বন্ধ হয় না। ঝিমিয়ে এলো ছেলে—পানি খেতে চায়। নিদারুণ তৃষ্ণা—এই দিচ্ছ, আবার বলে, পানি—। যেখানে যত পুকুর নদী সমুদ্র আছে, সমস্ত শুষে খেলেও কেন তার তৃষ্ণা যাবে না। সে সব ভাবতে গেলে ইসমাইলের মাথার ঠিক থাকে না—সে তখন হন্যে হয়ে ওঠে।

কতদিন পরে মঞ্জুলা ফিরে এসেছে। বড়দি'র সঙ্গে গলাগলি হয়ে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। সহসা জিজ্ঞাসা করে: বাবার আর কোন খবর বলতে পারো?

কামরুন জবাব দেয় না, তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

মেরে ফেলেছে ?

কামরুন ঘাড় নাড়ে : না, হাঙ্গামা হয়নি—ঐ যে শুনলি, ছোঁয়াছুঁয়ি চলেনি এদিকে। কিন্তু এক-কোণে না মরে ভিন্নে ভিন্নে মরে গেছে ওরা। হয়তো-বা এখনো মরছে আর কোথায় গিয়ে।

বলতে বলতে থেমে গেল। ভাবছে চিরকালের সাথী নিরপরাধ সেই প্রতিবেশীদের কথা। মঞ্জুলার বাবা যদুনাথ না-হয় হাত-পা-ছাড়া একলা মানুষ – কিন্তু কাচ্চাবাচ্চা-স্ত্রী-পরিজন নিয়ে যারা বিদায় হয়ে গেল ? কোথায় কোন অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা ভিক্ষাপাত্র হাতে! কোন্ পোড়োমাঠে একটুখানি ছাউনির নিচে নিঃসম্বল সংসার পেতেছে। সবাই মনে করে, জঞ্জাল ভেসে এসে জমেছে। উদ্বাস্তু নাম দিয়েছে সে-দেশের লোক। মানমর্যাদা নেই, আপন বলে কেউ কাছে ডাকে না, মহাশয়েরা একটু-আধটু বড় জোর দয়া দেখায়।

মঞ্জুলা বলে, পালাল কেন ভীরুর দল ? নিজের গ্রাম নিজের ভিটেয় থাকতে পারল না জোর করে ?

কামরুন বলে, বোঝ তাই। ভিটেমাটি মানুষ কম কষ্টে ছাড়ে! ছেড়ে যেতে কলজে ছিঁড়ে যায়। তবু তারা সর্বস্ব ফেলে রাত-বিরেতে চোরের মতো সরে পড়ল।

আমি কিন্তু থাকতে এসেছি বড়দি। যাবোই বা কোথা, কোনখানে জায়গা নেই। দাদুকে দিয়ে আমাদের বাড়ির একটা ঘর সারিয়ে নেবো। তারই বা দরকার কি—এ বাড়িতে হবে না একটা মানুষের জায়গা ? মরি তো আপন জায়গায় চেনা মানুষের মধ্যে একদিন মুখ থুবড়ে মরব। ভিক্ষের ঝোলা হাতে বাইরে ছোটাছুটি—বড্ড ঘেন্নার ব্যাপার, তার চেয়ে মরণ ভাল।

ইসমাইল দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। সে কি শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? কিন্তু কথার ভাবে প্রকাশ নেই। বলল, চান করে রান্না চাপিয়ে দে এবার। গল্প মুলতুবি থাক। রাতে জুটেছে বোধহয় লবডঙ্কা। তাড়াতাড়ি কর্—

আলস্যের ভাবে আড়মোড়া ভেঙে মঞ্জুলা বলে, একার জন্য যাচ্ছি আমি আলাদা রান্না করতে! তোমরা রাঁধবে না বড়দি ? আমাকে বাদ দিয়ে খাবে ?

তাই তো হত—হয়েও এসেছে। একটুখানি ইতস্তত করে কামরুন বলে, কপাল পুড়িয়ে এসেছিস যে! চলবে কেন আমাদের রান্না ? লোকে ছি-ছি করবে।

মঞ্জুর জবাবের আগেই ইসমাইল হেঁকে উঠল : ইঃ, রান্না করে খেতে পারবেন না ! করতেই হবে। না পারিস উপোসি থাকবি।

আর ইসমাইল রাগলে মঞ্জু কিছুতেই কম যাবে না। চিরদিনের এই রীতি : থাকব উপোসি তোমার বাড়ির উপর। বেশ ! ওই কথা রইল, জলবিন্দু খাব না—

ইসমাইল গজর-গজর করছে : নবাবজাদি এসেছেন কিনা—রেঁধে-বেড়ে মুখে তুলে ধরতে হবে। বাপ চিরকাল আমাদের মাথায় পা দিয়ে বেড়িয়েছে, মেয়েরও সেই মেজাজ। কিন্তু পাকিস্তান এর নাম—তোদের জারিজুরি এ জায়গায় নয়।

কামরন তাড়া দিয়ে ওঠে : এসব কি জন্যে বলো ? এইটুকু বয়স থেকে খেয়ে আসছে, নিজে তুমি কত কি এনে এনে মুখে ধরেছ। সেই রকম অভ্যাস আছে, তাই বলছে।

ইসমাইল বলে, আর নয়। বেইমানের ঝাড়। শেষটা বলবে, বিষ খাইয়ে দিয়েছে। হাতে দড়ি পড়ুক আমার !

আর সে দাঁড়াল না, হন হন করে চলেছে। তলতাবাঁশগুলো নুয়ে পড়েছে অদূরে গোরস্থানের উপর। দু-দিন বৃষ্টির পর প্রসন্ন রোদ উঠেছে, রোদে বিল মাঠ-ঘাট ভরে উঠেছে। বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে কুচি কুচি রোদ এসে পড়েছে গোরের উপর। ভারি হল্লোড় আজ যে ওখানে। বাঁশ ক্যাঁচ-কোঁচ করছে—বাঁশগাছে দোলা টাঙিয়ে বেদম দুলছে বুঝি এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। ইসমাইল থমকে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুপচাপ। চুপ করে গেছে যেন তার ভয়ে।

বুকের ভিতর থেকে কে যেন কেঁদে উঠল রমজানের কণ্ঠে : রান্না করবি নে আমার জন্যে, ভাত দিবি নে, পানি দিবি নে ? বাদ দিয়ে দিলি আমায়, উপোস করে থাকব ? আব্বাজান আমায় আলাদা করে দিলি তোর সংসারে ?

ঐ কান্না সমস্তটা দিন ধরে চলল। ইসমাইলকে তিলেক বসতে দেয় না কোন ঠাঁই, উদ্ভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রাত হল, রাত গভীর হল—গুমরে গুমরে কাঁদছে তখনো। পেটের ক্ষিধে চোখের ঘুম দুই-ই গেছে ইসমাইলের। এমনি হয় এক-একদিন। অত বড় ছেলে রমজান—ইস্কুলে পড়ত—কিন্তু কাঁদে একেবারে অবোধ শিশুর মতন।

দলিজঘরে মাদুরের উপর উপর ইসমাইল এপাশ-ওপাশ করছে। তারপর উঠে বসল। বাইরে এসে দেখে, দালানের দরজা এঁটে দিব্যি ওরা ঘুমুচ্ছে।

আলো নেই, একটা মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না কোন দিকে। ভয়-ভয় করছে। একলা ঘরে থাকা যায় না, কথা বলতে ইচ্ছে করছে কারো সঙ্গে।

না গো, একা কেন হবে—আছে তো অনেক। অনেকগুলো গিনি। এক একটা গিনি গেঁথে সকলকে লুকিয়ে চুরিয়ে চকিতে একবার দু-বার দেখে নেয়। অল্পবয়সি বাপ প্রথম ছেলের সম্পর্কে যে রকমটি করে—আত্মীয়স্বজন কে কি ভাববে, সকলের অলক্ষ্যে একটুখানি আদর করে নেয়। তা এর একটা গিনির জন্ম যা কষ্ট করতে হয়েছে—ছেলের ঝক্কি পোহানো সহজ তার তুলনায়। এরাই সব ছেলে—কত ছেলে আছে তবে হিসাব করে দেখ।

সেই তারা আছে মাটির নিচে পিতলের ঘটিতে। হল কতগুলো? তাড়াতাড়ি ইসমাইল মাদুর তুলে খন্তা দিয়ে মেজের মাটি খোঁড়ে। বেরুল ঘটি। হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখে। উঃ, পরিপূর্ণ হতে কত বাকি এখনো! ঘটির খোল ক্রমেই বড় হচ্ছে, মনে হয়। তার এত কষ্টের মোহর মাটিতে শুষে নিচ্ছে না তো? আলো জ্বালা চলবে না—কে জানে ছ্যাচা-বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোন শয়তান নজর পেতে রেখেছে। আজ অবধি কখনো একত্র দেখেনি গিনিগুলোকে—অন্ধকারে দেখবে কি করে? আল্লাহ্ রহমান, চোখের চেরাগ যদি উজ্জ্বল করে দিতে অন্ধকারেই সে দেখে নিত একবার। চোখে দেখতে পায় না, তাই হাত বুলিয়ে দেখে।

পুকুর কাটবে সে। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রফিক মিঞার কাছে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। ছোকরা মানুষ—কিন্তু ভারি এলেমদার, এত বড় পদ তার সেইজন্যে। রফিকের হাতে সঁপে দেবে তার সারা জীবনের সঞ্চয় গিনিগুলো। মাতব্বরদের সাক্ষি রাখবে। তারপর বাড়ির সামনে ঐ আমবন খানা-ডোবা জঙ্গল-জাঙাল একাকার হয়ে যাবে একদিন, কাকের চোখের মতো পানি টলমল করবে সেখানে। কাটা মাটি চারদিকে পাহাড়ের মতো উঁচু হবে, দেশ-বিদেশের মানুষ চোখ মেলে দেখবে। দু-পাড়ে দুটো পাকা ঘাট বাঁধিয়ে দেবে যদি সঙ্গতিতে কুলোয়। ঘাটের উপরে জোড়া বট-অশ্বত্থ। দূর-দূরান্তরের পথিকজন এসে জিরোবে গাছতলায়, অঞ্জলি ভরে ঠাণ্ডা পানি খাবে। মানুষে খাবে, গরু-বাছুরে খাবে। ছেলেপুলে গোসল করবে দাপাদাপি করে, বউ-ঝিরা কলসি ভরে নিয়ে যাবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। বর্ষায় তালের-ডোঙা ভাসিয়ে খ্যাপলা-জাল বেয়ে পুঁটি-মৌরলা কই-খলশে ধরবে গাঁয়ের জোয়ান পুরুষেরা—

ইসমাইল ভাবে, ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে ওঠে। চোখে দেখে যেতে পারবে কি সেই রমজানের দীঘি? খোদা তালাহ, আমার বড় সাধ—কঠিন

মাটির উপর পানির লহর খেলবে, দু-চোখ ভরে আমি তাই দেখব। তা সে যত বজ্জরই লাগুক, আমায় বাঁচিয়ে রেখো। তেষ্টায় ছটফট করে আমার রমজান অবশেষে শান্ত হল—শান্ত দু-চোখ বুজে বাঁশতলায় ন্যাড়ালেজির চিহ্নিত-করা গোরের নিচে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত ছেলের মুখে তেষ্টার পানি পড়বে তার নামে যদি আমি দীঘি কাটিয়ে যেতে পারি।

দিন আষ্টেক কাটল। গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়েছে। গালি পাড়ছে সকলে ইসমাইলকে। যদু রায়ের মেয়েকে ঠাঁই দিয়েছে—ঐ বাপের মেয়ে কোন্ মতলবে আবার ঢুকল, কে জানে? আবার অন্য কথাও বলে কেউ কেউ। আবাল আমাদের সর্দারের বেটা! ভুলিয়েভালিয়ে রেখে দিয়েছে, কলমা পড়িয়ে নিকে দেবে রফিক মিঞার সঙ্গে। রফিকের আড্ডা তাই ইদানীং ইসমাইলের বাড়ি—ইসমাইলের কথায় সে ওঠে বসে।

শেষে আর পরোক্ষে নয়—রফিকেরা লোকেরা এসে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা পাড়ল: যদু রায় বেটা ছিল পাকিস্তানের দুষমন—

মেয়েটার দোষ নেই।

বাপের দোষের শোধ তুলতে হবে মেয়ের উপরে। ওকে আর ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। রফিক মিঞা নিকে করে ঘরে রাখতে রাজি হয়েছে।

ইসমাইল চুপ করে থাকে।

কি ভাবছ—তোমার রমজানের কথা? লাঠি-পেটা করে ছেলেটাকে মেরে ফেলল।

কিন্তু ইসমাইলের মনে ভাসছে আরও—আরও অনেক আগেকার এক শোকাচ্ছন্ন অপরাহ্ণ—মা-মরা ছোট্ট মেয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল কামরনের কোলে। খুব কাঁদছিল—কামরন ঠাণ্ডা করতে পারে না। ইসমাইল শেষটা কাঁধে করে স্টেশনের পাশে চড়কের মাঠে নিয়ে যায়। চড়ক ঘুরছে দেখে খিলখিল করে কী হাসি তখন মঞ্জুর!

ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই সর্দার। ভাল চাঁদ দেখে একটা তারিখ ঠিক করে ফেল। রফিকের ঘরে যত্নে থাকবে।

ইসমাইল ইতস্তত করে বলে, গাঁয়ের পাশে থানা—জোরজবরদস্তি করা যাবে না। আর জবরদস্তিতে ঠাণ্ডা হবার মেয়েও নয়। জোর করে চলে যেতে চাইলে কি করব আমি?

আর কেউ নয়—এ হল রফিক মিঞা। উচিত ব্যবস্থা সে-ই করবে, তোমার কোন দায়ে ঠেকতে হবে না সর্দার।

কামরন রান্নাঘরে। দালানের রোয়াকে মাদুর পেতে পান-তামাক খেতে

খেতে পাঁচ-সাতজনের কথা হচ্ছিল—ফিসফিসানি আর বারবার এদিক-ওদিক তাকানো ভাল ঠেকল না তার। ক'দিন ধরেই নানারকম উড়ো-গুজব কানে আসছে। অলক্ষ্যে সে দরদালানে উঠে দেয়ালে কান পাতল। একটু-আধটু যা শুনতে পেল, তাতেই হতভম্ব হয়ে গেল একেবারে। ছটফট করছে, কি করবে ভেবে পায় না। গেল কোথায় সে হতভাগী? ঐ দেখ, মাঝের-কোঠায় পড়ে আছে। রাতে খাবে না, খেতে নেই মুখে বলে—আসলে হল রান্নার আলস্য। খান কয়েক পেঁপের কুচি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমুতে পারলেই হল যে-কোন অবস্থায়।

তবু কামরন আশায় আশায় ঐদিকে এগিয়ে যায়। পা টিপে টিপে জানলার কাছে আসে, কবাট সন্তর্পণে একটু সরিয়ে উঁকি দেয় মাঝের-কোঠায়। কপট ঘুমও তো হতে পারে। চুরি করে এদের শলাপরামর্শ শুনে তারপরে আবার যদি শুয়ে থাকে শয্যায়! ঘরে আলো জ্বলছে—সে আলোয় যদি দেখতে পায় মঞ্জুর শঙ্কাকাতর মুখ! কেষ্টপুরের কায়েতপাড়ার মতো সে-ও যদি পালিয়ে যাবার ছল খোঁজে।

তা নয়, দেখ কাণ্ড—বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। কতকাল যেন ঘুমোয় নি! ঘুমুচ্ছে পরম নির্ভরতায়—যেন হাজার সিপাহি-সান্ত্রী পরিবেষ্টনে নিঃশঙ্ক নবাবনন্দিনী ঘুমুচ্ছেন। দুর্বার ক্রোধে কামরনের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে ধাক্কা মারতে মারতে ওকে ঘরের বার করতে ইচ্ছে হয়।

রাতটুকু সয়ে রইল কায়ক্লেশে। সকালবেলা মঞ্জু চোখ মেলতেই কামরন বলে আপদবালাই দূর হয়ে যা বলছি। আজকেই চলে যাবি। বসে বসে গিলবি আর পড়ে পড়ে ঘুমুবি—ওসব হবে না, এই সাফ কথা বলে দিলাম।

মঞ্জু কানে নেয় না। ফিক-ফিক করে হাসে—যেন কত বড় রসিকতার কথা!

জবাব দিসনে যে?

মঞ্জু এক কথায় সেরে দেয়: আপন জন ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছি নে—

কামরন তার স্বরের অনুকৃতি করে বলে, আপন জন! কত ঢংই শিখেছিস! ভিন জাত আমরা—গাঁ সুদ্ধ সকলে দুষছে আমাদের।

সকলের মতো নও তোমরা, তাই এসেছি।

কামরনের দিকে এতক্ষণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে মঞ্জু প্রশ্ন করে: হয়েছে কি তোমার বড়দি?

কামরন বলে, ভয়-ভীতও নেই রে! সমস্ত কায়েতপাড়া পালিয়ে গেল—আর ডাংপিটে মেয়ে, তুই এসে উঠলি কোন্ ভরসায়?

মঞ্জুলা বলে, মা যেদিন মরে গেল—সমস্ত কায়েতপাড়া বজায় থাকতে তোমাদের কাছে এসেছিলাম বলো দিকি কোন্ ভরসায়?

কথায় না পেরে তখনকার মতো কামরুন সরে গেল। পাড়াপড়শির সঙ্গে হায়-হায় করে: একি জ্বালা হল—কী দায়ে ঠেকলাম! তোমরা দোষ দিচ্ছ—কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও যাবে না, তা হলে কি করতে পারি বলো।

কেউ বলে, কলমা পড়িয়ে নিয়ে নাও তা হলে—

কমবয়সি একটি মেয়ে মুখ টিপে হেসে বলে, তারও তো জোগাড় হচ্ছে শুনতে পাই।

কামরুন বলে, তাতে কি হবে? ওসব মানে নাকি কিছু? আজকাল জাতও যায় না ওদের। কলমা পড়লে জাত মরবে, সে দিনকাল নেই।

চিন্তিত হবার কথাই বটে! মানুষের জাত নষ্ট করা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিনকে-দিন। সেকালেও অবশ্য বামুনের ছেলে হোটেলের অখাদ্য-কুখাদ্য খেত, কিন্তু মুখ মুছে তবে বাইরে আসত—তখন আর ধরবার জো ছিল না। এখন ঐ আব্রুটুকুও নেই—এ করেছি তা করেছি জাহির করে বেড়ায়, তবু সমাজে অনাচরণ বন্ধ হয় না। জাত এখন ইস্পাতে-মোড়া—পুরানো পন্থায় জাত মারার উপায় নেই।

কামরুন বলে, দেখ না এই চোখের উপর। বয়সে ছেলেমানুষ হোক যা-ই হোক, বিধবা মানুষ তো! তা সে চুল বেঁধে গায়ে জামা চড়িয়ে চটিজুতো ফটফট করে দিনের মধ্যে অমন দু-শ বার আমার গলা জড়িয়ে ধরে হেসে খেলে বেড়াবে, এতটুকু বাছবিচার নেই—এর জন্যে কেউ ওদের সমাজে দুটো কথা বলে না। এই যে নিজের হাতে রাঁধছে—সে নিতান্ত উপায় নেই বলে। আমায় রাঁধতে বলেছিল—কিন্তু জাতের যখন কিছু করা যাবে না, কি জন্যে খেটে মরব?

পরদিন সন্ধ্যা। মঞ্জুলা ঘুমোয় নি। পিঠে গড়ে গড়ে দিচ্ছে, কামরুন ভাজছে। আর দুঃখের কাহিনী বলছে—ভাসুর ও জায়েরা কী রকম অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কারণ হল, ঘরবাড়ি ও বিষয়সম্পত্তি। ভাগীদার তারা সহ্য করতে পারে না।

কামরুন বলে, তারও চেয়ে বড় কারণ—তোর লাটসাহেবি মেজাজ। সেই ছোটবেলা থেকে ধকল সয়ে আসছি, সময় সময় আমাদেরই অসহ্য হয়ে ওঠে—পরে কেন বরদাস্ত করবে?

তাই দেখলাম বড়দি, তোমরা ছাড়া কোনখানে আমার ঠাঁই নেই।

লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। আজকেও আবার? কামরুন

ভয়ে ভয়ে দরজায় এসে বাইরে উঁকি দেয়। যা ভেবেছে তাই, বাস্তুহারেরা এসে জুটেছে।—কামরুন ছুম করে পিঁড়ির উপর বসে বলে, ঠাঁই এখানেও নেই। কাল বিদেয় হয়ে যাবি।

মঞ্জুলা অবাক হয়ে গেছে। কামরুন বলে, দুপুরের গাড়িতে চলে যাবি। সহজে না যাস তো ঝাঁটা মেরে তাড়াব।

মঞ্জু হেসে ফেলল : ঝাঁটা তো খাইনি তোমার হাতে, মিষ্টি-মিঠাই খেয়ে এসেছি। দেখা যাক, ঝাঁটা কেমন লাগে। সে যাকগে—কালকের কথা কাল। তোমার তেল জ্বলে যাচ্ছে বড়দি, পুলি ছেড়ে দাও।

কামরুন রাগে রাগে উনুনের পাশে কড়াই নামিয়ে বলে, চুলোয় যাকগে পুলি। জিজ্ঞাসা করি, লজ্জাশরম মানইজ্জত পেটের দায়ে পুড়িয়ে খেয়েছিস? এমন তো ছিলিনে।

ইসমাইল এমনি সময়ে দরজায় দাঁড়াল কলকেয় আগুন নিতে। মঞ্জু নালিশ করে : দেখ দাদু, বড়দি খুন্তি উঁচিয়ে কি রকম আমায় তাড়িয়ে তুলছে।

কামরুন ঠাণ্ডা হয় না। বলে, নিশ্চয় তাড়াব। জাত দুটো আলাদা হয়ে গেছি, দেশ দুটো ভাগ হয়ে গেল—কোন্ লজ্জায় পড়ে থাকিস?

তখন মঞ্জুলাও ক্ষেপে গেল : যাবো কোথায় বলে দাও। কে কোথায় আছে আমার, কি সম্বল আছে? খাব কি, থাকব কোথায়, কি আমার ভবিষ্যৎ? না থাকতে দাও—বেশ তো, চলো দাদু আমার সঙ্গে, তুমি আমার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে। আমি কাকে চিনি ওদেশে? যাদের বাড়ি বিয়ে দিলে, তারা তো দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল।

মঞ্জুলার দু-চোখে জলের ধারা বইল। ইসমাইল স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলে, তা যায় যখন যাবে—এত তাড়াতাড়ি কিসের? গিয়ে পথে দাঁড়াতে পারে না তো! ভেবেচিন্তে একটা ব্যবস্থা করতে হবে—

কামরুন আগুন হয়ে বলে, তা জানি—তুমি এই বলবে। সমস্ত জানি আমি। কালকেই ওর চলে যেতে হবে। এই শেষ কথা।

ইসমাইল কাঁদে প্রায়ই। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে এক-একদিন ডুকরে কেঁদে ওঠে। ঐ তো কাঁদবার সময়। পুরুষমানুষ কাঁদছে—এ লজ্জার কান্না মানুষে শুনতে পায় না তখন। শোনে ঘর-উঠোন, আর বোধহয় সর্বনিয়ন্তা সেই খোদাতালা। অদূরের গোরস্থানও হয়তো বা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

দুপুর বেলা ইসমাইল বাড়িতে খায় নি। রফিক মিঞার বাড়ি দাওয়াত, সেইখানে চলে গেছে। ফিরবে কখন কে জানে। আর কামরুনের যে কথা

সেই কাজ, গোটা দশেক টাকা জমিয়েছিল সুপারিটা নারকেলটা লুকিয়ে চুরিয়ে বিক্রি করে। টাকা ক'টি মঞ্জুর হাতে দিয়ে বেলাবেলি তাকে স্টেশনে পাঠাল।

গাড়ি এলো, অচেনা কলকাতা শহরের টিকিট কিনে মঞ্জু উঠে বসল। ঐ নাকি জগতের মধ্যে তার সব চেয়ে আপন জায়গা—তার হিন্দুস্থান। কামরার মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে কে কোন্ দিককার বাসিন্দা। শুকনো মুখে যারা নির্বাক হয়ে আছে, নিঃসন্দেহ তারা সীমান্ত-পারের। কাস্টমসের লোক কিম্বা যে-কেউ হোক না কেন—কোন-কিছু বললে বিনয়ে প্রায় ভূমিলগ্ন হয়ে জবাব দিচ্ছে। আজ্ঞে, হুজুর—প্রভৃতি কথায়।

একজন চেনা মানুষ দেখতে পেল—বিপিন তাম্বুলি। কায়েতপাড়ার কাছে তার বসতি ছিল, এখন হিন্দুস্থানে বাড়ি তুলেছে। কাস্টমসের লোক বিপিনকে এসে ধরেছে।

কত টাকা আছে সঙ্গে?

কুড়ি বাইশ টাকা হুজুর—

বের করো—

থলি ঝেড়ে দেখা গেল, তা-ও নয়। আনি-পয়সা গোণাগুণতি করেও পনের টাকা পোরে না।

জিনিসপত্তোর কি আছে? সোনারূপো? সুপারি?

আজ্ঞে না। সোনারূপো কোথায় পাব? জামা-কাপড় দু-তিনটে। আর আমার শাশুড়ি ক'খানা চন্দোরপুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে দিয়েছেন। দেখাব?

বিপিন বোঁচকা খুলে ছড়িয়ে দিল। অন্য যাত্রীকে প্রশ্ন করতে করতে রীত-রক্ষার মতো কাস্টমসের লোক হাত ঢুকিয়ে দিল তার ভিতর।

গাড়ি ছেড়েছে। এতক্ষণের শুকনো মুখগুলোর উপর একটু যেন হাসির রেখা—পুরোপুরি হাসির সময় আসেনি এখনো। সে ঐ সীমানার তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে যাবার পর।

ইসমাইল গাড়ির সঙ্গে ছুটছে। বাড়ি এসে খবর শুনেই ছুটেছে স্টেশনে। মুখ-বাঁধা একটা হাঁড়ি কামরার জানলা দিয়ে মঞ্জুর হাতে তুলে দিল।

কি?

কাঁচাগোল্লা কিনে দিলাম, রাত্তিরে খাস।

আকুল অশ্রুজলে মঞ্জু বলে, এ তুমি নিয়ে যাও দাদু। ঘরে জায়গা দিলে না, একবেলা খাবার খাইয়ে মায়া দেখাতে হবে না।

কিন্তু ইসমাইলের কানে গেল না—গাড়ির গতিবেগ বেড়েছে, অনেক

দূরবর্তী সে এখন। মুখ বাড়িয়ে মঞ্জু দেখতে লাগল, প্লাটফরমের শেষপ্রান্তে নিস্পন্দ মূর্তির মতো ইসমাইল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে বিপিন তাম্বুলি মঞ্জুর কাছে আলাপ করতে এলো।

কি দিয়ে গেল ইসমাইল সর্দার?

খাবার—

বিপিন হাঁ হাঁ করে ওঠে।

এদ্দিন যা করেছ, করেছ। আর ও-সমস্ত ছুঁয়ো না, ঐ ইসমাইলটা হল পালের গোদা—পাকিস্তান-পাকিস্তান করে সে-ই বেশি চেঁচাল। যারা ঘর জ্বালায়, ছুরি মারে, গ্রাম পোড়ায়, সাত পুরুষের ভিটে থেকে তাড়িয়ে তোলে—খাবারের সঙ্গে তারা বিষ মিশিয়েও দিতে পারে। হাঁড়িসুদ্ধ বাইরে ছুঁড়ে দাও মঞ্জু।

মঞ্জু বলে, তাই দেবো। ওরা সব কী হয়ে গেছে—বিষ না-ও যদি দিয়ে থাকে, ওদের খাবার বিষের মতো কটু—

কৌতূহলী বিপিন বলে, হাঁড়ি খোল দেখি। কি দিয়েছে দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়: উঁহু—সীমানা পার হয়ে যাক আগে। তবে নিশ্চিন্ত। একদিন হল কি—ইঞ্জিন পিছুতে পিছুতে ফের ঐ স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এখন যেমন আছ, একেবারে চুপচাপ—

চিহ্নিত তেঁতুলগাছ অতিক্রম করে তখন মানুষের চেহারা বদলে যায়। একদল হাঁক দিয়ে ওঠে: জয় হিন্দ! আর একদল মুখ চুণ করে থাকে। এতক্ষণের পরম বশম্বদ বিপিন তাম্বুলি খাবারের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে তিন লাফে গাড়ির ঠিক মাঝখানে যাত্রীর জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। খিঁ-খিঁ করে উৎকট হাসি হাসতে হাসতে বলে, আহাম্মক! সুপারি বোঁচকায় বেঁধে এনেছি তুমি হাত ঢুকিয়ে মুঠোয় পুরে আনবে বলে। বনগাঁয়ে গিয়ে বের করব, দেখতে পাবেন—দু-পাঁচ গণ্ডা নয়, ইয়া এক দু-মনি বস্তা—যেখানটায় মশায়রা বসে আছেন, ওরই তলায় চাকার পাশে লোহার সঙ্গে বাঁধা। আর থলি উপুড় করে বেটাচ্ছেলে টাকা ধরতে এসেছিল—

ম্যাজিকে যেমন দেখা যায়, গুটি বের করছে নাক থেকে কান থেকে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ থেকে—বিপিন তেমনি সর্বাঙ্গ থেকে জামার আস্তিন থেকে জুতোর শুকতলা থেকে অগুন্তি নোট বের করতে লাগল। এক-একখানা বের করে মেলে ধরে সকলের চোখের সামনে—

দেখুন—দেখুন—আবার দেখুন—হি-হি—পনের টাকা দেখে গেল তো? একুনে পাঁচ শো সাতান্ন, আমার গোণা আছে।

মঞ্জু এবারে হাঁড়ি খুলল। কোথায় কাঁচাগোল্লা—মিথ্যে কথা বলেছে ইসমাইল—কালকের পোড়া-পিঠে আর তিলের নাড়ু। এই অখাদ্য খাবে নাকি সে? অকারণে অপমান করে গেল স্টেশন অবধি এসে। আরো কি দিয়েছে…ভারী কেন এত, চিক-চিক করছে এ কোন্ জিনিস? একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো—। পোড়া-পিঠের ঢাকা দেওয়া সোনার মোহর! দাদু এক রাত্রির পথের খাবার দেয়নি—নির্বান্ধব নিজভূমে না খেয়ে পথে পড়ে মারা না যায়, সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

ওদিকে, প্লাটফরমের কোলাহল এখন স্তিমিত। ঘোর হয়ে গেছে, কেরোসিনের বাতি জেলে দিয়েছে কোন্ সময়। ইসমাইল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার সম্বিত নেই। রেলগাড়ি বাঁকের মুখে কখন মিলিয়ে গেছে! চিরজীবনের সাধ আর সম্বল নিয়ে চলে গেছে সেই গাড়িতে চড়ে একটি মেয়ে—কোন বিচারে যে তার আপন নয়, না রক্তের বিচারে না ধর্ম ও অবস্থার বিচারে। দীঘি কাটা আর হবে না, গোরস্থানের অন্ধকারে গলা শুকিয়ে তার রমজানের রূহ্ পানি-পানি করে কাঁদবে অনন্তকাল।

একটা বড় তারা উঠেছে বাঁশবনের মাথায়। ঐ আকাশের তারা, দোলায়মান বাঁশের আগা, সন্ধ্যাচ্ছন্ন ধরিত্রী—সকলকে সে মনে মনে সাক্ষি মানে। সোনা সরিয়ে দিয়ে আমি হারামি করলাম পাকিস্তান ও ইসলামের সঙ্গে? কিন্তু মঞ্জুর যে কেউ নেই—সে খাবে কি, থাকবে কোথায়? আল্লাহ্ রহমান, অপরাধ নিও না আমাদের মঞ্জুর দশা বিচার করে দেখে।

তারাটি জল-জল করে তাকাল। মাঠ পেরিয়ে এক ঝলক বাতাস সর্বদেহ জুড়িয়ে দিয়ে গেল। এপার-ওপার দু'দিকেরই ঐ তারা। এই হাওয়া রাধানগরের সুপারিবাগান কলাবাগান দুলিয়ে বেহুলার আসরের সুরের বেশ বয়ে এনে, দেখ দেখ, কেষ্টপুরের ঐ ধানবনে দাপাদাপি করছে।

কানু গাঙ্গুলির কবর

খোঁড় এখানটায়। বেশি নয়, হাত তিন-চার খুঁড়লেই হবে। না পাও, আর একটু দক্ষিণে গিয়ে খোঁড়। যতক্ষণ না পাও খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যাও দিকি। নিশ্চয় পাবে।

খুঁড়ছে ছেলেগুলো। কড়া রোদ, সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, খুঁড়ে যাচ্ছে তবু।

গুপ্তধন আছে নাকি শঙ্কর-দা?

শঙ্কর-দা বুড়ো হয়েছেন এখন। একমুখ দাড়ি। ঘাড় নেড়ে তিনি হাসলেন। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন সাদা সাদা দাঁত। হাসেন কথায় কথায়, হাসি ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর যখনই হাসেন, দু-পাটি দাঁত বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে যায়।

শঙ্কর-দা হাসতে হাসতে দেখাচ্ছেন: উঁহু, এদিকে আর নয় ভাই। ডোবা ছিল, ডোবার পাশে ছিল বাঁশবন।—কি হে, হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে কেন তোমরা? তোমাদের ওদিকেই হবে।

কোদাল মারতে মারতে হাত রাঙা হয়ে গেছে দেখুন শঙ্কর-দা—

হাত মেলে দেখাল ছেলেটা। টুকটুকে-ফরসা কোমল ছেলে—জীবনে ধরে নি কোদালের মুঠো। হাতের তলা সত্যিই রাঙা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দা একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, কি করব—ঠিক ধরতে পারছি না যে! তখন এরকম ছিল না—বনজঙ্গল বাঁশঝাড় আপলার-মার চালা কুড়েঘর একখানা। অন্ধকার রাত্রে তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলেছিলাম। জায়গার নিশানা র৷খ৷ হয় নি, আর সময়ও ছিল না ভাই। আবার কোন দিন যে দিনদুপুরে খুঁড়ে দেখবার আবশ্যক হবে, একালের সোনার ছেলে তোমরা কোদাল হাতে এসে জুটবে, সে কি ভাবতে পেরেছি সেদিন?

অকৃত্রিম হাসিতে শঙ্কর-দার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলতে লাগলেন, খোঁড়- খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে কলসি পেয়ে যাবে একটা। সোনার নয়, পিতলের নয়, মেটে কলসি।

কলসির ভিতর?

সেই ফরসা ছেলেটা বলে উঠল, সোনার মোহর—

আর একজন বলে, মোহর আসবে কোত্থেকে? বড়লোক ছিলেন না তো এঁরা।

বড়লোকেরা দিত। টাকা নইলে এত সব কাজ চলত কি দিয়ে?

না দিলে ডাকাতি করে আনতেন।

শঙ্কর-দা তখন কিছুদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। এদের আলোচনা কানে যাচ্ছে না তাঁর। একেবারে অপরিচিতের মধ্যে এসে পড়েছেন, এমনি মুখের ভাব। এই গাছপালাবিহীন প্রশস্ত জায়গাটা, এই ছেলেগুলি, পীচের রাস্তা, বিদ্যুতের আলো আর বড় বড় বাড়িতে উদ্ধত এই মহকুমা-শহর—সেকালের সঙ্গে কিছুতে এদের যোগ ঘটাতে পারছেন না। দু-তিন বছর পরে এক একবার জেল থেকে বেরিয়ে

নূতন পরিচয় শুরু করেন, ভাল চেনাজানা হবার আগেই আবার ধরে নিয়ে যায়। এবারেই বা কতদিন থাকেন, তাই দেখ।

বিকাল অবধি বিশ-পঁচিশ জায়গায় খুঁড়েও শঙ্কর-দার মাটির কলসি পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার পর তিনি অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি গেলেন। ডাক্তার যথারীতি কলে বেরিয়ে গেছেন। দু-হাতে টাকা রোজগার করছেন— তাঁকে বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট। আর মানইজ্জতও খুব—এখানকার হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, গভর্নমেন্টের পেয়ারের মানুষ।

তিনবার গিয়ে রাত্রি সাড়ে-ন'টার পর দেখা হল অমূল্য ডাক্তারের সঙ্গে। মোটর থেকে নেমে উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, শঙ্কর-দাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দায় এলেন।

চোখে কম দেখি, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। তুমি নিশ্চয় জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারবে অমূল্য-ভাই।

কোন্ জায়গা ?

মনে পড়ছে না ? সাপলার-মার বাড়িতে সেই যে রাত্রিবেলা—

অনেক দিনের কথা, জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়। অবশেষে অমূল্য ডাক্তারের মনে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, আমাকে আর ওসবের মধ্যে কেন দাদা ? ও. বি. ই. টাইটেল দিয়েছে এবার আমাকে।

শঙ্কর-দা বললেন, ভোরবেলা বেড়াতে গিয়ে তুমি একটু আন্দাজ দিয়ে এসো। কে দেখছে বলো সে সময় ? ছেলেরা সমস্ত দিন জমি কুপিয়ে আধমরা হয়ে গেছে।

শঙ্কর-দার হাত কোনদিন কেউ এড়াতে পারে না, আজকে বুড়ো হয়ে পড়েছেন—এখনো নয়। অমূল্য ডাক্তারকে ঐখানে নিয়ে তবে ছাড়লেন। খুব ভোরবেলা—রাত আছে বললেই চলে—সেই সময় তাঁরা গেলেন। বাঁশবন কেটে ফাঁকা করে ফেলেছে। পাকাবাড়ি হবে—বাড়ির সীমানা ঠিক করে খুঁটো পুঁতেছে। ইট এনেছে—ঢালছে গাড়ি-গাড়ি। খোয়া ভেঙে পাহাড় জমিয়েছে ওদিকে। অমূল্য ডাক্তার বললেন, উঃ, বিষম বাড়ি ফেঁদেছে তো এতটা জমি নিয়ে।

শঙ্কর-দার চোখের সামনে দিয়ে এ সমস্ত ভেসে যায়, মনে পৌঁছয় না। নিজের খেয়াল ছাড়া বিশ্বভুবনের আর সমস্ত নিরর্থক তাঁর কাছে। অমূল্য বলতে লাগলেন, অ্যাসেম্বলির মেম্বার—মোটা মাইনে-ভাতা, তার উপর চালের সাপ্লাই দিয়ে কম টাকা মেরেছে। ডাক্তারি না করে পলিটিক্সে

আমলে মুনাফা অনেক বেশি ছিল। সুযোগও ছিল আমার—আধাআধি তো নেমেই ছিলাম। কি বলেন?

শঙ্কর-দার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অমূল্য ডাক্তার জায়গাটার সন্ধান করতে লাগলেন।

কাঁঠালগাছের গর্তের ভিতর মৌচাক হয়েছিল—মনে আছে দাদা? এই যে সেই গাছের গোড়া। আপনার চোখ খারাপ, দেখতে পান নি। কাঁঠালগাছের গোড়া নিশানা করে খুঁজতে বলুন তো আজকে। খুঁড়তেও হবে না, ভিতের মধ্যে পড়ে গেছে, চুন দিয়ে দাগ দিয়েছে এই দেখুন। কত বড় বড় ঘর ফেঁদেছে—উঃ!

অমূল্য দেরি করলেন না, মানুষজন এদিকে এসে পড়বার আগেই অদৃশ্য হলেন। কবে ওরা ভিত কাটবে, কি করবে—সে অপেক্ষায় থাকবার মানুষ শঙ্কর-দা নন। একটু পরেই ছেলেদের নিয়ে এলেন।

খোঁড়—

প্রফুল্লর লোকজন হাঁ-হাঁ করে পড়ল: এখানে কি মশাই? আর যেখানে যা-ইচ্ছে করুন গে, ভিতের উপর খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না।

শঙ্কর-দা বললেন, তোমাদের মনিবকে খবর দাও গিয়ে। সে এসে মানা করলে তবে থামব। পথ বেশি নয়, ছুটে চলে যাও। কি বলে শুনে এসোগে।

ছুটেই চলল তারা। ছেলেরা এদিকে খুঁড়ে চলেছে, কিন্তু মানা করতে কেউ ফিরে এল না। প্রফুল্ল শুনে অবহেলার ভাবে বলল, থাকগে, থাকগে—বুড়োমানুষ যা করছেন তার উপর কথা বলতে যেও না তোমরা।

বিস্ময়ে দু-চোখ কপালে তুলে সরকার বলল, বলেন কি! এদ্দিন এদিকে-ওদিকে হচ্ছিল, আজকে একেবারে জায়গায় আরম্ভ করেছেন। তাতে আমাদের প্ল্যান মতো বাড়ি তৈরির অসুবিধে হয়ে যাবে হুজুর।

প্রফুল্ল বলে, প্ল্যান বদলাতে হবে। চুপচাপ দু-চার দিন এখন বসে থাকগে, ওদিকে যেও না। ওঁর যা করবার করে চলে যান। তখন ভাবা যাবে, কোন্‌খানে বাড়ি তুললে অসুবিধা না হয়।

দু-চার দিনের আর দরকার হল না, কলসি সেই দিনই পাওয়া গেল। ঠুক করে একটু আওয়াজ কোদালের আগায়। গাছতলায় বসে আর দুটো ছেলের সঙ্গে সে আমলের গল্প করছিলেন শঙ্কর-দা। চোখে ভাল দেখেন না, কান কিন্তু অত্যন্ত সজাগ—ছুটে চলে এলেন।

বেরিয়েছে তা হলে! কানায় কোপ ঝেড়েছিল, দফাটি সেরে দিয়েছিল তো? কলসির কানা একটুখানি ভেঙে গিয়েছে কোদালের কোপ লেগে।

ছেলেরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করছে, কি আছে এর ভিতরে—যার জন্ত আজ দিন চারেক ধরে শঙ্কর-দা উঠে পড়ে লেগেছেন কলসি আবিষ্কারের জন্ত। কিন্তু দেখবার কিছু নেই আপাতত। মাটি ঢুকে কলসির ভিতরটা বোঝাই—সোনার মোহর ইত্যাদি যদি থাকে, সে ঐ মাটি চাপা পড়ে আছে। মাটি বের করে দেখবে, তারও আর উপায় নেই—শঙ্কর-দা এসে পড়েছেন। বলছেন, হ্যাঁ—এইটেই। এইটে বলেই মনে হচ্ছে। এক কাজ কর্—একখানা খোঁটা পুঁতে রাখ ঐখানটা। কলসি তুলে নিয়ে আয়—দেখি, সেই কলসি কিনা।

কলসি উপরে আনা হল। শঙ্কর-দা ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মাটি বের করে ফেলছেন। ছেলেরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে, নিশ্বাস পড়ছে না কারও যেন। কী তাজ্জব জিনিস না-জানি এর মধ্যে, সাত রাজার ধন কোন মাণিক! কিন্তু শঙ্কর-দা মাটি বের করেই যাচ্ছেন—কলসির তলা অবধি শুধুই মাটি। এ কলসি নয় নাকি তবে? হঠাৎ কী কতকগুলো পেয়ে আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে শঙ্কর-দা বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই বটে! মুঠো খুলে দেখালেন—কড়ি কতকগুলো। বললেন, পাওয়া গেছে—ওই সে জায়গা। কলসি যেমন ছিল বসিয়ে এক টুকরা বাঁশের আগায় নিশান উড়িয়ে দে এখানে।

ছেলেরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে। শঙ্কর-দার চোখ চক-চক করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, কানু গাঙুলির কবর এইখানটায়।

গাঙুলির কবর?

শঙ্কর-দা স্তিমিত দৃষ্টিতে দূরের দিকে এক-নজরে কি দেখতে লাগলেন।

এই মহকুমা শহর তখন একটা বড়গোছের গ্রাম বললেই চলে। এখান থেকে মিটারগেজের লাইন বসিয়েছিল কেশপুরের গঞ্জ অবধি। খালধারে তার ওয়ার্কশপ ছিল। ওয়ার্কশপ কম্পাউণ্ডের ভিতরেই পাশাপাশি পাঁচ-ছ' খানা বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়িগুলো আজও আছে, উকিল-মোক্তাররা থাকেন। সে আমলের নামটা কেবল রয়ে গেছে—সাহেবপাড়া। মোটরবাসের দৌরাত্ম্যে রেললাইন শেষাশেষি অচল হয়ে ওঠে। সাহেব কোম্পানি এক ভাটিয়ার কাছে সবসুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ল, এসব ভিন্ন এক কাহিনী। এখন ছোটরেলের কোন চিহ্ন নেই এ অঞ্চলে, লড়াইয়ের সময় লোহার পাটিগুলো অবধি উপড়ে নিয়ে গেছে।

তখন শঙ্কর-দা দস্তুরমতো যুবাপুরুষ—ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি বয়স নয়। অন্ধকারে পিছল মেঠো-পথ ধরে টিপিটিপি তাঁরা চলেছেন। আজকের স্বনাম-ধন্য প্রফুল্ল মজুমদার মশায়ও সেই দলে। প্রফুল্লর বাড়ি থেকেই সব রওনা

হয়েছেন। প্রফুল্লর বোন হাসিকে দেখেছেন আপনারা। মোটা থপথপে, গলায় লম্বা সোনার হার। ঐ বিধবা মেয়েটা তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কেমন করে টের পেয়েছিল বুঝি—যাবার সময় জোর করে একমুঠো সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছিল কানুকে। কানু কিছুতে খাবে না, তখন হাসি তার হাত ধরে ফেলল। জীবনে প্রথম ঐ সে তার হাত ধরল—গা শিরশির করে উঠেছিল কিনা বলতে পারি নে সেদিনের কুমারী মেয়ে হাসির। যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে অন্ধকার বর্ষারাত্রে পা টিপে টিপে সকলে যাচ্ছে, গাইড ফিস-ফিস করে নির্দেশ দেয়, বুকের মধ্যে গুর-গুর করে ওঠে গাইডের কণ্ঠের মৃদু আওয়াজে।

কুলি-বস্তি উত্তীর্ণ হয়ে সাহেবপাড়ার ভিতর পা দিলে মনে হয়, নন্দন-কাননে এসে পড়লাম নাকি? ওদের সুস্থ ছেলেমেয়েগুলো লনের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কোঁকড়ানো সোনালি চুল বাতাসে ওড়ে। রাত্রে জোরালো পেট্রোম্যাক্স জ্বলে প্রতি বারান্দায়, রেকর্ডে নাচের বাজনা বেজে ওঠে। আর রাস্তার অন্ধকার মোড় থেকে বস্তির ছেলেরা তাকিয়ে দেখে অকারণে উল্লসিত হয়, ঘরে এসে সাহেবপাড়ায় কী দেখে এল, সেই গল্পগুজব করে। দূরের গ্রাম থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব যারা আসে, তাদের কাছে ঐসব বলে গর্ববোধ করে।

খবর এসেছিল, টমাস সাহেব অনেক টাকা নিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে সদর থেকে এসেছে। গাড়ি লেট ছিল, সাহেব পৌছবার আগেই ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে গেছে, সেজন্য কুলিদের মাইনে দেওয়া হয় নি, সমস্ত টাকা বাড়িতেই আছে সাহেবের।

একটা কথা জেনে রাখুন—শঙ্কর-দা প্রায়ই বলেন কথাটা—সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমন কাপুরুষ আছে, যাদের জুড়ি দুনিয়ার মধ্যে নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগে আর আগস্ট-আন্দোলনের সময় অনেক ক্ষেত্রে ওদের বীরত্বের বহর দেখা গেছে, আর শঙ্কর-দার কাছ থেকে শুনতে পাবেন সেই রাত্রে সাহেবপাড়ার বাসিন্দাদের বীরত্ব-কাহিনী। গুলি-বোঝাই ছয় সিলিণ্ডার রিভলবার হাতে রয়েছে—কিন্তু টমাস সাহেব ট্রিগার টিপল না, কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। আর কানাই সেইটাই তুলে ধরল তার মুখের সামনে। রাত তখন বেশি নয়, দলের একজন দু'জন গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক এক বাংলোয়, অতগুলো প্রাণীর তাতেই প্রায়-মূর্ছার অবস্থা। মোটের উপর এত নির্গোলে কাজ হাসিল হবে, কেউ এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

বেরিয়ে চলে আসছে—সাহেবরা নিপাট ভদ্রলোক, হাতখানা উঁচু করবার

শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে। তারা কিছু করে নি—পিছন দিক থেকে রাইফেলের গুলি কানুর পিঠে এসে বিঁধল। বাহাদুর বলে এক গুর্খা ছোকরা ছিল পাহারাদার—গুলি করেছে সে-ই। এর জন্ম কেউ প্রস্তুত ছিল না—অব্যর্থ টিপ—কানাই মাটিতে পড়ে গেল। আর ওদিকে এই গোলযোগে কুলিবস্তি থেকে পিল-পিল করে মানুষ বেরুচ্ছে। মানুষ দেখে সাহেবগুলোর হতভম্ব ভাব কাটল এতক্ষণে, তারাও বেরুল। কানু অসাড়, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো গেল না তার পাশে, পঙ্গপালের মতো মানুষ আসছে। বিষম হৈ-চৈ, টর্চের আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। কানুকে কাঁধে তুলে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

প্রফুল্লর চিরদিনই সাফবুদ্ধি, সে এক চালাকি করল। ওদের ধাঁধা দেবার জন্ম তিন-চারজন মিলে উল্টোমুখো সদর-রাস্তা বেয়ে ছুটল। বুটজুতোর আওয়াজ তুলে সাহেবগুলোও পিছু ছুটেছে। বকুলতলার আঁধারে শঙ্কর-দা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন—সবাই খুব খানিকটা এগিয়ে গেলে কানুকে কাঁধে নিয়ে টিপিটিপি বাগিচার ভিতর দিয়ে বিলের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন।

নিরন্ধ্র অন্ধকার। কানুর মুখখানা শঙ্কর-দা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন, যে মুখে ওরা লাথি মেরে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে। যখন ছুটছিল প্রফুল্লর পিছু পিছু—বকুলতলা থেকে ওদেরই টর্চের আলোয় শঙ্কর-দা দেখলেন, ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে একজন বুটের লাথি ঝেড়ে দিয়ে গেল চেতনাহীন কানুর মুখে। ফুটফুটে ছেলে কানাই—কোদাল পাড়তে পাড়তে মুখ রাঙা হয়ে গেছে ঐ যে ফরসা বড়লোকের ছেলেটির, ওরই মতো দেখতে। সবে কলেজে ঢুকেছিল, পবিত্র পুণ্যবান বংশের ছেলে। শঙ্কর-দা নিঃশব্দে নিষ্পলক চোখ মেলে দেখলেন, লাথি মেরে আক্রোশ মিটিয়ে ওরা আবার ছুটল।

কানুকে নিয়ে এলেন এখানে। এই চৌরস মাঠ নয়—তখন কশাড় বাঁশবাগান, তার এক প্রান্তে জেলেদের এক বুড়ি কুঁড়ে বেঁধে বসতি করত, ক্ষ্যাপলার-মা বলে তাকে ডাকত সকলে। কখন কখন শুধুমাত্র 'মা' বলে ডাকতেন এঁরা, 'মা' ডাকে বুড়ি গলে যেত। কত যে ঝঞ্ঝাট পোহাত! রাতবিরেতে যখনই দায় পড়ত, চলে যেতেন তাঁরা ক্ষ্যাপলার-মার ওখানে। ক্ষ্যাপলার-মা আজ বেঁচে নেই, তার ঘরখানার চিহ্নমাত্র নেই—ওঁদের কত সাহায্য করেছে, কত ঘটনার সাক্ষি ছিল সে! দশ-বাড়ি ধান ভেনে, গোবর-মাটি লেপে খাওয়া-পরা চালাত—বক-বক করা ছিল তার স্বভাব, কাজ করতে

করতে কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে গালি পাড়ত, যত কষ্ট হত গালিরও জোর বাড়ত তত বেশি। কিন্তু আশ্চর্য এই, কখনো কোন অবস্থায় এঁদের বিষয়ে একটা কথা উচ্চারণ করে নি বুড়ি।

ন্যাপলার-মার ঘরের ভিতর তো এনে নামালেন কানুকে। টেমি জলছিল, ফুঁ দিয়ে বুড়ি সেটা নিভিয়ে দিল—কি জানি, খোঁজে খোঁজে কেউ যদি এসে পড়ে! কানুর তখন জ্ঞান ফিরেছে অল্প অল্প, অস্পষ্ট কণ্ঠে জল চাইল। ন্যাপলার-মা সজল চোখে, বাসনপত্র তো নেই—নারকেলের মালায় জল গড়িয়ে দিল। শঙ্কর-দা নামিয়ে রেখেই ছুটে বেরিয়েছেন ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তার এনে ফল যা হবে, সে অবশ্য জানাই আছে। তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া—ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। আর ডাক্তারও সেই সময়টা সহজলভ্য ছিল—ঐ অমূল্য সরকার—তাকে খবর দেওয়ার মাত্র অপেক্ষা।

পুরোপুরি ডাক্তার নয় তখন অমূল্য। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত, প্লুরিসির মতো হয় -মাস ছয়েক হল বাড়ি থেকে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে ডাকা চলে না অতএব অমূল্যর চেয়ে ভাল ডাক্তার আর কোথায়?

অমূল্য ঘুমুচ্ছিল। বাইরের চৌরিঘরখানায় সে শুত, শঙ্কর-দা জানতেন। দরজায় টোকা দিলেন, ঘুম ভাঙল না। তখন চ্যাঁচ-বাঁশের বেড়া দু-হাতে একটু ফাঁক করে ফিস-ফিস করে ডাকতে লাগলেন: অমূল্য—অমূল্য! পাশ ফিরে শুল সে একবার। বাখারি ছিল একটা পড়ে, সেইটে ঢুকিয়ে খোঁচা দিতে ধড়মড় করে অমূল্য উঠে বসল।

কে?

চুপ! বেরিয়ে এসো।

মেঘ জমে এসেছে আকাশে, গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শঙ্কর-দা বললেন, বুলেট রয়ে গেছে, বের করে ফেলতে হবে। শিগ্‌গির চলো।

অমূল্য বলে, তাই তো—অপারেশন-যন্ত্রপাতি কিছু যে নেই আমার কাছে।

যেন যন্ত্রপাতি থাকলেই আর কোন ভাবনার বিষয় ছিল না। যাই হোক, যন্ত্রও মিলল অবশেষে। খুঁজে পেতে ভোঁতা একটা ল্যানসেট পাওয়া গেল তার বাক্সর মধ্যে। সেইটে আর এক শিশি আইডিন পকেটে পুরে অমূল্য দ্রুতপায়ে শঙ্কর-দার সঙ্গে চলল।

গিয়ে তাঁরা অবাক। আশাতীত ব্যাপার—কানু বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, টর-টর করে কথা বলছে। প্রফুল্ল ফিরে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে তখনও—হাঁপাতে হাঁপাতে কৃতিত্বের গল্প করছে, কেমন করে ধোকা দিয়ে

দমস্থদ্ধ সে খেয়াঘাট অবধি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বোঁও করে দৌড় দিল পাটক্ষেতের দিকে—পুরোদমে ছুটলে তাকে ধরতে পারে কে! এ-ক্ষেত থেকে সে-ক্ষেতে—শেষকালে চারদিক দেখেশুনে সন্তর্পণে এখানে চলে এসেছে।

আবার টেমি জ্বালতে হল ডাক্তারকে অবস্থা দেখাবার জন্ম। হাসিতে উদ্ভাসিত কান্থর মুখ, প্রফুল্লর গল্প খুব সে উপভোগ করছে। বুলেট আটকে রয়েছে পিঠের দিকটায়, এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি, যন্ত্রণায় মুখ এক একবার কালিবর্ণ হচ্ছে, দেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছে—হাসির প্রলেপ কিন্তু ঠোঁট দু'খানার উপর।

টেমির আলোর তিন দিকে ভালো করে ঢেকে দেওয়া হল, কান্থর দেহ ছাড়া বাইরে কোনদিকে আলোর রেশ না বেরোয়। প্রফুল্ল আর শঙ্কর-দা তৈরি হয়ে বসেছেন, কান্থ ইশারায় মানা করল—ধরতে হবে না তাকে। দাঁতে-দাঁত চেপে সে উপুড় হয়ে আছে, অমূল্য ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে ল্যানসেট একবার আধ-ইঞ্চিখানেক বসিয়ে আবার তুলে নিল। যাচ্ছে না ঠিকমতো। নতুন হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে ঘষে ঘষে ধার দিল যন্ত্রটায়। আগুন করে একটুখানি সেঁকে নিয়ে তারপর এমনভাবে চিরতে লাগল যে শঙ্কর-দা অবধি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চোখে আর দেখা যায় না—কাজ সেরে টেমিটা নিভিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন।

কিছুই করা গেল না, চামড়া চিরে খোঁচাখুঁচিই হল খানিকটা। নিঃশব্দে অমূল্য নাড়ি ধরে বসে আছে। একবার দেশলাই জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে-তিনটে। মেঘভাঙা অল্প অল্প জ্যোৎস্না ফুটেছে তখন। তিনজনে ওঁরা মাটির উপর উবু হয়ে বসে আছেন। স্যাপলার-মা জল গরম করবার জন্ম মাচার উপর থেকে টেনে টেনে শুকনো নারকেলপাতা বের করছে। শঙ্কর-দা ডেকে বললেন, থাক মা, আর দরকার হবে না।

ধপ করে দাওয়ার উপর সেইখানে বসে পড়ল স্যাপলার-মা।

বাঁশবনের বাসা থেকে এবারে হঠাৎ কাক ডেকে উঠল। আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন—রাত আছে আর মোটে দণ্ড দেড়েক। প্রফুল্ল ছুটল কান্থর দাদা বলরামের বাড়ি— শেষ-দেখা দেখতে দেওয়া উচিত। হাঁ৷ তাই, সরকারি উকিল রায় সাহেব বলরাম গাঙ্গুলি—মহামহোপাধ্যায় হরিচরণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বড় ছেলে বলাই। অমন অবাক হয়ে তাকাবার কি আছে! এমনি সর্বত্র—টপ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ইংরেজের খোশামুদি করে যারা দিন গুজরান করত, খোঁজ করলে দেখতে পাবে ইংরেজের প্রবলতম শত্রু হয়তো তাদের বাড়িতেই। লাঠি মেরে মাথা

কাটানো যায়, কিন্তু মনের মাথায় যে লাঠি পড়ে না! শেষাশেষি আর এদেশে ইংরেজের নিরাপদ ভূমি একটুকরোও ছিল না—কেউ ভাল চোখে দেখত না ওদের। কম মুশকিলে পড়ে ওরা ভারত ছেড়েছে!

হাত তিনেক গর্ত খোঁড়া হয়েছে ইতিমধ্যে বাঁশতলায় নাটার ঝোপের আড়ালে। গর্তের ভিতর কানুকে এনে নামানো হল। এমনি সময় রায় সাহেব এলেন—ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন।

শঙ্কর-দা বললেন, আপনি একা এলেন গাঙ্গুলিমশায়, প্রফুল্ল মায়ের কথা বলে নি? তিনিও এসে দেখে যেতেন একটু।

বলরাম বিচলিত ভাবে না-না করে উঠলেন। বললেন, মা দেখে তো কষ্টই পাবেন শুধু, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠবেন। তার চেয়ে আমি রটিয়ে দেব, কানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বেড়াতও তো অমনি ভাবে! না না শঙ্কর, কাজ নেই—এক কান দু-কান করে ছড়িয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—একেবারে বংশসুদ্ধ টান পড়ে যাবে আমাদের।

পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে কানুর মুখের উপর। ঝুপ-ঝুপ করে তিনজনে গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেহের চারি পাশে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে রায় সাহেব বলে উঠলেন, মহামহোপাধ্যায়ের ছেলের শেষটায় কবর দিলে শঙ্কর?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিছু বলছি নে এ নিয়ে। শ্মশানে নিতে জানাজানি হবে, উপায় কি বলো? যে যেমন অদৃষ্ট করে এসেছে। বলে নিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন।

শঙ্কর-দা বললেন, হিন্দু আর মুসলমান, শ্মশানঘাট আর কবরখানা—যারা খবরের-কাগজের রাজনীতি করে, পাখার নিচে বসে টাকাপয়সার বখরায় হিসাব কষে, তাদের। লড়াইয়ের মুখে জাতবেজাতের হিসাব থাকে না রায় সাহেব।

মাটির বড় চাঁইগুলো কানুর নধর গায়ে চাপাতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি শঙ্কর-দার, মাথার ধারে বসে হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে ফেলছেন। আপলার-মা এই সময়ে এই মাটির কলসি আর পাঁচ কাহন কড়ি এনে বলল, দাও বাবা এসব ওর সঙ্গে। দিতে হয়। কড়ি নইলে বৈতরণী পার হতে দেবে না যে!

ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে দুস্তর ভয়াল বৈতরণী নদী। কানুর বিদেহী আত্মার পারানি-কড়ি কলসির মধ্যে পুঁতে দেওয়া হল তার সঙ্গে। ধরণীর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে পাঁচ কাহন কড়ি মাত্র শেষ সম্বল—বা ঐ হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে শঙ্কর-দা পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

গর্ত ভরাট হল। তার উপর নারিকেল-পাতা বাঁশ আর বাঁশের চেলা সাজিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। অনেক দিন ধরেই আছে যেন এইরকম, কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

সন্দেহ কেউ করে নি। সেই অমূল্য মস্তবড় ডাক্তার—গভর্নমেণ্টের তরফে অনেক নাম, রায় সাহেব বলরাম যথারীতি সেলাম বাজিয়ে রায় বাহাদুর রূপে সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন, আমাদের প্রফুল্লও এম. এল. এ হয়ে গত মন্বন্তরের সময় চাল-সাপ্লাইয়ের কাজে দেদার টাকা পিটেছে। স্যাপলার-মা বুড়ি কোন্‌কালে মরে গেছে। তার সেই বাড়ি আর আশপাশের অনেক জমি নিয়ে এক বিরাট বাগানবাড়ি ফেঁদেছে প্রফুল্ল। শঙ্কর-দা জেল থেকে এসে কাহুর প্রসঙ্গ তুললেন, প্রফুল্লর মনে পড়ে গেল, তটস্থ হয়ে সে বলল, বটেই তো! জায়গাটা নিরিখ করে দিন—কবরের উপর বসত-বাড়ি তোলা ঠিক হবে না। রেলিং দিয়ে একটা পিলার গেঁথে দেবো আমি ঐ জায়গায়।

পিলার হয়তো প্রফুল্ল সত্যিই গেঁথে দেবে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে প্রফুল্ল নেই তো আর! মড়ার পাশে তাড়াতাড়ি ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিয়েছিল লোকে দেখতে পাবে বলে—সে আলো আবার কেউ জ্বালাতে আসবে না কবরের উপর। কিংবা—ঠিক বলা যায় না, প্রফুল্লর বোন ঐ মোটা থপথপে হাসির ভাবটা যেন কেমন-কেমন। নাছোড়বান্দা তার কাছে শঙ্কর-দা সেবার বলেছিলেন এই কাহিনী। শঙ্কর-দার মতো মানুষ—তাঁরও মুখ খুঁলতে হয়েছিল দলের বাইরে ঐ বিধবা মেয়েটার কাছে। চাসি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সেই যে চলে গেল—কোথায় গেল তার পরে শঙ্কর-দা? মিথ্যা কথা অনেক সাধনা করে এঁদের অভ্যাস করতে হয়, জাঁদরেল পুলিশ-অফিসারদের মুখের উপর অবাধে এঁরা মিথ্যা বলে যান, কিন্তু সজল-চোখ মেয়েটার সামনে শঙ্কর-দার মুখ দিয়ে কিছুতেই সেদিন মিথ্যা বেরুল না।

আধুনিকা

দু-দিন আজ বিষম বাদলা নেমেছে। বিকালে ঐ ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে তিনটে-সাতাশের লোকালে বেরিয়েছিলাম রোগি দেখতে। ফিরছি এখন। রাতের গাড়িতে ফিরতে হবে, তাই যাবার সময় বেডিং অর্থাৎ সতরঞ্চি ও বেশি-কম্বলে জড়ানো বালিশটা স্টেশনে রেখে গেছলাম।

টিকিটবাবু বিশেষ চেনা আমার। হাসপাতালে রেখে সেবার এর কার্বঙ্কল অপারেশন করে দিয়েছিলাম। খাতির করে আমায় অফিসঘরে

এনে বসালেন। বললেন, এ গাড়িতে কেন যাচ্ছেন ডাক্তারবাবু? পৌঁছুতে ধরুন—

তিনটে নিশ্চয় বাজবে। তা-ও পথে যদি আপনাদের রেলগাড়ি দয়া করে ঘুমিয়ে না পড়েন কোথাও।

তাই বলছি, শুয়ে থাকুন এখন স্টেশনে। ওয়েটিং-রুমের তালা খুলিয়ে দিচ্ছি। সকালবেলা থ্রী-আপে চলে যাবেন।

হবার জো নেই মশায়। তা হলে কি এই ভোগ ভুগতে আসি?

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিয়ে বললাম, টিকিট দিন। শেষ রাত্তির থেকে রোগির ভিড় লাগে। কুইনিন নেই বলে পানাপুকুরের জলই রঙ করে দাগ কেটে চালাচ্ছে ফটিক কম্পাউণ্ডার। তাই শেষ করে উঠতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

টিকিট আর বাদবাকি টাকা-পয়সা হিসাব করে দিলেন টিকিটবাবু।

থার্ড ক্লাসের?

নয় তো আর আট টাকা সাড়ে বারো আনা ফেরত দিচ্ছি? গণে নিন।

কিন্তু বলছিলাম কি—ভোর থেকেই স্তেথেসকোপ ঠুকে কসরৎ চালাতে হবে। আমার শুয়ে যাবার দরকার।

টিকিটবাবু বললেন, তোফা নাক ডাকাতে ডাকাতে যাবেন, আমি বলছি। সেভেনটিন-ডাউন গেল, সেভেন-আপ গেল—সব খা-খা করছে, কাকস্য পরিবেদনা। এমন অভদ্রায় কুকুর-বেড়াল ঘর থেকে বেরোয় না—

কিন্তু ডাক্তার বেরোয়। আর ডাক্তার আনতে যারা যায় তারাও।

তা যা বলেছেন।

টিকিটবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, বুদ্ধি বাতলে দিই ডাক্তারবাবু। থার্ড ক্লাসে জায়গা না পান, যে ক্লাসে পাবেন উঠে পড়বেন—পরোয়া করবেন না চেকার ধরে ফেললে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন, না ধরল তো কথাই নেই। যদি বলেন, পজিসন থাকে না-এ দুর্যোগে কে দেখতে যাচ্ছে যে অমুক ডাক্তারবাবু থার্ড ক্লাসে চলেছেন। আর দেখেই যদি, স্রেফ বলে দেবেন—পি. সি. রায় মশায়ও এই লাইনে কতবার গেছেন থার্ড ক্লাসে।

টরে-টক্কা করে টেলিগ্রাফের সংকেত এল, টিকিটবাবু সেই দিকে দৌড়লেন। আর উপদেশ শোনা হল না।

গাড়ি এল। ফাঁকা সত্যি। টর্চ ছিল, অসুবিধা হল না। একটা কামরায় উঠে পড়লাম। বাইরে থেকে ভেবেছিলাম, জনপ্রাণী নেই। সেটা

ঠিক নয় অবশ্য, তবে সজাগ অবস্থায় কেউ নেই। সাকুল্যে জন আষ্টেক হবে, সবাই বেঞ্চির উপর পড়ে ঘুমুচ্ছে। মরে ঘুমুচ্ছে যেন। টর্চের আলো গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে চলে গেলাম, কেউ নড়ল না একটুখানি।

জায়গা যথেষ্ট আছে। একেবারে কোণের দিকে একটা বেঞ্চি পছন্দ করে সতরঞ্চি পেতে ফেললাম। নিরিবিলি থাকা যাবে। কেউ উঠে হঠাৎ বুঝতে পারে না, এ জায়গাটুকুতেও বেঞ্চি দিয়েছে। না—বেঞ্চি না হোক, বাক্স আছে বুঝতে পেরেছে তো। বাক্সের উপর জিনিসপত্র গাদি দিয়ে রেখেছে কে-একজন।

গেঁয়ো হাসপাতালের ডাক্তার আমরা—বেলা একটা অবধি হাসপাতালের কাজ করে পনের মিনিটের ভিতর নেয়ে খেয়ে প্রাইভেট-প্র্যাকটিসে বেরোই—সময়ের অপব্যয় ধাতে সয় না। সতরঞ্চির উপর বালিশটা মাথায় গুঁজে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম। শীত-শীত করছিল—কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে দিলাম ভাল করে। ঘুমও আমাদের সাধনা করে আয়ত্ত করা—যেখানে যে অবস্থায় হোক, গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা।

বৃষ্টি জোরে এল আবার। কড়-কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাড়ি চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কখন নড়বে গাড়িই জানে। আমার অবশ্য তাড়া নেই সেজন্য, নীলগঞ্জ স্টেশনে ভোরের আগে পৌঁছলে হল। বরঞ্চ যত দেরি হবে, ততই ভাল আমার পক্ষে। বাসায় গিয়ে আবার এক দফা ঘুমোবার সুবিধে হবে, মনে হয় না। নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজলাম।

স্বপ্ন দেখছি. মনে হচ্ছে। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, শাড়ির খসখসানি। শাড়ির খানিকটা মোলায়েম আবরণে আমার মুখ ঢেকে ফেলেছে, স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধে চেতনা আরও আচ্ছন্ন হচ্ছে। একটি মেয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে আমার। মুখ দেখতে পাচ্ছি না। বাক্সের বিছানা-বস্তাগুলোর মালিক তা হলে মেয়েটি! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি-সব নাড়ানাড়ি করছে, মৃদু কণ্ঠে কয়েকবার কী যেন বলল আপন মনে। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে তখন আমি দোল খাচ্ছি, শোনবার বা ভাল করে চোখ মেলে দেখবার অবস্থা নেই। এটা ঠিক, আমি একটা পুরুষমানুষ নিচে শুয়ে পড়ে আছি, মেয়েটা টের পায় নি। এই লড়াইয়ের দিনে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে—গাড়ির কামরায় আলো থাকে না, নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর তার. উপর যে রকম কালো কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি, চোখের যত জোর থাকুক—ঠাহর করা সোজা নয়। ক্রমশ সজাগ হলাম, কিন্তু অদ্ভুত অবস্থা—নিশ্বাসটাও নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। মেয়েটা বুঝতে পারলে বড় অপ্রস্তুত হয়ে যাবে।

বাঁচলাম যে বাবা—চলে যাচ্ছে। দম ধরে কুম্ভক করে থাকা কতক্ষণ পোষায়! সেণ্টের সুবাস, গায়ে আঁচল এসে পড়া, গহনার ঝিনিঝিনি—সকল উপসর্গ নিয়ে অন্ধকারবর্তিনী মেয়েটা নেমে গেল।

গাড়ি জংশন-স্টেশনে এল 'চা-গরম—' হাঁক শুনে বুঝতে পারছি। আধ ঘণ্টার উপর গাড়ি থাকে এখানে। শীত ধরেছে, মন্দ হয় না এক কাপ চা পেলে। মাটির গ্লাসে কটু বিস্বাদ যে তরল বস্তু ফিরি করছে, ও নয়। প্ল্যাটফরমের উপরেই রেস্তরাঁ—হামেশাই এ পথে যাতায়াত করতে হয়, সমস্ত জানাশোনা। পাকা-দাড়ি ফোকলা-দাঁত এক বয় আছে, কাপ পিছু দু-পয়সা বেশি ধরে দিলে সে চমৎকার চা বানিয়ে দেয়।

শেডের নিচে লম্বা টেবিল। কাচের জারে কেক-বিস্কুট, দড়িতে-টাঙানো মর্তমানকলা। বড় একটা তোলা-উনুন পিছন দিকে, উনুনের উপর ডেকচিতে টগবগ করে জল ফুটছে, গরম জল হাতা কেটে কেটে ঢালছে চায়ের কেটলিতে। আর পাশে বড় একটা প্লেটে করে চপ-কাটলেট সাজিয়ে রেখেছে, উনুনের আঁচে গরম থাকছে ওগুলো। এই হল জংশন-স্টেশনের সুবিখ্যাত রেস্তরাঁ। খদ্দেরের বসবার জন্য সামনে ক'খানা টিনের চেয়ার আছে। ভিড়ের চোটে কোনদিন কিন্তু চেয়ারে বসতে পারি নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে চলে গেছি। আজকে দুর্যোগের দরুন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দিব্যি লাটসাহেবি মেজাজে বসে টবের উপর পা ছড়িয়ে ঢোকে ঢোকে চা খাচ্ছি। এক কাপ শেষ করে ফের এক কাপের ফরমায়েস করেছি, এমন সময়—

বঙ্কিম যে! তুমি কোথেকে এখানে?

হাতে টিফিন-কেরিয়ার, ছুটতে ছুটতে এসেছে বঙ্কিম। বলে, বলেন কেন দাদা! ডিউটিতে আছি।

টিফিন-কেরিয়ার এগিয়ে ধরে বলল, এদিকে—আমার এটা ভরতি করে দাও। যা তোমাদের ভাল আছে, সব রকম দাও দুটো-চারটে করে। কুইক—

পুলিসে চাকরি করে বঙ্কিম। পুলিশরূপ বলয়ের মধ্যমণি আই. বি.-তে ঢুকেছে নাকি। কম বয়সে উন্নতি করেছে। কিন্তু হাবাগবা ভালামানুষটি কি কৌশলে যে উন্নতি করল, আমার কাছে এক প্রহেলিকা। আর দ্বিতীয় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল, তার মতো কৃপণ মানুষ রেস্তরাঁয় এসে ঢালা হুকুম ঝাড়ছে। এখনো আমি ঘুমিয়ে নেই তো? ব্যাপার কি হে?

বঙ্কিম বলে, এই ট্রেনে যাচ্ছেন? আসুন, আসুন। খিদে পেয়েছে কিনা বড্ড।

নোট দিয়েছে—তার বাকি পয়সা ফেরত নিতে সবুর সয় না, এমন ব্যস্ত হাত ধরেছে আমার, আর এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার। ছুটছে। বলে, মুখ ফুটে আমায় খিধের কথা বলল। সেই মেয়ে দাদা। মনে পড়ছে না—লিলি মিত্তির।

অতঃপর মনে না পড়বার কথা নয়। চার-পাঁচ বছর ঐ চিজটি নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রকে। একবার তো আমাকে সুদ্ধ। হাত-পা ধরাধরি করে বঙ্কিম আমাকে আর তার খুড়ো সম্পর্কের একজনকে পাঠাল ওদের বাড়ি মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার জন্য। মেয়েটাই গেট অবধি এগিয়ে এসে ধুলো-পায়ে আমাদের বিদায় করে দিল, উঠানে পা ফেলতে দিল না।

রাগ করে বললাম, লিলি মিত্তির তো জুতোর হিলে কাদা ছিটকে ছিটকে মুখে দেয়, এখনো পিছন ছাড় নি? আশ্চর্য মানুষ তুমি।

বঙ্কিম হেসে বলে, বড্ড রেগে আছেন দাদা, কিন্তু সে লিলি আর নেই। আসুন না, দেখবেন আলাপ করে। আমার সঙ্গে আজ দৈবাৎ দেখা এই গাড়িতে। সে-ই এখন লেপটে রয়েছে আমার গায়ে। ডিউটিতে আছি—কিন্তু, গল্প…গল্প গল্প। সব স্টেশনে নেমে দেখাও আর হয়ে উঠছে না।

পরম দুঃখে বলতে লাগল, ভাদ্রমাস পড়ে গেল—নয়তো যা মনমেজাজ দেখছি, নির্ঘাৎ এবারে লাগিয়ে দেওয়া যেত। শুধু রাজি নয়—বিষম রাজি সে এখন। কিন্তু হলে কি হবে—অঘ্রাণ অবধি হা-পিত্যেশ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

সেই লিলি বদলে এখন কি হয়েছে, দেখবার কৌতূহল কিছু আছেই—তার উপর বঙ্কিম হাত ধরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে, হাত এড়াবার উপায় নেই। তার ভাবী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাকে রাগ করে থাকতে দেবে না, মিটমাট করে দেবেই।

বৃষ্টি একেবারে ধরে গেছে, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে দেখলাম, মেয়েটা অধীরভাবে পায়চারি করছে। বঙ্কিম দেখিয়ে দিল: ঐ—

কাছে নিয়ে পরিচয় ঝুরিয়ে দেয়: এঁকে চিনতে পার লিলি?

লিলি চমকে তাকাল। মনে হল, তার চোখে বিরক্তি পুঞ্জিত হয়েছে। আবার এই সময়ে ছুটো গেঁয়ো স্ত্রীলোক ছুটতে ছুটতে তার গায়ে একরকম ধাক্কা দিয়ে গেল। এক-পা হঠে দাঁড়াল লিলি, ভ্রু-কুঁচকে নাক সিঁটকে বলল, মানুষ না জানোয়ার? নোংরা কাপড়চোপড়—কী দুর্গন্ধ মাগো।

জলের কল কাছেই, জল পড়ছিল। হয়তো হাতে ছোঁয়া লেগেছিল তাদের, রগড়ে রগড়ে হাত ধুয়ে এল। বদলেছে কি রকম, বুঝতে পারি না। ধুলো-ভরা নোংরা পৃথিবীতে সেই তো আগের মতন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটে। ধুলো না হয়ে যদি আগাগোড়া কার্পেট-বিছানো থাকত, সোয়াস্তি পেত এই লিলির জাতের মেয়েগুলো।

হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতে, বঙ্কিম নাছোড়বান্দা—আবার শুরু করল: চিনতে পারলে না দাদাকে? সেই যে সেবার—মনে পড়ছে না? শান্তিময়-দা গো—যার বাড়িতে খেয়ে আমি মানুষ। আমার নিজের বড়দা'র চেয়েও বেশি। প্রণাম করো।

লিলি হাত দু'খানা একটু তুলল—হাত জোড় হল না, কপাল অবধিও পৌঁছল না। যা-ই হোক, বদলেছে একটু সত্যিই। এ কালের মা-লক্ষ্মীরা গড় হয়ে প্রণাম করতে শেখেন না—কিন্তু যে হাত একদিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কপালের দিকে সেই হাত উঠল তো উঁচু হয়ে!

ওদের গাড়িতে উঠে বসতে হল। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে। বছর বাইশ বয়স মেয়েটার। রং খুব ফরসা। সেটার কতখানি নিজস্ব, আর কতটা ক্রিম-পাউডারের মারফতে দাঁড় করিয়েছে—সঠিক বলা যাবে না। ঠোঁটে আর গালে রুজ, নখে রঙ, একহাতে চুড়ির গোছা আর একহাত খালি, রুক্ষ চুলের বোঝা, মুখের উপর 'হায়—হায়—' গোছের একটা ভাব, কত দিনের করুণ ক্লান্তি যেন জমে আছে সেখানে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি—কত ঘণ্টা সময় লেগেছে না-জানি প্রসাধনে! ছবি আঁকার মতো এরা দেহখানি সাজিয়ে-গুছিয়ে বুভুক্ষু চোখের সামনে তুলে ধরে। সিল্কের আঁটো-ব্লাউজ গায়ে, শাড়ির গুটানো আঁচল আলগোছে আছে কাঁধের উপর। সুরার রক্তিম আভা কাচের পাত্র থেকে যেন বেরিয়ে আসছে। গা শির-শির করে ওঠে। দু-চোখে দেখতে পারি না এই চপল মেয়েগুলোকে—যারা দিনের অর্ধেক সময় ধরে সাজে, আর সাজ কতটা খুলল বাকি অর্ধেক সময় তারই পরখ করে বঙ্কিমের মতো হাঁদারামগুলোর উপর।

মনের ভিতরে যাই থাক, হেসে আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে হয়। আলাপ করিই-বা কি ছাইপাঁশ নিয়ে? বোঝে তো দুটো জিনিস পৃথিবীতে—সিনেমা আর কসমেটিক, আর আমি নিতান্ত আনাড়ি ঐ দুটো জিনিস সম্পর্কে।

লিলি বলল, আপনার কথা শান্তিময়-দা অনেক শুনেছি। উঠেছেন কোন্ গাড়িতে?

বঙ্কিমই বলল, ও ধারে কোথায়। ঘুম—ঘুম—ঘুম—এমন ঘুম-কাতুরে দাদা আমার! তোমার সঙ্গে দেখা করাতে আনব, ঘুম কামাই হবে বলে আসতে চান না।

লিলি বলে, হাই তুলছেন। তাই তো—ওঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। দেখাশুনো তো হল—যান শান্তিময়-দা ঘুমুনগে আপনি।

অর্থাৎ সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়াচ্ছে, আপদ-বালাই বিদায় হও তুমি এখান থেকে। বর্ষারাত্রে ফাঁকা গাড়িতে দু-জনে আছি, পাকা চুল আর ভারি গোঁফজোড়া নিয়ে দোহাই তোমার জেঁকে বসে থেকো না এর মধ্যে।

কিন্তু বঙ্কিমটা বুঝবে না এসব কিছু। বলে, কষ্ট না আরো-কিছু! কি হয় মানুষের একরাত না ঘুমুলে? কত কথা জমে আছে—বসুন আপনি। দেখাশুনোর পাট একেবারে উঠিয়ে দিয়েছেন, তার শাস্তি।

এই সময় খেয়াল হল টিফিন-কেরিয়ারের খাবার যেমন তেমনি রয়েছে।

কই লিলি, খাচ্ছ না যে?

এখন থাক—

ক্ষিধে পেয়েছে বললে—

লিলি মৃদু হেসে বলে, কখন?

আমি জানি, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তোমার। খাও।

আমি বললাম, খাওয়ানোই যদি মতলব, আমায় টেনে আনলে কেন এখানে? আমি উঠি।

লজ্জিত হয়ে লিলি বলল, না না, বসুন আপনি, গল্প করুন। মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে যাই আমি। হাত-টাত ধোবার দরকার, নিচে তো নামতেই হবে—

বঙ্কিমের দিকে চেয়ে বলে, বাপ রে, অত এনেছ কেন? দাও অতি-সামান্য কিছু।

নিজেই সে একটা বাটিতে করে তুলে নিল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, যা নিল নেহাৎ অতি-সামান্য নয়। যাক—একেবারে বেপরোয়া হয় নি তা হলে, পুরুষদের সামনে হাঁ করে গিলতে লজ্জা লাগে এখনো!

লিলি গেল তো ফাঁকা পেয়ে অতঃপর বঙ্কিম ছেঁকে ধরল। শতকণ্ঠে লিলির কথা। বাইরে একটু বেশি চটপটে হলেও মনে মনে সে অত্যন্ত সরল ও অমায়িক, অমন মেয়ে হয় না। অর্থাৎ প্রেমে গদগদ অবস্থা বেচারির। লিলি অলোকসামান্যা নারী, পৃথিবীতে এমনটি দ্বিতীয় জন্মায় নি, বিনাতর্কে

মেনে নিয়েও অব্যাহতি পাই নে। বঙ্কিম বিপুলতর উৎসাহে আবার গুণের ফিরিস্তি দিতে লেগে যায়। এ পাগল দেখছি মাথা খারাপ করে দেবে।

লিলি ফিরে আসছে। দুটোয় মিলে গল্প করুক, এবার আমি পালাব। না ঘুমুলে চলবে না। অগ্নিবিন্দু···। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখতে পাচ্ছি, হাঁ—লিলিই তো! সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ—মেয়েটা সিগারেট ধরিয়েছে নাকি?

যখন কামরায় এসে উঠল, তখন অবশ্য ও-সব কিছু দেখলাম না। চুলোয় যাকগে। কতক্ষণ বা আছি এদের সঙ্গে, ক'দিনই বা দেখা হবে জীবনে!

বঙ্কিম বলে, এর মধ্যে হয়ে গেল?

যাচ্ছেতাই খাবার। ফেলে দিতে হল প্রায় সমস্ত।

লজ্জায় মরে গিয়ে বঙ্কিম বলে, তাই নাকি? সব তাতে জোচ্চুরি চলেছে আজকাল। আচ্ছা, মামুদপুর পৌছই। সেখানে—

মামুদপুর আমার নীলগঞ্জেরই ঠিক পরের স্টেশন। আট বছর আছি, আমার ঘরবাড়ি বললেই হয় নীলগঞ্জ-মামুদপুর ইত্যাদি অঞ্চলটা। আশ্চর্য হয়ে বললাম, ফ্ল্যাগ-স্টেশন—এক ঢোক খাবার জল জোটানো যায় না, জলখাবার মিলবে কোথা মামুদপুরে?

মুচকি হেসে রহস্যপূর্ণ চোখে বঙ্কিম বলল, আমাদের মিলবে দাদা, ষোড়শোপচার রাজভোগ। লোক আছে আমাদের।

আমি বললাম, এ গাড়ি আগে ধরতই না ওখানে।

আজকাল ধরে। মিলিটারি ঘাঁটি হয়েছে কিনা! ক্যান্টিন থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা আছে। আর তা ছাড়া—

কথার মাঝে বঙ্কিম থেমে গেল হঠাৎ।

আমি আর লিলি চেয়ে আছি। বঙ্কিম বলল—লিলির খাতিরেই নিশ্চয়—তা আপনাদের কাছে বললে দোষ আর কি? বাইরে খবর ছড়াতে যাচ্ছে না তো?

গলা নিচু করে বলতে লাগল, কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েছে। পেট্রোল দিয়ে পোস্টাফিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

লিলি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে: সে কি? পোস্টাফিস পোড়াতে গেল কারা?

বঙ্কিম বলে, মাথা খারাপ যাদের। দেশ উদ্ধার হবে নাকি এই সমস্ত করে করে!

মুখ দিয়ে আমার বেরিয়ে গেল: করাচ্ছে যে তাদের দিয়ে—

লিলি সায় দেয়ঃ ঠিক। দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীরা—

না, সরকারি লোক তারা—

বঙ্কিম হাঁ করে আমার মুখে তাকাল।

হাঁ—সরকারই দায়ি এ সমস্তর জন্য। বোম্বাই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস কি করে, দেখবার জন্য সবুর করল না—কেন ধরল গান্ধীজী ও নেতাদের? সর্বস্ব দিয়ে যারা পরাধীনতার অবসান চাচ্ছে, আর এক নতুন বিদেশি-জাপানির পায়ে মাথা বিকোবার কথা স্বপ্নে তারা ভাবতে পারে?

লিলি উত্তেজিত হয়ে ঘাড় নাড়ল: না না—দুয়োরে শত্রু, ওসব চুল-চেরা বিচারের সময় এ নয়। ধরা পড়েছে কেউ বঙ্কিমবাবু?

বঙ্কিম পরমোৎসাহে বলে, গোটা দুই এখন পযন্ত। কিন্তু যাবে কোথা? বেড়া-জালে আটকানো হয়েছে। এই গাড়িটায় আমার নজর রাখবার কথা। স্টেশনে স্টেশনে নেমে যাচ্ছি, দেখছ না? মামুদপুর থেকে আরও ছ-সাত জন আমাদের উঠবে। গাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখা হবে তার পরে।

লিলি বলে, ধরে সবগুলোকে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। সে-ই উচিত শাস্তি।

উঠে দাঁড়ালাম, আর নয়। মনে মনে বলি, বিলাতি পারফিউমারির জীবন্ত বিজ্ঞাপন বই তো নও—তোমরা এ কথা বলবে বই কি! সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি। তোমাদের পরম উপাস্য বিদেশি দেবতারাঁও নিশ্চয় ঘর পোড়াবার দায়ে ফাঁসির হুকুম দিতে চাইত না।

বঙ্কিম পিছনে ডাকতে লাগল, আমি কানে নিলাম না।

কামরায় ঢুকে নিজের জায়গায় যাচ্ছি, জুতোসুদ্ধ পা হড়কে গেল। পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ব্যাপার কি? টর্চ জেলে দেখি, কলার খোসা। আর দেখি, কেক আর কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে আমার সতরঞ্চি-কম্বলের উপর।

কি করে এ সব এখানে আসে? একটা কথা ধ্বক করে মনে উঠল। কিন্তু না—এত জায়গা থাকতে লিলি বেছে বেছে এই থার্ড ক্লাসের কামরায় জলযোগ করতে আসবে কি জন্য? সরকারি গাড়ি—যার ইচ্ছে খেয়ে গেছে। তবে আমার বিছানায় ছড়িয়ে না গেলে বলবার কিছু থাকত না।

শুয়ে পড়লাম ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে।...সেই স্বপ্ন আবার। নিঃশব্দগতিতে ঢুকল, পাখির মতো উড়ে এল যেন। ঘুমোই নি, এক মুহূর্তে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। ফিস ফিস করে লিলি ডাকছে: অজিত-দা, ঘুমিয়ে পড়লে আবার?

ডাকতে ডাকতে বেডিং ও বস্তার মাঝ থেকে শব্দ বেরুল, উঁ।

খেয়েছ ?

তুমি খাইয়ে দিয়ে গেলে না তো !

খাও নি তাই বলে নাকি ?

ফেলে দিয়েছি, রাগ করে ছড়িয়ে দিয়েছি সব—

নিশ্বাস রোধ করে উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্ছি। বটে রে! লাগেজের সঙ্গে জলজ্যান্ত প্রেমিক একটি নিয়ে চলেছ, ফাঁক মতো এসে এসে প্রেম করেও যাচ্ছ—আর বঙ্কিম হতভাগা ওদিকে খাবার বয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের।

লিলি অনুনয়ের সুরে বলে, কি করব! একটা তো পিছনে ফেউ লেগেই আছে। আবার দু-নম্বর জুটেছে—বঙ্কিমের কোন বাউণ্ডুলে দাদা। বেশিক্ষণ কাছে থাকতে ভরসা হয় না। মিথ্যে তুমি রাগ করছ।

খুব চুপি চুপি বলছে, তবু শুনতে পাচ্ছি প্রতিটি কথা।

এবার কোমল স্বরে ছেলেটি জবাব দিল: না গো, রাগ করব কেন? ঠাট্টা করে বললাম। যদ্দুর পারি খেয়েছি। হাত দিয়ে তুলে খাবার জো আছে কি?

জল এনেছি, জল খাও অজিত-দা। হাত-মুখ মুছিয়ে দি তোমার—

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসলাম। এমন আবিষ্ট, এখনো টের পেল না। শুধু হাত ধোওয়ানো নয়—ও কি! মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়—কি করছে রে? হাতে-নাতে ধরে ফেলব। টর্চ জ্বাললাম। বাঙ্কের উপর ঝুঁকে পড়ে লিলি তার শাড়ির আঁচলে হাত-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। বেডিং-বস্তার আড়ালে মানুষটাকে ঠিক দেখতে পেলাম না।

লিলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু। খপ করে আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

ঘাড় নেড়ে আমি বললাম, বলে আমি দেবোই। সমস্ত ফাঁস করে দেবো।

সহসা বিছানার তূপ ঠেলে মানুষটা খাড়া হয়ে বসল। বলল, চলুন—আমিই যাচ্ছি।

লিলি বলে উঠল, উঠো না, উঠো না তুমি অজিত-দা—

শুধু ওঠা নয়, লাফিয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করছে ছোকরাটি। হঠাৎ অসহ আর্তনাদ করে সে গড়িয়ে পড়ল।

শিউরে টর্চ ফেললাম তার দিকে। জীবনে অমন বীভৎস চেহারা দেখব না। সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে, ঘা দগদগ করছে, ঝাঁকুনিতে রক্তের ধারা বেরুচ্ছে ক্ষতমুখ দিয়ে। সেই অবস্থায় অজিত বলল, আমার তো ক্ষমতা নেই নিজে গিয়ে ধরা দেবার। ওদের ডাকুন মশাই, চাই নে আমি পোড়া-দেহ নিয়ে পড়ে থাকতে।

লিলি সজল কণ্ঠে বলে, না অজিত-দা, না।

দু'জনে আস্তে আস্তে ধরে নামালাম অজিতকে। আমি জল আনতে ছুটলাম স্টেশনে। এসে দেখি—নিজের চোখে না দেখলে কখনো আমি বিশ্বাস করতাম না—সেই নাক-সিঁটকানো শৌখিন মেয়ে লিলি, যার বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কথা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেদের মুখে মুখে ঘোরে—দামি সবুজ একখানা রুমাল অজিতের ঘায়ের উপর চেপে ধরেছে। রুমাল ভিজে গিয়ে ঘায়ের রসরক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার পাউডার-বুলানো সুশুভ্র হাতের উপর দিয়ে, রাঙানো নখগুলোর উপর দিয়ে। আর কী আকুলতা দেখলাম তার চোখে-মুখে!

স্টেশনের কেরোসিনের আলোর নিচে হঠাৎ বঙ্কিমকে দেখা গেল। ঘুরে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছে বোধহয়। অজিতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি: কি বঙ্কিম?

'আসছি—' বলে কোথায় যে লিলি চলে গেল, অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ি ছাড়বে, ঘণ্টা দিতে যাচ্ছে এবার।

হেসে বললাম, লিলিকে আমার এখানে টেনে এনেছি। বড়ঘরেব মেয়ে —দেখে যাক, থুতু-কাশি শালপাতা পোড়া-বিড়ির মধ্যে কেমন আনন্দভ্রমণ হয় আমাদের। যাও লিলি, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি-চুপি বলি, মামুদপুর পৌছবার আগেই আমি ব্যবস্থা করে ফেলব। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও দিদিভাই।

লিলি নেমে গেল। বঙ্কিমের সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে ঘনপক্ষ দৃষ্টি তুলে তাকাল একবার আমার দিকে। জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম।

নীলগঞ্জ স্টেশনে স্ট্রেচার নেই। জন চারেক কুলিকে দিয়ে অফিসের ইজিচেয়ারটা আনালাম। সবাই আমার চেনা, ডাক্তারবাবু বলে খাতির খুব, একেশ্বর সম্রাট বলতে পারেন আমাকে এ-জায়গায়। ইজিচেয়ারে অজিতকে শুইয়েছি, আমার কালো কম্বলে ঢেকে দিয়েছি আগাগোড়া। ইচ্ছে করেই বঙ্কিমদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাই। লিলি খুব গল্প জমিয়েছে—একখানা হাত এলিয়ে দিয়েছে বঙ্কিমের কোলের উপর। জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েই বঙ্কিম যথাসম্ভব তার ডিউটি করছে।

আমায় দেখে বলে, চললেন দাদা?

হ্যাঁ। আর গেরো কেমন ঐ দেখ। রোগ দেখতে গিয়ে রোগিটিও পিছন নিয়েছে। ত্রিসংসারে কেউ নেই, হাসপাতালে ভরতি করে নিতে হবে।

লিলি উঠে দাঁড়াল। প্রণাম করে আসি দাদাকে—

আধুনিকা মেয়ে এসে কাদা-ভরা প্লাটফর্মে আমার পায়ের গোড়ায় উপুড় হয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলল যখন, দেখি, সাবান দিয়ে-ফাঁপানো চুলে ভুরু কাজলে ঠোঁটের রুজে কাদা লেপটে গেছে। কুলিরা ততক্ষণে আমার রোগীকে প্লাটফর্মের গেট পার করে নিয়েছে।

পুণ্যের সংসার

একদা হরিমোহন উকিল ছিলেন। বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সত্যিই কোর্টে যেতেন তিনি নিয়মিত। এবং মক্কেল পেলে ওকালতনামায় সই মেরে নথিপত্র বগলে হাকিমের এজলাসে ছুটতেন। উপায় কি তা ছাড়া? বাপ খরচা করে ওকালতি পড়িয়েছেন। যা দু-একটা মক্কেল, তিনিই জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বিয়েও দিয়েছেন তিনি, এবং তার ফলে যথারীতি নাতি-নাতনি পেয়ে যাচ্ছেন। এ হেন বাপের আদেশ অমান্য করা চলে না। সে কথা ওঠেও না—অত্যন্ত সৎ পিতৃভক্ত ছেলে হরিমোহন।

সেই বাপ গত হলেন। অতঃপর হরিমোহন আর কোর্ট মুখো হন নি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বৈঠকখানায় বিছানা পেড়ে ঘুমোন। বলেন, একই ব্যাপার তো—বার-লাইব্রেরিতে বসে বসে ঘুমানো আর বৈঠকখানায় শুয়ে পড়ে ঘুমানো।

ঘুমটুমের পর হরিমোহন বাপের পুরানো কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখেন। যত দেখেন, অবাক হয়ে যান। ধন্য তুমি বাবা! এতই তোমার আছে, তবে কি জন্য ঐ ক'টা বছর আদালতে ছুটোছুটি করালে? যে সম্পদ রেখে গেছেন—হরিমোহন তো ছার, তার ছেলে এবং ছেলের ছেলে অবধি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবে। ফুরোবে না। উত্তরপুরুষদের যত রকমে নির্ভাবনা করা যায়, তার সকল ব্যবস্থা ভেবে গেছেন তিনি। ধানজমির গুলো-বন্দোবস্ত—অর্থাৎ ফসল হোক না হোক, বর্গাদার হিসাবমতো ধান গোলায় তুলে দিয়ে যাবে। ফলের বাগান—বারোমাসে যখন যা ফলে, বাগান থেকে ঘরে আসবে। বসতবাড়ি ছাড়া ভাড়াবাড়ি কতকগুলো—বিনাশ্রমে মাসে মাসে বিস্তর পরিমাণ নগদ তঙ্কা। তাছাড়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা আছে, শেয়ার ও জীবনবীমা আছে। আরও কত কি আছে, সমস্ত এখনও জানা যায় নি। মোটের উপর অত্যন্ত মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন বাবা মানুষটি।

এই অবস্থায় যা ঘটে—ধর্মে-কর্মে বিষম মতি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। তেতলার ছাদের দুই প্রান্তে দুই ঠাকুরঘর। হরিমোহন আর পূরবী ভোরে উঠে নিজ

নিজ ঠাকুরঘরে চলে যান। বেরুতে নটা। হরিমোহন বেরিয়ে এসে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। পূরবী যান রান্নাঘরের তদারকিতে। সন্ধ্যার ঠিক পরেই পুনশ্চ উভয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েন। ভরভরন্ত সংসার হরিমোহনের। তিন মেয়ে, চার ছেলে। বড় মেয়ে দীপার বয়স ষোল হলেও এমন বাড়-বাড়ন্ত যে ঘরে রাখা যাচ্ছে না, অচিরে বিয়ে দিতে হবে।

একদিন বিষম কাণ্ড। ধূপের-ধোঁয়ায় বিগ্রহ এবং হরিমোহন নিজেও আধাআধি অদৃশ্য। পূরবী দেবী এমনি সময় বাইরে এসে ডাকলেন: শোন, শিগগির শুনে যাও একটা কথা।

হরিমোহন তদ্গত হয়ে ছিলেন। পূরবী এত ডাকছেন, কানে পৌঁছয় না। অবশেষে সাড়া দিলেন: অ্যাঁ?

বাইরে আসতে বলছি।

যাই।

পূরবী আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। অধৈর্য হয়ে শেষে নিজেই ঢুকে পড়েন: নিভা কি করেছে জান?

কতক বাক্যে কতক বা ইঙ্গিতে পূরবী বললেন। শুনে হরিমোহনের চোখ বড় বড় হল: কি বল, তাই কখনও হতে পারে?

পূরবী বললেন, ভাল করে না জেনে কি বলছি? সাত ছেলেমেয়ের মা— আমার চোখে ফাঁকি চলে না। তার উপরে লক্ষ্মীমণি দাইকে দিয়েও দেখিয়ে নিলাম আজ।

হরিমোহনের কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাল: কী সর্বনাশ!

করবী পাঠাল ওকে। ওর মা চিরকাল তাদের সংসারে কাজ করে গেছে, কেউ একটা কথা বলতে পারে নি। কচি বয়সে বিধবা হয়েছে, অনাথা, লিখতে পড়তে পারে একটু-আধটু। ভাবলাম, রেখে দিই। দীপার বিয়ে হবে, তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে দেব।

হরিমোহন বলেন, আমি মানা করেছিলাম—মনে আছে? ফালুকফুলুক চাউনি—ওসব মেয়ে ভাল হয় না। বোঝ এইবারে।

তাই নিভাকে বলছিলাম, পুণ্যের সংসারের উপর বসে কী কাণ্ড করলি, ওরে পোড়ারমুখী। দয়া করে আশ্রয় দিলাম—আমার যে মুখ তোলবার উপায় রাখলি নে ওঁর কাছে।

হরিমোহন রায় দিলেন: পাপ বিদেয় কর।

করতেই তো হবে—

দেরি নয়, এক্ষুনি। এই মুহূর্তে।

পূরবীর তখন দয়া হয়েছে : রাত্রিবেলা, তার উপর শীতকাল—

হরিমোহন কঠিন কণ্ঠে বলেন, না না, চলে না-যাওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতে আমার ঘুম হবে না। তবে বল, আমিই যাচ্ছি অন্য কোথাও।

পূরবীকে কিছু বলতে হল না। লক্ষ্মীমণি দাইকে দেখানোর পরে পূরবী যখন হরিমোহনের কাছে ছুটলেন, তখনই নিভা বুঝেছে। টিনের বাক্সটা গুছিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। পূরবী বেরিয়ে আসতেই পায়ের গোড়ায় সে প্রণাম করল।

দীপার বিয়ে। দমদমে ছোটবোন করবীর বাসা—হরিমোহন ও পূরবী তাদের নিমন্ত্রণ করতে গেছেন। নিভাকে দেখে চমকে উঠলেন। বোনকে একান্তে নিয়ে পূরবী বলেন, তোর এখানে এসে জুটেছে? তুই পাঠিয়েছিলি, রেখেও ছিলাম। জানিস নে ওকে—ডুবে ডুবে জল খায়। বাড়ি থেকে সেই জন্য তাড়িয়ে দিয়েছি।

করবী সহজভাবে বলে, আমরাও তাই আন্দাজ করেছিলাম। নয়তো এমন ভাবে হাসপাতালে গিয়ে উঠবে কেন? ওঁরও হাসপাতালে কাজ। খবর দিয়েছিল কিংবা হঠাৎ উনি দেখে ফেললেন, বলতে পারি নে। বাড়িতে নিয়ে এলেন।

তারপর আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে করবী বলে, ভালয় ভালয় প্রসব হয়ে গেছে। খাসা এক ছেলে। দেখবে বড়দি?

পূরবী স্তম্ভিত হয়ে যান : ছি ছি, পাপের কথা মুখ দিয়ে বলিস কেমন করে? দূর করে দে।

করবী বলে, ওঁর তাহলে বড় কষ্ট হবে। আমি আবার ইস্কুলের কাজ নিয়েছি একটা। একলা উনি মুখে রক্ত তুলে খাটবেন কেন? দুপুরবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরেন, আমি তখন ইস্কুলে। নিভা আছে বলে দায় ঠেকতে হয় না।

পূরবী বলেন, সর্বনাশ, বেড়াল হল মাছের পাহারাদার! কবে তোর জ্ঞানবুদ্ধি হবে, বল্ তো?

করবী অসহায়ের ভাবে বলে, কি করি বড়দি, লোকজন মেলে না মোটে। তাছাড়া বাড়ি ওঁর—উনি এনে বহাল করেছেন আমি কেন তাড়াতে যাব। আগ বাড়িয়ে?

স্বামীকে এমনি ভয় করে বটে করবী। ছোট বোনের জন্য পূরবীর কষ্ট হয়। যে-কথা মুখ ফুটে বলল না, মেয়েমানুষ হয়ে তিনি তা বুঝে নিয়েছেন। চোখের উপরে এই বস্তু দেখতে হয়, মাস্টারি নিয়েছে বোধহয় সেই জন্যেই। সংসারে ঘেন্না ধরেছে, কাজের মধ্যে যতক্ষণ বাইরে বাইরে থাকা যায়।

বৈঠকখানায় হরিমোহন চা খাচ্ছেন, যেতে যেতে একটা পরামর্শ করতে হবে তাঁর সঙ্গে। এমনি অবস্থা চলতে দেওয়া হবে না। একটা চিঠির মতন হরিমোহনের হাতে। পূরবীকে দেখে ঢেকে ফেললেন। ঢাকাঢাকি জিনিসটা আদপে সহ্য হয় না পূরবীর : কি ওটা ?

কই। কিছু না—

উঠে দাঁড়াও।

স্ত্রীকে হরিমোহন ভাল রকম জানেন। কথা না শুনলে কুরুক্ষেত্র এখনই। কুটুম্ববাড়ি বলে রেহাই নেই। উঠে দাঁড়াতেই কাপড়ের ভিতর থেকে চিঠি পড়ে গেল। লুফে নিলেন পূরবী।

—যথেষ্ট হইয়াছে। ছেলের জন্য টাকার আবশ্যক নাই।

পূরবী ভ্রূকুটি করলেন : নিভার এ চিঠি তোমার কাছে কেন ?

হরিমোহন আমতা-আমতা করেন : আমার কাছে কে বলল—উঁহু, মেঝেয় তো পড়ে ছিল।

সুপ্রসন্ন হাসপাতাল থেকে এল এই সময় : বড়দি এলেন কখন ? দু'জনে এসেছেন—করবী বাড়ি ছিল তো, সে কোথায় ? কি হয়েছে বড়দি ?

উঁকি দিয়ে দেখে নিল পূরবীর হাতের চিঠিখানা। দু'জনের মুখে তাকায়। ধর্মনিষ্ঠ এই দম্পতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ একবার দেখেছিল দুই ঠাকুরঘরের মাঝে ওঁদের খোলা ছাতের উপর। ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসা করেছিল হরিমোহনকে। তেমনি এক ব্যাপার ঘটে যায় বুঝি! সুপ্রসন্ন বলে, আমার চিঠি আপনার কাছে এলো কি করে বড়দি ?

অগ্নিদৃষ্টি পলকের মধ্যে হরিমোহন থেকে সুপ্রসন্নের উপর এসে পড়ল : তোমার এ চিঠি ? করবী জানে ?

উঁহু, সে জানবে কি করে ? তারপর নিম্নকণ্ঠে সকাতরে বলে, তাকে কিছু বলতে যাবেন না বড়দি।

কিন্তু মানা করে দিল যখন, এর পরে পূরবী মুহূর্তকাল আর স্থির থাকতে পারেন না। করবীর কাছে ছুটে গিয়ে বলেন, দেখ—

কার চিঠি ?

কার বলে মনে হয় ?

নাম করে লেখে নি তো। কেমন করে বুঝব ?

চিঠি সুপ্রসন্নর।

হাসি চেপে নিয়ে করবী বলে, ও—

সে হাসি দেখতে পেয়েছেন পূরবী। চটে গিয়ে বললেন, বিশ্বাস করলে না ?

এ কি বিশ্বাস হবার কথা?

স্বীকার করেছে আমাদের কাছে। দেখ, যা আঁচ করেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে খাটে কি না! বোকা-সোকা মানুষ তুই, সেইজন্যে এতবড় সর্বনাশ।

করবী তখন মুখ চুন করে বলে, সংসারের মালিক হলেন উনি, ওঁর ইচ্ছে হলে আমি কেমন করে ঠেকাব বড়দি?

পূরবী আগুন হয়ে বলেন, ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর ছুঁড়িটাকে। ন্যাকা তুই, তোর দ্বারা হবে না। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি এখনই।

এবারে করবী পথ আগলে দাঁড়ায়। কঠিন স্বরে বলল, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমাদের ব্যাপারে যা করতে হয়—আমরা নিজেরা করব।

রাগ করে পূরবী হরিমোহনের হাত ধরে চলে গেলেন।

নিভা ওদিকে টিনের বাক্স গোছাচ্ছে। করবী গিয়ে পড়ল: তোর কি আবার?

চলে যাচ্ছি।

করবী ক্ষেপে ওঠে: গেলেই হল! উনি খেটেখুটে আসেন, আমি থাকতে পারি নে—এক গ্লাস জল গড়িয়ে কে দেয়? বলি, মায়াদয়া লজ্জাশরম কিছু থাকবে না—পাষাণ নাকি রে তুই?

নিভা ঘাড় নিচু করে দাঁড়াল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মুখপুড়ি, চুরি করে অন্যের কথা শোনা হয়েছে! দেবো এক থাবড়া। টাকা দিতে চেয়েছিল বুঝি? ঠিক করেছিস। ও-মানুষের মুখ দেখতে নেই। কিন্তু বাঘের মতন বড়দি আমার—চিঠিপত্তোর সামাল হয়ে ছুঁড়তে হয়।

নিভা সরে গেলে সুপ্রসন্নকে বলে, তুমি কিন্তু বেশ। বড়দি ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। আর কিছু নয়, বোকা বলে গেল আমায়। বোকা হতে আমি চাই নে।

সুপ্রসন্ন বলে, কী করা যায়। ওঁদের পুণ্যের সংসারে অশান্তি আসবে, সে তো হতে পারে না। আর বড়দির যা ব্যাপার—এই নিয়ে হুলস্থুল বাধাবেন। বিয়েবাড়ি বলে মানবেন না।

যুগল আত্মহত্যা

মাস কয়েক আগে কাগজে উপরোক্ত শিরোনামায় খবর বেরিয়েছিল। পড়েছেন নিশ্চয়। কোরিয়ায় কুকুর রপ্তানি, কালিফোর্নিয়ায় বিমানদুর্ঘটনা, সুন্দরবনে জলপ্লাবন ইত্যাদি না পড়ুন—লেকের জলে জোড়া-আত্মহত্যা কদাপি নজর এড়াবে না।

বর্ণনাটা এই রকম :

সকালবেলা চৌকিদার দেখিতে পাইল, বড়-লেকে কী এক বস্তু ভাসিতেছে। আত্মহত্যা সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে এত সুখ্যাতি যে বহু দূরবর্তী স্থান হইতে লোকে এখানে আত্মহত্যার মানসে আসিয়া থাকে। সাঁতার কাটিয়া ভাসমান বস্তুর নিকটে গিয়া দেখা গেল, মৃতদেহই বটে—তবে একটি নয়, দুইটি। পরস্পরের পরিধেয় বস্ত্রে গিঁঠ-দেওয়া। অধিকন্তু একের বাঁহাত ও অন্যের ডানহাত একত্রে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা আছে···

অর্থাৎ একজনে হাবুডুবু খেয়ে দম আটকে মরবে, অন্যে সেই সময় মজাসে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে পড়বে—সেইটে না হয়। যাকে বলে চুক্তিবদ্ধ আত্মহত্যা। এ কর্মের বিধি এই প্রকার। বিশেষজ্ঞরা জানেন।

বর্ণনা দিব্যি জমে উঠেছে, কি বলেন? কিন্তু উপসংহারে এসে বসিয়ে দিল। আত্মহত্যা করেছে তরুণ-তরুণী নয়, গোঁফ-সমন্বিত পুরুষমানুষ। বুড়োমানুষ দু'জনেই। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বেঁচে এসে বাকি ক'টা বছর আর পারলেন না। সংক্ষিপ্ত পথে পাড়ি দিলেন।

মৃতদেহ সনাক্ত হয়েছে। একটা নিয়ে ভাবনা কিছু নয়—সরকার-জানিত ব্যক্তি, রায়বাহাদুর নিরুপম চৌধুরি। পুলিশে বড় চাকরি করতেন। লেকের চৌকিদারগুলো অবধি চিনল। ডাক্তারে বলেছিল, করোনারি-থ্রম্বসিস এড়িয়ে আয়ু দীর্ঘতর করবার প্রকৃষ্ট উপায় হল বেড়ানো। ঋষিবাক্যের মতন সেই উপদেশ মেনে রায়বাহাদুর আজ চার-পাঁচ বছর নিয়মিত লেকে বেড়াচ্ছেন, অথচ সেই বড় সাধের প্রাণটা জীর্ণবস্ত্রের মতো অবহেলায় জলে ডুবিয়ে তিনি সরে পড়লেন।

সহচর রূপে যাকে নিয়ে গেলেন, তার পরিচয়টা খুঁজতে হল। বাণী-বিদ্যালয়ের সেকেণ্ড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার কুশলচন্দ্র পাকড়াশি। আমি ঐ ইস্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র—আমিই দেখে নামধাম সমস্ত বাতলে দিলাম। ভারি তাজ্জব কিন্তু। রায়বাহাদুর মানুষটা চিরকালের সাহেব-ঘেঁষা। নিকট-আত্মীয়দেরও কোনদিন আমল দিতেন না। চরমকালে তিনি ইস্কুলের এক নগণ্য ক্যাশিয়ারের হাতে হাত-বেঁধে নির্লজ্জের মতো যমরাজের দরবারে গিয়ে উঠবেন, ভাবতে পারা যায় না।

আদ্যোপান্ত শুনুন তবে। কতক কুশলচন্দ্রের স্ত্রীর কাছে শোনা, কতক রায়বাহাদুরের ছেলের কাছে। আগে থেকেও জানতাম কিছু কিছু।

ঐ লেকপাড়াতেই রায়বাহাদুরের বাড়ি। ঝকঝকে ছবির মতন। যে দেখে সে-ই রুচির প্রশংসা করে। কিন্তু ঘরে শান্তি নেই। লেকে বেড়ানো

শুধুমাত্র শারীরিক কারণে নয়। যতক্ষণ বাইরে থেকে পারা যায়। পারলে রাত্রিটাও লেকে কাটাতেন।

বড় ছেলে অলকেশ কিছুদিন থেকে আয়রন-সেফের চাবির বায়না ধরেছে। অস্থির করে তুলছে। স্ত্রীও ছেলের দিকে: দাও না ফেলে ছাই। ঝোঁক হয়েছে, খুলে দেখুক।

দেখবে কী আবার? বলেই তো দিয়েছি—পুরানো কাগজপত্র, আর তিন-চারটে সোনা-রুপোর মেডেল। কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে মার্টিন আর প্যামার সাহেবের সার্টিফিকেট দুখানা।

তবে দিচ্ছ না কেন?

রায়বাহাদুর এবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন: দেবো না। ব্যাঙ্কে যা ছিল, চেটেমুছে তো সাবাড় করেছে। অসুখ করে যদি ছ-মাস বিছানায় পড়ে থাকি, ও ছেলে দেবে এক পয়সা? বলে দিয়েছি, আয়রন-সেফে কিছু নেই। বিশ্বাস করে ভাল, না করে তো বয়ে গেল।

চলছিল এমনি কিছুদিন ধরে। আজকে চরমে উঠল। স্ত্রী বললেন, তুমি যে অমনি করে বল—জোয়ানযুবো ছেলে, রাগ না চণ্ডাল। ধর, অলক এসে তোমার গলা টিপে ধরল। বুড়োমানুষ পারবে ঠেকাতে?

রায়বাহাদুরের বাক্যস্ফূর্তি হয় না ক্ষণকাল। বললেন, বুঝতে পারলাম। ছেলে গলা টিপে ধরবে, তুমি মা সেই সময় কোমর হাতড়াবে চাবির জন্যে।

ভালর জন্য বললাম, কানে নিলে না। অপঘাত সত্যি সত্যি আছে তোমার অদৃষ্টে।

আসন্ন সন্ধ্যা। আজ আর বেড়ানো নয়—রায়বাহাদুর লেকে গিয়ে সবুজ বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে পড়লেন। রাগে গরগর করছেন। ভয়ও হচ্ছে, অলকেশের মতো ছেলের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। বিশেষত মাকে যখন দলে পেয়েছে। প্রাণ নিয়ে নেয়, সেটা তত কিছু নয়। তারও বেশি আছে। আয়রন-সেফে যে যে বস্তুর ফিরিস্তি দিলেন, তা ছাড়াও আছে এক-শ টাকার নোট কুড়িখানা! প্যামার সাহেবের সার্টিফিকেট যে খামে আছে, তার ভিতরে। রায়বাহাদুরের সর্বশেষ সম্বল। ওরা সেটা টের পেয়েছে কেমন করে। কিন্তু দু-হাজার টাকা কতক্ষণ আর অলকেশের কাছে!

খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। টাকাটা সরাতে হবে। এবং সোনারুপোর মেডেল-গুলোও। গলা টিপে মেরে কোমরের চাবি নিয়ে আয়রন-সেফ খুলে যাবে-

ছেলের তখন কপাল চাপড়াবে। সেইটে তৃপ্তি। পরলোক থাকে তো চেয়ে দেখবেন সেখান থেকে। দেখে হো-হো করে হাসবেন।

এই প্রকার মানসিক অবস্থা। এমনি সময় সহপাঠী কুশলচন্দ্রকে দেখতে পেলেন। কুশলচন্দ্র লেকে বেড়ান না, টুইশানি করেন সন্ধ্যার পর। বাণী-বিদ্যালয়ের সবাই টুইশানি করে এক সীতাপতি বেয়ারা ছাড়া। আজকে বড় দাগা পেয়ে কুশলচন্দ্র শীতল হাওয়ায় প্রাণ জুড়াতে এসেছেন। স্ত্রী ললিতা মুখের উপর বলে বসলেন, তুমি মরো, আমরা তা হলে বেঁচে যাই।

কুশলচন্দ্র আশ্চর্য ঠাণ্ডা মানুষ। ঝগড়াঝাঁটি করেন না রায়বাহাদুরের মতো। বললেন, বেশ তো। মনে কর, আমি মরে গেছি। খাওয়া—সে আমি হোটেলে সেরে নেবো। তা হলে মরছি কিন্তু সত্যি সত্যি। বাড়িভাড়া দেবো না, কাল সকালবেলা বাজারের টাকাও চাইতে পারবে না।

ললিতা আগুন হয়ে বলেন, কিসের জোরে হোটেলের কথা বলছ সে আমি জানি। দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমাদের ভাতে মেরে টাকা জমিয়েছ। কিন্তু মরার সময় তো লোকে সমস্ত রেখে চলে যায়। বেশ, টাকাপয়সা সমস্ত বুঝসমঝ করে দিয়ে তুমি মরে যাও। অথবা যে চুলোয় ইচ্ছে যাও চলে। আপত্তি নেই।

হায় রে, ললিতার মুখে আজ এমন কথা! প্রেম করে বিয়ে করেছিল এই ললিতা। নতুন বয়স সেটা। রোজগারের বিষয়ে পুরুষ ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলে থাকে তরুণী বউএর কাছে। তাই করেছিলেন কুশলচন্দ্র। তখন প্রেমে গদগদ অবস্থা—যা বলতেন মানিয়ে যেত। এখন বুড়াবয়সে হিসাবের যোগ-বিয়োগ চলছে: এত করে আয় ছিল তোমার—আর এই খরচ। বাকি টাকা গেল কোথায়? দাও কৈফিয়ৎ। কোথায় রেখেছ, বের কর।

কুশলচন্দ্রকে দেখে রায়বাহাদুর চেঁচিয়ে ওঠেন: আছ তাহলে বেঁচে? কেমন আছ? কতকাল পরে দেখা!

দুঃখ-বেদনা ভুলে সেকালের কথাবার্তা দুই বুড়োয়। ফার্স্ট হতেন কুশলচন্দ্র। পাশ করে কলেজেও ঢুকলেন। কিন্তু বাপ মারা গিয়ে পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেই ললিতার ব্যাপার। নিরুপমের কী রকমের বোন হন ললিতা। প্রথম দেখা নিরুপমের বাড়িতেই। বয়সটা খারাপ তখন—অবস্থা দেখতে দেখতে সঙ্গিন হল। নিরুপম বাতাস দেন এই ব্যাপারে, চিঠি বওয়াবয়ি করেন। শেষটা ললিতার বাপের কানে গেল। তিনি রেগে টং: কী আছে ছোঁড়াটার, কী দেখে ভুলল?—বিদ্যে ঐ, আর ধনসম্পত্তিও অষ্ট রম্ভা ধনুর্গুণ।

ললিতা বললেন, মন্তর পড়ে না হোক, মনে মনে বিয়ে হয়ে গেছে। বিত্তে কিম্বা ধনদৌলত তো বিয়ে করি নি, মানুষটাকে করেছি। বিয়ে হিন্দুর মেয়ের একবারের বেশি দু-বার হয় না।

এক-কাপড়ে বেরিয়ে গেল বাপের-বাড়ি থেকে। বলতে বলতে রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হন: আমায় কি বলেছিল জান কুশল? টাকাপয়সায় সুখ নেই, সুখশান্তি মনে। টাকাপয়সা ছেড়ে আমি সুখশান্তি বেছে নিলাম দাদা। একদিন গিয়ে তোমাদের সুখের সংসার দেখে আসব—ললিতাকে বলো আমার কথা। অতবড় মানুষটা মুখ ফুটে বাসায় যেতে চাইলেন, 'না' বলা যায় কেমন করে? আমতা-আমতা করে ঠিকানা দিতে হল রায়বাহাদুরকে।

একদিন মানে ঠিক তার পরের দিনই। সকালবেলা লেকে না বেড়িয়ে রায়বাহাদুর কুশলচন্দ্রের ঠিকানায় চললেন। বস্তির ভিতরে লম্বা টিনের ঘর খোপে খোপে ভাগ-করা। একটা লোকের কাছে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করছেন: কুশলচন্দ্রবাবুর কোন্ ঘর?

কুশলচন্দ্রের কানে গিয়ে পৌঁছল। বললেন এই সেরেছে! এমন নাছোড়-বান্দা লোক দেখি নি বাবা!

ললিতা সরে যাচ্ছেন। কুশল বলেন, লজ্জার কি হল—তোমার তো দাদা। আসছে তোমারই কাছে।

ললিতা খিঁচিয়ে ওঠেন: দু'কান-কাটা তুমি, ঠিকানা দিয়ে রাজ-অট্টালিকায় আহ্বান করেছ। কিন্তু লজ্জা তোমার না থাক, আমার আছে। এই ছেঁড়া কাপড়চোপড়—একদিন কী সাজপোশাকে দেখেছেন আমায়!

কলতলার দিকে পালালেন। রায়বাহাদুর ততক্ষণে ঘরে এসে উঠেছেন: কই গো—

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, ঐশ্বর্য না থাক, লক্ষ্মীশ্রী আছে। ললিতা যা চেয়েছিল। কোথায় গেল সে?

কুশলচন্দ্র বলেন, আজকেই চলে আসবে, সে তো বল নি। সাথী পেয়ে সে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি চলে গেল। এসে দুঃখ করবে।

তার জন্যে কি। বাড়ি চিনে গেলাম, কতবার আসব। শোন—

গলা খাটো করে রায়বাহাদুর বলেন, কাজ আছে, এমনি আসি নি। কিছু টাকা রেখে যাব। আর চারটে মেডেল। খামের মধ্যে ভরে নিয়ে এসেছি।

কুশলচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বলেন, কিসের টাকা? কত?

দু-হাজার আছে। আমার শেষ সম্বল।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে রায়বাহাদুর নোটগুলো খাম থেকে বের করে গণছেন। কুশলচন্দ্র ঘাড় নেড়ে বলেন, না, আমি রাখতে পারব না। তোমরা সব বলতে—মনে আছে নিরুপম ?—'তোর এমন মাথা, হাইকোর্টের জজ হবি নিশ্চয়। কিন্তু জজ না হয়ে বাণী-বিদ্যালয়ের ক্যাশিয়ার অ্যাণ্ড সেকেণ্ড ক্লার্ক হয়ে রইলাম। বেড়ালের কাছে মাছ গচ্ছিত রাখতে এসেছ, মাথা খারাপ হল নাকি তোমার ?

তবে আর কি! ক্যাশিয়ারি করা অভ্যাসই তোমার। হঠাৎ যদি মারা যাই, এ টাকা তোমাদের। শেষ সময়ে যদি কঠিন রোগপীড়েয় ভুগি, বিনা ওষুধে বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় পড়ে না মরি সেইটে তুমি দেখবে। আমার বউ-বেটারা চোখ তুলেও তাকাবে না।

কুশলচন্দ্রের হাত জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বলেন, বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না—চোর-ডাকাতের ভয়। তোমার কাছে গোপন কি—চোর আমার বউ, ডাকাত আমার বড়-ছেলে। সমস্ত নিয়ে নেবে। তোমায় দেখে মতলবটা মাথায় এলো। কাল রাতদুপুরে চুপিসারে আয়রন-সেফ খুলে বের করেছি। বাড়ি থেকে সরাতেও পেরেছি ভালয় ভালয়।

কুশলচন্দ্র বলেন, তাই তো, মুশকিলে ফেললে বড্ড। টাকা এখানেও নিরাপদ নয়।

একটু ভেবে নিয়ে গলাবন্ধ-কোটটা গায়ে চাপালেন: চলো, ইস্কুলের সিন্দুকে রেখে দেবো। ইস্কুল দশটায় বসবে। ততক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করি গে। এত টাকা নিয়ে এ জায়গায় থাকতে একটুও ভরসা হয় না আমার।

সেটা রায়বাহাদুরও বুঝতে পারছেন। বস্তি জায়গা—ঢোকবার মুখে ষণ্ডা ষণ্ডা কতকগুলোকে দেখলেন। পকেটে টাকা নিয়ে তাঁর নিজেরই তখন বুক কাঁপছিল।

রায়বাহাদুর বাড়ি ফিরলেন। এত বেলা কোনদিন হয় না। স্ত্রীর একেবারে আলাদা সুর: খাবার মুখে না দিয়ে বেরিয়ে পড়লে—বলি, বয়সটা বাড়ছে না কমছে ? যদি মাথা ঘুরে পড়তে, কি সর্বনাশ হত বলো দিকি ?

ব্যস্তসমস্ত হয়ে খাবার সাজিয়ে এনে সামনে ধরলেন। রায়বাহাদুর বলেন, এত বেলায় কেন আবার ? ভাত খেলেই তো হয়।

না গো, সুখের জিনিসগুলো। সেই থেকে আমি ঘর-বার করছি।

উদ্বেগের বশে আয়োজন আজ গুরুতর। অনেক দিন আগে, সেই

চাকরির আমলে, স্রোতের জলের মতো টাকা আসত—তখনই এই জাতীয় প্লেট দেখা যেত সকালবেলা।

রায়বাহাদুর খাচ্ছেন পরম আনন্দে। আর ভাবছেন, গচ্ছিত টাকার অর্ধেক এক হাজার কুশলচন্দ্রের কাছ থেকে স্ত্রীকে এনে দিলে দিলে কেমন হয়? শেষ জীবনের সম্বল তাঁরও দরকার বই কি। স্ত্রী তখন এটা খাও ওটা খাও করছেন—সেই প্রথম বয়সে যেমনধারা করতেন। আদর করে হাত বুলাচ্ছেন গায়ে—

হাত হঠাৎ কোমরে নামিয়ে চাবি মুঠো করে ধরলেন। চেঁচাচ্ছেন: এই যে, পেয়েছি। চলে আয়।

অলকেশ ওৎ পেতে ছিল কোথায়। বাঘের মতন এসে বাপকে ঝাপটে ধরল। আয়রন-সেফ খোলা হল। ভিতরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। রায়বাহাদুর দেখলেন তাকিয়ে তাকিয়ে। মৃদু হেসে তারপর আহারে মনোনিবেশ করলেন।

তন্নতন্ন করে সমস্ত দেখে ক্রুদ্ধ স্ত্রী ছুটে এসে এক টানে খাবারের প্লেট ছুঁড়ে দিলেন: বলি, হাসি কিসের অত? টাকা কোথায়, বের করো। ছেলের জেলে যাবার গতিক, এমন চামার বাপ দেখি নি কখনো।

অলকেশও চোখ পাকিয়ে পড়ে: ইনসিওরেন্সের দু-হাজার টাকা কি উড়ে গেল? টাকা না দিলে আমায় জেলে পুরবে—আর এই সময় আপনি ভানুমতীর খেল দেখাতে লাগলেন!

এগারোটা আন্দাজ বেলায় এই ঘটনা। আত্মহত্যা গভীর রাত্রে। মাঝের এই এতক্ষণের বিবরণ কোন মতে সংগ্রহ করতে পারি নি।

আর কুশলচন্দ্র সেই বেরিয়েছিলেন রায়বাহাদুরের সঙ্গে। ভাত পেটে পড়ে নি সারাদিন। ইস্কুলের ছুটির পর ধুঁকতে ধুঁকতে তিনি বাসায় এলেন।

ললিতা বলেন, না খেয়ে অত সকাল সকাল তুমি নিরুপম দা'র সঙ্গে বেরিয়ে গেলে—

পেট জ্বলছে, কুশলচন্দ্র তার মধ্যেও একটু রসিকতা প্রয়োগ করেন: হোটেলে খাব, কথা হল তো। ঢুকেও পড়লাম এক হোটেলে। কিন্তু টাকার অভাবে শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে বেরিয়ে আসতে হল।

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, টাকা নিয়ে যাও নি তো রেখে গেলে কোথায়? কোথাও পেলাম না।

খুব খোঁজাখুঁজি হয়েছে, ঘরখানার সর্বত্র তার পরিচয়। বাক্সের তলাও ভেঙেছে। বিরক্ত হয়ে কুশলচন্দ্র বলেন, মাসের শেষ—টাকা এখন কোথায়?

তোমার ইস্কুলের মাইনে ওই আটষট্টি টাকার কথা হচ্ছে না। আমাদের ভাতে মেরে জমিয়ে জমিয়ে যা নিরুপম-দা'র কাছে রেখেছিলে। নিরুপম-দা আজ দিয়ে গেল। কোথায় সে টাকা? ও টাকা আমাদের—দিতেই হবে, না দিলে ছাড়াছাড়ি নেই। আয় তো রে—

ললিতার দুই ভাই কখন কুটুম্ববাড়ি এসেছে। কোমর বেঁধে তারা লাফিয়ে পড়ল।

এটা সন্ধ্যাবেলার ব্যাপার। আত্মহত্যা রাত দুপুরের আগে হতে পারে না। এতক্ষণ ধরে কী ঘটল, ললিতাদেবীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকমে জিজ্ঞাসা করেও বের করতে পারি নি।

যুগল আত্মহত্যার পর আমি ললিতাদেবীর সঙ্গে দেখা করি। যথাবিধি অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললাম, ওঁর ইস্কুলের ছাত্র আমি। কুশলচন্দ্রবাবু বড় ভালবাসতেন। তাঁর মতন নিরীহ সজ্জন মানুষ কেন যে এমন কাজ করলেন—

ললিতা দেবী কেঁদে বলেন, এই যদি মতলব, সমস্ত বলে কয়ে দুটো হিতকথা বলে যায় তো মানুষে! একেবারে মুখটি বুঁজে চলে গেলেন। চিরকালের এই স্বভাব। বকো-ঝকো, গালমন্দ করো—কথাটি বলবেন না।

অলকেশের সঙ্গে আমার আগে থেকে জানাশোনা। রায়বাহাদুর তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপে চাকরি করছেন, স্রোতের জলের মতো টাকা আসছে। ফলে অলকেশ পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে প্রকাশ্যে সাহিত্যচর্চায় এবং অপ্রকাশ্যে অপর নানাবিধ চর্চায় মেতে উঠল। সাহিত্য ব্যাপারে এক কাগজের অফিসে সেই সময় আমার সঙ্গে পরিচয়।

পুরানো পরিচয়ের সূত্র ধরে চলে গেলাম তাদের বাড়ি। মুখ মলিন করে বলি, কাগজে খবর পড়লাম। অমন বিচক্ষণ মানুষ কেন যে এমন কাজ করলেন—

অলকেশ খিঁচিয়ে উঠল: করলেন তো দু-মাস চার মাস আগে করলেই হত—কুশলচন্দ্র শনিটা ঘাড়ে লাগবার আগে। টাকাটা সে-ই মেরেছে। খবর নিয়েছি, মরবার দিনও একসঙ্গে দু'জনে বাণী-বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। আমিও দেখে নেব। অপঘাতে মৃত্যু—ভূত হয়ে আদাড়ে-ভাগাড়ে ঘুরে মরতে হবে যতক্ষণ না এই শর্মা গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিচ্ছে। গাঁটের পয়সায় গয়া যেতে বয়ে গেছে আমার!

চোরের উৎপাত

সেবারে হাওয়া-বদল করতে গিয়েছিলাম সাঁওতাল-পরগনার এক আধা-শহর জায়গায়। ঝিরঝিরে নদী, ছোট ছোট পাহাড়, ঢেউ-খেলানো মাঠ।

পাকা দাড়ি, ধবধবে ফর্সা রং এক ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। নাম বললেন রামকুমার মিত্তির। আমার নাম জানা আছে তো? শ্যামলাল ঘোষ। তিনি রাম আর আমি শ্যাম। তিনিও নতুন এসেছেন। পাহাড়ের ফাঁকে অনেকটা দূরে আবছা মতন সবুজ বাংলো দেখা যায়—ঐ বাংলো ভাড়া নিয়েছেন তিনি।

এক দিনেই বেশ ভাব জমে গেল রামকুমারের সঙ্গে। কিন্তু বিষম ভয় ধরিয়ে দিলেন তিনি। জায়গাটা ভাল বটে, কিন্তু চোরের উৎপাত। হঠাৎ চমকে উঠলেন: ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন—এমন দামী জিনিস নিয়ে আসে কেউ বিদেশে? বিশেষ, এই জায়গায়? তা একটা কথা বলে দিই মশায়—যত্ন করে সেরে-সামলে রাখবেন সর্বদা। নইলে পস্তাতে হবে।

অত্যন্ত মিশুক লোক। দিনের মধ্যে অমন দশ বার আসছেন।—করি কি মশাই, কাজকর্ম নেই—বাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না। তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

আর প্রায় প্রতিবারই আমায় সামাল করে দিয়ে যান: খবরদার, খবরদার! চাকরকে বলে দেবেন, অজানা অচেনা কাউকে ঢুকতে না দেয়। জায়গা বড্ড খারাপ।

বিকালে একসঙ্গে বেড়াতে বেরুই। একদিন বেলা পড়ে গেল, রামকুমার আর আসেন না। আমি পথ তাকাচ্ছি। এলেন, তখন বেশ ঘোর হয়ে গেছে। এসেই হাউ হাউ করে কান্না: আপনাকে এত সামাল করি মশায়, আমার নিজের সর্বনাশ হয়েছে আজ। সোনার ঘড়ি চুরি হয়ে গেছে।

সে কি!

শখ করে কিনেছিলাম ও-বছর। পাঁচ-শ সাতান্ন টাকা নিয়েছিল।

পুলিশে খবর দিয়েছেন?

দিয়েছি বই কি! তা পুলিশ কি করবে? যে বেটা নিয়েছে, সে কি আর কাছেপিঠে আছে? রেলগাড়ি চেপে কোন্ মুল্লুকে চলে গেছে এতক্ষণ! চোর এখানকার বিষম ধড়িবাজ।

কিছুতে প্রবোধ মানেন না। পায়ে পায়ে নদীর ধার অবধি গেলাম। সেখানেও ঐ ঘড়ির কথা। ফিরে এসে বৈঠকখানায় বসেছি। রামকুমার বললেন, চা খাওয়ান দিকি শ্যামলালবাবু। বিকাল থেকে থানা-পুলিশ করে বেড়াচ্ছি, রোদে রোদে মাথা ধরেছে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

চাকরটাকে চায়ের জল চাপাতে বললাম। আবার মনে হল, শুধু চা কি করে দেওয়া যায় ভদ্রলোককে, খান চারেক বিস্কুট অন্তত দেওয়া উচিত। মোড়ের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে এনে দেখি, রামকুমার চলে গেছেন। চাকরকে বলে গেছেন, একটা লোকের উপর সন্দেহ হচ্ছে। স্টেশনে ছুটলাম, ঘড়িচোরের যদি হদিশ পাওয়া যায়।

আহা, কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা ভদ্রলোকের! শখের জিনিস ছিল কিনা, বড় লেগেছে।

সকালবেলা রোজ ক্যামেরা নিয়ে বেরুই। কী সর্বনাশ—স্যুটকেসের চাবি খোলা, ক্যামেরা লোপাট। কাল রামকুমারের ঘড়ি গেছে, আমার ক্যামেরাও গেছে তো কাল। নতুন জায়গা—কারও সঙ্গে তেমন জানাশোনা নেই ঐ রামকুমার মিত্তির ছাড়া। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম সবুজ বাংলোর দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বলি, রামকুমারবাবু আছেন?

আছেন বই কি! চানঘরে ঢুকেছেন, দেরি হবে। কে আপনি, কি চাই?

আমার নাম শ্যামলাল ঘোষ। খুব জরুরি ব্যাপার—

স্নানঘরটা পাশেই। আর বলতে হল না, ঘরের ভিতর থেকে হুঙ্কার ওঠে: কি নাম বলল রে—শ্যামলাল ঘোষ? মানে সেই ক্যামেরা-চুরির ব্যাপার? ধরে ফেল্‌ বাটুল, ছাড়িস নি। দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধ্‌। পুলিশে দেব ব্যাটাকে।

আমারও আর ধৈর্য্য রইল না।

এস না বেরিয়ে। কে কাকে পুলিশে দেয় দেখি। ঘড়ি-চুরির কথা বলে নাকি-কান্না কেঁদে একলা বৈঠকখানায় রইলে—শয়তানির আর জায়গা পাও না, চোর কোথাকার!

রাগে গরগর করতে করতে ভিজা কাপড়েই লোকটা স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কই, কোথায় শ্যামলাল ঘোষ?

বুকে থাবা মেরে আমি বললাম, এই তো—এই যে হাজির আছি। রামকুমারটা কোথায়?

সেই লোকটি সবিস্ময়ে বলে, আমারই নাম রামকুমার মিত্তির। কিন্তু শ্যামলাল আপনি হতে যাবেন কেন? তার তো পাকা দাড়ি, ধবধবে গায়ের রং—

আমিও তো তাই বলছি। রামকুমারের হল পাকা দাড়ি, ধবধবে রং। কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে কেঁদে পড়ল, সোনার ঘড়ি চুরি হয়ে গেছে।

সত্যিকার রামকুমার বললেন, সকালে দেখছি, সত্যিই ঘড়িটা নেই। আমারও কাছে কাল বিকালবেলা এসে কেঁদে পড়ল, ক্যামেরা চুরি গেছে। চা খেতে চাইল।

অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

রামকুমার বললেন, চোর হোক যাই হোক, লোকটা কিন্তু সামাল করে দিয়েছিল—জিনিসপত্রে যেন কড়া নজর থাকে, বাড়িতে অজানা-অচেনা লোক ঢুকতে না দেওয়া হয়। আমরা সে কথা শুনি নি। থানায় যাই চলুন। তারা যদি চোর ধরতে পারে।

আমি বললাম, তা-ও তো বলে গিয়েছে। রেলগাড়ি চেপে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে গেছে সে এতক্ষণ।

রোগি

কী সুন্দর তুমি!

তপতী হাসে।

পাশে বস, এই এখানটায়।

তপতী বলে, কাজ যে অনেক—

চুলোয় যাক কাজ। আমার কথা না শুনলে আমিও একটি কথা শুনব না আর তোমার।

এমন জেদের মুখে কী করতে পারে তপতী! পাশে নয়, চেয়ারখানা টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল।

আমার হবে তুমি?

ঘাড় দুলিয়ে তপতী বলে, হুঁ—

মুখের কথা মানব না। গা ছুঁয়ে দিব্যি কর।

তাই করতে হয় তপতীকে। 'জীবনে মরণে আমি তোমার—' যেমন যেমন বলছে, আবৃত্তি করে যায়।

প্রেম সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে এবারে প্রেমিক পরের অধ্যায় অর্থাৎ বিয়ের কথা ভাবছে।

কী জাত তোমার ?

তপতী বলে, প্রেমে আবার জাত দেখে নাকি ?

তবু। এর উপরে জাতও যদি এক হয়, বুঝতে হবে ভগবান প্রজাপতি ষোলআনা আমাদের পক্ষে আছেন।

কিন্তু তপতী বিপদে পড়েছে। প্রেমিকের নামটা সঠিক মনে পড়ছে না। হাতের কৌশলে চার্টটা উলটে আড়চোখে দেখে নেয়—মন্মথ চক্রবর্তী।

তখন নিষ্কম্প নির্ভীক কণ্ঠে বলে, জাতে ব্রাহ্মণ তো আমরা। আপনি ?

কী চমৎকার! আমিও তাই। হতেই হবে। এই জন্মের শুধু নই, অনেক জন্মের আমরা আপন—

অধীর কণ্ঠে মন্মথ বলছে, বেরুতে পারলে যে হয় এখান থেকে। বাড়ি গিয়ে প্রথম কাজ—পাঁজি নিয়ে একটা দিন দেখা। বাবাকে প্রণাম করে পাঁজি মেলে ধরব তাঁর সামনে। আচ্ছা তপতী, কিছু মনে কোর না, লেখাপড়া কদ্দুর তোমার ? মানে, বাবা চান, তাঁর বাড়ির বউ একটা পাশ হবে অন্তত।

তপতী বলে, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এখানকার কাজে ঢুকেছি।

উঃ, উঃ !—উল্লাসের বেগ সামলাতে পারছে না রোগি মন্মথ। তপতীর ভয় হয়ে যায়। শিয়রের টেবিল-ফ্যানটা খুলে দিল তাড়াতাড়ি।

তার পরে শান্ত হয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে মন্মথ বলে, নার্ভের অসুখ করল, হাসপাতালে এলাম, বিশেষ করে এই হাসপাতালে—এখন বুঝতে পারছি সমস্ত প্রজাপতির নির্বন্ধ। এখানে না এলে তোমায় কোথা পেতাম তপতী ?

নার্সের ডানহাত মুঠোর মধ্যে সে নিয়ে নিল। আঙুল নিয়ে খেলা করছে। তপতী আপত্তি করে না।

সেইদিন বিকালবেলা মন্মথর ছাড় হয়ে গেল। হিসাব মিটিয়ে, বখশিশ ইত্যাদি যাকে যা দেবার দিয়ে অফিসের সামনের বেঞ্চিটায় সে বসে আছে।

জমাদার এসে তপতীকে বলে, রোগি ডাকছে আপনাকে সিস্টার।

ব্যস্ত আছি। দেখা হবে না এখন।

জমাদার বলে, দেখা না করে নড়বেন না, তাই বলে দিলেন।

তপতী তখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে পড়ল : রোগি ছাড়লেন কেন ?

রোগ সেরে গেছে। ছাড়ব না—তা হলে চিরকাল হাসপাতালে থাকবে নাকি ?

সেরে গেছে, তবে প্রেম করে কেন এখনও ?

অন্য রোগে ধরেছে। ও-রোগের ওষুধ ঠেঙানি।

তপতী হেসে বলে, সে চিকিচ্ছেও আপনাকে করতে হবে।

ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, অধিকার দিলে তবে তপতী? মন ঠিক করে ফেলেছ? তবে আর কি—এক্ষুনি লাঠি নিয়ে যাচ্ছি।

সঞ্চয়িতা

চারটি মেয়ে ওরা একসঙ্গে থাকে। দু-জনে হাসপাতালের নার্স, একটি ইস্কুলের মিস্ট্রেস আর একটি টুইসানি করে ও এম-এ পড়ে। বয়স কম, অতএব কবিতায় বড় অনুরাগ। ঘরে গাদা গাদা কবিতার বই। লেখেও বোধহয় একটু-আধটু। তবে খুব গোপনে, কেউ কারও কাছে স্বীকার করে না।

স্বাতীর আবার রান্নার শখ আছে। রবিবারের দিন কখনও কখনও বাজারে বেরোয়, দু একটা তরকারি নিজ হাতে রান্না করে, সকলে আমোদ করে খায়। আজকেও বেরিয়েছিল। কিন্তু এক কবিকে পেয়ে তাকে সঙ্গে করে ফিরে চলে এল। বাজার অবধি যাওয়া হল না।

কবির ঠিক যেমনটি হতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল লম্বা লম্বা চুল, গণ্ডা পাঁচ-সাত দাড়ি থুতনির উপর, পরনে পাঞ্জাবি ও পাজামা। এক বাড়ির রোয়াকে বসে খাতা খুলে কবিতা পড়ছে। সুরেলা কণ্ঠ। পাড়ার পাঁচ-ছটা বাচ্চা হাঁ করে দেখছে। স্বাতী তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ মুখ তুলে কবি ভুবনমোহন হাসি হেসে বলে, চা খাওয়াতে পারেন? গলা শুকিয়ে আসছে।

এমন কবিতা বাচ্চাদের কাছে পড়া—বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো হচ্ছে। স্বাতীর মোটে ভাল লাগে না। বলে, আমাদের বাড়ি আসুন। ওই যে, তিনটে বাড়ির পর।

কাঁধে-ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ, হাতে কবিতার খাতা—কবি এসে মেঝের শতরঞ্চির উপর আসন নিলেন। স্বাতী চা করতে যাচ্ছে। বলে, চুপচাপ কেন, পড়ুন দু-একটা। জোরে জোরে পড়ুন, রান্নাঘর থেকে শুনব।

নিবেদিতা কোণের টেবিলে বসে ক্লাসের নোট টুকছিল খাতায়। বলে, পড়ুন। লিখতে লিখতে শোনা যাবে।

সুভদ্রা রবিবার বলে শাড়ি-ব্লাউজ বনেটে সাবান দিচ্ছে। কলতলা থেকে বলছে, খাসা কবিতা! পড়ে যান—

তপতী কেবল নেই, চিঠি ডাকে দিতে গেছে। শনিবারে রাতদুপুর অবধি চিঠি লিখে সকালবেলা নিজের হাতে ডাকে ফেলে আসে। এই একটি বাঁধা-কাজ তার। কাকে চিঠি লেখে, কখনও তা বলবে না।

কবি পর পর তিনটি কবিতা পড়ল। নিবেদিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনি লিখেছেন?

সমস্ত। খাতাখানা তুলে ধরে সগর্বে কবি বলে, এতবড় খাতার মধ্যে একটি পাতা সাদা নেই। কিন্তু থাক এখন। চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তার পরে হবে।

পুবের জানলাটা খুলে দিল কবি। শীতের রোদ এসে ঘরে পড়ল। গাঁদা দোপাটি আর ঝুমকো-জবায় উঠান আলো হয়ে আছে। মগ্ন হয়ে কবি স্বভাবের শোভা দেখে। জানলার উপরে টুকিটাকি জিনিসপত্র—টুথপেস্ট, হরলিকসের শিশিতে কাজুবাদাম, পাউডারের কৌটো, চুলের ফিতে—কাগজের বাক্সে পাটালি আছে খানকতক। সুগন্ধ নলেনের পাটালি—শোভা দেখতে দেখতে পাটালিগুলো কবি ঝোলানো-ব্যাগের ভিতর ফেলল।

নিবেদিতা ইতিমধ্যে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে কবিতার খাতা ওল্টাচ্ছে। স্বাতী চা করে নিয়ে এল। সুভদ্রা বলছে, শুধু চা দিও না স্বাতী। বিস্কুট তো ফুরিয়ে গেছে। মুড়ি আছে, তাই বরঞ্চ চাট্টি দাও। আর তপতীর বাড়ি থেকে কাল যে পাটালি এসেছিল—

স্বাতী বলে, পাটালি তো পাচ্ছি নে সুভদ্রা-দি।

জানলার উপরে ছিল। তপতী তাহলে তুলে রেখে গেছে কোথাও। সেই কখন চিঠি ফেলতে গেছে।

কবি তাড়াতাড়ি বলে, পাটালি খাব না। মিষ্টিতে চায়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। মুড়ি-চা-ই ভাল।

এমনি সময় তপতী ফিরল। সঙ্গে গিটার নিয়ে আর একটি মেয়ে—মালতী। এরা সকলে কলরব করে উঠল: কি আশ্চর্য! কোন্‌দিকে আজ সূর্য উঠল গো—মালতী-দি আমাদের বাড়ি!

তপতী বলে, আর কোথাও বাজাতে যাচ্ছিলেন। বললাম, রোজ ফাঁকি দেন। ছুটির দিন আছে, আজ আমাদের ওখানে বাজাবেন। জোর করে ধরে এনেছি।

মুড়ি-চা শেষ করে কবি ওদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে: আমি যাচ্ছি। আবার একদিন আসা যাবে।

স্বাতী বলে, আসছে রবিবার আসবেন—কথা দিয়ে যান। অনেক কবিতা পড়তে হবে। আমাদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে আসতে বলব। তিনি কবিতার ভক্ত। সুভদ্রা উঠে এসে বলে, আমিও ভাবছি নার্সেস হস্টেলের

দু-একটিকে ডাকব। যদি কিছু মনে না করেন—পাঞ্জাবি-পাজামা কেচে-কুচে আসবেন সেদিন।

দুটো টাকা সে কবির সামনে শতরঞ্জির উপর রাখল। নিবেদিতা তার উপরে আরও তিন টাকা রেখে দিয়ে বলে, পাঞ্জাবি তো শতচ্ছিন্ন। নতুনই একটা কিনে নেবেন। আমার ক্লাসের কয়েকটা মেয়েও আসবে। কবিতা শুনে কী করবে দেখবেন তারা। স্বাতী তারও উপরে একটা টাকা দিয়ে বলে, মাথার চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে বেশ ভদ্রস্থ হয়ে আসবেন।

স্মিতহাস্যে কবি ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেটে টাকাগুলো তুলে নিল।

খাতাটা রেখে যান—সলজ্জে নিবেদিতা বলে, কয়েকটা কবিতা টুকে নেব। মুখস্থ করব আমি।

হুঁ:, রদ্দি এক খাতা—তার থেকে কবিতা টুকে নিতে হবে!

এবার তো দস্তুরমতো ঝগড়ার ব্যাপার। নিবেদিতা করকর করে ওঠে: কেন টুকব না? কত ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন, তার কোন ধারণা আছে আপনার? মূল্য বোঝেন?

কবি সহজ ভাবে বলে, ভাল তো বটেই, এক-শ বার ভাল। রবি ঠাকুরের কবিতা ভাল হবে না? কিন্তু খাতা দেখে টুকতে হবে কেন? সঞ্চয়িতা বই আছে আপনাদের—ঐ দেখতে পাচ্ছি। ওর মধ্যে এগুলো আছে, আরও কত রয়েছে।

নিবেদিতা স্তম্ভিত হয়ে বলে, তবে যে বললেন আপনি লিখেছেন?

লিখেছি বই কি। সঞ্চয়িতা কেনার অত টাকা কোথা? একটা বই যোগাড় করে বাছা বাছা কতকগুলো লিখে নিয়েছি। আপনাদের মূল বই রয়েছে, লিখে মরতে যাবেন কেন?

পুত্রদায়

ধরণীধর চটে আগুন। এমন খাসা মেয়ে, তার বিয়ে নিয়েও এই কাণ্ড! ছেলেও হাতিঘোড়া কিছু নয়, মেডিকেল কলেজে পড়ছে—পাশ করে ডাক্তার হবে কিম্বা ফেল করে হোমিওপ্যাথি করবে, ঠিকঠিকানা নেই। এ হেন পাত্রের জন্ম গয়না-বরসজ্জা ইত্যাদি ছাড়া বরপণ নগদ ছ-হাজার এক টাকা। তিন হাজার অগ্রিম দাদনও হয়ে গেছে। বিয়ের দিন পাঁচেক আগে পাত্রের বাপ হরনাথ মজুমদার মুখ চুন করে এসে পড়লেন: বিস্তর কাট-ছাঁট করে

দেখলাম, ছ-এ কুলোয় না। ওর উপরে আরও একখানা ছাড়তে হবে বেয়াই মশায়। নয়তো কিছু উপায় দেখি নে।

ধরণী অবাক হয়ে বলেন, কিন্তু কথাবার্তা পাকাপাকি করে লগ্নপত্তর সেরে গেলেন—

হরনাথ ঘাড় নেড়ে বলেন, এত হিসেবপত্র করে দেখি নি তখন। লগ্নপত্তর সই হয়ে গেছে, ছ-এর বেশি এক পয়সাও আইনত দাবি করতে পারি নে। অগত্যা অন্যদিকে কাটকুট করতে হবে। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠাব না—এ সব তো লগ্নপত্তরে নেই—তত্ত্ব-তাবাস নিয়ে কথা না ওঠে এর পর যেন।

এক বোমা ছুঁড়ে দিয়ে বেরুলেন তো হরনাথ। ধরণীধরের পিসতুত ভাই অরবিন্দ বলে, ভদ্রলোক চামার। মোচড় দিয়ে আরও কিছু টাকা বের করতে চান।

ধরণীধর বলেন, চাইলেই দিচ্ছি আমি। টাকা খোলাম-কুচি, টাকা বৃষ্টির জল—উঁ? কাজ নেই গায়ে-হলুদের তত্ত্বে। আত্মীয়কুটুম্ব বাড়িতে গিজগিজ করবে, সকলে ওদেরই দুষবে, বলবে, চশমখোর বেটারা।

বৈঠকখানায় দুজনে মিলে কড়া মতলব আঁটলেন, কিন্তু ভিতরে গিয়ে সমস্ত বানচাল। সরোজিনী গালে হাত দিয়ে বলেন, ওমা সে কি কথা! সাত নয় পাঁচ নয়, একটা মেয়ে আমার। লোকে এসে তত্ত্ব দেখতে চাইবে, বিয়ে না হতেই শ্বশুরবাড়ির নামে ছি-ছি করবে—মেয়ের কি ভাল লাগবে সেটা? ও সব হবে না—যা বিধিনিয়ম, ষোলআনা চাই আমার।

ধরণী বলেন, কিন্তু টাকা চাচ্ছে আরও এক হাজার।

কায়দায় পেয়েছে, ছাড়বে কেন? আমাদেরও দিন আসছে। ওরা এক ছেলের বাবদ নিচ্ছে, আমাদের দু-জন। শশধর-জলধরের বিয়েয় ডবল আদায় করে নেব আমরা।

জলধরের নামে ধরণী জ্বলে উঠলেন: তোমার ও-ছেলের বিয়েয় উল্টে টাকা গণে দিতে হবে, দেখো তখন। মাংনা কেউ মেয়ে দেবে না।

পিসিমা কোন্ দিকে ছিলেন, করকর করে উঠলেন: কি বললি, মেয়ে দেবে না—আমার বাপের বংশে পণ দিয়ে বিয়ে করবে? মেয়ে দিয়ে বর্তে যাবে দেখিস, পা জড়িয়ে ধরবে মেয়ে দেবার জন্যে।

বাড়ির তাড়া খেয়ে ধরণী আবার হরনাথের কাছে গিয়ে পড়লেন।

কম-সম করে নিন বেয়াই—নানান দিকে চাপ, সামলে ওঠা যাচ্ছে না।

খরচ করে ছেলে পড়াচ্ছি, বিয়েতেও আবার গাঁটের পয়সা খরচ করব?

কেন, কি হবে যদি গায়ে-হলুদের তত্ত্ব না পাঠানো যায়? এ সব তো উঠেই যাচ্ছে।

বিস্তর খোশামুদির পর ছ'শ টাকায় রক্ষা হল। নোট গুণে দিয়ে ধরণীধর নিষ্ক্রান্ত হলেন।

প্রতিশোধ নেবার দিন অচিরে এসে পড়ল। বউ-ভাতে হরনাথের ওখানে বাড়িসুদ্ধ নিমন্ত্রণ। খাওয়াদাওয়ার পর চলে আসবেন, এমনি সময় দোহারা গড়নের ফুটফুটে একটি মেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ধরণীধরকে প্রণাম করল। ঘরের মধ্যে এক গাদা স্ত্রীলোক, তাঁরাই ঠেলেঠুলে মেয়েটাকে পাঠিয়েছেন, পাঠিয়ে দিয়ে জানলা-দরজার অন্ধিসন্ধিতে চোখ রেখেছেন। ফিসফিসানি ও ব্যস্তসমস্ত ভাব। আন্দাজে বুঝতে পারা গেল অতএব ব্যাপারটা। এবং হরনাথ নিজেও অনতিবিলম্বে পরিষ্কার করে দিলেন: কেমন দেখলেন বলুন প্রণতিকে?

মেয়েটা সত্যিই ভাল, সাধারণ বাঙালি-ঘরে কদাচিৎ এমন দেখা যায়। তবু ধরণীধর রেখে ঢেকে উত্তর দিলেন: মন্দ নয়—

আমার বড় সম্বন্ধীর মেয়ে। আই এ পাশ করল এবারে। ভাল লেগে থাকে তো ঘরে নিয়ে নিন। শালা-শালাজ বড্ড ধরে পড়েছে।

মেয়ের বাপ কমলভূষণের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু। ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরলেন: ছা-পোষা মানুষ, সামান্য মাইনে। আপনার মতো লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতের সঙ্গতি নেই। দয়াধর্ম করে যদি নিয়ে নেন।

ধরণীধর তটস্থ হয়ে ওঠেন: ছি-ছি, অমন করে বলবেন না। আমিই বা কী লাট-বেলাট হলাম! ছা-পোষা আমিও তো।

মুখফোড় অরবিন্দ ওদিক থেকে বলে ওঠে, দয়াধর্ম খুব বেশি হবে না কিন্তু। যেমন দান, তেমনি দক্ষিণে। আপনার ভগ্নিপতি যে রকম দয়াটা করলেন, তার বেশি চাইবেন কোন হিসাবে?

লজ্জিত ধরণী তাড়া দিয়ে ওঠেন: কি হচ্ছে অরবিন্দ, থাম না! মেয়েটি তো ভালই দেখলাম। অবিশ্যি মেয়েরাই বোঝেন এ সমস্ত। তাঁরা দেখে মত না দিলে কিছু হবে না।

হরনাথ হেসে উঠে বলেন, বটেই তো! ঘরগৃহস্থালী করি—কার এলাকা কতদূর, সেটা আর বুঝি নে ভাই! বেয়ানকে তাই সকলের আগে দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে ভরসা পেয়েছি বলে তো এগোবার সাহস হল।

তবে আর কি! তা বেশ, যাবেন আপনারা একদিন।

ফিরবার সময় পিছন-সিটে ধরণী আর সরোজিনী। অরবিন্দ ড্রাইভারের পাশে বসেছে। সরোজিনী হাসতে হাসতে বলেন, বলেছিলাম না আমাদেরও সময় আসছে, ছেলের বিয়ের সমস্ত উশুল করে নেব? সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল অমনি। মেয়েটা সত্যিই বউ করবার মতো। হঠাৎ চোখে পড়ে না অমন মেয়ে।

ধরণী বলেন, কিন্তু ঐ নিয়েই খুশি হতে হবে। আর কিছু নয়। সামান্য মাইনে পান ভদ্রলোক।

অরবিন্দ বলে ওঠে, মাইনে সামান্য সত্যিই। মার্চেন্ট-অফিসের দপ্তর। আবার ভুঁড়িটাও দেখলেন—উপরি দশ রকম না থাকলে অমন নেওয়াপাতি ভুঁড়ি জমে কোত্থেকে? মাইনে বলে যে ক'টা টাকা দেয়, ওঁরা তা স্বচ্ছন্দে আতুর-ভিখারিকে দান করে আসতে পারেন।

সরোজিনীও সায় দেন: মেয়ের মা এসেছিল। যা ঘটা দেখলাম—হীরে-বসানো পেণ্ডেণ্ট দিয়েছে সবিতাকে।

অরবিন্দ বলে, তাই বোঝান দিকি দাদাকে। কন্যাদায়ে সবাই মিউ-মিউ করে। এক ডজন বাড়ির মালিক কুবের হালদার- সে-ও দেখেন নি কি রকম হাত কচলাচ্ছিল মেয়ের বিয়ের সময়। দাদার মতন সবাই সরল হলে দুনিয়া উল্টে যেত। এক কথায় ছ-হাজার বলে দিলেন, কিছু হাতে রেখে বললেন না। বাড়তি লেগে গেল তাই। গোড়ায় পাঁচ থেকে শুরু করলে পুরোপুরি ছয়ও উঠত না, দেখতে পেতেন।

তারপর বলে, যাক গে, যা হবার হয়েছে। বুধবার দাদার অফিসে আসছে ওরা, আমার থাকা হবে না, মফস্বল চলে যাচ্ছি। খুব মোটা রকম চেয়ে বসবেন কিন্তু। আট হাজার নগদ চাই, নয়তো পথ দেখ। তার পরে কত কমাতে পারে কমাক। কি বলেন বউদি?

সরোজিনী বলেন, ঠিক! ওরা ছাড়ে নি, আমরাই বা কেন ছেড়ে কথা কইব? আমাদের ঘরবাড়ি মানমর্যাদা আর শশধরের মতন পাত্র—বেয়াই নিজে থাকবেন যখন, তিনিই তুলনা করবেন মনে মনে।

অরবিন্দ বলে, হাতে-হাতে শোধ নিতে হবে, বুঝলেন? ছাড়াছাড়ি নেই।

ধরণীধরও ঘাড় নাড়লেন: ভালরকম প্রতিশোধ নেব। ছাড়ব কেন?

বুধবার এলো। লালদীঘির ধারে, কমলভূষণের অফিস। অফিস অন্তে হরনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ধরণীধরের কাছে গেলেন।

ছেলে দেখেছেন আপনারা?

হরনাথ বলেন, নিশ্চয়। সবাই দেখেছে। সেই যে নেমন্তন্নে গিয়েছিল আমাদের বাড়ি। বাবাজি আপনার অফিসেই তো বেরুচ্ছে—তাকে দেখছি নে এখন?

মাসখানেক খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগল। এক বন্ধুর সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছে কাল—

কমলভূষণ বলেন, খুব ভাল ছেলে। আত্মীয়কুটুম্ব সকলে দেখেছেন, সবাই তারিফ করছেন। হীরের টুকরো ছেলে।

ধরণীধর গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করেন, পড়াশুনোর খবর নিয়েছেন?

এক একটা প্রশ্ন আসে, আর শিউরে-শিউরে ওঠেন কন্যাকর্তারা। দরাদরির আগে রূপ ও গুণ ফলাও করে বললে খদ্দেরের তখন মতলব বুঝতে বাকি থাকে না। কমলভূষণ শুকমুখে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর নিতে হবে কেন? এটর্নিশিপে ফার্স্ট হয়েছে এবার, সে তো কাগজেই বেরিয়ে গেছে।

তা হলে?

কমলভূষণ বললেন, দর উঠবে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। টেলিফোনে অরবিন্দবাবু বললেন, বেয়ান নাকি আট হাজার নগদ চান। সে অবিশ্যি কাজের কথা নয়—

ধরণীধর হরনাথের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি নগদ কত চেয়েছিলেন, শুনিয়ে দিন আপনার সম্বন্ধীমশায়কে।

হরনাথ আমতা-আমতা করেন: সে তো বটেই। টাকার লোকের অভাব নেই, ঝুঁকবেও নিশ্চয়। কিন্তু শুধু টাকার বিবেচনা করলেই তো হবে না—ঘরের বউ করে তুলবেন সে মেয়েটাও বেশ দেখে-শুনে নিতে হবে।

ধরণীধর কঠিন সুরে বললেন, আমার সবিতাও কি খারাপ মেয়ে ছিল বেয়াই?

হরনাথ চুপ হয়ে গেলেন। বলবার কিছু নেই, ভাল মেয়ে বলে নিজেও তিনি রেহাই দেন নি। কন্যার বাপ তখন জোড়হাত করলেন: তর্কাতর্কি করে কি হবে? সঙ্গতি আমার উইএর ঢিবি, আশাটা হিমালয়পর্বত। আপনাব সঙ্গে কুটুম্বিতের বড্ড লোভ— পদাঘাতে ছিটকে দেবেন না মশায়।

ধরণীধর বিচলিত হয়েছেন। যা গতিক, এর পরে ভদ্রলোক হয়তো-বা পা দুখানাই চেপে ধরবেন। কিছু বলা যায় না। বললেন, আহা—ও-রকম করছেন কেন? মেয়ের বাপ হয়ে অপরাধ করেন নি তো কিছু—ছি ছি, হাতজোড় করবার কি হল?

কমলভূষণ বলেন, মেয়ের বাপ হওয়ার চেয়ে বড় অপরাধ আছে এই বাংলা দেশে?

ধরণীধর সম্প্রতি তা মর্মে মর্মে বুঝে গেছেন। তাড়াতাড়ি বললেন, মেয়ে খুব পছন্দ আমাদের। আচ্ছা, কি পরিমাণ হলে আপনার পক্ষে কষ্টকর হবে না, বলুন সেটা।

কমলভূষণ বিচক্ষণ লোক—মানে, ধরা-ছোঁয়া দিতে যাবেন কেন? আন্দাজি একটা কিছু বলবেন, পাত্রপক্ষ হয়তো আরও কমে রাজি হয়ে যেতেন। আবার অতিরিক্ত কম বললে সম্বন্ধ ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ঝামেলায় কাজ নেই, আরও কিছু খোশামুদি করে ধরণীধরের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। বললেন, আমি কি বলব। সকল দিক বিবেচনা করে আপনিই আদেশ করুন, আপনার উপর ভার দিচ্ছি।

ভার আমার উপর?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শিক্ষিত মহৎ ব্যক্তি—আপনার দরের মানুষ দেশের মধ্যে ক'টি আছেন? অন্যায় বিচার কক্ষনো করবেন না আপনি।

তাহলে বলে দিচ্ছি, একটা পয়সাও পণ লাগবে না।

অপর দুই ব্যক্তির বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেছে। হরনাথ বলেন, হাসিমস্করা ছেড়ে কাজের কথায় আসুন বেয়াই। কমল সত্যিই বড় আশা করে এসেছে।

কাজের কথা এই হল যে টাকা নিয়ে আমি ছেলে বিক্রি করব না। পয়সা খরচ করে মানুষ করে তুলেছি তো, বিয়ে থাওয়াও পয়সা খরচা করে দিতে পারব। কিন্তু একটা কথা, সবিতা চলে গিয়ে বাড়ি খাঁ খাঁ করছে, টেঁকাই মুশকিল, শুভকর্ম এই মাসের ভিতরেই করতে হবে।

একটু ইতস্তত করে কমলভূষণ বলেন, আর তো কুড়িটা দিন আছে মাসের।

ধরণী বলেন, টাকাকড়ির দায় যখন থাকছে না, বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। এর পরে অকাল পড়ে যাচ্ছে, পাঁজিতে তিন মাস আর দিন নেই।

হরনাথ চিন্তিত ভাবে মাথা নাডলেন: হুঁ, ভাদ্দোর-আশ্বিন-কার্তিক তিনটে মাস তো বিয়েথাওয়া হতে পারবে না।

শশধর পুরী গেছে। তারিখ ঠিক করে টেলিগ্রাম করলেই চলে আসবে। এর মধ্যে কনে-আশীর্বাদটা সেরে রাখি আমরা। বলুন কবে যাব।

কমলভূষণ বললেন, আজামোজা কি বলি এখন। দিন দেখাতে হবে ঠাকুরমশায়কে দিয়ে। বাড়ির সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

বেশ, ঠিকঠাক করে খবর দেবেন। মোটের উপর শুভকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে, এই হল আমার কথা।

হুঁ—বলে নমস্কার সেরে দুজনে চলে গেলেন।

মফস্বল থেকে ফিরে এসে সমস্ত সবিস্তারে শুনে অরবিন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসল। আরে সর্বনাশ, এ কী করে বসেছেন দাদা! সরোজিনীকে বলে, হ্যাঁ বউদি, শশধরের মতন ছেলেকে দাদা দানপত্র করে দিলেন—আপনি একটা কথা বলতে পারলেন না?

সরোজিনী বলেন, আমায় জানিয়ে কিছু করেন নাকি? তোমায় ভাই পই পই করে মানা করলাম—মফস্বল-টফস্বল থাক, সর্বক্ষণ ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক।

অরবিন্দ ধরণীকে বলে, আচ্ছা দাদা, এত যে তড়পালেন হরনাথবাবু যত-কিছু করেছেন তার পুরোপুরি শোধ নিয়ে নেবেন—

ধরণীধর মুচকি হেসে বলেন, তাই তো নিলাম রে! বিয়ের পাঁচদিন আগে পর্যন্ত তোমরা দর-কষাকষি করেছ—আর এই দেখ, বিনা পণে নিয়ে নিচ্ছি তোমাদেরই মেয়ে। লজ্জা পেয়েছে ওরা, শিক্ষা হয়েছে। আর কখনও ছোটলোকের ব্যবহার করবে না কারও সঙ্গে।

কচু হয়েছে। অরবিন্দ গজর-গজর করতে লাগল। ধরণীধর বললেন, আশীর্বাদের দিনক্ষণ এসে জানিয়ে যাওয়ার কথা, আজকেও তো এলেন না। খবর নিয়ে এস তো অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ল কিনা কমলবাবুর। উনত্রিশে বিয়ে না হলে তিন মাস আর হতে পারবে না।

অসুখবিসুখ হয় নি—সে খবর পাওয়া গেল অনতিপরেই উমাচরণ ডাক্তারের কাছে। এ বাড়ির পুরানো ডাক্তার—এই দিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, ধরণীকে দেখে বৈঠকখানায় উঠে এলেন।

শশধরের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে বুঝি? কী কাণ্ড, আমার কাছে গিয়ে পড়েছিল। কত রকমে জেরা! সেই যে জ্বর হয়েছিল—কদ্দিন থেকে চলছে জ্বরটা, সঙ্গে কাসি আছে কি না, রক্তটক্ত ওঠে কি না মুখ দিয়ে, পুরী পাঠানোর দরকার হল কিসে—জবাব দিতে দিতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। দেশসুদ্ধ পণ্ডিত হয়ে গেছে, জ্বর হলেই অমনি টি-বি—ডাক্তারি করা মুশকিল হয়ে উঠল আমাদের।

অরবিন্দও ওদিকে অফিসের ফেরত কমলভূষণকে ধরে নিয়ে এল।

দেখা নেই যে তার পর?

শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল। বেরুতে পারি নি।

মিথ্যে কথায় ধরণীধর বড় চটে যান। ভ্রূকুটি করে তিনি বললেন, বেরুবেন না কেন। উমাচরণ ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। তা কি পেলেন খোঁজখবর? দিন কমে আসছে, আর আমরা দেরি করতে পারি নে।

আজ্ঞে না, দেরি করলে হবে কেন। তাই বলছিলাম কি—

বলুন। মনে গোল রাখবেন না, বলে ফেলুন সমস্ত।

তবু বলতে পারেন না কমলভূষণ, আমতা-আমতা করেন। অরবিন্দ বলে দেয়, কে ওঁদের লাগিয়েছে ছেলের নাকি বুকের দোষ আছে। এক্স-রে প্লেট নিতে চান একটা।

কমলভূষণ বলেন, আসবার জন্ত বাবাজিকে টেলিগ্রাম করে দিন। দশ মিনিটের তো ব্যাপার। যে দিন নেওয়া হবে, তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আশীর্বাদের বন্দোবস্ত হতে পারবে।

ধরণীধর রুষ্ট কণ্ঠে বলেন, কাজ নেই। খারাপ অসুখ থাকলে আমরাই তো এগোতাম না। আমাদের উপর আস্থা যদি না থাকে, কুটুম্বিতেয় পস্তাতে হবে। আপনি অন্যত্র দেখুন মশায়।

তবুও কমলভূষণ নরম হলেন না। মন-স্থির করেই এসেছেন, এক্স-রে না করিয়ে এগোবেন না আর। তিনি উঠে যাবার পর ধরণীধর বললেন, শোভা-বাজারের সেই সম্বন্ধটা দেখ অরবিন্দ। এক্ষুনি চলে যাও। নগদ টাকাকড়ি নেব না, এদের বলেছিলাম—শোভাবাজারে বলগে, গয়না-বরসজ্জাও লাগছে না। শুধু শাঁখা-শাড়ি।

খবর পেয়ে শোভাবাজারের কন্যাকর্তা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। ধরণী বলেন, এই মাসের উনত্রিশে বিয়ে দেব আমি। মেয়ে তো দেখাই আছে— আশীর্বাদ করতে কবে যাব, তারিখ দিয়ে যান।

কৃতার্থ হয়ে কন্যাকর্তা বলেন, তাহলে অপর কথাবার্তাগুলো—

কিছু লাগবে না। বলে নি আপনাকে অরবিন্দ? আমরা যাব আপনার বাড়ি, শাঁখাশাড়ি দিয়ে আপনি কন্যাদান করবেন। তার পর ঘরের বউকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আমি বাড়ি এনে তুলব। ব্যস!

গয়নাগাঁটি কিছু কিছু গড়িয়ে ফেলেছি—

এখন কিছু নয়। আদর্শ দেখাব দেশের মধ্যে। কিন্তু বিয়ে এই মাসেই, তিন মাস এর পরে দিন পাওয়া যাবে না। ছেলের মা খুব উতলা হয়ে পড়েছে।

শোভাবাজার একটু মিইয়ে গেলেন যেন। বললেন, সে তো ঠিকই। সবে-ধন এক মেয়ে শ্বশুরঘর করতে গেল, মন খারাপ তো হবেই। আচ্ছা, মার্ডককোম্পানির বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল শুনতে পেলাম—

আমি বিয়ে দেব না ওখানে। ভেঙে দিয়েছি।

পাজি দেখিয়ে পরের দিন সকালবেলা আসবেন, এই কথা বলে শোভাবাজারের ভদ্রলোক বিদায় হলেন। এলেনও পরদিন। হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে বলেন, একটা কথা কানে গেল—

টি-বি হয়েছে শশধরের, রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে, পুরী গিয়ে আছে?

অতদূর ঠিক নয়।

এক্স-রে প্লেট চাই?

আজ্ঞে না। রক্ত আর কাসি পরখ করেই ডাক্তার মোটামুটি বলে দিতে পারবে।

আমার কথায় যাঁর প্রত্যয় নেই, তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করি নে। আপনি আসতে পারেন।

শোভাবাজার চলে গেলে ধরণীধর হাঁক দিলেন, অরবিন্দ—

বললেন, বেলেঘাটায় গিয়ে ধনঞ্জয়বাবুকে নিয়ে এস। দেড় বছর হাঁটাহাঁটি করে ভদ্রলোক জুতোর তলা খুইয়েছেন।

মেয়ে যে কালো—

হোক কালো। উনত্রিশে বিয়ে আমি দেবোই।

ধনঞ্জয় এলেন। ধরণীধর বললেন, কাল ভাল দিন আছে। আশীর্বাদ করে আসব আপনার মেয়েকে। আপনারাও করে যাবেন। ছেলে পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, টেলিগ্রাম করে নিয়ে এসেছি। বিয়ে উনত্রিশে।

সে কি, দু-হপ্তা মাত্তোর আছে—

তাতে কি হয়েছে, এক পয়সাও লাগছে না তো আপনার। গয়না, বরসজ্জা, বরপণ—কিছুই না।

তবু ধনঞ্জয় ইতস্তত করেন: আমার বাড়িটা দেখেছেন তো! দুটো মানুষ এলে বসতে দেব, এমন জায়গা নেই। বিয়ের জন্যে একটা বাড়ি-টাড়ি খুঁজে নিতে হবে তো!

ধরণীধর বলেন, কিছু না, কিছু না। পাত্রী নিয়ে আপনারা আমার পিসিমার বাড়ি চলে আসবেন। বিয়ে ওখানে থেকে হবে। খরচপত্র সব আমার। এর পরে আর কথা নেই তো?

আবার কি কথা থাকবে! আপনি দেবতা—

ধনঞ্জয় ভক্তি-গদগদ হয়ে ধরণীধরের পায়ের ধূলো নিতে যান। না নিয়ে ছাড়বেন না। সেই দিনই সন্ধ্যার পর তিনি আবার চলে এসেছেন।

কি হল?

কাল তো আশীর্বাদ হয় না। অসুবিধা আছে বাড়িতে।

ধরণীধর ধমক দিয়ে উঠলেন: ভিতরের কথা বলুন। কি হয়েছে?

মার্তণ্ড-কোম্পানির বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তো, সেইখানে গিয়েছিলাম একবার—

ধরণীধর অধীর কণ্ঠে বললেন, কি করতে হবে তা হলে—এক্স-রে না ব্লাডস্পিউটাম?

ধনঞ্জয় সবিনয়ে বলেন, আজ্ঞে না—ও সব কিছু নয়। আমাদের পাড়ায় বিচক্ষণ ডাক্তার আছেন একজন, আমায় খুব ভালবাসেন। সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে বেড়াতে তিনিই এসে দেখে যেতে পারবেন। বাবাজি বাড়ি থাকবেন সন্ধ্যাবেলাটা—

ধরণীধর বলেন, ডাক্তার দেখিয়ে বিয়ে হবে না। আপনি চলে যান।

হতাশ হয়ে ডাক দিলেন, ওরে অরবিন্দ, ছেলের বিয়ে যে মেয়ের চেয়েও বড় দায় হয়ে উঠল।

অরবিন্দ বলে, বিয়ে হবে না দাদা। শশধর শুনেছে সব, ঘেন্না হয়েছে, সে এখন বিয়ে করবে না। বলছে, আর কোন সম্বন্ধ নিয়ে এলে বাড়ি থেকে সে পালাবে।

তবে কি হবে? বুঝিয়ে-সুজিয়ে বল। তোমার বউদি এই ক-দিনেই তো পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। উনত্রিশে তারিখটা ফসকে গেলে তিন মাসের মধ্যে কিছু হবার জো নেই।

শশধর রাজি হবে না। আপনিই সব গোলমাল করে দিলেন। সবাই বাতিল করে দিয়ে যাচ্ছে, তার খুব মনে লেগেছে। যা গতিক, সম্বন্ধ গাঁথাও যাবে না এখন। বিয়ে নিতান্তই দিতে হয় তো জলধরের দিয়ে দিন—

জলধর? ধরণী আশ্চর্য হয়ে বলেন, জলধরকে মেয়ে দিচ্ছে কে? লেখাপড়া করল না, টেড়ি কেটে বখামি করে বেড়ায়—

আলবৎ দেবে। মেয়ে তো কতই দেখা আছে শশধরের জন্যে—বলেন তো, তারই একটা লাগিয়ে দিই। পুরোপুরি ভার কিন্তু দাদা আমার উপরে। একটা কথাও আপনি বলতে পারবেন না।

ধরণীধর রাজি হলেন: বেশ, বলব না। কিন্তু তুমি যে ছেলের দোষ ঢেকে মিথ্যে করে বাড়িয়ে দেখাবে, সেটাও চলবে না।

একটা কথাও মিথ্যে বলব না। আপনার সামনাসামনি সমস্ত হবে। আপনি চুপ করে শুনবেন শুধু, কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমায় দেখিয়ে দেবেন।

সবিস্ময়ে ধরণী বলেন, জলধরের বিয়ে—এই উনত্রিশে? বলছ কি!

উনত্রিশের অনেক বাকি দাদা। এখনও দশটা দিন।

অরবিন্দ কোথা দিয়ে কি করল জানি নে, পরের দিন সেই কমলভূষণই আবার এসে হাজির। এত গালিগালাজ খেয়ে গেলেন, সে সমস্ত গায়ে না মেখে বাড়ি অবধি চলে এসেছেন।

আপনার ছোট ছেলের বিয়ে দেবেন নাকি ধরণীবাবু?

বৈঠকখানার পাশের কামরায় অরবিন্দের চেয়ার-টেবিল পড়েছে। সেখান থেকে সে ডাক দেয়: এদিকে আসুন। হ্যাঁ, হবে বিয়ে। বিয়ের বয়স হলে তার পরে আর ঝুলিয়ে রাখতে নেই।

কমলভূষণ গিয়ে বসলে এদিক-ওদিক ঘাড় দুলিয়ে সে বলল, কিন্তু আপনার পক্ষে বোধহয় সুবিধে হয়ে উঠবে না কমলবাবু।

কেন, আমি কি দোষ করলাম বলুন? মেয়ে তো দেখা আছে আপনাদের। আর কথা-কথান্তরের কথা যদি বলেন, ধরণীবাবুই দশ-কথা শোনালেন আমায়, আমি কোন জবাব করি নি।

অরবিন্দ বলে, লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না—সবাই জানে। সম্বন্ধ অমন কত ভাঙে, কত গাঁথে। সে কথা হচ্ছে না। ব্যাপার হল, খরচপত্রে পেরে উঠবেন কি? আপনি বলেন, সামান্য মাইনে আপনার—

তা হোক, তা হোক। মেয়ে সুপাত্রে পড়ে সেটা তো দেখতে হবে। সামান্য মাইনে ঠিকই, তবে খুব হিসেবপত্তর করে চলি আমি। অবিশ্যি পাহাড়পর্বত দাবি করলে পেরে উঠব না।

অরবিন্দ বলে, উপযুক্ত গয়না-বরাভরণ ছাড়া নগদ দশটি হাজার—

কমলভূষণ চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়লেন।

বলেন কি! আমার ভাগনে ঐ দরের ছেলে—তাকে তো পুরোপুরি সাতও দেন নি আপনারা।

অরবিন্দ বলে, আপনার ভাগনেকে আপনি বড় দেখেন, আমার ভাইপোকে আমি বড় দেখি। তুলনা দেওয়া মিছে। পাচ্ছি যখন, এ বাজারে ছাড়তে যাব কেন বলুন?

পাচ্ছেন? কোথায় কে দিচ্ছে?

মৃদু হেসে অরবিন্দ বলে, সেটা আপাতত না-ই শুনলেন কমলবাবু। জানাজানি হয়েই যাবে। আপনার পেরে ওঠা শক্ত হবে, সে তো গোড়াতেই বলেছিলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন কমলভূষণ, এই কথায় আবার চেপে বসলেন।

কেন শক্ত হবে? ওঁরা যখন পারছে, আমারই বা চেষ্টা করতে দোষ কি? এক কথায় কাজকর্ম হয় না অরবিন্দবাবু, কিছু কম-সম করতে হবে।

হাতজোড় করে বিনয়ে অভিভূত হয়ে অরবিন্দ বলে, আজ্ঞে না, মাপ করুন।

বেশি নয়, নগদে দুটো হাজার কম করুন। আট—

যেন বুকে কেউ ছুরি বসাল, এমনিভাবে অরবিন্দ আর্তনাদ করে ওঠে: ওরে বাবা!

নিদেন পঁকে এক হাজার। শোভাবাজারের সুনীল ভড় লেগেছে, বুঝতে পারছি। গুড় বেচে পয়সা করেছে। মেয়ে কিন্তু অনেক মিরেশ আমার মেয়ের চেয়ে।

অরবিন্দ হেসে বলে, বেশি নয়—এই উনিশ-বিশ, অনেক খুঁটিয়ে দেখলে তবে ধরা যায়।

অতএব সংশয় রইল না, সুনীল ভড়ই টোপ নাচাচ্ছে। কমলভূষণ তখন শেষ ডাক ছাড়লেন: একটি হাজার কমিয়ে নিন ভাই। নগদ ন-হাজার আর চল্লিশ ভরির গয়না। যা বলেছেন—উনত্রিশেই শুভকর্ম হয়ে যাবে। মেয়ের বিয়ের টাকা আমি ব্যাঙ্কে রেখেছি, গুড় কিনে মজুত করি নি।

অনেক ধরাপাড়ার পর অরবিন্দ বলে, বউদিকে বলে দেখি। সন্ধ্যের পরে খোঁজ নিয়ে যাবেন।

আপনার বউদি তো বেয়ান হবেন আমার। তাঁকে বলুনগে, মেরে ফেললেও এর বেশি পারব না। কন্যাদায় যেমন করে হোক উদ্ধার করে দিতে হবে ভাই—

বলতে বলতে খপ করে অরবিন্দের হাত জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে চিন্তিত মুখে অরবিন্দ উঠে পড়ল।

আচ্ছা, দেখি তো। আসবেন সন্ধ্যের পরে।

ধরণীধর শুনছিলেন। বৈঠকখানায় কমলভূষণকে ডেকে বললেন, জলধরকে দেখেছেন তো? রং কালো।

কমলভূষণ ঝেড়ে ফেলে দেন: কালো! ছেলে কালো আর ধান কালো—সে কি ধর্তব্যের মধ্যে?

জলধর পাশটাশ করে নি কিন্তু।

কমলভূষণ মহোৎসাহে বলেন, দরকারটা কি? আপনার ছেলেকে অফিসে কলম পিষে খেতে হবে না আমাদের মতন—বয়ে গেল পাশ করল আর না করল। ঐ সব আজে বাজে বলে ভুলোতে পারবেন না বেয়াইমশায়। পাকাকথা বলে দিন—ঐ উনত্রিশে যাতে হয়, কোমর বেঁধে লেগে যাই।

সন্ধ্যা অবধি সবুর সইল না, অফিস থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে কমলভূষণ বেলাবেলি এসে অরবিন্দকে বলেন, কি হল ভাই? কি বললেন আপনার বউদি?

এত যখন ইচ্ছে আপনার। আর মেয়েটিকেও বউদির বড় পছন্দ।

বেঁচে থাকুন ভাই, শতেক পরমায়ু হোক।

পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে দু-হাজারের দু'খানা নম্বরি নোট বের করে এক ছত্র লিখিয়ে নিয়ে কমলভূষণ আত্মীয়কুটুম্বদের সুখবর শোনাতে ছুটলেন।

ধরণীধর বাড়ি এলে অরবিন্দ নোট দুখানা দিল। বলে, দাদন দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে গেছে দাদা। 'না' বলবার আর পথ রইল না।

ধরণীধর বলেন, মাথায় গোলমাল লেগে যাচ্ছে অরবিন্দ। শশধরের মতো ছেলের সঙ্গে একেবারে বিনা পণে কাজ করতে পিছিয়ে গেল, সেই মানুষ এত খরচপত্র করে জলধরকে মেয়ে দেবার জন্য পাগল—

কলিকাল, দাদা। মানুষ ভাল, এ কেউ বিশ্বাস করে না—তক্ষুনি ভাবে, গোলমাল আছে নিশ্চয় ভিতরে। যত কান্নাকাটি করুক, ন-হাজারের একটি পয়সা ছাড়বেন না। সোনা চল্লিশ ভরি নিক্তি ধরে ওজন করে নিতে হবে। নয়তো ফের কেঁচে যেতে পারে কিন্তু।

ধরণীধরের হতভম্ব অবস্থা দেখে অরবিন্দ হেসে উঠে বলে, ছেলে দাতব্য করতে যাচ্ছিলেন দাদা, তা টাকাটাই না হয় দান করে দেবেন কোনও ভাল জায়গায়।

সুভদ্রা

উঃ কী সাংঘাতিক মেয়ে! সুভদ্রা রায়। এক-গ্রাম মানুষের সঙ্গে লড়ছে। আমার শাশুড়ির সঙ্গে বিশেষ করে। ভিটেছাড়া করে ছাড়বে, আষ্টাস্পষ্টি শাসিয়ে বেড়ায়। সত্যিমিথ্যে পাঁচ-সাত নম্বর মামলা জুড়ে দিয়েছে। গুচ্ছের নাবালক ছেলেপুলে, এখন তিনি কোথায় যান, কী করেন! আমিও ছাই ইস্কুল-মাস্টারি করি, মামলা-মোকর্দমার কিছু বুঝি নে। তা হলেও তদ্বির করতে সদরে যাচ্ছি। ত্রিসংসারে আর কেউ নেই শাশুড়ি ঠাকরুনের।

রাত সাড়ে-আটটা। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ক-দিন ধরেই চলছে। সামনে পুল। পুল পার হয়ে খানিকটা গিয়ে সদরের স্টেশন, সেইখানে নামব। রেলগাড়ি হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। সিগন্যাল দেয় নি হয়তো, লাইন জাম হয়ে আছে ওপারের স্টেশনে। অন্ধকার কাঁপিয়ে ইঞ্জিন সিটি দিচ্ছে ঘন-ঘন, পুল পার হবার অনুমতি চাচ্ছে।

প্রথমটা তা-ই ভেবেছিলাম। প্যাসেঞ্জারের মুখে-মুখে এখন অন্য কথা শুনি। গাড়ি যাবেই না আর মোটে। নদীতে জল বেড়েছে, বিষম স্রোত, এখান থেকেই জলের ডাক কানে আসে। এ-অবস্থায় পুলের উপর তুলবে না গাড়ি। পুল ধ্বসে এই কিছুদিন আগে মানুষ মারা গেছে—শিক্ষা হয়েছে সেই থেকে, সামাল হয়েছে।

সে তো হল। এখন উপায় কী? কাল মামলার দিন। সুভদ্রার মতো বাস্তু পাটোয়ারি নই, মামলার কিছুই বুঝি নে। চিঠি লেখা আছে, স্টেশন থেকে সোজা উকিলের বাড়ি গিয়ে সমস্ত শুনব। সে-আশা আর নেই। যা গতিক, সারা রাত পড়ে থাকতে হবে এখানে। বৃষ্টিটা একটু থামল, কিন্তু আকাশ-ভরা মেঘ পাকিয়ে বেড়াচ্ছে। প্যাসেঞ্জার অনেকেই লাইনের ধারে নেমে দাঁড়িয়ে শুলতানি করছে। বসতি না-জানি কত দূরে। ছেলেপুলে মেয়েলোক আতুর-বৃদ্ধ এতজনা রয়েছে—খাবার-টাবার মিলবে কোথা?

গ্রাম শুনছি ক্রোশ তিনেক এই জায়গা থেকে। রাস্তা নেই—নাবাল মাঠ ভেঙে যেতে হয়, বৃষ্টিতে জল জমেছে, রাত্রিবেলা প্রাণ বেরিয়ে যাবে গ্রামে পৌঁছতে। গিয়ে লাভও নেই। গরিব চাষাভূষোরা থাকে—নিজেরা খেতে পায় না, এত লোকের খাবার কে সাজিয়ে রেখেছে বলুন।

পুল পার হয়ে লাইন ধরে যদি চলি? রেলের পুল—স্লিপার একটা এই এখানে একটা ওই ওখানে, দুই স্লিপারের মধ্যে দেড়-হাত দু-হাত ফাঁক। স্লিপারে পা রেখে রেখে এগুতে হবে। একবার পা ফসকাল তো গেলেন একেবারে নদীস্রোতের মধ্যে। মেঘভরা অন্ধকারে স্লিপারও ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না।

তবু যাচ্ছি। উপায় নেই, মামলা কাল। একটা মেয়ের কাছে, বিশেষ করে সুভদ্রার কাছে হার মানব না। জুতো খুলে হাতে নিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলছি। কী করে পার হলাম বলতে পারি নে। পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছি, তবু বিশ্বাস হয় না সত্যি সত্যি এসেছি পার হয়ে। পিছনে তাকিয়ে আন্দাজ নিই, কত বড় দুঃসাহসিক কাজ করে এলাম। আমার দেখাদেখি আরও মানুষ পুলে উঠেছে—সাদা ঐ এক বস্তু আসছে ধীরে ধীরে। 'এরও মামলা নাকি, সুভদ্রা রায়ের মতন কারও আতঙ্কে মরণপণে নদী পার হচ্ছে?

বৃষ্টিটা আবার চেপে এল তো রেলরাস্তা থেকে নেমে পড়লাম। মাইল দেড়েক গিয়ে শহর। দুটো রাস্তা মিশেছে এইখানে, মোড়ের উপর মুদীর দোকান। পান-বিড়িও পাওয়া যায়। জরভাব হয়েছে, আর বৃষ্টি লাগানো ঠিক নয়। বসে পড়ি দোকান-ঘরে।

অদৃষ্ট ভাল। একটা সাইকেল-রিকশ সওয়ারি পৌঁছে দিয়ে ফিরছে। ফিরতি গাড়ি বলে আটআনাতেই রাজি।

কোন ভদ্দর হোটেলে পৌঁছে দাও বাপু। আছে তো সে-রকম? খাওয়া হোক না হোক, শুয়ে পড়তে চাই। সমস্তটা দিন জলে ভিজেছি, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।

তেমন হোটেল তো—

একটুখানি ভেবে নিয়ে রিকশওয়ালা বলে, ভরদ্বাজ মশায়ের হোটেলে ঘর আছে। ঐখানে কপাল ঠুকে দেখা যায়।

চল ভাই—

হেনকালে নজর পড়ল, উঁচু রেলরাস্তা থেকে তীরবেগে একজন নেমে আসছে। সেই যাকে সাদা কাপড়ে দেখেছিলাম। হাত উঁচু করে চেঁচাচ্ছে, আমি যাব, আমি—

কাছে এসে পড়ল। মেয়েলোক। এবং পাঁচ বছর পরে দেখা যদিচ, লহমার মধ্যে চিনে ফেললাম, সুভদ্রা রায়। বৃষ্টির মধ্যে কখন মাঝপথ থেকে ট্রেনে উঠেছিল, ঠাহর পাই নি। কঠিন হয়ে বললাম, এ রিকশ ভাড়া হয়ে গেছে।

আমার দিকে পলকমাত্র দৃষ্টি হেনে সুভদ্রা রায় রিকশওয়ালাকে বলে, কত টাকার মানুষ—কে ভাড়া করল শুনি? পুরো-টাকা দেব, চল।

তড়াক করে গাড়িতে উঠে পড়ে হুকুম দিলাম, চালাও। আমি আগে ভাড়া করেছি, লাখ টাকা দিলেও আর হবে না।

রিকশওয়ালা তবু দাঁড়িয়ে আছে। আটআনা ও একটাকায় তফাত কম নয়। মেয়েয় পুরুষে কোন্দল জমছে—দোকানের লোকগুলো রাস্তায় বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে মজা দেখতে। তাদেরই সালিশ মানি: বল তোমরা, আগে তো আমি ভাড়া করেছি?

তারা একবাক্যে সায় দিল: বটেই তো! আগেভাগে ভাড়া হয়ে গেছে, নতুন সোয়ারি নেবে কেমন করে?

সুভদ্রা ঝঙ্কার দেয়: বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে মেয়েলোক একা-একা পায়ে হেঁটে যাব, এই তোমাদের বিচার হল?

অমনি লোকগুলো আমার উপর খিঁচিয়ে ওঠে: বটেই তো! অবলা মেয়েলোক একা একা হেঁটে যাবেন, কী রকম ভদ্রলোক মশায় আপনি?

বলে কী, সুভদ্রা রায় নাকি অবলা! অবলা মেয়েলোক ইতিমধ্যে এক লম্ফে চলতি রিকশয় উঠে পড়েছে। আমার মুখ এদিকে, সুভদ্রার ওদিকে।

দেহের আয়তন সিকিখানা করে এক কোণে চেপেচুপে আছি। রিকশওয়ালার স্ফূর্তি—ভাড়া আট আনার সঙ্গে টাকা জুড়ে গেল। স্ফূর্তিতে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে অন্ধকার পথে ছুটল।

পরিচয়টা নিয়ে নিন সুভদ্র রায়ের—কেমন করে তার সঙ্গে চেনাজানা ঘটল। বি-এ পাশ করে চোখে অন্ধকার দেখছি। যতদিন কলেজে ছিলাম, মা ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে খরচ জুগিয়েছেন। আর নয়। কপালে ছিল, তাই এতটা হয়েছে, নইলে এই কি হবার কথা? যদ্দূর হয়েছে, তারই মতন রোজগারে লেগে যাও তো দেখি।

নিরঞ্জন আমার সঙ্গে পড়ত। মামার জোর আছে, পাশ করতে না করতেই চাকরি। একদিন আমাকে খবর দিল: ইস্কুল-মাস্টারি করবে তো বল। হেডমাস্টার—আমাদের গাঁয়ের ইস্কুলে। মাইনে দেড়-শ টাকা।

শুধুমাত্র বি-এ পাশ, বয়সেও ছেলেমানুষ—বলছে কি নিরঞ্জন, দেড়-শ টাকা দিয়ে সোজাসুজি হেডমাস্টারের চেয়ারে নিয়ে বসাবে?

নিরঞ্জন মুচকি হেসে বলে, খাতায় সই করবে দেড়-শ। পাবেও তাই। তার থেকে এক-শ কুড়ি টাকা গরিব ইস্কুলকে মাসে মাসে দান করে দিও।

তখন বুঝলাম। বাকি তিরিশ দেবে তো, না খাওয়া-থাকার বাবদ তা ও কেটে নেবে?

ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট সতীশ্বর রায়ের বাড়ি থাকবে। বড়লোক মানুষ—তিনি কেন টাকা নিতে যাবেন।

মা-জননী সকাল-বিকেল অভীষ্ট করে তুলেছেন—যা-হোক কিছু চাকরি জুটলে পছন্দমত এক টুকরো বউ নিয়ে আসবার সাধ। তিরিশ টাকাই বা কে দিচ্ছে আমায়। চললাম নিরঞ্জনদের গ্রামে।

বড় গ্রাম। শিক্ষিত লোক আছেন। তারা সব গ্রামের বাইরে। বিদ্যে-সাধ্যি বা সহায়-সম্বল নেই এমনি লোকেরা সামান্য জমিজমা অবলম্বন করে পড়ে আছেন। নীচের যাবতীয় মাস্টার ওঁদের ভিতর থেকে। জমাজমি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারি বাবদ পাঁচ টাকা দশ টাকা যা আসে, মন্দ কি! মেলে না হেডমাস্টার—বি-এ পাশের নীচে হেডমাস্টার হয় না, পাশ-টাশ করে তিরিশ টাকায় কে পড়ে থাকবে? বরাবর এক নিয়ম ছিল—হেড-মাস্টার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টাররূপে দু'জন গ্রাজুয়েট গ্রামবাসীর নাম লিখে রাখত খাতায়। ইনস্পেক্টর আসবার মুখে গ্রামের কল্যাণে তাঁরা ছুটিছাটা নিয়ে আসতেন। ইদানীং মানুষজন ত্যাঁদড় হয়েছে, ইনস্পেক্টর-

অফিসে বেনামি চিঠি চলে যায়—হেডমাস্টার নেই, পড়াশুনো কিছু হয় না। ইনস্পেক্টরও তেমনি—খবরবাদ নেই, গোছগাছ করবার অবসর দেন না, হুট করে এসে পড়েন। এই সব কারণে একটি ষোল-আনা হেডমাস্টারের জরুরি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আছি অবশ্য বেশ ভাল। রায়েরা কলকাতা থাকেন—চকমিলানো বাড়ির উপরতলায় আমি একেশ্বর। মোটা মোটা থাম, বড় বড় কামরা, পরকলা-দেওয়া ঝাড়লণ্ঠন ঝোলে ছাত থেকে, মেহগ্নি-পালিশ খাটপালঙ্ক, দেয়ালে দেয়ালে তেলরঙের ছবি—ঘোড়া, জাহাজ, মেমসাহেব, বাঘ-শিকার ইত্যাদি। অবসর সময়ে তিন-চারটে ঘর নিয়ে পায়চারি করে বেড়াই। নিচের তলায় নায়েব-খাজাঞ্চি-পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে কাছারি বসে সকাল-সন্ধ্যা। বরকন্দাজদের খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে—বিশাল রান্নাবাড়ির একটা ঘরে পাকশাক হয়। আমার খাওয়া তাদের সঙ্গে। নায়েব প্রায়ই বলেন, আরে দুর—ওরা রাঁধতে পারে নাকি! আমার বাড়ি খেয়ে এস। শাকপাতা যা-ই হোক, হাসির মা-র রান্নার খুব যশ। ভোজের রান্না রাঁধতে ডেকে নিয়ে যায়।

আমি উড়িয়ে দিই: বেশ তো চলছে। অসুবিধা হলে বলব বই কি। নিজে যেচে গিয়ে খাব।

পুজোর সময়টা ভারি ধুমধাম। পাঁচ-ছখানা প্রতিমা ওঠে। গ্রামসুদ্ধ মিলে থিয়েটার করে। যারা বাইরে থাকে, বাড়ি আসে এ সময়। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, আমায় কিছুতে যেতে দিচ্ছে না।

ফস্টারের পার্টটা করে দিয়ে যাবেন হেডমাস্টার মশায়। ইংরেজি কথাবার্তা অমন আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সকলের টানাটানিতে থেকে যেতে হল। পুজোর ক'টা দিন কাটিয়ে তার পর মায়ের কাছে যাব। কলেজের অভিনয়ে কিছু নাম ছিল, এখানে এরওরাজ্যে রীতিমত কেষ্টবিষ্টু হয়ে দাঁড়িয়েছি।

সতীশ্বরবাবুরা এসে পড়লেন। সতীশ্বরবাবুর পঁচাশি বছরের মা—বৃদ্ধার নড়ে বেড়াবার ক্ষমতা নেই, ডুলিতে বসিয়ে দশ-পনেরো জনে ধরে দোতলায় তুলে দিল। স্ত্রী নেই—এসেছে চার ছেলে ও এক মে·য়। ছেলেগুলো ছোট, মেয়ে সকলের বড়—অনেক বড়। এই সুভদ্রা।

আমি অতএব দোতলা ছেড়ে নিচের তলায় এসেছি। কাছারির পাশে চোরকুঠুরিতে বরকন্দাজদের এক খাটিয়া পেতে দিয়েছে। শোওয়ার কষ্ট, কিন্তু খাওয়ার মজায় পুষিয়ে যাচ্ছে। রাজসূয় ব্যাপার মশায়—পোলাও-

কালিয়া, লুচি-মাংস চলছে এবেলা-ওবেলা। সাদামাটা ভাত-ব্যঞ্জন রায়েদের গলা দিয়ে যেন নামে না।

সতীশ্বর রায় শুনেছি পণ্ডিত মানুষ—সংস্কৃত ইংরেজি দুটোতেই ভাল পড়াশুনা। কথাবার্তা হয় নি কোনদিন– কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখি নি। কথা বলার উপযুক্ত মানুষ পান না নাকি। অন্য দোষও আছে। টকটকে লাল চোখ দুটো তুলে যখন তাকান, বুকের মধ্যে গুরগুর করে– পালিয়ে বাঁচি সামনে থেকে।

সুভদ্রা অবশ্য কথা বলে, কিন্তু না বললেই বরঞ্চ ভাল ছিল। নুন দিতে আধ মিনিট দেরি হয়েছে, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে থালাসুদ্ধ ঝনঝনিয়ে ছুঁড়ে দিল। এ-ব্যাপার আমি চোখে দেখেছি। বাপের মতন মেয়েরও কেউ কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু হলে কী হবে, লাট্টুর মতন সে-ই সর্বত্র পাক দিয়ে বেড়ায়।

একদিন আমার ঐ চোরকুঠুরির দোরগোড়ায় হাজির। আধ-শোওয়া অবস্থায় পার্ট মুখস্থ করছিলাম, উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলি, আসুন—

ভিতরটায় একবার নজর বুলিয়ে সুভদ্রা তিতো জিনিস খাওয়ার মতন মুখ করে বলে, মাস্টার আপনি?

বলবার ধরনটা ভাল নয়। কিন্তু আছি এদের আশ্রয়ে—অত বিবেচনায় কাজ কী—শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম: হ্যাঁ।

হেডমাস্টারি করেন, লেখাপড়া শিখেছেন খানিকটা, স্বাস্থ্যের নিয়ম-টিয়ম জানেন না? এত নোংরার মধ্যে থাকেন কী করে?

আমায় দেখিয়েই থুতু ফেলল সে বাইরে। চোখ-মুখ কুঞ্চিত করে জুতো ঠুকঠুক করে চলে গেল।

নায়েবমশায়ের সঙ্গে আরও খাতির জমেছে ইতিমধ্যে। তিনিও দেখলাম বেশ বিরক্ত। বয়স্ক মানুষ, মেয়েছেলের অমন স্বভাব বরদাস্ত করতে পারেন না। গল্প করি: আচ্ছা, এ-মেয়ের যে-ঘরে বিয়ে হবে—

নায়েব ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, বিয়ে? এ-জন্মে নয়—এই তোমায় বলে রাখলাম। চেষ্টা কম হয় নি। হবার হলে অনেক আগে হয়ে যেত।

আবার বলেন, দেখ, মেয়েদের যত লেখাপড়া শেখাবে, বিয়ের মুশকিল ততই। কনে এম-এ পাশ তো বরকে তার উপরে হতে হবে—তেমন আর ক'টা পাওয়া যায়? দেখতে শুনতে আগে ভালই ছিল, স্বভাবও মারমুখি ছিল না, পয়সাকড়ি ছিল—খরচপত্র করা যেত। চেষ্টাও খুব হয়েছে। কিন্তু একে বনেদি বাড়ি, তায় লেখাপড়া,—গোদের উপর বিষফোড়া উঠলে কোন

চিকিচ্ছে আছে? এখন পয়সাকড়ি শুকোচ্ছে, মেয়ে মুটিয়ে যাচ্ছে, মেজাজ চড়ে উঠছে ততই। মানুষজন পিঁপড়ে-ফড়িঙের মত বিবেচনা করে—যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। আগে বেশ শিষ্টশান্ত ছিল।

মহানবমীর দিন থিয়েটার হল। ধন্ধু-ধন্ধু পড়ে গেল। দেমাক করব না, অধমের চেহারাটা দেখেন নি আপনারা, সাজলে-গুজলে মন্দ দেখায় না। সত্যি, লরেন্স ফস্টার সেজে আয়নার মধ্যে নিজেকেই চিনতে পারি নে। বিলাতের জাহাজ থেকে সদ্য নেমে যেন স্টেজের উপর উঠেছি। শয়তানি চরিত্র, লোকের ঘৃণা হবার কথা। কিন্তু আমার সাজগোজ, ভাবভঙ্গি, ফড়ফড় করে ইংরেজি বলা—স্টেজে দেখা দিলেই চতুর্দিকে হাততালি পড়ে যাচ্ছে। নায়ক প্রতাপ অবধি ফস্টারের কাছে পাত্তা পায় না।

সাজ-পোশাক খুলে রং ধুয়ে ফেলে বাসায় ফিরছি, তখনও লোক কাতার দিয়ে যাচে। কী চমৎকার, কত গুণ ধরেন আপনি মাস্টার মশায়! প্রশংসা কুড়োকে কুড়োতে এগোই—রণজয়ী সেনাপতি বোধহয় এমনি দেমাকে ঘরে ফেরে। চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের দিকে বারংবার তাকাচ্ছি, যেখানে মেয়েদের জায়গা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে-বউরা অবশ্য যেচে প্রশংসা জানাবে না, কিন্তু সুভদ্রা শহরের মেয়ে—তার মনোভাবটা জানতে পারলে হত।

জানতে দেরি হল না। বাড়ি ফিরছে সুভদ্রা, আমাদের পাশাপাশি এসে পড়ল। নায়েব মশায় সগর্বে জিজ্ঞাসা করেন: গেঁয়ো থিয়েটার কেমন লাগল সুভদ্রা?

বড্ড আমোদ পেয়েছি। এতখানি ভাবতে পারি নি।

দলসুদ্ধ কৃতার্থ। আমার দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা আবার বলে, এমন হাসাতে পারেন আপনি! হেসে হেসে খুন হয়ে গেছি।

নায়েব বললেন, এই দেখ, তুমিও তবে চিনতে পার নি। হাসির পার্ট নয় গো, মাস্টার এমন সাজে সেজেছিল, ধরা বড় শক্ত!

সেদিকে কান না দিয়ে সুভদ্রা বলে, কিছু তো লেখাপড়া জানেন। ইচ্ছে করেই নিশ্চয় লোক হাসাবার জন্তে অমন উৎকট ইংরেজি উচ্চারণ করছিলেন। তাই নয়?"

ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ি। 'চন্দ্রশেখর' পালা আর একদিন করতে বলছিল, কিন্তু ভোর না হতে রওনা হয়ে পড়েছি। মায়ের কাছে যাওয়ার একটা দিনও আর দেরি চলবে না।

মাসখানেক পরে জগদ্ধাত্রীপুজো অন্তে ফিরে এসেছি। সুভদ্রারা আজও

পড়ে আছে। সতীশ্বরের বড় অসুখ—সেজন্যে যাওয়া হয় নি। অজ-পাড়াগাঁ জায়গায় ভাল ডাক্তার-কবিরাজ নেই, এতবড় রোগি এখানে ফেলে রেখেছে কী জন্য? নায়েবমশায় চোখ টিপে বললেন, ডাক্তার-কবিরাজ বেটে খাওয়ালেও অসুখ সারবে না বাবাজি। অত্যাচার করে করে লিভার পচিয়ে ফেলেছে।

তিন-চার মাস কেটে গেল, অসুখ সমভাবে আছে। নায়েবের কথা সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি কাঁহাতক আধ-অন্ধকার চোরকুঠুরিতে পড়ে থাকি! নায়েব বললেন আমার বাড়ি এসে থাকতে বলছি, বাড়ির-ছেলে হয়ে থাকবে। একটা কথা বলি তবে শোন। আর এরা কলকাতা যাবে না—কলকাতার বাড়ি তিন মর্টগেজ দেওয়া ছিল, এবারে বেচে নিয়েছে। গিয়ে সেখানে থাকবে কোথায়, খাবে কী?

আবার এখানেও তেমনি ব্যাপার। সতীশ্বর রায়ের গেরো খারাপ পড়েছে। বাজারটা বেশ ভাল সম্পত্তি—দশ-পনেরো টাকার মতন দৈনিক তোলা উঠত, কোথাকার কে-একজন সেই বাজার নিলামে ডেকে নিল। পোতাও-কালিয়া গিয়ে ডাল-ভাত চলছিল, তাতেও টান পড়বার গতিক।

চোরকুঠুরিতে সুভদ্রা আবার একদিন ঢুঁ মারল: আমাদের নায়েবের বাড়ি উঠে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ।

নতুন ঘর বানিয়ে আস্পর্ধা বড্ড বেড়েছে নায়েবের। ঘর কিন্তু টিনের—দুপুরবেলা আগুন ছোটে। এমন পাকা দালান নয়।

তা হলেও আলো-বাতাস দিব্যি। দেখে এসেছি।

সুভদ্রা হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে, আলো-বাতাস আমাদের বাড়ি নেই বুঝি? নেমকহারাম, তাই নিন্দে করলেন। দোতলার যে-ঘরটায় ছিলেন, বাতাসে তো মশারি গুঁজে রাখা যায় না।

ইতস্তত করে বলি, কিন্তু সেখানে তো আর সুবিধা হচ্ছে না।

সুভদ্রা মুখ বেঁকিয়ে বলে, কী লাটসাহেব! তিরিশ টাকার মাস্টারি করতে এসেছেন, অমন ঘরেও সুবিধা হবে না বলছেন?

অনেক কষ্টে রাগ চেপে নিয়ে বলি, আমার কথা হচ্ছে না। অসুবিধা হবে আপনাদের। আপনার।

সুভদ্রা হেসে উঠে বলে, কিছু না—কিছু না। বিড়াল-কাকাতুয়া ইঁদুর-আরশোলা কতই রয়েছে—এই বড়-বাড়ির মধ্যে আপনি কোন্‌দিকে আছেন না আছেন, টেরই পাব না মোটে।

যদিই বা দু-চার দিন থাকতাম এর পরে আর চলে না। জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে ফেলেছি, আবার এল সুভদ্রা।—যাচ্ছেন?

জবাব দিই না।

সুভদ্রা বলে, ঐ নায়েব কাঁকিজুকি দিয়ে বাবাকে পথে বসাচ্ছে। বাজারটা বেনামিতে ওই ডেকেছে, জানতে পারা গেল। শয়তান লোক।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, বিষয়আশয় যারা করে, পথ তাদের ঐ একটিই। আপনার পূর্বপুরুষের খবর নিয়ে দেখুন গে—ঐ রকম কিছু-একটা হবে।

অতঃপর ভদ্রতার মুখোশটুকুও থাকে না। বলে, যাবেন—সে তো জানিই। নায়েব টোপ নাচাচ্ছিল, বোকা মানুষ গিলে বসেছেন। হিড়হিড় করে এবার টেনে তুলছে। কী-বা রুচি, কী পছন্দ! আবার নাকি পড়াশুনো করতেন কলেজে!

মুখ ঘুরিয়ে টিনের বাক্সটা হাতে তুলে নিলাম। বাকি জিনিস ও-বাড়ির লোক এসে নিয়ে যাবে।

ইঙ্গিতটা ইতর। হাসির কথা বলল—নায়েবের বয়স্থা মেয়ে হাসির সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে। পাড়ার মধ্যেও নাকি ফিসফাস চলছে। মেয়ের বাপ নায়েবমশায় তিলমাত্র বিচলিত নন। বলেন, যা রটে কিছু তার বটে। তা অন্যায়টা কী—হবে তুমি আমার জামাই। মেয়ে আমার কানা নয়, খোঁড়া নয়, কাজকর্মে ভাল—কুলেশীলে মিল রয়েছে, গোলমালটা কিসের?

মায়েরও মত এসে গেল। হাসির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে আমার। শ্বশুরমশায় কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়-আশয় নেই, নায়েব রেখে ওঁরাই বা কী করবেন। বসতবাড়িটাই মেরামতি অবস্থায় ক বছর রাখতে পারেন তাই দেখুন।

বিয়ের দিন রায়বাড়ির মানুষ কেউ এল না—চাকরের হাতে একজোড়া হাঙরমুখো বালা পাঠিয়ে দিল। সতীশর নিজ-হাতে চিরকুট লিখেছেন—হাসিরানীকে আশীর্বাদ। সেকেলে ভারী গয়না, হয়তো-বা সুভদ্রার মায়ের জিনিস। শ্বশুরমশায় বলেন, পুরনো মনিব, অনেক কাল নুন খেয়েছি—বালা রেখে দাও, ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করতে পারব না। পরিয়ে দাও হাসির হাতে।

পরদিন রওনা হবার মুখে—ঢোল-কাঁসি-শানাই বাজছে—সুভদ্রা এসে দাঁড়াল সেই সময়।

বিয়ে করলেন, সেই সঙ্গে মাস্টারিতে ইস্তফা দিলেন কোন্ ভরসায়?

দেখা যাক—

লাটের চাকরি কে দিচ্ছে শুনি? পাশ করেছেন, কিন্তু লেখাপড়া কিছু শেখেন নি। নিতান্ত ধাপধাড়া জায়গা, আর বাবার মতন প্রেসিডেন্ট—পাড়াগাঁয়ের মাস্টারি ছাড়া আপনার ও-বিদ্যেয় আর কিছু হয় না।

আমার উপর আক্রোশ কেন জানি নে, গায়ে পড়ে এই সব শোনাতেই যেন এসেছে। আত্মীয়কুটুম্বরা কান পেতে শুনছে, তা বলে মানবে না। শ্বশুরমশায় কোন্ দিকে ছিলেন, ছুটে এসে পড়লেন: এসব কি এখন বলবার সময়?

সুভদ্রা বলে, সত্যি কথা সব সময় বলা যায়। আপনি ইংরেজি জানেন না ভাই। এঁদের সব ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া উচিত।

শ্বশুরমশায় বললেন, আমার বাড়ির উপর দাঁড়িয়ে নতুন জামাইএর কুচ্ছো করতে পারবে না।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুভদ্রা বলে, চলে যেতে বলছেন বাড়ি থেকে?

যা বলতে হয়, রাস্তায় গিয়ে বল গে। এখানে নয়।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

তেমন যদি মনে কর তো তা-ই।

এত দম্ভ আমাদের সর্বস্ব গ্রাস করে? কাল অবধি আমাদের চাকর ছিলেন, সেটা ভুলে যাবেন না।"

সিংহীর মত গর্জাতে গর্জাতে সুভদ্রা চলে গেল। সেই—আর পাঁচ বছর বাদে আজকে। সতীশ্বর রায় ও শ্বশুরমশায় দুজনেই গত হয়েছেন। নানান ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি এতদিন—সুভদ্রার কথাই খাটল, শেষ পর্যন্ত আবার মাস্টারি। মাস্টার হয়ে ক-মাস এই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসেছি। শাশুড়ির প্রতি চিঠিতে সুভদ্রার কথা কিছু-না-কিছু থাকে। ক্ষেপে গেছে—এমন মেয়ে ভূভারতে কেউ দেখে নি—গ্রামসুদ্ধ মানুষের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। সেই বাজারের স্বত্বাস্বত্ব নিয়ে বড় দেওয়ানি মামলা ফেঁদেছে। শাশুড়ি লিখেছেন, বাইরের লোক টাকা ফাঁকিজুকি দিয়ে নেয়, মামলার তদ্বির করে না। জামাই হলেও তুমি, ছেলে হলেও তুমি। এই তারিখটায় তুমি বাবা যেমন করে হোক হাজির হয়ো। বাজারটা গেলে অন্ন জুটবে না।

*

রিকশ থেমে দাঁড়াল। এই তবে ভরদ্বাজের হোটেল। রাত অনেক হয়েছে। দরজার কড়া নাড়ি, মর্মান্তিক চেঁচাই। রিকশওয়ালাও ভেঁপু বাজিয়ে সাহায্য করছে। দরজা খুলে পাকাচুল এক বুড়োমানুষ মুখ বাড়ালেন।

কে ?

ঘর পাওয়া যাবে ভরদ্বাজমশায় ? রাত্রে থাকব।

দাঁড়াও—

হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে এলেন। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করছেন। বললেন, ভাল লোকেরা এসে অসুবিধায় পড়েন, সেইজন্যে তো ঘর রেখেছি। তবে হ্যাঁ, লোক ভাল হওয়া চাই। উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি, তা বলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কোথাও যাই নি ভাই। সৎপথে রুজিরোজগার করি। হুট করে এসে পড়লেই অমনি জায়গা দেব না। সেবারে কি হল—এক ডেপুটির ছেলে এসেছে, সঙ্গে দেখি মেয়েছেলে। ভাল লাগল না, মেয়েমানুষের ঢং দেখলে ধরা যায়—কি বল ভাই ? দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ডেপুটি কেন, নবাব শায়েস্তা খাঁর ছেলে হলেও ভরদ্বাজের ঘরে ঠাঁই হত না।

আমার কাঁধের উপর দিয়ে হ্যারিকেন উঁচু করে ধরে ভরদ্বাজ আহ্বান করেন, তা এস তোমরা—ভিতরে চলে এস।

পিছন দিকে চেয়ে দেখি, সুভদ্রাও রিকশ থেকে নেমেছে। মামলা-মোকদ্দমায় এত আসা-যাওয়া—কোনও চুলোয় জায়গা নেই, মেয়েছেলে হয়েও হোটেলে এসে উঠল ? আবার আবদারের ঢঙে বলছে, কোঠাঘর দেবেন কিন্তু—টিনের ঘরে আমার ঘুম হয় না।

তাই হবে মা-লক্ষ্মী। খেয়ে নাও তো আগে।

সোরগোল পড়ে গেছে বুঝতে পারছি। কাজকর্ম চুকিয়ে ঠাকুর বাসায় চলে গেছে, ভরদ্বাজ-গিন্নি নিজে তাই মাছের ঝোল চাপিয়ে দিয়েছেন।

রাত দুপুরে কী কাণ্ড লাগালেন ভরদ্বাজমশায়! খাওয়ার গরজ নেই, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, শুয়ে পড়তে চাই তাড়াতাড়ি।

ভরদ্বাজ বলেন, এই বড় রাত উপোস করে থাকবে, তাই কখনও হয় ? একটুখানি সবুর কর, দশ মিনিটের মধ্যে পাতা করে দিচ্ছি।

নিজেই ছুটলেন—দোকানদারকে ডেকে তুলে দু' খুরি দই কিনে আনবেন, নিজে না গেলে হবে না। হোটেলের খদ্দেরমাত্র নয়—কোন গৃহস্থ-বাড়ি অতিথি হয়ে এসেছি যেন। ডাল মাছের ঝোল আর দই, তিনটে পদ। অমৃত খেয়ে এসে বিড়ি টানছি আর উদ্গার তুলছি।

ভরদ্বাজ বললেন, এইবার ওঠ। শোবার জায়গা দেখিয়ে দিই।

উঠান পার হয়ে ঢাকা-বারান্দায় উঠলাম। পাশাপাশি ক'টি কামরা—তার একটা দেখিয়ে দিলেন।

কামরা নয়, পায়রা-খোপ—খাটে তিন ভাগ জুড়ে আছে। ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে আসি—কি সর্বনাশ, খাট জুড়ে সুভদ্রা শুয়ে পড়েছে।

ভরদ্বাজ বলছেন, দুয়োর দিয়ে শুয়ে পড়। কুলুঙ্গিতে জলের কুঁজো। আর কিছু দরকার হয় তো বল।

অন্য একটা ঘর দিন ভরদ্বাজমশায়।

ভরদ্বাজ একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, অন্য ঘর কোথা? রাত দুপুরে চাঁদের আবদার ধরলে, আঁকুশি দিয়ে কে পাড়তে যায় এখন বল। ঘর আর একটা ছিল, সেখানে সব শুয়ে পড়েছে।

ভরদ্বাজ-গিন্নি এসে দাঁড়ালেন। অল্প ঘোমটা, হাসিতে ডগমগ মুখ, একমুখ পান চিবোচ্ছেন। মৃদু কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন: কি হল?

অন্য ঘর চাচ্ছে। খাট ছোট দেখে গোঁসা হল বোধহয়।

গিন্নি বললেন, ছেলেপুলে নেই, মাঠের মতন এক খাট কী হবে? একটু থেমে আবার বলেন, বৃষ্টি-বাদলের দিন, আঁটোসাটো খাটই তো ভাল গো!

মুচকি হেসে আঁচলে মুখ ঢাকা দিলেন।

এই দেখুন, কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। জবাব দেব কি, অন্ধকার রাতে এক রিকশায় দুজনে এসে নামলাম, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলে ডেপুটি-পুত্রের মতো আমাকেও দূর করে দেবে ঘর থেকে।

চলে গেলেন স্বামী-স্ত্রী, পাশের কামরায় গিয়ে দরজা দিলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়। বিপদের উপর বিপদ, ঝুপঝুপ করে জোরে বৃষ্টি এল। অনেক বৃষ্টি খেয়েছি, আবার এই রাত দুপুরেও। দেয়ালে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়েছি, তবু ঝাপটা আসে। নবাবনন্দিনী ওদিকে আমারই খুঁজে-বের-করা হোটেলে আরামে ঘুম দিচ্ছে।

ভেজানো দরজা খুলে গেল হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায়—উঁহু, দোর খুলে সুভদ্রা এসেছে।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন?

নড়ব কোথা? জলের ঢেউ খেলে যাচ্ছে দেখুন না।

ঢেউএর মধ্যে থাকতে কে বলছে? ঘরে এসে শুয়ে পড়ুন।

ইচ্ছে তো ছিল ভাই। শরীরটা ভাল নেই, রাতে ঘুমানোর গরজ। তা হতে দিলেন কই?

আমি কি মানা করেছি? ঘরে এসে বসুন, শোন, ঘুমোন, আমার কিছু যায় আসে না।

অবাক হয়ে তাকাই, বলে কি।

এবং অনেককাল আগেকার সেই কথাগুলো মুখস্থর মতো বলে যাচ্ছে, "বিড়াল-ইঁদুর-আরশুলা তো থাকে, আপনি একদিকে একটু ঘুমিয়ে থাকলে কি ক্ষতি হবে আমার? চলে আসুন।

চটে গিয়ে বলি, বিড়াল না হয়ে বাঘ যদি হয়?

হি-হি করে হাসে। কি বলেন, বাঘ হয়ে গেছেন নাকি? ভারি মজা! তা মাস্টারমানুষ বাঘ হয়ে কেমন হামলা দেন, দেখতে হবে তো! আসুন।

বলেই খপ করে হাত এঁটে ধরল। টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। দাঁড়াতে পারছি না আর আমি। মেজের উপর ঝাপটে বসলাম।

সুভদ্রা ধমক দিয়ে ওঠে: শরীর খারাপ বলছেন তো শুনিয়ে শুনিয়ে। ঠাণ্ডা মেজেয় কেন, খাটের উপর শুয়ে পড়ুন।

জবাব দিই না, নড়ে-চড়ে ভাল হয়ে বসি।

বলছি, শুনতে পেলেন না?

সুভদ্রা এগিয়ে আসে। কী রকম দৃষ্টি! আমার সত্যি ভয় হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে! দুয়োরের দিকে যাই। কি সর্বনাশ নিশিরাত্রে কে ওদিকে ছিল, বাইরে থেকে শিকল এঁটে দিয়েছে। টানাটানি করছি, দুটো-একটা ঘা দিয়েছি দরজায়, চাপা হাসির আওয়াজ পেলাম বাইরে থেকে।

সুভদ্রা কঠিন কণ্ঠে বলে, চুপচাপ থাকুন—কেলেঙ্কারি করবেন না। গিন্নি ঐ হাসছেন।

আর কি হবে, মড়া হয়ে পড়ে আছি। দেহ-রক্ত হিম হয়ে গেছে। সাংঘাতিক মেয়ে—দেওয়ানিতে দেরি হয়, কুৎসিত কোন ফৌজদারিতে ফেলবার মতলব কি না, কে জানে! প্রতিহিংসার জন্ম না-পারে এমন কর্ম নেই।

একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে সুভদ্রা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল। কত ক্লান্ত হয়েছি বুঝতে পারি, এত বড় উদ্বেগের মধ্যেও ঘুম এসে গেল। ঘুম ভেঙে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কে। চোখ খুলতে সাহস পাই নে—যেমন ঘুমুচ্ছিলাম, তেমনি ঘুমিয়ে আছি চোখ বুজে। কি জানি, সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ব্যাপার ঘটে যাবে! এই কোমল হাত সুভদ্রার, এমন আলগোছে সে হাত বুলাতে জানে!

সকালে উঠে বাইরে যেতে ভরদ্বাজ বলেন, ঘুমটুম হল ভায়া? শরীর কেমন?

এক-গাল হেসে বললেন, গিন্নি তো ভয় পেয়ে আমায় টেনে তুলল: ছেলেমানুষ দুটোয় কী ঝুটোপুটি লাগিয়েছে দেখে যাও। আমি বলি, বয়সের দোষ—ও বয়সে আমাদেরও অমন হত। তোমাদের তো ঘর-বারাণ্ডা ভাই—আমি একবার ছুতোর বলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরুচ্ছিলাম।

তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ি: সকাল-সকাল ভাত চাই ভরদ্বাজমশাই।

হচ্ছে, ভাত চেপে গেছে। তোমার আগেই বউমা ভিতরে তাগাদা লাগিয়েছেন। তা ওঁকে সুদ্ধ আদালতে টানছ, কি ব্যাপার?

বিষম এক কেস—

আমতা-আমতা করে সরে পড়ি সেখান থেকে।

ধন্য শ্বশুর মশায়! পাটোয়ারি মানুষ বটে—নিজেই সমস্ত করে গেছেন, কারও জন্যে কিছু রেখে যান নি। ঐ বাজার নিয়ে নিরবধি কালে যত কিছু কথা উঠতে পারে, সমস্ত আগে-ভাগে যেন জেনে বসে ছিলেন। দু-পক্ষের আরজি-জবাব নিয়ে উকিলে-উকিলে লড়াই চলল। লড়াই অন্তে বার লাইব্রেরিতে এসে দাবায় বসেছেন আবার সেই দু'জনেই। হাকিম রায় দেবেন কাল। তা সুভদ্রার পক্ষেরই উকিল বলে দিলেন, রায় তো বোঝাই যাচ্ছে। নির্ভাবনায় চলে যাও, রায় পরে এক সময় জেনে নিও।

সদরে এসেছি, এটা-সেটা কেনাকাটা আছে। হাসির ফরমাশ, বিয়ের সময় সতীশ্বর রায় যে বালা দিয়েছিলেন গয়নার দোকানে সেটা বেচে দিয়ে নতুন প্যাটার্নের একজোড়া কঙ্কণ কিনে নেওয়া। ক্যাটালগ জোগাড় করে তিন-চার রকম ছবিতে দাগ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই আসল কাজটাই হল না। মফস্বল-শহরে সন্ধ্যা হতে না হতে গয়নার দোকান বন্ধ করে দেয়। অতএব একটা বেলা নষ্ট—সকালের ট্রেনেও ফেরা যাবে না। তবে একটা কাজ হবে, হাকিমের রায়টা জেনে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া যাবে।

ভরদ্বাজের হোটেলে গেলাম। খদ্দেরের ভিড় লেগেছে, তারই মধ্যে মুখ তুলে ভরদ্বাজ বললেন, থাকবে তো ভায়া? একা যে—বউমাকে কোথায় রেখে এলে?

একটা-কিছু জবাব দিতে হবে—বললাম, মেজ শালা কোর্টে গিয়েছিল, তার সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

আরও রাত হল। কালকের সেই খাটে শুয়ে স্ফূর্তিতে পায়ের উপর পা তুলে দিয়েছি। আজ ঝামেলা নেই, একা দিব্যি আরাম করে থাকব।

কাজের এক ফাঁকে হুঁকো টানতে টানতে ভরদ্বাজ এসে উঁকি দিলেন।

বললেন, ঐ বৃষ্টিবাদলার মধ্যে গিন্নি কাল কতবার উঠে উঠে যে পাতান দিয়েছে। আমুদে মানুষ। কিন্তু কী রাগ তোমাদের ভাই! একজনে খাটে শুয়েছ আর একজনে নাকি জানলা ঠেসান দিয়ে বসে কাটিয়েছ সমস্ত রাত্রি। আমাদের মতন বুড়ো বয়স হলে না-হয় মানে পাওয়া যায়। কিন্তু গিন্নি বলল, সত্যি গো, চোখে দেখে তবে বলছি।

ঠিক এই সময় রিকশ করে সুভদ্রা এসে নামল। কী জ্বালা, ঘুরে ফিরে এখানেই—আর কোথাও জায়গা হল না?

ভরদ্বাজ-গিন্নি কলকণ্ঠে আহ্বান করলেন, এস—ভাইএর সঙ্গে বাপের-বাড়ি চলে গিয়েছ শুনলাম?

সুভদ্রা বলে, কার কাছে শুনলেন?

তোমার কর্তাটি বললেন, আবার কে। ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে গড়িয়ে পড়লেন বিছানায়।

সুভদ্রা কি বলে এবার - কান পেতে আছি। না, চতুর মেয়ে, সামলে নিল: যাওয়া হল না, ভাই থেকে গেল আজকে।

তুমি বুঝি অমনি খুঁজতে বেরুলে? খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে ধরেছ। আচ্ছা, কি করে জানলে যে এখানে?

সুভদ্রা তরল কণ্ঠে বলে, বিনি-তারে খবর হয়ে যায়, তা বুঝি জানেন না?

পাশাপাশি কামরা—শুনতে পাচ্ছি ওদের প্রতিটি কথা। গিন্নি বলছেন, আজকাল এ কি গতিক দেখি তোমাদের ভাই, সিঁথের সিঁদুর দেবে না—

সুভদ্রা বলে, সিঁদুরে নানান বাজে জিনিস থাকে, চুল উঠে যায়।

শিউরে ওঠেন যেন গিন্নি: সাহস বটে তোমাদের। আমাদের সময় দৈবাৎ যদি সিঁদুর মুছেছে কি চুড়ি ভেঙে গেছে, ভয়ে কাঠ হয়ে যেতাম, ঘুম হত না সারা রাত্তির। না ভাই, এসব হবে না, সেজেগুজে এয়ো-স্ত্রীর মতন ঘরে যাবে।

অতএব এয়োস্ত্রী রূপে সাজাতে নিয়ে বসল নাকি? এ বড় ফ্যাসাদ। কোনও এক অজুহাত নিয়ে সরে পড়া যাক।

সুভদ্রা এসে ঢুকলে তাই বললাম, আপনি থাকুন, আমি চলে যাচ্ছি। হোটেল-চার্জ রেখে যাচ্ছি আপনার কাছে।

সুভদ্রা বলে, আছেন কি জন্যে তা-ও জানি নে আমি থাকলাম আপিল করতে হবে সেই গরজে।

আপিলের কিছুই নেই। হেরে যাবেন। আপনার উকিলও তাই বলছিলেন।

সুভদ্রা আগুন হয়ে বলল, বেইমান আপনার শত্তুর লুটেপুটে নিয়েছে—কিছু থাকতে দেয়নি।

কীর্তিধ্বজ শ্বশুরমশায়ের ক্ষমতা কোর্টের মধ্যেও আমি বুঝে এসেছি। সেই অবধি বড় খারাপ লাগছে।

সুভদ্রা বলছে, আপিল করতেই হবে। তা ছাড়া আশাই বা কি। ছোট ছোট ভাইগুলোকে বাঁচাতে হবে। কিছু নেই, সমস্ত গেছে। এমন একজন নেই, মাথার উপরে থেকে দুটো ভরসার কথা বলবে, বুদ্ধিপরামর্শ দেবে। মায়ের একটা আংটি ছিল, বেচে দিয়ে এলাম। গরজ বুঝতে পেরে ন্যায্য দাম দিল না, কোর্ট-ফীর টাকাটাও হবে না।

বলতে বলতে সামলে যায়। উচ্ছ্বাসভরে কার কাছে কী সব বলে ফেলল! কামরার দেয়ালে অতি-ক্ষীণ একটা কেরোসিনের আলো—তাই বোধহয় বলতে পারল এতদূর। চোখের কোণে অশ্রুও বুঝি টলটলিয়ে উঠেছে—মুখ ফিরিয়ে নিল, সঠিক অতএব বলতে পারব না। আর একটি কথা না বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

ভরদ্বাজ মশায়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত রচনা করছি: মনিব্যাগ পাচ্ছি নে। উকিলবাবুর সেরেস্তায় ফেলে এসেছি মনে হয়।

ভরদ্বাজ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, তা হলে?

চললাম আমি সেখানে। উনি রইলেন।

সুভদ্রা দেখি উঠান অবধি নেমে এসেছে। রাগে ফুলছে। চাপা গলায় বলে, বালা রেখে এলেন কেন?

চুপ করে আছি।

ভিক্ষে দিচ্ছেন—দয়া হয়েছে আমার কথা শুনে? এস্টেটের চাকরের মেয়েকে বাবা দান করেছিলেন—সে-জিনিস ফেরত দিচ্ছেন, এতদূর অস্পর্ধা?

সেই ভারী গয়না একরকম ছুঁড়ে মারল আমার গায়ে।

সাঁতার

রাজলক্ষ্মীর শক্ত ব্যারাম, বাঁচার আশা কম। বয়স সত্তর ছাড়িয়েছে। সেই মানুষ তিন মাসের উপর জ্বর আমাশায় ভুগছেন। কঙ্কালসার হয়ে গিয়ে চিঁ-চিঁ করেন। গোমস্তা পরেশ বাগ ছাড়া কেউ তাঁর কথা বুঝতে পারে না। পরেশ খুব করছে, চিরকালই করে। ঐ একটি মানুষ সম্বল করে রাজলক্ষ্মী দেবী ঘরবাড়ি আগলে গ্রামে পড়ে থাকেন। কিন্তু এবারে পরেশ ঘাবড়ে

গেল। কবিরাজ আড়ালে ডেকে স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিয়ে দিলেন: ভাল মনে হচ্ছে না আমার। ছেলেমেয়েদের খবরাখবর দিয়ে পাঠাও। তাঁরা এসে যা হয় করুন। ডাক্তার-টাক্তার দেখান। আমি বাপু সময় থাকতে বলে খালাস। আমায় দুষতে পারবে না। ছেলের চাকরি নয়াদিল্লীতে। বড় মেয়ে ডালটনগঞ্জে—ছেলেপুলে নাতিনাতনি নিয়ে বিরাট সংসার তার। কাছাকাছি মহকুমা শহরে থাকে ছোট মেয়ে শোভা। জামাই উকিল। এরই মধ্যে দিব্যি পশার জমিয়েছে। খবর পেয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তার সঙ্গে করে নিয়ে সবসুদ্ধ তারা নাটিগাছি এসে পড়ল।

আশ্চর্য ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল। ডাক্তার এসে গণ্ডা আষ্টেক বড়ি খাইয়ে দিতে আগুনে যেন জল পড়ে গেল। কবিরাজ মশায় দেখে অবাক—কৌটার লালবড়ি বাতিল করে দিয়ে সেখানে ডাক্তারের ঐ সাদাবড়ি ঢুকিয়ে কবিরাজি চালাবেন কি না, তাই ভাবছেন। শাশুড়িকে খানিকটা ভাল দেখে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে সুকুমার শহরে ফিরে গেল। উকিল মানুষ—বেশি দিন বাইরে থাকলে মক্কেল শুনবে কেন। শোভা দুই বাচ্চা নিয়ে রইল—মায়ের দেখাশুনো করুক। মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে আবার একদিন এসে তাদের নিয়ে যাবে।

সুকুমার একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল নয়াদিল্লিতে—সাত দিনের দিন ছেলে-বউ এসে উপস্থিত। রজত ও রীণা। খেয়া পার হয়ে এক রকম ছুটে এসেছে বাড়ির এই পথটুকু। পাড়ার মানুষ দু-একটিকে দেখেছে—কিন্তু কথা বলে নি। মায়ের খবর জিজ্ঞাসা করে নি ভয়ে ভয়ে। বাড়ির উঠানে পা দিয়ে দেখে সেই মা বঁটি পেতে তরকারি কুটছেন রান্নাঘরের দাওয়ায়। শোভা বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে বলে, ওর যে আর একটা টেলিগ্রাম করবার কথা—মা ভাল হয়ে গেছেন, খবর জানিয়ে দেবে। তার আগেই তোমরা বেরিয়ে পড়েছ।

শাশুড়ি ও ননদের পায়ের ধুলো নিয়ে রীণা বলল, টেলিগ্রাম পেলেও আসতাম আমরা। লম্বা ছুটি জমে গেছে, তিন মাসের ছুটি নিয়ে নিয়েছে। মরুভূমিতে পড়ে থাকি—শ্বশুরবাড়ি ভাল করে দেখি নি কখনও, পাড়াগাঁও দেখি নি। নাটাগাছি থাকব কিছুদিন, আর কলকাতায় বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।

শোভা বলে, বড়দিদিকেও লেখা হয়েছিল। তিনি আবার এসে পড়েন কিনা দেখ। তাঁর তো অনেক ঝামেলা। টেলিগ্রাম তাঁর কাছেও গেছে অবিশ্যি।

ভাল হল, রীণার আর কোন কাজ নেই শুধুমাত্র পাড়াগাঁ দেখা ছাড়া। ট্রেনে যেতে যেতে ইতিপূর্বে যা-কিছু দেখেছে। এবং বইএ পড়েছে। পাড়াগাঁয়ে থাকে নি কখনও। পরের দিন রজত জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগছে?

রীণা উচ্ছ্বসিত। বলে, কী সুন্দর, কী সুন্দর! বইএ আর কতটুকু লিখতে পারে! কেন যে মানুষ শহরে পড়ে থাকে জানি নে। আর ঐ দিল্লির মত শহরে। পোড়ামাটি, লোহা সিমেণ্ট আর ইটের খাঁচা। একটু ঘাস দেখবে তো চাষ করে বানিয়ে নিতে হবে। জল দেখবে তো সেই ওখালা অবধি কিম্বা যমুনায় চলে যাও। ছ্যা ছ্যা—শহর কি মানুষের থাকবার জায়গা!"

রজত হেসে বলে, আচ্ছা, যাক দিন কতক। আবার একদিন শুনব।

ভ্রূভঙ্গি করে রীণা বলে, ভয় দেখাচ্ছ কিসের? চিরজন্ম আমি থেকে যেতে পারি। বেশ, চলে যাও তুমি দিল্লি। আমি মায়ের সঙ্গে থাকব। ভরাই নে।

শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি ধরে না: তাই হোক। আমিও বলছি, থাকবে বউমা আমার সঙ্গে। দেখি, আটকায় কিসে। তোমার নিজের ঘরবাড়ি মা, সব চেয়ে জোরের জায়গা। যক্ষের মত, আগলে বসে আছি, কবে এসে বুঝেসুঝে নিয়ে ছুটি দেবে আমায়। ছুটি তো এবারই হয়ে যাচ্ছিল, নেহাৎ শোভারা এসে পড়ে যমরাজার মুখ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এল।

কয়েকটা দিন গেল। এত বড় বাড়িতে মানুষ এই পাঁচ-সাতটি। বড় বড় ঘরগুলো যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসে। রীণার দৃকপাত নেই, রজতই ছটফট করছে: দূর, মানুষজনের মুখ দেখা যায় না। যেন নির্জন কারাবাস হয়েছে। বেরিয়ে পড়ি চল দু-এক দিনের মধ্যে।

রীণা বলে, মানুষ না দেখলাম, আরও কত সব দেখছি। দক্ষিণের জানলা খুলে বিল দেখি। জল থই-থই করছে, বিল এখন জলের সমুদ্দুর। পুবের জানলা খুলে বাগবাগিচা দেখি। কত বড় বড় গাছ, কত রকমের পাখি। কাঠবিড়াল ছুড়-ছুড় করে কেমন দুষ্টু ছেলের মতো ডালের উপর দিয়ে পালায়। মানুষ তো একঘেয়ে—কত দেখে এসেছি, আবার গিয়ে কত দেখব।

আবদারের সুরে বলে, এদ্দিনের মধ্যে বেরুলাম না বাড়ি থেকে। কোথাও তুমি নিয়ে গেলে না। আজ বিকালে ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে বেড়াব—কেমন?

রজত বলে, এ তোমার কলকাতা-দিল্লি পেয়েছ? বর্ষাকালে ঘুরে ঘুরে কোথায় এখন বেড়াবে? বেড়াবে তো দু-পায়ে হেঁটে নয়, সাঁতার কেটে। ঘুরবে তো ডিঙি বা ডোঙায় চেপে। তা বেশ, বিকালে আজ ডোঙা নিয়ে ঘুরতে বেরুনো যাক।

হি-হি করে হাসতে লাগল : ভোঙা একবার এদিক একবার ওদিক করবে, জল উঠে ডুবেও যেতে পারে। আমি তো দিব্যি সাঁতার কেটে ভেসে ভেসে বেড়াব। আর, শহরে মেয়ের হাবুডুবু খাওয়া আর ঘোলা জল খাওয়া দেখব মজা করে।

বীণা বলে, আচ্ছা, আজকে না-ই হোক—যেতে দাও ক'টা দিন। ভোঙা বাওয়া শিখে আমিই তোমায় নিয়ে বিলে ঘুরব। সাঁতার কেটে গিয়ে পদ্মফুল তুলে আনব। শক্ত মেয়ে আমি। মোটে অঙ্ক জানতাম না—জেদ করে সেই অঙ্ক শিখে লেটার নিয়েছিলাম ফাইন্যাল এগজামিনে।

শোভা ডাকছে : জল তুলে দিয়েছে, চান-টান করে নাও বীণা। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বীণা বলে, চান করব দিদি ঘাটে গিয়ে। আপনাদের মতন। তোলা জলে তো বারোমাস চান করতে হয়। কলের জল—সে-ও তো তোলা জল। দুদিনের জন্য গাঁয়ে এসেছি—তা আপনারা দেখছি গাঁয়ের মধ্যে শহর না বসিয়ে ছাড়বেন না।

জেদ ধরে বলে, আপনার সঙ্গে যাব আমি চান করতে। আপনারা ডুব দিয়ে চান করেন, আমি তাই করব। চান করে কলসি ভরে জল নিয়ে আসব!

রাজলক্ষ্মী ভারি প্রসন্ন : শহরের মেয়ে—তা শোন তার মুখের কথাবার্তা। মনে মনে আমি যেমন বউ চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনি। বউ নয়, ও আমার মা। আমার ঘরের মা-লক্ষ্মী।

এদের পুবের বাগিচার মাঝখানে পুকুর। মেয়েরা যায় সেখানে। গাছপালায় ঘেরা নিরিবিলি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা জায়গাটা। পুরুষরা নদীতে চান করে। কিন্তু বর্ষায় নদীর উগ্রচণ্ডা চেহারা—এবারটা অন্যবারের চেয়ে বেশি। ঝুপঝাপ পাড় ভাঙছে, টানের মুখে কুটোগাছটা দিলে দুই খণ্ড হয়ে যায়। সেজন্য আপাতত সব দীঘির ঘাটে যাচ্ছে, নদীর জলে নামতে সাহস করে না।

বাগিচার পুকুরে চান করতে এসে বীণার কী দুর্ভোগ! জীবনে প্রথম এই বোধ করি ডুব দিচ্ছে। জলতলের অন্ধকারে ভয় করে, কানের মধ্যে জল ঢুকে যায়। শোভা দেখিয়ে দেয় : দুই কানের গর্ত আঙুলে চেপে ধরে ডুব দাও, তবে জল ঢুকবে না। আর ডুব দিয়েই অমনি উঠে পড়বে। আমি ধরে আছি, ভয় কি!

পাড়ার মেয়ে-বউ কয়েকটি রয়েছে ঘাটে। পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মেয়েগুলোও ঠিক তেমনি। কলরবে মাতিয়ে তুলে, হাত-পা

ছুঁড়ে, মুখে করে এক একবার জল নিয়ে আকাশমুখো পিচকারির মতন ছড়িয়ে দিয়ে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। রীণাকে তামাশা করে ডাকে: এস না বউদি—

শোভা মুখ টিপে হেসে বলে, না, সর্দি করেছে আজকে। উঠে এস রীণা, জল বসিয়ে আর কাজ নেই।

রীণাও বাড়ি থেকে এক পিতলের কলসি নিয়ে এসেছে। ভিজে কাপড়ে সপ-সপ আওয়াজ তুলে কলসি-কাঁখে শোভা বাড়ি চলেছে। পিছনে রীণাও তার কলসি নিয়ে যায়। পাড়াগাঁয়ের বউএর যেমনটি হতে হয়। একবার বলে, সাঁতার জানি নে বলে ঠাট্টা করছিল ওরা। সাঁতার আমি শিখবই। এই নাটাগাছি থাকতে থাকতেই পুরোপুরি শিখে নেব আমি।

শোভা বলে, শক্ত কিছু নয়। ঐটুকু-টুকু বাচ্চা-মেয়েরা এপার-ওপার করছে—দেখলে তো! এক কাজ করতে পার। সকাল সকাল গা ধুতে আসবে, ঘাটে তখন কেউ থাকে না। রজতকে নিয়ে এসো। বড় ভাল সাঁতার জানে, ওর মতন কেউ না। অত বড় গাঙ কোটালের সময়েও টান কাটিয়ে কতবার পাড়ি দিয়েছে। অন্য কেউ সাহস করত না। এখন শহরে থাকে, অভ্যেস নেই অবিশ্যি—তা হলেও শেখা বিদ্যে একবারে কেউ কি ভুলে যায়।

রীণা বলে, ও শিখিয়ে দেবে—তবেই হয়েছে! আমি সাঁতার শিখে নিলে তখন আর দেমাক করবে কার কাছে? ও কিছু করবে না দিদি। আপনি একটু-আধটু দেখিয়ে দেবেন, তাতেই শিখে নেব।

শোভা হেসে বলে, আচ্ছা, কেমন না শেখায় আমি দেখছি। অষ্টপ্রহর চা চাই—সেটা যে একেবারে আমাদের হাতে। তুমি আর আমি দুজনে যদি বেঁকে বসি, এ পাড়াগাঁয়ে চা খাওয়া বন্ধ। কে করে দেবে?

সেই সাহসে রীণা রজতকে গিয়ে বলে, আমি সাঁতার শিখব।

রজত গম্ভীর হয়ে বলে, শেখা উচিত বটে। বাথ-টবে প্রাকটিস করতে পারবে। টবের জলে ডুবে যাবারও ভয় থাকবে না।

রীণা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, প্রাকটিস তোমাদের বাগিচার পুকুরে হবে। শেখাবে তুমি। মেয়েগুলো ঠাট্টা করছিল আমায়। দুটো মাস আছি তো অন্তত। তার মধ্যে শিখে নিয়ে পাতিহাঁসের মতন ভেসে ভেসে পুকুরের এপার-ওপার করব তবে নড়ব নাটাগাছি থেকে। চাই কি, নদীতেও সাঁতরাব তোমার মতো।

রহস্যভরা বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে বলে, তোমায় শেখাতে হবে। আপোসে মানে মানে রাজি হও ভাল, নয়তো বিপদ আছে। দিদি আর আমি যুক্তি করে ফেলেছি।

রজত রাজি হয়ে গেল। না শেখাবার বিপদটা আঁচ করে নিয়েই সম্ভবত।

বাগিচার পুকুরে রীণার সঙ্গে গেলও দুপুরের পর। কিন্তু হলে কি হবে—দুষ্ট তো বিষম! শেখাবে না কিছুই, খালি ফষ্টিনষ্টি। নিজের বাহাদুরি দেখানো শুধু। ভয় পাইয়ে দেয় রীণাকে। সাঁ করে গভীর জলের দিকে গিয়ে আর্তকণ্ঠে ডাকছে, রীণা, রীণা—! অসহায়ের মত হাত-পা ছোঁড়ে, আর ঢোক-ঢোক জল গেলে। জলতলে তলিয়ে গেল একেবারে। রীণা ডুকরে কেঁদে উঠল। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভুস করে তার গা ঘেঁসে উঠে পড়েছে রজত। ডুব-সাঁতার দিয়ে চলে এসেছে।

চোখের জলে রীণা বলে, এমন ভয় দিতে পার! আচ্ছা, তোলা রইল সমস্ত। সাঁতার শিখে নিই—আমিও শোধ দেব ঠিক এমনি করে।

কৌতুকটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেছে দেখে রজত নরম হল। মাটির কলসি এনেছে একটা—কলসি উপুড় করে রীণা বুকের নিচে নিয়েছে। মাস্টার মানুষের মত রজত পাঠ দিচ্ছে: কলসি তোমায় জলের উপর ভাসিয়ে রাখবে, ডুবে যাবার ভয় নেই। পা দাপাও এইবার, দু-হাতে জল কেটে এগিয়ে চল। আমি পাশে পাশে থাচ্ছি গো—ডুবতে কিছুতে দেব না।

কিন্তু যে রক্ষক, সে-ই তো ভক্ষক। হঠাৎ এক সময় রজত ধাক্কা দিল রীণাকে। বুকের নিচের কলসি বেরিয়ে ভেসে চলে যায়। রজত উদ্দাম হাসি হাসছে। আর এদিকে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে রীণা ভেসে থাকবার চেষ্টা করে। রজত তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে রীণার উপর—জলের উপর তুলে ধরে, শোলার পুতুল যেন সে একটি।

ঘাটে এসে মাটির উপর পা রেখে রীণা জোর পায়। ঝগড়া করছে: যাও তুমি, খালি খালি বজ্জাতি তোমার—মাগো, কোথায় যাব—ঘাটে এসেও বেহায়াপনা!

কর্তব্যরত শিক্ষকের মতন গম্ভীর ভাবে রজত বলে, কলসি ধরে ভাসলেই তো হল না। কলসি ছেড়ে দিয়ে কী রকমটা হয়, পরখ করতে হবে না?

রীণা আরও রেগে বলে, রাখ চালাকি। আর ডাকব না তোমায়। ভারি কিনা ইয়ে! নিজে নিজে শিখব। নিজে শিখে তাক লাগিয়ে দেব, এই বলে যাচ্ছি তোমায়।

ফরফর করে সে বাড়ি চলল। ডেকে ডেকে রজত ফেরাতে পারে না।

সেই রাত্রে। শুয়ে আছে দুজনে মাঝের-কুঠরিতে। তক্তাপোশে ছারপোকা, মেঝের উপর পুরু করে বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে শোয়। রাত দুপুরে রীণা ধড়মড় করে ওঠে: উঃ, কিসে যেন কামড়াল বাঁ-হাতে। জ্বালা করছে।

রীণার শোওয়া খারাপ। পাশ ফিরেছে, সেই সময়ে হাতটা মশারির বাইরে আছড়ে পড়ল। কামড় দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে। রজতের গা ঝাঁকাচ্ছে রীণা: শুনছ? কিসে কামড়েছে আমায়। বড্ড জ্বলছে।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সন্ধ্যা থেকে চলছে। এমনি সব রাত্রে ঘুমোবার মজা। রাগ জড়িয়ে রজত কুঁকড়ি মেরে আছে। বিরক্তি লাগে এই সময় গোলমাল করলে। রীণার উপর খিঁচিয়ে উঠল: আঃ, কী লাগালে এখন! বিছেয় কামড়েছে, সয়ে থাক, একটু পরে সেরে যাবে।

হয়তো তাই। রীণা চুপচাপ থাকে একটুখানি। আবার কাতরে ওঠে: ওগো, বড্ড জ্বলুনি। যেন আগুন জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে হাত বেয়ে উপরমুখো উঠছে। ওঠ তুমি।

উপরমুখো উঠছে না হাতি! এতটুকু সহ্যশক্তি নেই।

গজর-গজর করতে করতে রজত উঠল। হ্যারিকেন টিপ টিপ করে জ্বলছিল—কেরোসিন নেই বোধহয়, সে ঘোড়ার-ডিম নিভে গেছে কখন।

রজত ডাকছে: ও ছোড়দি, ওঠ একবার। রীণাকে কিসে যেন কামড়াল।

দরজা-দেওয়া ঘর, বাইরে বৃষ্টির তোলপাড়। শোভা শুনতে পায় না। শুনলেই বা ঢুকবে কি করে ঘরের ভিতর। তবু ছোড়দি ছোড়দি করে রজত ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে মশারির ভিতর থেকে। ঘুমের মধ্যে নিজের সম্পর্কে হুঁশজ্ঞান ঠিকই আছে। বিছে হোক বা অন্য-কিছু হোক, মশারি থেকে বেরিয়ে এলে তাকেও কামড়ে দেয় যদি! এক বিপদের উপর নতুন বিপদ আবার না ঘটে।

চেঁচাতে চেঁচাতে অবশেষে শোভার কানে গিয়েছে। উঠে এসে সে দরজা ঝাঁকায়: কি হয়েছে রজত? দরজা খুলে দেবে তো আগে।

রজত বলে, আলো নিয়ে এস। আলো এনে ঐ জানলার কাছে উঁচু করে ধর। তার পরে আমি উঠছি।

শোভা আবার গিয়ে আলো ধরিয়ে আনল। খোলা জানলায় খানিকটা আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতরে।

রীণার আর্তনাদ তুমুল হয়েছে। মশারি থেকে বেরিয়ে রজত এক-ছুটে দরজার খিল খুলে দিল।

রীণার বাঁ-হাতটা নিয়ে শোভা আলোর কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। গৌরবরণ নিটোল বাহুমূলে যেন দাঁতের খোঁচা দুটো। রক্ত ফুটে বেরিয়েছে।

মেয়ের পিছু পিছু রাজলক্ষ্মীও এসে পড়েছেন। বললেন, তাগা বাঁধ শিগগির উপরের দিকটায়। কষে বাঁধন দে।

ঠাণ্ডা রাত্রে ঘুমের নেশা এখনও কাটে নি বোধহয় ভাল করে। বিরক্ত স্বরে রজত বলে, কাঁকড়াবিছেয় কামড়েছে, মাথা-তামাক ডলে দিলে সেরে যায়। তা নয়, সবসুদ্ধ তোমরা উতলা হয়ে পড়লে।

রাজলক্ষ্মী বলেন, যা দিতে হয় দিস এর পরে। বেঁধে রাখলে তো ক্ষতি নেই। যে বিষই হোক, উপরে উঠতে পারবে না।

দড়িটড়ি নিয়ে এস তবে। ঝঞ্ঝাট এই দুপুর রাত্রে!

রাজলক্ষ্মী বলেন, দড়ি এখন কোথায় খুঁজি? দড়ির চেয়ে কাপড়ের পাড় ভাল। পাড় দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধ।

ছেঁড়া কাপড় আন তবে একটা—

শোভা বলে, ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ে টেনে বাঁধতে গেলে ছিঁড়ে যাবে পটাস করে। শক্ত পাড় চাই।

রজত খিঁচিয়ে ওঠে: তবে আর কি! পরনের এই শান্তিপুরে ধুতির পাড় ছিঁড়ে দিই তবে?

রীণা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল: মরে যাচ্ছে একটা মানুষ—ধুতির দাম বেশি হয়ে গেল; কারও কোন জিনিস চাই নে আমি।

দাঁতে কামড়ে ধরল নিজের শাড়ির আঁচল; আর ডান হাতে প্রাণপণ বলে পাড়ের পাশ দিয়ে চিরে ফেলল।

রজত বলে, রাগ ষোলোআনার উপর আঠারোআনা। মরে যাবার কিছু তো দেখি নে। বিছের কামড়ে মানুষ মরে না।

রাগে রাগে আচ্ছা করে বাঁধন দিল দুটো। নরম শরীরে গর্ত করে পাড়ের বাঁধন কষে দিয়েছে। ঠিক হয়েছে, যেমন তেমনি!

তার পর ডাকাডাকি করে পরেশকেও ঘুম থেকে তোলা হল: জুড়ন ওঝার কাছে এক্ষুনি চলে যাও পরেশ। খবর কানে পেলে সে ছুটে আসবে।

সেটা জানা কথা। আসতেই হবে ওঝাকে, না এসে উপায় নেই। কিন্তু দালানের ভিতরে বসে হুকুম বেশ দেওয়া যায়, হুকুম মাত্রেই রাত্রিবেলা বিলপাড়ি দেয় কেমন করে? তা সে যাই হোক, চোখের সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। পায়ে পায়ে এগোল পরেশ।

বৃষ্টিটা নেই বটে, কিন্তু আকাশ থমথম করছে মেঘে। চোখে ঠাহর করে ডাঙার উপরেই পথ চলা দায়—আর ঐ তেপান্তরের বিল, জলে-জলে সমুদ্র হয়ে গেছে, জলের উপর আ'লের মাথা শুধু জেগে আছে দীর্ঘ বিসর্পিল কালো রেখার মতন। জায়গায় জায়গায় তা-ও নিশ্চিহ্ন। বিল-পারে জুড়ন ওঝার বাড়ি—আ'ল ধরে ধরে যেতে হবে সেখানে। পা এদিক-ওদিক হলে জলে

পাঁকে কোমর অবধি ডুবে যাবে। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙাও বিচিত্র নয়। সুখের কথা বলে দিলেই অমনি বিল ঝাঁপিয়ে ওঠা যায় না।

হরিতলা বিলের ঠিক উপরে। সেখানে একটা চালাঘর করে রেখেছে—পূজার্থীরা পূজার আয়োজন এনে রাখে সেখানে, নিজেরাও দায়ে-বেদায়ে আশ্রয় নিতে পারে। একটা বিড়ি ধরিয়ে পরেশ চালার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাতটুকু কাটিয়ে নেওয়া যাক। খুঁটি ঠেশান দিয়ে কাত হয়ে বসেছে। চোখও বুজে এল।

সাপে কেটেছে কানে গেলেই ওঝাকে কাজকর্ম ফেলে ছুটতে হবে। গড়িমসি করলে চলবে না। নিয়ম না মানলে মা-মনসা রুষ্ট হয়ে রইলেন, কোন এক সময় শোধ নিয়ে নেবেন। পথে-ঘাটে খাল-বিলে রাতবিরেতে কত ঘুরতে হয়, মনসাদেবীকে চটিয়ে রাখা চলে না। বয়স হয়ে গিয়ে কোন কোন ওঝা তাই ছুটোছুটির দায় এড়াবার জন্ত ছাগল ধরে তার কানের ভিতর মন্ত্র পড়ে দেয়। ছাগলের কানে দিলে মন্ত্র আর খাটবে না, অতএব বাতিল হয়ে গেল ওঝাগিরি। আর কেউ ডাকতে আসবে না তার পরে।

জুড়ন ওঝা এসে রোগি দেখে মাথায় হাত দিয়ে পড়ল: আরে সর্বনাশ, বাস্তুসাপে কেটেছে। বলি নি মা-ঠাকরুন, শঙ্খরাজ আর বঙ্করাজ দুটিতে আপনার বাড়ি আগলে থাকে—তাদেরই একটি। এতকাল ধরে আছে, কাউকে কিছু বলেছে কখনও? অনাচার অবহেলা কী দেখে ক্ষেপে গিয়েছে। ওরা ঠাণ্ডা না হলে তো বিষ নামানো মুশকিল। সরায় করে দুধ-কলা রেখে আসুন আগে বোধনতলায়। দেখা যাক।

ওঝা আরও এসেছে। যত বেলা হচ্ছে, এদিক-ওদিক খবর চলে যাচ্ছে—আরও সব এসে পড়ছে। আবার সুকুমার এসে পড়ল দুপুর নাগাত। শাশুড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, শোভাকে নিয়ে যাবে বলে এসেছে। এসে তো এই কাণ্ড। তখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে বীণার, মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুচ্ছে। হায়-হায় করছে সকলে। আহা, বউ তো নয়, লক্ষ্মী-প্রতিমা। রূপ ফেটে পড়ছে। অক্ষণে অলগ্নে গাঁয়ে পা দিয়ে আর হতভাগীর ফিরে যেতে হল না।

বিকালবেলা বীণা মারা গেল। কাল এমনি সময় বাগিচার পুকুরে জল-ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। কান্নাকাটি বেশি নয়—বাড়িসুদ্ধ, এমন কি নাটাপাছির গ্রামসুদ্ধ মানুষ যেন বজ্রাহত। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—অলীক মায়া বলে মনে হচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে বোধহয় সকলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কোন অঙ্গের এতটুকু বিকৃতি নেই—মরা কে বলবে, সারাবেলা ছটফট করে রূপসী বউ ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি এতক্ষণে।

আকাশ ভেঙে পড়েছে আবার—এত জল আছে আকাশে! তারই মধ্যে শবযাত্রার আয়োজন। রাত কাটিয়ে মড়া বাসি হতে দেওয়া হবে না। তাড়াটা রজতেরই বেশি। সইতে পারছে না সে মরা রীণাকে। বলছে, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে চুকিয়ে-বুকিয়ে দিয়ে এস সুকুমার-দা।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে শোভা ছুটে এল: রাখ, একটুখানি রাখ। রীণার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিল বড় করে। গায়ের গয়না সুকুমার খুলছিল, সোনা-বাঁধানো নোয়াটা শোভা খুলতে দিল না। যার জিনিস, যাক তার সঙ্গে পুড়ে। যত্ন করে দু-পায়ে আলতা পরিয়ে দিল। খোঁপা আলুথালু হয়ে পড়েছে—পাড়াগাঁয়ে-চলিত বিশাল পদ্মখোঁপা—শোভাই বেঁধে দিয়েছিল কাল সন্ধ্যায়। আয়নার পিছন দিকে আর একটা আয়নায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে রীণা কত খুশি! খোঁপাটা আঁটো করে আর-গোটাকয়েক কাঁটা গুঁজে দিল ঘন চুলের ভিতর। কয়েক পা পিছিয়ে রূপ দেখে বউয়ের। শেষবারের মতো দেখে নিল!

নদীর কি ভয়ঙ্কর চেহারা! শ্মশান ভেসে গিয়ে অনেকদূর অবধি বানের জল এসেছে। হু-উ-উ রবে স্রোত ডেকে চলেছে। একটা বড় তেঁতুলগাছের অদূরে জায়গা বেছে নিল। রীণারই জন্যে এই আনকোরা-নতুন শ্মশান। চিতা সাজাচ্ছে নদীর কিনারে। সুকুমার এসে পড়েছে ভাগ্যিস, নইলে এসব কে করত। এ দৃশ্য রজত সহ্য করতে পারে না, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে তেঁতুলতলায়।

সুকুমার এসে ডাকে: চান করাতে হবে এস।

আমি পারব না।

করতে হয় যে! এক কলসি জল তুমি মাথার উপর ঢেলে দেবে। তার পরে আমরাই সব করব।

হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রজতকে চিতার কাছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে জল ঢালল। জল ঢেলে কলসিটা ছুঁড়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে পালিয়ে গেল।

ক্ষণপরে সুকুমার আবার গিয়ে বলে, মুখাগ্নি করতে হবে রজত।

রজত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে: সোনার প্রতিমার মুখে আমি আগুন দেব? কিছুতে নয়, কিছুতে নয়, কিছুতে নয়—

পারব না। রীতিনিয়ম আমি মানি নে। কক্ষনো আমি পারব না—

বলতে বলতে তেঁতুলতলা ছেড়ে রাস্তার দিকে সে দৌড়ে পালায়। এমনি সময়ে বিষম কাণ্ড—কখনও যা কেউ শোনে নি। হুড়মুড় করে পাড় ভেঙে পড়ল অনেকখানি। স্রোতে তলদেশ ক্ষয়ে গিয়ে ফাটল হয়েছিল। না দেখে এরা সেখানে চিতা সাজিয়েছে। মাটি ধ্বসে পড়ল—সেই সঙ্গে চিতা ও শবদেহ চলে গেল নদীগর্ভে। শ্মশান-বন্ধুরা ছুটোছুটি করে এদিকে গিয়ে পড়েছে। একটি মানুষ কেবল পারে নি। হাবুডুবু খাচ্ছে, আঁকুপাঁকু করছে ডাঙায় উঠবার জন্য। ক্ষিপ্ত জলধারা আবর্ত রচনা করে ছুটেছে। অনেক কষ্টে অবশেষে কাত-হয়ে-পড়া আমগাছের একটা ডাল ধরে ফেলে মানুষটা বেঁচে গেল। চিতার খানকতক কাঠ টানের মুখে একবার ভেসে জলতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এইমাত্র দেখা যায়।

সুকুমার খিঁচিয়ে ওঠে: হল তো! অত অনিচ্ছা দেখে বীণাই নিলেন না তোমার আগুন। ডঙ্কা মেরে ভেসে চলে গেলেন।

রজত বলে, আমায় বাঁচিয়ে গেল ভীষণ একটা পরীক্ষার হাত থেকে। ভালই হল, আগুন আমি কিছুতে দিতে পারতাম না সুকুমার-দা।

প্রবীণ বহুদর্শী এক গ্রাম্যব্যক্তি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন: সত্যিই ভাল হয়েছে। আপনারা মানেন না আজকাল—কিন্তু কাটি-ঘায়ের রোগি পোড়াতে নেই। দেখছেন মরে গেছে—কিছু মরে না অনেক সময়, আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। লখিন্দরকে পুড়িয়ে ফেললে কেমন করে প্রাণ ফিরে পেত, দেখুন ভেবে কথাটা।

সেই রাত্রিটা কী মুশকিল যে রজতকে নিয়ে! শুয়েছে পাকা কুঠুরিতে বাইরের টিনের ঘরে। ফরাসের তক্তাপোশের উপর। সুকুমার পাশে শুয়েছে। জুটো বেঞ্চি জুড়ে পরেশ বাগ শুয়েছে অনতিদূরে। মশারি খাটিয়ে চারিপাশে ভাল করে গুঁজে দিয়েছে। কোথা থেকে একটা পেট্রোমাক্স জোগাড় করে আলো জেলে দিনমানের মতো করেছে। তবু রজত ঘুমাতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে চেঁচিয়ে ওঠে। অপর কাউকে ঘুমাতে দেবে না। ঘরময় সাপ দেখছে। সাপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ঘরের মেজেয়, দেয়ালে, চালের আড়ার গায়ে গায়ে। উড়ে বেড়াচ্ছেও বুঝি সাপ পাখনা মেলে—মশারির গায়ে পড়ে ছোবল মারছে।

রাতটুকু কোন রকমে কাটিয়ে সুকুমার সকালবেলা রাজলক্ষ্মীকে বলল, রজত তো আজকেই চলে যেতে চায় মা।

রাজলক্ষ্মী বলেন, অপঘাতে বউমা মারা গেল। ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা নিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়ে গেলে পারত ক'টা দিন থেকে।

আমি অনেক করে বুঝিয়েছি। একজনকে কামড়েছে বলে কি সবাইকে কামড়াবে? না, যখন তখন কামড়ে বেড়ায়?

শোভাও এসে পড়ল সেখানে: আমিও কত বললাম। মা বারোমাস আছেন এই বাড়ি। পরেশ থাকেন। কাউকে কিছু বলে না তো। সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। অদৃষ্টে লেখা থাকলে তবে তাকে কামড়ায়।

রজত গুম হয়ে শোনে। তার পরেও সেই এক কথা: যাব আমি আজকেই।

সুকুমার বলে, বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মতন ব্যাপার। দুর্বল স্বভাবের লোক—সে তো জানেনই। সারারাত্তির কাল যে কাণ্ড করেছে!

শোভা বলে, আমরা এক মতলব করেছি মা। রজত চলুক আমাদের সঙ্গে। ট্রেনে উঠতে হবে আমাদের স্টেশন থেকে—টেনেটুনে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, এমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। শহর জায়গা, সাপের ভয় নেই। ছুটিও অঢেল রয়েছে। যদি আটকে রাখতে পারি, শ্রান্তিশান্তি ওখানে হতে পারবে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি মত বলুন? আমরা তো মনে করি, এই ব্যবস্থা ভাল সকলের চেয়ে। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে।

মত না দিয়ে উপায় কি! সেই দিনই চলল রজত, এবং শোভারা। খেয়ায় নদী পার হয়ে গিয়ে ওপার থেকে পাকা-রাস্তা—মোটরবাস। বাস নিয়ে পৌঁছে দেবে মহকুমা শহরে। সেখানকার স্টেশনে ট্রেনে চেপে কলকাতা, দিল্লি, ভুবনের যেখানে যে জায়গায় খুশি।

ভাঁটা এখন, জল নেমে গিয়েছে। উদ্দাম নদী খানিকটা ঝিমিয়ে আছে এই সময়টা। খেয়ানৌকো সোজাসুজি যায় না, উজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উপর দিকে। মাঝনদীতে টানের মুখে যখন পড়বে, চক্ষের পলকে পাক খেয়ে তীরের বেগে পিছন পানে ছুটবে—মাঝি আর চার দাঁড়ি মিলে সামাল দিয়ে পারবে না। হাল ঠেলতে ঠেলতে মাঝি বলে, দেবতা যে কি ক্ষেপে গেছেন এবার! বৃষ্টির মোটেই বিরাম নেই। দুনিয়া ভেসে গেল। ধানক্ষেতে এক-কোমর জল।

হঠাৎ সুকুমার আঙুল তুলে দেখায়: কি একটা ভেসে আসে ঐ—

মাঝি চেয়ে দেখে নিরাসক্ত ভাবে। বলে, মড়া—

রজতের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। দেখছে তাকিয়ে নিষ্পলক চোখে। মড়া ভাসছে, ডুবছে—ভেসে ভেসে আসছে খেয়ানৌকার দিকেই।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, বীণা—চিনতে পারছ না সুকুমার-দা, বীণা ঐ যে!

সুকুমার বলে, মাথা খারাপ তোমার। কতদিনকার পচা মড়া—রীণা হতে যাবে কেন?

মাঝিও বলে, মানুষ-গরু কত এমন ভেসে যায়! হরবখত দেখে থাকি আমরা।

তবু কিন্তু প্রবোধ মানে না রজত। ভাসছে রীণাই। একবার ঐ যে ডুবে গেল—ভেসে উঠল আবার সঙ্গে সঙ্গে। অবহেলায় জলের উপর ভেসে ভেসে বাহাদুরি দেখিয়ে যায় যেন। নৌকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকুল দৃষ্টি রজত ফেরাতে পারে না: দেখ দেখ, সাঁতার দিয়ে চলেছে রীণা ভাঁটার স্রোতের সঙ্গে। এই পরশুদিন দেমাক করে যা বলেছিল, সেই কথাই রাখল তবে!

পার হয়ে গিয়ে বাসে উঠে রজত আর একটি কথাও বলে না। শোভা আর সুকুমার মুখ-চাওয়াচায়ি করে: সত্যি সত্যি পাগল হল নাকি? ছাড়া যাবে না কিছুতেই এ অবস্থায়। দু-চার দিন পরে খানিকটা শান্ত হলে তখন যেখানে হয় যাবে।

রেলস্টেশনে এসে বাস থামল। সাইকেল-রিক্সা ডেকে সুকুমার রজতকে বলে, ওঠ—

রজত অবাক হয়ে বলে, কেন?

নিজের রোজগারে নতুন বাড়ি করলাম, একবার সেটা চোখে দেখে যাবে না?

শোভা গিয়ে হাত ধরল। বলে, নাটাগাছি তো তিন মাস থাকতে। বোনের কাছে তিনটি দিন থেকে যাও অন্তত। আমার দেওর সুবোধ সোমবার কলকাতায় যাবে। তার সঙ্গেই যেও না হয়। একলা তোমায় ছাড়তে পারব না, সে তুমি যা-ই বল।

দুটো রিক্সা নিয়েছে। একটায় শোভা আর একটায় রজত ও সুকুমার। ছবির মতন খাসা বাড়িখানা সুকুমারের। ঝকঝক তকতক করছে। রিক্সা এসে দাঁড়াতে হাসিমুখে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সুকুমার বলে, আমার বোন সুসীমা। আর এই মানুষটি হলেন—কে বল তো সুসী?

সুসীমা ঘাড় দুলিয়ে বলে, জানি। কলকণ্ঠে আহ্বান করে, আসুন রজত বাবু। একা কেন, বউদি এলেন না?

বুদ্ধিমতী মেয়ে সুসীমা। প্রশ্নের পর থমথমে ভাব দেখে আন্দাজ করেছে গোলমেলে একটা-কিছু। শোভার ছোট ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি কোলে টেনে তাকে নিয়ে মেতেছে। প্রশ্নের জবাব তবু রেহাই হল না। ম্লান হেসে রজত

বলে, রীণার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? গাঙে সে মজা করে সাঁতার কাটছে, দেখে এলাম। ভাঁটায় দক্ষিণে সাগরমুখো চলে যায়, জোয়ারবেলা ফিরে আবার ঘাটে চলে আসে। নয় ছোড়দি? খুব ভাল সাঁতার দিতে শিখেছে।

সুসীমার চোখ ছলছল করে আসে। শোভা চুপিচুপি ননদকে বলে, ভাইএর আমার মাথা খারাপ না হয়ে যায়। আসতে কি চায়—জোর করে এনে তুলেছি।

সুকুমারের ভাই সুবোধ সোমবারে কলকাতা চলে গেল। রজত তার সঙ্গে গেল না। তারও দুদিন পরে সে রওনা হল—কলকাতায় নয়, নাটাগাছি মায়ের কাছে। রাজলক্ষ্মীর নামে শোভা ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে: সুসীমার সঙ্গে রজতের বিয়ে দিলে কেমন হয় মা? রজতের বোধহয় আপত্তি হবে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি রাজি হলে অশৌচ কাটিয়ে একেবারে বিয়েথাওয়া করে সুসীমাকে নিয়ে সে দিল্লি চলে যাবে। তোমার চিঠি পেলে ইস্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দেবে সুসীমা।

এ চিঠি ডাকে চলে গেছে। চিঠি পৌছবার আগেই যাচ্ছে রজত। খেয়া পার হচ্ছে গ্রামে পৌছবার আগে। আজকে ভরা জোয়ার। কী সর্বনাশ—কেউ আগে দেখে নি—কোথা থেকে পচা মড়া ভেসে এসে দাঁড়ে আটকেছে। শবদেহ খরস্রোতে বেঁকেচুরে লেপটে গেছে দাঁড়ের কাঠের সঙ্গে। দুর্গন্ধ, নাকে কাপড় দিতে হয়। রীণাই— তাতে কোন আর ভুল নেই। উলঙ্গ দু-পাটি দাঁত, চোখ দুটো কিসে খুঁড়ে খেয়ে গেছে—কিন্তু মুখ দেখে না-ই চিনুক, পদ্মখোঁপা রয়েছে মাথায়। শোভার হাতের বাঁধা বিশাল খোঁপা। রজতের সর্বদেহ থরথর করে কাঁপছে। ঢেউ ঘা দিচ্ছে নৌকার গায়ে—দাঁতের ছড়া বের করে রীণা যেন খলখল করে হাসে। দেহপিণ্ড দিয়ে দাঁড়ের মাথা জড়িয়ে ধরেছে—ফিরে যেতে দেবে না রজতকে আর গাঁয়ে।

পাগলের মতো রজত চিৎকার করে ওঠে: সরিয়ে দাও মাঝি লগির খোঁচা দিয়ে। আচ্ছা করে খোঁচাও—দাঁড় ছেড়ে ভেসে চলে যাক। কী আপদ, খেলা পেয়ে গেছে যেন নিত্যিদিন!

সতী

গাঁয়ের নাম সতীপাড়া, লোকের মুখে মুখে ছুতিপাড়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। মিত্তির-বাড়ির এক বউ সতী হয়েছিলেন। সতীঘাটও আছে। প্রাচীন এক বটগাছ। মুক্তেশ্বরী নদী অনেকটা দূরে সরে গেছে। নদী ঠিক বলা যায় না

এখন। বর্ষাকালটা ছাড়া জল চোখে পড়ে না—জঙ্গল। হোগলা কচুরিপানা আর হিঞ্চে-কলমির দাম এপার-ওপার ছেয়ে থাকে। গরু-ছাগল চরতে চরতে দামের উপর দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। ডাঙার দিকে হাত দুই-তিন জায়গা সাফসাফাই করে গৃহস্থরা সেখানে পাড়ার ঘাট বানিয়ে নেয়। জল যত কমে, ঘাটও সরতে সরতে তত দূরে চলে যায়। বাসন মাজার কাজটা চলে কোনরকমে। আর ননী মিস্তিরের মা নিস্তার-বুড়ি ওই পচা জল গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দুপুরের আহ্নিকটা সেরে যান ঘাটের গুঁড়ির উপর বসে। সতী-দাহ হয়ে গিয়ে মুক্তীশ্বরী গঙ্গাতুল্য হয়েছে।

এখন নদীর এই দশা। আর সেকালে খেয়া-নৌকায় পারাপারের সময় অতি-বড় সাহসীরও বুক কাঁপত। হ্যালিডে সাহেবের বর্ণনায় আছে। হ্যালিডে তখন জেলার কালেক্টর, নিজের চোখে দেখা অনেক ঘটনা তিনি বইয়ে লিখে গেছেন। তার মধ্যে সতীর কাহিনীও পাওয়া যায়।

বটগাছের পাশেই ছিল শ্মশান। লক্ষ মড়া পুড়েছে বলে মহাশ্মশান বলত। মড়া নামিয়ে রেখে শ্মশানবন্ধুরা বটতলায় বিশ্রাম নিত। জোয়ারের জল খলখল করত বটের শিকড়-বাকড়ের মধ্যে। মিস্তির-বাড়ির রামজীবন মারা গেলেন। প্রথম পক্ষের তিন ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি-নাতনিরা। শেষ বয়সে তিনি নতুন সংসার করেন। সে বউ রামজীবনের ছোট ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট। নতুন বউয়ের যথাশাস্ত্র বিধবার সজ্জা নেওয়ার কথা, কিন্তু সে আড় হয়ে পড়ল। চুড়ি ভাঙবে না, সিঁদুর মুছবে না, থান-কাপড় পরবে না, বিধবা হবে না সে কিছুতে।

তার পর আসল মতলব প্রকাশ হয়ে গেল। সতী হবে নতুন বউ, স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরবে। হাঁপানিতে ভুগে ভুগে রামজীবনের মেজাজ ইদানীং তিরিক্ষি হয়েছিল, সেবায় যত্নে নতুন বউয়েরও ঢিলেমি ছিল, হামেশাই তিনি চড়টা চাপড়টা মারতেন। বউও তার পুরোপুরি শোধ তুলে নিত—হাতে নয়, জিভে। ঝগড়ার চোটে বাড়িতে কাক বসতে পারত না। পাড়ার লোকে এই সম্পর্কই দেখে এসেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আর সেই স্বামীর শবদেহ যেইমাত্র উঠানে নামাল, বউ কিনা জেদ ধরে বলে, একলা পড়ে থাকতে পারব না, ওঁর সঙ্গেই যাব আমি।

ছেলে-বউরা বোঝাচ্ছে, বাবা বিস্তর দিন সংসারধর্ম করে সকল সাধ মিটিয়ে ষোলআনা সমস্ত বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেলেন, তুমি কোন্ দুঃখে এই বয়সে চিতায় উঠতে যাবে মা?

নতুন বউ কানে নেয় না। হাসিখুশি নিরুদ্বিগ্ন ভাব, কপাল জুড়ে সিঁদুর

দিয়েছে, টকটকে রাঙা-পাড় শাড়ি পরেছে। দু-চার ক্রোশ দূরের মানুষও ভেঙে আসছে সহমরণের ব্যাপার দেখতে। শ্মশানঘাট যেন মেলাক্ষেত্র। বউ-ঝিরা সব কৌটা ভরে সিঁদুর এনে একটুখানি নতুন বউএর কপালে ছুঁইয়ে সিঁদুর-কৌটা পরম যত্নে আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখছে।

এ সমস্ত হ্যালিডের বর্ণনা। তিনি তখন গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে তাঁবু খাটিয়ে আছেন। শীতকালে তখনকার দিনে কালেক্টর সাহেবরা সদর ছেড়ে গাঁয়ের উপর এসে থাকতেন। দারোগা-চৌকিদার মোতায়েন থাকত, সাহেবের জন্য কে কতদূর ভেট জোগাবে তাই নিয়ে রেশারেশি লেগে যেত জমিদার-তালুকদারের মধ্যে। অবস্থা এমনি। সেদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পাখি-শিকারে বেরিয়েছেন, পথের মধ্যে কে এসে বলল সতীর বৃত্তান্ত। সতীদাহ আইন পাশ হয় নি, তা হলেও অনুষ্ঠানের কথা কালেভদ্রে শোনা যায়। শিকার বন্ধ করে সাহেব শ্মশানমুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

জনতা তটস্থ হয়ে সাহেবের পথ করে দেয়। চিতার ধারে নতুন বউয়ের কাছে সোজা চলে গেলেন সাহেব। মুনসির মারফত কথাবার্তা। মুনসি সাহেবের কথা বউকে বোঝাচ্ছে, বউয়ের কথার ইংরেজি তর্জমা করে দিচ্ছে সাহেবের কাছে।

সাহেব বললেন, তুমি মরছ কেন?

বউ বলে, স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছি। স্বামী ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

আগুনে পুড়ে মরার কি কষ্ট, তোমার ধারণা নেই।

বউ হেসে বলে, খুব কষ্ট বুঝি? দেখি, প্রদীপটা আন দিকি তোমরা কেউ।

চিতায় ঘি ঢালছে। একটা বড় ঘৃতের প্রদীপে সাতটা সলতে ধরিয়ে দিয়েছে—ওই প্রদীপ থেকে চিতায় আগুন দেবে। বউয়ের কাছে প্রদীপ এনে রাখে। বাঁ-হাতের বুড়ো-আঙুলটা বউ প্রদীপের উপর ধরল।

হ্যালিডে লিখছেন: আশ্চর্য দৃশ্য। আঙুল কুঁকড়ে গেছে, মাংস-পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। বউ ফিরেও তাকায় না, হাসিমুখে কথা বলছে আমার সঙ্গে। আমি আর চোখে না দেখতে পেরে ফিরে চলে এলাম। লোক-মুখে শুনেছি, দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসতে হাসতে বউ আগুনের মধ্যে ঢুকে স্বামীর শব জড়িয়ে ধরে যেন আরামের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

নতুন বর-বউ গাঁয়ে ঢুকবার মুখে সতীঘাটে প্রথম পালকি এনে নামায়। বটগাছের গোড়ায় প্রণাম করে সতীমা'র আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। সেই সতীর

আমল থেকে নিয়ম চলে আসছে। মিত্তির-বাড়ির ননী মিত্তির আর টেঁপুরানীও অমনি সতীতলা হয়ে এসেছিল। কিন্তু হলে হবে কি—নবেল-পড়া একালের মেয়ে, পতিভক্তির সে-মন পাবে কোথা?

অঞ্চলের মধ্যে মানী ঘর মিত্তির-বাড়ি—যে বাড়ির বউ সতী হয়েছিলেন। অবস্থা পড়ে গিয়েছে এখন। দালানকোঠা ভেঙে পড়েছে, গাঁতিপটি নতুন আইনে সরকার খাস্ করে নিয়েছে। ধানজমিতে যে কয় কাহন ধান পাওয়া যায়, টেনেটুনে কোনগতিকে তাতে বছরটা চলে। সংসার ছোট। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে, নিস্তার-বুড়ি আর ননী। আর এই টেঁপুরানী বউ হয়ে এল। মানুষ কম বলেই নানান ফন্দিফিকিরে মা চালিয়ে যাচ্ছেন। চাকরি-বাকরি করে ননী যদি বাইরের দুটো পয়সা না আনে এবং তার উপরে খাওয়ার মানুষ বেড়ে যায়, সংসার একেবারে অচল হয়ে যাবে।

বিয়ের মাস কয়েক পরেই নিস্তার-বুড়ি নিজমূর্তি ধরলেন। টেঁপুরানীকে ডেকে বললেন, আমার ঘরে শোবে তুমি বউমা। রাতে দু-তিন বার উঠতে হয়। অন্ধকারে সেদিন বিষম আছাড় খেয়েছি। তুমি থাকলে আলোটালো জেলে দুয়োর খুলে দিতে পারবে।

ননীর আবার সেইদিন খুব মাথা ধরেছে। আর্তনাদ করছে। মায়ের প্রাণে মায়া হয় না কিন্তু। উল্টে করকর করে ওঠেন: রোজগার-পত্তর করে বউয়ের সাধআহ্লাদ কত মেটাচ্ছে কিনা—বউ যাবে এখন ওঁর মাথা টিপে দিতে! বয়ে গেছে। শুয়ে পড় বউমা, যেতে হবে না।

কিন্তু শেষরাত্রের দিকে জেগে উঠে বুড়ি দেখলেন দুয়োর খোলা, বউ ঘরে নেই। ব্যস্ত হয়ে ছেলেকে ডাকছেন: উঠে পড় ও ননী, বউকে দেখছি না। বউ কোথা চলে গেল।

কি আশ্চর্য, ননীও যে সাড়া দেয় না। ঘরে নেই নাকি? শীতের মধ্যে ঠুরঠুর করে কাঁপতে কাঁপতে নিস্তার-বুড়ি বাইরে খুঁজতে বেরুলেন।

পরবর্তীকালে এই নিয়ে টেঁপুরানী হাসাহাসি করত: ভূত-পেত্নী যে সে-রাত্রে বুড়ির ঘাড় মটকায় নি, সেই তার ভাগ্য।

জ্যান্ত ভূত আর জ্যান্ত পেত্নী—ননী মিত্তির ও টেঁপু—পোয়াল-গাদার পাশে দুজনে গায়ে গায়ে বসে আছে—হাত দশেক দূর থেকে নিস্তার-বুড়ির তা চোখে পড়ল না। চোখে না-ই দেখুন, বুড়ি একেবারে ক্ষেপে গেলেন এই ঘটনায়।

মাগী-মরণে বেলায় তো এক সের করে চাল টানছিল। শুচ্ছেরখানেক পঙ্গপাল এসে পড়ে আউড়ির ধান ফুঁকে দেবে, তার পরে আমার উপায়টা

কি? কার দুয়োরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াব? কথা না শুনবি তো বিদেয় হয়ে যা বাড়ি থেকে। সংসারধর্মে আমার কাজ নেই।

পাড়ার লোকে হাসাহাসি করছে। ননী গরম হয়ে বলে, বিদেয় সহজে হব না। তোমায় অন্তর্জলীতে শোয়াই আগে, তার পরে।

কিন্তু মুখেরই হম্বিতম্বি। ঘরবাড়ি জমি-জমা সমস্ত নিস্তার-বুড়ির নামে। দিনরাত বুড়ির বকর-বকর চলছে: চলে যা বাড়ি থেকে। চাকরি-বাকরি কর গিয়ে।

চাকরি কোথায় কে ভাগা দিয়ে রেখেছে?

চেষ্টাচরিত্র করে দেখবি তো? বাড়ি বয়ে কে হাতে তুলে দিয়ে যাবে? বউয়ের আঁচলের তলায় পড়ে থাকতে লজ্জা করে না?

মায়ের তাড়া খেয়ে দু-দণ্ড বউএর কাছে জিরোবে, সে জো নেই। টেপুরানী চালাক মেয়ে, সেবাযত্ন করে ইতিমধ্যে শাশুড়ির খানিকটা মন পেয়েছে। তারও মুখেও নিস্তার-বুড়ির ওইসব কথা। তার মুখের কথা বরঞ্চ বেশি কটু।

ভাত তোমার নামে গলা দিয়ে?

গলার কোন্ অসুখ হল, কেন নামবে না?

উঠতে বসতে এইরকম খোঁটা—

ননী বলে, খোঁটা দিয়ে আমার কি করবে? ভাতের সঙ্গে যখন ঝাললঙ্কা কিম্বা চিরেতা মেশাবে, সেই সময় গেলার কষ্ট হতে পারে। তার আগে নয়

অবিরত খিচিমিচিতে এ হেন লোকেরও অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গায়ে জামা চড়িয়ে বেরুল একদিন দুর্গা-দুর্গা বলে। কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই বাঁড়ির ছেলে আবার বাড়ি এসে হাজির। কোথায় চাকরি! বলে, না শিখেছি লেখাপড়া, না জানি শয়তানি-ফেরেব্বাজি। আমায় কোন্ হতভাগা চাকরি দিয়ে পুষতে যাবে?

নিস্তার-বুড়ি এবারে বউকে ঠেস দিয়ে কথা শোনান: ডাকিনী! আমার বেটাকে গুণ করেছে। কি করি, দালানের ইট খুলে খুলে না বেচলে সংসার চলার উপায় দেখি নে।

যখন তখন এমনি সব কথা। ননী বলে, অনেক খাচ্ছি তোমার মা। আচ্ছা, আজ থেকে ছেড়ে দিলাম।

ননী দুধ খায় না, মাছ খায় না। পাতের কোলে দিলে পড়ে থাকে। পিণ্ডি-রক্ষার মত চাট্টি ভাত নুন দিয়ে মেখে মুখে দিয়ে উঠে পড়ে।

বউকে বলে, আমি মাছ খাচ্ছি নে, তুমি কোন আক্কেলে খাও শুনি?

পয়সার জিনিস ফেলি কি করে? তোমার ভাগটাও খেতে হয়। ডবল খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

আমার দিকে নও তুমি। বেশ, জেনে রাখলাম।

টেঁপুরানী বলে, মা আর তুমি কি আলাদা? আমি সকলের দিকে।

ননী গরম হয়ে বলে, এই মিত্তির-বাড়িরই বউ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। একালের তুমি আর এক বউ।

টেঁপু ভালমানুষের ভাবে বলে, শুনেছি সে বউ মোটে নিরামিষ খেতে পারতেন না। সেই ভয়ে মরলেন। আমারও তাই। খাবার পাতে মাছ একটুখানি চাই। নিদেনপক্ষে আঁসটে-জল।

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলে: বলতে নেই। তোমার এমন-তেমন হলে আমারও সতী হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

নুন-ভাত চলছে দিনের পর দিন। আর নিস্তার-বুড়িরও যেন জেদ চেপে গেছে। মাছ আরও বেশি বেশি আসছে। রকমারি মাছ রান্না করে থালার পাশে বাটি সাজিয়ে দেন। ননী চোখ ঘুরিয়ে দেখে নেয় একবার। তার পর নুন-ভাতের দু-চারটে দলা মুখে পুরে উঠে পড়ে। টেঁপুরানী কোন্ দিকে বিড়ালের মত ওৎ পেতে থাকে, মাছের বাটিগুলি রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে পা ছড়িয়ে স্বামীর প্রসাদ পেতে বসে যায়। কাঁটা চিবানোর কচর-মচর আওয়াজ পাওয়া যায় বাইরে থেকে।

চলল এমনি মাসাবধি। বৈশাখ মাস। কচি আম ফলেছে গাছে। ননী বউকে বলে, আমের ঝোল রেঁধো, তাই দিয়ে আজ ভাত খাব। গাছের আমে তো মায়ের পয়সা লাগবে না।

বিকালবেলা পুকুরঘাটে কলসি রেখে টেঁপুরানী একটা জিওল-কচা ভেঙে নিয়ে আমের ডালে বাড়ি দিচ্ছে। আর, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই কি সন্ধ্যা হবে? শাশুড়ি কোন্ দিক দিয়ে এসে বলেন, গুঁটি পেড়ে নষ্ট করছ কেন বউমা?

টেঁপু ভয়ে ভয়ে বলে, অম্বল রাঁধতে বলেছে।

তা বুঝেছি। এস, বাড়ি চলে এস তুমি। বউমানুষ এলোচুলে গাছতলায় ঘোরে না।

যে কটা গুঁটি পেড়ে ফেলেছিল, নিস্তার-বুড়ি ঝুপ-ঝুপ করে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিলেন।

অনেক রাত্রে ননী বাড়ি ফিরল। বুড়ি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন, টোকা দিতে বউ দরজা খুলে দিল। রোজই সে রাত করে বাড়ি ফেরে, টেঁপু বকে

বলে ঝিমোয়। শাশুড়ি ঘুমিয়ে থাকেন, এই একটুখানি সময় বরের সঙ্গে চুপিচুপি দুটো কথা বলবার। আজ টেঁপুরানী ভেবে রেখেছে, হাতে-পায়ে ধরে যেমন করে হোক ননীর রাগ ভাঙাবে। বাটি থেকে মাছ তুলে জোর করে তার মুখের মধ্যে গুঁজে দেবে: বুড়োমানুষ মা মনের দুখে ওই সব বলেন, তাই বুঝি মনের মধ্যে গেরো দিয়ে রাখতে হয়? ছিঃ!

ভাতের থালার চারিপাশে যথারীতি তরকারির বাটি। ননীর কেমন সন্দেহ হয়েছে। গোড়াতেই বলে, আমের ঝোল কই?

আছে। খেয়ে নাও এ সমস্ত। আজ তোমায় ছাড়ব না, খেতেই হবে।

আগে অম্বল নিয়ে এস—

নিস্তার-বুড়ি নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, নেই—আমি রাঁধতে দিই নি। কুঁড়ের অম্বলে টান। এক পয়সার মুরোদ নেই, লজ্জা করে না ফরমায়েস ঝাড়তে?

আজ ননীর কি হয়েছে—মায়ের কথার জবাবে কটমট করে সে বউয়ের দিকে তাকাল: আমি মাছ খাই নে, তাই বড্ড জুত হয়েছে তোমার। মাছের বাটি নিয়ে বসবে? বসাচ্ছি তাই।

ঝনঝন করে চতুর্দিকে বাটি ছুঁড়ে দিল। মায়ের চোখের সামনে। আর গজরাচ্ছে টেঁপুরানীকে উদ্দেশ করে: মাছ কখনও না খেতে হয় তাই আমি করব। বুঝবে সেই সময়।

নিস্তার-বুড়ি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তার পরে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছেন। পাড়ার মানুষ ঘরে শুয়ে বলাবলি করে, ওই—লেগে গেল আবার মিত্তিরবাড়ি।

ননী এক-ছুটে পুবের কোঠায় নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা দিল। টেঁপুরানীর ভয় লাগে আজ বড়। আরও অনেকক্ষণ পরে শাশুড়ি গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছেন, টিপি টিপি সে দরজার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকছে: লক্ষীটি, দুয়োর খোল। শোন সব কথা। আমার কি দোষ?

সাড়া নেই। শাশুড়ি পাছে জেগে ওঠেন, টেঁপুও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখের পাতা এক করে নি, সারারাত্রি ছটফট করেছে। সকালবেলা উঠানে ছড়া-ঝাঁট দেবার মধ্যে উঁকি দিয়ে পুবের কোঠা বারকয়েক দেখে এসেছে। দরজা বন্ধ। এত বেলা অবধি কখনও ননী শুয়ে থাকে না—মায়ের বচনের ভয়ে ভোর থাকতে উঠে নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে সরে পড়ে।

তার পর এক সময় নিস্তার-বুড়ির নজরে পড়ে। অগ্নিমূর্তি হয়ে তিনি

দুয়োর বন্ধ করে কাঁদছেন। শিয়রের একটি মাত্র জানলা, সেটাও বন্ধ। বৈশাখের এই গরমে জানলা এঁটে ঘরের মধ্যে বাক্সবন্দি হয়ে রয়েছে—জানলার ফুটোয় চোখ রেখে টেঁপুরানী দেখে। দেখে আর্তনাদ করে উঠল।

ননী গলায় দড়ি দিয়েছে।

পাড়ার মানুষ ধাক্কাধাক্কি করে দরজা ভাঙল। গোয়ালের গরু ছেড়ে দিয়ে দড়ি এনেছে, সেই দড়ি গলায় বেঁধে আড়ায় ঝুলে আছে। চোখের ঢেলা দুটো ঠিকরে বেরিয়েছে গর্ত থেকে। তাকিয়ে দেখা যায় না।

নিস্তার-বুড়ি দুমদুম করে বুকে কিল মারছেন। মাথার চুল ছিঁড়ছেন। শাপশাপান্ত করছেন দুনিয়ার মানুষকে—যারা ননীকে কাজকর্ম দেয় নি। বউকে গালি পাড়ছেন: স্ত্রী-ভাগ্যে ধন—তা এমন পোড়াকপালী বউ, জলজ্যান্ত স্বামীকেই চিবিয়ে খেল শেষ পর্যন্ত।

ক'টা দিনের মধ্যে টেঁপুরানীর আলাদা চেহারা। থান-কাপড় পরেছে, হাতে চুড়ি নেই, সিঁথির সিঁদুর মুছেছে। শাশুড়ির সঙ্গে একবেলা নিরামিষ খায়। খেতে খেতে টেঁপুরানীর মনে আসে, ননী যা বলেছিল সত্যি সত্যি তাই করে ছাড়ল—মাছ-খাওয়া ঘুচিয়ে দিল জন্মের মতো। পাড়ার গিন্নিরা কিন্তু টেঁপুর দিকে। ফুটফুটে কচি বউটার মুখ চেয়ে মায়া হয়। বলেন, অত কড়াকড়ি কোর না ননীর মা। নরুণপেড়ে ধুতি পরুক, গলায় সরু মবচেন থাকুক, নিরামিষটা থাক—কিন্তু দুবেলা। নয়তো পিত্তি পড়ে পুড়ে ছেলেমানুষের শক্ত অসুখ করবে। বলে কত পাঁচ ছেলের মা বিধবা হয়ে চুরি করে মাছ-মাংস খেয়ে দফা মারছে—তুমি আবার আচার দেখাতে যাচ্ছ!

নিস্তার-বুড়িও নরম হবার মেয়েমানুষ নন। বলেন, আর যেখানে যা হবার হোক, এ-গাঁয়ে নয়। এ-বাড়ি তো নয়ই। স্মৃতিপাড়ার মিত্তিরবাড়ি এটা—সতীঘাট আমার বাড়ির নিচে।

যা বলছেন টেঁপুরানী করে যাচ্ছে, একটা জিনিস কেবল পারে না। কিছুতে পারবে না। ঘনকৃষ্ণ মাথার চুল—এলো করে ছেড়ে দিলে পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে যায়। বড় দেমাক তার চুল নিয়ে—চুলের উপর ভারি যত্ন। সেই যখন ছোট্ট খুকিটি ছিল, তখন থেকেই। তার সেই একপিঠ চুল কেটে কদম-ছাঁটা করে দেবে নাকি।

নাপিত এসে গেছে, ভাঙা-রোয়াকের উপর বসেছে। টেঁপু ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা দেয়। কাঁপছে থরথর করে। বাঘ যেন হামলা দিয়ে এসে পড়েছে। শাশুড়ি বচন ছেড়ে দিয়েছিল—অশ্লীল অকথা-কুকথা: আসল

মানুষ গেল তো সবই শেষ হয়ে গেল। চুল বেঁধে, পাতা কেটে, বাহার করে কাকে দেখাবি? কার মন ভোলাবি?

এমনি সময় বড়মামি—ডেকে দিলীপ এল উঠানে। ছোঁড়া সীতাপতি ঘোষের ভাগনে—কলকাতায় থেকে আইন পড়ে, গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি আম খেতে এসেছে। মানুষ দেখেও নিস্তার-বুড়ির ঝগড়া থামে না। বলছেন, দেখ বাবা, এ-বাড়ির বউ সহমরণে এক চিতায় পুড়ে মরল, আর এই মুখপুড়ি সামান্য চুলের মায়া ছাড়তে পারে না।

দিলীপ গম্ভীর হয়ে বলে, চিতেয় পুড়েছিল বড়মামি ঠিক এইজন্যেই। রামজীবনের বউয়ের ভাল চেহারা ছিল। বিধবা হলে মাথা ন্যাড়া করে শাঁখা-চুড়ি ভেঙে শাঁকচুন্নি বানাবে, সেই ভয়ে বউ আগুনে ঝাঁপ দিল।

ননীর মা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, তোমরা সবাই একেলে বিচ্ছু। সতীর কুচ্ছোকথা বললে জিভ খসে পড়বে দেখো।

দিলীপ আরও গম্ভীর হয়ে বলে, আর হতে পারে, কর্তার বুড়ো বয়সের বউ বলে আগের পক্ষের ছেলেরা দেখতে পারত না। রামজীবন অন্তে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। না খেয়ে পথে পড়ে মরত। ভেবেচিন্তে বউ তাই আপোসে সতী হয়ে নামযশ করে নিল। ঠারে-ঠোরে হ্যালিডে সাহেবও এই রকম লিখে গেছে বড়মামি।

এসেছিল দিলীপ ঐ নাপিতের খোঁজে। শহুরে মানুষ, থুতনিতে একটু ক্ষুর ঠেকিয়ে দিলে টক করে নগদ সিকি ছুঁড়ে দেয়—নাপিত দিলীপের পিছু পিছু উঠে গেল। চুলকাটা মুলতুবি রইল। ভগ্নিপতির আত্মহত্যার খবর পেয়ে সেইদিন আবার টেপুর বড়দাদা এসে পড়লেন। নিস্তার-বুড়িকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বিশ-পঁচিশ দিন থেকে শোক কিছু শীতল হলে আবার টেপু শ্বশুরবাড়ি ফিরবে।

তিন মাস কাটল। নিস্তার-বুড়ি চিঠিও দিয়েছেন। বউয়ের কুশল খবর পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কবে আসবে সঠিক কিছু লেখে না। তার পর চিঠি এল, কলকাতায় গেছে টেপুরানী তার কোন মাসিমার কাছে। নিস্তার-বুড়ি আগুন। মিত্তিরবাড়ির বিধবা বউ হুট করে শহরে বেরিয়ে পড়ল, যত ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানা যেখানে। শাশুড়িকে মুখের কথাটা বলারও পিত্যেশ হল না। এত বড় দুঃসাহস! শূন্যে ঝাঁটা তুলে ধরে চিৎকার করছেন: দেখুক একবার এ বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে। এই ঝাঁটা। বাড়িঘর জমাজমি সমস্ত আমার নামে—খেয়াল থাকে যেন।

বছর ঘুরল। বুড়ি একা গজর-গজর করেন। বউ আছে পড়ে কলকাতায়।

শ্বশুরবাড়ি এসে ঝাঁটা খাবার জন্তে উঁকিঝুঁকি দেয় না উঠানে। আবার শোনা গেল, কোন ট্রেনিং-ইস্কুলে নাকি পড়ছে। পাশ হলে ষাট-সত্তর টাকার মাস্টারি চাকরি হবে। ননীর জন্ম যে মাইনে স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। যোগাড়যন্তর করে দিয়েছে নাকি সেই ছোঁড়া—দিলীপ।

ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা এখন পাকা হয়ে গেছে। মুক্তীশ্বরীর কিনারা ধরে পথ। পয়সাওয়ালা লোক গাঁয়ে আসতে হলে সদর থেকে সোজা ঘোড়ার-গাড়ি করে আসে। একদিন সকালে অমনি এক ঘোড়ার-গাড়ি এল।

সতীঘাটের বটতলায় এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল টেপু, দিলীপ চৌধুরি আর ফুটফুটে এক বাচ্চাছেলে দু-বছরের। টেপু নয় এখন—তপতী। তপতী চৌধুরি। দিলীপ চৌধুরি সদরে মুনসেফ হয়ে এসেছে। মামাতো বোনের বিয়ে—সেই উপলক্ষে মামার বাড়ি এল অনেক বছর পরে। সামাজিক গণ্ডগোলের কথা একটু-আধটু উঠেছিল। কিন্তু মামা হুঙ্কার ছাড়লেন: সোনার-টুকরো ভাগনেকে আমি বাদ দিতে পারব না। তাতে আমার বাড়ি কেউ যদি না খান, কি করতে পারি! তার পরে সব চুপ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ছেলেরাও এই মামার দিকে—বুড়ো মুরুব্বিরা তাদের সামাল দিয়ে পারেন না। উদ্যোগী কেউ কেউ আবার সদর অবধি গিয়ে দিলীপদের ডেকে এসেছে: আসুন চলে আপনারা। এই নিয়ে কে ঘোট পাকাতে যায়, দেখব।

ঘোড়ার-গাড়ি থামিয়ে তপতী বটতলায় গড় হয়ে প্রণাম করে। প্রণাম করে উঠে খিলখিল করে হাসে: সেই সেবারেও বলেছিলাম, বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়। তুমি কানে নিলে না সতী-মা। এবারে শুনো। নয়তো বড্ড বদনাম হয়ে যাচ্ছে।

পিছন থেকে দিলীপ টিপ্পনী কাটে: আর বয়সও তো হয়ে যাচ্ছে।

রোষ-ভঙ্গিমায় তপতী তাকাল স্বামীর দিকে। দিলীপ বলে, সতী-মা হিংসে করছেন তপু। কি ভুলই করেছিলেন! একালের মেয়ে জীবন আঁকড়ে রইল—মরে শেষ করে দিল না।

তপতী ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, দুঃখ করছেন সতীমা। কৃপণ ছিল ওঁদের সেকাল। তখন পারত এমনি ট্রেনিং পাশ করে মাস্টারি করতে—বেড়াতে, খাটতে, ভোট দিতে পার্লামেন্টে? ওঁদের জায়গা ছিল বাড়ির ঘেরটুকুর মধ্যে, ওঁদের সম্বল শুধুমাত্র স্বামী। আজ স্বামী ছাড়াও কত দিকে কত পথ খোলা—

একটু থেমে দিলীপের দিকে কৌতুক-চোখে চেয়ে বলল, হরেক রকম সম্পত্তি আজ আমাদের। তার ভিতরে স্বামী হল একটি।

দেবশিশুর মতো ফুটফুটে ছেলে-কোলে স্বামীর হাত ধরে তপতী আবার গিয়ে গাড়িতে বসল। বনজঙ্গলে-ঘেরা সেই পুরানো শ্বশুরবাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

নিস্তার-বুড়ি তখন রোদে বসে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন। কাজ ফেলে আমতলায় দাঁড়িয়ে দেখলেন লুকিয়ে লুকিয়ে। ঝলমলে রূপের ঐ বউ গাড়ি থামিয়ে এ-বাড়ির উঠানে কেন—ঘরের মধ্যেও যদি জুতো মসমস করে ঢুকে পড়ত, ঝাঁটার হাত উঠত না তার সামনে। ঝিম হয়ে বসে বসে ভাবছেন। দু-বিঘা ধান-জমি দখল করেছে প্রতাপান্বিত ঘোষেরা। ঐ দিলীপ-হাকিমের এজলাসেই মামলা। বউকে গিয়ে সুপারিশ ধরলে কেমন হয়—আগের সম্বন্ধ মনে করে স্বামীকে যদি একবার সে বলে দেয়।

নতুন বউ অলকা

ছেলে বলল, আপনার সঙ্গে কথা আছে বাবা।

কলেজের বই, না টেনিসের র‍্যাকেট?

সে-সব কিছু নয়।

মুখের চুরুটটি হাতে নিয়ে নৃত্যলাল বললেন, তবে আবার কি? বেশ, বলে ফেল।

অলকাদের সম্বন্ধে বলছিলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে নৃত্যলাল বললেন, অলকাটা কে হে?

প্রতুল বলে, আপনি জানেন না বুঝি! ছোটমামির ভাইয়ের মেজ মেয়ে; সেই যে গেল-বছর স্কলারশিপ পেয়ে পাস করল।

ওঃ! তা অলকা বোঝা গেল, কিন্তু তাদের মানে আর কে কে?

প্রতুল রাগ করে বলে, তার বাবা মা ভাই বোন—আর ওদিককার ছোটমামা ছোটমামি—

সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাবে—হ্যাঁ? ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, খুব সংক্ষেপে সারো। আমার কাজ আছে।

প্রতুল বলে, অলকাকে আমি দেখেছি।

ভাল।

আমি মনস্থির করে ফেলেছি—ধরুন, এক রকম মত দিয়েই ফেলেছি।

চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নৃত্যলাল বললেন, মনস্থির আমিও

করেছি। আজ নয়—অনেকদিন, তোমার জন্মের আগে থেকেই। কাজেই ও বিয়ে হবে না, তোমার ছোটমামা যতই বলুক।

প্রতুল বলে, অলকা দেখতে খারাপ নয়।

যদি খারাপই হয়। তুমি কি-এমন লাটসাহেবের বেটা যে স্বর্গের অপ্সরী নইলে ঘরে মানাবে না।

ভ্রূকুটি করে চেয়ে থাকেন: খারাপ চেহারার মেয়ের বিয়ে হয় না, বলি খারাপগুলো পড়ে থাকে নাকি?

তবে আপত্তি কেন?

তুমি পছন্দ করবে, আমি ঘাড় হেঁট করে তাই মেনে নেব—এইটে উচিত, না আমার পছন্দ তুমি মানবে এইটে উচিত? জিজ্ঞাসা করি, নৃত্যলাল প্রতুলচন্দ্রের বাবা—না, প্রতুল নৃত্যলালের বাবা?

প্রতুল বলে, আজ নূতন কথা বললে হবে কেন বাবা? বরাবর বলেছেন, আমাদের স্বাধীন মত জেগে উঠবে—আপনি তাই চান।

নৃত্যলাল বললেন, এক-শ বার চাই। ভেড়ার পালের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ জন্মাক, কে চায় না শুনি?

তা হলে?

এ তো তোমার একলার কোন ব্যাপার নয় বাপু। তোমার বিয়ে দিয়ে যাকে আনব, সে কেবল তোমার বউ হবে না—আমাদের হবে পুত্রবধূ, তোমার বোনেদের হবে ভাজ, এত বড় সংসারের হবে অন্নপূর্ণা। তা হলে একলা তোমার মত থাকলে কি হবে? সকলের মতামত চাই।

সুহাসিনী ঘরে ঢুকে বললেন, কি তোমাদের বচসা হচ্ছে? ও খোকা, বলছিস কি?

প্রতুল বলে, আমার আজই বোর্ডিংএ ফিরতে হবে, তাই বলছি। ভোট নিয়ে বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।

জোরে জোরে পা ফেলে সে বেরিয়ে গেল। নৃত্যলাল হেসে উঠলেন।

সুহাসিনী বললেন, কি হয়েছে?

নৃত্যলাল বললেন, যে বয়সের যে পাগলামি। আমি করেছিলাম, ও করবে না কেন। আমিও বাবাকে গিয়ে বলেছিলাম, শিবানীর সঙ্গে বিয়ে না দেন তো সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

সুহাসিনী কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি কি বললেন?

তিনি হলেন মুকুন্দ রায়, সোঁদরবনের বাঘ—আমার মতন এই রকম আধঘণ্টা তর্কাতর্কি করবার মানুষ তিনি! সংক্ষেপে বললেন, তাই যাস।

মাঝখানেকের মধ্যে দেখি, আত্মীয়কুটুম্বে বাড়ি বোঝাই, রশুনচৌকি বাজছে, গোয়ালবাড়ির পাশে ঐখানটায় হাঙর-মুখো পাল্‌কি এল। বাবা বললেন, ভালয় ভালয় উঠে বসবি—না এত লোকের মধ্যে কানে হাত দিতে হবে? উঠে বসলাম—তার পর চিত্তির-করা পিঁড়ির উপর বসে ভয়ে ভয়ে মন্তরও পড়লাম।

সুহাসিনী বললেন, কিন্তু সেই শিবানীর সঙ্গে বিয়ে হলেই হয়তো ভাল হত।

নৃত্যলাল আগুন হয়ে বললেন, কোন্‌ শত্তুর এ কথা বলেছে, জিজ্ঞাসা করি? আমার যা ভাল হয়েছে, তোমার ঐ তেজীয়ান ছেলের ভাগ্যে তার সিকির সিকি হোক দিক। তাইতো ঠিক করেছি, আর-দশটা কাজে যা-ই হোক, বিয়েথাওয়া হবে বুড়োদের কথায়। দেখ তো অন্যায়টা—জলজ্যান্ত একটা বউ ঘরে এনেছি, তিরিশ বছর তার সঙ্গে সংসার করে ঝুনো হয়ে গেলাম। আমি মেয়ে বাছতে পারব না, পারবেন উনি আর ওঁর বন্ধু-বান্ধবের দল!

দিন-কুড়িক পরে নৃত্যলাল দুপুরবেলা দোতলার ঘরে শুয়ে চোখ বুজেছেন, এমন সময় সুহাসিনী গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত নেড়ে চুড়ি বাজিয়ে তিনি শব্দ-সাড়া দিলেন, জড়িত স্বরে কর্তা বললেন, কি?

চিঠি এসেছে।

এখানে রাখ কোথাও।

সুহাসিনী বললেন, কালীপদ লিখেছে, খবর আছে।

কর্তা চোখ খুললেন: চিঠি যখন এসেছে, খবর তো আছেই।

তার পর স্ত্রীর মুখ-চোখের দিকে চেয়ে বললেন, জরুরি খবর?

সুহাসিনী বললেন, খোকার বিয়ে পঁচিশে তারিখ।

নৃত্যলাল বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসলেন: দয়া করে খোকার ছোটমামা তাই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে? পড় দিকি শুনি।

সুহাসিনী চিঠিখানা ছুঁড়ে দিলেন, চোখ ভরে জল এল। বললেন, আমি পারব না, তুমি পড় গে। পেটের ছেলের বিয়ে, পর-অপরের মতো খবর দিয়েছে দেখ।

কর্তা চশমা চোখে দিয়ে গম্ভীর ভাবে চিঠির আগাগোড়া পড়লেন। তার পর আরও একবার পড়লেন। সুহাসিনী বললেন, এখন কি করবে?

যেতেই হবে, খোকার বিয়ে যখন।

গিন্নির মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, রাগ করছ কেন, তোমারই ভাই লিখেছে। রাগ করলে কুটুম্বিতে চটে যাবে।

সুহাসিনী বললেন, বয়ে গেল। পেটের সন্তানের চেয়ে আর কেউ আপনার নয়। তাকে যে পর করে নিয়ে গেল, সে ভাই নয়—শত্রু।

কর্তা উঠে দাঁড়ালেন।

কোথায় চললে?

নবীনকে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিই।

কেন?

ছেলের বিয়ের বরযাত্রী যেতে হবে না?

নৃত্যলাল ম্লান হাসি হাসলেন। বলতে লাগলেন, মাঝে চারটে পাঁচটা দিন আছে। ধোপা কালই কাপড় দিয়ে যাবে। অন্ততপক্ষে পরশু সকালে রওনা হতে হবে। দু-একদিন আগেই যাই।

নিজের ঘরে গিয়ে সুহাসিনী চোখা চোখা কথায় ভাইকে চিঠি লিখতে বসলেন।

...তোমার সন্তান নাই; সেইজন্য খোকাকে তোমাদের ওখানে সর্বদা যাতায়াত করিতে দিই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ছেলে বিলাইয়া দিই নাই। আমাদের প্রথম সন্তানের বিবাহ—বাড়ির প্রথম কাজ, মনে মনে কত সাধ-বাসনা ছিল। এই বিবাহ সম্পর্কে আমাদিগকে তুমি একটা কথাও জানাও নাই, অধিকন্তু সাধারণ নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়া অপমান করিলে। মানী লোককে এইভাবে অকারণ অপমান করিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। সেই লোক ঘাড় হেঁট করিয়া তোমাদের ওখানে বরযাত্রী চলিয়াছেন, কত বড় আঘাত পাইয়া যে যাইতেছেন, তাহা কেবল আমিই জানি। তোমার এই অপরাধ আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।...

চিঠি ডাকে পাঠিয়ে তার পর যেন সুহাসিনী একটু ঠাণ্ডা হলেন।

সদর উঠানে পালকি এসেছে, বেহারারা তামাক খাচ্ছে। নৃত্যলালের সঙ্গে জিনিসপত্র বেশি কিছু যাবে না। সুহাসিনী জামাকাপড় ট্রাঙ্কে ভরতি করে দিচ্ছিলেন, বললেন, না গেলেই ভাল হত কিন্তু।

কেন?

দেখ, কাটা-কান চুল দিয়ে ঢাকতে হয়। মামা-ভাগনেয় ষড়যন্ত্র করে কাণ্ডটা করলে, তার পর তুমি যাবে সেখানে—লোকে হাসাহাসি করবে, আঙুল দিয়ে দেখাবে।

নৃত্যলাল ভ্রূকুটি করে বললেন, সেই ভয়ে খোকার বিয়ে দেখব না? কী যে বল তুমি!

সুহাসিনী বললেন, না, যাওয়া উচিত নয়। একা একা গিয়ে অপমানিত হবে, আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।

নবীন লম্বা একটা কাঠের বাক্স এনে রাখল। সুহাসিনী শিউরে বললেন বন্দুক নিয়ে যাচ্ছ নাকি—কেন?

নৃত্যলাল বললেন, একা যেতে মানা করছিলে—একা আমি যাব না। ইনি সঙ্গে যাচ্ছেন।

সুহাসিনী ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, বন্দুক কি হবে? না না, তোমার যা রাগ—কার বুকে গুলি বসাবে বল!

আর কাউকে না পাই, নিজের বুকটা রয়েছে তো! তুমি নিশ্চিন্ত থাক গিন্নি, অপমানিত আমি হব না।

আধ-গোছানো ট্রাঙ্ক ঠেলে ফেলে সুহাসিনী রাগ করে উঠে দাঁড়ালেন: তোমার যাওয়া হবে না।

তার মানে?

হ্যাঁ, তোমায় যেতে দেব না। যাও দিকি কেমন? বন্দুকের গুলি আগে আমার বুকে বসাবে, তার পর যাবে।

উত্তেজনা দেখে নৃত্যলাল হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন সে হবে না—তা তুমি জান। তা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে ভেবেচিন্তে বল।

তবে বন্দুক থাক, আমি যাচ্ছি।

নৃত্যলাল বিব্রত ভাবে বললেন, কিন্তু পালকি একখানা এসেছে।

দু'খানা লাগবে। নবীন, আর একখানা পালকি আনতে হবে যে বাবা।

নবীন বলে, এক্ষুনি কি করে হয়?

বিকালে তো হবে!

নৃত্যলাল বললেন, বিকেল হলে পৌঁছতে কত রাত্রি হবে, জান?

সুহাসিনী বললেন, তাতে তোমার নেমন্তন্ন ফসকে যাবে না গো—বর-বিদায় আজ নয়, কালকে।

নৃত্যলাল ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলেন, এতক্ষণে বোঝা গেল গিন্নি, নেমন্তন্নের লোভ একলা আমার নয়। ছেলের বিয়ে দেখবার জন্যে তুমিও মনে মনে মতলব পাকাচ্ছিলে, মুখ ফুটে বল নি। যা রে নবীন, আর একখানা পালকি দেখ। মেয়েমানুষের বাপের-বাড়ির টান—কিছুতে ঠেকানো যাবে না।

মেল-গাড়ি রাত আড়াইটের যশোরে আসে, সেই গাড়ি থেকে প্রতুল নতুন বউ নিয়ে নামল। সঙ্গে জন-চারেক বরযাত্রী আর গোটা দুই-তিন বাক্স।

প্রতুল বলে, দেখ তো, মোটর আছে কি না।

রিজার্ভ-করা গাড়ি, থাকবে না কি রকম!

সন্ধ্যার দিকে ভয়ানক ঝড়জল হয়ে গেছে, এখন জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার উপর কয়েকটা বড় ডাল ভেঙে পড়েছিল, সে সব ইতিমধ্যে সরিয়ে পথ করা হয়েছে। নালা দিয়ে কল-কল শব্দে জল যাচ্ছে।

ও গাড়ি? বলি, কেশবপুরের গাড় রয়েছে কোন দিকে?

শব্দসাড়া নেই। নূতন বউ সপ্রতিভ খুব। সে-ও দু-এক পা এগিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। প্রতুল বলে, তুমি ঐ বাক্সের উপর চুপ করে বসে থাক। তুমি গাড়ি খুঁজবে—হয়েছে আর কি!

অলকা বলে, বসে থাকতে ভাল লাগছে না, এই এতক্ষণ বসে এলাম। আমি কি কাপড়ের বাণ্ডিল যে বসিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হতে চাও।

প্রতুল বলে, বাণ্ডিলের একটা গুণ—ফেলে রাখলে ঠিক থাকে। তোমরা আবার নিজের বুদ্ধিতে নড়ে চড়ে মুশকিল বাধাও কি না!

মুশকিল বাধাই না মশাই, মুশাকলের আসান করি। ও-ই দেখ গাড়ি। গাছের তলায় দেখতে পাচ্ছ না?

ডালপালায় সমাচ্ছন্ন বাদামগাছ, তার নিচে এক টিনের ঘরে হোটেল খুলেছে। এই রাত্রে হোটেলের ঝাঁপ অবশ্য বন্ধ, দূরে একটা টিমটিমে কেরোসিনের আলো থাকায় জায়গাটা আলো-আঁধারি হয়েছে। হোটেলের পাশে অলকা আঙুল দিয়ে দেখাল, সেটা খড়ের গাদা হওয়াই সম্ভব। কাছে গিয়ে দেখা গেল—না, মোটরগাড়ি।

অলকা বলে, ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে।

মরে গেছে। কিন্তু এত চিৎকারে মরা মানুষেরও তো নড়ে বসবার কথা।

তার পর হর্ন বাজানো, পা ধরে নাড়ানাড়ি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার পর ড্রাইভার উঠে বসল। বরযাত্রীদের শহরেই বাড়ি—প্রতুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা বিদায় হবে এইবার: নমস্কার বউদি, সংসার গুছিয়ে নিন গে, তার পর জ্বালাতন করতে যাব।

অলকা হেসে বলে, কথার ঠিক থাকে যেন। চিঠি লিখে আপনাদের আবার আলাতন করতে না হয়।

হ্যাঁ, উদ্যুগ করে চিঠি লিখবেন আবার! গিয়ে পড়লে তখন চিনতেই পারবেন না।

অলকা বলে, গিয়েই পরখ করবেন। যাবেন তো সত্যি?

ও প্রতুল, যাব নাকি?

যাবেন, যাবেন। আমিই বলছি, ও আবার কি বলবে। ধরুন, এর পরের শনিবারে? কি বলেন?

গাড়ি ছাড়ল। প্রতুল বলে, নিমন্ত্রণ করলে অলকা, কিন্তু শনিবার নাগাত নিজেদের কি হয়, দেখ।

অলকা রাগ করে বলে, ভয় দেখিও না। চারিদিকে এই ঝোপজঙ্গল—ভাবছি, কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে আরাম করে বসব—উনি আবার বাড়ির ভয় দেখাতে লাগলেন।

বাবাকে তো জান না!

অলকা বলে—এখন থেকে জানব। শনিবারের এখনও পাঁচ-ছ দিন বাকি, তার মধ্যে জানাশোনা হয়ে যাবে।

অত সোজা নয় অলকা। আমায় দেখে মনে কোর না আমার বাবাও ঠিক এই রকম।

নয়ই তো। এদ্দিন ধরে তোমায় দেখছি, বাবার গল্প কম শুনি নি। তোমায় জানতে যদি দু-বছর লেগে থাকে, বাবাকে জানতে দুটো দিনও লাগবে না, এই বলে দিলাম।

প্রতুল কি বলতে যাচ্ছিল, তর্জনী তুলে অলকা বলল, চুপ, আর কথা নয়। তোমার হল কি—সমস্ত রাত এই রকম বকবক করবে নাকি? আমার ঘুম পাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে প্রতুল অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, চুরুটের কৌটো স্যুটকেসে পুরলে—একটা দাও না গো। চুরুটে আটকা থাকলে মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।

সে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। চুরুট পাবে না। অলকা দেবী ঘুমুবেন, তার বরের ঠোঁটে এই দেখ চাবি পড়ে গেল।

কোমল হাতখানি প্রতুলের মুখে চাপা দিয়ে অলকা তার কোলের উপর শুয়ে পড়ল।

মোটর ছুটেছে। চারিদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ভিজে গাছপালা জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করছে।

অত জোরে চালিও না হে—শুনছ?

আজ্ঞে? ড্রাইভার চোখ রগড়াতে রগড়াতে পিছন দিকে চায়।

এই যাচ্ছেতাই রাস্তা, তার উপর ফুল-স্পীডে চালিয়েছ। তোমারও দেখছি ঘুম ধরেছে। আজ একটা কাণ্ড বাধাবে।

ড্রাইভার হেসে বলে, কিচ্ছু হবে না স্যার, ঠিক পৌঁছে দেব।

প্রতুল বলে, পৌঁছে তো দেবে—তবে যমের বাড়ি কি না তাই ভাবছি। তুমি বাপু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালাও—বছরে কতগুলো ঘায়েল কর বল দিকি?

ঘাড় নেড়ে লোকটি বলে, ঐ কথাটি বলতে হবে না স্যার। সেবার খেজুর গাছে বেধে গাড়ি চিৎ হয়ে উলটে গেল, কিন্তু প্যাসেঞ্জারেরা তক্ষুনি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। আর একবার হয়েছে কি—

আর একবারের কাজ নেই—তুমি এদিকে ফিরে গল্প কোর না। ভাল বিপদ দেখছি—যতক্ষণ জেগে থাকবে পিছন ফিরে গল্প করবে, আর সামনে ফিরবে তো চোখ বুজবে।

ড্রাইভার সগর্বে বলে, চোখ বুজলে কি হয়—রাস্তা মুখস্থ হয়ে গেছে।

জোরে ড্রাইভার একসিলেটর চেপে ধরল। প্রতুল ডাকে: গতিক ভাল নয় অলকা, উঠে বোস শীগগির।

ঘুম-চোখে অলকা বলে, বাড়ি এসে গেল?

যা ব্যাপার, বাড়ি যাবে তো বিশ্বাস হয় না। আর আমরা বাড়িতেই যাচ্ছি নে মোটে।

অলকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে: বাড়ি নয়, কোথায় যাচ্ছ তবে?

মামার-বাড়ি।

কেন?

প্রতুল জবাব দেয় না। অলকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, বাবা মারুন আর কাটুন, নিজেদের বাড়িঘরে যা ঘটে ঘটবে। আর এক জায়গায় উঠে, আত্মীয়কুটুম্বের মাঝখানে—ছি-ছি, এ তুমি কি করেছ! আমাকে একবার বললে না!

কুণ্ঠিত স্বরে প্রতুল বলে, সাহস হয় না বাবার মুখোমুখি হতে।

তুমি পিছনে থেকো আমার। ড্রাইভারকে বলে গাড়ি ফিরিয়ে নাও।

বাবা কি বাড়ি আছেন, এতক্ষণ কোন্‌কালে মামাদের ওখানে রওনা হয়ে গেছেন। আর এক কাণ্ড করে রেখেছি। ছোটমামার নাম করে এক নেমন্তন্ন-চিঠি পাঠিয়েছি, তাতে বিয়ের তারিখ দিয়েছি পাঁচদিন পরে।

তাতে কি হবে?

বাবাকে তো জানি, তিনি বিয়ে বন্ধ করতে ছুটে যাবেন। গিয়ে পড়েছেন হয়তো। এদিকে আমরাও যাচ্ছি। মামার-বাড়ি চার মামা, দিদিমা আর মামিরা সব রয়েছেন। সকলে ধরে পেড়ে মিটিয়ে দেবেন। ছোটমামা আমায় বড্ড ভালবাসেন কিনা।

অলকা বলে, বাবা-মার চেয়ে নিশ্চয়ই নয়। আমি জানলে এই সব লুকোচুরি করতে দিতাম না।

তার পর চুপচাপ। অলকা বলে, কি ভাবছ?

যত এগুচ্ছি, ততই ভাবনা হচ্ছে অলকা। বাবা রাগি মানুষ—রাতটা পোহালে কী যে হবে!

রাস্তার পাশে খোড়োঘর। ছেলে কাঁদছে, টেমি হাতে কে-একজন বেরিয়ে এল। বেগুন-ক্ষেত, পাশাপাশি দুটো বটগাছ—গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি মাঠের মধ্যে এল, জোলো হাওয়া বইছে, মাঠের জলে ঢেউ উঠেছে, রাস্তার গায়ে ছলছল করে ঢেউ এসে লাগছে।

অলকা খিল-খিল করে হেসে ওঠে: তাইতো বলি, এমন ভাল ছেলে হয়ে বসে রয়েছ তুমি!

প্রতুল বলে, ঘুমুই নি।

তবে মাথা ঝুঁকে প'ড়ছে কেন? ভাবনার ভারে?

কেন পড়ছে, শুনবে? উঃ কি হাওয়া! মুখটা আন ইদিকে, কানে কানে বলছি—

অলকা বলে, ইস, মাথা তুলবার জো নেই—দুষ্টুমিটুকু আছে।

পশ্চিমে চাঁদ নিচু হয়ে এসেছে। তারপর অনেক দূরে ঝাপসা গাছপালার আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। রহস্যমধুর অন্ধকার।

এক সময় প্রতুল ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

জল কেন? গাড়ির মধ্যে জল থই-থই করছে। অলকা, অলকা!

ড্রাইভার আগেই নেমে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়েছে, টর্চ জেলে দেখছে। ঘাড় নেড়ে সে বলল, গাড়ি আর যাবে না, আপনারা নামুন।

তিক্ত স্বরে প্রতুল বলে, সমুদ্রের মাঝখানে এনে বলছে—নামুন। গাড়ি চলবে না, বললেই হল?

ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে, চলবে কি করে?

বলি রাস্তা থেকে বিলে নামলে কেন?

আঁধারে দেখা যায় বুঝি!

হেডলাইট আছে কি করতে?

ড্রাইভার রেগে গেছে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, কোথায় আছে—দেখুন না। টর্চ ফেলে সে সামনে দাঁড়াল। বলে, মিছে কথা বলছি নাকি? সে খোড়ার-ডিম জখম হয়ে আছে তিন বছর।

অলকা বলল, শীতে কাঁপ ধরে গেছে। আর সওয়াল কোর না, ডাঙায় চল।

এইসব নটবহর ?

ড্রাইভার এদিকে লোক ভাল। বলে, বাক্স-বিছানা আমিই রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। রাস্তাই বা কেন, সামনে তোফা ডাকবাংলো রয়েছে, আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ুন গে।

অলকা উৎসাহিত হয়ে বলে, সেই ভাল। আমার খুব মজা লাগছে—চল, ফ্লাস্কটাস্কগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি।

খুচরো দু-একটা জিনিস ছিল, তৎক্ষণাৎ সে হাতে টেনে নিল। বোঝা মাথায় নিয়ে জল ছপ-ছপ করে ড্রাইভার এগিয়ে চলেছে। প্রতুল বলে, কই, নেমে এস তুমি।

অলকা বলে, পায়ে জুতো—যাই কি করে ?

জুতো হাতে নাও, এই যেমন আমি নিয়েছি।

আলতা পরা রয়েছে—কাদা লেগে সব বিচ্ছিরি হয়ে যাবে। আমি এত জিনিস নিয়েছি, তুমি কিছু নিলে না। তুমি আমাকে নাও।

প্রতুল বলে, বা রে! তোমার ভার আর তোমার ঐসব জিনিসের ভার সমস্ত পড়বে আমার উপর।

এক বিচিত্র অনুভূতি! ক'দিন মাত্র আগে কতদূরে ছিল এই একেবারে আপনার মানুষটি! অলকা বলে, ধ্যেৎ, দেখ দিকি—ড্রাইভার বেটা আবার পিছন ফিরে চায়। কি ভাবছে বল তো। আর তুমিও চলেছ টিমিয়ে-টিমিয়ে—

গভীর স্নেহে প্রতুল তাকে নিবিড়তর বন্ধনে বেঁধে ফেলে। খোঁপা খুলে বিনুনি জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। অলকা বলে, দেখ কাণ্ড—না, তোমার জ্বালায়—একি, কপালের টিপটা ফেলে দিলে তো!

প্রতুল ভয় দেখায়: ঝগড়া করবে তো দেবো এই শোলাবনের মাঝখানে ফেলে। দেবো ? দিই ?

ডাকবাংলোয় এক চৌকিদার আছে। ড্রাইভার বলে, তাকে পাবেন না স্যার। পান-সুপারির ব্যবসা করে—দিনমানেই দেখা মেলে না, এখন তো হল রাত দুপুর। এমন-তেমন মানুষ এলে তখনই কেবল ইদুরে-কাটা পাগড়িটা পরে সেলাম করে দাঁড়ায়।

একটিমাত্র কামরা, তা-ও ভিতর থেকে বন্ধ। ড্রাইভারের টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পিছনের বারান্দায় দেখা গেল, খানিকটা ঘেরা মতো জায়গা—চার-পাঁচখানা বেঞ্চি আছে, হাতা-ভাঙা চেয়ার আছে। পাঠশালা বসে থাকে এখানে তার চিহ্ন রয়েছে। একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে অলকা। সদুপদেশ দেয়: তুমি ঐখানটা শোও—

প্রতুল বলে, শুয়ে পড়লে—তোমার কাপড় যে ভিজে-জবজবে, ছাড়তে হবে না?

ঝনাৎ করে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে অলকা নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজল।

প্রতুল বলে, কি হয়েছে দেখ। ট্রাঙ্কের ভিতর অবধি জলের পাথার। শাড়ি-ধুতি একটাও শুকনো নেই। কি হবে?

মধুর হেসে অলকা বলে, হবে আবার ছাই। শুয়ে পড়।

বিরক্ত হয়ে প্রতুল বলে, তুমি মানুষ নও।

নই-ই তো। তুমি যে কত কি বলে থাক। ওগো, বল না, শুনি—মানসকমল, সোনার-পরী, আরও কি-সব ভাল ভাল কথা?

প্রতুল বলে, পরী না আরও-কিছু! তুমি একটি গাধা। ভিজে কাপড়ে থাকলে নিমোনিয়ায় ধরবে, এই বুদ্ধিটুকু নেই।

মাথায় এক মতলব এল প্রতুলের—কাপড় হাতে করে এসে বলে, ওঠ দিকি দয়া করে, শুকনো কাপড় পরে আমায় কৃতার্থ কর।

চোখ মেলে অলকা বলে, এই যে বললে সমস্ত ভিজে গেছে। কী মিথ্যুক তুমি গো!

বাইরে কাপড় মেলা আছে কতগুলো, ওঁরাই মেলে রেখেছেন।

অলকা বলে, তাই অমনি নিয়ে এলে? পরের কাপড় পরতে আমার ঘৃণা হয়।

কাদা-মাখা নোংরা কাপড় পরে আছ, তাতে ঘৃণা হচ্ছে না? এ তো দিব্যি গরদের শাড়ি। আসল কথা, উঠতেই আলসেমি। সে আমি শুনছি নে, ভিজে কাপড় পরে তোমায় থাকতে দেব না আমি।

বাবা রে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়!

অলকা উঠে গিয়ে কাপড় বদলে এল। বলে, সকালবেলা উঠে ওঁরা কি ভাববেন!

উঠবার আগেই যেমন কাপড় তেমনি মেলে রেখে দিও। তোমার কাপড়ও একখানা শুকোতে দিয়ে এলাম, ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

ভাল করে ভোর হয় নি, কাক ডাকতে শুরু করেছে সবে। ড্রাইভার এসে ডাকতে লাগল: শুনছেন স্যার?

প্রতুল উঠে দেখে, অলকা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। দেখলে মায়া হয়—একেবারে ছেলেমানুষটি, বয়সের তুলনায় আরও যেন ছেলেমানুষ। অজানা জায়গা, তা বলে একটুখানি হুঁশ নেই, কেমন করে ঘুমুচ্ছে দেখ। আহা খুমোক!

ড্রাইভার বলে, আমার ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিন, আমি যশোর ফিরছি। পায়ে হেঁটে যাব, সকাল সকাল রওনা না হলে কষ্ট হবে।

তোমার গাড়ি?

গাড়ি থাকবে এই রকম। রাস্তায় এসে দেখে যান না।

বিলের জল ছাপিয়ে রাস্তার উপর দিয়ে গড়াচ্ছে, খানিকটা জায়গা ভেঙেও গেছে। ভাঙা জায়গার মুখে এসে মোটর দাঁড়িয়েছে। চাকার অর্ধেকটা তখনও ডুবন্ত।

ড্রাইভার বলে খামকা বকাবকি করলেন। আমিও আঁধারে ঠাহর পেলাম না—ভাবলাম, সত্যি বুঝি বিলে নেমেছি। ঘুমুলেও কি রকম হুঁশ থাকে দেখলেন? এই গোটা রাস্তা আমার মুখস্থ। ভাড়ার টাকা কিন্তু পুরোপুরি চাই স্যার।

বাড়ি পৌঁছলাম না, পুরো ভাড়া কি রকম?

মনিব শুনবে না। আর আমার যখন দোষ নেই—

তা বটে! রাস্তা ভেঙেছে, তার দোষ আমার। গাড়ি জল থেকে তুলে অন্য কোন পথে যাবার জোগাড় দেখ না।

সেই জন্যেই তো যাচ্ছি, ভাড়াটা মিটিয়ে দিন। ইঞ্জিনে জল ঢুকেছে, দিনসাতেক এখন একদম আর নড়াচড়া করবে না। এ্যাদ্দিন তো বসে থাকতে পারবেন না, আপনি পালকি-টালকি করে চলে যান।

পুকুর-ধারে পালকি দেখা যাচ্ছিল। প্রতুল বলে, ঐ একটা রয়েছে। ঠিক করে দাও না।

ভাড়া-করা পালকি স্যার। বেহারার সঙ্গে তামাক খেয়ে এলাম। কাল রাত্রে এঁরা যাচ্ছিলেন, ঝড়জল দেখে ডাকবাংলোয় নেমে পড়েছেন, এক্ষুনি উঠে রওনা হবেন। আপনি গাঁয়ে চলে যান না, দু'খানা কেন—দশখানা পালকি পেয়ে যাবেন।

ঘুমের ঘোরে অলকা শুনতে পাচ্ছে, কামরার ভিতর কর্তা-গিন্নিতে বচসা। কর্তা রাগত স্বরে বললেন, চুরুট নেই, তা তুমি এসেছ কি করতে?

গিন্নি বলছেন, আমি কি তোমার নবীন খানসামা, চুরুট হাতে পিছন পিছন ছুটতে হবে?

চুরুট আনলেই অমনি খানসামা হয়ে গেলে? আমি তোমার জন্যে কী না করছি! তুমি পানে দোক্তা খেতে, আমি পানই খেতাম না। শেষে তোমার খাতিরে দোক্তা অবধি ধরলাম।

আমাকেও চুরুট ধরতে বল নাকি?

তাই বলছি বুঝি। একটা চুরুট দিতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ভুলে যান—উনি আবার চুরুট ধরবেন! জান তো সকালবেলা ধোঁয়া না হলে মন আমার খিঁচড়ে থাকে, কোন-কিছু ভাল লাগে না।

হাসি পায় অলকার। সব পুরুষ একরকম। ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে—পুরুষেরা চুরুট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, তা নইলে তারা নড়তে পারে না।... তার পর আবার ঘুম একটু গাঢ় হয়েছে, হঠাৎ সে ধড়মড়িয়ে উঠল। এবারে কথা কাটাকাটি নয়, রীতিমত সোরগোল। কামরা থেকে ওঁরা বাইরে চলে এসেছেন। গিন্নি উত্তেজিত স্বরে বলছেন, শাড়ি চুরি হয়ে গেচে। একশবার বললাম, ঘরের মধ্যে যদ্দুর ঢুকোয় ঢুকোক, চোর-ছ্যাঁচড়ের দেশ। তুমি শুনলে না। গরদের ভাল শাড়িখানা আমার!

অলকা উঠে দাঁড়িয়েছে। সর্বনাশ, ওঁরা এই বারান্দার দিকেই আসছেন, শাড়ি তার পরা রয়েছে এখনও। এমনি রাগ হতে লাগল প্রতুলের উপর! বেশ মানুষটি—নিজে ভোর থাকতে উঠে গেছে, তাকে একটু ডেকে দিয়ে যেতে হয়!

অলকার সামনে এসে গিন্নি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন: তুমি কে বাছা?

অলকা হাসবার মতো ভান করল। বলে, পথ-চলতি মানুষ মা—আপনারা যেমন এখানে এসে পড়েছেন, আমরাও তেমনি।

গিন্নি বললেন, তা তো হল। কিন্তু ঐ কাপড় পরে আমি ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক করি। বলা নেই, কওয়া নেই—কোন্ জাতের মেয়ে তুমি ঠিকঠিকানা নেই—তুমি যে বাছা কাপড় পরে দুগ্গোঠাকরুন হয়ে আছ—

কথা শুনে এমন অবস্থায়ও হাসি আসে। অলকা বলে, আমি মুচির মেয়ে, চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? ফাঁকতালে আপনার কাপড় পরে নিলাম।

কাপড় পেয়ে গেছ? কার সঙ্গে কথা হচ্ছে? কর্তাও চলে এলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তাই তো বলি, কে আবার চুরি করবে! সেই সেই পেয়ে গেলে, মিছামিছি খানিকটা চেঁচামেচি করলে।

গিন্নি বললেন, ঐ কাপড় আমি ছোঁব নাকি? উঠোনের কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। চুরি আর কাকে বলে?

এইবার—বোধকরি পুরুষমানুষের সামনে হচ্ছে বলেই—অলকার চোখে-মুখে যেন আগুন ধরে গেল। বলে, আপনার ফেলতে হবে না—আমিই ফেলে দিচ্ছি।

ছুটে ওধারে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে আগের দিনের কাদা-মাখা কাপড়খানা

গরদ—বাক্স খুলে একমুঠো টাকা নিয়ে ঝনঝন করে সিমেন্টের বারান্দায় ছুঁড়ে দিল। বলে, কত টাকা দাম, নিয়ে নিন। আরও লাগবে? বলুন—বলুন—

কর্তা-গিন্নি দুজনে হতভম্ব হয়ে রইলেন। শেষে কর্তা বললেন, এটা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি। চুরি করবে আবার চোখ রাঙাবে, একসঙ্গে দুটো হওয়া কি উচিত?

অধীর কণ্ঠে অলকা বলে, এক-শ বার বলছি, চুরি করি নি—

কিন্তু 'না বলিয়া লইলে'—প্রথম ভাগের কথা!

অলকা বলে, দরজায় খিল এঁটে আপনারা ঘুম দিচ্ছিলেন, বলি কি করে? আমরা এদিকে রাতদুপুরে ভিজে কাপড়ে হি-হি করে মরি—

চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল, বলে—ঐ ভাবে থাকলে ঠিক হত, রাতের মধ্যে নিমোনিয়া ধরত। বাবা-মা কেউ আমার কাছে নেই—দিব্যি হত!

কর্তা বিচলিত হয়েছেন, ভাবে বোঝা গেল। বললেন, যাই বল গিন্নি, না জেনে ও রকম করা তোমার ঠিক হয় নি।

গিন্নি ভয়ে ভয়ে একবার অলকার দিকে তাকালেন, তখনও তার অশ্রু বেয়ে পড়ছে। বললেন, তুমি তো আমারই দোষ দেখবে—আমায় কি কিছু খুলে বলেছে? কেবল তোমার কাছে গালি খাওয়াবার মতলব।

কর্তা বিব্রতভাবে বললেন, গালি আবার কখন দিলাম, এই দেখ! বললাম যে, মন খিঁচড়ে আছে—কোন কাজে সুবিধে হবে না আজ। যে জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে গিয়েও খণ্ডপ্রলয় বাধবে দেখছি।

অলকা স্যুটকেস থেকে চুরুটের কৌটা এনে ঠক করে জানলার উপর রাখল। বলে, এই নিন, আর প্রলয়ে কাজ নেই—মন ঠাণ্ডা করুন গে।

চুরুট দেখে কর্তার মুখ হাসিতে ভরে গেল: বাঃ বাঃ, একেবারে খাঁটি জিনিস। বাঁচালে মা—কিন্তু তুমি জানলে কি করে এ নইলে আমার একদণ্ড চলে না? আর হঠাৎ তুমি পেলেই বা কোথায়?

মহানন্দে একটি ধরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ গিন্নি, তিরিশ বছর ঘর করছি—তোমার মনে থাকে না, আর—

শান্তকণ্ঠে অলকা বলে, আর ঝগড়ায় দরকার নেই, যান। ঠাণ্ডা মনে ভাবুন গে, একটা গরদের কাপড়ের দাম কত হওয়া উচিত।

ঈজিচেয়ার ছিল একখানা, তার উপর গড়িয়ে পড়ে কর্তা মিনিট কয়েক চুপচাপ ধূম উদ্গীরণ করতে লাগলেন: ওরে কানাই, গুছিয়ে নে, রওনা হওয়া যাক এবারে।

সর্দার-বেহারা৷ কানাই বলল, হুজুর, ইয়ে হয়েছে। ওরা সব বলল, গাঁয়ে স্বজাতি রয়েছে—তাদের ওখানে গিয়ে আরামে শুই গে। পালকি আমার জিম্মায় রেখে রাত্রে তারা গাঁয়ে চলে গেল। এখনও ফেরে না—নন্দ হয় ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে আছে কোথাও পড়ে। আমি না হয় ছুটে দেখে আসি।

তুই আবার কোথাও পড়ে থাকবি নে তো?

কর্তা একটা চুরুট শেষ করে দু-নম্বর ধরালেন। তার পর ডাকতে লাগলেন, মা লক্ষ্মী, এদিকে আসবে একটু?

অলকা এসে দাঁড়াল।

তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছে? মানে, আর কাউকে দেখছি না তো!

তিনি পালকির চেষ্টায় গেছেন। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, তাই এখানকার চৌকিদারকে বলে গেছেন। দেখুন না, আমাদের মোটর ঐ জল খাচ্ছে।

অলকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্তা মৃদুকণ্ঠে বললেন, এমনি তো খাসা মানুষ। বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সব আছে। রাগটা একটু কম কোর—বুঝলে মা, সুখে থাকবে।

দরজার ওদিক থেকে গিন্নি বলে উঠলেন, আর তুমি নিজেও। তোমার জন্যেই তো এই দুর্ভোগ। নিজের পেটের মেয়ের মতো—সে-ই কিনা মুখের উপর টাকা ছড়িয়ে দেয়, গরদের শাড়ি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে।

কর্তা বললেন, কিন্তু আমি কি করলাম?

তুমি কর নি? ছেলে বিয়ে করবে, তা বন্দুক নিয়ে চললে কোন্ লজ্জায় শুনি? আমি তখন কি করি—নইলে বয়ে গেছে আমার পিছু পিছু ছুটতে।

অলকা চমকে যায়। জিনিসপত্র ইতিমধ্যেই কিছু বারান্দায় বার করা হয়েছে। দেখে, হোল্ড-অলের উপর নাম লেখা আছে, নৃত্যলাল রায়।

ছেলে আপনাদের অমতে বিয়ে করছে বুঝি?

নৃত্যলাল বললেন, মত কি অমত ভাল করে খোঁজ নিল কি হতভাগা? পাছে অমত করি, তাই মামার সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। উঃ, মেয়েটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে দিলেও শ্রীমানের স্বাধীন মতবাদ উড়ে পালাত।

গিন্নি বললেন, আর সেই জন্যে বাবুর বন্দুক নিয়ে গুলি করতে যাওয়া হচ্ছিল।

নৃত্যলালের দিকে চেয়ে লঘুকণ্ঠে অলকা জিজ্ঞাসা করে, গুলি কাকে করতেন? বলুন না। মেয়েটাকে—তাই না? পরের মেয়ে—সেই সুবিধে—নিজেদের তো নয়!

গিন্নি বললেন, রাগ হলে উনি সব পারেন মা। সে চেহারা তো দেখ নি।

আমি কেবল দায়াজন্ম ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে গেলাম। তোমার মতো একটি রণরঙ্গিণী ঘরে আনতে পারতাম, সে-ই ওঁকে জব্দ রাখতে পারত। দেখলে না, চুরুট নিয়ে কী রকম সুড়সুড় করে এখানে এসে বসলেন।

কানাই আর ফেরে না। বেলার দিকে চেয়ে কর্তা-গিন্নি দুজনেই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আবার অলকা এলো, হাতে দুটো বাটি আর কেটলি। কেটলির নল দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

কর্তা সভয়ে বললেন, আমি চা খাই নে। তুমি ভাববে, হাতে খেতে চাচ্ছি নে। সে সব কিছু নয়, সত্যি চা খাই নে।

অলকা বলে, চা নয়, দুধ। পাশেই গোয়ালবাড়ি, চৌকিদারকে দিয়ে দুধ আনিয়েছি, কেটলি-বাটি খুব ভাল করে মেজেছি।

নৃত্যলাল একগাল হেসে হাত বাড়ালেন: দাও দাও, আর বলতে হবে না—অমৃতে আবার অরুচি! আচ্ছা মা, কি করে তুমি টের পেলে এখানে পেটুকদাস এসেছে, সকালে যতক্ষণ পেটে কিছু না পড়বে, মনটা খালি আইঢাই করবে।

অলকা হেসে বলে, আমি হাত গুনতে পারি। আর এক বাটিতে দুধ ঢেলে গিন্নিকে বলল, আপনি খাবেন না? আমি মুচির মেয়ে নই, সত্যি বলছি।

গিন্নি গম্ভীর মুখে বললেন, দাও। 'না' বললে এখনি বাটিসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেবে তো! তার কাজ নেই।

কর্তা-গিন্নি কথাবার্তা বলছেন, অলকা ওদিকে গেছে। কর্তা বারম্বার রাস্তার দিকে তাকান।

কি?

সাইকেল ঘাড়ে করে জলের উপর দিয়ে কে যায়, দেখ তো—কালীপদ না? হুঁ—সে-ই। কালীপদ, ও কালীপদ!—ফুর্তি করে তোমার ভাই বিয়ের বাজার করতে ছুটেছেন—বুঝলে? দাঙ্গা করতে বাড়ি যাচ্ছিলাম—শালাকে পথেই পেয়ে গেছি।

কালীপদ এসে পায়ের ধুলো নিল। সুহাসিনী পা সরিয়ে নিলেন। কর্তা বললেন, এস দিকি, কাছে এগিয়ে এস—এখান থেকেই কান. মলতে শুরু করি।

কালীপদ বলে, আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে বড়দিদি, কেন মিছে রাগ করছ? কাল বিকেলবেলা তোমার আর প্রভুলের চিঠি একসঙ্গে পেলাম। পেয়ে ছুটে যাচ্ছি তোমাদের কাছে।

চিঠি বের করল। বলে, এই দেখ—সমস্ত কথা খুলে লিখেছে, বিয়েও হয়ে গেছে।

সে কি, এর মধ্যে হয়ে গেল?

এই দেখুন না। বিয়ে হয়ে গেছে। বউ নিয়ে সে যাচ্ছে আমাদের ওখানে। সেখান থেকে বাড়ি যাবে।

নৃত্যলাল বোমার মতো ফেটে পড়লেন: বাড়ি গেলে জুতো মেরে বউসুদ্ধ তাড়িয়ে দেব।

প্রভুল গ্রাম থেকে কখন ফিরেছে। দ্রুতপায়ে সে সামনে এল। অলকাও পিছনে। বলে, জুতো মারতে হবে না বাবা, এখান থেকেই বিদায় হচ্ছি। আপনার বাড়ি আমরা ঢুকব না।

আমরা মানে? নৃত্যলাল সবিস্ময়ে বললেন, এই মেয়ে বিয়ে করেচ তুমি?

এবার সুহাসিনী রেগে উঠলেন: কোথায় যাবি তোরা? ইঃ, যাব বললেই হল! আমি সঙ্গে এসেছি কি করতে? জানি, এইরকম হবে। আমার ছেলে-বউ আমি বাড়ি নিয়ে তুলব, জোর করে পালকি পুরে নিয়ে যাব, কে তাড়িয়ে দেয় দেখি।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে সুহাসিনী বাঁ-হাতে অলকাকে বেষ্টন করলেন।

নৃত্যলাল নরম হয়ে গেছেন, সভয়ে অলকার দিকে তাকিয়ে মুখভাব দেখছেন। অথচ রণরঙ্গিণী মেয়ে এখন নিঃশব্দে হাসছে। বলে, বাবা, দিন তাড়িয়ে ওকে, তার পর আমরা সব পালকি করে বাড়ি গিয়ে উঠি। আপনার মতো মানুষ—তাঁর সম্বন্ধে কত কি মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে, জানেন? রাগি মানুষ—মারবেন, কেটে ফেলবেন, হেন-তেন কত কি! এখন আবার বাহাদুরি হচ্ছে, বাড়ি ঢুকব না—বিদায় দিয়ে চললাম।

নৃত্যলাল হো-হো করে হেসে উঠলেন: বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। স্বাধীন মতের খাণ্ডব-দাহন হবে। আমার কি, সকালে উঠে চুরুট পাব, গরম দুধ পাব। আমি দেখি নি, শুনি নি, কিছু জানি নে—নিজে দেখেশুনে করেছ বাপু।

কালীপদ বলে, নিজে দেখেশুনে করেছে, আপনি চটেন নি?

নৃত্যলাল বলেন, আর চটি নে। আমার একটা ধারণা ছিল বটে। কিন্তু দেখলাম, মেয়েরা সব ভাল। আমি বা 'র কানমলার ভয়ে তোমার বড়দিদিকে না এনে ধরো যদি শিবানীকেই বিয়ে করে বসতাম, কিছু ইতরবিশেষ হত না। সে যাই হোক, আমরা বাড়ি যাচ্ছি—তুমিও সঙ্গে চলো কালীপদ, বউভাতের পর ফিরবে।

মেয়ে নেই বাড়িতে। পাড়ায় বেরিয়েছে। বেশি দূরে নয়—ছটো বাড়ির পর মণ্টু স্থরের বাড়ি। মণ্টুর মেয়ে খনার সঙ্গে বড্ড ভাব। তুপুর-বেলাটা প্রায়ই গিয়ে তাস খেলে, অথবা লেভার বাজায়। আহা, করুক গিয়ে তাই—যে বয়সের যা। কর্তা আহারের পর গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে ডাক দিলেন, কই মা, দেখ্ দিকি আবার ক'টা চুল পেকে গেল! হুর্গাবতী তাড়া দিলেন, উঁহু, খনা ডাকতে এসেছে। ও যাক। পাকাচুল আমি তুলে দিচ্ছি।

অক্ষয় হেসে বললেন, রক্ষে কর। তুমি তুলবে—পাকা কাঁচা বোঝবার চোখ আছে? যে ক'টা কাঁচা চুল তবু আছে, তুলে একেবারে সাবাড় করে দেবে।

অলকা বলে, আমার কাজ আমি করব বাবা। তোমার মাথা মাকে ছুঁতে দিচ্ছি কিনা!

খনা এসেছে যে।

এসেছে, ফিরে চলে যাক। কাজকর্ম সেরে তার পরে আমি যাব। ও না থাকলে যেতে পারি নে বুঝি?

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে বলেন, তুই যা এখন। ঘুম ধরেছে, আমি ঘুমোব। পাকাচুল পালিয়ে যাচ্ছে না, কাল হবে।

বলেই নিদ্রার আবেশে চোখ বুজে পড়লেন। এর পরে কি করবে আর অলকা! মেয়ে চলে যেতে চোখ মেলে অক্ষয় হা-হা করে হাসতে লাগলেন: এতকাল মানুষ করে মেয়ে পরঘরি করে দিলাম। ক'দিনই বা থাকবে! যদ্দূর পারি সেবা-টেবা নিয়ে হিসাব চুকিয়ে দিচ্ছি।

হুর্গাবতী বলেন, আমিও তাই বলছি। থাকতে দেবে ক'দিনই বা! নিয়ে গিয়ে দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তি করাবে। যদ্দিন আছে কাজকর্মে ওকে ডেকো না, আমোদ-স্ফূর্তি করে বেড়াক।

হ্যাঁ, দাসীবৃত্তি করায় নাকি বিয়ের পর? একজন দাসী এই তুমি যেমন? দেখ, ছুঁদে স্বভাবের জন্ম আমায় সেকালে বলত বাঘ। শ্রীচরণের দাসী হয়ে এসে তুমি সেই বাঘের গলায় দড়ি পরিয়ে ঘাস-বিচালি খাওয়াচ্ছ। বিয়ের পরের হালটা লোকে যদি বুঝতে পারত, বলছি বড়বউ, অর্ধেক বর ছাতনাতলা থেকে পালাত, বাকি অর্ধেক ভিড়তই না মোটে এ-তালে।

অক্ষয় হাসতে লাগলেন। কিন্তু দুর্গাবতী হাসেন না: সে তোমার ঐ হাঁদা মেয়ে নয়। পরের ছেলে বশ করতে সাধ্যসাধনা করতে হয়। ও মেজাজে তা হবে না।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, শতেক খোয়ার আছে মেয়ের কপালে। আমরা দেখেশুনে দিলে কি হবে, বিধিলিপি খণ্ডানো যায় না। আপন ভাল পাগলেও বোঝে, ও হতভাগী একটা কথা যদি কখনো নেবে আমার!

অক্ষয় বলেন, সেদিন এই বিয়ে হয়েছে—ভাল করে আলাপ-পরিচয়ই হল না? এরই মধ্যে তোমার আকাশ-পাতাল ভাবনা। সোনার ছেলে প্রতুল, ও-ছেলের হাতে মেয়ে কখনও কষ্ট-দুঃখ পাবে না।

ছেলের কথা হচ্ছে না। পরের ছেলের দোষ ধরে কি হবে? মেয়ে যে বাঁদর। কোন লগ্নে দেখা—যেন চাল আর তেঁতুল! কত জন্মের শত্রুতা যেন দু'জনার মধ্যে!

জানলার বাইরে হঠাৎ দুর্গাবতীর নজর পড়ে গেল। বললেন, পিওন এসেছে। দেখে আসি।

সেই গেলেন, ফিরে আসার নাম নেই। অক্ষয়ের ইতিমধ্যে ঝিমুনি এসেছে, হাতের নল পড়ে গেছে। দুর্গাবতীর সাড়া পেয়ে আবার সোজা হয়ে বসলেন।

দেখ, মিছে কি সত্যি বলেছিলাম, পড়ে দেখ এইবার।

খামের চিঠি। অক্ষয় জিভ কাটেন: এ তো প্রতুল লিখেছে অলকাকে।

দুর্গাবতী তর্জন করে ওঠেন: হ্যাঁ, লিখেছে। চোখ বুজে থাকলে চলবে না। কি লিখেছে তাই পড়তে বলছি।

এই বয়সে কত কি আবোল-তাবোল লেখে, সে কি আমাদের পড়বার জিনিস?—অক্ষয়ের গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হাসি ফুটে বেরুল। বলেন, মনে করে দেখ বড়বউ, আমাদেরও বয়স ছিল। আমাদের চিঠিপত্তোর দাদ কর্তারা চুরি করে দেখতেন, কা রকমটা হত ভাব দিকি!

দুর্গাবতী বলেন, আমরা আর এরা! ভালবাসা কি বস্তু, তা এরা জানে নাকি? কাঁচা বয়স ওদের—আমরা জানি বলে তাই। নয়তো চিঠি পড়ে বলতে হবে, ত্রিকালের কোন জরদ্গব নাতনীকে হিতোপদেশ দিচ্ছেন—

রাগে তরতর করে ভিতরের চিঠি বের করে ফেললেন। জল লাগিয়ে সাবধানে খাম খুলে একবার পড়ে এসেছেন আগেই। চিঠি এগিয়ে ধরলেন একেবারে অক্ষয়ের মুখের উপর: দেখছ, পাঠ দিয়েছে 'মাননীয়াসু'। 'আপনি' 'আপনি' করে লিখছে—

· অক্ষয় বলেন, তাই দেখ, আজকালকার শিক্ষিত ছেলে মহিলার কেমন মর্যাদা দেয়। দু-মাস বিয়ে হয়েছে, অভ্যাস এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।—বলতে বলতে হেসে উঠলেন: আমি কত নিচে নেমে গিয়েছিলাম—চিঠিতে তুই-তোকারি পর্যন্ত করেছি। নয় বড়বউ?

খুব হাসতে লাগলেন তিনি। হাসি সংক্রামক। দুর্গাবতীর রুষ্ট চোখ একটু যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলেন, তা বলে তোমার মতন বেহায়া-বেলাজ না-হয় যেন। চিঠির পাঠই চলত একনাগাড় আড়াই তিন লাইন। কী কাণ্ড! অনেক পরে, অমল বেশ বড়সড় হয়েছে তখন, ইস্কুলে যায়—দেখি, বানান করে করে তোমার সেই পাঠ পড়ছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! কেড়ে নিলাম তো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। মুখে সন্দেশ গুঁজে দিয়ে ছেলে তবে ঠাণ্ডা করতে হয়।

চুলে একটা-দুটো পাক ধরেছে দুর্গাবতীর। দেবীপ্রতিমার মতো অমন মুখে খাঁজ পড়ে যাচ্ছে। কতকাল আগের সে সব কথা! বলতে বলতে কণ্ঠ তবু স্নিগ্ধ হয়ে আসে। অক্ষয় চিঠিটা হাতে নিয়ে নিলেন। না, বড়বউয়ের রাগ অকারণ নয়, মেয়ে-জামাইয়ে ভাব হয় নি। এর আগে নিশ্চয়ই কড়া কড়া লিখেছিল অলকা, তারই জবাব। সেই কড়া চিঠিরও হেতু অনুমান হচ্ছে, নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিল বেচারা প্রতুল। উঃ, কী সব হচ্ছে এখনকার এরা! লেখার বাঁধুনিটা দেখ—তোম ভি মিলিটারি, হাম ভি মিলিটারি! প্রেমপত্র বলে ভাবছিলেন, কিন্তু এ হল দুই সেনাপতির লড়াইয়ের পাঁয়তারা।

শ্বশুর-বাড়ি থেকে আমোদ-স্ফূর্তি সেরে অলকা ফিরে এলো। তখন বেলা পড়ে এসেছে। এসে সাবান-তোয়ালে নিয়ে চান-ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে।

দুর্গা বললেন, চিঠি—

বাঁ-হাতের দুটো আঙুলে চিঠিটা ধরে এক নজর দেখল। তার পর খাটের উপর রেখে দিয়ে ধীর-পায়ে চান-ঘরে ঢুকে গেল।

দুর্গাবতীর ধৈর্য রাখা দায়। এর পরে তো চিৎকার করে বলতে হয়, পড়ে দেখে যা একবার হতভাগী। কিন্তু বলেন কি করে—তবে তো প্রমাণ হয়ে যায়, জামাইয়ের চিঠি চুরি করে পড়েছেন তিনি। বিস্তর কষ্টে অতএব রাগ চেপেচুপে থাকতে হয়।

তার পরে ধীরেসুস্থে গা ধুয়ে বেরিয়ে অলকা দেবী রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের বাটি নিয়ে বসলেন। খামের চিঠি তেমনি পড়ে আছে—ভুলেই গেছে সম্ভবত। দুর্গাবতী সে সময়টা এদিকে ছিলেন না, ঘরের মধ্যে বালিসে ওয়াড় পরাচ্ছিলেন। এসে দেখেন, এই কাণ্ড। গতিক দেখ একবার। স্বামী

বলে ভয়-ভক্তি চুলোয় যাক, এতদূর তুচ্ছতাচ্ছিল্য! চিঠিটা খুলেই দেখল না—তার ভিতরে সাপ আছে না ব্যাঙ আছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো এবং ধেড়ে করে বিয়ে দেওয়া আজকাল ফ্যাশান হয়েছে—ওই হয়েছে কাল। আমাদের সময় ছিল 'পতি পরম গুরু'—পতি মুখ বেজার করলে জগৎ অন্ধকার। ওরা এখন জেনে বসে আছে, অফিসে এক-শ টাকার কেরানির চাকরি ঠেকায় কে? পুরুষমানুষকে তাই কেয়ার করে না।

গম্ভীর তীক্ষ্ণ স্বরে দুর্গাবতী জিজ্ঞাসা করলেন: প্রতুল আছে কেমন রে? কি লিখল?

ও, হ্যাঁ, চিঠি এসেছে, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।—খিলখিল করে হেসে উঠল: ভাল থাকবে বইকি মা, চিঠি তো খুব ভারীই ঠেকল। শরীর বেজুত হলে অত লেখা আসত না।

তা দয়া করে চিঠিটা খুলে পড়েই বল না। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার দরকারটা কি?

তার উত্তরে পাজি মেয়ে কি বলে শুনবে? বলে, খাচ্ছি দেখতে পাও না? খেতে খেতে খোলা যায় কেমন করে? তুমি খুলে দেখ না এতই যদি ব্যস্ত হয়ে থাক।

দুর্গা বললেন, বয়ে গেছে আমার।

ও-মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। চলে গেলেন তিনি। অলকা নিশ্চিন্তে লুচির পর লুচি শেষ করতে লাগল।

ডাক্তারখানা বাজারের উপর। দিবানিদ্রার পর অক্ষয় সেখানে গিয়ে বসেন। কল এলে সাইকেলে বা নৌকোয় সেখান থেকে বেরিয়ে যান। কল আসছেও বেশ। নদীর ওপারে শিববাড়ি, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন থেকে সেখানে মেলা বসেছে। এক মাস চলবে। পুরনো মেলা, বিস্তর নাম। এই তল্লাটের উৎকৃষ্ট কাঠের কাজ, বাঁশের কাজ ও বেতের কাজ আমদানি হয় মেলায়। অনেক দূর থেকে লোকজন এসে জমে, শিক্ষিত ও গুণীলোকেরাও অনেকে আসেন। লোক জমলে রোগপীড়া হবে, ডাক্তারদের মজা। সেই মজা জমে উঠছে ক্রমশ। মেলার কল সেরে ডাক্তারখানায় নিয়মিত দু-বাজি দাবা খেলে বাড়ি ফিরতে আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, দুর্গাবতী কেবল ঘর-বার করছেন। অর্থাৎ ধরবেন চেপে এইবার অক্ষয়কে—খাওয়া সেরে গড়গড়া নিয়ে বসতে যেটুকু দেরি।

কিন্তু সেটুকুও আজ ফুরসৎ দিলেন না। আঁচলের তলা থেকে দুর্গাবতী

চিঠির প্যাড বের করলেন—লম্বা লম্বা অনেকটা লেখা। ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, জবাব যাচ্ছে, দেখ—

বেশ, বেশ। চিঠি পেয়েই জবাব দিচ্ছে, রাগ দেখে খুব ভয় হয়ে গেছে—

সেই মেয়ে বটে তোমার! সন্ধ্যা থেকে আমি টিয়া-পড়ানো পড়াচ্ছি : খুব কাতর হয়ে শ্রীচরণের দাসী-টাসি বলে লেখ, আসবার জন্তে মাথার দিব্যি দিয়ে লিখে দে। লজ্জার মাথা খেয়ে নানা রকম গৎও বলে দিলাম, 'সাধ্য থাকিলে এখনই পাখি হইয়া তোমার শ্রীচরণে উড়িয়া যাইতাম'—হুঁ-হুঁ করে দিব্যি শুনে গেল, হাসল না, একটি কথাও বলল না। খেয়েদেয়ে তার পর সত্যি সত্যি লিখতে বসে গেল। ভাবলাম, সুমতি হয়েছে। লিখলও অনেকক্ষণ ধরে। ঘুমিয়ে পড়লে তখন টিপিটিপি বের করে দেখি, হায় রে আমার কপাল—

খাওয়াদাওয়া শেষ করে কতক্ষণে অক্ষয় নিজে পড়বেন, অতদূর সবুর সয় না। দুর্গাবতীই পড়ছেন এক-একটা জায়গা থেকে। রাজার নন্দিনী প্যারী কি বাণী ছেড়েছেন শোন একবার—আপনাকে এখানে আসিবার জন্য মা আমাকে লিখিতে বলিলেন। বলিলেন, পাখি হইলে উড়িয়া চলিয়া যাইতাম—এই কথা লিখিতে। নতুবা আপনি নাকি আবার বিবাহ করিবেন—

দুর্গাবতীর ধৈর্য থাকে না। ফ্যাস-ফ্যাস করে চিঠি ছিঁড়ে কুচি-কুচি করলেন। বললেন, যে কথা বলেছি, ঠিক করবে তাই। এত অপমান কোন পুরুষছেলে সইতে পারে না। এখন বুঝছে না, সতীন আছে ঠিক ওর কপালে।

অক্ষয় অবশ্য অতদূর বিচলিত নন। হেসে বললেন, ছেলেরা আজকাল খুব সেয়ানা। একটা বিয়েই করতে চায় না। এই প্রতুলকেই দেখ না। লম্বাচওড়া হয়ে গেছে, তবু শতেক বায়নাক্কা। যাচ্ছে সেই ছেলে আর একবার বিয়ে করতে!

বিবাগী হয়ে তবে হিমালয়ে চলে যাবে।

সেটা হতে পারে। যাতায়াতের অসুবিধা নেই এখন। বাস-সার্ভিস হয়েছে, পায়ে হেঁটে মরতে হয় না। জায়গা ভাল, ঘি-আটা ভালই মেলে—

দুর্গাবতী চটে-মটে চলে গেলেন। হাসতে হাসতে বললেন বটে অক্ষয়, কিন্তু মনে মনে ভাবনা। সত্যিই তো, নতুন বিয়ের পরে কী সব এই বিদঘুটে ব্যাপার! আবার বিয়ে করবে, সে অবশ্য কাজের কথা নয়—কিন্তু বয়স আর মেজাজের দোষে উগ্র চিঠি-লেখালেখি করে বেচারিরা মনে মনে বিষম কষ্ট পাচ্ছে। বাবা-মায়ের উচিত হচ্ছে, বুঝিয়েসুজিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

দিন আটেক পরে পুলকিত অক্ষয় স্ত্রীকে খবর জানালেন, জামাই আসছে—যোগাড়-যন্তর করো। বেহাই-বেয়ান উভয়কে লিখেছিলাম তোমার হার্টের

অসুখের দোহাই পেড়ে। মেয়ের দোষ আমরা আদরযত্নে ভুলিয়ে দেব। ভাব করিয়ে দিতে হবে ছুটিতে।

অলকার তা বলে গ্রাহ্য নেই। গয়ংগচ্ছ ভাব। বলে, তোমাদের জামাই আসছে, আমি তার কি করব? ধিত্তিং-ধিত্তিং করে নাচতে বলো আমায়?

অন্নপূর্ণা বলে পাড়ার একজন বেড়াতে এসেছেন। অক্ষয় পিসি বলে ডাকেন, অলকার সঙ্গে অতএব ঠাট্টার সম্পর্ক। তিনি হেসে বলেন, নাচবিই তো বটে। একালের নাচুনে-মেয়ে তোরা সব। সেকালে আমরা সেজেগুজে গয়নাগাঁটি পরে ভয়ে ঘেমে খুন হতাম। তোরা কি তেমনি চুপচাপ থাকার পাত্তর? বর এসেছে, বর এসেছে—করে ত্রিভুবন জানান দিয়ে বেড়াবি।

মায়ের কাছে অলকা বলে, তোমরা যে ঐ অজুহাত করে বাড়িতে আমায় বসিয়ে রাখবে, তা হবে না কিন্তু।

দুর্গাবতী উচ্চকণ্ঠে বলেন, কোন্ বৃহৎ কাজ আছে শুনি? স্বামীর সেবাযত্ন করা—তার চেয়ে বড় কিছু আছে নাকি মেয়েমানুষের?

ঠোঁট ফুলিয়ে অলকা বলে, অজন্তার বাড়ি যেতে হবে না ঐ দিন? তোমায় তো বলে রেখেছি।

দুর্গাবতীর কিছুই মনে পড়ে না। বললেন, অজন্তাটি হলেন কোন্ লাট সাহেব, শুনি?

খনার মাসতুতো বোন অজন্তা। তার বিয়ে সেদিন।

দুর্গাবতী কড়া হয়ে বললেন, তা সে যাই হোক। জামাই আসছে, সেদিন তোমার কোনখানে যাওয়া হবে না। পায়ে শিকল পরিয়ে রাখতে হয়, তাতেও আমি পিছপা হব না।

মায়ের কাছে সুবিধা হল না তো অলকা বাপের কাছে গিয়ে পড়ে: মা'র অন্যায় দেখ বাবা। অজন্তার বিয়ে কি রোজ রোজ হবে?

অক্ষয় বলেন, কিন্তু প্রতুল আসছে যে মা। আমি এত চিঠিপত্তর লিখে নিয়ে আসছি—

তুমি লিখেছ, তা তুমি থেকো বাড়িতে। ও-দিনটা ডাক্তারখানায় যেও না। আমায় জিজ্ঞাসা করে তো চিঠি লেখ নি—তা হলে আমি মানা করে দিতাম।

শোন কথা পাগল মেয়ের! বয়স হয়েছে তা কে বলবে, একেবারে কচি খুকী তুই মনে মনে।

অক্ষয় প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে লাগলেন। বলেন, আমরা তো থাকবই, কিন্তু তাতে হয় না মা। অবিশ্যি তোর কথাও মিথ্যে নয়, অজন্তার বিয়ে

ঐ একবারই হচ্ছে। এক কাজ কর—দুটো দিকই যাতে বজায় থাকে। বিয়েবাড়ি সকাল সকাল চলে যাবি, প্রতুল পৌছবার আগে, ধর পাঁচটা সাতটার ভিতর ফিরে আসবি। বলিস, মায়ের অসুখ। ওই তো আছে আমাদের এক ছুতো, সর্বকর্মে লাগিয়ে দিই।

অলকা আবদার ধরে: না বাবা, ন'টা। অজন্তাদের বাড়ি কি এখানে? সেই রথখোলার কাছাকাছি। সাইকেল-রিকশায় যাব—যেতে আসতেই তো এক ঘণ্টা লেগে যাবে।

উঁহু, নতুন-জামাই—চটে-মটে যাবে। আচ্ছা, তোর কথা থাক আমার কথাও থাক। আটটা—ব্যস ব্যস—তার উপরে সিকি মিনিটও আর নয়। আটটা অবধি 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' করতে করতে যেমন করে হোক আমি কাটিয়ে দেব।

জামাই এলো।

এস বাবাজি, এসো এসো। পথে কষ্ট হয় নি তো কোন রকম?

হাত-মুখ ধোওয়া ও জলযোগ পর্ব শেষ হল। অক্ষয়ের সেই 'কেমন আছ' ইত্যাদি চলেছে এখন। কিন্তু উসখুস করছে জামাই, কথার জবাব ভাল করে দেয় না। কেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আটটা অবধি সামলাবেন, অক্ষয় বলেছিলেন। কিন্তু সাড়ে-ছটা না বাজতেই এই গতিক। লক্ষ্মীছাড়া মেয়ের আজ বিয়ে দেখাটাই বড় হয়ে গেল। বিয়ে যেন আর দেখে নি! নিজের বিয়েই তো এই সেদিন হয়ে গেল, ফূর্তিফার্তি করলি, খাওয়াদাওয়া হল—তা লোভের কিছুতে শেষ নেই।

বুদ্ধি করে অক্ষয় বললেন, ক্লান্ত হয়েছ বোধহয় বাবাজি। একটু গড়িয়ে নাও, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতুল তখন যেন মরীয়া হয়ে বলে উঠল, আজ্ঞে না, আমাকে বেরুতে হচ্ছে একটু—

রাগের কথা। সত্যিই তো, কার না রাগ হয় খবর-বাদ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে যদি বোঝা যায় শ্বশুর-নন্দিনী উধাও?

প্রতুল বলে, আমার বন্ধু ব্রতীনের বাড়ি এখানে। ব্রতীন তার বাবার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে—খুব জরুরি চিঠি। সেইটে দিয়ে আসব।

ব্রতীনকে জানেন বইকি। তাদের বাড়িতে কলকাতার ছেলে প্রতুল বেড়াতে আসে। বিয়ের যোগাযোগ সেই সময় ঘটে যায়। তা মন্দ নয়, ব্রতীনদের বাড়ি যাওয়া, সেখানেও 'কেমন আছ' 'ভাল আছি' ইত্যাদি।

ফিরে আসতে ওই আটটাই হয়ে যাবে। দু-দশ মিনিট বেশি ছাড়া কম নয়।

বললেন, ব্রতীনের বাপ আবার গল্পে মানুষ। জমিয়ে বোসো না ওখানে। তাড়াতাড়ি ফিরো।

দুর্গাবতী শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন: যাবে বলল, আর যেতে দিলে তাকে ও-বাড়ি? চিঠিখানা তো আমরাও পাঠিয়ে দিতে পারতাম। লোক দিয়ে পাঠাতাম।

অক্ষয় বুঝতে পারেন না। বলেন, ব্যাপার কি? ও-বাড়ি যাচ্ছে তো আজ নতুন নয়। আমাদের জামাই হবার আগে থেকে যাতায়াত।

সে তো হবেই। খাতির করে ব্রতীন কলকাতা থেকে নিয়ে আসত। এক ধুমসি বোন আছে—মলিনা—তাকে গছাবার চক্রান্ত। কালো মেয়ে শেষ অবধি পেরে ওঠে নি।

অক্ষয় বলেন, সে সময় যখন পারে নি, এখন বিয়ে থাওয়ার পরে আবার সে কথা উঠছে কিসে?

দুর্গাবতী বলেন, জান না বুঝি, বিষম ধড়িবাজ ঐ মলিনা। আর আমাদের ইনি হলেন তো সাক্ষাৎ মনসা ঠাকরুন—ফোঁস করে ফণা তুলেই আছেন। এ সময়টা আবার ঝগড়াঝাঁটি চলেছে দু'জনায়। আমায় কিছু না জানিয়ে এত বড় কাণ্ড কেন হতে দিলে বল তো?

কি জবাব দেবেন অক্ষয়, তাঁর কি দোষ? জামাই যাচ্ছে বন্ধুর বাড়ি, হাত ধরে টেনে ধরবেন নাকি তিনি? আবার এক দুর্যোগ—কালবৈশাখীর সময়, বেশ এক চোট ঝড়-জল হয়ে গেল এর মধ্যে। না মেয়ে না জামাই—কোন তরফের দেখা নেই। দুর্গাবতী বাঘের মতন গর্জন করে ফিরছেন। লাঠি ও টর্চ খুঁজে নিয়ে অক্ষয় উঠলেন। বিয়েবাড়িতে খোঁজ করে আসা যাক। বাড়িটা ঠিক চেনা নেই, কিন্তু রথখোলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বেরিয়ে পড়বে।

হেনকালে রিকশায় ভকভক করতে করতে অলকা এসে নামল। জুতো ভিজে আমসত্ত, কাপড়চোপড়ও ভিজেছে। জুতো খুলে রেখে দুরদালানে ঢুকল। দুর্গাবতী ঘুরে দাঁড়ালেন। বকাঝকা কিছু নয়, মুখই দেখবেন না মেয়ের। নতুন বর এসেছে, সে-অবস্থায়ও এত দেরি করে আসতে পারে—বকুনি ও শাসনের বাইরে চলে গেছে সে।

মেয়ে চলে গেলে দুর্গাবতী বললেন, ক'টা বাজে দেখে নিয়েছ তো? বাপসোহাগী কথা দিয়ে গিয়েছিল কিনা বাপের কাছে—

অক্ষয় ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চান: একটুখানি দেরি করে ফেলেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে সকলের হাত ছাড়িয়ে আসা—

ন'টা সাত এখন। এক ঘণ্টার উপর—সাতবট্টি মিনিট। এই হল একটুখানি দেরি?

জামাইয়ের আগে তো এসে পড়েছে! জামাই কিছু টের পাবে না, তাহলেই হল।

আরও খানিকক্ষণ পরে প্রতুল ফিরল। নিজের মেয়ের দিকে মুখ ঘোরানো যায়, পরের ছেলের বেলা উল্টো। মেয়ের অবহেলা মায়েরই পুষিয়ে দিতে হয় খাতির-যত্নে। খাইয়ে-দাইয়ে দুর্গাবতী জামাইকে ঘর অবধি এগিয়ে দিলেন। দেখ কাণ্ড, বিয়ে-বাড়ির ফেরতা মেয়ে আগে-ভাগে বিছানায় পড়ে পাশবালিস আঁকড়ে অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে। তাই দেখ একালের নিষ্ঠা—মানুষ নাকি এরা?

দাবা নিয়ে অক্ষয় মেতে যেতেন ঠিক এখনকার মতই। পাড়াগাঁয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—বাড়ির সব নিঃসাড় অচেতন। রাত ঝিমঝিম করছে, তক্ষক ডেকে ডেকে উঠছে বোধনতলার দিক থেকে, ঘরকানাচে লতাপাতা নড়ছে বাতাসে—মনে হয়, ওদিকে বিস্তর লোকের আনাগোনা। আর ঘরের মধ্যে নতুন বউ দুর্গাবতী। সে সব কথা ভাবতে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মানুষটি কম কষ্ট দিলেন চিরজীবন ধরে? ঘরে বউ একা, আর ওঁরা কিস্তির পর কিস্তি হাঁকছেন চণ্ডীমণ্ডপে হ্যারিকেন-আলোয় বসে। শাশুড়ি বার বার এসে বলছেন, তুমি খেয়ে নাও বউমা অক্ষয়ের ভাত ঢাকা দিয়ে। বলছেন, ভয় করে তো আমার ঘরে এসে শোও বউমা।

না মা, ভয় কিসের ঘরের মধ্যে? আমার অত ভয়টয় নেই। ঘুম পেয়ে গেছে, ঘুমের মধ্যে ওঠাউঠি করতে কষ্ট হয় মা। বলেই হাই তুলে চোখ বুজেছিলেন দুর্গাবতী। তখনকার সেই কিশোরী নতুনবউ।

বুড়োমানুষ শাশুড়িকে বোঝানো হল এই রকম করে। সেকালের তাঁরা নিপাট ভালমানুষ—তাই বুঝে অমনি চলে গেলেন। কিন্তু ভয় করছিল সত্যি। ভয়ের সঙ্গে মেশানো উৎকণ্ঠা—কখন আসবে তুমি, কত দেরি? এসে খাওয়াদাওয়া শেষ কর, তার পরে টের পাবে। খাওয়ার আগে কিছুই নয়—তবে তো উনিই বেঁকে বসবেন, খোশামুদি করে তখন পার পাওয়া যাবে না।

নিঃশব্দে খেয়েদেয়ে পান চিবাতে চিবাতে উনি বলছেন, আর কেন, বলে যাও এবারে—

উঁহু, খাব না বলছি, খিদে নেই আমার—তুমি কি পরখ করবে?...দেখ, ভাল হবে না কিন্তু।...না, না, না—কেউ না দেখুক, আমার বুঝি লজ্জা-শরম নেই? রাত পুইয়ে যায়, এখন উনি এলেন ইয়ে করতে—সর, সর...আহা, খাব এখন, বলছি তো খাব—শুয়ে পড় আগে। ওদিকে ফের, লেপ মুড়ি দিয়ে পড়। পুরুষের সামনে এই বড় বড় হাঁ করে খাব—লজ্জা করে না বুঝি?

আলোর জোর কমিয়ে দিয়ে এদিকে পিছন করে খেতে বসল দুর্গাবতী। সেকালের সেই ঢলঢল-মুখ পাতা-কেটে চুল-বাঁধা দত্তবাড়ির ছোটবউ। খাচ্ছে আর মাথা তুলে পিছনে দেখছে এক-একবার। কিছু বিশ্বাস নেই ও-মানুষকে —লেপ ফেলে টিপিটিপি উঠে এল হয়তো। তখন তো পালাতে হবে। উঃ, কম জ্বালাতন করেছেন উনি!

নিশ্বাস পড়ল একটা। হায় রে সেকাল! এরা বড় দুর্ভাগা, মনে রসকস একটু নেই—নতুন কাল সমস্ত শুষে নিয়েছে। রাত্রি জেগে জেগে কড়া কড়া ইংরেজি মুখস্থ—কিছু কি আর অবশেষ থাকে? সেকালের টুলো-পণ্ডিতরা যেমন ছিলেন—দুর্গাবতীর বাপের বাড়ির স্মৃতিরত্ন মশায়। হাল আমলের কলেজে-পড়া যত মেয়ে দেখ, সবাই যেন বিনুনির মধ্যে স্মৃতিরত্নের সেই লম্বা টিকিটা লুকিয়ে রেখে পাউডারের প্রলেপে স্মৃতিরত্নের ফোঁটা-চন্দন ঢেকে স্মৃতিরত্নের খড়মের আওয়াজের মতোই খুট-খুট জুতো বাজিয়ে চোয়াড়ে মুখ নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

ওঠ্ রে—এই অলকা, উঠে বালিস-টালিশ নিয়ে ভাল হয়ে শো—

উঁ!—বলে গড়িয়ে ও-পাশে সরে গেল মেয়ে।

এমনি অবস্থায় ফেলে যাওয়া চলে না। হয়তো বা সমস্ত রাত পড়ে রইল অমনি বেহুঁশ হয়ে। জামাই এমনি তো রেগে আছে, সে কি আর ডেকেডুকে জাগাতে যাবে? ঘুম অতএব ভাল করে ভাঙিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার।

উনি ডাকাডাকি করছেন তোকে। উঠে আয়।

বাপের নামে অলকা সজাগ হয়েছে। বলে, কেন?

পান দিয়ে এসেছিস?

বড্ড ঘুম পেয়েছে। সোনা-মা, লক্ষ্মী-মা, তুমি দাও না দুটো পান সেজে—

বয়ে গেছে আমার। তোর ইচ্ছে থাকে, দিয়ে আয়। নয়তো কি আর হবে! খাবেন না উনি পান। একটা রাত পান না খেলে কেউ মারা যায় না।

এক বেলা ভাত না খেলেও কেউ মারা যায় না।—এবারে রেগেছে অলকা, রাগে রাগে সে উঠে চলল। বলে, বেশ, তোমার একটা কাজ যদি কখনও করে দিই—

মেয়ের পিছু পিছু মা-ও বাইরে এলেন। খানিক দূর গিয়ে বললেন, দাঁড়া। পান আমি দিয়েছি। ঘুমুচ্ছেন উনি।

অলকা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, কাঁচা-ঘুমে আমায় তবে ডেকে তুললে কেন?

অত্যন্ত কোমল স্বরে দুর্গাবতী বললেন, ক'টা কথা তোকে বলে দেব। যা বলি শোন্, অবাধ্য হোস নে।

বল—

সন্ধ্যেরাতে অত ঘুম কেন রে? শরীর খারাপ করে, বেশি ঘুম ভাল নয়।

অলকা ফোঁস করে ওঠে: সন্ধ্যে বলছ এখনো মা? রাত পুইয়ে গেলেও তোমার সন্ধ্যে শেষ হবে না।

সে দোষ তো তোরও। নিজে কখন ফিরেছিস, খেয়াল আছে? যাক গে। সতী নারীর ইষ্টদেবতা হলেন পতি। ঝগড়াঝাঁটি না হয় যেন প্রতুলের সঙ্গে।

ভালমানুষের মত অলকা বলে, না মা, ঝগড়া করতে যাব কেন?

মুখ গোমড়া করে থাকবি নে মোটে। ভাল ভাল কথা বলবি। পুরুষমানুষের মন তপস্যা করে পেতে হয়।

বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি শেষ কর মা, আর পারছি নে। কালকে ভাল করে শোনা যাবে।

সকালে ওঠবার সময় পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আসবি কিন্তু।

ঘাড় বেঁকিয়ে সকৌতুকে অলকা বলে, কেন?

ঘুমের ঘোরে পা-টা যদি গায়ে লেগে যায়! গুরুজন তো! প্রণাম করে পাপ খণ্ডে আসতে হয়।

অলকা বলে, শোবই না তা হলে খাটের ওপর। নিচে মাদুর পেতে শোব। তা হলে গায়ে পা লাগবে না।

দুর্গাবতী ক্রোধে ফেটে পড়েন: হারামজাদা মেয়ে, এতক্ষণে তুই এই বুঝলি?

অলকা ততক্ষণে পাখির মতো যেন উড়ে পালিয়ে গেছে। ঝনাৎ করে ঘরের খিল এঁটে দিল। আর কি করবেন দুর্গাবতী, দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে।

গোয়ালঘরে খটখট করে উঠল। চোর-টোর নাকি? অত উঁচু পাঁচিল টপকে চোর এর মধ্যে আসে কেমন করে? আসবেই বা কোন্ লোভে? সাঁজাল দেওয়া হয় নি নিশ্চয় গোয়ালে। দুর্গাবতী জামাই-এর রান্নাবান্নার

তালে ব্যস্ত ছিলেন, রাখাল ছোঁড়া সেই ফাঁকে সরে পড়েছে। মশায় কামড়াচ্ছে, গরুগুলো খুব দাপাচ্ছে তাই। এই রাতে তুষ-ঘুঁটে যোগাড় করে দুর্গাবতী সাঁজাল দিতে বসলেন। তার পরে মনে হল, খিড়কির দরজা দিয়েছে তো ওরা? যা লোকজন হয়েছে, কারও উপর নির্ভর করবার জো নেই। না, এটা ভুল হয় নি, দিয়েছে দরজা। খিড়কি থেকে ফেরবার মুখে পুবের কামরার সামনে দাঁড়ালেন একটু। সন্ধ্যাবেলা পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা জ্বলছে এখনও। খোলা জানলা হা-হা করছে—জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ে দিনমানের মতন হয়ে গেছে সামনের জায়গাটা। কথাবার্তা হচ্ছে—আস্তে নয়, রীতিমত শব্দ সাড়া করে। ঝগড়াঝাঁটি নয় তা ঠিক, তবু যে কি ব্যাপার ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। আর খানিক এগিয়ে যাবেন—কিন্তু সাহস হয় না ওই খোলা জানলা ও জোরালো আলোর সামনে। দেখে ফেলবে রাত দুপুরে মা পাতান দিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

অক্ষয়ের ঘুমটা এঁটে এসেছে, দুর্গাবতী গিয়ে গা ঝাঁকাচ্ছেন: শুনছ গো? ওঠ—শোন, কি কাণ্ড—

ভয় পেয়ে অক্ষয় তড়াক করে উঠে বসলেন: কি হয়েছে?

হি-হি করে হাসছেন দুর্গাবতী: আলো জ্বেলে হাত-মুখ নেড়ে বক্তৃতা করছে তোমার মেয়ে। ওমা, কী বেহায়া! কী বেহায়া! স্বদেশীর সময়ে মাঠেঘাটে বক্তৃতা হত না—প্রায় সেইরকম। আমাদের আমলে ছিল—ঘরে পা দিয়েই আলো নেবানো, দুয়োর-জানলা এঁটেসেঁটে দেওয়া, তাতে দম আটকে মরে গেলেও উপায় নেই। ফিসফাস করে কথা—ঠোঁট দিয়ে বেরুতে চাইত না। এখনকার এরা লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে একেবারে। হি-হি-হি—

আহ্লাদ উপচে পড়ছে। ভাব হয়েছে ওদের। অক্ষয়কে চোখে না দেখিয়ে সোয়াস্তি পান না! হাত ধরে টেনে বলেন, এস না—

অক্ষয় জিভ কাটেন: বল কি! তুমি মেয়েলোক, তোমায় যা-হোক তবু সাজে। বুড়োমানুষ কান পেতে জামাই-মেয়ের কথা শুনছি, দেখলে আমায় বলবে কি?

এই রাত অবধি কেউ জেগে বসে নেই দেখবার জন্যে। চল তুমি—

অক্ষয় বলেন, দেখবে ওরাই। জানলা খোলা, আলো জ্বলছে।

দুর্গাবতী অধীর হয়ে বলেন, সামনের ওদিকে কে যাচ্ছে? কানাচে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে একটুখানি শুনে চলে আসব। বাগিচার মধ্যে অন্ধকার, একলা যেতে ভয় করে। সেই জন্যে টানছি তোমায়। শখ করে

শোনা তো নয়। জামাইএর মেজাজ তিরিক্ষি, মেয়েটার মাথা খারাপ—আবার কিছু ঘটলে আমাদেরই সামাল দিতে হবে তো!

বিরোধ মিটে গিয়ে দম্পতির কী কথাবার্তা হচ্ছে—ভাল করে শুনে নিয়ে দুর্গাবতী নির্ভাবনা হতে চান। ঠেকানো যাবে না তাঁকে, ঠেকাতে গেলে অনর্থ ঘটবে। ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হল সঙ্গে। যেতে যেতে তবু অক্ষয় বলেন, জঙ্গল ওদিকে। উড়ো-কাল—সাপপোকা থাকতে পারে।

তা-ও দুর্গাবতী ভেবে রেখেছেন: লিচুগাছ কাত হয়ে আছে। তার উপরে দাঁড়িয়ে শুনব। পাতার মধ্যে ঢাকা থাকব, আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। দোভালার উপর বসাও চলবে।

কী দুর্ভোগ সে রাত্রে! বৃষ্টিটা ধরে গিয়েছিল, আবার টিপটিপানি শুরু হল। গাছতলায় প্যাচপেচে কাদা, জুতো বসে যায়। বৃষ্টির জলে গাছও পিছল হয়ে গেছে। অক্ষয় বিস্তর কষ্টে দোভালায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। পায়ের ঠিক নিচে দুর্গাবতী। ঝোপজঙ্গল বলে এদিককার জানলা বড় খোলা হয় না। বন্ধ জানলার উপর দুর্গাবতী কান পেতেছেন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। কবাটের কাঠের কোণে চোখ রেখে দেখবারও চেষ্টা করছেন। দেখবেন কি ছাই। নিশিরাত্রে কনকনে বাদলার হাওয়া বইছে—কোথায় তোরা চাদর জড়িয়ে গায়ে গায়ে শুয়ে গুনগুন করে কানের কাছে ভালবাসার বচন ছাড়বি, তা নয়—বসেছে দু'জন দুই চেয়ারে, মাঝখানে এক গাঁয়ের ব্যবধান। যেন দুই বুনো মোষ সিং উঁচিয়ে আছে, কায়দা বুঝলেই তেড়ে গিয়ে পড়বে। হচ্ছে অ্যাটম-বোমার কথা—পণ্ডিত-মেয়ে খবরের কাগজে-পড়া বিদ্যে ঝাড়ছেন: বোমা বানানো নিচক খারাপ কেমন করে বলতে পারেন? দু-তরফেই বানিয়ে যাচ্ছে, কার কি শক্তি সঠিক কেউ জানে না। সেই ভয়ে লড়াই হতে পারছে না। ওই বস্তু থাকতে লড়াই হবেও না কোনদিন।

শোন কথা! অক্ষয় ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর মাথার কাপড় ধরে টান দিলেন। তাকালেন দুর্গাবতী উপরমুখো। ডালপালার মধ্যে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কি তিনি বলতে চান বোঝা যাচ্ছে। নতুন বিয়ের বর-বউ—রাত দুপুরে ওঁরা অ্যাটম-তত্ত্বে মেতেছেন। বাক্যের খই ফুটছে কন্যার মুখে, বিশ্বভুবনের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আর অনেক—অনেক দিন—পঁচিশটা বছর আগে কন্যাকে একটা কথা বলাবার জন্য সেকালের এক বরের কতরকম সাধ্য-সাধনা! ওই যে নিচের ডালের ওই দুর্গাবতী। বিয়ের পর দুর্গাবতীর বর এসেছে—এই অলকার এসেছে আজকে যেমন।—বুঝেছি গো বুঝেছি,

আমায় পছন্দ নয় কিনা, ঘেন্না করে তাই কথা বলা হচ্ছে না। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ি—কি আর করব, কেউ যখন চায় না আমায়। তখন বউ কানের একেবারে উপরে মুখ নিয়ে এসে বলে, শুনছে যে ওরা। এখন নয়, চুপ করে থাক, তোমার পায়ে পড়ি—

ভোর হবার মুখে—বাড়ির বজ্জাত মেয়ে-বউগুলোর সুপ্তির সম্পর্কে যখন কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—সেই তখনই কথাবার্তার শুভলগ্ন। এক লহমার মধ্যে অমৃতের পাত্রে তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে নেওয়া—বাড়ির লোকজন জেগে উঠবার আগে পুনশ্চ নিরীহ মানুষ হয়ে অঘোর ঘুম ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আর এরা দেখ, য়্যুনিভার্সিটির লেকচার-হল বানিয়ে তুলেছে—জগজ্জন জমায়েত হয়ে বিনা-বেতনে যতখুশি জ্ঞান-মুক্তা কুড়িয়ে নিতে পার।

চুপ, চুপ—পুরুষ পক্ষের জবাব এবারে। কি বলছে শোন।

আপনি বলতে চাচ্ছেন অ্যাটম-বোমা কোন দিনই কাজে আসবে না। তা হলে বৈজ্ঞানিকের শ্রম ও মস্তিষ্ক-শক্তির অপব্যয় কিনা বলুন। এই বিপুল শক্তি মানব-কল্যাণে যদি নিয়োগ করা হত!

হত কচুপোড়া! খবরের কাগজের বুকনি ছাড়া কিছু নয়। সকালবেলা কাগজের খবরগুলো পড়ি, দুপুরে হাই তুলতে তুলতে পিছন-পাতায় এইগুলো পড়ে থাকি। রাত পৌনে-একটায় এই শোনবার জন্ম লিচুগাছে চড়ে বসি নি বাপু। আরও অসহ্য, একফোঁটা মেয়েকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছে। এই সব করেই মাথাটি খাচ্ছে অলকার। অমন এক বিদ্বান ছেলে সম্ভ্রম করে কথা বলছে, মেয়ে ভাবছে রাতারাতি লাটবেলাট হয়ে পড়েছে বুঝি!

এমনি সময় আর এক বিপদ। খট করে এদিককার জানলার ছিটকিনি খুলে ফেলল। জ্ঞানগর্ভ অ্যাটম-তত্ত্ব বাগিচার মধ্যেও যাতে প্রচার হয় হয়তো-বা সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু অব্যবহারের দরুন কবজা জাম হয়ে গেছে, ঝাঁকা-ঝাঁকিতে খুলছে না। খুলে গেলে তো সর্বনাশ—লিচুগাছ আলোকিত হবে, বৃক্ষারূঢ় শ্বশুর-শাশুড়ি নজরে এসে যাবেন। কি করা যায় তবে? লাফ দেবেন ডাল থেকে, এবং মাটিতে পড়েই দৌড়? 'চোর' 'চোর'—বলে চেঁচিয়ে ওঠে ওরা যদি? এ পাড়ায় বখাটে ছোঁড়াদের তিন-চারটে ক্লাব আছে, চেঁচামেচি শুনে তারা যদি রে-রে করে লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়ে?

ঠেকিয়ে দিল অলকাই: জানলা খোলেন কেন? ওদিকে জঙ্গল আর পগার। লিচু-ডালে ছিনেজোঁক ঝিলবিল করছে, জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর জোঁক এসে ছেঁকে ধরবে।

বলে কি! জোঁকের কথাটা খেয়াল হয় নি তো! জোঁকের ভয় দুর্গাবতীর

কাছে বাঘের ভয়ের চেয়ে বেশি। যেই মাত্র শোনা, অন্ধকারে মনে হতে লাগল, কুটকুট করছে যেন পায়ের পাতার উপরে। হাত বুলিয়ে দেখেন, না, জোঁক নয়, কিছুই নয়—এমনি একটু চুলকাচ্ছে। কিন্তু ওই যে ভয় ঢুকে গেল—কেবলই মনে হচ্ছে, কুটকুট করছে সর্বাঙ্গে, আষ্টেপিষ্টে জোঁক এঁটে গেল। কী করে যে নামলেন গাছ থেকে, ঘরে ঢুকে পড়লেন ছুটতে ছুটতে—কোন কিছু সজ্ঞানে করেছেন বলে মনে হয় না। ঘরে এসে খোঁজাখুঁজি করছেন জোঁক লেগেছে কোথায়।

অক্ষয়ও চলে এসেছেন। তিনি বলেন, বোশেখ মাসে জোঁক কোথা এখন? এইটুকু বৃষ্টিতে জোঁক বেরুবে? তুমি পাগল—

তবে অলকা বলল কেন ও-কথা? দুর্গাবতী ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন: ভারি শয়তান মেয়ে, কেমন করে টের পেয়েছে! জোঁকের নামে ছিটকে পড়ি—ওই বলে আমায় জব্দ করল।

কথাটা অক্ষয়েরও মনে লাগে। মেয়ে জেনে ফেলেছে। খুব সম্ভব জামাইও। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ঠকঠক করছে বাইরে। অলকার গলা: কত ঘুমুবে? ও মা, দরজা খোল।

ধড়মড় করে দুর্গাবতী উঠে পড়লেন: হল কি রে? রাত থাকতে উঠে এলি?

বেশ তুমি মা! রাত দুপুরে তখন হল তোমার সন্ধ্যেবেলা। আর বেলা দুপুরে এখন রাত।

বাইরে এসে দেখেন, রাত আর নেই বটে, উষাকাল, আকাশে পোহাতি-তারা। অন্যদিন গলা ফাটিয়ে যার ঘুম ভাঙানো যায় না, এই সকালে নিজে থেকে উঠে এসে সে দুয়োর ভাঙছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলেন—শুকনো চেহারা, যেন অসুখে ভুগে উঠেছে।

কি হয়েছে রে?

ঘুম হল না। একে গরম, তার ওপরে ছারপোকা।

ছারপোকা কই এ-বাড়িতে তেমন কোথায়—

অলকা রাগ করে বলে, তবে কি মিথ্যে বলছি? দেখ না, এই দেখ, এই—। পিলপিল করে লাইনবন্দি গায়ের ওপর ওঠে।

সত্যি, খুঁড়ে খেয়েছে মেয়েটাকে। সুঠাম সুন্দর অমন মুখখানা—তার এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ লেগেছে যেন। আহা-রে!

মেয়ে বলে, তবু তো খাটে শুই নি। মেজেয় মাদুর পেতে নিয়েছিলাম। তারই গন্ধি দেখ।

মেয়ের চেয়েও আর যে বড় ভাবনা—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে দুর্গাবতী তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেন: প্রতুল—সে কি একা খাটে শুয়েছে?

উহুঁ।

তবে কোথায়?

অলকা আকাশ থেকে পড়ে: আমি তার কি জানি মা?

ন্যাকা মেয়ে! বিয়ের আগে হলে, এবং জামাই ছেলেটা বাড়ির উপর না থাকলে দুর্গাবতী নির্ঘাৎ এক চড় কষিয়ে দিতেন এই কথার পর। জানতে যাবে তুমি কেন জানবে সৈরভী গোয়ালিনী, জানবে ছিদাম গাড়োয়ান!

আবার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে ভদ্রলোক বাইরে চলে গেলেন। আমি তখন কি করি, রাত্তিরবেলা ঘরের বা'র হতে ভয় করে—আচ্ছা করে আমি খিল এঁটে মাদুর পেতে পড়লাম।

মুখ ভেংচে দুর্গাবতী বলেন, ভারি কাজ করেছ!

মুখ কাঁচুমাচু করে নিরীহ ভাবে অলকা বলে, কি করব মা! দুয়োর বন্ধ করে ঘরের ভিতরেই আমার ভয়-ভয় করছিল। একটু ফরসা হতেই ছুটে এসেছি।

সে কোথায় গেল, কি করছে, তার একটু খোঁজখবর নিলে না? ও-ছেলের একটু মানইজ্জত থাকে তো কুলো বাজিয়ে তোমায় বিদেয় করে নতুন-বউ ঘরে নিয়ে আসবে।

এত সব বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে রাজনন্দিনী ঝুপ করে মায়ের বিছানায় পড়ল। পড়েই চোখ বুজেছে। ছুটলেন দুর্গাবতী পুবের কামরায়। যে মাদুরে শোওয়া হয়েছিল, নিচেই পড়ে আছে সেটা, মাদুর ছেড়ে বালিশটা মেজেয় গড়াচ্ছে। প্রতুলকে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। বারান্দায় ভাঙা ইজি-চেয়ারটায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বেচারি। এক্ষুনি রোদ এসে পড়বে মুখে।

ওঠ বাবা, ঘরে এসে ভাল হয়ে শোও! কামরায় ছারপোকা থাকে তো তোমার শ্বশুরের খাটে শোও গিয়ে।

চোখ মেলে প্রতুল হাসল। কী মিষ্টি হাসি। যাই বল, পেটের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলে অনেক ভাল। দেবতার মতো জামাই হয়েছে। মেয়ে দু-চক্ষে দেখতে পারে না—তবু দেখ, হাসছে কেমনধারা! সাদা-সাদা দাঁতের উজ্জ্বল পবিত্র হাসি।

ডাকছেন, এস বাবা—

গভীর ঘুমে মগ্ন অলকা। ঘুমের ভেতর থেকেই সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছে। দুর্গা কালী গণেশ চতুর্মুখ-ব্রহ্মা যতগুলো পটের ছবি আছে, একে একে সকলকে প্রণাম করে বাবা রওনা হয়ে গেলেন। রোজই যান—আগে ডাক্তারখানায়, সেখান থেকে কলে। জামাই-মেয়ে জেগে উঠে চা খাবে, মা পরিপাটি করে গোছাচ্ছেন। কেটলিতেও জল অবধি ভরে রেখে দিলেন। কেটলিটা অলকা একটু উনুনে বসিয়ে জল গরম করে নেবে। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না। গোছগাছ করে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মা। জানা আছে কোথায় তিনি যাচ্ছেন। স্বর-বাড়ি দুপুরবেলা আজ সবসুদ্ধ নেমন্তন্ন। খনা এসে কাল নেমন্তন্ন করে গেছে। খনার মা নেই, আর আমার মা তো রেঁধে-বেড়ে দশজনকে খাওয়ানোর নামে নেচে ওঠেন। এমন সুযোগ ছাড়বেন উনি? বলেও দিয়েছেন কাল খনাকে। তাই চলেছেন মা ও-বাড়ির ব্যবস্থায়।

মায়ের খাট থেকে অলকা ডাকছে: ও মশায়, মশায় গো, শুনতে পাচ্ছেন?

তার পর বোধহয় মনে হল, অ্যাটম-তত্ত্বই দূরে দূরে ভাল মানায়, অন্ত কথাবার্তা জমে না। সে এসে বাপের খাটের একদিকে বসল।

শুনতে পেলাম, আবার বিয়ে করা হবে মশায়ের—

আমায় বলা হচ্ছে?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মা আমায় বকছে, তুই পোড়ারমুখি খাতিরযত্ন করিস নে, কুলোর-বাতাস দিয়ে তোকে বিদেয় করে আবার বিয়ে করবে।

প্রতুল রেগে ওঠে: অন্যায়—মা হলেও বলব, অন্যায় বলেছেন তিনি।

দু-হাতে অলকার মুখখানা টেনে বুকের উপর নিয়ে আসে। বলে, শতদল-পদ্ম এই—কোন্ চোখ দিয়ে দেখেন মা, কোন্ মুখে বলেন পোড়ারমুখি। আর যা-ইচ্ছে বলুন গে, মুখের নিন্দে করলে আমার সহ্য হবে না।

গৌরবে আনন্দে অলকা ফেটে পড়বে বুঝি। বলে, পদ্ম না ছাই। তার ওপর যা কাণ্ড হয়েছে, আয়নায় দেখে লজ্জায় বাঁচি নে। মা বললেন, আহা-হা, ছারপোকার কামড়ে কি হাল হয়েছে রে! আমি কেঁদে পড়লাম, বাঁচাও মা তোমার ছারপোকা জামাই-এর হাত থেকে—

বলেছ ওই? তা হলে, বেশ্—

অলকা বলে, মুখে এসে পড়েছিল আর কি!...ওকি, মায়ের গলা—সর্বনাশ, মা তবে যান নি স্বর-বাড়ি! কি ভাগ্যি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন নি।

তীরের মতো অলকা সেই মায়ের বিছানায় গিয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। মা বাইরে কথা বলছেন। বললেন, তুমি যে আবার?

সে যেখানটায় শুয়ে, তারই একটা দেয়ালের ওধারে। বাবা ফিরে এসেছেন ডাক্তারখানা থেকে। মায়ের কথায় তিনি বললেন, কম্পাউণ্ডার অজিত একটা কথা বলল। শুনে ব্যস্ত হয়ে খবর নিতে এলাম।

মা বাবার কাছে চলে এসেছেন। বললেন, কি শুনলে? কলে না গিয়ে ছুটে এসেছ, খারাপ কিছু নাকি?

বাবা আমতা-আমতা করেন: হ্যাঁ—তাই বটে। জরুরি কেস আছে, কিন্তু মনের এই অবস্থায় রোগি দেখা ঠিক হবে না বলে চলে এলাম। শোন, জামাই' নাকি ডাক্তারখানায় গিয়েছিল কাল রাত্রে। জলকাদায় আছাড় খেয়ে হাঁটুর অনেকটা ছড়ে গেছে, অজিত সাফসাফাই করে আইডিন লাগিয়ে দিল।

দুর্গাবতী বলেন, কই, আমাদের কোন-কিছু বলল না তো! কাপড়-চোপড়ে কাদা-মাখা ছিল, এসে ছেড়ে ফেলল। তা ভয়া খেয়েছে পথের ওপর, জল-কাদা তো মাখবেই। কিন্তু পড়ে যাবার কথা তো কিছু বলল না।

একটু থেমে বললেন, আছাড়-খাওয়া বলতে লজ্জা করেছে, তাই হয়তো বলে নি।

অক্ষয় বললেন, হ্যাঁ, বিষম লজ্জার ব্যাপার। আর এক হতে পারে। অজিত একবার মাত্র দেখেছে প্রভুলকে, হয়তো চিনতে পারে নি। সে অন্য লোক। সেইটে আমি পরখ করতে এলাম। প্রভুল হলে হাঁটুতে কাটা থাকবে। দেখ দিকি, তুমি একটু জিজ্ঞাসা করে দেখ।

দুর্গাবতী রাগ করে ওঠেন: ঘুমুচ্ছে বেচারা—ডেকে তুলে আমি এখন জিজ্ঞাসা করতে যাই! হাঁটু একটুখানি ছড়ে গিয়ে থাকেই তো উতলা হবার কি আছে?

অক্ষয় সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তবে থাক। ঘুমোক, আর এক সময় দেখা যাবে। মা-কালী করুন, প্রভুল না হয়—সে অন্য লোক।

দুর্গাবতীর বিচলিত কণ্ঠ শোনা গেল: কেন, অমন করে বলছ কেন তুমি? কি হয়েছে, সমস্ত খুলে বল আমায়।

অক্ষয় একটু চুপ করে থাকেন। বলতে বাধছে, বোঝা গেল। একবার কেসে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগলেন, একটা মেয়েও ছিল নাকি প্রভুলের সঙ্গে, ডাক্তারখানার পুকুরধারে বটগাছের আড়ালে মেয়েটা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রভুল বেরিয়ে এলে দু'জনে খেয়াঘাটমুখো চলল। আমি

অবশ্য সামলে নিলাম—জামাই-মেয়ে জোড়ে মেলায় গিয়েছিল বোধহয়। তা অজিত বলে, অলকা এত লজ্জাবতী হয়ে উঠল কেন? ডাক্তারখানায় ঢুকে সেই তো সব করতে পারত। করেছেও এমন কত! তুমি আবার, বড়বউ, কাল ব্রতীনের বোনের কথা তুলে ভাবনা বাড়িয়ে দিলে—

চাপা তর্জন করে উঠলেন: খবর নিয়ে দেখি, আমি ছাড়ছি নে। তাই যদি হয়, ব্রতীনের বাপ ওই বুড়োটাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। থুবড়ো মেয়েকে কোন্ আক্কেলে রাত্তিরবেলা বৃষ্টিবাদলার মধ্যে মেলা দেখতে পাঠায় জোয়ান ছেলের সঙ্গে!

অলকা শুনছে। শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেছে। প্রতুল যায় নি মোটে ব্রতীনদের বাড়ি। ছি-ছি-ছি—নিরীহ মেয়ে মলিনার উপর বিনা দোষে অপবাদ পড়ছে। মা কিন্তু এত বড় কথার উপরেও রা কাড়লেন না। মৃদু-কণ্ঠে বললেন, এদিকে আবার শোন। স্বর-বাড়ি যাব, তা অন্নঠাকরুন এসে পড়লেন: তোমার জামাই এসেছে, জামাই দেখব বলে এলাম। আর তোমার মেয়ের সঙ্গে আচ্ছা একচোট ঝগড়া করব।—খবর পেলে কি করে পিসিমা? না, মেলা থেকে ফিরছি, দেখি, এক ছোকরা তোমার মেয়েকে ডাব কিনে খাওয়াচ্ছে। মানুষজন দেখে ফুড়ুৎ করে পাখির মতন তোমার মেয়ে বর বগলদাবায় করে মাঠে নেমে পড়ল। যেন বর কেড়ে নিতে যাচ্ছিলাম! আমি আর কিছু ভাঙলাম না ঠাকরুনের কাছে, ওরা ঘুমুচ্ছে, বলে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু অন্নঠাকরুন বাজে কথা বলবেন না—কে হতে পারে বল তো? বিয়ের আগে চড়কডাঙার যে ছোঁড়া চিঠি লিখেছিল, সেই আবার ঘুর-ঘুর করছে না তো?

তার পর স্বামীকে বোঝাচ্ছেন: চুপচাপ থাক। ঘাঁটাঘাঁটি করলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। যা করতে হয়, আমি করব। খনার কাছে আমি গিয়ে ভাল করে শুনি, অলকাকে নিয়ে কখন সে বিয়েবাড়ি গিয়েছিল, কতক্ষণ ছিল সেখানে। জামাই উঠুক, তার কাছেও খোঁজ নিই, সে-ই বা গিয়েছিল কিনা ডাক্তারখানায়।

মার কথায় আপাতত ঠাণ্ডা হয়ে বাবা জরুরি কলে চলে গেলেন। মা-ও চলে গেলেন খনাদের বাড়ি। উঁকি দিয়ে দেখল অলকা—সত্যি সত্যি গিয়েছেন এবারে।

অলকার দু-চোখ জলে ভরে এল। মা তুমি এমন! পেটের মেয়ে দিনের পর দিন এত বড় করে তুললে—এমন বিশ্রী ব্যাপার ভাবতে পারলে আমায় নিয়ে? প্রতুলের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। প্রতুলও উঠে বসেছে, ভালমত সমস্ত কানে না গেলেও খানিক খানিক শুনেছে।

উপায়? কি হবে এখন বল? বললাম যে বিয়েবাড়ি একবার ঘুরে আসি, আর তুমিও একছুটে ফেলে দিয়ে এস চিঠিটা—তা নয়, পরে হবে। পরে আর হয়ে ওঠে কখনও। ছি-ছি, জিজ্ঞাসা করলেই তো জানাজানি হয়ে যাবে। এর পরে মুখ দেখাব আমি কেমন করে?

চোখের জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে অলকার দু-গালে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

খনা ভাল মেয়ে—একেবারে নিজের মেয়ের মতো। দুর্গাবতী বললেন, কাল তোমার মাসতুত বোনের বিয়ে ছিল—অজন্তা নাম বুঝি?

সেখানেই তো ছিলাম কাকিমা। নয় তো, জামাই এল—সন্ধ্যেবেলা আমায় বুঝি দেখতে পেতেন না?

হুঁ!—পাকা উকিলের মতন ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন দুর্গাবতী।

অলকা গিয়েছিল তোমার সঙ্গে?

খনা বলে, তা যাবে বই কি! তারও তো নেমন্তন্ন।

মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে দুর্গাবতী বললেন, অমন ভাসা-ভাসা কথা শুনব না। স্পষ্টাস্পষ্টি বল, গিয়েছিল কি না।

হ্যাঁ—বলতে গিয়ে খনা খতমত খেয়ে চুপ করে যায়।

দুর্গাবতী বললেন, যায় নি তা আগেই বুঝেছিলাম। অন্ন-পিসি ধার্মিক মানুষ, পাড়ার ঘোঁটে থাকেন না—তিনি খামোকা মিছেকথা বলতে যাবেন কেন।

কি বলেছেন তিনি?

দুর্গাবতী সমস্ত খুলে বললেন, খনার কাছে লুকোবার কিছু নেই।

শুনে খনা বলে, যদি হয়েই থাকে, আপনি অত রেগে যাচ্ছেন কেন কাকিমা?

রাগব না? তোমরা ধিঙ্গি হয়ে মুখে চুন-কালি মাখাবে, চোখ-কান বুজে আমরা চুপ করে থাকব? অন্ন-পিসিকে বললাম, জামাইএর সঙ্গে বেড়াচ্ছিল। অমন মানুষের কাছে মিথ্যেকথা বলতে হল মানের দায়ে।

খনা বলে, মিথ্যে আপনি বলেন নি কাকিমা।

বলছ কি তুমি! জামাই তো সেই সময় ব্রতীনের বাড়ি চিঠি দিতে গেছে।

খনা একটু উষ্ণ হয়ে বলে, এই যেমন খোঁজখবর নিচ্ছেন—সে বাড়িতেও জেরা করে খবর নিয়ে আসুন না, কোথায় ছিল আপনার জামাই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দুর্গাবতী। খনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি

সমস্ত জান মা। খুলে বল। এই সব শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। ওঁরও কানে গিয়েছে—রোগি দেখতে না গিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এলেন।

খনা জিব কাটে: সর্বনাশ, এতদূর গড়িয়েছে! তবে আমার মুখের কথায় কি হবে? দলিল দেখাই—আপনার জামাই কি লিখেছে দেখুন তা হলে।

ছুটে গিয়ে চিঠি এনে দিল। সর্বশেষ চিঠি—আসবার আগে প্রতুল যা লিখে এসেছে। গোড়ার সম্বোধনটাই পুরোপুরি আড়াই লাইন—রকমারি বিশেষণ ঢেলেছে, কোথায় লাগে ওঁদের সেকালের 'প্রাণেশ্বরী' 'প্রাণপ্রতিমা'। লজ্জায় মাথা কাটা যায় দুর্গাবতীর—বিশেষ এই খনার সামনে। চিঠির ওইটুকু ভাঁজ করে দিলেন। কিন্তু চার পৃষ্ঠার প্রায় সবখানেই ওই রকম বিদঘুটে কাণ্ড—কোথায় ভাঁজ করেন, আর কতটুকু বা পড়েন! বাদ দিয়ে দিলে আসল জায়গায় এসে পড়া গেল—'কত দিন তোমায় পাই নি। হৃদয় গোবির মতন তৃষ্ণায় হা-হা করছে। পাষণ্ড আত্মীয়েরা রাত্রেও লুকিয়ে শুনতে আসবে, শেষরাত্রির দিকে যদি একটুখানি রেহাই দেয়। অত দেরি বৈধে সইবে না। ছলছুতোয় তুমি বেরিয়ে পোড়ো, আমিও বেরুব। কোন এক নিভৃতি খুঁজে নিয়ে আমার আদরের অলকাকে—'

খনা বলে, আমি মানা করেছিলাম। এ হল ছোট্ট জায়গা—কারও না কারও চোখে পড়ে যাবে। ওরা কানেই নিল না কাকিমা।

দুর্গাবতী বলেন, দজ্জাল মেয়ে আমার—কিন্তু প্রতুলকে যে অতি গোবেচারা ভেবেছিলাম। তার পেটে পেটে এত?

খনা হেসে বলে, বুদ্ধি দিয়ে দিয়ে তাকেও দজ্জাল বানিয়েছে কাকিমা।

দু-মাস মোটে বিয়ে হয়েছে—দেখাই বা হল ক'দিন, আর বুদ্ধিই বা দিল কখন?

বলি তবে কাকিমা। টের পেলে অলকা কিন্তু জন্মে আমার মুখ দেখবে না। রোজই চিঠি লেখে আমাদের বাড়ি বসে—ও-ই সমস্ত বুদ্ধি বাতলায়। আসেও চিঠি আমার এখানে। তাসখেলার কথা বলে—কিছু নয় কাকিমা, চিঠি লেখা আর চিঠি পড়া। ওর যত চিঠি এখানে আমার নামে আসে, খামসুদ্ধ ওকে দিয়ে দিই!

দুর্গাবতী বলেন, আমাদের বাড়ি আসেও তো চিঠি। লেখেও এখান থেকে।

সে সব চিঠি ভুয়ো। ধোঁকা দেয় আপনাদের।

দুর্গাবতী দুঃখিত স্বরে বললেন, ওদের ভাব-সাব হয়েছে—এ তো সুখের

কথা। বাপ-মা তাই তো চায়। কেন তবে ঢাকাঢাকি করে মন খারাপ করে দেয়?

লজ্জা, কাকিমা। চিঠি খুলে খুলে পড়েন, সে ওরা জানে। লুকিয়ে কথাবার্তা শুনবেন, সে ওরা আন্দাজে বুঝেছে। অত তাই সামাল-সামাল। বড্ড লাজুক কিনা—অলকা যেমন, জামাইও তেমনি।

দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে দুর্গাবতী খুব হাসতে লাগলেন: কি কাণ্ড! আমাদের আমলে সাধাসাধি করে একটা কথা বের করতে পারত না, ওরা এখন অ্যাটম-বোমা নিয়ে হুল্লোড় বাধায়। ঘরের মধ্যেই হুমড়ি খেতাম আমরা, আর ঘর পালিয়ে ওরা মেলার ভিতর টহল দিতে বেরোয়—

খনা বলে, লজ্জা! কাকিমা, লজ্জা—

ধুনোবাণ-সর্বৈবাণ

আসামি মেয়েরা মেখলা পরেন। ঊর্ধ্ব-অঙ্গের বসন। ভাইপোর মাথায় এসেছে, ঐ বস্তুর উপর যদি কল্কা তুলে নতুন নতুন ডিজাইনের পাড় সহ বাজারে ছাড়া যায়, চাহিদা অফুরন্ত হবে। একচোট পয়সা লোটা যাবে যতদিন না হিংসুটে অন্য ব্যাপারির টনক নড়ছে। কাগজে আঁক-জোক কেটে জোড়হাটের এক মহাজনকে সে দেখিয়েছিল। দেখে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। লাগান মশায়, পয়লা কিস্তিতেই হাজার টাকার অর্ডার রইল। পরের কিস্তিও আমায় না জানিয়ে অন্য ঘরে ছাড়বেন না।

সে তো হল। কিন্তু বুনানির উপরে এই নক্সা হুবহু তুলে দেবে, তেমন লোক পাওয়া যায় কোথা? ধরণী বিপুল, এবং গুণীরাও হয়তো আকাশের তারা ও পাতালের বালির মত অগণন। কিন্তু ভাইপোর ও আমার জানাশোনা সাকুল্যে বিশ-ত্রিশখানা গ্রাম মাত্র। তাই নিয়ে এতটা বয়স কাটিয়েছি, জীবনের বাকি ক'টা দিনও কাটিয়ে দিতাম যদি না স্বাধীনতার হল্লায় ভিটেমাটি হারিয়ে এই রকম ভবঘুরে বৃত্তি নিতে হত।

যাক গে, যে কথা হচ্ছিল। কারিগর কোথায় পাওয়া যায়? পাশের গাঁয়ে দেব-নাথেরা ছিলেন—সেকালের মসলিনের গল্প শুনেছেন, তা ভাল রকম মজুরি পেলে ওঁদেরই কেউ কেউ এখনও মসলিন বুনে দেবেন। আমাদের অত দূর গরজ নেই, মেখলার উপর নিখুঁত ভাবে কয়েকটা শুধু কল্কা বসানো। কিন্তু সেই ওস্তাদেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন, কোথায় তার সন্ধান পাই?

কাছাড় অঞ্চলে গিয়েছিলাম ব্যবসা সম্পর্কিত একটু কাজে। গিয়ে বিষম বিপদ—আসাম-লিঙ্কের লাইন ভেঙেছে। বর্ষাকালে ওটা অবশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ওঁরা বললেন, বন্যা ডাঙার উপরে—আকাশে তো নয়! আকাশ-পথে চলে যান। কিন্তু সুবিধা দর পেয়ে ইতিমধ্যে কিছু তাঁতের কাপড় সওদা করে ফেলেছি—কাপড়ের গাঁইট নিয়ে উড়ি কেমন করে বলুন? খাঁচার পাখি হয়ে অতএব দিনক্ষণ গুণছি, কবে নাগাত লাইন খুলে দেবে।

হাইলাকান্দি শহরের বাইরে (এখন আর বাইরে নয়, শহর হু-হু করে ছুটেছে ওদিকে) করিমগঞ্জের রাস্তার উপর একটা কালভার্ট দেখতে পাবেন। বাঁ-হাতি কবরখানা—ভাবী ভারী লোকেরা মাটি নিয়েছেন, পাকা গাঁথনির উপর শ্বেতপাথরে নাম-ধাম-পরিচয় লেখা। ফাঁকে ফাঁকে আমরে-আপনার মঃ বাজে মানুষরাও আছে। আর কালভার্টের উলটো দিকে কবরখানার প্রায় সামনা-সামনি শ্মশানঘাটা—কলমির দামে-আঁটা ডোবা, পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসি, শ্মশান-বন্ধুদের জন্য খোড়ো চালা একটা ডোবার পাশে। মোটের উপর, হিন্দু হোন মুসলমান হোন, দুনিয়ার মেয়াদ কাটিয়ে এ-তল্লাটের মানুষের এইখানে এসে শুতে হবে। এই ক' বছর আগেও নিতান্ত দায়ে না পড়লে জ্যান্ত মানুষ আসত না এদিকে। এখন কলেজ হয়েছে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে। উদ্বাস্তুরা এসে নতুন পাড়া বসিয়েছেন—রাস্তার ধারে ধারে। কাপড় তৈরি হচ্ছে ঐ পাড়ায়, সরকার থেকে তাঁত কিনে দিয়েছে, সুতা সরবরাহ করছে। এরই মধ্যে কেউ কেউ গুছিয়েও নিয়েছে বেশ একরকম।

ঐ তাঁতের খবর শুনেই আরও ছুটেছি। কোন্ অঞ্চলের মানুষ ওরা, কল্কা-তোলা কারিগরের খবরাখবর বলতে পারে কি না। স্থানীয় কয়েকজন মাতব্বর যাচ্ছেন সঙ্গে, উদ্বাস্তু-সমিতির সেক্রেটারিও আছেন। কালভার্টের উপর এসে একজন বললেন, জানেন মশায়, ভূত আছে এই জায়গায়। এক-আধটা নয়, পল্টনখানেক। রকমারি ভূত, হরবখত চরে বেড়ায়। অনেকেই দেখে থাকে। দু-একজন হলে বলতে পারতেন যে চোখের ভুল।

এতগুলি ভদ্রলোক সমকণ্ঠে বলছেন, একেবারে নস্যাৎ করি কেমন করে? কিন্তু ভূত আস্তানা গাড়ে তো অশ্বত্থগাছে, পেত্নী শ্যাওড়াগাছে, ব্রহ্মদৈত্য বেলগাছে। এ জায়গায় শুধুই ধানবন। ধানবনের হাওয়া খেয়ে খেয়ে ভূত মশায়রা না হয় বেঁড়িয়ে বেড়ালেন। কিন্তু তার পরে পা ঝুলিয়ে বিশ্রাম করবেন—এক টুকরা এমন গাছের ডাল তো দেখছি নে কোন দিকে।

প্রত্যক্ষ জিনিসে ঘাড় নাড়লে কে না চটে যায়? ওঁরা বললেন, বেশ বাজি ধরুন। দশ টাকায় এক টাকা। নিশিরাত্রের দরকার হবে না—এই

ন'টা-দশটা নাগাত এখানটায় একবার চক্কোর দিয়ে যাবেন। আমরা ঐ আমতলার বাড়িটায় বসব। ফিরে গিয়ে তারপরে আমাদের কাছে বলবেন, নেই ভূত। ঘাড় হেঁট করে মেনে নেব। ও কি কি ওখানে?

আমরা তর্কাতর্কি করছি, আর সেই আমতলার বাড়িতেই দেখতে পেলাম অনেক মানুষের জটলা। কি ব্যাপার? দেখবার জন্ম ওঁরা হনহনিয়ে চললেন। আমিও চলেছি পিছু পিছু। কলাগাছ পেঁপেগাছ মানকচু আর আমের চারায় ঘেরা ঝকঝকে তকতকে কেমন সব ঘরবাড়ি! আহা, দেখুন দেখুন—ফাঁকা মাঠের ধারে মন্দির গড়ে গড়ে যেন লক্ষ্মী-স্থাপনা করেছে!

উঠানের সেই ভিড়ের মধ্যে—কি আশ্চর্য—পরেশ যে! হোগলাডাঙার পরেশ। আমায় দেখে পরেশও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আমার সঙ্গীরা এদিকে নানান প্রশ্ন করে চলেছে, কার কি হল গো? স্বরূপ ওঝা কেন এ বাড়ি?

বাড়ির কর্তাটি বুড়োমানুষ। স্বরূপ ওঝা কি কানে কানে বলল, বুড়া হাঁক দিয়ে বলেন, অ বউমা, ইদিক পানে এস দিকি একবার—

স্বরূপ বাধা দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, এমনি এমনি ডাকলে সন্দ করবে। আরও বিগড়ে যাবে। একটা কাজের নাম করে ডেকে আনুন।

বুড়া বললেন, ভদ্দরলোকেরা এসেছেন—কলকেটা সেজে দিয়ে যাও তো বউমা!

আমি এই ফাঁকে পরেশদের কিছু খবরাখবর নিচ্ছি। বেশি দেরি হল না—কমবয়সি এক বউ কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে কর্তার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিল। আহা, ভারি সুন্দর বউটুকুন! দেশভুঁই ছেড়ে আসবার সময় নানান রকমের ধকল গিয়েছে তো, তা সত্ত্বেও ঝিকমিকে চেহারার উপর এমন কিছু কালিমা পড়ে নি। ঘোমটা নেই, সিঁথির উপরটায় শাড়ির আঁচল। তামাক দিয়ে ধীর পায়ে সে ছাঁচতলা অবধি চলে গেল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ফিক করে হেসে বলে, আ মরণ! বউমা বলছ আবার কোন্ সুবাদে? আমায় বেয়ান বলে ডাকবে।

কর্তা স্বরূপের দিকে তাকিয়ে হাহাকারের মতো বলে উঠলেন, শুনলে? কথা শোন একবার! চোখ তুলে কথা বলতে পারত না আমার লক্ষ্মীমন্ত বউ। তার কি দশা হয়েছে, দেখ।

বউ কোন-কিছুই দৃক্‌পাত করে না। হাসতে হাসতে দাওয়ায় উঠে কুলো আর চালের কলসি নিয়ে অসময়ে এখন চাল ঝাড়তে বসল। ঝাড়ছে আর

আড়চোখে শশুরের পানে তাকিয়ে হাসে মিটিমিটি। বুড়ো এদিকে হুঁকা টানেন—ধোঁয়া বেরোয় না। আর হাসি ততই বেড়ে যাচ্ছে বউ-এর। রাগ করে শেষটা কলকে ঢেলে ফেলে দেখলেন, তামাকই দেয় নি মোটে—ছাইমাটি-গুড়ে তার উপরে আগুন দিয়ে এনেছে। বউ হাসিতে ফেটে পড়ল একেবারে। বলে, ঠাট্টা করলাম বেয়াই। তুমি ধরতে পারলে না—হি হি-হি, কেমন বেকুব!

বুড়া আমাদের দিকে চেয়ে সজল কণ্ঠে বললেন, অদৃষ্ট দেখুন মশায়রা, জমিজিরেত ঘরবাড়ি ছেড়ে পথের ভিখারি হয়ে তো এসেছি। একটা ছেলে মাত্তোর—খুঁজে-পেতে মনের মতন বউ এনেছিলাম, তারও এই গতিক। সাত-আট দিন আগে থেকে লক্ষণ টের পাচ্ছিলাম, এখন পুরোপুরি পাগল। নয় তো, বেহাই ডাকবে কেন আমায়?

স্বরূপ ওঝা এক নজরে এতক্ষণ বউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখের উপরটায় আরও কি যেন দেখছে। বলে, পাগল বলেন কোন্ বিবেচনায়? উড়ো-বাতাস ভর করেছে। চিনবার চেষ্টায় আছি, শয়তানটা কে। তার পরে বিহিত করা যাবে।

যেই মাত্র বলা, বউ হাতের কুলো ফেলে দিয়ে এক লম্ফে উঠানে নামল। চোখ পাকিয়ে পড়ে স্বরূপকে এই মারে তো এই মারে। সামনের উপর দু-হাত নেড়ে বলে, ওঃ—ভারি তুমি ওঝা হয়েছ! ক্ষমতা জানা আছে। কি বিহিত করবে কর। দেখ তোমার হদ্দমুদ্দ, আমি নড়ছি নে। কিছুতে না।

স্বরূপ এদেরই এক দলে পাকিস্তান থেকে এসেছে। পুরানো চেনা-জানা। ঘাড় ফিরিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলে, তড়পানিটা শুনলেন? অমনি দশ রকম বলে গুণীনকে ভাগিয়ে দেবার ফিকির। বেটি ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখে নি।

বলে তো যাচ্ছেতাই গালিগালাজ শুরু করল। এমন, যে দুকানে আঙুল দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই আবার মা-লক্ষ্মী বাপু-বাছা বলে খোশামোদ করছে। তিতো-মিষ্টি কোন পন্থায় কিছু হয় না। তখন বলে, ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ না খেয়ে নড়বি নে? বেশ, সেই দু-খানার জোগাড় করি তাহলে। নিয়ে এস দিকি এক ছটাক ধুনো আর পোয়াটাক সরষে—

এত বড় আস্ফালনেও বউ ভয় পায় না, খলখল করে হাসে। বলে, আর পশার বাড়িও না ওঝা, তোমার মুরোদ জানা আছে। ধুনোবাণ জান না কচু জান। তবে সেবারে পারলে না কেন?

কর্তা অবাক হয়ে বলেন, কোন্ বারের কথা বলছে স্বরূপ? বউমার আর কবে এমন হয়েছে?

ওঝা খুব চটে গেছে। জবাব না দিয়ে সে তড়বড় করে মন্ত্র পড়ছে আর সর্ষে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে বউ-এর গায়ে। বউও দেখা গেল, বিড়বিড় করে কি বলছে, উচ্চহাসি হেসে উঠছে এক একবার। নিশ্বাস নিরুদ্ধ করে কাণ্ড দেখছি আমরা উঠানসুদ্ধ মানুষ।

আধঘণ্টা খানেক চলল এমনি। শেষটা হতাশ হয়ে স্বরূপ বলে, না মশায়রা, কিছু করা যাচ্ছে না। কোন্ ঘাঘি এসে ভর করেছে—যত মন্তর পড়ছি, সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টো কাটান দিয়ে যাচ্ছে ঐ দেখুন। একে শায়েস্তা করা মুশকিল।

কে-একজন বলে উঠল, কেতু সর্দারকে আনতে চলে গেছে।

অ্যাঁ! কেতুর নাম শুনে বউ আঁতকে ওঠে। মুখ পাংশু হয়ে যায়। বলে, কেতু বাড়ি নেই। লাঙল নিয়ে ক্ষেতে বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণ—

বাড়ির কর্তা বউ-এর সেই শ্বশুর বললেন, ক্ষেত থেকে ডেকে তুলে আনবে। তার হাতে জব্দ হোস কি না, দেখা যাক।

স্বরূপ ওঝা তো ফেল হয়ে গেছে। কেতু সর্দারের সঙ্গে কি-রকমটা জমে, না দেখে যেতে মন সরে না। পরেশ বলে, বিস্তর দেরি হবে দাদা। কেতু ক্ষেতে নেমে পড়েছে—এ সব কাজে পয়সাকড়ি নেই, কাজ খানিকটা না তুলে দিয়ে সে কি আর আসবে? ততক্ষণ আমাদের বাড়ি চলুন, সেখানে গিয়ে বসবেন।

মন্দ কথা নয়। আপাতত মজা নেই দেখে উঠানের ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পরেশ বলল, টুনি আছেন এখানে। দেশের মানুষ পেলে বড্ড খুশি হবেন। তাই চলুন।

টুনি—কোন্ টুনির কথা বলছে পরেশ! বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠি।

সঙ্গী ভদ্রলোকদের বললাম, দেশের মানুষ। এ বেলাটা ওদের ওখানে থেকে যাব। বিকালে ওরাই কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে। চলে যান আপনারা, কিম্বা দাঁড়িয়ে থেকে কেতু সর্দারের সঙ্গে লড়াইটা দেখে যান।

বড়রাস্তা ছেড়ে পাড়ার ভিতর ঢুকছি। টানা টানা পথ—দু-পাশে নয়ানজুলি। নিজেরা কোদাল ধরে এসব বানিয়েছে। হলদে হলদে ঝিঙাফুলে ক্ষেতের বেড়া আলো হয়ে আছে। খটখট তাঁত চলার আওয়াজ পাচ্ছি এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে। এক ফাঁকা জায়গায় সুতো টানা দিয়ে মাড় মাখানো হচ্ছে। দেশি বুরুশ—ঘুনিবাঁশের শিকড় বেত দিয়ে বোনা—আপনাদের বিলাতি বুরুশের চেয়ে অনেক বেশি নরম। সেই বুরুশে মাড় মাখিয়ে সুতার উপর আলগোছে ছুঁয়ে জোরে দৌড়তে হয়। ভারি ভারি মরদ জোয়ান

ঝিমঝিম খেয়ে যায়—কিন্তু কি আশ্চর্য, এ জায়গায় দেখতে পাচ্ছি এক মেয়ে। আয়ও কাছে এসে—বিশ্বাস হয় না—চোখ কচলে দেখতে হয়, সত্যি না স্বপ্ন দেখছি? মাড় মাখানোর কাজ করছে টুনি। পরেশ ততক্ষণে হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেছে: এ কি, এটা কি হচ্ছে বলুন তো?

টুনি, টুনি, টুনি—

ডাকতে গিয়ে মুখে আওয়াজ বেরুল না। কী ছিল, কী হয়েছে! সুধাংশু কবিরাজের মেয়ে টুনিকে এই অবস্থায় চোখ মেলে দেখতে হল!

টুনি নামটা কিসে হল—সে আপনারা জানেন না বুঝি? আমাদের গাঁ-অঞ্চলে ছোট্ট এক রকম পাখি, টুনি বা টুনটুনি—ফুরফুরিয়ে উড়ে বেড়ায়, বড় বড় গাছ থেকে ঝুলে-পড়া গুলঞ্চলতায় দোল খায়। টুনি আমাদের সেই এক পাখি! নামকরণ ছোট্টবেলাকার—কিন্তু কি করে তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন, কিশোর বয়সে এই মেয়ে ঠিক এক টুনিপাখি হয়ে উঠবে।

টুনির বাপ সুধাংশু দেবনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজনই বটে—সুধাংশু কবিরাজ। কবিরাজের চকমিলানো বাড়ি, অঞ্চল-জোড়া নামডাক। রোজ সকালে লোকে লোকারণ্য। রোগি দেখে শেষ করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। দু'টি ছাত্র পোষেন কবিরাজ—তারা খায়-দায়, পড়াশুনো করে। তারাও রোগি দেখে কবিরাজের সঙ্গে। তবু ঐ অবস্থা।

পরেশও এসে জুটেছিল সুধাংশুর বাড়ি। আপন বলতে কেউ নেই দুনিয়াদারিতে—হিসাব-পত্তর করে সুধাংশুর সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়ে, সেই সুবাদে এসে আশ্রয় নেয়। গোড়ায় ছাত্র হিসাবে ছিল। কিন্তু কবিরাজ দেখলেন, ঐ নিরেট মাথার মধ্যে চরক-সুশ্রুত ঢোকানো যাবে না, রোগি মেরে মেরে সাবাড় করবে। তখন বকাল গুঁড়ো করার কাজে দিলেন। অসুরের মতো জোয়ান, পদদাপে পাহাড় চুরমার হয়, সে-মানুষ হামানদিস্তায় কন্টিকারি পিষতে পারবে না কেন? কিন্তু মুশকিল হল, বিষম আলসে, আর বড্ড ভুলো-মন। কন্টিকারি পিষতে বলেছ তো বিস্তর হাঁকডাকের পর ঘৃতকুমারী নিয়ে বসল। কোনো কাজে ভরসা করা যায় না, সদাসতর্ক থাকতে হয়। শেষ অবধি পরেশের কাজ দাঁড়াল রান্নার কাঠকুটোর জোগাড় দেখা আর কবিরাজের ঘোড়াটাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ানো। তা-ও কি করতে চায় —শুয়ে-বসে কূল পায় না, কাজ করে কখন? টুনি থেকে শুরু করে বাড়ির সকলের এই নিয়ে হাসিমস্করা, গালিগালাজ। পরেশ গালি খায়, আর ঐ সঙ্গে এবেলা-ওবেলা ভাত খায় দুটো দুটো!

টুনির বিয়ে হবে। তিন পুরুষের মধ্যে ধরুন এই একটা মেয়ে। সুধাংশু

কবিরাজেরা তিন ভাই, বোন নেই। তাঁর বাপ-খুড়োদেরও সেই অবস্থা। ঠাকুরদেবতার কাছে বিস্তর মাথা খুঁড়ে এই মেয়ে হয়েছে বংশের মধ্যে। তার বিয়ের কি পরিমাণ ধুমধাড়াক্কা, অনুমানে বুঝে নিন। কিন্তু সমস্ত বরবাদ হল স্বাধীনতার ঘূর্ণিঝড়ে। কবিরাজ, তাঁর ঘরবাড়ি-ধনদৌলত—ফুৎকারে সব উড়ে-পুড়ে গেল।

নিরিখ করে দেখুন, টুনির কপালখানা জুড়ে কাটার দাগ। কপাল ভাল, রামদা-এর একটা মাত্র কোপের উপর দিয়ে গেছে। মানুষের চলাচলে কবিরাজবাড়ি গমগম করত—এখন যে যার মতো ভেগে পড়েছে, কবিরাজ নিজে মরেছেন। টুনিরও বাপের দশা হত, সকলের ঠাট্টাতামাসার পাত্র পরেশ ছুটে এসে মাঝখানে যদি না পড়ত। টুনির গায়ে পড়ল একটা কোপ, পরেশের তিন-চারটা। পাথুরে-জোয়ান—চার-চারটে কোপ খেয়েও ভুঁয়ে পড়ল না। তার পর অনেকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে অনেক দুঃখধান্দার পর সীমানা পার হয়ে এসে ঘর বেঁধেছে। টুনির কাণ্ড দেখে সেই পরেশ ছুটে গিয়ে পড়ল: এ কি! কি হচ্ছে, বলুন দিকি? এ সব কি আপনার কাজ?

আমার নয় তো কার? সংসার যেমন তোমার, তেমনি আমার। একজনে সারাক্ষণ খেটে মরবে, আর একজন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে—এ হতে পারবে না। আর দেখ, আপনি-আপনি করবে না আমায়। শুনে কান জ্বালা করে।

এমনি সময় আমায় দেখতে পেয়ে টুনি মুহূর্তকাল মুখ তুলে চেয়ে থাকে। আনন্দে বিগলিত হয়ে বলল, কোত্থেকে এলে দাদা?

পরেশই তড়বড় করে সব বলল। বলে, মেখলায় আমরা কম্বা তুলে দেব—দিয়ে দেখুন পারি কি না। তা কথা মোটে কানেই নিচ্ছেন না দাদা। ভাবছেন, ঘোড়ার-ঘাস-কাটা মানুষ কারিগরির কি জানে? তার পরেই আপনার কথা উঠল—বললাম, উনি আছেন এই জায়গায়—

টুনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: ফের আপনি?

থতমত খেয়ে পরেশ বলে, ভুল হয়ে গেছে। আর বলব না, কক্ষনো না।

আমায় সাক্ষি মানল: আপনিই বলুন। কত বড় বাড়ির মেয়ে, কখনো এ সব কাজ করেছে—না, করা উচিত? আমরা থাকতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাড় দেওয়ার কাজ কেন করবেন উনি?

আমি হেসে বললাম, বটেই তো! কিন্তু পরেশ, কথা দিয়ে তার পরেও উনি-উনি করছ, তোমারও এটা উচিত হচ্ছে না।

টুনি বলল, ঐ বড়বাড়ি কাল হয়েছে দাদা। মানুষজন মরে-হেজে

মাটির সঙ্গে মিশে গেল, ঘরদোর ভেঙে চুরমার হল, আসবাবপত্তর পুড়ে ছাই, —বড়বাড়ি তবু কিছুতে যায় না, ভূত হয়ে ওঁর মাথায় চেপে আছে।

কণ্ঠস্বর কান্নায় ভিজে এল। পরেশ মরমে মরে গিয়ে বলে, আমার মনে থাকে না। আমার স্মরণশক্তি কি রকম, দেশসুদ্ধ সকলের জানা আছে। কষ্ট দেবার জন্য বলি নে। কিন্তু আপনাকেও বিচার করতে হবে—এই সব কাজ কি মানায় ওকে?

আমি উল্লাস প্রকাশ করে বলি, বাঃ—আর তোমার রাগ করা চলবে না টুনি। 'ওকে' বলে ফেলল—আর তুমি কি চাও?

টুনির ছলছল চোখের উপর হাসির আভাস দেখা দিল। বলে, ও হুকুম করুক। কড়া হয়ে বলুক, যাও—ঘরে চলে যাও, এ সব করতে হবে না। এক্ষুনি যাচ্ছি আমি।

এত কথা পরেশ বলবে—তবেই হয়েছে! হুকুম-টুকুম নয়, অশেষ কষ্টে শুধুমাত্র বলানো গেল, ঘরে চলে যাও।

তাতেই স্ফূর্তি কত টুনির! যাচ্ছি গো যাচ্ছি—ঘাড় নিচু করে পরম আজ্ঞানুবর্তিনী হয়ে টুনি বাড়ির দিকে চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে একবার বলে, দাদাকে ছাড়বে না কিন্তু। এসে পড়েছেন, একটা বেলা কষ্ট করে যান বোনের বাড়ি।

না, না—তাই কি ছাড়ি!

হাত এড়ানো গেল না। থাকবার ইচ্ছে আমার নিজেরও ষোলআনা। আমাদের গাঁয়ের মন্মথ দাস, কালা দত্ত আর ঠাকুরদাস মণ্ডলও শুনলাম এখানে এসে ঘর বেঁধেছেন। জন্মে কোনদিন জানতেন না কোন্‌টাকে বলে টানা, কোন্‌টাকে বলে পোড়েন— তবুও তাঁদের কাজে লেগেছেন। পাড়াটা ধরেই ঐ বৃত্তি।

জাঙাল বেয়ে এই সময় একটা লোক আসছে। সঙ্গে ছোটখাট একটু ভিড়। লোকটার হাঁটার সঙ্গে কেউ তাল দিয়ে পারছে না। পরেশ বলে, ঐ—ঐ যে কেতু। এত তাড়াতাড়ি কেতু সর্দার এসে গেল! তা যান আপনি, দেখে আসুন। আমার যাওয়া হবে না। রান্না করতে গেলেন, সাথে-সঙ্গে না থাকলে পেরে উঠবেন কেন একা-একা?

তাড়া দিয়ে উঠি: আবার? বউটার মতন তোমার ঘাড়েও ভূত ভর করে আছে। ঐ যা বলে গেল টুনি।

কেতুর মত গুণীন হয় না। সে আমি চোখে দেখে এলাম। ধানসিদ্ধ করার বড় উনুন, পাশে বাতাবিলেবুর গাছ। সেই লেবুতলায় বউ বসে

আছে—এমনি বেশ ভালমানুষ, পা ছড়িয়ে দিয়েছে উনুনের দুই ঝিকের উপর। পাড়ার একটা মেয়ে চুল ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আহা, এমন ঘন মিশমিশে চুল অযত্নে অববেলায় জট বেঁধে রয়েছে, জট ছাড়িয়ে তার পরে ক্ষার দিয়ে মাথা ঘষে দেবে ভাল করে। কেতু সেই সময়টা আড়াআড়ি জাঙাল পাড়ি দিয়ে উঠল। বাড়ির কেউ তখন অবধি দেখতে পায় নি—বউ চঞ্চল হয়ে উঠল। বলে, ছাড় ছাড়—ছেড়ে দে আমায়। যেন অসুরের বল গায়ে। ধাক্কা মেরে পাড়ার মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরুল। ঘরের ভিতরে—একেবারে মাচার তলে।

আর কেতু সর্দারও তেমনি। উঠানের সীমানায় পা দিয়েই চেঁচাতে লেগেছে: কোনও শয়তানি খাটবে না! জানিস তো কে আমি? কি হল—পালিয়েছে বুঝি? গায়ে ময়লা মাখলে যমে ছাড়বে নাকি? চলে আয় বলছি, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়—

তাড়া খেয়ে বউ মাচার নিচে থেকে বেরিয়ে সুড়-সুড় করে সামনে চলে এল। কাঁদো-কাঁদো সুরে বলছে, যাব না আমি। মেয়েটাকে ছেড়ে কোথাও আমি থাকতে পারব না।

আপোসে যাচ্ছিস না তাহলে?

বিড়-বিড় করে কি-একটা মন্ত্র পড়ল কেতু। বলে, রোস—উঠোন-বন্ধনটা করে নিই আগে। পালাতে না পারিস।

তখন বউটা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে: সন্তানের মধ্যে এই এক গুঁড়ো। এর সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেশ ছেড়ে এসেছি। থাকতে পারলাম না। সর্দার, তোমার পায়ে পড়ি, আমার দিকে আর নজর ক'র না।

কেতু ভ্রূকুটি করে করে বলে, আচ্ছা মা তো তুই! মেয়ের কাঁধে চেপে চেপে বেড়াচ্ছিস, মেয়েকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছিস! শরম হয় না?

বউ বলে, কি করব, আপন-লোক সবাই চলে এল—সেখানে আর মন টেকে না। আসছিলাম বসন্তর মা'কে ধরে। বেশ ভাল লোক, এক বয়সে তার সঙ্গে আমি গোলাপফুল পাতিয়েছিলাম। তা পথের উপরেই সে বুড়ি মরে গেল, সে-ই এখন খোঁজাখুঁজি করছে, কার ঘাড়ে চেপে চলে আসে।

স্বরূপ ওঝা সেই থেকে আছে। সে বলে উঠল, ওঃ, তুই ভর করেছিলি বসন্তর মা'র ঘাড়ে? সে তবে তুই? আমায় চিকিচ্ছের জন্যে ডেকেছিল—

সেদিনও ঠিক আজকের মতন চিকিচ্ছে করেছিলে। ওঝা, তুমি ভাল লোক—বেশি ঝামেলা কর না।

বলতে বলতে বউ এরই মধ্যে খল-খল করে হেসে উঠল। সে হাসি থেমে গেল কেতুর হুঙ্কারে।

আজকে শক্ত পাল্লায় পড়েছিস। ভালর তরে বলছি, সরে পড়্। পাড়ার মধ্যে আসবি নে। শ্মশানঘাটার মাঠে আরও দশ-বিশটা রয়েছে তো—সেইখানে যা, স্বজাতির সঙ্গে থাকবি ভাল। দেশের মানুষজনও পাবি। মেয়ে এক রকম চোখের উপরেই থাকবে। ফুর্তিসে ধানবনের হাওয়া খেয়ে বেড়াবি। দিব্যি হবে। তাই চলে যা।

অনেক কান্নাকাটিতেও কেতু সর্দারের দয়া হল না। শেষটা বউ ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা—

আচ্ছা বললে শুনি নে। প্রমাণ দিয়ে যেতে হবে। ঐ আদাড়ে-কলসি আছে—পুকুরঘাট থেকে জল ভরে নিয়ে আয় দাঁতে করে।

বউ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কলসিটা তুলে নিল।

কেতু বলে, আর আমগাছের বড় ডালখানা ভেঙে দিয়ে যাবি যাবার সময়। তবে বুঝব, চলে গেছিস পাকাপাকি।

আজ্ঞে—

কি তাজ্জব! আপনারা বিশ্বাস করছেন না, আমিও করতাম না ব্যাপারটা যদি নিজচোখে না দেখে আসতাম। ঐ তো একফোঁটা বউ—সে করল কি, ভরা-কলসির কানায় কামড়ে ঘাট থেকে অতখানি পথ বয়ে নিয়ে এল। উঠানের উপর এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কলসি ভেঙে চুরমার। দাঁতকপাটি লেগেছে, শাশুড়ি জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে-মুখে। আর ঠিক সেই সময়টা মড়-মড় করে একটা আমের ডাল পড়ল ভূঁয়ে। ঝড় নেই, ঝাপটা নেই, আপনাআপনি ডাল ভেঙে পড়ল।

মগ্ন হয়ে দেখছি—পরেশ পিছনে এসে ডাকল, দাদা—

সে-ও এক ভরা-কলসি নিয়ে চলেছে। দাঁতে কামড়ে নয় অবশ্য, হাতে ঝুলিয়ে। বলে, এই বারে চলুন দাদা। দেখা তো হয়ে গেল, চলুন।

পরেশ আগে আগে যাচ্ছে। ছাঁচতলা অবধি গিয়েছে, আমি উঠানে। খুব বেশি দিন আসে নি এরা, রান্নাঘর বাঁধা হয় নি, দাওয়ায় রাঁধে। টুনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে হাঁড়িকুড়ি ফেলে নেমে এল। বলল, ওর জন্যে আমার মাথা ভেঙে মরতে ইচ্ছে করে দাদা। তাই করব একদিন। বাঁচতে আমার একটুও সাধ নেই।

আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। এইটুকু সময়ে যা দেখলাম, পরেশের তো

অপরিসীম যত্ন টুনির উপর। সেই যে বলে থাকে, কোথায় রাখি—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায়—ঠিক সেই গতিক। ইতিমধ্যে ঝগড়াঝাটি কিছু হয়ে থাকবে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে।

মোটা রকম উপদেশ ছাড়ি: অত রাগারাগি করলে সংসারধর্ম হয় কখনও? দুটো লাঠি একসঙ্গে রাখলে ঠকাঠকি হয়, আর দু-দুটো মানুষ হলে তোমরা—

টুনি কেঁদে ফেলল: ওর যা অত্যাচার—আপনি ভাবতে পারবেন না দাদা। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে কেউ কখনও শোনে নি। এই দেখলেন তো একটা—একহাট মানুষের চোখের উপর দিয়ে জলের কলসি নিয়ে আসা হল। তার মানে দশে-ধর্মের কাছে জানান দেওয়া, ঘরের মধ্যে কেউ নেই এসব কাজ করবার।

তখন মালুম হল। হেসে বললাম, এ তোমার অন্যায় পরেশ, ভারি অন্যায়!

টুনি বলে, অন্যায় আর ক'টা বলি। সারা দিন ধরে বললেও শেষ হয় না।

আমি পুরোপুরি রায় দিলাম টুনির দিকে: খবরদার পরেশ, আর কক্ষনো এমনধারা না হয়—

পরেশ অপরাধীর কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলে, আপনি এসেছেন দাদা। তাই ভাবলাম, রান্নাবান্নায় জলের একটু বেশি দরকার হবে। পুকুরঘাট অনেক দূর। আর ধরুন একা ঐ একজন মানুষ—

অধীর কণ্ঠে টুনি বলে, সে সমস্ত আমার বুঝবার কথা, পুরুষমানুষের কি! বলব কি, এমন ওর হাতসাফাই—কলসি পিছন থেকে কোন্ ফাঁকে চুরি করে নিয়েছে, একটুও টের পাই নি। টের পেলে কি আর ছুঁতে পারত।

পরেশ বলে, চুরি কিসে হল? রান্না হচ্ছিল, ডাল সম্বরা দেওয়া হচ্ছিল ওদিক ফিরে। আমি তাই বলতে পারলাম না।

টুনি বলে, দেখুন তাহলে দাদা, আমি কি মিছে বলি? কথার ঐ ধরনটা দেখুন না—

হাসি চেপে অতিশয় গম্ভীর হয়ে আমি বলি, তোমার কথার ধরুন অত্যন্ত খারাপ পরেশ। বলতে হবে, রান্না করছিলে তুমি। রান্না করছিলি বলতে পার তো আরো ভাল—বেশি নম্বর পাবে।

টুনি ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাই বলতে যাচ্ছে! সেই মানুষ আর কি—আপনিও যেমন!

বলে ফেল, রান্না করছিলে তুমি—

পরেশ বলে, বলব।

গতিক বুঝে আমি তখন খুব কড়া হয়ে গেছি। বললাম,, মুলতুবি রাখলে হবে না। এক্ষুনি—

হুঁ—

টুনি বলে, শুনলেন? বড্ড গরম হলেন তো, ঐ হুঁ-হাঁ বলে সারবে। তার উদিকে নয়।

সকলের তাড়া খেয়ে পরেশ অবশেষে অতিমাত্রায় কাতর হয়ে বলল, রান্না করছিলে তুমি—

টুনির মুখ হাসিতে ভরে গেল। আগের কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে, আমি এক হাভীর মতন মাগি ঘরে থাকতে পুকুর থেকে জল বয়ে নিয়ে এলে। লোকে কত কি বলাবলি করবে।

পুরুষসিংহ এইবার গর্জন করে উঠল: লোকের ঘাড়ে ক'টা মাথা যে বলতে যাবে। মাথা ফাটিয়ে চৌচির করে দেব না?

টুনি খিলখিল করে হেসে বলে, থাক—মাথা-ফাটাফাটির তালে যেতে হবে না। দাদা যা বলে দিলেন—আমার গেরস্থালির কোন কাজ তুমি করবে না। বুঝতে পারলে?

আজ্ঞে—

আর রক্ষা নেই। হাসি এক লহমায় শুকিয়ে নিঃশেষ হল। কোমরে আঁচলের ফেরতা দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল টুনি। যেন জ্বলছে: আঁজ্ঞে? আমি আজ্ঞে করব—আর তাই তুমি মেনে চলবে?

জলসুদ্ধ সেই মাটির কলসি দড়াম করে উঠানে ফেলে দিল। ভেঙে চৌচির। বলে, অনেক সয়েছি। অত্যাচার আর সইব না। আমি যাব—আমি গিয়ে খাবার জল নিয়ে এসে তবে তোমাদের ভাত দেব।

যত জল মাটিতে পড়ল, তত জলই টুনির দু-চোখে গড়িয়ে পড়ছে। অভ্যাসবশে নিদারুণ অপরাধ করে ফেলে পরেশ সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। আঁচলে চোখ মুছে টুনি বলতে লাগল, দেখলে তো দাদা। কেউ আমার নেই ত্রি-সংসারে। বাবা নেই, মা নেই, ভাই-বোন কেউ নেই—

আমি সান্ত্বনা দিই, স্বামী রয়েছে। পরেশ সত্যি কী যত্ন করে তোমায়! তোমার পায়ে কুশাঙ্কুর না বেঁধে সেই ওর চেষ্টা।

কথা শেষ করতে দেয় না। বলে, না, স্ত্রী বলে নয়—খাতির করে ও বড়বাড়ির মেয়েকে। মনে মনে আলাদা করে দিয়েছে। সেই কবে ঘি খেতাম, দুধে আঁচাতাম—আজও তাই যেন মুখে লেগে আছে! সমস্ত গেছে, বড়বাড়ির ভূত কাঁধ থেকে নামে না। কি করব, আমি কি করব!

একটু বিরক্ত হয়ে বলি, যাই বল, বাড়াবাড়ি তোমারও আছে। তুমি এদিকে কাজে ব্যস্ত, কলসিতে জল নেই দেখে—

রোদের মধ্যে আধ ক্রোশ ঠেঙিয়ে জল আনতে গেল। আমায় বলল না কেন? আমার চুলের মুঠি ধরে কেন বলে না, খাবার জল নেই—তার খেয়াল থাকে না কেন? তা তো বলবে না—বড়বাড়ির মেয়ে যে! ছোট বয়সে তখন দুষ্টু ছিলাম—সকলের উস্কানিতে একদিন বলেছিলাম, 'আপনি' বলে ডাকবে—খাটাখাটনি করবে, শুয়ে বসে ভাত মিলবে না। দিনরাত তারই এখন শোধ তুলছে।

কিছুতে বোঝাতে পারি নে। শেষ অবধি একটু ঠাণ্ডা হল, নিতান্ত আমি ঐ বেলা অবধি অভুক্ত রয়েছি বলে।

পাড়ার মধ্যে নতুন মানুষ এসেছে, বিকেলে জনকয়েক দেখা করতে এলেন। একটু লেখেন-টেখেন নাকি আপনি—মাথায় ভাল ভাল কথা আসে? ভাল মতন একটা নাম দিয়ে যান তো আমাদের কলোনির। এই যেমন আজাদগড়, জওহরপল্লী, নেতাজিনগর। বড় বড় নাম সবই তো লোপাট করে ফেলেছে। ভেবে-চিন্তে বলুন তো একটা কিছু?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ভূতখোলা। ওঁরা খুব বিরক্ত হলেন। অমন নাম কে পছন্দ করে বলুন? আমার কিন্তু ঐ ছাড়া আর কিছু মনে আসছে না।

ফাঁসি

প্রতিমা দেখা করতে এসেছে বিকালবেলা, টুনুও আছে। সন্ধ্যা হয়ে এল এই এতক্ষণ ধরে চলল কথাবার্তা। কেউ মানা করে নি। কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা করেছে প্রতিমা। টুনুরও মুখ শুকনো—মুকুন্দ এটা-সেটা বলে হাসাবার চেষ্টা করছে ছেলেকে। রসিকতা জমে না কিছুতে। টুনু হাসল বটে, কিন্তু প্রাণ-খোলা হাসি নয়—বাড়িতে যেমন সে পাশে শুয়ে কিম্বা কাঁধের উপর উঠে খিল-খিল খিল-খিল বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের হাসি হাসত। বাপ আর ছেলের মাঝখানে রাক্ষসের দাঁতের মত সাদা রঙ করা কঠিন গরাদেগুলো —হাসি জমাবার জায়গা কি এটা?

কত রকমের খাবার করে এনেছে, প্রতিমা খাওয়াতে লাগল। আজকের দিনে আইনের কড়াকড়ি নেই। হাঁড়ি থেকে একটা একটা করে মুকুন্দর হাতে দিচ্ছে ওদিক থেকে। মালপো আছে ক'খানা। ওই মালপো নিয়ে হাঙ্গামা

হল গেল-বছর বিজয়া-দশমীর পরদিন। শাশুড়ি মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন— মুকুন্দ তার মধ্য থেকে মালপো খেতে চাইল বিশেষ করে। প্রতিমা দিল না কিছুতে। বলে, লোভ কোর না লক্ষ্মীটি। অসুখ যাক সেরে, কত মালপো তৈরি করে খাওয়াব—কত খেতে পার দেখা যাবে! জ্বরে ভুগে ভুগে মেজাজ খিটখিটে—মুকুন্দ রেগে উঠল। কিন্তু নির্দয় প্রতিমা আমল দিল না। বলে, উঁহু—রাগ কোর না। রাগতে নেই—রাগলে শরীর খারাপ হয়।

ছোট বয়সে মা তার মাথায় আস্তে আস্তে থাবা দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। প্রতিমা ঠিক তেমনি ভাবে শান্ত করতে লাগল। মুকুন্দ ঘুমিয়েও পড়েছিল তার পরে।

এতদিন পরে প্রতিমা মালপোর প্রতিশ্রুতি রেখেছে। আজকে না হলে আর হতে পারত না। খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছছে। মুকুন্দ বলতে পারত, ছিঃ প্রতিমা, তোমার চোখের জল দেখে শান্তিতে যাব কেমন করে? কিন্তু লজ্জায় বাধে। এ সমস্ত যাঁদের কথা, সে তাঁদের পায়ের ধূলো নেবার যোগ্য নয়। টুনু যাবার বেলা হাত বাড়াল গরাদের ভিতর দিয়ে। এ জন্মে আর তাকে বুকে চেপে ধরা হল না। বললে হয়তো ওয়ার্ডার ব্যবস্থা করে দিতে পারত—এরা বড় ভাল—কিন্তু কি দরকার মায়া দেখিয়ে? কি লাভ হবে বাপে-ছেলেয় আকুল চোখের জলে ভেসে?

মানুষ আজ বড় ভাল, বড় আপন। স্নেহদৃষ্টিতে সবাই তাকাচ্ছে তার দিকে। কারও সঙ্গে অপ্রীতি নেই। হঠাৎ যেন মুকুন্দ রাজাধিরাজ হয়ে গেছে। স্নানের জল চাইতে ছুটোছুটি করে ওরা জলের ব্যবস্থা করে দিল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করছে: আর কিছু চাই? ছল-ছল করছে যেন সকলের চোখ। বাইরের পৃথিবী থেকে অনেকদিন তো আলাদা হয়ে আছে—আজকের আকাশ-বাতাসও বুঝি বিহ্বল হয়েছে একটি মানুষ চলে যাবে বলে। ভাবতেও তৃপ্তি!

দিনান্তের অন্ধকারে প্রতিমা ছেলের হাত ধরে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে—আর আসবে না। প্রথম পরিচয়ের সে দিনটা—দিন না রাত্রি তখন? ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন চারিদিক। মানুষ কি—হাত-পাগুলোই সঠিক চেনা যায় না। ট্রেন ছুটছে উন্মত্ত গতিতে—চাকার নিচে লাইনের জোড়গুলো খটাখট নড়ছে বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো। কানাডার অতিকায় ইঞ্জিন গাড়ি টানতে টানতে দুরন্ত আক্রোশে সিংহের মতন হাঁক দিয়ে উঠছে এক-একবার।

বেলা হল, কুয়াসা কেটেছে। ওপাশের সীটের উপরে বিস্তৃত কম্বল নড়ে

ওঠে একটুখানি। কম্বলের মধ্য দিয়ে সন্ত ঘুম-ভাঙা একখানা মুখ। ঘুম-ভরা চোখে প্রতিমা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

মুকুন্দপদ অবাক হল চারিদিকে চেয়ে। বাঙ্কের বাক্সপ্যাটরা সরিয়ে লোকের দাঁতখিঁচুনি খেয়ে একটুখানি স্থান সংগ্রহ করে সে কায়ক্লেশে পা গুটিয়ে শুয়ে ছিল—এখন নিচে উপরে দেদার জায়গা। ঐ যে মেয়েটা উঠে বসল, সে ছাড়া আর তিন-চারটি প্রাণী মাত্র কোণের দিকে।

প্রতিমা উঠে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে চুল আঁচড়ে একটুখানি পাউডার বুলিয়ে ওরই মধ্যে পরিপাটি হয়ে এল। মুকুন্দ নেমে এসে প্রায় সামনাসামনি বসেছে। খাবার বের করল প্রতিমা টিফিন-কেরিয়ার থেকে। বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। মনোযোগ দিয়ে স্বভাবের শোভা দেখছে, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত —এমনি অবস্থা। আর যেন নিজেরই অজান্তে আলটপকা এক একটা মিষ্টি ফেলছে মুখে।

খাওয়া শেষ। প্রতিমা তাকাচ্ছে ইতস্তত। ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ মুছল। গাড়ি থেমেছে একটা স্টেশনে। মুকুন্দ নেমে গিয়ে চা ডেকে নিয়ে এল। প্রতিমা তেমনি বাইরের দিকে চেয়ে। ট্রে সমেত তার পাশে রেখে দিয়ে চা-ওয়ালা চলে গেল। প্রতিমা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। তবু তেমনি অনড় হয়ে আছে।

মৃদুকণ্ঠে মুকুন্দ বলে, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে—

আমায় বলছেন ? কিন্তু চা আনতে আমি তো বলিনি।

মিষ্টি খেয়ে চা মনে মনে চাচ্ছিলেন নিশ্চয়—

না—

চা খান না ? তা হলে ডাব-টাব দেখি ?

মুকুন্দ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে আবার নেমে পড়তে যায়। প্রতিমা মৃদু হাসল এবার : থাক। এসে পড়েছে যখন, চা-ই খাওয়া যাক।

মুখ ফিরিয়ে বলে, কিন্তু এক কাপ মাত্র। আপনি খান না ?

খাই তো বটেই—

ইতস্তত করতে লাগল মুকুন্দ।

তবে ?

খালি পেটে চা খেতে নেই। ডাক্তারের মানা। ওতে ক্যান্সার পর্যন্ত নাকি হতে পারে। তা প্লাটফরমে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, খাবার ভাল পাওয়া যায় না। পুরি আছে পচা তেলে ভাজা—খেলে নির্ঘাৎ কলেরা।

এর পরে কোন্ পার্বতী চুপচাপ থাকতে পারে ?

আমার সঙ্গে আছে কিছু। ঘরে তৈরি ভাল জিনিস—খাবেন?

কেন খাব না?

কেরিয়ারের বাটি এগিয়ে দিতেই টপাটপ সে গালে ফেলছে। এই প্রত্যাশায় ছিল কি এতক্ষণ? প্রতিমার তাই তো ধারণা।

মুখের কাজ চালাতে চালাতে ওরই মধ্যে মুকুন্দ একবার তারিফ করে ওঠে: খাসা জিনিস। আপনাদের কেমন সব খেয়াল থাকে—সকালের ভাবনা দুপুরের ভাবনা ভেবে সমস্ত গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে পথে বেরোন। বসুন—আর এক কাপ চা বলে আসি তবে।

এই দিনটা নিয়ে প্রতিমা কত ঠাট্টাতামাসা করেছে পরবর্তীকালে। মুকুন্দ পরম ঔদরিক—সন্দেহমাত্র নেই। প্রতিমা বলত, নজর তখন আমার দিকে তো নয়—ছিল আমার টিফিন-কোরিয়ারের দিকে।

প্রতিমারা অনেকক্ষণ চলে গেছে। একটা মানুষ নেই অদূরের ঐ পাষাণ-মূর্তির মতো নিশ্চল ওয়ার্ডারটি ছাড়া। তাই বা কেন– মনের মধ্যে কত মানুষ আনাগোনা করছে! বিচিত্র শক্তি মনের—ভূত-ভবিষ্যতের হাজার-লক্ষ বছর পার হয়ে বেড়ায় পলক ফেলতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যে। মনোরথ বলা হয় মনকে। কিন্তু রথের গতি কোথায় লাগে এর তুলনায়?

মুকুন্দ যখন ছোট—ঐ টুনুরই মতন, বাড়িতে আটক থাকতে চাইত না কিছুতে। বার বার ছুটে বাইরের উঠানে আসে, উঠান পেরিয়ে ছড়কোর কাছে দাঁড়ায়, ছড়কো পার হয়ে জাঙাল ছাড়িয়ে বিলের ধারে চৌমাথা অবধি চলে যায়।

সেকালে এমনি এক সন্ধ্যা নেমেছিল গৃহস্থবাড়ির ঘরে ঘরে দীপ-দেখানো শঙ্খ-বাজানোর মধ্যে। মেঘ করেছে—আকাশের দিকে চেয়ে খোকা-মুকুন্দ মাকে প্রশ্ন করে: বাবা কখন আসবে? এত দেরি হচ্ছে, আসে না কেন?

আসবেন—

বৃষ্টি হবে ঝড় হবে, গাছপালা ভেঙে ভেঙে পড়বে—

তার আগেই এসে যাবেন।

কেউ না দেখে, কেউ না জানতে পারে—এমনি এক নিরালা জায়গায় গিয়ে সেদিন মুকুন্দ বারবার আকাশের দিকে প্রণাম করেছিল: হরি ঠাকুর, নারায়ণ, কেষ্ট-রাধা, আমার বাবা যেন এক্ষুনি ফিরে আসে—মোটে দেরি না হয়। তোমাদের হরির-লুঠ দেবো।

ছোটপিসি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় দুটো পয়সা তার হাতে গুঁজে দিকে

গিয়েছিলেন। সে পয়সা আছে টিনের কৌটোয় কড়ে-পুতুলগুলোর বিছানার নিচে। সেই সঞ্চতির জোরেই সে ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে খুশি করবার আশা রাখে।

আরও মেঘ জমেছে, ঝিলিক দিচ্ছে মেঘ চিরে চিরে। মুকুন্দ ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। নারায়ণ-কোঠা খান-তিনেক বাড়ির পর—এর উঠান ওর কানাচ দিয়ে যেতে হয়। শাঁখ-ঝাঁজর বাজছে সেখানে। আসন্ন দুর্যোগে মা বেরুতে দেবেন না—মুকুন্দ কাউকে না বলে টিপিটিপি চলল সেখানে।

চারিদিক থমথম করছে, হাওয়া নেই একটুও। ঠাকুরের শীতল-ভোগ হচ্ছে—ধূপ-গুগ্‌গুলের সুরভিতে মন্দির আচ্ছন্ন। মুকুন্দ এই সময়টা প্রায়ই আসে, পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। পুজোর পর প্রসাদ পাওয়া যায়। প্রসাদের লোভেই সে এসে দাঁড়ায়।

আজকে প্রসাদের জন্য নয়—প্রণাম করতে এসেছে। প্রণামের সঙ্গে মাথা ঠোকে, আর বিড়বিড় করে বলে, বাবাকে এনে দাও ঠাকুর, বাবা যেন দেরি না করে। ঝড়-বাতাসে কিছু হয় না যেন আমার বাবার—

একটা দুঃসাহসিক কাজ করেছিল সেদিন। কেউ জানে না—জানেন শুধু ঠাকুর। এক-দৌড়ে সে গাঙ অবধি চলে গিয়েছিল। রাত্রি হয়েছে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক বিলুপ্ত। জনমানবের সাড়া নেই—তার উপর কবিরাজের ভিটের দুরন্ত বাঁশ-বাগান। সেখান দিয়ে দল বেঁধে যেতেও গা কাঁপে। কবিরাজের নির্বংশ-বাড়ির যাবতীয় প্রেতাত্মার চলাচল নাকি ঐ সমস্ত বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে। ছেলেপুলে—বিশেষ করে মুকুন্দকে পেলেই অশরীরীরা ভয় দেখাত, কটর-কটর-কট আওয়াজ বেরুত এ-ঝাড়ে ও-ঝাড়ে। এক-একটা বাঁশ নুইয়ে একেবারে মাথার উপর নিয়ে আসে। দিনমানে এই অবস্থা—কিন্তু সেই রাত্রিবেলা বাপের জন্য উদ্বেগে শিশুর হুঁশজ্ঞান ছিল না একেবারে। ছুটতে ছুটতে সে গাঙের ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। একটা নৌকো নেই গাঙের উপর—অশ্বত্থের ছায়ান্ধকারে কয়েকটা মাত্র ডিঙি বাঁধা। দুর্যোগের শঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে যেন তারা গাছতলায় পালিয়ে আছে।

বাড়ি যাও খোকা, একা একা ঘুরছ কেন? এক্ষুনি বাতাস উঠবে।

মাঝির কথায় কেঁদে ফেলে মুকুন্দ বলেছিল, আমার বাবা—

তোমার বাবা বুঝি নৌকোয় আসছে? তা কান্না কিসের? নৌকো কোন্‌খানে বেঁধে রেখেছে—মেঘ কেটে গেলে ছাড়বে। তুমি ঘরে যাও। ঘরের লোক আবার তোমার জন্য ভাববে।

মা হয়তো খোঁজাখুঁজি করছে—এতক্ষণে মনে হল মুকুন্দর। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। দৈত্যের একটা দল বুঝি কোথায় আটকানো ছিল—ছাড়া পেয়ে তারা দাপাদাপি করছে গ্রামের উপর দিয়ে। সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড করবে। ভিজা-কাপড়চোপড় ভিজা-চুল ভিজা-গা-হাত-পা—মুকুন্দ ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল। মা রান্নাঘরে—কিছু টের পান নি তিনি। কাপড় ছেড়ে গামছায় ভাল করে গায়ের জল মুছে মুকুন্দ তাঁর সামনে গিয়েছিল। ঘুমোবে না সে—কিছুতে না—যতক্ষণ বাবা না ফেরে, চোখ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকবে। কিন্তু ঘুম ঠেকানো গেল না কিছুতে।—রাত দুপুরে বাবা ফিরেছিলেন, তখন সে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

তার টুনু হয়তো চুপি চুপি প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে। পৃথিবীতে কত কি আজব ঘটে! হঠাৎ ভূমিকম্পে এই জেলখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ইট-কাঠের স্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুকুন্দ তাদের পিছন-দরজায় গিয়ে ডাক দেবে: ও টুনু, ঘুমুচ্ছ?

সেই পুরানো রসিকতা: ঘুমিয়ে থাকো তো টুনুবাবু, 'হ্যাঁ' বলে জবাব দাও।

ফটকের পেটা-ঘড়িতে ঢং করে একবার বাজল। চোখ বুজে আছে মুকুন্দ, ঘুম নেই। এই শেষ রাত্রি। মুখ ফুটে কেউ বলে নি—কিন্তু সকলের ব্যবহারের হঠাৎ পরিবর্তনে বুঝতে বাকি নেই। বুদ্ধিমান বলে তার চিরকাল খ্যাতি—কিন্তু সমস্ত বোধ-চেতনা স্তিমিত হবে এক মুহূর্তে, এত কালের চেনা-জানা ধরিত্রীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যাবে। তার পর? সঠিক খবর কে বলবে? যুগে যুগে মানুষ নানা রকম ভেবে এসেছে, কিন্তু যুক্তির কোন পাকা বনিয়াদ নেই ভাবনার মূলে।

হয়তো মহাব্যোমে গ্রহ-তারকাদের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। তন্দ্রার ঘোরে এই ছোট্ট পৃথিবী এবং তার মধ্যে ততোধিক ছোট্ট এক সংসারের কল্পনা করেছিল। মৃত্যুর হয়তো উল্টো মানে—সুপ্তি থেকে পুনর্জাগরণ। মৃত্যুপারে গিয়ে উদ্দাম হাসি হেসে উঠবে সে হয়তো—স্বপ্নের মধ্যে কত হাস্যকর খেলাই না খেলেছে এতক্ষণ ধরে! অবাস্তব পৃথিবীতে পুত্র-কলত্রে সঙ্কীর্ণ এক নীড় সাজাবার খেলা। হোক হাস্যকর, কিন্তু বড় মনোরম।

বড় মনোরম টুনুর সঙ্গে খেলাধূলা। টুনু ডাকে, বাবা! টুনুকে মুকুন্দ পাল্টা ডাক দেয়, কি বাবা? সে ডাকের উত্তর টুনু আর দেয় না—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসি-হাসি মুখে অপরূপ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। বাপ হওয়ার দায়িত্ব যে অনেক—জামাজুতো কিনতে হয় ছেলের জন্য, খেলনা কিনে দিতে

হয়। টুনু এত সময় কোথায় পাবে? তাই সে চুপ করে থাকে। আবার একসময় পাল্লা বেধে যায় বাপে ছেলেয়—বাবা-বাবা, বাবা-বাবা…কে কাকে ডেকে হারাতে পারে! মুকুন্দ থেমে পড়ে একটু পরেই—কিন্তু টুনু ডেকে চলেছে। কী রকম পাগল দেখ—দম ধরে ডাকছে একটানা। মুকুন্দকে তখন বুঝিয়ে-সুজিয়ে থামাতে হয় তাকে: হেরে গেলাম—এই দেখ খোকন। তোমার সঙ্গে কি পারি? আর ডাকে না অত করে—খুব হেরেছি—তুমি এখন থামো—

জোরালো আলোর এক ফালি এসে পড়েছে সেলের মধ্যে। চোখ মেলে সহসা মুকুন্দর মনে হল, অনেক মানুষ চারিপাশে। মানুষের উপর মানুষ চেপে বসেছে। যারা মরে গেছে আর যারা বেঁচে রয়েছে। সত্যি সত্যি রয়েছে যারা, আর যারা আছে কল্পনায়।

কুলুঙ্গির মধ্যে বসে আছে চার বছরের মুকুন্দ। লাল গামছা মাথায় দিয়ে বউ হয়ে আছে।

মা বললেন, মুখ দেখি আমাদের রাঙাবউ-এর—ফেরাও এদিকে মুখখানা। হাঁ কর দিকি বউ—ওমা মা, আমসত্ত্ব মুখের মধ্যে কেন রে বউ-এর? তাই এত লজ্জা!

গুনগুন গুনগুন গুঞ্জন উঠছে, বিকালের রোদ এসে পড়েছে পাঠশালা-ঘরের দাওয়ায়। ছেলেরা দুলে দুলে পড়া তৈরি করছে। দ্বারিক পণ্ডিত মশায় জলচৌকির উপর বসে বারাণ্ডার খুঁটি ঠেশ দিয়ে অঙ্ক লিখে দিচ্ছেন মুকুন্দর শ্লেটে। শ্লেট ধুতে গেছে ক'জনে পুকুরঘাটে—কামিনীফুল-তলায় ভাঙা রানার উপর উবু হয়ে বসে মাজছে, শ্লেট ঝকমক করছে। পশ্চিম আকাশে পড়ন্ত সূর্য—নীরদ সেই দিকে মেলে ধরল শ্লেট। নাড়াচ্ছে—গোলাকার এক টুকরো রোদও নাচছে ঐ সঙ্গে। মনোযোগ দিয়ে মুকুন্দ অঙ্ক কষছিল—মুখে এসে রোদ পড়ল।

দেখুন তো পণ্ডিত মশায়, নীরদ কাজ করতে দিচ্ছে না।

দ্বারিক পণ্ডিত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, কোথায় নীরদ?

ঐ যে—দেখুন, ঐ কামিনীফুল-তলায়—

সে নীরদ কোথায় আজকে? একই গ্রামের বাসিন্দা, তার শৈশব-সাথী নীরদ?…

কষ্ট হচ্ছে?

খুব ফিসফিসিয়ে কে প্রশ্ন করল। মুকুন্দ চমকে ওঠে।

ভয় কিসের? কোন ভয় নেই—সবাই একসঙ্গে বেশ মজায় থাকা যাবে।

স্বর একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। ঘাড় ফেরাল মুকুন্দ। কেউ নয়। বলছে একেবারে কানের গোড়ায় দাঁড়িয়ে, অথচ দেখতে পায় না কেন?

কে তুমি?

আরও স্পষ্ট গলায় এবার জবাব এল: খাসা আছি। বড় ফুর্তিতে আছি আমরা। এলে দেখতে পাবি, একটা কথাও মিথ্যে বলছি নে।

চোখে না দেখেও চিনতে পেরেছে। কতকাল একসঙ্গে কাটিয়েছে, কত ভাব ছিল—চিনবে না? আরও আগে—প্রথম কথাটি বলা মাত্রই চেনা উচিত ছিল।

নীরদ, রাগ করিস নি আমার উপর?

রাগ কিসের? গুলি করে বুক ছেঁদা করলি—বাঁচিয়ে দিলি আমায় ভাই। বুঝতে পারবি নে, বুকের মধ্যে আমার কত আকুলি-বিকুলি করত ফাঁকিজুকি দিয়ে তোদের পথের ভিখারি করেছি বলে।

কিন্তু করেছিলি কেন বল্ তো?

নেশা। একসঙ্গে লেখাপড়া করতাম, কত বড় বড় বুলি কপচেছি সে আমলে ভেবে দেখ্। তার পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—সংসারে ডুবে গিয়ে সম্পত্তির নেশায় পড়ে গেলাম।

মুকুন্দর কাঁধে হাত দিল যেন নীরদ। অদৃশ্য, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের অতীত নয়। বলে, বাহাদুর তুই। সত্যি, বন্ধুর কাজ করেছিস—রোগ আরোগ্য করে দিলি এক মুহূর্তে। সেই একবার, মনে আছে, গাঙ সাঁতরাতে সাঁতরাতে টানের মুখে ভেসে যাচ্ছিলাম—তুই ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললি? এবারও দুর্গন্ধ পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছিস আমায়—ফাঁকায় দম নিয়ে বাঁচছি। একা তোর টুমুকে নয়—অনেককেই পথের ভিখারি করেছি ঐ রকম। আরও করতাম। অনেক রকম মামলার মতলব ছিল মাথায়। ওটা এক রকমের রোগ।

সে সময়টা তোর বড্ড লেগেছিল?

মুকুন্দ আন্দাজে নীরদের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিল ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছিল যেখান থেকে। পরম স্নেহে গভীর কাতরতায় হাত বুলাল তার ছেলেবেলার বন্ধু নীরদবিহারীর গায়ে।

হ্যাঁ নীরদ, তোর বোধহয় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল জানলা দিয়ে যখন আমার বন্দুকের গুলি গিয়ে বিঁধল?

কিচ্ছু না—শুধু চমক লেগেছিল প্রথমটা। এ ভারি মজা। আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়, কোন রকম হুঁশ থাকে না। কষ্ট যা-কিছু গোড়ায়—মরব-মরব

এক দুশ্চিন্তা। আসছে তো সেই ক্ষণ—জানতে পারবি, একটা কথাও মিথ্যে বলছি নে আমি।

সে ক্ষণের দেরি নেই বড় বেশি। অপরাধীকে ঝুলিয়ে খতম করে দেবে। চরম চিকিৎসা। ফিরে এসে আর কখনও যাতে সমাজের অহিত করতে না পারে। অহিত অবশ্য ওদের মতে। মুকুন্দর মত হচ্ছে, ওদেরই অনেকে এত অহিত করছে যে সেইগুলোকেই সর্বাগ্রে ঝোলানো উচিত। কিন্তু ফাঁসির দড়িতে অত অন্যায়ের ভর সইবে না নিশ্চয়—দড়ি ছিঁড়ে পড়বে।

ছিঁড়ে পড়লে, সে নাকি বিষম ব্যাপার! আর ফাঁসি দেওয়া চলবে না আসামিকে—সে তখন মুক্ত। আইনে সঠিক কি বলে, মুকুন্দ জানে না। কিন্তু লোকে বলে থাকে এই রকম। যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে আছে বিধাতার সঙ্গে—দড়ি ছিঁড়লে বা ফাঁস না আটকালে বুঝতে হবে, তাঁর সৃষ্ট জীব হননে সায় নেই বিধাতাপুরুষের। বর্বর পদ্ধতির সঙ্গে বর্বর যুগের সংস্কার জড়িয়ে থাকবে—এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কত সাবধানতা এই জন্য। মুকুন্দর ওজন নিয়েছে, ফাঁসির দড়িতে ঐ ওজনের মাল টাঙিয়ে ছিঁড়ে পড়ে কিনা—পরখ করে দেখেছে আগেভাগে। চর্বি ও কলা মাখিয়েছে দড়িতে, টান দেওয়া মাত্রই যাতে ফাঁস এঁটে যায়। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। একখানা এই মোটা বই আছে ফাঁসি দেবার প্রণালী সম্বন্ধে—দুর্গোৎসব-প্রকরণ কোথায় লাগে তার কাছে! আইন-কর্তা কেমন সহজ সচ্ছন্দ ভাবে সবিস্তারে লিখে গেছেন—লিখবার সময় আশেপাশে ঘুরছিল হয়তো তাঁর ভালবাসার মানুষেরা। চকিতে একটা বারও কি তাঁর মনে এল না মুকুন্দ হেন লোকগুলোকে—ফাঁসি যাওয়া যাদের ভবিতব্য?

থাক মুকুন্দর কথা—সে একটা সাধারণ খুনে। কিন্তু ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, দীনেশ-গোপীনাথ-সূর্যসেন—শত শত এমনি, ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হতে হয়—ফাঁসির দড়ি ফুলের মালার মতো কণ্ঠে তুলে নিলেন যাঁরা! কারার কক্ষে কক্ষে উন্মত্ত বন্দেমাতরম্‌-ধ্বনি, পোহাতি-তারা ছলছলিয়ে ওঠে আকাশে …তোমরা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছিলে সেই সময়টা—কারও কানে যায় নি ঊষা-লোকের সেই নিঃশব্দ ব্যাকুল কান্না। ফাঁসিমঞ্চ মহিমা পেয়েছে তাঁদের চরণ-স্পর্শে। খুনে মুকুন্দরও গৌরবভাগী হওয়ার কথা সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াতে পেয়ে।

আর, তাই ঘটল যে সত্যি সত্যি! মুকুন্দর কপাল—বিশ হাজারের মধ্যে যা একটা শোনা যায় না।

আকাশে পুরানো সাক্ষি সেই পোহাতি-তারা। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয়

কিলবিল করছে কালো কালো প্রেতের দল ফাঁসিক্ষেত্র ভরে। আইনের যত পাহারাদার সবাই ওরা হাজির। সেলের পিছন-দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে পৌঁচেছে মঞ্চ অবধি। ভূমি থেকে দেড়-মানুষ উঁচু হবে মঞ্চটা। মোটা দুটো খুঁটির মাথায় আর একটা মোটা কাঠ—হরাইজেন্টাল-বার অবিকল। তার দু-দিকের দু-আংটায় দড়ি পরানো। একেবারে একসঙ্গে দু-জনকে ঝোলানো চলে। হয়েও থাকে তাই একাধিক আসামি মজুত থাকলে। পাইকারি হারে খরচ কিছু কম পড়ে।

প্রক্রিয়াগুলো সমাধা হল একে একে। মঞ্চের তক্তার উপর মুকুন্দকে দাঁড় করিয়েছে। হাত দুটো পিছন দিকে বাঁধা। মুখ-চোখ কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে। জল্লাদ কাছে এসে অতি নিম্নকণ্ঠে মন্ত্র পড়ার মত বলে গেল, বাবু, রাজার আইন-দস্তুর হামাকে করতে হচ্ছে। হামার কসুর লিবেন না।

রাজার কাঁধে দোষ চাপিয়ে ঈশ্বর ও নিহতের কাছে সে খালাস থাকল। এই তার উপজীবিকা—নগদ টাকা বরাদ্দ আছে প্রতিটি ফাঁসিক্রিয়ার জন্ত। তার পর ছুটে সে হাতল ধরে দাঁড়াল। তৈরি—শুধু এবার ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

পেয়েছে ইঙ্গিত—হাতল ধরে দিল টান। ঘড়াং করে আওয়াজ হয়ে পায়ের নিচের তক্তা সরে গেল। মরে গিয়ে হাত পাঁচ-ছয় নিচুতে ঝুলে থাকবে—কিন্তু একি, পড়ে গেল যে পাতকুয়োর মতো সেই গর্তের তলায়। আছাড় খেয়ে ব্যথা লেগেছে, কিন্তু মরে যায় নি তো!

উপর দিকে মুখ করে চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে মুকুন্দর উল্লাস জানাতে ইচ্ছে করে—বেঁচে রয়েছি আমি। জজ গম্ভীর মুখে রায় দিল: তোমায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে—যতক্ষণ না তুমি মারা যাও। রায় পড়ে দিয়েই এজলাস থেকে উঠে গেল- সেদিন আর অন্ত কাজ হবে না। যে কলম দিয়ে রায় লিখেছে—সে কলমেও কাজ করবে না আর কখনও। এত আড়ম্বরের পর এ কি রকমটা হল? দড়ি ছিঁড়ে পড়েছে। কোন্‌খানে অসাবধানে রেখেছিল দড়ি—ইঁদুরে কেটেছিল বোধহয় চর্বি ও পাকাকলার লোভে। এরা লক্ষ্য করে নি।, আপিলে বাঁচতে পারে নি—ইঁদুর অবশেষে বাঁচিয়ে দিল।

হৈ-চৈ পড়ে গেছে। অন্ধকার গর্তের মধ্যে মুকুন্দপদ সমস্ত শুনতে পাচ্ছে—জ্ঞান আছে টনটনে। ভারি গলায় একজন বলছে—জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টই—যা কখনও হয় না, তাই ঘটল। চাকরি নিয়ে যে টান পড়বে।

মুকুন্দ হাসছে খলখলিয়ে। ধরে নিতে হবে, ফাঁসিই হয়ে গেছে—শাস্তি-ভোগের পর বিমুক্ত সে এখন। মঞ্চতলের ঘুলঘুলি খুলে ফেলল, ওইখানে

থেকে মড়া বাইরে তুলে নিয়ে আসে ফাঁসির পর। মুকুন্দপদ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, মাথা পৌঁচেছে ঘুলঘুলি অবধি। ক'জনে ধরে বাইরে আনল তাকে, হাতের বাঁধন কাটল, চোখের ঢাকা খুলে দিল।

কপাল-জোর বটে আপনার! চলে যান মশায়, আপনাকে আটকে রাখার এক্তিয়ার নেই।

মুক্তির আনন্দে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। প্রভাতের আলো অভিনন্দন জানাচ্ছে তাকে। মুক্ত লোহার দরজা। মাথা নত করছে ফটকের প্রহরীরা।

রাস্তায় পড়েছে। অবারিত পথ। ফিরে চলেছে বাড়িতে। ভাবতে পেরেছে কি, আবার বাড়ি ফিরবে কোন দিন?

ভিড় নেই। যানবাহনও অত্যন্ত কম। মানুষের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা এত সুন্দর লাগছে দীর্ঘ আট মাস আটক থাকার পর! সহপাঠী একজনের সঙ্গে দেখা—হন-হন করে ব্যস্ত ভাবে যাচ্ছে, সে নিশ্চয় খবর রাখে না মুকুন্দর, মুখ ফিরিয়ে একটু সাধারণ সম্ভাষণের হাসি হেসে চলে গেল। সুখ-দুঃখ-দোলায়িত মধুর পৃথিবী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিল চিরকালের মতো—মুকুন্দর উদ্দেশে এই হাসিটুকু দেখতে পেত সে কি আর জীবনে?

কই গো—

গলা শুনে প্রতিমা তাড়াতাড়ি দরজা খুলল। অবাক হয়ে থাকে মুহূর্তকাল। কথা বলতে পারে না! বলতে গিয়ে থরথর কেঁপে ওঠে ওষ্ঠপুট। ঝরঝর করে কেঁদে ভাসায়।

কোথায় টুনুবাবু? ঘুমুচ্ছে? ঘুমিয়ে থাক তো 'হ্যাঁ' বলে ওঠ—

প্রতিমা কথা বলতে পারছে না। ডাকাত ওদিকে জাগ্রত হয়েছে, দৌড়চ্ছে। বড় বড় চুল উড়ছে দৌড়বার বেগে, দু-হাত বাড়িয়ে আসছে··· ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

বাবা, আমি জানতাম তুমি আসবে। ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি। তিনি চোখ মুছিয়ে দিলেন—বললেন, আজকেই এসে যাবে তোর বাবা।

আট মাস ছেলে কোলে তোলে নি—বুকের ক্ষুধা উদগ্র হয়ে ছিল। আদরে আদরে মুকুন্দ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে··

আরে, আরে—অত জোরে ধোর না সোনা-মাণিক খোকনধন, লাগে—

মুকুন্দ সহসা গলার উপর অসহ্য ব্যথা অনুভব করল। এক মুহূর্ত—তার পর আর কিছু নয়—

মৃতদেহ আধঘণ্টা ঝুলবে ঐ গর্তে। তার পর টেনে তুলবে। রক্তাক্ত চোখের ঢেলা তখন বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে, জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে। এতেও হবে না। ডাক্তার পরীক্ষা অন্তে রায় দেবেন, মরেছে সত্যিই।

তখন ছুটি।

বাদাবনের গান

নিশিরাত্রে মর্জাল গাঙ বেয়ে যদি যাও, ঢোলকের আওয়াজ ও বিশ্রী বেতালা গান শুনতে পাবে। আমি শুনেছি, শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-সব কিছু নয়—মানুষই গায়। ওমশা—উমেশ মণ্ডল।

পাকা চুল, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, নিকষ-কালো গায়ের রং। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দুপুরে উমেশ আসে। অম্বিকের মাছের সায়েরে তার গানের আড্ডা। খাল-পারে বাড়ি—রাস্তাঘাট তৈরি করে শ্রমের অপব্যয় এ সব অঞ্চলে কেউ করে না। দুই জমির সীমানা ঠিক করবার জন্য সরু আ'ল—সেই আ'ল-পথে পথিকজন যাতায়াত করে। উমেশ বুড়া মানুষ—দিনমানেও সে আ'লের উপর দিয়ে হাঁটে না—একটু এদিক-ওদিক হলে পড়ে গিয়ে পা ভাঙার সম্ভাবনা। তার পথ বারো মাসই মাঠের উপর দিয়ে। শীত-বর্ষা জল-ঝড় কোন-কিছুই বাধা দিতে পারে না, যথাসময়ে সে সায়ের-মুখো ছুটবে।

সন্ধ্যা-রাত্রে ফড়খেলা হয় সায়েরে। ঝনাঝন পয়সা-সিকি-দুয়ানি বাজি ধরে কাপড়ে-ছাপা ইস্কাপন-রুইতন-হরতন-চিঁড়িতনের উপর। টেমি জ্বলে। ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় আলো নিবে যায় বলে কাচের চৌখুপিও আছে একটা। পয়সাকড়ির লেনদেন হয়—খেলার সমস্ত সময়টা আলোর প্রয়োজন। খেলার শেষে টেমি নিবিয়ে দেয়—অকারণ কেরোসিন পোড়ায় না। হয়তো-বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে চারিদিক থমথমে হয়ে আছে, পাড়ের উপর জল-তরঙ্গ কলধ্বনি করছে। আলো নিবিয়ে জন পাঁচ-সাত গোল হয়ে বসেছে দুরন্ত মর্জালের কূলে নিঃশব্দ প্রেতমূর্তির মতন। গাঁজার কলকে ফিরছে হাতে-হাতে। টানের চোটে দপ করে হঠাৎ জ্বলে ওঠে কলকের মাথা। উগ্র কটু গন্ধে ঘর ভরে যায়। কলকে শেষ করে সকলে উঠে পড়ে। নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরুবে, কিম্বা সরকারি রিজার্ভ জঙ্গলে ঢুকে পড়বে চুপি-চুপি।

অম্বিক এবার ঘুমোবে। শীত ও বর্ষাকালে ঘরের ভিতর শোয়, অন্য সময় দুধের মতো সাদা কোমল চরের উপর। রাতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলে কিছু

বিব্রত হয়ে পড়ে। সেই সময়টা অম্বিক সরল করে, অন্তত একটা পাশে গোল-পাতা ও হোগলার বেড়া দিয়ে নেবে। কিন্তু দিনমানে আর মনে থাকে না। ঘুম নিতান্তই যেন পোষ-মানা। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাসাগর্জন। যখন পাশ ফেরে, শব্দ শুনে মনে হয়—পর্বত ধ্বসে পড়ল বুঝি কোনখানে। জঙ্গলি-রাজ্যে মশার উৎপাত খুব। মশা নয়, ভীমরুলের বাচ্চা—অম্বিক রসিকতা করে বলে। আকারে তো বটে, হুলের জলুনিতেও। ঘুমের মধ্যে মশা মারার চেষ্টায় অম্বিক নিজের গায়ে চটাপট চাপড় মারে। মনে হবে, গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলেছে। আর ওদিকে ঢপাঢপ উমেশের ঢোলক বেজে ওঠে। একলা সে গান ধরে।

গান-বাজনা বন্ধ করলে ঘুম ভেঙে অম্বিক হাঁক দিয়ে উঠবে: হল কি বুড়ো?

উমেশ সচকিত হয়ে বলে, গলা ভেঙে গেছে কাঁচা-তেঁতুলের ঝোল খেয়ে।

অম্বিক আদেশ করে: হাত ভাঙে নি তো—হাতে বাজাও।

বাজনা শুরু হয়। দু-হাতের প্রচণ্ড পিটুনি। পরম আরামে অম্বিক আবার চোখ বোজে।

ভাঁটার জল নেমে যায় খাল দিয়ে। রাত শেষ হয়ে আসে। বাদুড়ের ঝাঁক দূর অঞ্চল থেকে জঙ্গলের দিকে ফেরে। হরিণের ডাক শোনা যায় নদীর ওপার থেকে। বুনোহাঁসের কলধ্বনি। উমেশের গান-বাজনা একটানা চলেছে। গাইতে গাইতে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়।

রাত শেষ হয়ে আসে। একটা-দুটো করে নৌকা এসে লাগে মোহানায়। সায়ের জমবে, বেচা-কেনা শুরু হবে এইবার। ঢোলক কাঁধে উমেশ ধীরে ধীরে সাঁকোর উপর গিয়ে ওঠে।

কত দিন? তা কম হল কি—এককুড়ি বছর তো হবেই! উমেশ শিক্ষিত ব্যক্তি—অ-আ ক-খ এবং ধারাপাতের আধাআধি মুখস্থ। কিন্তু হিসাবপত্রের ঘোর-প্যাঁচে মন যায় না। কিসের জন্য?...তখন একটা চুল পাকে নি, দেহ লিকলিকে অবশ্য—কিন্তু গাল বসে নি, কপালের শিরা বেরোয়'নি এমনধারা। সরু সরু হাত দুটোয় ভেল্কি খেলিয়ে দিত।

দয়া কত দিন বলেছে, কী বোঠে বাইলে গো! উজান কেটে হু-হু করে নৌকা ঘাটে চলে এল। হাত কি তোমার লোহার? সেই থেকে বাইছ—মা গো, ব্যথাও ধরে না!

লোহার কি কিসের, দেখ না পরখ করে।

লোভী উমেশ হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। দয়া মিটি-মিটি হাসে, সরে দাঁড়ায়। ঠাকুর-প্রতিমার মত হস্তেল-রঙের হাতে উমেশের কালো অঙ্গ ছুঁতে ঘৃণা হত বোধহয়। সেই যে গানে আছে,—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো কালা, কালো হবে অঙ্গ—' সেই বৃত্তান্ত আর কি!

-ঘাটে হাঁক দিচ্ছে, যাবে গো কুলটি—পাঁচারই—কুয়োমারি—? দু-আনা ফি চড়নদার। যাবে-এ-এ—

নিয়ম-রক্ষার মতো এক একবার হাঁক দিয়ে মাঝিরা গল্প গুজব করছে। নৌকার খোলে রান্না বসেছে কারও। লোক জমবার দেরি আছে। ভর-দুপুরে এই আগুনের মতো রোদের মধ্যে বাইরে বেরুবে কে? চৌধুরিহাটও জমজমাট। বেলা পড়ে এলে হাট ভাঙো-ভাঙো হবে—তখন মিলবে সোয়ারি।

দয়া হাউইবাজির মত সাঁ করে এসে লাফিয়ে উঠল। পাগলী দয়া, বজ্জাত একরোখা দয়া। উমেশের ডিঙায় উঠে পড়েছে। এমন লাফ দিয়েছে—ডিঙা যে কাত হয়ে ডুবে যায় নি, সেইটে আশ্চর্য।

এখনই ছাড়বে?

দু-দশ জন হোক—

হোক আর না-ই হোক—আমায় কিন্তু বেলাবেলি পৌঁছে দিতে হবে।

লাটসাহেবের মতো হুকুম ঝেড়ে দয়া ছই-এর ভিতর গেল। পুঁটলির গামছাটা খুলে গাঙের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে অন্তরঙ্গ সুরে বলে, মা-দাদা কেউ জানে না। মাসির অসুখ, এখন-তখন অবস্থা কিনা—চুরি করে দেখতে এসেছিলাম।

ভিজে গামছায় মুখ-হাত মুছে ঠাণ্ডা হল। তখন খেয়াল হল, উমেশ ডিঙা ছেড়ে দিয়েছে—প্রায় মাঝ-গাঙে এসে গেছে তারা। দয়া ভাবছিল, জোয়ার এসে পড়ায় সরিয়ে ডাঙার ধারে নিয়ে যাচ্ছে। তা নয়—একজন মাত্র যাত্রী নিয়েই নৌকো ছেড়েছে।

চললে যে? আর সোয়ারি কই?

তোমায় বেলাবেলি পৌঁছে দিতে হবে, বললে—

আর একটা মানুষও পেলে না?

উমেশ বলে, হাট না ভেঙে কে যাবে, কার দায় পড়েছে? তোমার মতো ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে না তো সবাই।

তবু দ্বিধান্বিত ভাবে দয়া বলে, এ কেমনটা হল! শুধু আমি আর তুমি।

বোঠে-বাওয়া মুহূর্তকাল বন্ধ রেখে উমেশ কৌতুক-কণ্ঠে বললে, ভয় করছে?

ভয় ? তোমাকে ?

পুঁটুলিতে চাট্টি চিঁড়েও এনেছে। দয়া কাঁচা চিঁড়ে কুড়মুড় করে চিবোচ্ছে ; অবহেলায় উমেশের দিকে তাকিয়ে দেখে না একবার।

খাওয়া দেখে উমেশও ক্ষুধা বোধ করে। ডিঙা খরবেগে ছুটেছে। বোঠে কেবল ছুঁয়ে রেখেছে জলে! অলস দৃষ্টি মেলে উমেশ আহার-পর্ব দেখছে।

যেখানটায় বসেছ, পাটার কাঠখানা তুলে ফেল দিকি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে দয়া বলে, কেন ?

তোলই না। তোমাদের মেয়েমানষের এই এক বড় দোষ—সব তাতে কেন, কি বৃত্তান্ত—

মুখ টিপে হেসে দয়া বলে, ক'টা মেয়েমানষের সংসার তোমার গো ? দেখে-দেখে হয়রান হয়ে পড়েছ !

পাটার কাঠ তুলে দেখল জলের কলসি। বাটিতে জল ঢেলে চিঁড়ে গামছায় করে ডুবিয়ে নিল তার ভিতর। গাঙের নোনা জল মুখে দেওয়া যায় না। তা বুদ্ধি দিয়েছে ভাল—চিঁড়ে মোলায়েম হয়েছে, খাওয়ার জুত হচ্ছে।

উমেশ বলে, মালসায় পাটালি দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার চোখ কানা।

দয়া বলে, গাঁজার নেশায় তো ঢুলছ। মনের মধ্যে ধুকপুকানি হচ্ছে আর এই নেশায়। সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। কানা যদি হব, এত সমস্ত দেখলাম কি করে ?

গাঁজার কথায় রাগ হল উমেশের। খামোকা এমনি এক-এক হাড়-জ্বালানো কথা বলে! জলের উপর থাকতে হলে দু-এক টান না টানলে চলে না। কিন্তু আজকের আচ্ছন্ন ভাব সমস্তটা দিন কড়া রোদে নৌকা বাওয়ার দরুন। কিন্তু প্রতিবাদ করল না—লাভ কি ? জগতে কেউ নেই যে তার উপর দরদ দেখাবে। আরও জোর দিয়ে উমেশ বলল, আলবৎ কানা তুমি। আচ্ছা, ফটিকের মধ্যে কি দেখেছ বল তো—যার লেগে মজে আছ ?

দয়া শুনতে পাচ্ছে না যেন। মুঠো-মুঠো চিঁড়ে মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। তার কত ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে।

তখন কোমল স্বরে উমেশ বলে, পাটালি খাও।

তোমার পয়সার পাটালি আমি খাব কেন ?

পয়সা দিয়ে কেনা নয়। এমনি।

চুরি করেছ ?

অর্থাৎ উমেশ চোর, উমেশ গেঁজেল—যত গুণের নিধি হল ফটিকচাঁদ। মেজাজ ঠিক রাখা দায়, তবু সে শান্তভাবে বলল, কত মানুষ ওঠা-নামা করে—

ভালবেসে ভারা দিয়ে গেছে—কেমন ?

জবাব ঠোঁটের কাছে এসে পড়ে, এই যেমন তুমি দয়াময়ী, ভালবাসার বন্যা খুলে বসেছ! পিরথিমের লোক সবাই তোমার মতো। শরীর কি মন-মেজাজ খারাপ হওয়ার দরুন কোনদিন যদি পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়, সোয়ারিরা বাপ তুলে গালি দেয় তারই নৌকার উপর বসে। মায়া-দয়া নেই।

কিন্তু এ সব কিছুই বলল না উমেশ। কৈফিয়তের ভাবে বলে, এক জনের ঝুনকে থেকে পড়ে গিয়েছিল। তা পড়ে-যাওয়া জিনিস খাও না তুখানা। শুধু-চিঁড়ে কত আর চিবোবে ?

দয়া সবেগে ঘাড় নাড়ে: নৌকোয় যাচ্ছি—নগদ পয়সা গুনে দিয়ে নামব। এই মাত্তর। খাতির-উপরোধের ধার ধারি নে।

ধৈর্য হারিয়ে উমেশ হাতের বোঠে কাড়ালে ফেলে দিল।

থাকল এই। বয়ে গেছে: একলা মানুষ—খাবে কে আমার পয়সা ?

বেশ, পাড়ে লাগাও—নেমে চলে যাই। নিয়ে এলে তবে কি জন্যে ?

কিন্তু কলহের অবসর কোথা ? মোচার খোলার মতো ডিঙি ঘোলার মধ্যে পাক খাচ্ছে। দয়া ছুটে আসে এদিকে।

দাও, বোঠে দাও আমার কাছে—

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, বুক ওঠা-নামা করছে। বলে, ইচ্ছে হয় তুমি মর। আমায় সুদ্ধ টানবে কেন ?

তা তো বটে। ফটকে হাপুস-নয়নে কাঁদবে তাহলে।

হুড়োহুড়ি। বোঠে উমেশ দেবে না কিছুতে। দয়ার হাত দুটো এঁটে ধরল, চোখে ধক করে আগুন জ্বলে ওঠে বুঝি! কোন দিকে কেউ নেই—করাল জলস্রোত খল-খল হাসছে শুধু। বাঘিনীর মতন দয়া তার হাত কামড়ে ধরল।

উমেশ তখন পায়ের ধাক্কায় বোঠে জলে ফেলে দিল। দয়াও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে—বোঠে ধরতে গিয়েছিল, টাল সামলাতে পারে নি। বোঠে কি ভেসে থাকে, জল-তলে ডুবে গেছে চক্ষের পলকে।

অবস্থা বুঝেছে উমেশ। রাগের বশে বোঠে ফেলে বেকুব হয়েছে—নৌকো বানচাল হবার উপক্রম। ছইএর উপর আর একটা ছিল, এক পাশ ভাঙা—তাই নিয়ে প্রাণপণে বাইছে। পাকা হাত—সামলে নিল। দ্রুত বেয়ে গেল দয়ার কাছে: উঠে এস দয়া—

দয়া আগুন হয়ে বলে, কক্ষনো না। জন্তু-জানোয়ার তোমার সঙ্গে এক নৌকায় বসব ? থুঃ—

বড্ড টান আজকে। কুমির-কামটও খুব এই সব জায়গায়।

ধরে ধরবে কুমির-কামটে। তারা সোজাসুজি কামড়ায়—ছলা-কলা নেই।

উমেশ মরমে মরে গেছে। কথা বলবার মুখ নেই সত্যি। ডিঙি বেয়ে যাচ্ছে দয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যত কাছে আসে, দয়া তত সরে-সরে যায়। কালো মত কী একটা দূরে। চর উঠেছে বুঝি—মাঝ-গাঙে মাটি দেখা দিয়েছে? আনাড়ি লোক তাই ভাববে, কিন্তু উমেশ জানে। কুমির পিঠ ভাসিয়ে আছে। ডুব দিল বলে—দয়া যে রকম দাপাদাপি করছে। অব্যর্থ ওদের তাক—চক্ষের পলকে জলের নিচে টেনে নিয়ে যাবে। শুধু পলকের জন্য রাঙা হয়ে যাবে স্রোতের খানিকটা।

উমেশ পাগলের মতো হয়ে যায়। মিনতি করে: এস দয়া, আর কোন দিন কিছু বলতে যাব না। এই শেষ একটা বার আমার কথা পেত্যয় করে দেখ। উঠে এস।

দয়াও নরম হয়েছে, জল টেনে-টেনে পারছে না আর—ডিঙি দেখে এবার ছিটকে গেল না। উমেশ তার কাছে, একেবারে পাশটিতে, চলে এসেছে—সেখান থেকে বোঠে এগিয়ে দিল। এঁটে ধরল দয়া—ধরে জিরিয়ে নিচ্ছে। বড় ক্লান্ত হয়েছে স্রোতের সঙ্গে এতক্ষণ লড়াই করে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

বোঠেয় হয় না—উমেশ হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। একটা হাতের বলে অত বড় মেয়েকে টেনে তোলা সহজ নয়—নিজে আবার হুমড়ি খেয়ে না পড়ে! তুলে ফেলল অবশেষে। দয়া এলিয়ে পড়েছে। উমেশ নিঃশব্দে শান্ত ভাবে বেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দয়া চমকে উঠে বসল।

ও কি, রক্ত কিসের?

সাপে কেটেছে।

দেখি, দেখি—

না, দেখতে হবে না। জন্তু-জানোয়ারের একটু-আধটু রক্ত পড়লে কি আর ক্ষতি হয়?

রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কী সর্বনাশ! পাড়ে ধর বলছি।

না—

আমার দোষ। যেখানেই যাই, একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসি।

ঠাস-ঠাস করে নিজের গালে চড় মারছে মেয়েটা। উমেশ হাঁ-হাঁ করে ওঠে: আরে, দোষ তো আমারই! আমি একনম্বরের গাধা। সোমত্ত মেয়ের হাত ধরা অন্যায় হয়েছিল। আমারই দোষ।

দয়া বলে, আমিই বা কোন্ আক্কেলে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম। ছি-ছি—মানুষ না কি আমি! সরো, আমি বেয়ে দিচ্ছি খানিক।

তখন উমেশ সস্থির ভাবে বলে, এখানে নয়। শিবসার মুখ এটা—এ জায়গায় পেরে উঠবে না। খালে পড়ি—সেই সময় তুমি লগি মেরো।

দয়া খুব খুশি হল: সেই ভাল। খালে-খালে যাওয়া যাক। গাঙে পড়ে দরকার নেই।

বিষম ঘুর-পথ কিন্তু। তোমায় যে আবার বেলাবেলি পৌঁছতে হবে।

অধীর কণ্ঠে দয়া বলে, তাই বলে এ অবস্থায় নৌকা বাইয়ে তোমায় মেরে ফেলব কি? না।

তবে আর কি! ঢুকে পড়, সামনে ঐ খাল চলে গেছে বেনেপোতার চরের পাশ দিয়ে। ধরণীর শিরা-উপশিরার মতো সংখ্যাতীত খাল অঞ্চলটা জুড়ে। সমস্ত উমেশের নখ-দর্পণে। রাত্রি প্রহর খানেক হয়েছে—এখনও চলছে তারা। দয়া একলাই লগি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পরনের শাড়ি কাঁধ ঘুরিয়ে ফেরতা দিয়ে মাজায় বেঁধে নিয়েছে। উমেশ কাত হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ছিটে জঙ্গল এধারে-ওধারে—জন-বসতি নেই, গাছে-গাছে বানরের পাল, সাপ চরে বেড়ায় হেঁতাল-বন ও দিগ্‌ব্যাপ্ত উলুঘাসের ভিতর দিয়ে। চাঁদ উঠল। এমন স্বচ্ছ সুন্দর চাঁদের আলো উমেশ জীবনে আর দেখল না। দিনমানের মতো জ্যোৎস্না কেওড়া-পশুরের পত্রপুঞ্জের ফাঁকে তেরছা হয়ে নৌকায় পড়েছে।

গীত গাও একখান, শুনি—

উমেশ ঘাড় নাড়ে: উঁহু—গান-টান আমার আসে না।

অভিমান-ভরা কণ্ঠে দয়া বলে, মিথ্যে বল কেন? গান গায় না সে-মানুষ পিরথিমে নেই।

উমেশ হেসে ওঠে: তা বটে। রাত-বিরেতে ভয়তরাস লাগলে গেয়ে উঠি কখনো-সখনো—

আজকে ভয় করছে না?

করছে।

অক্ষর-পরিচয় এবং যাত্রা শুনে বেড়ানোর দোষ যাবে কোথা! বলে, খালটুকু শেষ হলেই তো তোমাদের বাড়ি। পথ ফুরিয়ে যাবে, সেই ভয় করছে দয়াময়ী।

পূর্ণিমার কোটালে ঘোলা জল এসেছে—চিংড়ি পড়বে এবার। মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে খালে এসে জমেছে। কত নৌকা। নৌকা যাদের নেই, পাড়ে দাঁড়িয়ে তারা পাশখেপলা ফেলছে।

উমেশও ডিঙি নিয়ে চলে এসেছে, আজকে আর চৌধুরিহাটের সোয়ারি ধরতে যায় নি। কি দরকার? চিংড়ির খটি আছে—দু-ঝুড়ি পাঁচ ঝুড়ি যা নিয়ে যাবে, নগদ কড়ি সঙ্গে-সঙ্গে। খটিওয়ালারা যদ্দুর পারে হাটে-বাজারে মাছ চালান দেয়, বাকি শুকিয়ে রাখে। গরানের আগুন রাতদিন গন-গন করে মাছ শুকোবার প্রয়োজনে।

ঢাকের বাজনা শুনে কৌতূহলী উমেশ এক বাঁক এগিয়ে চলল। জাল বাইতে বাইতে যাচ্ছে—রংতামাসা যদি কিছু থাকে, সেটা উপরি লাভ। তামাসা দেখতে এসে কিন্তু বিপাকে পড়ে গেল। পারের প্রত্যাশায় দয়ারা খালধারে দাঁড়িয়ে। ছাঁচ-বাতালা একটা হাঁস ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে বনবিবিতলায় পুজো দিতে গিয়েছিল, এখন ফিরছে। মস্ত একটা দল—পুরুত আছেন, দয়ার বড় ভাই জনার্দন ও মুখ্যি-বুড়ি আছে, পাড়ার বউ-ঝিও আছে পাঁচ-সাতটা। হুড়মুড় করে সকলে উঠে পড়ল, ডিঙিতে তিলধারণের জায়গা নেই।

ইতিমধ্যে উমেশ মাছের খালুইটা টোকা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। লোকে টোকাই দেখছে, খালুই নজরে আসে না। কিন্তু দয়াময়ীর গতিক দেখ—এত পথ দিব্যি মেরে এল—আর নৌকোয় পা দিয়েই ননীর পুত্তলি উত্তাপে গলে যায় আর কি? উমেশ হাঁ-হাঁ করে ওঠে—কিন্তু তার আগেই সে হোগলার টোকা মাথায় দিয়ে মেমসাহেব হয়ে বসেছে।

বাঃ, বেশ খাসা চিংড়ি তো!

উমেশ কানে নিচ্ছে না। তাড়াতাড়ি এ পারে পৌঁছে দিতে পারলে হয়। জনার্দন স্পষ্টাস্পষ্টি চেয়ে বসে: জলের মাছ তো! খেতে দাও না ক'টা আমাদের।

নির্জীব কণ্ঠে উমেশ একটা শব্দ করল—যার অর্থ হাঁ-না দুই-ই হতে পারে।

দয়া মারমুখী হয়ে ওঠে: না-না—মাছ-টাছ কেন দেবে? অত খাতির কিসের? এটুখানি এগিয়ে শুধু যদি বাড়ির ঘাটে আমাদের তুলে দাও।

উমেশও অমনি বেঁকে বসে: আমার দায় পড়েছে! কিসের খাতির?

দয়া স্বর নরম করে বলে, হেঁটে-হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে। পারছি নে যে।

ফিক করে সে হেসে ফেলল। কে বলবে, এই মেয়ে একটু আগে আগুনের মতো জলে উঠেছিল।

উমেশ বলে, তাহলে মাছ নেবে বল? পাঁচটা কি ছ'টা মোটা মতন—ও ক'টা সমস্ত নিতে হবে। নয়তো নেমে পড় এই এখানে।

কে বলবে, এই উমেশই ব্যস্ত হয়ে খালুই ঢাকাঢাকি করছিল একটু আগে।

দয়া বলে, নিতে পারি এক কড়ারে। গান শোনাতে হবে।

উমেশের গর্ব হয়। আবার এত মানুষের মধ্যে লজ্জাও লাগে। বলে, যাঃ—আমার আবার গান!

ভবী ভোলে না। ঘাটে এসেও সেই কথা: গান শোনাবে তো বল। নইলে খালুই ছুঁচ্ছি নে।

ভাল রে ভাল! ফাঁকি দিয়ে অ্যাদ্দুর নিয়ে এসে—

দয়া বলে, গান তো গাইবে—আর খেয়েও যাবে। তবে মাছ নেব। আমার হাতের তরকারি খেলেই বা একদিন।

দয়ার মতো মেয়ে আর যদি একটি দেখে থাক! খাওয়াচ্ছে সামনে বসে—তা-ও রণমূর্তি। অতি-বড় শত্রুও বলবে না, উমেশ কম খায়। সাধারণ জন তিনেকের ভাত-ব্যঞ্জন শেষ করেছে, তবু দয়ার সন্তোষ নেই।

উঠছ? গুড় আনলাম কার জন্যে তবে? গুড়-তেঁতুল দিয়ে মেখে জল ঢেলে নাও।

আর খাব না।

খেতেই হবে।

গুড়ের বাটি উপুড় করল পাতে, ঘটি থেকে হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল।

যা খাওয়ান খাওয়াচ্ছে দয়াময়ী, হাত ধরে ওঠাতে হবে। নিজের বলে পেরে উঠব না।

মাদুর পেতে রেখেছি। হাত ধুয়ে গড়িয়ে পড় গে। কি কাজ আর এখন?

সত্যি বড় যত্ন করেছিল। সহোদর ভাইয়ের কথা বল কিম্বা বিয়ে-করা পরিবার বল (পরে সে বিয়ে করেছিল)—কেউ কোনদিন অমন এক-নাগাড়ে কাছে বসে থেকে খাওয়ায় নি।

উমেশ ঘুম ভেঙে ধড়-মড় করে উঠে দেখল, বেলা একেবারে পড়ে গেছে। আরে সর্বনাশ, ডিঙিতে করে গরুর খাবার বিচালি আনতে হবে যে! ঘাটে গিয়ে দেখে, বোঠে-লগি কিছু নেই—জোয়ারের তোড়ে ডিঙিটা দুলছে শুধু। কে নিয়ে নিল, খোঁজ—খোঁজ—।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে চোর উঠে এল

বাঁশতলার দিক থেকে। হি-হি-হি—হেসে একেবারে শতখান হয়ে পড়ে। সত্যি, এমন হাসতে পারত দয়া! হাসির তোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত জোয়ার-লাগা তার দেহের যৌবন!

গান-না শুনিয়ে পালাচ্ছিলে। যাও—চলে যাও না। আমি কিছু জানি নে।

বিপন্ন উমেশ বলে, দিয়ে দাও মাইরি। তাড়া আছে।

জলে পড়ে গেছে বোধহয়। আমি কি জানি?

তার পর কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বলে, আচ্ছা—গান তো ধর। দেখি খুঁজে-পেতে—পাড়ের কোনখানে যদি আটকে থাকে।

এ কি একটা গান গাওয়ার জায়গা? যেখানে-সেখানে গাইলেই হল?

দয়া আবার হেসে ওঠে: কি রকম জায়গা চাই? সামিয়ানা-ঝাড়লণ্ঠন লাগবে, আসর বসাতে হবে?

অতএব নিরুপায় উমেশ একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে গলুইএ জুত করে বসল।

দয়া বলে, রোসো—ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি। আর তোমার জিনিসপত্তর এনে দিই। আসছি এখুনি।

হলদে-পাখির মতো ফুড়ুৎ করে যেন লঘু পাখনা মেলে সে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। লগি-বোঠে নিয়ে এল। আর আনল ফটিককে।

মুখ বেজার করে উমেশ সম্ভাষণ করে: ফটিকচাঁদ এলে কখন?

দয়াই জবাব দেয়, তুমি ঘুমুচ্ছিলে—সেই সময় এসেছে। দাদা খবর দিয়ে এনেছে। আমাদের দোকানে থাকবে।

উমেশ বলে, গান আজকে হয়ে উঠবে না। গলা ভেঙে গেছে।

কে ভেঙে দিল গো?

বহু-প্রচলিত এদের এই স্থূল-রসিকতা। কিন্তু পাল্টা জবাবে উমেশের মন নেই। বলে, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল খেয়েছিলাম কি না!

হলই না-হয় গলাখান ভাল। কত খোশামুদি করাবে আমায় দিয়ে? বিদেশি মানুষটাকে ডেকে-ডুকে নিয়ে এলাম কিনা!

বোঠে মাটিতে ফেলে তার উপর পাশাপাশি চেপে বসল দয়া আর ফটিক। অর্থাৎ হাতে তুলে নিয়ে যে সরে পড়বে, সে উপায় নেই।

উমেশ গান ধরল—'কও দেখি হে লঙ্কাপতি, রাম কি বস্তু সাধারণ? চল, রামের সীতে রামকে দিয়ে হইগে গিয়ে শরণাপন।'

পুরানো গানের কথাগুলো গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। গলা-ভাঙার কথা

মিথ্যে করে বলেছিল, কিন্তু সত্যি সত্যি ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরুচ্ছে হাঁসের মতো!

শেষ হয়ে গেলে উমেশ কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না। দয়া বলে, ভাল। তবে সেদিনের মতন হল না। এই গান সেদিন কী সুন্দর গাইলে!

সে দিন আর আজ! বেনেপোতার চরে জ্যোৎস্নার ফুলঝুরি ঝরছিল—ডিঙির দুই প্রান্তে দুটি প্রাণী। চারিদিকে অসীম স্তব্ধতা—বাদা থেকে অস্বচ্ছ হরিণের ডাক আসছিল শুধু মাঝে-মাঝে। আজকে তোমার পাশে নিয়ে বসেছ সুন্দর চেহারার এক দুশমন। গান খোলে এ অবস্থায়?

দুশমনটা হেসে উঠল। দয়াও তো হাসে, কিন্তু ফটিকের মুখের এ জিনিস হাসি নয়—লাঠি মারা। হাসতে হাসতে ফটিক হিতোপদেশ দেয়: বোঠে বাইতে জান—তাই কর। গান গাইতে যেও না।

মনে মনে সেই মুহূর্তে উমেশ সঙ্কল্প করল, গানই গাইবে সে শুধু। বোঠে আর বাইবে না।

মন যার উড়ু-উড়ু, বাদাবনের উদ্দাম নদীখালে নৌকা বাওয়া সত্যিই চলে না তাকে দিয়ে। ডিঙি ভাইয়ের জিম্মায় দিয়ে সুরেন দাসকে সে গানের গুরু ধরল। দাস মশায় ওস্তাদ-গাইয়ে—অঞ্চল-জোড়া খাতির। দুপুরে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে উমেশ মৌভোগে ওস্তাদের বাড়ি রওনা হয়ে পড়ে। বেলাবেলি পৌছবার প্রয়োজন। এক-সংসারের কাঠ চেলা করতে হয় দাস মশায়ের ওখানে, আট-দশটা গরুর জন্ত পোয়াল কাটতে হয়, কলাগাছ কুচিয়ে মিশিয়ে দিতে হয় জাবনার সঙ্গে। হাট-বাজারেও যেতে হয় এক-এক দিন। অনেক হাঙ্গামা—গুরু-কৃপা সহজে হয় না।

মাস খানেক এমনি কাটিয়ে একদিন উমেশ বড্ড তাগাদা দিল। দাস মশায় সদয় হয়ে খাতা বেঁধে আনতে বললেন। সেই খাতায় বোল লিখে দিলেন—নানা বাদ্যযন্ত্রের বোল, গোটা তিরিশ হবে গুনতিতে। এইগুলো আপাতত মুখস্থ করুক—পরে আরও দেবেন। ধিন তারে তেরে কেটে—উমেশ সশব্দে মুখস্থ করে, আর স্মরণশক্তিকে ধিক্কার দেয়। বোলের সমুদ্র কাটিয়ে কত দিনে যে গানের কূলে পৌছবে, ঠিক-ঠিকানা নেই।

ভাদ্র মাসে এক-এক দিন বৃষ্টি-বাদল চেপে পড়ে। উমেশের ছাতা আছে—গোলপাতার ছাতা, বন্ধ হয় না। ছাতা মাথায় লাঠি হাতে যথারীতি সে মৌভোগ রওনা হয়েছিল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে আলস্য লাগল—অত পথ ভাঙতে ইচ্ছে করে না এই জল-কাদার মধ্যে। জনার্দনের দাওয়ায় উঠে

পড়ল। পুব-দুয়ারি ঘর—বৃষ্টির ছাটের জন্য দরজা বন্ধ। লাঠির আগা দিয়ে ঠুক-ঠুক করে সে দরজায় ঘা দেয়: জনার্দন আছ না কি? ও ভাই?

জনার্দন উদ্দিষ্ট নয়। এই অপরাহ্ণবেলা তার দোকান-ঘরে থাকবার কথা। কিন্তু আজ এই ভরার মধ্যে খদ্দের-পত্তর নেই তো—ভাত খেয়ে জনার্দন আরাম করে শুয়েছে, আর যায় নি দোকানে। উমেশের ডাকে দয়া গিয়ে দরজা খুলল। জনার্দন উঠে বসল বিছানায়। মুখিয়্য-বুড়ি যথাপূর্ব ঘুমুচ্ছে।

উমেশ বলে, ঠাণ্ডায় গলা ব্যথা করছে—একটু চা খাওয়াবে দয়াময়ী? সেই জন্যে এলাম।

দোকানের মাল গস্ত করতে জনার্দন খুলনায় যায় মাঝে-মাঝে। একবার এক কৌটো চা এনে রেখেছে। কোথায় যেন দয়া চা খাওয়া দেখে এসেছিল—শৌখিন মেয়ে তো—দাদার কাছে অমনি ফরমায়েস হয়েছিল। বেশি রকম সর্দি-কাসি হলে, কিম্বা বাড়িতে বিশিষ্ট জন কেউ এলে তখনই চা বেরোয়। পিতলের ঘটিতে জল গরম করে তার মধ্যে চা ফেলে—গুড় এবং কদাচিৎ দুধ সহযোগে সমারোহে চা-পান চলে।

চায়ের আয়োজন হতে লাগল। আজ উমেশ নিজেই প্রস্তাব করে: একটু গান-বাজনা হলে হত না? এত কাল মৌভোগ গতায়াত করে ঐ বিদ্যায় খানিকটা লায়েক হয়েছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ সে। গান শুনে সেই যে ফটিক দয়ার সামনে হাসাহাসি করেছিল, সে অপমান তুষের আগুনের মতো মনে জ্বলে। তারই প্রতিবিধান করবে দয়াকে নতুন গান শুনিয়ে।

প্রস্তাবটা জনার্দনের মন্দ লাগে না। বাদলাবেলা কি করা যায়—আসর জমানো যাক বসে-বসে। বলে, বাজনার কি হবে? একখানা খোল ছিল আমার—দল-ছাউনি ছিঁড়ে তার কেঁড়েটা মাত্তর আছে।

উমেশ সগর্বে বলে, আমার সমস্ত জোগাড় আছে। ইস্তক হরমনি অবধি।

বাইরের বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে বলে, থাক গে। এর মধ্যে আনতে গেলে যন্তর নষ্ট হয়ে যাবে। খালি-গলায় চলুক। ধর একখানা, জনার্দন ভাই!

জনার্দন আপত্তি করে; আমার মেঠো গান—আচ্ছা, সে না হয় হবে এর পর। তোমার একখানা শুনি, ওস্তাদের কাছে যা শিখলে।

এমনি একটু-আধটু অনুরোধের অপেক্ষায় ছিল। আ-আ-আ—করে উমেশ তান ধরল। চায়ের জল গরম করতে দয়া রান্নাঘরে গেছে। উমেশ ডাক দেয়: কই গো দয়াময়ী—গেলে কোথা তুমি? কাবাব-চিনি আছে তোমাদের ঘরে? কিম্বা লবঙ্গ?

লবঙ্গ এনে দিয়ে দয়া এক পাশে পিঁড়ি পেতে বসল। বসে চা তৈরি করছে। মাটিতে সে কখনও বসে না। পাট-ভাঙা কাপড়-পরা। গৃহস্থালির দশ রকম কাজে আছে, তার মধ্যেও যেন ঝকমক করে।

ওস্তাদি কসরতের জায়গা এটা নয়—সে সাদা-মাঠা একটা গান ধরল। এটাও নতুন শিখেছে। 'জল আনিবার করে ছলা, কদমতলায় দেখিল কালা—'

চোখ বুজে গাইছিল উমেশ। আস্তন্ত বার-দুয়েক গেয়ে সে চোখ খুলল। জিজ্ঞাসা করে: কেমন লাগল?

জনার্দন আমতা-আমতা করে: তা মন্দ কি—

কিন্তু যার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে সোজাসুজি মন্তব্য করল: গান হবে না তোমায় দিয়ে।

কেন? গান কেন হবে না? সুরেন দাস আমায় কি বলে জান?

বলতে বলতে রাগে আগুন হয়ে ওঠে। বলে, ঐ ফটিকের কথা মুখস্থ করে নিয়েছ। আগে তো ভাল বলতে। ভাল জিনিসের মাহাত্ম্য কি বুঝবে? চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন।

কাঁসার বাটিতে দয়া চা ঢেলে দিল। এক চুমুক খেয়ে উমেশ বলে, বেশ, খালি গলায় আর নয়। হরমনি-টনি নিয়ে একদিন শুনিয়ে যাব।

জনার্দনকে দয়া বলে, দোকানে গিয়ে তোমার মানুষ-জন পাঠিয়ে দাও গে দাদা—।

মুখ পুড়ে যায়, এই ভয়ে জনার্দন চা খায় না। কষ্টে-সৃষ্টে দু-একবার খেয়ে দেখেছে, স্বাদও কিছু নেই। উমেশের মুখেও আজ চা কটু লাগছে। আরও খানিক গুড় ঢেলে নিল, তবু মিষ্টি হয় না। উমেশের আনাড়ি গলার গান দয়ার এত ভাল লাগত—কষ্ট করে এখন যত শিখছে, ততই কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একটা কথা বড্ড চলেছে ইদানীং লোকের মুখে-মুখে—উমেশের গান ভাল লাগে না কি সেই জন্যে?

দয়া, বিদেশিরে মন দিও না—বিপাকে পড়বে।

দয়া বলে, না—মন পেঁটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। দেশি মানুষ কেউ নেয় তো দিয়ে দেব পেঁটরাসুদ্ধ।

ফিক করে হেসে বেহায়া মেয়েটা বলে ফেলে, দিই তো শুধুই জানপ্রাণ দেব বিদেশিকে।

উমেশ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে: হাসি-মস্করা নয় গো দয়া। লোকে নানান কথা বলছে তোমার পীরিতের জনেরে নিয়ে।

কি বলে? এক লাফে খাল ডিঙোয়, পাঁচ-হাতি লাঠি হাতে বিশ জনের মহড়া নেয়।

তা বলে। আর বলে, গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়ায়, বে-পাশের বন্দুক নিয়ে মানুষও মারে। আদর-কাওরানির হাতনেয় বসে তামাক খায়, ফুসফুস-গুজগুজ করে তার সঙ্গে।

জনার্দন দোকানে মানুষজন পাঠাতে গিয়েছিল—মানুষজন সাকুল্যে একটি—সে এসে চায়ের বাটি তুলে নিল।

দয়া বলে, নানান জনে তোমার কুচ্ছো করে। আদরের বাড়ি গিয়ে নাকি গড়াও?

ফটিক কটমট চোখে উমেশের দিকে তাকায়।

নানান জনের একটা তো এই দেখতে পাচ্ছি।

বাঘের মত হঠাৎ সে গর্জন করে উঠল, বলেছিস তুই? এবং জবাব শোনবার আগেই গালে বিষম এক চড়। চোখে অন্ধকার দেখল উমেশ—চড় তো নয়, যেন হাতুড়ির ঘা মারল। তার পরেও ঘুসি উদ্যত করেছে।

দয়া মাঝখানে পড়ে বাঁচিয়ে দিল। সে ফটিকের হাত চেপে ধরল।

কি কর! এই তো তালপাতার সেপাই—মরে যাবে যে!

ও দেখেছে?

লোকের কাছে শুনে ভালর তরে আমায় বলতে এসেছিল। তাতে তুমি এমনধারা করছ কেন গো?

ফাঁক পেয়ে উমেশ ছুটে পালাল। ঘর-কানাচে গিয়ে চেঁচায়, দেখে নেব—চিনিস নি আমায়। একখানা কান কেটে নেব একদিন হাতে-নাতে ধরে ফেলে।

ঘটনাটা চাউর হয়ে পড়ল। তখন আর একা উমেশের নয়—পাড়ার, এবং ক্রমশ আতটারই মান-অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তেঁতুলে-বাগদির গায়ে হাত তোলে কাওরার পো! মাতব্বরদের বল পেয়ে টিকে একদিন জনার্দনকে গিয়ে বলল, বিদেয় কর ওটাকে। এই তোমায় বলে দিচ্ছি।

ফটিক ভারি কাজের—এই ক'মাসে দোকানের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় কিছু দিন চললে, জনার্দনের আশা—হাতে-গাঁটে দু-পয়সা জমিয়ে ভাল পণের মেয়ে ঘরে আনতে পারবে। হাঁ-না সে কিছু বলে না—দয়া আগ বাড়িয়ে এসে পড়ল।

তোমার চালের উপর চাল দিয়ে বসত করি নে যে, উঠোনের উপর

দাঁড়িয়ে কথা শোনাতে এসেছ। ডাকো দশজনাকে—ওঁর যা বলবার সকলের মুকাবেলা বলবে।

এরই পরে এক রাতে দমাদম ঢেলা পড়তে লাগল জনার্দনের বাড়ি। জনার্দন ও ফটিক দোকানে শোয়—ফটিক বেরিয়ে পড়বে, হাত ধরে জনার্দন তাকে টেনে রাখে। ক'জন এসেছে ঠিক কি—গোঁয়ার্তুমি করাটা কিছু নয়। সকাল বেলা দেখা গেল, চষা আউশ ক্ষেতের ঢেলা উঠানময় ছড়ানো।

আবার এক রাত্রে ফেউ ডাকছে খুব। একটু পরে গোয়ালে হুড়মুড় করতে লাগল। মুখ্যি বুড়ি চেঁচাচ্ছে, গোয়ালে কেঁদো পড়েছে। ওরে জনা, উঠে আয় তোরা।

দয়া তাড়া দেয়। থামো মা, কেউ ওরা বেরুবে না।

বেরুবে না—আর ইদিকে গরু-ছাগল মেরে টেনে নিয়ে যাক—

বেরুলে খ্যাচ করে কালা-সড়কি বসিয়ে দেয় যদি পিছন থেকে?

ও মা কি বলে! কেঁদোবাঘে সড়কি মারবে?

গজর-গজর করে অবশেষে বুড়ি থামল। চারি দিক চুপচাপ। অনেকক্ষণ কাটল। কেঁদোবাঘ হঠাৎ বিকৃত গলায় কথা বলে উঠল বাইরে থেকে, আচ্ছা থাক—ভাল-মন্দ খেয়ে নে। কদ্দিন বাঁচবি এ ভাবে?

ক'দিনের মধ্যে জানা গেল, ফটিক নেই—অঞ্চল ছেড়ে সরে পড়েছে।

উমেশের একমাত্র দোচালা ঘর—রাত দুপুরে দয়া টিপিটিপি সেখানে চলে এসেছে। ছ্যাঁচা-বেড়ার ফাঁকে আঙুল গলিয়ে দুয়োরের খিল খুলে ফেলল। শিয়রে গিয়ে ডাকে, শুনতে পাচ্ছ? ওরে, ও ওমশা—

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার—তার মধ্যে দয়ার গায়ের গৌরবরণ ঝিলিক হানছে যেন। ফিসফিস করে ডাকছে, ওরে—

তাতে হল না দেখে হাত দিয়ে নাড়াচ্ছে তার মাথা। এমন নরম তুলতুলে হাত! উমেশ চোখ মেলল। ঘুমের জড়িমা দু চোখে—সহসা বুঝে উঠতে পারে না। বিশ্বাস হয় না, দয়া তার ঘরের মধ্যে এত কাছে এসেছে।

ঢুকলে কি করে দয়া? দুয়ার খুললে কোন কায়দায়?

উমেশ উঠে আলো জ্বালল। হেসে বলল, চুরিবিদ্যি ধর দয়াময়ী, জুত করতে পারবে।

ধরেছি তো—

তা বটে! সত্যিই তাই। লেখাপড়া-জানা উমেশ গূঢ় অর্থ তলিয়ে বুঝে হাসতে লাগল।

ঠিক কথা বলেছ দয়া। সর্বনেশে চোর তুমি। প্রাণটা অবধি চুরি করে নিয়ে বুক ঝাঁঝরা করে দাও।

দয়া এবার গম্ভীর হল।

শুধু শুধু আমি মস্করা করতে আসি নি ওমশা। বলছ, সে কি সত্যি?

বোঝ না?

না। পুরুষ জাতের মুখ মিষ্টি—তোমরা আমাদের কাদার মতন শুধু কেবল পায়ে চটকে যাও।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দয়া। যে চোখে একটু আগে হাসি ছিল, আগুন জ্বলছে যেন সেখানে। উমেশ ভীত হয়ে ওঠে। বলে, কি হয়েছে তোমার দয়া?

দয়া বলে, ফটিক পালিয়ে গেছে—শোন নি? গাঁয়ের লোক এখন আমাদের উপরে লেগেছে। সমাজে পাত পাড়তে দেবে না, বাস ওঠাবে গ্রাম থেকে।

আমি কিচ্ছু জানি নে, মাইরি। কারও কাছে যাই নে। সঙ্গী-সাথী সমস্ত হলেন ওঁরা—

বিছানার পাশে বাজনার যন্ত্রপাতিগুলো দেখাল। তা অনেক জোগাড় করে ফেলেছে। ডুগি-তবলা, খঞ্জরী, ঢোলক—এবং মানিকপীরের দল থেকে কেনা ইঁদুরে-কাটা তার বহু গর্বের হরমনি অর্থাৎ হারমোনিয়াম।

দয়া এক আশ্চর্য কথা বলে।

দেশান্তরী হয়ে যাব তোমার সঙ্গে? রাজি?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে উমেশ চেয়ে রইল। দয়া জোর দিয়ে আবার বলে, আজকেই। ডিঙি নিয়ে তুমি আমাদের বা'নতলার ঘাটে থাকবে। ভাঁটা লাগলে রওনা হব।

বুকের ভিতর সে যে কি হচ্ছে—উমেশ সহসা কথা বলতে পারে না। তারপর অস্পষ্ট আওয়াজে বলে, কোথায় যাবে?

দয়া অধীর কণ্ঠে বলে, হিসেব-পত্তর করে এসেছি নাকি? দূর-দূরন্তর—যেখানে তুমি নিয়ে যাও। হাড়-হাবাতেরা যেখানটায় নাগাল পাবে না।

তোমার মা-ভাই—

ওদের নাম ক'র না। মা-বুড়ি মরলে কেউ যদি খবর দেয়, এক গণ্ডূষ জল দেব তার নাম করে। বেঁচে থাকতে ওদের মুখ দেখব না।

ডিঙিটা এখন টিকের হেপাজতে। কাজে নিয়ে যায়—কাজ অন্তে ধোয়া-মোছা করে বেঁধে রাখে। নিজের ডিঙি চুরি করে নিয়ে বা'নতলায় ছায়ান্ধকারে সে দয়ার পথ তাকিয়ে আছে। আছে তো আছেই। অর্ধেক

ভাঁটা নেমে গেছে—তাই ভয় হচ্ছে, দেরি হয়ে গেছে হয়তো—দয়া এসে ফিরে চলে গেছে। মশা আর বেড়ে-পোকার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে—অথচ একটা চাপড় দিতে সাহস হয় না, শব্দ হলে লোকে পাছে টের পেয়ে যায়।

পাতার খস-খসানি। এসেছে, সে এসেছে।

আমি ভাবলাম, এলে না তুমি বুঝি, মা-ভাই-এর মায়ায় পড়ে গিয়ে—

অত মায়া-দয়ার ধার ধারি নে।

কাড়ালে পা ঝুলিয়ে একেবারে উমেশের গা ঘেঁসে বসল। ইতিমধ্যে ভেবে-চিন্তে দূর-দূরন্তরের ঠিকানাও সাব্যস্ত করে ফেলেছে দয়া।

মাসির বাড়ি চৌধুরিহাটে যাওয়া যাক। সেখান থেকে কোথায় যাব—কাল ভাবা যাবে।

নিশিরাত্রে খালটাকে জীবন্ত মনে হয়। খলখল হেসে আর কথা কইতে কইতে খালের জল চলেছে তাদের সঙ্গে। ডিঙিটা নাগরদোলার মত নাচিয়ে দিচ্ছে এক-এক বার।

উমেশ বলে, বড়-গাঙে এসে গেলাম। এইবার পা তুলে ব'স দয়াময়ী।

চৌধুরিহাটে পৌঁছুতে বেশ বেলা হয়ে গেল। সমস্ত পথ দয়া বেশি কথাবার্তা বলে নি, কেমন অন্যমনস্ক। ঘাটে পৌঁছুতেই নিঃশব্দে নেমে চলল। নৌকো বেঁধে জানা-শোনা মাঝিদের নজর রাখবার জন্য বলে-কয়ে আসিতে একটু দেরি হল উমেশের। দয়া অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে, উমেশ জোর-পায়ে এসে তাকে ধরল।

পায়ের শব্দে দয়া পিছনে তাকায়। উমেশকে বলে, তুমি আসছ?

উমেশ হেসে ওঠে, এত ভয়টা কিসের? মাসির কাছে পরিচয় দিও আমি নৌকোর মাল্লা। চিঁড়ে ভিজিয়ে দিতে ব'ল এক পাথর। সারা রাত্তির যে খাটান খাটিয়েছ, পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাবার যোগাড়।

বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। দয়া ডেকে বলে, চলে এসেছি ফটিক। থাকতে পারলাম না।

ফটিক এবং তার পিছু-পিছু পুষ্ট-গড়নের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। দয়া গর্জন করে: ভাল, ভাল! আদরকে কাঁধে করে বাসায় এনে তুলেছ?

অতএব নিঃসংশয়ে এরা হামলা করতে এসেছে অত দূর থেকে নৌকো বেয়ে। ফটিকও পরাজয় মানবার লোক নয়। তড়াক করে রণমূর্তিতে সে উঠানে লাফিয়ে পড়ল। দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি। এবং উমেশের ভরসা আছে, চৌধুরিহাটে এত কাল সোয়ারি বওয়াবয়ি করেছে—ঘাটের দাঁড়ি-

মাঝিরা চেনা-জানা—হাঁক দিলে এখনই দশ-বিশ মরদ এসে পড়বে। ফটিককে আদরের সঙ্গে এই হাতে-নাতে ধরবার পর—একখানা কান কেটে নেওয়া না-ই যদি সম্ভব হয়, সেদিনের মারের নির্ঘাৎ উপযুক্ত শোধ তুলে নেবে।

কিন্তু দয়াই ভেস্তে দিল। মুহূর্তে আর এক মূর্তি। আদর পিট-পিট করে তাকাচ্ছিল দাওয়া থেকে। আর একরকম সুরে—আদরের সঙ্গে যেন কত ঘনিষ্ঠতা—দয়া বলল, ওমশার বড্ড কষ্ট হয়েছে। চিঁড়ে থাকে তো চাট্টি চিঁড়ে ভিজোও আদর।

আর এদিকে—রাগ উপে গিয়ে উমেশের মুখে রসিকতার কথা আসে: এই মাসির কাছে আসা-যাওয়া কর দয়াময়ী? সেবারে যে নিয়ে গেলাম—এই বাড়ি এসেছিলে? তা কোন্ জন তোমার মাসি, চিনলাম না তো! কোঁচা-কাছা দেওয়া ফটকে সর্দার না বাউটি-পরা আদর পেশাকার?

চৌধুরিহাট থেকে উমেশের আর বাড়ি ফিরবার মন হল না। এ-তল্লাট ও-তল্লাট ঘুরে দিন কয়েক পরে এক কাজ জুটিয়ে নিল—বনকরের চৌকিদারি! বাড়ি গেল মাস আষ্টেক পরে—টিকে এসে জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে গেল। বিয়ে-থাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সে বউ ঘর লাগল না—সে এক লম্বা কাহিনী। কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

গান-বাজনা নিয়েই সে আছে। রকমারি বাদ্যযন্ত্র গিয়ে ঢ্যাবঢেবে এক ঢোলে এসে ঠেকেছে। পয়সা জোটাতে পারে না, কিনবে কি দিয়ে? তা হয়েছে ভাল। ভাল বাজনার সঙ্গে এ গলার গান আরও উদ্ভট শোনাত।

দয়াকে আর দেখে নি। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সে। লোকে কিন্তু বলে, মিথ্যে কথা—ফটিক গলা টিপে তার পর গলায় দড়ি পরিয়ে ঘরের আড়ায় টাঙিয়ে রেখেছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল। ভাই-এর সংসারে বেশ তো ছিল—জাত-কুল খুইয়ে সাঙা করতে গেল কেন অমন প্রকৃতির মানুষকে?

উমেশের কিন্তু রাগ নেই। চোখে জল আসে দয়ার কথা ভাবলে। মোহমুগ্ধ দয়া—সে তো পাগল তখন। পাগলের উপর রাগ করা চলে না। গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছে। ফটিক বাঘের মতন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই অবস্থাটা উমেশ ভাববার চেষ্টা করে। কী ভাব মনে হয়েছিল তখন দয়ার? চকিতে একবার মনে এসেছিল কি ওমশার কথা—আকৈশোর যে ওমশাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছে, মানুষ বলে মনে করে নি বেনেপোতার সেই এক মনোরম রাত্রি ছাড়া।

বাদাবন তোমাদের মানবেলার মত নয়, তোমাদের বাঁধা হিসাব সব সময়

খাটে না সেখানে। কেউ মরলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি সকল-সম্পর্ক চুকে গেল, এ রীতি সেখানকার নয়। মানুষের বসতি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে এই মর্জালের কূল অবধি। ওপারে ভয়াল বন—জালের দড়ির মত নদী-খালের শত পাকে বাঁধা। বনের মধ্যে সাপ-বাঘ, হরিণ-দাঁতাল। এ সব ছাড়া আরও আছেন—যে-কেউ অপঘাতে মরেছে, মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্জন বন-অঞ্চল জুড়ে আছেন। একলা আমি বা উমেশ নয়—যারা বাদাবনে যায়, জিজ্ঞাসা করে দেখো তাদের। এমন হল, তোমার নৌকো একলা পড়ে গেছে উদ্দাম মর্জালের মাঝখানে—গা ছম-ছম করছে— বাঁকের মুখে এসে দেখবে ভরা পালে আরও খান পাঁচ-সাত চলছে। আগে-পিছে চলল তারা—যেই কোন বনকর-অফিস কি জনালয়ের কাছাকাছি এসেছ, চকিতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তোমায় ভরসা দিতে এসেছিল ঐ সব মায়া-তরী। বাওনে যাচ্ছ সরু খাড়ির মধ্য দিয়ে—অথবা গুলোবন ভেঙে চলেছ মৌমাছির সন্ধানে। দেখবে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে এক প্রান্তে গাছ-গাছালির ভিতর, দশটা হাত দূরে, কিন্তু একেবারে শান্ত। এ সমস্ত কৌতুক ওঁদের।

স্রোত কাটান দিতে কূলে কূলে চলেছ· চাঁদা-কাঁটার আড়াল থেকে ফিসফিসিয়ে কে কথা বলে উঠবে। শুধাচ্ছে ছেড়ে-আসা অনেক দূরের পাড়া-পড়শি আত্মীয় জনের কথা। মানুষ দেখতে পেয়ে থাকতে পারে নি—খোঁজ-খবর নেবার লোভ জেগেছে। ঘনঘোর আরণ্য রাত্রে ইহলোক-পরলোকের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিলীন হয়ে যায়—এপারে-ওপারে আলাপন শুরু হয়। উমেশের গান-বাজনা এই সময়টায়।

লায়েরে রাত্রিবেলা আসর। কেউ শুনতে চায় না গান—একমাত্র অম্বিক ছাড়া। আর সেকালে সেই একজন ফরমায়েস করত। আর সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। উমেশের দু-চোখ জলে ভরে আসে। চিরটা কাল একই ভাবে গেল! পারের খেয়ায়, হরিঠাকুর, যেদিন তোমার কাছে গিয়ে পড়ব, তুমিও হাসবে কি এই রকম? ঠাট্টা করবে? পদতলে ঠাঁই দেবে না?

লায়ের নিঃশব্দ তখন। শেষ রাত্রের দিকে চোরাই মাছ এসে পড়লে দর-দাম হাঁক-ডাকে আবার সরগরম হয়ে উঠবে। এরই ফাঁকে 'উমেশ হরিঠাকুরকে ডেকে নেয়।

ঢোলক বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায় গাঙের ধারে। ওপারে জঙ্গল—মানুষ নেই, মানুষ ছাড়া আর সবাই আছে। রোজই সে যায় অমনি। স্রোতের কিনারায় দাঁড়িয়ে বাজনার সঙ্গে সে গান ধরে। বয়স হয়েছে, কিন্তু গলায় জোর আছে। বর্ষার অবিরল ধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়।

শীতের দিনে প্রায় খালি গায়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে গান ধরে। যেটা শুনে দয়া নিজে করেছিল, বিশ বছর ধরে রপ্ত করে ফেলেছে সেটা—

জল আনিবার ক'রে ছলা
কদমতলায় দেখিল কালা—
কালার পীরিতি লেগে হইল বড় জ্বালা রে—

'হইল বড় জ্বালা রে'—নানা তান-কর্তবে শেষটুকু বারম্বার গায়, গেয়ে যেন আশ মেটে না। নৌকোয় যেতে যেতে দাঁড়ি-মাঝিরা বলাবলি করে, পাগলটা গাইছে। রসিকতা করে কেউ কেউ—ঝপঝাস্ করে একবার দাঁড় ফেলে সেই তালে চেঁচিয়ে ওঠে, বাহবা! জঙ্গলের দিক থেকে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আসে—বাহবা!

উমেশ সচকিত হয়ে তাকায়—সত্যি কেউ তারিফ করে উঠল ওপার থেকে?

দাঙ্গার দাগ

বেনাপোলে ট্রেন এসে থামল। পাকিস্তানে ঢুকেছি, সীমান্তের স্টেশন। উঁচু ক্লাস বলে ভিড় নেই। গদির বেঞ্চিতে সামনাসামনি আমরা দুজন।

সীমান্ত-পুলিস ও কাস্টম্‌সের লোক একসঙ্গে কামরায় ঢুকল। সীমান্ত-পুলিস সামনের ভদ্রলোককে বলছে, পাসপোর্ট ভিসা দেখান মশায়। কাস্টম্‌সের লোক আমায় বলছে, ও-পার থেকে কি কি আনলেন, বের করুন মিঞাসাব।

হেসে বলি, মিঞাসাব ভুল করে বলছেন। হিন্দুস্থানের মানুষ আমি। এক আত্মীয় মারা গেছেন এখানে, তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে পাঁচ-সাত দিনের জন্য যাচ্ছি। জিনিসপত্র আবার কি আনতে যাব?

এবং সামনের ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বুকে থাবা মেরে বললেন, মিঞাসাব আমি—মশায় নই। আমি পাকিস্তানী, পাকিস্তানের পাসপোর্ট আমার। কলকাতায় সারাজীবন কেটেছে। বড়দিনের আমোদস্ফূর্তি এখন কি রকম হয়, সেইটে দেখতে গিয়েছিলাম।

উভয় কর্মচারীই একবার আমার দিকে একবার ঐ ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তার পর যথারীতি পাসপোর্ট ভিসা পরখ করে মালপত্র দেখে নেমে গেল।

ভদ্রলোক তখন হো-হো করে হেসে উঠলেন: দেখুন খোদাতালাহ্

গায়ের উপর লিখে দেন নি কে হিন্দু কে মুসলমান। তা হলে এমন ভুল হত না। আমি আবদুল আজিজ—আমাকে ওঁরা হিন্দু ঠাউরে বললেন।

আমিও হেসে বলি, খোদাতালার ভুল মানুষে সংশোধন করে নিয়ে ঘোরাফেরা করে। সবাই তাই একনজরে বুঝতে পারে। আমরা সেটা করি নি যে! আমার দাড়ি রয়েছে, আপনার গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। তাইতে ওঁদের গোলমাল হয়ে গেল।

আজিজ বললেন, মসজেদ-মন্দির নয়, পুরাণ-কোরান নয়, ধর্ম তবে এসে দাড়িতে ঠেকেছে? তা ছিল আমার দাড়ি। কালো কুচকুচে এক গোছা নূরে চমৎকার দেখাত। কিন্তু কালো দাড়ি পেকে সাদা হয়ে যায়। দাড়ি ধর্মের নিশানা হোক, পাকা দাড়ি বার্ধক্যের নিশানা। সত্যি কথা বলি আপনাকে, এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হতে চাই নে। দাড়ি সরিয়ে দিয়ে যৌবনের চেহারা রেখেছি। যদ্দিন পারা যায় যুবা হয়ে থাকি।

আমার দাড়ি ছিল না। চেহারার খাতিরেই রাখতে হল। দাঙ্গার সময়ে ছোরা মেরেছিল। এক কোপ পিঠের উপর মারল। সেটা মারাত্মক নয়, জামায় ঢেকেঢুকে বেড়াই। আর একটা মারল থুতনিতে। থুতনির সেই উৎকট দাগ ঢাকবার জন্য দাড়ি।

দাঙ্গার কথায় আজিজ বিচলিত হয়ে ওঠেন: উঃ, মশায় বলবেন না—বলবেন না! চিরকালের বসত ওঠাতে হল ওই ধাক্কায় পড়ে। বাড়ি পুড়িয়ে জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে গেল। আমি পাকিস্তানে চলে এলাম।

আর আমার কথা ঐ তো শুনলেন। দু-দুটো কোপ ঝেড়েছে, অক্কা পেতে পেতে বেঁচে গিয়েছি। বাড়ি আপনার কোন্‌খানে ছিল বলুন তো আজিজ সাহেব?

ভবানীপুর, রানীবাগান লেন। চেনেন নাকি?

কী আশ্চর্য, আমারও বাড়ি ঐদিকে। এখনও থাকি সেখানে। রানীবাগান লেনের কোন্ বাড়িটা বলুন তো?

আজিজ বললেন, করপোরেশন প্রাইমারি ইস্কুল, তারই লাগোয়া টিনের বস্তি ছিল—

বুঝেছি, বুঝেছি। ঠিক সামনে বিশ্বকর্মা রিপেয়ারিং হাউস—স্টোভ, টর্চ এই সমস্ত মেরামত করে। শুনুন তবে। বস্তি পোড়ানোর পরের দিন বিশ্বকর্মায় আমি টর্চটা দেখাতে এসেছি, পিছন দিক থেকে ঘ্যাচ করে মারল ছোরা। মুখ ফিরিয়েছি তো ফের থুতনির উপর বসিয়ে দিল। হিন্দুপাড়ার মধ্যে সাহসটা কি বুঝে দেখুন।

আজিজ বলেন, মুখ ফেরালেন আর মানুষটা দেখলেন না?

দেখেছি, বইকি! পলকের দেখা, কিন্তু মনে গাঁথা আছে মানুষটার চেহারা।

আজিজ বলেন, তাই আছে। আমিই তো সেই। তখন অবশ্য দাড়ি ছিল আমার।

দাড়িই গোলমাল করে দিয়েছে। তবে বলি, আপনাদের বস্তি পোড়ানোর বড় পাণ্ডা একজন আমি। আপনিও কি আর দেখেন নি! তখন আমার দাড়ি ছিল না। দাড়ির দরুন আজ ঠাহর করতে পারলেন না।

কী আশ্চর্য, কতকাল পরে দেখা!

• বেঁচে থাকলেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

কাস্টম্সের মানুষ যাচ্ছে কামরার সামনে দিয়ে। জিজ্ঞাসা করি, আর কতক্ষণ আটকে রাখবেন?

হাতঘড়ি দেখে সে বলে, আধঘণ্টা তো বটেই।

আজিজ আমার হাত ধরে টানেন: চলুন চা খেয়ে আসি।

হাসতে হাসতে হাত-ধরাধরি করে দুজনে প্ল্যাটফরমে নেমে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম।

এপার-ওপার

শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর বড় মিছিল বেরুল। প্রধান উদ্যোগী সিরাজুল আর তাজ মহম্মদ। মিছিল আরও বেরিয়েছে অনেকবার—কিন্তু এমনটা ঘটে নি। দশ গ্রাম ঘুরে ঘুরে সারা বেলা মিছিল চলল। হাটখোলায় সেদিন হাট বসেনি—হাটুরে মানুষ নিয়ে বড় সভা। ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সিরাজুল। শান্ত মানুষ তাজ মহম্মদ—সে-ও আগুন। বিহারের গ্রামে গ্রামে তারা ঘুরে এসেছে—সিরাজুলের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে সেই অনেক দূরের অসহায় হাহাকার ভেসে ভেসে আসছে যেন।

বক্তৃতা শেষ হতে দেয় না—শত শত কণ্ঠে গর্জন ওঠে। মানুষের চেহারা বদলে যায়। যারা হেসে ছাড়া কথা কইতে পারে না, তাদের চালচলনে শাণিত তরবারির ঝিলিক যেন।

হিমাংশু সদরের আদালতে বেরুচ্ছে। পসার জমেনি এখনো, জমানোর জন্ত মাথাব্যথাও নেই। এই শীতকালের সময়টা কিছুদিন গ্রামে এসে থাকে। রসগুড় এবং বিলের কই-মাগুর খেয়ে ধান-চালের বিলি ব্যবস্থা করে আবার

সদরের বাসায় গিয়ে উঠবে। থানের খোলাট থেকে সে আর নকুল দাস ফিরছিল। হাটখোলার কাছাকাছি এসে পা চলে না। একটা গোলমাল উঠেছে—এই অবধি জানত। কিন্তু এমন সর্বনেশে ব্যাপার, ধারণা করবে কি ক'রে। বটগাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মানুষজন সভায় যাচ্ছে—কারো নজরে না পড়ে, তাই ঝুরি নেমে এক জায়গায় ঘরের মতো হয়েছে—তার ভিতরে চলে গেল। একবার বা ভাবছে, দোতালায় উঠে পড়বে নাকি? ভাল করে শুনতে পাবে, দেখতেও পাবে সকলকে। কিন্তু সিরাজুলের কথা শুনতে শুনতে উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বক্তৃতা শেষ হবার আগেই সরে পড়ল হাটখোলার তল্লাট থেকে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আপাদমস্তক। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে ভরসা পায় না। এতকালের চেনা-জানা গ্রাম—বলতে গেলে ঘাসবন অবধি চেনা—হঠাৎ যেন ভয়াল অরণ্য হয়ে উঠেছে, সাপ-বাঘ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। কোন্‌দিকে যে নিরাপদ জায়গা, ভেবে ঠিক করতে পারে না। পালাতে হবে—কিন্তু কোথায় কোন পথ দিয়ে?

দোমহলা বিস্তীর্ণ ঘরবাড়ি। কত মানুষের আনাগোনা—বিশেষ করে হিমাংশু এইরকম যখন বাড়ি আসে। রাত দুপুর হয়ে যায়, তবু মচ্ছবের শেষ নেই। আজ কেউ আসেনি। কোনদিকে না তাকিয়ে সে হন্ হন্ করে শোবার ঘরের বারাণ্ডায় উঠল। সাড়া পেয়ে হাসি দরজা খুলে দিল। রক্তলেশহীন মড়ার মুখ হয়ে গেছে হাসির। আবার খিল আঁটল দরজার, হুড়কো দিল। চারদিক ঘুরে দেখে এল বন্ধ আছে কিনা জানালাগুলো।

সে রাত্রে হিন্দুপাড়ায় কেউ দরজা খোলে নি। ঘুমোয় নি প্রায় কেউ, আলো জেলে জেগে বসে রয়েছে। কথাবার্তা বলবারও ভরসা পাচ্ছে না। নিঃশব্দে চারদিক—ঝিমঝিম করছে। শিয়াল কি কুকুর ডেকে উঠল অনেক দূরে—এতেই তারা শিউরে ওঠে। ওকি—ক্যানেস্তারা পিটছে না? পশ্চিম-পাড়ার দিকে ড্রামের বদলে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে। কান পেতে থাকে—'আল্লা-হো-আকবর' শোনা যায় কিনা ঐ সঙ্গে।

সকালে জানা গেল একদল মোজাহির হারাণ চাটুজ্জেকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। আপত্তি করতে গিয়েছিলো চাটুজ্জে মশায়, গলাধাক্কা দিয়েছে। পড়ে গিয়েছিলেন সিঁড়ির উপর, সর্বাঙ্গ কেটে কুটে গেছে।

শোনা গেল, বন্দরে আস্ত ঘর আর নেই, দিনের বেলা প্রকাণ্ড ভাবেই দল বেঁধে মহাজনি গোলায় আগুন দিয়ে বেড়াচ্ছে। থানার লোক নিরপেক্ষ দর্শক।

সিরাজুলের গলা যেন—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছে। পাঠশালা

থেকে বড় ইস্কুল অবধি হিমাংশু এই সিরাজুলের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। শুভাকেত্রে যা-ই সে বলুক—এমন কাছাকাছি পাওয়া যাচ্ছে, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। নিশ্চয় সাহায্য পাওয়া যাবে।

ছুটে রাস্তায় এসে হিমাংশু সিরাজুলের হাত জড়িয়ে ধরল।

এ কি শুনছি ভাই?

বেশী শুনেছ—বিস্তর বাড়িয়ে বলাবলি হচ্ছে।

ঠেকাও ওদের ভাই। তুমি হয়তো পারবে। নির্দোষ মানুষ মারছে।—

সিরাজুল সংশোধন করে দেয়, হিন্দু মারছে—

হিমাংশু ব্যাকুল হয়ে বলে, কি বলছ, হিন্দু কি মানুষ নয়?

হিন্দু মানুষ, মুসলমানও মানুষ। বিহারে মুসলমানদের যে মারলো তারা কি নির্দোষ নয়?

কিন্তু তাদের পাপে আমাদের শাস্তি কেন? যাও সেই বিহারে—যারা মারছে তাদের গিয়ে মারোগে।

সিরাজুল নিষ্কম্প কঠিন কণ্ঠে বলে, মারামারি হচ্ছে মানুষ ধরে নয়—জাত ধরে। হিন্দু যেখানে শক্তিমান তারা মুসলমান মারছে, মুসলমান সুবিধা পেলে হিন্দু মারবেই।

সিরাজুলের মতো ছেলের মুখে এই কথা—তখন আর ভরসা কিসের? কোথা থেকে কি হয়ে গেল! ভাল ভাল বচন কপচে আসছি আমরা সভ্যতার আদিকাল থেকে। বাইরেই শোভন পোষাক—একটু আঁচড় কাটলে ভিতরের জঘন্য পশুমূর্তি বেরিয়ে পড়ে ...

চার বছর পরে আবার গ্রামের পথে চলতে চলতে হিমাংশুর মনে পড়ছিল সেই পুরানো ঘটনা। যেন ঝড় উঠেছিল—কত বাঁধা ঘর ভূমিসাৎ হল, মানুষজন ছিটকে পড়ল এদিকে সেদিকে। আজকের সন্ধ্যায় চারদিকে বিপুল প্রশান্তি। সে দিনের সঙ্গে কোন মিল নেই। গ্রামসীমানার দু'দিকে ডাল-মেলানো বিশাল বটগাছ, হরিতলা—হরিঠাকুর দুই বাহু বিস্তার করে নিঃসঙ্গ গ্রাম আগলাচ্ছেন। পালপার্বণে ইদানীং ঢাক বাজে না আর এখানে বৃক্ষমূলে সিঁদুর মাখা ঘট-স্থাপনা হয় না। ভাঁট-আশশ্যাওড়ায় চতুর্দিকে ভরে গেছে, যাওয়াই যায় না ঠাকুরের কাছাকাছি।

তাজ মহম্মদের বাড়ি। দালান দিয়ে ফেলেছে! রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হিমাংশুর নজরে পড়ল, সারা উঠানে আড় বেধে পাট শুকাতে দিয়েছে। গিন্নি বউর চিড়ে কুটছে ঢেঁকিশালে! বিকালবেলার খেজুররস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে—লক লক আগুন উঠছে বিশাল বাইনের দুই মুখ দিয়ে। দেখেছে

তো, কি দুর্দিন ছিল এদের। আজকে গুছিয়ে নিয়েছে। তার এবং আর দশটা গৃহস্থের জমিজিরেত ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, সৌভাগ্য উথলে উঠেছে সেইজন্তে।

চোখ ভরে জল আসে। শহরের লোকে বুদ্ধি দিয়ে হিসাবপত্র করে বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের মনে ঢুকবে তারা কেমন করে? ভুক্তভোগীর ব্যথা বাইরে থেকে কি বোঝা যায়?

হাটখোলা। হাটবার নয়—তবু এ-দোকানে ও-দোকানে গুলতানি চলেছে। মুখ ঢেকে ছুটল হিমাংশু। নকুল বলে, আস্তে চলেন বাবু অন্ধকার জায়গা—শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন।

প্রহরখানেক রাত হয়েছে, সেই সময় বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। তিরিশটা বছরের চেনা বলেই চিনতে পারে—নতুন কেউ বলবে না, কোন বাড়ির উঠান এটা। এক গলা জঙ্গল—রোয়াকের নিচে যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। বুনো ফুলের মৃদু সৌরভ নাকে আসে। শন শন আওয়াজ ওঠে সে আমলের দেউড়ির ধারে লাগানো ঝাউ সারিতে। হিমাংশুর বুকের মধ্যে গুর গুর করে।

হল কি নকুল? আলো ধরাতে কতক্ষণ লাগে?

নকুল একবার বিকালে এসে ঝাঁট-পাট দিয়ে হেরিকেন দেশলাই ইত্যাদি ঠিক করে রেখে গেছে, তবু এত দেরি কেন? অন্ধকার ঘরের মধ্যেই হিমাংশু উঠে পড়ে! ঘরে ঢুকল যেন অলক্ষ্য কোন আততায়ীদের আতঙ্কে! দরজা বন্ধ করবার ইচ্ছে, কিন্তু কবাট নেই। পোড়ো বাড়ির জানালা-দরজা খুলে নিয়ে গেছে।

একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে নকুল বলল, কষ্ট হয়েছে—গড়াতে থাকেন বাবু। আমি দুটো ক্যানশা ভাত ফুটিয়ে আনি।

এ নকুলের তুলনা নেই। ভদ্রপাড়াটা এই চার বছর একাকী সে আগলে বেড়াচ্ছে। ফাঁক পেলেই পাড়ার ভিতর এসে ঢোকে। এর উঠানে, ওর বাগানে থমকে দাঁড়ায়। শিয়াল-শুয়োর মুখ তুলে পালায় মানুষ দেখে। পালিয়ে যাবার সময় সেই বাসিন্দারা নকুলের উপর যেন ভার দিয়ে গেছে।

কিন্তু একেবারে চলে যায়নি বাসিন্দারা। শাড়ির খসখসানিতে হিমাংশু চমকে তাকায়। হাসি এসে ঢুকল।

হেরিকেন খানিকটা দূরে রেখে গিয়েছে—হিমাংশুর চোখে আলো না লাগে। দপ দপ করে উঠে আলো ক্ষীণ হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার। শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাড় বাঁকিয়ে হিমাংশু আর একবার দেখল। কুলুঙ্গির

দিকে সরে গেল হাসি, সেখানে দাঁড়িয়ে খুটখাট করছে। হাত-আয়না নিয়ে মুখ দেখে নাকি? আঁধারে দেখছে কি করে? আয়না কি সঙ্গে আনে ও। কুঞ্চিতাগ্র একপিঠ এলোচুল দেখে হিমাংশু নিঃসংশয়ে চিনেছে, এ হল হাসি-রাণী। হাসি কথা বলে না, হিমাংশুই বা বলতে যাবে কেন? খোড়ো পাখির মতো নিরাশ্রয় সে ছুটাছুটি করেছে, হাসি কোন খবর রাখে না। তার দুঃখের ভাগ নেয়নি হাসি।

ঝপ করে হাসি পাশে এসে বসল। একেবারে গায়ের উপর। ওই তার চিরকালের জায়গা। কথাও বলল। গলার স্বর কাঁপছে।

ঘরবাড়ির কথা মনে পড়ল এ্যাদ্দিনে?

হিমাংশু বলে, কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে আছ কেমন করে?

উপায় কি বলো? সবাই সরে পড়লে—গৃহস্থঘরে সন্ধ্যা পড়বে না, এ-ই বা কেমন করে হয়?

ভয় করে না?

হাসি বলে, নিজের জিনিসে ভয় করলে চলে? এই যে তুমি এসেছ—ভয় পেয়েছি কি?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, অথচ বেঁচে নও তো তোমরা! তা বলে আলাদা-কিছু ভাবতে পারা যায়?

হিমাংশু আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। অন্ততঃ তাই তার মনে হল—সে ভীষণ চিৎকার করেছে। বেঁচে নেই?

আছ, আছ।

হাসি সামলে নেবার ভাবে বলতে লাগল, রাগ করো না—বেঁচে আছ বই কি! ও আমি ঠাট্টা করলাম।

হাসির মুখের দিকে চেয়ে হিমাংশু জোর দিয়ে বলে, তাই। বেঁচে গিয়েছিলাম আমি। হাসপাতাল থেকে সেরে সুয়ে পুলিসের সঙ্গে আবার এসেছিলাম এখানে। তুমিই মরেছ হাসি। ঠিক! কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছিল—সমস্ত এবার মনে পড়ে গেছে।

হাসি মুখ টিপে হেসে বলল, বলছিই তো আমি সেই কথা। তুমি নকুল দু-জনেই বেঁচে রয়েছ। যাক্ গে, বাজে কথা নিয়ে মাথা গরম কোরো না। বিত্তর বেলা ফুটেছে—গন্ধ পাচ্ছ না? রোসো, রেকাবিতে করে আমাদের শিয়রে এনে রেখে দিই।

বলে, আজকে নতুন ফুলশয্যা আমাদের। এবারে বেশ নিরিবিলি—মানুষজনের ঝামেলা নেই। উঃ একটা কথা বলতে পারি নি ফুলশয্যার সারা

রাত্রির মধ্যে। তুমি কি বলতে গেলে, ফুক-ফুক করে হেসে উঠল জানলার ওদিক থেকে।

হাসতে হাসতে লঘুপায়ে বেরিয়ে গেল হাসি। ফুল তুলতে গেল,- ফুলবাগানটা আছে তা হলে? চিরদিনের ফুলপাগলা—এতখানি বয়সেও ফুলের টান কমেনি। কিন্তু হাসিরাণী জঙ্গলপুরী সামলাচ্ছে, এর এক তিল খবর পৌঁছয়নি তো হিমাংশুর কানে।

নকুল ডাকলে, জায়গা হয়েছে বাবু। উঠুন।

হিমাংশু উঠে বসে বলে, আলোয় জোর দে। কিছু যে দেখা যায় না!

নকুল অবাক চোখে তাকাল।

কত জোর দেবো? আর দিলে কাচ ফেটে যাবে।

কলার পাতায় ফ্যানসা ভাত ঢেলে দিয়েছে। একটু তেঁতুল সংগ্রহ করেছে, আবার কি! দু-এক দলা মাত্র মুখে দিয়ে হিমাংশু কি যেন ভাবছে।

নকুলকে জিজ্ঞাসা করে, তোর গলায় অত বড় দাগ কিসের?

সেই যে হেঁসো-দায়ের কোপ ঝেড়ে দিয়েছিল। বাপের ভাগ্যি দুই খণ্ড হয়ে যায়নি।

আমাকেও মেরেছিল—

আপনাকে মেরেছিল লাঠির ঘা। মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গিয়েছিল। কেউ ভাবতে পারেনি, হাসপাতাল থেকে ফিরবেন। অথচ দেখেন বউঠানের বেলা—

কি ভয়ানক সেদিনটা! সর্বস্ব লুঠ হয়ে যাচ্ছে দাউ দাউ করে এঘরে-ওঘরে জ্বলছে আগুন। হিমাংশুর ফাটা মাথার রক্তে উঠানে সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। হাসি পাগল হয়ে তাদের পায়ে মাথা খুঁড়ছিল—সমস্ত নিয়ে নিলে, সব শেষ করলে, আমার উপর এত দয়া কেন? আমায় কেটে ফেল।

তারা বলেছিল, বন্দুক তুলেছিলি, তোর উপরে তো সকলের চেয়ে বেশি আক্রোশ। সেইজন্য তোকে প্রাণে মারব না।

একটা মাটির মালসা এনে দিয়ে বলে, মালসা হাতে দশ দুয়োরে ভিক্ষে মেগে বেড়াবি—এই হাল তোর করে দিয়ে গেলাম।

নকুল বলল, সেই মালসাখানা বাবু পড়েছিল খেয়াঘাটে বৈঁচিবনের পাশে। শরবনের মধ্যে লাস পাওয়া গেল—কলাগাছের মতন এমন নিটোল দেহ পচে গিয়ে ঢোল হয়েছে।

হিমাংশু ক্ষেপে উঠল।

গাঁজাখুরির জায়গা পাস নে? তোর গলা কাটল, আমার মাথার ঘিলু

ছিটকে গেল—আমরা বেঁচে বর্তে রইলাম। আর জলজ্যান্ত মানুষটার গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি—মারা গেল সে-ই?

খাওয়া শেষ করে হিমাংশু দেওয়াল ঠেশ দিয়ে মাদুরের উপর বসে আবার চোখ বুজল। ধীর মস্তিষ্কে আগাগোড়া ভেবে দেখবে। হাসপাতাল থেকে সেরে সুরে সে ফিরছিল···উঁহু, সত্যি সত্যি তা হয়ত নয়—সেরে গেছে, এমনি ভেবেছিল নিজের মনে। মৃত্যুর পরে যে রাজ্য, সেখানকার বাসিন্দারা হয়তো এমনি দেমাক নিয়ে থাকে। ভাবে, তারাই জীবিত—আর যত-কিছু সমস্ত মরে আছে।

পায়ের শব্দে ভাবনা ভেঙে যায়। নকুল।

উঠুন বাবু। চাদর পেতে দিই মাদুরের উপর নয়তো কষ্ট হবে, সমস্ত গায়ে দাগ-দাগ হয়ে যাবে।

হিমাংশু সজোরে নকুলের হাত চেপে ধরল।

সত্যি বল্, লুকোবি নে—আমরা কি মরে গেছি?

বালাই ষাট! অনেকে গেছে, আমরা কি আছি বাবু। কপাল ভালো আমাদের।

আরও রাত হল। ঝুপসি ঝুপসি গাছপালা—এতক্ষণ নিশ্চল ছিল, এখন নিশিরাত্রে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে যেন এদিকে সেদিকে। নকুলটা কিন্তু বেশ। দ্বারশূন্য ঘরের মেজেয় বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে, কিছুমাত্র ভয়সঙ্কোচ নেই।

ওরে নকুল!

সাড়া না দিয়ে নকুল পাশ ফিরে শু'লো। নাকের আওয়াজটা থামল, এই মাত্র। মাথা ভন ভন করছে, চটাপট সে গায়ে চাপড় মারছে মশা মারবার অভিপ্রায়ে। কি করবে এখন হিমাংশু। সাহসী বলে সবাই তাকে জান—কিন্তু আজন্মের ঘরবাড়িতে শুয়ে শুয়ে একি অস্থিরতা? কি একটা জানোয়ার ছুটে গেল ওদিককার জঙ্গল আলোড়িত করে। তক্ষক ডাকছে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। ঘুম আসছে না—ঘুমোয় কেমন করে এই অবস্থায়?

তক্ষক থামল, শুধু ঝিঁঝির আওয়াজ। ঝিমঝিম করছে রাত। পুরাঙ্গনারা গ্রাম-ব্যেপে যেন উলু দিয়ে বেড়াচ্ছে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে। গাছে গাছে অজস্র জোনাকি। ঐ যে উঠান—ওর চতুর্দিকে অসংখ্য ঘর ছিল গোলকধাঁধার মতো। চোর ঢুকতে ভরসা পেত না, জ্যেঠা মশায় বলতেন, আবার ঠিক মতো বেরুতে পারবে না—এই আশঙ্কায়।

হুমহাম বেহারা ডাকছে না? গভীর রাত্রে পালকি মেরে আসেন কোন নবাব বাহাদুর? আবার কে—চাটুজ্জে বাড়ির রামতারণ খুড়ো ভালুকভর

গাঁয়ের ছড়াদার গোলাম আলি সে আমলে ছড়া বেঁধে ছিলেন—রোগ নেই পীড়ে নেই যজ্ঞেশ্বর বাবু জমি নেই জিরেত নেই রামতারণ বাবু। রামতারণ হাট করতে যাবেন তাও পালকি চড়ে। পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত ঘুচিয়েছেন, তবু তার হাত খাটো হল না।

কি আশ্চর্য, তারণ খুড়োর পালকি হিমাংশুর ঘরের সামনে এনে নামাল। বেহারারা গোটাকয়েক হেড়াঙ্কি উপড়ে তার উপর চেপে বসে কাঁধের গামছায় কপালের ঘাম মুছে হাওয়া খাচ্ছে।

তুমি এসেছ—খবর পেয়ে দেখতে এলাম। আছ কেমন? রোগ রোগা দেখাচ্ছে। শহরে পড়ে থাকো।

শুনতে পাই মাটিও ওখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—কি-ই বা খেতে পাও সেখানে! কি পাশ দিলে এবার—এলে?

লেখাপড়ার পাট কবে সে চুকিয়ে এসেছে—কিন্তু বুড়োমানুষের খেয়াল থাকে না, সেই সব প্রশ্ন করছেন।

যজ্ঞেশ্বর এসে পড়লেন। ফর্সা রং, রোগা লিকলিকে চেহারা, এক মুখ দাড়ি-গোঁফ। এসে বললেন, বেহারার ডাকে বুঝতে পারলাম। তা বৈঠকখানা অন্ধকার কেন ও বউমা? আলো পাঠিয়ে দাও। চলো হে—মিছে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। ও বেলা দু-বাজি ঘাড়ে চাপিয়েছ, একটা তার অন্তত শোধ দিইগে। হাত ধরে টান দিতে রামতারণ খুড়ো উ-হু-হু করে উঠলেন।

বুড়ো হলে তবু ছেলেমানুষের ব্যাভার গেল না যজ্ঞেশ্বর। হাতের কড়া নড়িয়ে দিলে। হিমু বাড়ি এসেছে, একটুখানি সবুর করো।

যজ্ঞেশ্বর চোখ তুলে হিমাংশুকে দায়সারা গোছের এক নজর দেখে নিলেন।

ভাল তো রে? কখন এলি?

ততক্ষণে উঠানে নামিয়ে ফেলেছেন রামতারণকে। হিমু তো রইলই। সকাল বেলা আসব। এসে গল্পগুজব করা যাবে। ধানাই-পানাই না করে চলো দিখি-এখন—হাঁক দিয়ে বললেন, পান পাঠিয়ে দিও বৈঠকখানায়, ও বউমা—

হাসির বিরক্তস্বর শোনা গেল পাশের ঘরে অন্ধকারের মধ্যে।

এই রাত্রে এখন ওঁদের পান খাওয়ার বাতিক চাপল।

মা চাপাগলায় হাসিকে বকছেন।

ও কিরকম কথা! মানুষ বাড়ি এলে একটু ঝক্কি তো পোয়াতেই হবে। মানুষ না লক্ষ্মী। দশজনা পায়ের ধুলো দেবে, তবেই না গেরস্ত বাড়ি?

আর কথা নেই। হাসি লজ্জিত হয়েছে। যত জারিজুরি হিমাংশুর কাছে। মায়ের সামনে ভিজে বেরালটি।

জাঁতি দিয়ে সুপারি কাটার আওয়াজ। বাচ্চা কেঁদে উঠল একবার। গুণগুণ গুণগুণ ঘুম-পাড়ানো ছড়া বলছে ক্ষীরো। দোলনা দোলাচ্ছে, দড়িটানার শব্দটুকুও পাওয়া যাচ্ছে। এই এক মেয়ে ক্ষীরো—মাইনে-পত্তোর কিছুতে নেবেনা। বলে, টাকা নিয়ে রাখব কোথা? শোন কথা টাকা রাখবার সে জায়গা পায় না। বোনের মতো এই ক্ষীরো—মায়ের আর একটি মেয়ে।

হৈ-হৈ উঠল বাইর-বাড়ি। নাঃ পারা গেল না বুড়োদের নিয়ে। ছুটল হিমাংশু। রীতিমতো খণ্ডপ্রলয়—যজ্ঞেশ্বর জাপটে ধরেছেন রামতারণকে। ক্ষীণদেহ হলে কি হয়, যজ্ঞেশ্বরের গায়ে অসীম জোর। আর বলা কওয়া নেই, দুম করে প্রতিপক্ষকে মেরে বসেন। রামতারণ ঘেমে গিয়েছেন।

কি লাগিয়েছেন, আপনারা? সবাই হাসছে। লজ্জা করে না আপনাদের —ছি-ছি!

ভিতরে বাইরে একপাল ছেলেছোকরার ভীড। তারণ খুড়োর ফতুয়া ছিঁড়ে ন্যাকড়ার লম্বা ফালি ঝুলছে। ঘাড়ের দিকটা যজ্ঞেশ্বর চেপে ধরেছেন। পাহাড়ের মতো ঐ বিপুল দেহের উপরে যজ্ঞেশ্বর—যেন পাহাড়-শীর্ষে একটা পাখি। সেই চাপেই অথচ আইটাই করছেন তারণ খুড়ো। দর্শকজনে নানা মন্তব্য করছে, উৎসাহ দিচ্ছে।

হিমাংশু চেঁচিয়ে ওঠে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল নাকি? কি বলছে ওরা শুনতে পান?

অকুতোভয় যজ্ঞেশ্বর বলেন, তা বলে কিস্তির মুখে চালফেরত? দাবা আমি চাই-ই—

প্রায় নিরুদ্ধশ্বাস রামতারণ চিঁ চিঁ গলায় সালিশ মানলেন, আমার নৌকো তখনো কোট ছোঁয়নি বাবা। মা কালীর দিব্যি। তবে চালফেরত হয় কি করে? গায়ে বল আছে বলে জবরদস্তি করে ও জিতবে?

নকুল এমনি সময় পানের ডিবে নিয়ে এল। যজ্ঞেশ্বর দেখতে পেয়ে বললেন, এতক্ষণে এলি? থুতু যেন আঠা হয়ে গিয়েছে পান না খেয়ে—

মন্ত্রের কাজ হল। রামতারণকে ছেড়ে এক সঙ্গে গোটা চারেক খিলি মুখে ফেলে যজ্ঞেশ্বর কপ-কপ করে চিবোতে লাগলেন। রামতারণ উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ছেন, যজ্ঞেশ্বর তাঁর দিকে ডিবে এগিয়ে ধরলেন। পান খেতে খেতে রামতারণ উদারভাবে বললেন, বেশ তাই সই। চাইনে নৌকো। ঘোড়া তো আছে—অশ্বচক্র করে তবে ছাড়ব।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, সেই ভাল। মরদ মানুষের কথা। দেখা যাক—দু'জনে আবার দাবায় মগ্ন হলেন'।

অরণ্যাকীর্ণ বাড়ির মধ্যে জমজমাট সংসার। মা-বউ ক্ষীরো-খোকা সবাই রয়েছে; গ্রামের প্রবীণেরা যথারীতি বৈঠকখানায় এসে আড্ডা জমান। হিমাংশু খবর রাখে না, কতকাল দেখেনি এঁদের! আবার দেখবে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল? মরে যদি গিয়ে থাকে, মৃত্যু পরম রমণীয়—এই আনন্দলোক থেকে উষর জীবনে সে ফিরে যেতে চায় না।

ঘুম গাঢ় হল শেষ রাতে। আর কিছু জানে না। ভোর হল, তবু ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে। ক্রমশঃ টের পাচ্ছে মানুষের আনাগোনা। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসল। উলুখাগ আর হেড়াঞ্চি-কালকাসুন্দের উঠানে পা ফেলার জায়গা নেই, কত লোক রোয়াকে এসে উঠল তারই মধ্য দিয়ে। মানুষের চলাচল ছাড়া বাড়ি লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে।

কারা এলো? রাতের স্বপ্নগুলো অনতিস্পষ্ট উষালোকে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে আছে। অতীত দিনের মানুষ—সারা রাত্রি হিমাংশু যাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছে—সকালেও মায়া কাটাতে পারেনি। তাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে ঘর ছেড়ে রোয়াকে গিয়ে বসেছেন তাঁরা। সেই যে বলেছিলেন যজ্ঞেশ্বর তাঁরাও জুটেছেন বুঝি গল্পগুজব করতে? গল্প চলবে, এবং চা ও চিড়ে-ভাজা সেই সঙ্গে। চা দিতে দেরি হলে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক পাড়বেন, হল কি তোমাদের—ও বউমা? ঐ যে দেখা যাচ্ছে শনের মতো দাড়ি খুনখুনে বুড়ো—যজ্ঞেশ্বরই তো! যজ্ঞেশ্বর আজ অবধি বর্তমান থাকলে এমনি হয়ে যেতেন।

বাইরে এসে মুখোমুখি হয়ে ভুল ভাঙল। না, রাতের আত্মীয়স্বজন নয়—এরা শত্রুপক্ষ। রক্তচক্ষু তাজ মহম্মদ—শাণিত দাও হাতে যাকে উন্মত্ত নৃত্য করতে দেখেছিল ছাদের উপর থেকে। আরও কত অমনি! কেন এসেছে এই প্রত্যূষে? খেলা ঘরে একটুখানি গড়িয়ে নিচ্ছে—এখানে থাকতে চায় মোটমাট দু'টি দিন। তারপর চিরদিনের মতো চলে যাবে, তার সম্বন্ধীয় কেউ কখনো এ-মুখো হবে না, কোনদিন পরিচয় দেবে না—তাদের সাত পুরুষ ধরে শৈশবের অন্নপ্রাশন থেকে অন্তিমের চিতাশয্যা হয়েছে এই জায়গায়। জমিজমার একটু যে ক্ষীণ সম্বন্ধসূত্র আছে, সেটা ছেদ করে যাবে বলেই এসেছে। সিরাজুলের কাছে গিয়ে না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে সমস্ত জানে। এতদিনের পর চেপে বসার মতলব নিয়ে আসেনি এখানে হিমাংশু

তাজ মহম্মদ বলল, হাটখোলার আমতলা দিয়ে আসছিলেন, দোকানদাররা দেখেছিল। রাতের মধ্যে খবরাখবর হয়ে গেল। ধান কাটা, কলাই-সরষে তোলা—ক্ষেতের কাজের বড্ড চাপাচাপি তাই সাত সকালে চলে এলাম।

কেন এসেছে এরা—মতলবটা কি? হিমাংশুর মুখে ছাই মেড়ে দিল। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে—নিজের চোখে দেখা সেই সব ঘটনা।

তাজ মহম্মদকে বাঁ-হাতে সরিয়ে দিলেন বুড়ো মানুষটা। দীর্ঘ সাদা দাড়ি, বয়সের ভারে চামড়া ঝুলে পড়েছে। যজ্ঞেশ্বর বলে মনে হয়েছিল এঁকে। বুড়ো বললেন, আমায় চিনিস নে তুই?

কি ধরণের আলাপ! হিমাংশু ভুল করেছে সত্যি এখানে এসে। সিরাজুলকে লেখা উচিত ছিল, টাকা পয়সা নিয়ে সে-ই যাতে কলকাতায় চলে যায়, জমি-জমার বন্দোবস্ত সেখান থেকেই হত। আর যে রকম গরজ, নিশ্চয় সিরাজুল চলে যেতো! গাঁয়ে এসে এমন তুইতোকারি শুনতে হত না তা হলে। বড় বাড়ির ছেলে হিমাংশু—অধিকাংশই ওদের প্রজাপাটক—ও বাড়ির পাঁচ বছরের শিশুকে অশীতিপর বুড়োরাও 'আজ্ঞে হুজুর—' করে এসেছে। এতকাল পরে তিরিশের উপরে উঠে হিমাংশুকে 'তুই' শুনতে হল। দল বেঁধে এসেছে অপমান করবার মতলবে।

বলছিলেন বুড়ো লোকটি, পাঁচ কুড়ির কাছে বয়স—হাঁটাহাঁটি পেরে উঠিনে, শুয়ে থাকি। তা তুই এসেছিস শুনে থাকতে পারলাম না। কি একটা ওলট পালট হল, পুরানো সম্বন্ধ ধুয়ে-মুছে গেল একেবারে—

গভীর নিশ্বাস ফেলে তিনি মাথা নীচু করলেন।

তাজ মহম্মদ বলতে লাগল, আমি আগেভাগে এসে গেলাম। অনেকে আসবে। আছেন ক'দিন? কষ্ট করে এসেছেন—থেকে যান দু-দশ দিন। আর শোনেন—

হাত নেড়ে একটু দূরে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলে, নানান কথা শোনবেন আমার নামে। একেবারে মিথ্যে তাই বা কি করে বলি? আপনার ধান জমি আমি দখল করছি। চেঁচোঘাস হয়ে পড়ে থাকলে কি লাভ হচ্ছে বলুন? তা রাজ ভাগ আমি মারব না। মনে ভাবুন যে, বর্গা দিয়ে গেছেন। দশজনে হিসাব করে যা দিতে বলবে, আমি তাতেই রাজি। তবে এক সঙ্গে পেরে উঠব না, সইয়ে সইয়ে নিতে হবে। এক শ' টাকা এই হাতে করে এনেছি। আপনি খরচ পত্র করে এসেছেন, কিছু উসুল হোক!

নোটখানা হাতে নিয়ে তাজমহম্মদ চলে গেল। তাই তো। অবাক হিমাংশু তার গমন-পথের দিকে চেয়ে আছে। আসবার আগে কর্তাবাবু

বলেছিলেন, যাচ্ছেন যান—কিন্তু এক পয়সাও আনতে পারবেন না পাকিস্তান থেকে; শুধুই খরচান্ত হবে। হাতের মুঠোয় টাকা, তবু হিমাংশুর বিশ্বাস হচ্ছে না। বাড়ি বয়ে এসে লোকে টাকা দিয়ে যায়—এ কি বিশ্বাস হবার কথা? উড়ো খবর শুনেছিল, তাজ মহম্মদের নামে ভারি এক মামলা চলছে, তার ফাঁসি হবে। আর কিছু জানে না এর পর। হয়তো বা ফাঁসিই হয়ে গেছে, এ হল ফাঁসির পরের তাজ মহম্মদ। নইলে সেই মানুষের এমন মোলায়েম কণ্ঠ আর এতখানি ধর্মজ্ঞান!

বুড়ো আত্ম পরিচয় দিলেন, আমার নাম গোলাম আলি। চিনবি কি করে? ঈশ্বর মারা যাবার পর থেকে এ বাড়ি যাতায়াত বন্ধ। তোরা তখন কত ছোট!

নাম শুনে হিমাংশু তটস্থ হল। ছেলে বয়সে অল্প অল্প দেখেছে গোলাম আলিকে, কিন্তু জানে অনেক। খানদানি ঘরের সন্তান—সে আমলে কত রাস্তাঘাট পুকুর পাঠশালা যে বানিয়েছিলেন ইনি আর ঈশ্বর দুজনে মিলে! ঈশ্বর হিমাংশুর জেঠা—তাঁর মতো ইংরেজি নবীশ এ তল্লাটে কেউ ছিল না।

গোলাম আলি বলছিলেন, বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছি। আর পথও কম নয় ভালুকঘর থেকে। জল ভেঙে আসবার সময় ইটের উপর পড়ে কি অবস্থা হয়েছে দেখ্—

হাঁটুর উপর অনেকটা জায়গায় ছাল উঠে যাওয়ার কথা শুনে হিমাংশু হায় হায় করে উঠে জিগ্যেস করে—শীতকালে এখনো জল ভাঙতে হয়—বলেন কি জ্যেঠামশায়?

চোত মাসেও হাঁটুভর পানি থাকে বাবা। মরগা ছিল, ভেঙে এখন চৌচির। সেই আরো কাল হয়েছে—জলের তলে ইটের ঠোকর খেতে হয়। তা বলে চুপচাপ থাকতে পারলাম না তো বাবা। এসেছিস—আবার কখন ফুড়ুৎ করে চলে যাবি। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল; সেই তখন থেকেই এপাশ ওপাশ করছি। কত দিনের কত কথা মনে পড়ে তোরা সব তখন কোথায়?

বলতে বলতে গোলাম আলি থেমে গেলেন। সিরাজুল এসে উঠল।

এসে গেছ তা হলে?

হিমাংশু সসম্ভ্রমে বলে, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন? আমিই তো যাচ্ছিলাম। এঁরা সব এসে পড়েছেন, তাই একটু আটকা পড়ে গেছি।

সিরাজুল বলে, আমার ওখানে চা-টা খাবে, সেই কথা বলে যেতে এলাম।

একটু হেসে বলে, উঃ কদিন পরে এলাম! কি বাড়ি ছিল! কর্তাদের

আসলে কারো পা বাড়াবার জো ছিল অন্দরের এদিকটায়! সামনাসামনি এমনি পা ছড়িয়ে বসবার যাজি হত!

কাজের মানুষ সিরাজুল, বলতে গেলে গাঁয়ের মাথা সে এখন। তাড়াতাড়ি চলে গেল। গোলদার বাড়ি থেকে কিছু নলেন গুড়ের পাটালি কিনে বাড়ি ফিরে যাবে। পাটালি হয়তো হিমাংশুরই জন্য।

গোলাম আলি বলে উঠলেন, কি মতলব?

হিমাংশু জবাব দেয় না। বিষম উত্তেজিত হয়ে গোলাম আলি বলেন, খুলে বল দিকি আমায়। জমাজমি বেচবে? দশ-বিশ বিঘে জমি আছে, রাতে বুঝি ঘুম হয় না? মরে যাচ্ছিস জমি না বেচে। দেশঘরের কথা মনে পড়েছে ঐ জন্যেই বুঝি?

যেভাবেই বলুন, কথাগুলো কিন্তু নিদারুণরূপে সত্য। কয়লার ডিপো করে হিমাংশু সমস্ত পুঁজি খুইয়েছে। এক বইয়ের দোকানে হিসাব লেখার কাজ নিয়েছে, সে দোকানেরও উঠি উঠি অবস্থা। জমি বেচে কিছু গাঁটে নিয়ে—যাবে, নয়তো চতুর্দিকে নীরন্ধ্র আঁধার।

গোলাম আলি চোখ বুজে দেয়াল ঠেশ দিয়ে আছেন। রাতে ঘুম হয় না—এইভাবে সেটা পুষিয়ে নেবেন নাকি? বিষম মুশকিল হল হিমাংশুর। দুটো দিনের মাত্র ছুটি—কত দর-দাম, গোপন পরামর্শ ও বিলি ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বুড়ো এইভাবে ঘাঁটি আগলে বসে মাটি করবেন নাকি সমস্ত? অথচ কিছু বলাও যায় না -একেবারে জ্যেঠামশাই ডেকে বসেছে।

হঠাৎ দেখতে পেল, মুদিত দু-চোখের প্রান্ত দিয়ে জলের ধারা নেমেছে।

হিমাংশু ব্যস্ত হয়ে বলে, কি হয়েছে?

কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মার্জনা করে গোলাম আলি শান্তভাবে তাকালেন।

কিছুই নয় বাবা। বলবার মুখ আমাদের নেই, কিসের জোরে থাকতে বলব তোমাদের? আমি সে সময়টা রোগে পড়ে। তোমার ঐ মাতব্বর দোস্ত রটিয়ে দিল, কোন রাজ্যে নাকি খুনোখুনি হয়েছে, মসজিদ ভেঙেছে—

রটনা বলছেন কেন জ্যেঠামশাই? ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। আর সিরাজুল হাতে-নাতে দেখিয়েও দিয়েছিল—

হা-হা করে গোলাম আলি হেসে উঠলেন।

একেবারে ছেলে মানুষের মতো কথা বললে। আমার যে উঠবার শক্তি ছিল না নইলে হাঁক ছেড়ে বলতাম আমি সকলকে—

কেউ কানে নিত না জ্যেঠামশায়। কানে নেবার অবস্থাই ছিল না কারো—

গেলাম আমি অনেকটা আপন মনে বলতে লাগলেন কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। রোয়াকের উপর বসে চোখ মেলে চাইতে পারছি নে চারদিক। খোদাতালা যদি অন্ধ করে দিত!

অনতিদূরে খিড়কির ভাঙা দরজার কাছে অবগুণ্ঠিতা তিনজন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নকুল ছুটে এল। ফিসফিসিয়ে হিমাংশুকে বলে, তাজ মহম্মদের বাড়ির মেয়েরা। তার মা-বউ—আর একটি কে, চিনতে পারছি নে। ওরা তো বাড়ির বার হয় না বড একটা। আজকে এত পথ ঠেঙিয়ে এসেছে।

হিমাংশু শশব্যস্তে কাছে গিয়ে বলে, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন? আসুন—আসুন আপনারা।

হাতে ঝুড়ি-চাঙারি, তাতে চাল-ডাল তরিতরকারী। বাটীতে তেল, আর কানায় দড়ি ঝোলানো ঘটি ভরতি দুধ। সসংকোচে এগিয়ে এসে তারা রোয়াকের উপর নামিয়ে রাখলেন।

এ সব কি?

বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় তাজ মহম্মদের মা। ঘোমটা একটু খাটো করে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। বললেন, বাড়ি এসেছ—তা কিছুরই তো জোগাড় নেই। আজকের দিনটা এই সব রাঁধাবাড়া করে খাও—

হিমাংশু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল।

কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন, নেবে না?

কিন্তু জবাব দেবার আগে নকুল যেন ছোঁ মেরে সমস্ত নিয়ে তুলল রান্নাঘরে। বলছে, কাল তো আধা-উপোস গেছে। এখন কোথায় হাট বাজার, কোথায় কি—আমি তো হাঁড়িতে জল চাপিয়ে দিলাম, আপনি বিচার-বিবেচনা করুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

হিমাংশু হেসে বলল, নকুলটা ভিখারির বেহদ্দ। সত্যি আমার নেবার ইচ্ছে ছিল না, ভয়ানক রাগ হচ্ছিল। রাঁধা-বাড়া বেটা ছেলের পোষায়? কাঁচা চাল আর মূলো-বেগুন না এনে দুটো রাঁধা ভাত পাঠাতে পারলেন না মা?

সমস্ত দিন ধরে ঐ এক ব্যাপার চলল। মানুষ আসছে! যেন মেলা বসেছে—মানুষের পর মানুষ। অব্যবহৃত পথের যত জঙ্গল একটা দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হল সকলের পায়ে পায়ে। সন্ধ্যায় কালি-ঝুলি-মাখা হেরিকেনটা নকুল জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাতে মুখ দেখা যায় না সকলের। একজনে ছুটে গিয়ে বড় আলো নিয়ে এল সিরাজুলের বাড়ি থেকে। সেই একদিন শেষ

রাতে মুখ ঢেকে হিমাংশু পালিয়ে গিয়েছিল—আজকে জোরালো আলো জেলে অগণিত মানুষজন নিয়ে জাঁকিয়ে আসর করছে। উৎসবের বাড়ি। এই নতুন সঙ্গীদের নিয়ে উৎসব—আগে এরা শতেক হাত ব্যবধানে থাকত, দুর্যোগ-অন্ধকারের মধ্যে ছিটকে কখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ঝড়-ঝাপটার পর প্রসন্ন রোদ উঠেছে, চিরকালের স্বভাব ফিরে পেয়েছে আবার মানুষ। ভালবাসার এমন প্রস্রবণ লুকনো ছিল লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে! সাংঘাতিক রোগ-ভোগের পর বেঁচে উঠলে যেমন হয়—যা-কিছু দেখছে, অপরূপ লাগে। মানুষজন সবাই ভালো।

পরের দিন আরও ভিড়। খবর ছড়াচ্ছে আর এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকেও মানুষ আসছে। হাসি পায়—হঠাৎ এমন গণ্যমান্য হয়ে উঠল সে কিসে? কিন্তু পারা যায় না আর—একটা মিনিটও নিজের বলতে নেই। যে জন্যে এসেছিল, তার কিছু নয়—সিরাজুলের সঙ্গে একটা কথা বলবারই ফুরসৎ হল না দুটো দিনের মধ্যে। রেল স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এই গ্রাম—আসবার দিন হেঁটে এসেছিল, যাবার সময় কিছুতে শুনল না—গরুর গাড়ি এনে তার উপর বসিয়ে দিল। পাড়ারই একজনের বাড়ির গাড়ি—বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে নতুন করে ছই বেঁধেছে ভোরের রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে গাড়ি চলল। আগে পিছে এক পাল মানুষ।

আবার কবে আসবি? গোলাম আলি জিজ্ঞাসা করলেন।

আসব আর কিছু হিমাংশু বলতে পারল না। বেশী কথা বলতে গেলে মনে হল, চোখে জল এসে যাবে—সামলাতে পারবে না।

সহসা সে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, শুনুন জ্যেঠামশায়—

গাড়ি থামল, গোলাম আলি পাশে এলেন। তাজ মহম্মদের দেওয়া একশ টাকার নোটখানা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে হিমাংশু বলল, ভালুকঘরে দরগাটা যাতে হয়—আপনি জ্যেঠামশায় সেই আগেকার মতো একটু চেষ্টা করুন। আমার এই চাঁদা।

জানে, দোকানের চাকরি আর বেশি দিন নয়। সিকি পয়সা সম্বল নেই. এর পর পথে দাঁড়াতে হবে। এই মহানুভবতা অনুচিত তার পক্ষে। সমস্ত জানে। কর্তাবাবুর কথাগুলো মনে পড়ল—টাকা আনতে পারবেন না পাকিস্তান থেকে, কেড়েকুড়ে নেবে। তাই-ই হল। টাকা নিয়ে যাবার শক্তি নেই এখান থেকে।